গল্প-পঞ্চাশৎ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মুকুন্দ পাবলিশার্স
৮৮ বিধান সরণি, কলিকাতা-৪
(রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মস্থান)

প্রথম সংস্করণ

রেখাচিত্র : শিল্পী ইন্দ্র দুগার

প্রচ্ছদ : শিল্পী চারু খান

আলোকচিত্র : বোর্ন এণ্ড শেফার্ড

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

গ্রন্থন : গ্রন্থনালয়

মুকুন্দ পাবলিশার্স, ৮৮ বিধান সরণি, কলিকাতা-৩ হইতে শ্রীগোবিন্দ বিশ্বাস কর্তৃক
প্রকাশিত ও নিউ সরস্বতী প্রেস, ১৭ ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পান কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীমান জগদীশ ভট্টাচার্য

স্নেহভাজনেষু—

প্রকাশকের নিবেদন :

এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পঞ্চাশটি নির্বাচিত গল্প লইয়া এই 'গল্প-পঞ্চাশৎ'। তারাশঙ্করের সামগ্রিক রচনার বিভিন্ন রসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই গ্রন্থটি সংকলিত হইয়াছে।

শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। বলিতে কি তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশ করা আদৌ সম্ভবপর হইত না।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার মূল্যবান রচনা 'গল্পকার তারাশঙ্কর' ভূমিকারূপে সংযোজিত করিয়া এই গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি অঙ্গীভূত গল্পগুলি নির্বাচন করিয়া আমাদের প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন।

প্রখ্যাত শিল্পী ইন্দ্র দুগার মহাশয় স্বেচ্ছায় তাঁহার অঙ্কিত বীরভূমের দুইখানি রেখাচিত্র ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত মহাশয় বর্তমান গ্রন্থের প্রচ্ছদ এবং গ্রন্থন সম্পর্কে নানাবিধ উপদেশ দিয়া আমাদের পরম সাহায্য করিয়াছেন।

বন্ধুবর সত্যহরি পান নিজতত্ত্বাবধানে গ্রন্থটির মুদ্রণকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

ইঁহাদের সকলের কাছেই আমরা চিরঋণী রহিলাম।

১৫।৮।১৯৬০

মুকুন্দ পাবলিশার্স,
৮৮, বিধান সরণি, কলিকাতা-৪

গোবিন্দ বিশ্বাস

ভূমিকা : গল্পকার তারাশঙ্কর

গ ল্প ক্র ম :

গল্পকার তারাশঙ্কর

তারাশঙ্করের সাহিত্য-সাধনার কথা ভাবতে গেলে এক অবিকম্পিত নির্ধূম অগ্নিশিখার কথাই মনে পড়ে—দুঃখ-বেদনা-প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে যার দিগন্তস্পর্শী স্বর্ণদীপ্তি!

সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব কিঞ্চিৎ বিলম্বিত হলেও, বলিষ্ঠ শিল্পপ্রত্যয় ও অসাধারণ শক্তির জন্য অল্পদিনের মধ্যেই অগ্রণী সাহিত্যিকের মর্যাদা তিনি পেয়েছেন। ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসের 'কল্লোল' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয়; পরের বছর ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় আর একটি গল্প—'হারানো সুর'। তারাশঙ্কর ১৩৩৫ সালের বৈশাখ থেকেই তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের কালগণনা শুরু করেছেন।[১] এর আগে তাঁর সাহিত্যসাধনা চলেছে লোকচক্ষুর অগোচরে। কবিতা লিখতেন তখন। ১৩৩২ সালে বীরভূমে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে তিনি অভ্যাগতদের স্বাগত-সম্ভাষণ জানিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন। লাভপুরে তখন নাটক-রচনার ঢেউ চলেছে। তারাশঙ্করের মনেও নাট্যকার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। গ্র্যাণ্ড ডফের মারাঠাদের ইতিহাস অবলম্বন করে এক নাটকও তিনি লিখলেন। স্থানীয় রঙ্গমঞ্চে নাটকখানি 'আশ্চর্য রকম জমে গেল'।

আর্ট থিয়েটারের তখন স্বর্ণযুগ। সেখানকার অধ্যক্ষ মহাশয় নাটকখানি না পড়েই ফেরত দিলেন। সেদিন নাট্যকার-যশোলিপ্সু তারাশঙ্কর ব্যর্থমনোরথ হয়ে 'মারাঠা-তর্পণ' নাটকের পাণ্ডুলিপি আগুনে নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু সেই জ্যোতির্ময় পাবক-শিখাই তাঁকে বাঁচিয়ে দিল। তারাশঙ্করের সাহিত্যিক-জীবনে ঘটনাটির একটি বিস্ময়কর তাৎপর্য আছে। তিনি ভুল করেছিলেন। তাঁর অলিখিত কাহিনী তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের সংঘাতময় ভারত ইতিহাসের মধ্যে নিহিত ছিল না, গ্র্যাণ্ড ডফের তিন ভল্যুম মারাঠা ইতিহাসের তথ্যপঞ্জীতেও তা চিহ্নিত ছিল না, কিংবা ঐতিহাসিক রোমান্সের কারুকার্য-খচিত মর্মর-প্রাসাদের মধ্যেও তা নিবদ্ধ ছিল না। কিন্তু একথাও ঠিক যে, নাট্যকার তারাশঙ্করের সেদিন মৃত্যু হয় নি, রূপান্তর ঘটেছিল মাত্র। কেননা তাঁর গল্পে নাটকীয়তার অভাব নেই, এবং পরবর্তীযুগে তিনি নাট্যকার-খ্যাতিও লাভ করেছেন।

---

১. 'আমার সাহিত্য-জীবন' (প্রথম পর্ব), পৃ ১।

[দুই]

রহস্যময় মানবজীবনে গল্পের অভাব নেই। কিন্তু সে গল্প চোখে দেখা চাই, হৃদয় দিয়ে অনুভব করা চাই, সেই রহস্য-সমুদ্রের গভীরে অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে নিমজ্জিত হওয়া চাই। তারাশঙ্করের সেই দৃষ্টি, হৃদয় ও জিজ্ঞাসা ছিল। তাই দীর্ঘকালব্যাপী তাঁকে সন্ধান করতে হয় নি, সহজেই তিনি স্বক্ষেত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁকে গল্প খুঁজে বেড়াতে হয় নি, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর হাতে সহজেই শিল্পমূর্তি লাভ করেছে। যে জীবনকে তিনি দেখেছেন, সেই জীবনেরই মর্মস্থলে তিনি প্রবেশ করেছেন। তাঁর দেখার মধ্যে যেমন কোনো ফাঁক ছিল না, তেমনি তাঁর অনুভবের মধ্যেও ছিল না কোনো ফাঁকি। সুতরাং অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পাঠকের চিত্তজয় করলেন।

তারাশঙ্কর যখন বাংলা সাহিত্যে পদক্ষেপ করেছেন, তখন শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যের চূড়ান্ত শীর্ষে অধিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিপ্রাচুর্য তখনও নূতন নূতন রূপ ও রীতির সন্ধানে মুখর। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ তখন নব নব বক্তব্য ও আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের এই দুই অধিনায়কের সৃষ্টিপ্রাচুর্যের যুগেও সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিল অন্য এক অগ্নিময় সঙ্কেত। 'কল্লোল' পত্রিকা হল সেই বিদ্রোহের বাহন। ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যের পটপরিবর্তন শুরু হল। একদল সংস্কারমুক্ত বিশ্লেষণী মন সাহিত্যের প্রথাবদ্ধ ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সাহিত্য তার শুচিশুভ্র অভিজাত্য ও নীতিবোধের গজদন্ত-মিনার থেকে নেমে এল অখ্যাত ও অনাবিষ্কৃত গলিপথে। জীবনের যে অংশ আদর্শবাদ, নীতিবোধ ও সুলভ ভাবালুতার রঙীন কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল, তার উপরে পড়ল কৌতুহলী দৃষ্টির তীক্ষ্ণ রঞ্জনরশ্মি।

বাংলা সাহিত্যের পূর্বদিগন্তে যখন 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার' উদ্‌ঘাটনের প্রহর গণনা করছে, তারাশঙ্কর তখন সমাজসেবা ও রাজনীতির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। নাট্যকার-যশোলিপ্সু তারাশঙ্কর ব্যর্থমনোরথ হয়ে কংগ্রেস-সংক্রান্ত কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু অবরুদ্ধ বাসনার মৃত্যু হল না। স্থানীয় 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় তিনি দু-হাতে লিখে চললেন। নানাধরনের লেখা—কবিতা, গল্প, সম্পাদকীয়,—সব কিছুই। কিন্তু তাঁর কিছুতেই যেন মন ভরে না। তারাশঙ্করের মনোভূমি তৈরি ছিল, শুধু উপযুক্ত বীজের প্রত্যাশায় তিনি ছিলেন উৎকণ্ঠিত। আকস্মিকভাবেই তিনি স্বপথের সন্ধান পেলেন। তারাশঙ্কর নিজেই সেই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন :

ঠিক এই সময়েই একদিন—সিউড়ীতেই হবে, এক উকিলের বাড়িতে

উঠেছি কংগ্রেসেরই কাজে।...রাত্রে ঘুম আসে না। হয় গরম, নয় শীত, দুটোর একটা হেতু বটে। তার উপর ছেঁড়া মশারির ফাঁক দিয়ে মশা ঢুকছে ঝাঁকে ঝাঁকে।...জেগে বসে বিড়ি খাই আর গুনগুন করে গান গাই। এমনই অবস্থায় হঠাৎ হাতড়ে মিলল একখানা মলাটছেঁড়া 'কালিকলম' পত্রিকা।

আলোটা বাড়িয়ে দিলাম। চোখে পড়ল অদ্ভুত নামের একটা লেখা। এবং লেখকের নামটা অদ্ভুত না হলেও বিচিত্র।

'পোনাঘাট পেরিয়ে', লেখক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

পড়ে গেলাম গল্পটি। বিচিত্র বিস্ময়পূর্ণ রসমাদকতায় মন মদির হয়ে গেল। মশকের গানে বা দংশনেও কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারলে না।

ওলটালাম পাতা। আবার পেলাম একটি গল্প। গল্পটির নাম মনে নেই। লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

অদ্ভুত! বীরভূমকে এমনি করে কলমের ডগায় অক্ষরে অক্ষরে সাজিয়ে রূপ দেওয়া যায়! [২]

'কালিকলম' পত্রিকার পৃষ্ঠায় তারাশঙ্কর পেলেন পথনির্দেশ, পেলেন অবিচলিত সাধনার যথার্থ বীজমন্ত্র। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলি সারস্বত মুক্তির প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মফঃস্বল শহরের সেই বিনিদ্র রাত্রি ভাবীকালের শক্তিধর শিল্পীর সামনে তুলে ধরল এক অলিখিত জীবনভাষ্যের জ্যোতির্ময় পাণ্ডুলিপি। কমলিনী বৈষ্ণবীর প্রত্যক্ষচিত্রের সঙ্গে জীবনের সত্যজাগ্রত রসপিপাসা মিলে রচিত হল 'রসকলি' গল্প।

তারাশঙ্কর বলেছেন :

গল্প পেলাম।

আমার নায়িকা মঞ্জরী, জীবদেহের সরোবরে পদ্মের মত জীবন নিয়ে ফুটল। শুধু আমার গল্পের নায়িকা মঞ্জরীই ফুটল না—আমার মনে হল, আমি কেমন করে আচম্বিতে পৃথিবীর মায়াপুরীতে এটা ওটা নাড়তে নাড়তে সোনার কাঠি কুড়িয়ে পেলাম। যার স্পর্শে অসাড় মানুষ ঘুম ভেঙে ফুটে ওঠে ফুলের মত। গল্পলেখার ওইটেই একটা বড় সমস্যা। সব হয়, কিন্তু বেঁচে ওঠে না—জেগে ওঠে না। জানি না, পৃথিবীর যাঁরা মহারথী—তাঁদের কেউ এই বাঁচিয়ে তোলার, জাগিয়ে তোলার বিদ্যাই বলুন—আর মন্ত্রই বলুন—এটা কারুর কাছ থেকে শিখেছেন কিনা—অথবা

---

২. 'আমার সাহিত্য-জীবন' (প্রথম পর্ব), পৃ ১৯-২০।

শাস্ত্র পড়ে পেয়েছেন কি না। তবে আমার মনে হয়—ওই শক্তিটুকু একদিন অকস্মাৎ জেগে ওঠে। কেমন করে জানি না, শিল্পী সাহিত্যিকের আসে একটা তন্ময়তার যোগ; তখন পাত্র-পাত্রীর জীবনের সুখদুঃখের মধ্যে ডুবে যায় শিল্পী; তখনই জেগে ওঠে—ফুঠে ওঠে।[৩]

তারাশঙ্করের এই স্বীকৃতিকে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বলা যায়। তিনি সাহিত্যিকের 'তন্ময়তার যোগ' বিশ্বাস করেন। তিনি স্বভাবকবিদের মতোই বিশ্বাস করেছেন 'সোনার কাঠি'র আকস্মিক স্পর্শ—যাতে ঘুমন্ত রাজকন্যা জেগে ওঠে। কিন্তু পুরনো 'কালিকলমে'র বিবর্ণ পৃষ্ঠায় প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দের গল্পে ছিল এমন এক ইঙ্গিত, যা তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। তারাশঙ্করের উৎকণ্ঠিত শিল্পীমন সেদিন অঞ্জলিভরে সেই অভিনব জীবনরস আস্বাদন করেছিল। রাঢ়ের পল্লীজীবনের চিত্র শৈলজানন্দের গল্পে নিপুণ রেখায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতা বীরভূম। শৈলজানন্দের গল্প তারাশঙ্করের সুপ্ত অন্তরেন্দ্রিয়কে জাগিয়ে দিল। তিনি উত্তর রাঢ়ের রুক্ষ ধূসর মাটির মধ্যে আবিষ্কার করলেন এক অনাবিষ্কৃত মহাকাব্যের শিলালিপি, সেখানকার প্রত্যহের ধূলির মধ্যেই খুঁজে পেলেন চিরায়ত ঐশ্বর্য। তিনি সেই পটভূমির উপরেই দেখলেন সুখ-দুঃখে বিচিত্রিত মানবজীবন—আদিম অন্ধ জৈববৃত্তির নাগপাশ যাদের বন্ধন, অথচ সেই বন্ধনকে ছিন্ন করেই যাদের জরা-মৃত্যুজয়ী অমৃত পিপাসার অভয়মন্ত্র! শৈলজানন্দের 'বেনামি বন্দর: জনি ও টনি' গল্পটির মধ্যে[৪] বীরভূমের কোনো ছাপ নেই, কিন্তু জৈবজীবনের একটি বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র সেখানে উদ্‌ঘাটিত ছিল। তারাশঙ্কর এখানেও নূতন আস্বাদন পেয়েছেন। জীবনজিজ্ঞাসার মূলসূত্রটিকে তিনি চমৎকারভাবে রূপ দিয়েছেন। 'পূর্ণিমা'য় প্রকাশিত 'স্রোতের কুটো' গল্পটি তাঁর মতে 'জৈবিক বেগের প্রাবল্যে বেশী অভিভূত'। গল্পটির ভারসাম্য সেখানে বিচলিত হয়েছিল। কিন্তু উত্তরকালে তারাশঙ্করের প্রৌঢ়-জীবনোপলব্ধি এক শান্তস্থির ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠিত। তারাশঙ্কর বলেছেন:

জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস। কিন্তু সে তো তাকে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানবধর্মকে খুঁজে পেয়েছে! সেইখানেই

৩. 'আমার সাহিত্য-জীবন' (প্রথম পর্ব), পৃ ২১-২২।

৪. 'কালিকলম': জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪। এই গল্পটির কথাই তারাশঙ্কর উল্লেখ করেছেন।

তো নিজেকে পশুর সঙ্গে পৃথক বলে জেনেছে। ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখব। সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা—তার কামনার ধারার সঙ্গে মিশেই চলেছে। জীবন চলেছে একটি স্বতন্ত্র ধারায়। কোথাও জিতেছে কোথাও হেরেছে।[৫]

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এই হল তারাশঙ্করের উপলব্ধি! মাটি ও মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ মানুষ—আদিম প্রকৃতির ভীষণসুন্দর মহিমা ও মানবপ্রকৃতির সহজ বলিষ্ঠ অন্ধ আদিমতা এখানে যেন একই মহাশিল্পীর রচনা। সেই অরুগ্ন অমার্জিত অথচ সহজ জীবন-উৎসের অতল-গভীরে কত নিষ্ঠুর সত্যের নির্মম বিলাস, কত দুর্লভ ঐশ্বর্যের অভাবনীয় দীপ্তি!

আর্টিস্টের অনাসক্ত দৃষ্টিতে তারাশঙ্কর দেখেছেন—মানুষের আদিম অপরাধ-প্রবণতা, দেহ-মনের কুৎসিত ব্যাধি, পতনোন্মুখ জমিদারকুলের অস্তগামী গরিমা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ, এবং তার পাশাপাশি আদিম মানুষ বেদে-বাউরী-সাঁওতাল-রাজবংশীর দল।

বাংলা সাহিত্যে এ কাহিনী নূতন, জীবনবোধের স্বরূপটি আরও নূতন। রবীন্দ্রকাব্যের যৌবনলগ্নে 'অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা' আস্বাদনের পিপাসা জেগেছিল, জেগেছিল 'আরব বেদুইন' হাওয়ার রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা দু-একটি লিরিকের ক্ষণজীবী ইন্দ্রধনু মাত্র ;—কবিমানসের স্বর্ণ-মেঘস্তরে কদাচিৎ তার সন্ধান পাওয়া যায়। 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পমালায় ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীবাংলার জীবনযাত্রা ও পল্লীর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার রসোজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু সমাজের সর্বনিম্নস্তরের জীবনযাত্রার রহস্যদ্বার সর্বপ্রথম উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তারাশঙ্করেরই গল্পে। এই ধরনের জীবনচিত্রণ তথা আঞ্চলিকতার সূত্রপাত করেছিলেন শৈলজানন্দ। রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লার খনি ও সেখানকার সাঁওতাল কুলি-মজুরদের নিয়েই শৈলজানন্দ তাঁর 'কয়লা-কুঠি'র গল্পগুলি লিখেছিলেন। 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। শৈলজানন্দ পথের সন্ধান দিলেও কয়েকটি নিপুণ খণ্ডচিত্রের মধ্যেই তা নিবদ্ধ রইল, আর 'কয়লাকুঠি'র গল্প বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করল। শৈলজানন্দ যার আভাস মাত্র দিলেন, তারাশঙ্কর তাকেই সমগ্রতায়, গভীরতায়, জীবন-রহস্যের নিগূঢ় অর্থদ্যোতনায় একটি বিশালতা দিলেন। প্রথম থেকেই তারাশঙ্কর কারো প্রতিধ্বনি নন—প্রকৃতির সহজ শক্তির মতোই অরুগ্ন ও মৌলিক তাঁর শিল্পীসত্তা!

---

৫. 'আমার সাহিত্য-জীবন' (প্রথম পর্ব), পৃ ২০।

তখনকার কালের সবচেয়ে অভিজাত পত্রিকা ছিল 'প্রবাসী'। আত্মপ্রকাশেচ্ছু তরুণ সাহিত্যিকেরা লেখা পাঠাতেন, এবং সেখান থেকে না পড়েই লেখাগুলি ফেরত পাঠানো হত। এই বিড়ম্বনা তারাশঙ্করকেও ভোগ করতে হয়েছিল। 'কল্লোল' পত্রিকাই তারাশঙ্করকে আবিষ্কার করেছিল। 'প্রবাসী'র কৌলীন্যের দুর্গদ্বার তরুণদের জন্য ছিল অবরুদ্ধ। সেখানে তরুণদের স্পর্ধিত বিদ্রোহের কোনো প্রশ্রয় ছিল না। 'কল্লোলে'র সুর ছিল বন্ধন-মুক্তির, সংস্কারের নাগপাশ বন্ধন-মুক্ত করাই ছিল তার দুঃসাধ্য ব্রত। সাহিত্যের যুগ-জীর্ণ সংস্কারকে আঘাত হানতেই চেয়েছিলেন এই পত্রিকার সাহিত্যিক-ব্রতচারীরা। তাই তাঁরা চাইলেন সংস্কারমুক্ত নূতন দৃষ্টি, বিষয়বস্তুর নূতনত্ব ও জীবনের সব কিছুকে স্পষ্ট করে বলার স্পর্ধিত দুঃসাহস। অভিজাত পত্রিকায় যাদের জীবনের স্থান হয় নি, সেই নোংরা বস্তিবাসী ও অসংস্কৃত নরনারীর আদিম জীবনযাত্রা এখানে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হল। নরনারীর প্রেমসম্পর্কের উপর দীর্ঘকালব্যাপী যে নীতি ও আদর্শবাদের রঙীন কুয়াশা মণ্ডিত হয়ে ছিল, তাকে ভেদ করে অতির্যক রেখায় বর্ষিত হল বুদ্ধিদীপ্ত মননের রঞ্জনরশ্মি। অকুণ্ঠ সত্যভাষণ ও সংস্কাররাহিত্য নরনারীর যৌনজীবনকে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার বিষয়বস্তু করে তুলল। 'কল্লোল' দুঃসাহসী তারুণ্যের যৌবনদ্রোহ—উদ্ধতকণ্ঠে তাই ঘোষিত হল :

এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহঙ্কার,
যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী,
কারেও ডরি না কভু, সুকঠোর হউক সংসার,
বন্ধুর বিচ্ছেদ তুচ্ছ, তুচ্ছতর বন্ধুর সরণি।
পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র-তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর![৬]

'কল্লোল' ছিল নবীনের বাণীবাহক। তাই তারাশঙ্করের নূতন সুরও 'কল্লোলে'র কলধ্বনিতেই স্বীকৃত হল। পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে

---

৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ' (প্রথম সংস্করণ), পৃঃ ১৪৭।

এ কথা স্বীকার করেছেন।[৭] 'কল্লোল' পত্রিকার লেখক হলেও তিনি 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ হতে পারলেন না। কেন পারলেন না, তার হেতু নির্ণয় করতে গেলে তাঁর মনোজীবনের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করা যায়। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যুদ্ধোত্তর বাংলার জীবনচর্যা তখনকার কালের শিক্ষিত তরুণ-মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তা-ই 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠায় বিদ্রোহের বাণী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। জীবনের সবগুলি পথই যখন রুদ্ধ, কোনো দিকেই যখন নিষ্ক্রমণের কোনো পথ নেই, তখন এই ব্যর্থতাবোধ ও নৈরাশ্য চিত্তবিক্ষোভে পরিণত হল। তাই বাংলা সাহিত্যের এই ক্ষণদীপ্ত ও স্বল্পস্থায়ী অধ্যায়টির মধ্যে যতখানি আঘাতপ্রবণতা ছিল, ততখানি নূতন মূল্য-সন্ধানের প্রচেষ্টা ছিল না। 'কল্লোল' পুরাতনের দুর্গদ্বারে আঘাত করেছে, তার জীর্ণ কবাটে ফাটল ধরিয়েছে সত্য, কিন্তু নূতন-মূল্যকে তেমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি।

'কল্লোল'গোষ্ঠীর লেখকরা ছিলেন মূলত নাগরিকমানস। কিন্তু তারাশঙ্কর যথার্থই পল্লীপ্রাণ সাহিত্যিক। 'কল্লোল' পত্রিকায় যে পল্লীগ্রামকে নিয়ে গল্প লেখা হয় নি এমন নয়, কিন্তু তারাশঙ্করের গ্রামীণচেতনার সঙ্গে এর পার্থক্য দুস্তর। 'কল্লোল'গোষ্ঠীর অনেকেই নাগরিক চেতনা ও শহুরে মন দিয়ে পল্লীগ্রামকে বুঝতে চেয়েছিলেন। তাই সে বোঝার মধ্যে তন্ময়তা ছিল না, আন্তরিক সাযুজ্যেরও ছিল অভাব। সেখানে পল্লীজীবনের উপরিতলের দু-একটি ক্ষণ-বুদ্বুদ ও খণ্ডচিত্র ছাড়া তেমন কিছু ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয় নি। তারাশঙ্করের গ্রামীণচেতনা তাঁর জীবন-চেতনারই অবিচ্ছেদ্য অংশ—তাই এই চেতনা যেমন সমগ্র, তেমনি সর্বঙ্কর। দ্বিতীয়ত, তারাশঙ্করের জীবনবোধ গভীরতর, তাই তিনি মহাকালের প্রলয়লীলাকেই একমাত্র সত্য বলে মানেন নি, সবার উপরে তাঁর শিব-সুন্দর আশীর্বাদকেও স্বীকার করে নিয়েছেন। নাগরিক-জীবনের কুটিল সংশয় ও বিকৃতি তাঁর চরিত্রগুলিকে স্পর্শ করতে পারে নি। ব্যাধিকে তিনি নিপুণ ও অভ্রান্তভাবেই দেখেছেন, কিন্তু তাকেই তিনি চরম বলে স্বীকার করেন নি। তাই তাঁর রচনাতে ব্যাধির বিশল্যকরণীর সঙ্কেতও আছে। বিষামৃতময় জীবনের মূলে প্রবেশ করেছেন তারাশঙ্কর। একালের গ্লানিজর্জর ক্ষয়িষ্ণুতা ও কুটিল সংশয় তাঁর মানসলোক স্পর্শ করতে

---

৭. 'কল্লোল'-'কালিকলম' এমনিভাবে গুণগ্রাহিতার পরিচয় না দিলে আমি চলতাম অন্তপথে। রাজনীতির পথে।—'আমার সাহিত্য-জীবন' (প্রথম পর্ব), পৃঃ ৩২।

পারে নি, অথচ এর জন্য তাঁকে ভীরু পলায়নবৃত্তি গ্রহণ করতেও হয় নি। তিনি নিজেই বলেছেন :

> বিদ্রোহ ও বিপ্লবে প্রভেদ আছে। আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙেচুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনোদিন হয় নি। আমার রচনার সমাপ্তি-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই এটা বোধ হয় স্পষ্ট ধরা পড়ে। আমার মনে ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন ছিল। উত্তাল উর্মিলতার মধ্যে তটভূমিতে আছড়ে পড়ে ফিরে গিয়ে তটভূমি ভেঙে এবং আবর্ত সৃষ্টি করেই তৃপ্তি পাবার মত মনের গঠন আমার ছিল না। ওই উর্মিলতার নিচে যে স্রোতোধারা প্রবাহিত হয়, যে স্রোত অহরহ সমুদ্রের বুকের ভিতর প্রবাহিত হয় আপনার বেগে আপনার পথে, আমার মনের গতি অনেকটা সেই ধরনের।[৮]

আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে। 'কল্লোল'গোষ্ঠীর লেখকদের বিদ্রোহবাণীকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যিক ও চিন্তা-নায়কদের প্রভাব। রলাঁ, জাসিন্তো বেনাভাঁতে, যোয়ান বোয়ার, ক্নুট হামসুন, রবার্ট ব্রিজেস, এইচ. জি. ওয়েলস প্রমুখ সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করেছিলেন, প্রত্যুত্তরে এঁরা আশীর্বাণীও পাঠিয়েছিলেন। হুইটম্যানের কবিতা, লরেন্স-হাক্সলির কথাসাহিত্য, হামসুন-গোর্কি প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনা এই গোষ্ঠীর লেখকদের উদ্বোধিত করেছিল। এখানেও 'কল্লোলে'র সুরের সঙ্গে তারাশঙ্করের সুর মেলে নি। তারাশঙ্কর কোনোদিনই ওই পথে পা বাড়ান নি। তাতে তাঁর মহত্ত্ব কমে নি, বরং বেড়েছে। পূর্বসূরীদের প্রভাব এড়ানোর জন্য পশ্চিমী সাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়াকে কোনো কোনো লেখক তাঁদের স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে অবলম্বন করেছিলেন। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের মাটিতে বিদেশী মরশুমী ফুল ভালো ভাবে ফুটতে পারে নি। সৌভাগ্যের বিষয় তারাশঙ্কর সুলভসিদ্ধির পথ বর্জন করেছিলেন। কারণ, এই তাঁর শিল্প-নিয়তির অমোঘ নির্দেশ!

তারাশঙ্করের প্রতিভা এমন আশ্চর্য রকম স্বতন্ত্র যে 'কল্লোল'গোষ্ঠীর কেন, কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গেই তেমন অন্তরঙ্গতা ঘটা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সাহিত্যের পূর্বাচার্যদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কম নয়, তবু তাঁদের পথ তিনি যেমন বর্জন করেছেন, তেমনি সমকালীন কথাসাহিত্যিকরাও তাঁর উপর কোনো ছায়াপাত

---

৮. 'আমার সাহিত্য-জীবন' (প্রথম পর্ব), পৃঃ ৭৭।

করতে পারেন নি। একবার স্বক্ষেত্র আবিষ্কার করার পর নিজের অন্তর্লোকই তাঁকে পথ দেখিয়েছে। পৌরুষ ও নিষ্ঠাই তাঁকে পথনির্দেশ দিয়েছে। স্বভাব-কবিদের মতোই তাঁর সাহিত্যিক মেজাজ। অচিন্ত্যকুমার যথার্থই বলেছেন :

> …পুরুষকারই চিরদিন তারাশঙ্করকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে। পুরুষকারই কর্মযোগীর বিভূতি। কাষ্ঠের অব্যক্ত অগ্নি উদ্দীপিত হয় কাষ্ঠের সংঘর্ষে, তেমনি প্রতিভা প্রকাশিত হয় পুরুষকারের প্রাবল্যে। নিষ্ক্রিয়ের পক্ষে দৈবও অকৃতী। নিষ্ঠার আসনে অচল অটল সুমেরুবৎ বসে আছে তারাশঙ্কর—সাহিত্যের সাধনার থেকে একচুল তার বিচ্যুতি হয় নি।[৯]

তারাশঙ্করের উপলব্ধি ছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হল কঠিন তপশ্চর্যা। মাটিই তাঁকে পথ দেখিয়েছে। মাটির অত্যন্ত কাছাকাছি যারা বাস করে, সেই সব মানুষই তাঁকে তাঁর জীবনপথের নির্দেশ দিয়েছে। তাই পশ্চিমী সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হয় নি তাঁকে। যে অঞ্চল তাঁর ধাত্রী, তাকে তিনি রূপ দিয়েছেন নানা ভাষায়, বিচিত্র ভঙ্গিতে। জনশ্রুতি-কিংবদন্তী দিয়ে ঘেরা অস্পষ্ট অতীত থেকে শুরু করে বর্তমানের জীবনধারা ও ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলি তাঁর রচনায় সমন্বিত হয়ে এক মহাকাব্যোচিত সমগ্রতা লাভ করেছে। তিনি এমন একটি মনের অধিকারী, যেখানে তথাকথিত ইন্‌টেলেকচুয়ালদের স্বরচিত বৃত্তপরিক্রমা ও অসুস্থ মনোবিকার অনুপস্থিত। ক্ষণদীপ্ত স্ফুলিঙ্গের দু-একটি চকিত আভাস এখানে শুধু মাত্র উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না, পরন্তু শাল-মহুয়ায় ঘেরা উন্মত্ত অরণ্যপ্রকৃতি, বৃষ্টিহীন দগ্ধ মৃত্তিকার জ্বালাময় অভিশাপ, ময়ূরাক্ষীর গাঢ়পিঙ্গলবর্ণ হড়পা বান,—আদিম জীবনের ভীষণ-রমণীয়তায় পাঠককে বিস্ময়-বিমূঢ় করে।

আধুনিক সভ্যতার আলোকোজ্জ্বল রূপ তাঁকে কৌতূহলী করতে পারে নি, তিনি প্রবেশ করেছেন অদিমজীবনের গভীর মর্মমূলে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বভাবের বিকৃতি ঘটেছে। তাই সভ্য মানুষ আজ আর প্রকৃতির মতো সহজ হতে পারে না, কিন্তু সভ্যতার তথাকথিত আলোক-প্রসাদ থেকে যারা বঞ্চিত, তাদের জীবনের মধ্যে আজও সেই বিশুদ্ধ স্বভাবের রসটি পাওয়া যায়। নিষ্পেষিত ইক্ষুদণ্ডে স্বাভাবিক রস প্রত্যাশা করা যায় না। তারাশঙ্কর যাদের কথা বলেছেন, তাদের জীবন সভ্যতার পেষণযন্ত্রে নিষ্পেষিত হয় নি। বাংলা সাহিত্যের পক্ষেও এ ভূমি কুমারী-মৃত্তিকা। তাই তারাশঙ্করকে

---

৯. 'কল্লোল যুগ' (প্রথম সংস্করণ), পৃঃ ৩১৫।

জটিল জীবনের জটিলতর ভাষ্য রচনা করতে হয় নি, বহু-ফাটলে বিদীর্ণ জীবনের সূক্ষ্ম কণিকাগুলি আহরণ করতেও হয় নি। আধুনিক সভ্যতার প্রথম পদপাতের মুহূর্তেই তিনি শেষবারের মতো গোটা মানুষের পূর্ণ প্রতিকৃতি এঁকেছেন। স্নেহ-প্রেম-ঈর্ষা-হিংস্রতা-বর্বরতা—মানুষের যে কোনো প্রবৃত্তিই এখানে উঁচু সুরে বাঁধা—এবং প্রকৃতিকল্প জৈবজীবনের আদিম প্রবলতায় সে সুর উচ্চকিত। তাই ছোটখাটো বিপর্যয় ও বৈচিত্র্যকে ছাপিয়ে জীবনের সেই আদি ও অকৃত্রিম সুরই প্রবল হয়ে উঠেছে তাঁর রচনায়। তারাশঙ্করের গল্পে ও উপন্যাসে যে সংঘর্ষ ও সংঘাতের কাহিনী আছে, তা যেমন রক্তক্ষয়ী, তেমনি মর্মান্তিক। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় সঙ্কেতে তিনি এই বিরোধগুলিকে আভাসিত করেন না—কারণ এই সংঘাতগুলির প্রকৃতিই স্বতন্ত্র—এ সংঘাত একই আদিমশক্তির দুইটি বিরুদ্ধ রূপের মধ্যে।

মধ্যযুগীয় গ্রামবাংলার বিলীয়মান রশ্মিরেখা তারাশঙ্কর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল বর্ণে এঁকেছেন। প্রাচীন মাটির গন্ধে, প্রাচীন পৃথিবীর জীবনরসে কাহিনীগুলি নূতন এক আস্বাদনের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এইখানেই তারাশঙ্করের দেখার শেষ নয়, নূতনকালের ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন। পুরাতনের ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে নূতনকালের পদধ্বনি তিনি শুনেছেন। ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করেও তারাশঙ্কর এগিয়ে চলেছেন, কারণ তিনি মানুষের অপরাজেয় অভিযানে বিশ্বাসী। এই দুই কালের দ্বন্দ্ব জীবন-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এক বৃহত্তর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। দুই কালের সত্য এক অসামান্য রূপকের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে :

> …আমার সেকাল আর একালের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নাই। চিরকল্যাণের একটি ধারা আমি তার মধ্যে দেখতে পাই। কোনো কালে ওপারে ফুটেছে ফুল—কোনো কালে এপারে ফুটছে ফুল। আমি সকল কালের সকল ফুলের মালা গেঁথেই পরাতে চাই মহাকালের গলায়। ওই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আমার কালের রূপ ভেদ করেই একদা আমাকে দেখা দেবেন। সেদিন আমার মাল্যরচনা সার্থক হবে। [১০]

১০. 'আমার কালের কথা', পৃঃ ২২২।

সমাজের উচ্চকোটির জীবনধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আর একটি জীবনছন্দ আছে। নগর-নির্ভর সাহিত্যে তাদের স্থান নেই। এই লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির বহুবিচিত্র ধারার মধ্যেই মিশে আছে যুগযুগান্তরের অকৃত্রিম ও অশোধিত জীবনরস। নাগরিক-জীবনের কৃত্রিমতা তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। তারাশঙ্করের সাহিত্যের একটি প্রধান আশ্রয়স্থল হচ্ছে রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি। জনশ্রুতি-কিংবদন্তীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সমন্বিত হয়ে এই বিলুপ্তপ্রায় জীবনছন্দটি নবরূপ পেয়েছে। লোকসংস্কৃতির মধ্যে এমন অনেক উপকরণ আছে, যাকে উচ্চকোটির সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে তোলা সম্ভব। বাংলা সাহিত্যে এ বিষয়ে তারাশঙ্করের দাবিই অগ্রগণ্য। তিনি ব্যাপকভাবে বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের লোকচর্যাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন।

তাঁর রচনার একটি বিরাট অংশই তথাকথিত অন্ত্যজ সম্প্রদায় অধিকার করেছে। এদের সঙ্গে হিন্দু সমাজের মূল কাঠামোর কোনো যোগ নেই। এদের আদিম রক্তধারা ও জীবিকার্জনের অদ্ভুত পন্থা, উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য-গীত, পণ্যানারীর জীবনচর্যা, সংস্কার-মুক্ত নীতিজ্ঞানবিবর্জিত প্রাণোচ্ছল জীবনরস তারাশঙ্করের রচনায় অসামান্য শিল্পরূপ পেয়েছে। বৈজ্ঞানিকের তথ্যনিষ্ঠা নিয়ে নয়, জীবন-রসিকের মন দিয়েই তিনি এই জীবনের গহনে প্রবেশ করেছেন।

'যাদুকরী' গল্পে বীরভূমের বাজিকর সম্প্রদায়ের এক তথ্যসমৃদ্ধ ও জীবন-রসোজ্জ্বল ছবি আঁকা হয়েছে। এই বিলুপ্তপ্রায় সম্প্রদায়টির বিচিত্র তথ্য গল্পটির প্রথম দিকে পরিবেশন করা হয়েছে। এদের আচার-আচরণ, বেশভূষা ও বিচিত্র বৃত্তিকে তারাশঙ্কর নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। পরবর্তীকালে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ও 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র ভূমিকা হিসাবেও গল্পটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এই সম্প্রদায়ের বিচিত্র ইতিহাস সম্পর্কে তারাশঙ্কর অনেক অনুসন্ধান করেছেন। তিনি লিখেছেন :

> যাদুকরী যাদের নিয়ে লেখা—তারা আমাদের ও-অঞ্চলের একটি সম্প্রদায়। বিচিত্র সম্প্রদায়। ওদের নিয়ে গল্পটি লেখার পর—এই ধরনের সম্প্রদায় নিয়ে বড় রচনার ইচ্ছা এবং সাহস পেয়েছি।...এই সম্প্রদায়টি আজ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। তাদের জন্য মনে মনে বেদনা অনুভব করি।...ওই যাদুকর-যাদুকরীদের ভালোবাসতাম।...এদের সঙ্গে ঘুরেছি,

এদের গ্রাম আমাদের গ্রামের খুব কাছে—সে গ্রামের কিছু জমিদারী অংশ আমাদের ছিল, সে গ্রামে গিয়েছি, তাদের বাড়ির দাওয়ায় উঠানে বসেছি; ওদের সম্পর্কে প্রবাদকাহিনী ইতিহাস সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছি। জেনেছি। ওদের সম্পর্কে পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন লিখেছেন—ওরা রাঢ়ের সিদ্ধল নগরীর রাজা ভবদেব ভট্টের গুপ্তচর হিসাবে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়াত। সেই কাল থেকেই গুপ্তচরবৃত্তির সুবিধার জন্য পুরুষেরা যাদুবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করত। মেয়েরা ছিল নটীর মত নৃত্যগীত-পটীয়সী, ছলাকলায় পারদর্শিনী। সাহিত্যরত্ন বলেন—ওদের গ্রাম, শীগল গ্রামই সেকালের সিদ্ধল। ওদের কাছে ওদের সিদ্ধ যাদুকর টাকু মণ্ডলের গল্প সংগ্রহ করেছি।[১১]

এই সম্প্রদায় সম্পর্কিত তথ্যপ্রমাণের কোনো অভাব গল্পটিতে নেই, কিন্তু এর জন্য গল্পটি শুধু তথ্যসর্বস্ব হয়ে ওঠে নি। তথ্যকে অতিক্রম করে বাজিকর মেয়েটির লীলায়িত জীবনছন্দ গল্পটির মধ্যে একটি গতি সৃষ্টি করেছে। তথাকথিত সভ্য-সমাজের নীতিনিয়ম ও সংস্কারের বন্ধন সেখানে অনুপস্থিত। কনস্টেবলদের লুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে মেয়েটি অসঙ্কোচে নগ্নদেহে নৃত্য করেছে। প্রবল স্রোতোবেগের মতো তার জীবনের ছন্দ, তাই সেখানে আবর্জনা সঞ্চিত হতে পারে না। তাই, 'এতটুকু সঙ্কোচ নাই, কুণ্ঠা নাই, যৌবন-লীলায়িত অনাবৃত তনুদেহ, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। সকলের কলুষ দৃষ্টি তাহার দিকে নিবদ্ধ থাকিলেও, তাহার দৃষ্টি কাহারও দিকে নিবদ্ধ ছিল না।' জীবনের এই সহজ ও অবিকৃত রূপকে তারাশঙ্কর পর্যবেক্ষণদক্ষ বর্ণনায় শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছেন।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুখুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে পরিবারের বিরোধ কাহিনী। কাহিনীটির রস পারিবারিক। দুই পরিবারের পারিবারিক বিরোধের স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছবি কৌতুক-মাধুর্যে সুন্দর হয়ে উঠেছে। উপকাহিনী হিসাবে বর্ণিত হলেও এই ছোট্ট কাহিনীর একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ রসমূল্য আছে। বিশেষত দুই বাড়ির দুই কর্তার স্বল্পরেখ চরিত্র দুটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। এই পারিবারিক বিরোধকে যাদুকরীই কৌশল-চাতুর্যের দ্বারা বিরোধমুক্ত করেছে। যাদুকরীর তথ্যসমৃদ্ধ জীবনচর্যার সঙ্গে এই রস-মধুর স্বল্পরেখ কাহিনীটি যুক্ত না হলে সার্থক গল্প হত না—হত একখানি পর্যবেক্ষণ-নিপুণ চিত্র মাত্র। তারাশঙ্কর সুকৌশলে তথ্যকে রসমুক্তি দিয়েছেন।

---

১১. 'তারাশঙ্করের প্রিয়গল্পে'র ভূমিকা।

'বেদেনী' গল্পের রসনিবিড়তা ও কাহিনীর ঘনবদ্ধতা বিস্ময়কর। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র রাধিকা বেদেনী। শুধু বিশেষ সম্প্রদায়েরই নয়, এই চরিত্র সৃষ্টি করে তারাশঙ্কর আদিম নারীমনের চিরন্তন অভীপ্সার ইতিহাসকেই রূপ দিয়েছেন। রাধিকা চরিত্রটির আপাত অসঙ্গতির মধ্যে যে সমন্বয়সূত্রটি আছে তা সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বসম্মত। রাধিকা বেদেনীর পূর্বকাহিনীটির সংক্ষিপ্ত অবতারণার ফলে তার আচার-আচরণ ও মানস-পরিবর্তনের একটি কার্যকারণসূত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। রাধিকার স্বামী ছিল শিবপদ বেদে—'শান্তপ্রকৃতির মানুষ, কোমল মুখশ্রী, বড় বড় চোখ।' বেতের কাজ করে তার ভালো উপার্জন হত। তাদের শান্ত-স্নিগ্ধ জীবনের আকাশে একদিন মেঘ ঘনিয়ে উঠল। 'উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধতদৃষ্টি, কঠোর বলিষ্ঠ দেহ' শম্ভু বেদের প্রথম দর্শনেই সে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। তেমনি পাঁচবছর পরে তরুণতর কিষ্টো বেদের তাঁবুতে আগুন দিতে এসে তার পেশীবহুল বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে সে আবার আত্মসমর্পণ করেছে।

রাধিকা বেদেনী কোনো সংস্কারের বন্ধনকে স্বীকার করে নি, সে তার আদিম জৈববৃত্তির আহ্বানকেই অভ্রান্তভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। 'বীরভোগ্যা ধরণী রমণী'—এই সুপরিচিত আপ্তবাক্যটি গল্পটির মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শিবপদ ছিল শান্তশিষ্ট মানুষ, কিন্তু শম্ভু বর্বর পৌরুষের প্রতীক—তাই স্বাভাবিকভাবেই বেদেনী অকুণ্ঠচিত্তে তার কাছে আত্মদান করেছে। তবুও, জোয়ান পুরুষ, ছ-ফুটেরও বেশী লম্বা, তরুণতর কিষ্টো বেদে প্রথম দর্শনেই তার মন আবার হরণ করেছিল। তারাশঙ্কর বেদেনী চরিত্র রচনায় দু-একটি তির্যক রেখা এঁকেছেন, তা না হলে চরিত্রটি তেমন জীবন্ত হয়ে উঠতে পারত না। নূতন বাজীকরের আগমনে শম্ভুর মতো সেও 'হিংসায় ক্রোধে ধারালো ছুরি'র মতোই জ্বলে উঠেছে। মদ্যপান ও প্রগল্ভ রসালাপের মধ্যেও সে নূতন বেদের দিকে বিষধর সাপ ছুঁড়ে দিয়েছে। তারপর নূতন বেদে যখন যথার্থই 'কালিয়দমন' করেছে তখনই বেদেনীর পরাজয় ঘটেছে।

কিষ্টোর তুলনায় নিজেদের দীনতার কথা চিন্তা করে হিংস্রতায় ক্রোধে সে উন্মত্ত হয়েছে। এই দীনতার মূলে যে শম্ভু, একথাও বার বার মনে করে তার উপরেও সে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। নূতন বেদের উপর প্রতিহিংসা-বাসনা যখন শম্ভুর প্রবলতর, সেই সময় সে সুকৌশলে মদের বোতল সরিয়ে তাকে পুলিশ-দারোগার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল। আবার কিষ্টো বেদের তাঁবুতে আগুন ধরাতে গিয়ে এই নৈশ অভিসারিকা তারই বাহুবেষ্টনে ধরা দিল, এবং

শেষ পর্যন্ত আগুন ধরিয়ে দিল শম্ভু বেদের তাঁবুতেই। ঈর্ষা, ঘৃণা, প্রেম—বেদেনী চরিত্রে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে তার তির্যক ও স্বল্পায়ত রেখা কয়টি লেখক অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। দুই বেদের দুইটি বাঘ—চমৎকার দুটি প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আদিম জৈববৃত্তিকে প্রকাশ করতে গিয়ে এই দুটি পশু-প্রতীক গল্পটিকে আরও তীক্ষ্ণ করে তুলেছে :

> রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবল ভাসিয়া উঠিতেছিল উহাদের সবল তরুণ বাঘটির কথা। ইহারই মধ্যে লুকাইয়া বাঘটাকে সে কাঠের ফাঁক দিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। সবল দৃঢ় ক্ষিপ্রতাব্যঞ্জক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চকচকে চিকন লোম ; মুখে হাসির মত ভঙ্গি যেন অহরহই লাগিয়া আছে। আর তাহাদের বাঘটা স্থবির শিথিলদেহ ; অতি কর্কশ, খসখসে লোমগুলো দেখিলে রাধিকার শরীর ঘিন ঘিন করিয়া উঠে। (পৃঃ ৮১)

পশুপ্রতীকের ঋজু আলোকরশ্মি আদিম নারীর ঘৃণা ও আসক্তিকে অসামান্য মহিমায় উদ্ভাসিত করে তুলেছে !

'মেলা' গল্পটি মূলত চিত্রধর্মী। মেলার বৈচিত্র্য ও বিচিত্র মানুষের নানা আচার-আচরণকে এই গল্পে নিপুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 'আনন্দ-বাজার' বা বেশ্যাপটীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যেও লেখকের বাস্তবনিষ্ঠা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-নৈপুণ্য আত্মপ্রকাশ করেছে। তথ্যনিষ্ঠা ও বর্ণনার ঘনবদ্ধ রূপ গল্পটিকে বিচিত্রবর্ণ চিত্রের মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু এই বিচিত্র বর্ণ ও বর্ণনা গল্পটির বহিরাবরণ মাত্র। বহু-কণ্ঠের কোলাহল ও ছন্দোহীন প্রমত্ত জীবনের নিভৃতে যে একটা শান্ত-বিরল করুণ-মাধুর্য আছে, শিল্পী তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে তা এড়ায় নি। পণ্যানারী কমলির জীবনে আজ এক মুহূর্তে বঞ্চনা ও শূন্যতার বেদনা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ছোট্ট মেয়ে মণির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তার অবরুদ্ধ বেদনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। রূপোপজীবিনীর হৃদয়ে মাতৃত্বের এই নিগূঢ়সঞ্চার গল্পটির সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য :

> মণি সহসা কহিল—তুমি বিড়ি খাও কেন মাসী ! মা তো খায় না।
>
> মেয়েটির মুখ যেন কেমন হইয়া গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে মণির পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মারিয়া কহিল—ঘুমোও দেখি দুষ্টু মেয়ে।
>
> মণি কহিল—তুমি শোও।
>
> হাসিয়া কমলি মণিকে বুকে টানিয়া শুইয়া পড়িল।
>
> মণির চোখের পাতা ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল। কমলি অনিমেষ

দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ তাহার চোখ দিয়া কয় ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। (পৃঃ ১৩০-৩৩)

কমলি চরিত্রটি যেন বসন্ত চরিত্রটির পূর্বাভাষ। পণ্যানারী কমলির জীবনে যে অবরুদ্ধ বেদনা কয়েক ফোঁটা চোখের জলে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল, 'কবি' উপন্যাসের বৃহত্তর পটভূমিকায় তা-ই গভীরতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। আদর্শবাদের আতিশয্য ও সুলভ ভাবালুতা তারাশঙ্করকে বিচলিত করে নি, অথচ তিনি কত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে চিরন্তন মানব-সত্যকে আবিষ্কার করেছেন।

৪

তারাশঙ্কর রাঢ়ভূমির শিল্পীভাষ্যকার। এই ভূগোল-ভূমির কোনো অংশই তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি থেকে বাদ পড়ে নি। মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত তিনি এই অঞ্চলের সামাজিক উত্থান-পতনের বিচিত্র ইতিহাস রচনা করেছেন। এই ইতিহাসেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ জমিদার-সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী। একে বাদ দিলে বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস রচনাই সম্পূর্ণ হয় না। কারণ গত দু-তিন শতাব্দী ব্যাপী এই ভূস্বামীগোষ্ঠীই সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিলেন। তাঁদের কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের এক একটি আঞ্চলিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা-ব্যর্থতার কাহিনী গড়ে উঠেছে। পাল-পার্বণ, দোল-দুর্গোৎসব, সঙ্গীত-শিল্পকলা, আশ্রিত-বাৎসল্য, দান-খয়রাত—এই ভূস্বামী সম্প্রদায়েরই পৃষ্ঠপোষকতায় যেমন সম্ভব হয়েছে—তেমনি প্রজাপীড়ন, অর্থ-শোষণ ও নৈতিকাপরাধ তাঁদের ইতিহাসের একটি অংশকে মসীমলিন করে রেখেছে। এর সবটুকুকে নিয়েই এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস। তাই সে যুগের কাহিনী লিখতে বসে ভৌমিক-বাংলার এই কেন্দ্রশক্তিকে অস্বীকার করলে অবাস্তবতারই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। জমিদার-সম্প্রদায়ের ছবি আঁকার মধ্যে অতীতাশ্রয়ী রোমান্স-চিত্রণের অবকাশ আছে সত্য, কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ের ইতিহাসকে অযথা বিকৃত করার মধ্যেও বাস্তববুদ্ধির কোনো পরিচয় নেই।

তারাশঙ্কর রাঢ়ভূমির জমিদারবর্গের অন্তরঙ্গ ইতিহাস বলেছেন। তাঁর রচনায় জমিদার-সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের যুগ যেমন মধ্যাহ্নদীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি তার বিলীয়মান শেষরশ্মির অপরাহ্নিক ম্লানিমা দীর্ঘনিশ্বাসে ভরে উঠেছে। তারাশঙ্করের দিক থেকে এ ছবি সম্পূর্ণ বাস্তব। জমিদারপ্রধান গ্রাম

লাভপুরের তাঁরাও ছিলেন জমিদার। জমিদারদের সমৃদ্ধির শেষ অঙ্কের যেমন তিনি দর্শক, তেমনি ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের সঙ্গে নব-জাগ্রত ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়ের 'বিচিত্র বিরোধে'র আবহাওয়াতেই তাঁর কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। তিনি নিজেই তাঁর দেশ-কালের বিশ্লেষণ করেছেন :

> ১৮৯৮ সালে লাভপুরের সমাজে তখন দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে। জমিদারপ্রধান গ্রাম। নবাবী আমল থেকে সরকার-বংশীয়েরা ছিলেন জমিদার। তাঁরা তখন বহুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের ভাঙনের উপর উঠেছে আরও দুটি বংশ, ঐ সরকারবাবুদেরই দৌহিত্র-বংশ।…ঠিক এই সময়ে—গ্রামের এক দরিদ্রসন্তান ঘর থেকে বেরিয়ে এক বিচিত্র সংঘটনের মধ্যে ইংরেজ কয়লা ব্যবসায়ীর কুঠীতে পাঁচ টাকা মাইনের চাকরিতে ঢুকে শেষ পর্যন্ত কয়লার খনির মালিক হয়ে দেশে আবির্ভূত হলেন। বীরভূমের জমিদারের একটা বৈশিষ্ট্য হল জমিদারীর আয়তন ও আয়ের ক্ষুদ্রতা এবং তাঁদের সংখ্যার বাহুল্য।…এঁদের সঙ্গে আরম্ভ হল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক এই ভাগ্যবান ব্যবসায়ীর বিরোধ।[১২]

'রায়বাড়ি' ও 'জলসাঘর'—গল্পযুগল তারাশঙ্করের শিল্পকীর্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'রায়বাড়ি' গল্পে রাজারামপুরের রায়-পরিবারের গৌরবোজ্জ্বল দিনের ছবি আঁকা হয়েছে। রায়বাড়ির মহিমা-সুগম্ভীর পশ্চাৎপটে রাবণেশ্বর রায়ের ব্যক্তিত্ব ও আচার-আচরণ স্বল্প অথচ বলিষ্ঠরেখায় আঁকা হয়েছে। চারিত্রিক আভিজাত্য, সমুন্নত মহিমা, তেজোদৃপ্ত ব্যক্তিত্ব, আতিথ্যনিষ্ঠা, নির্মম প্রতিহিংসা-পরায়ণতা, বজ্রকঠোর দৃঢ়তা, নিদারুণ শোকের মধ্যেও অবিচলিত ধৈর্য—এই বিচিত্র দোষগুণের সমন্বয়ে রাবণেশ্বরের চরিত্র অসাধারণ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। এবং এই গাম্ভীর্য ও প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের মধ্যে দু-একটি পরিহাস-তরল মন্তব্য মেঘ-স্তম্ভিত আকাশের চকিত বিদ্যুদ্দীপ্তির মতোই মনে হবে। তবে এই দু-একটি মন্তব্যই রায়কে খানিকটা সহজ মানুষে পরিণত করেছে।

শ্যামপুরের প্রজাদের নির্মম বিশ্বাসঘাতকতায় রায় গোটা গ্রামটাকেই পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিলেন। কালী বাগদীর নৈপুণ্যে রায়ের অভিপ্রায় পূর্ণ হল। কিন্তু কিছুকাল পরে রায়বাড়ির উপরে নিয়তির নির্মম অভিশাপ বর্ষিত হল। পুণ্যাহের আগের দিন জলসাঘরে যখন মজলিশ জমে উঠেছে, তখন—সেই পরিপূর্ণ আয়োজনের মধ্যে রায়-গিন্নীর বজরা-ডুবির দুঃসংবাদ এল

---

১২. 'আমার কালের কথা', পৃ ৫-৬।

দৈব দুর্ঘটনার একটি অশুভ ইঙ্গিত রায়-গিন্নীর আশঙ্কা-দুর্বল হৃদয়ে পূর্বেই সঞ্চারিত হয়েছিল। প্রজাদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার পর 'গান্ধারীর অভিশাপে'র কথাও তাঁর মনে হয়েছিল—বিপদের পূর্বাভাস তাঁর স্বপ্নের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে রাবণেশ্বরের চরিত্রে অসঙ্গতি আছে বলে মনে হয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এই অসঙ্গতিই সে যুগের জমিদার-শ্রেণীর চরিত্রকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে। ঔদার্যের সঙ্গে নির্মমতার বিচিত্র মিশ্রণে রাবণেশ্বরের চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

কালী বাগদী ও কবিরাজ রামপ্রাণ গুপ্ত—চরিত্র দুটি লেখকের শক্তির পরিচয় দেয়। কালী বাগদীর নিঃশব্দ পদসঞ্চার, নীরব আজ্ঞানুবর্তিতা, অব্যর্থ কর্মদক্ষতা, ভীতি-বিহ্বল পটভূমিকায় এক রোমাঞ্চিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। ভগ্নদূতের মতো সে যখন দুঃসংবাদটি নিয়ে এল, তখন 'মুহূর্তে রাক্ষসের মত সে আর্তনাদ পুঞ্জীভূত সঙ্গীত-ঝঙ্কারকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ঘরসুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিল, অতর্কিতে চকিত যন্ত্রীর যন্ত্রের তার ছিঁড়িয়া গেল।' কালী বাগদীর রহস্য-নিবিড় ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোথায় যেন একটি অজ্ঞাত অশুভ ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল। কবিরাজ রামপ্রাণ গুপ্তের রসিকতা গল্পটির স্তম্ভিত পরিবেশের মধ্যে খানিকটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে।

'জলসাঘর' এই রায়বংশেরই সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভর রায়ের কাহিনী। বিশ্বম্ভর রায় ক্ষয়িষ্ণু রায়বংশের শেষ প্রতিনিধি। প্রথম গল্পটিতে এই বংশের ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের যেমন গৌরবোজ্জ্বল মধ্যাহ্নদীপ্তি উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি দ্বিতীয় গল্পটিতে পতনোন্মুখ রায়বংশের সায়াহ্ন-ম্লানিমা এক করুণ মাধুর্যের সৃষ্টি করেছে। ক্ষয়িষ্ণুতা ও শ্রীহীনতার কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ এই অসামান্য কাহিনীর পটভূমিকা রচনা করেছে। গল্পটির প্রারম্ভ অতীতস্মৃতি রোমন্থনের দীর্ঘশ্বাস দিয়ে রচিত হয়েছে। বর্তমানের শ্রীহীনতা ও দারিদ্র্যের জীর্ণ ছবির পাশে অতীত-গৌরবের স্মৃতি বিশ্বম্ভর রায়ের চিত্ত আলোড়িত করে। অভিমান-ক্ষুব্ধ আভিজাত্য ও বেদনাহত আত্মমর্যাদাজ্ঞান তাঁর চরিত্রে বিশালতা এনে দিয়েছে। শ্রীভ্রষ্ট বিশ্বম্ভর রায় নিজের গৃহকোণেই তাই আত্মগোপন করেছেন। শুধু তুফানের উচ্চ হ্রেষারব ও ছোটগিন্নীর গর্জন মাঝে মাঝে তাঁকে অতীত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই মূক প্রাণী দুটির ভূমিকা গল্পটির রসকেন্দ্রকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে।

নূতন ধনী গাঙ্গুলীবাবুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে এক বসন্তবিহ্বল জ্যোৎস্নামত্ত রাত্রিতে সুরা ও বাইজীর যৌবনমদিরার মোহে কিছুকালের জন্য

যেন অতীতবৈভব ও বিগতযৌবনকে ফিরে পেয়েছিলেন বিশ্বম্ভর। কিন্তু দিনের আলোয় সে বিভ্রমময় মায়াস্বপ্ন শূন্যে মিলিয়ে যায়, নির্বাপিতপ্রায় ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় প্রাচীরবিলম্বী পূর্বপুরুষদের মুখে মত্ত হাসি ফুটে ওঠে—'সহসা মনে হইল, দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন—মোহ! কেবল তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহ এই ঘরে জমিয়া আছে।' সাত পুরুষের মোহমত্ততা যে অভিশপ্ত আবহাওয়া'র সৃষ্টি করেছিল, তারই নিগূঢ় সঙ্কেত উপলব্ধি করেন বিশ্বম্ভর। বাতি নিবিয়ে দিয়ে জলসাঘর বন্ধ করার হুকুম দেন, আর 'হাতের চাবুকটা শুধু সশব্দে আসিয়া জলসাঘরের দরজায় আছড়াইয়া' পড়ে। শেষবারের মতো যেন অতীতের উদ্যত শাসনদণ্ড নিরুপায় বেদনায় অদৃষ্টের পাষাণ-শিলায় মাথা কুটে মরেছে।

ক্ষয়িষ্ণু অতীতের বেদনাকে তারাশঙ্কর তাঁর হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। নূতনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পুরাতনের অন্তর্বেদনা ও ট্রাজিক রসকে যেমন তিনি নিপুণ নিষ্ঠায় রূপ দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি নূতনের স্পর্ধিত পদক্ষেপ ও অব্যাহত জয়যাত্রাকেও অবিকম্পিত রেখায় দ্বিধাহীন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। রায়বংশের জীর্ণপ্রাসাদের উপর যেমন নৈশনীরবতা এক মৃত্যুবিবর্ণ ছায়া বিস্তার করেছিল, তেমনি তার পাশে 'এ অঞ্চলের হালে-বড়লোক গাঙুলীবাবুদের প্রাসাদশিখরে বহুশক্তিবিশিষ্ট একটি বিজলী-বাতি অবিকম্পিত ভাবে জ্বলিতেছিল'। তারাশঙ্কর পুরাতনের অন্তর্জীর্ণতা ও তার মহিমা-সুগম্ভীর আভিজাত্যের মধ্যে যেমন এক মর্মান্তিক ট্রাজিক চেতনাকে রূপ দিয়েছেন, তেমনি নূতনের সম্ভাবনাদীপ্ত আবির্ভাবকেও তাঁর রচনায় অনিবার্য করে তুলেছেন। জগৎ-বিধান তথা সমাজ-বিধানের এই সত্যকে নির্মম-নৈপুণ্যে রূপ দিয়েছেন তারাশঙ্কর। তাঁর উপন্যাসের বিস্তৃতক্ষেত্রে এই সত্যটি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের পটোত্তলিত হয়েছে গ্রামবাংলার ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের উপর—যেখানে কিংবদন্তী ও সংস্কারের মধ্যযুগীয় আবছা অন্ধকারের ঘোর তখনও কাটে নি, এবং উপন্যাসটি শেষ হয়েছে আধুনিক কলকাতার নাগরিক পটভূমিতে এসে—যেখানে দেশপ্রেম ও অভিনব জীবনচেতনার শপথ উচ্চারিত হয়েছে। 'কালিন্দী'তে ইন্দ্র রায়ের হাত থেকে শাসনদণ্ড স্খলিত হয়ে নববলদৃপ্ত শিল্পপতি মিঃ মুখার্জির শক্তি-বৃদ্ধি করেছে। 'পঞ্চগ্রামে'র প্রবীণ ন্যায়রত্ন নবীনের সঙ্গে সংগ্রামে পর্যুদস্ত হয়ে দেশত্যাগ করেছেন—এবং ন্যায়রত্ন-পৌত্র বিশ্বনাথ উপবীত বর্জন করে সাম্যবাদের মন্ত্র-উচ্চারণ করেছে।

পুরাতনকে জীর্ণ ও গতিশক্তিহীন ভেবে তারাশঙ্কর তার উপর নির্মম হতে

পারেন নি। ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব তাঁর শিল্পীসত্তার সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়িত। গ্রামীণ সংস্কৃতি ও পল্লীসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এত নিবিড় যে তাকে খুব সচেতনভাবে তিনি যেখানেই অতিক্রম করতে চেয়েছেন, সেখানেই নানা বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে। যুগ-জীবনের রূপান্তর লীলাকে তিনি ব্যাখ্যাই করেছেন, বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু পুরাতনের পতনের মধ্যে যে মহিমা সুগোপন আছে, তার প্রতি তাঁর বেদনাময় সশ্রদ্ধ মনোভাবই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর একটি স্বীকৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

> এমনি দ্বন্দ্বের সমারোহে সমৃদ্ধ লাভপুরের মৃত্তিকায় আমি জন্মেছি। সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।[১৩]

নূতনের কাছে পুরাতনের পরাজয় ঘটেছে, জমিদারদের স্থান অধিকার করেছেন মিল-মালিকেরা, চাষীরা পরিণত হয়েছে শ্রমজীবীতে। আর একটি প্রসঙ্গও এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্কর শুধু যে অতীতের মোহাবেশ সৃষ্টি করেছেন, তাই নয় ; তিনি অতীতের বহুজীর্ণ আভিজাত্যলেশহীন 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার'দের করুণ অথচ হাস্যকর ছবিও এঁকেছেন। সবটা মিলিয়েই যে তারাশঙ্করের অতীত, একথাও মনে রাখতে হবে।

শিল্পবিচারে 'জলসাঘর', 'রায়বাড়ি' থেকে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। অতীত রোমান্সের বিলীয়মান ঐশ্বর্য-বর্ণনাতেই শুধু নয়, নাটকীয় ও ট্রাজিক মহিমা-বর্ণনায় কাহিনীটি তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পের অন্তর্ভুক্ত। চাবুকের শব্দে গল্পটির চকিত উপসংহার যেন নিষ্ফল আক্রোশে একটি যুগেরই সমাপ্তি ঘোষণা করেছে।

---

১৩. 'আমার কালের কথা', পৃ ১২।

প্রচলিত ধারণা এই যে তারাশঙ্কর প্রেমচিত্র অঙ্কনে দুর্বল—এই বিশেষক্ষেত্রে তিনি তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। বুদ্ধদেব বসু তারাশঙ্করের রচনায় 'আদিরসে'র অভাব দেখে মন্তব্য করেছিলেন :

> Another respect I find Tarashankar lacking in is what our Sanskrit aestheticians called the *adirasa* or the primary feeling (though 'feeling' is not quite the word, *rasa* being untranslatable) : I mean the mutual attraction of the two sexes, capable of infinite forms, but invariable in substance ; the subject, totally or partly of so large, so overwhelmingly large a body of the world's literature.[১৪]

উদ্ধৃত অভিমতটির মৌলিকতা অবশ্য স্বীকার্য। এই নেতিবাচক মন্তব্যটি তারাশঙ্করের মানস-বিশ্লেষণে সাহায্য করবে। তাঁর রচনায় প্রেমচিত্রণ নিতান্ত বিশেষত্বহীন ও স্বভাব-শীতল, এ ধরনের অভিযোগও কেউ কেউ করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য যথার্থ কিনা এবং যথার্থ হলে এই জাতীয় অভিমত তারাশঙ্করের শিল্পীপ্রকৃতির কি পরিচয় দেয়, তা বিশেষভাবে বিবেচ্য। তারাশঙ্করের গল্প ও উপন্যাসে প্রেমের বিচিত্রলীলা, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের আলোছায়া, ব্যতিক্রমগুলির তীব্রতীক্ষ্ণ দ্যোতনা প্রাধান্য বিস্তার করে নি। সমকালীন লেখকদের সঙ্গে এইখানে তাঁর বড় পার্থক্য সন্দেহ নেই। আদিম-বৃত্তির অন্ধলীলা অঙ্কনে তিনি দক্ষশিল্পী, কিন্তু প্রেম যেখানে বিচিত্রলীলায় ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটায় বিলসিত, সেখানে তাঁর দৃষ্টি কদাচিৎই আকৃষ্ট হয়েছে।

এর মধ্যে আবার দাম্পত্য প্রেমের চিত্র সবচেয়ে অনুজ্জ্বল। তারাশঙ্কর এই আদিমবৃত্তিটির প্রাথমিক (Elemental) রূপকে তীব্র জ্বালাময় বিদ্যুৎরেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন, কিন্তু তার পরবর্তী স্তরগুলির বিচিত্র বিচিত্র বিকাশ তাঁর রচনায় স্থান পায় নি। তারাশঙ্কর প্রেমের আদিমতম রূপটিকে বলিষ্ঠ রেখায় এঁকেছেন। অন্ধ বাৎসল্য, হিংস্র প্রতিহিংসা স্পৃহা, নির্মম ক্রূরতা, নির্লজ্জ লালসা, অসংযত জৈবক্ষুধা—এখানে অকপট ও সহজভাবেই প্রকটিত। জীবনের সমগ্রবিশাল স্থাপত্যমহিমাই তাঁর রচনায় উদ্ভাসিত হয়েছে, স্বতন্ত্রভাবে তিনি

১৪. 'An Acre of Green Grass', p. 84.

কোনো সূক্ষ্ম কারুকার্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন নি। তারাশঙ্করের মনোজীবনে এই বৈশিষ্ট্যই তাঁকে তথাকথিত প্রেমবৈচিত্র্য চিত্রণে বিমুখী করেছে।

তবু একথা স্বীকার করা সম্ভব নয় যে, তারাশঙ্কর প্রেমের গল্প লিখতে পারেন নি। তাঁর অনেকগুলি গল্প এর স্বপক্ষে প্রমাণ দেয়। বর্তমান সঙ্কলনের 'রসকলি', 'ঘাসের ফুল', 'প্রত্যাবর্তন' প্রভৃতি গল্পে তারাশঙ্করের প্রেমচেতনার বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করেছে। 'রসকলি' তারাশঙ্করের প্রথম গল্প এবং প্রথম প্রেমের গল্পও বটে। প্রথম পদক্ষেপেই তিনি এক নিগূঢ় রসলোকের সংবাদ দিলেন। গোটা গল্পটি মঞ্জরীর বিচিত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করে দানা বেঁধে উঠেছে। মঞ্জরী পুলিনের বাল্যসখী। খুড়ো রামদাসের প্রথমে এ বিবাহে আপত্তি ছিল—পুলিনের আগ্রহাতিশয্য দেখে শেষে বৃদ্ধ মহান্ত এ বিবাহে রাজীও হয়েছিল। কিন্তু প্রণয়ীযুগলের প্রেমসম্পর্কটি বিবাহের মন্ত্রে বাঁধা পড়ার আগেই গোপিনীর আবির্ভাব হল। মঞ্জরী-পুলিনের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বহু কটূকটাক্ষ বর্ষিত হয়েছিল। গোপিনীর ঈর্ষাতিক্ত বক্রোক্তি, মৃত্যুকালে মহান্তর অশালীন ইঙ্গিত, গ্রামের লোকদের কানাকানি—কিছুই মঞ্জরীকে বিচলিত করতে পারে নি।—গোপিনীর সর্বনাশ-সাধনের সমস্ত উপরকণই তার হাতে ছিল। কিন্তু সে কখনোই সে পথে পা বাড়ায় নি।

অচরিতার্থ প্রেমের অশ্রুঘন বেদনাকে মঞ্জরী এক অপরূপ রসসত্তায় পরিণত করেছে। তার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, পরিহাস-রসিকতা, গোপিনীর সঙ্গে সহজ-সম্পর্ক, পুলিনের প্রতি নীরব ভালোবাসা প্রভৃতির মধ্যে এমন একটি সহজ স্বাভাবিক প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তা বিস্ময়কর। মঞ্জরী এমন এক রসধারা যা কলঙ্কের স্পর্শেও নিষ্কলুষ, বেদনায় যার বিকৃতি নেই, আনন্দেও যার সহজ চলার ছন্দ অভিভূত হয় না :

> চলিতে তাহার দেহে হিল্লোল খেলিয়া যায়, কথা বলিতে হাসি উপছিয়া পড়ে। হাসিতে নিটোল গালে টোল পড়ে, সে গ্রীবাটি ঈষৎ বাঁকাইয়া দাঁড়ায়। নাকে রসকলি কাটে, চুড়া বাঁধিয়া চুল বাঁধে, কথার ধরনটাও তাহার কেমন বাঁকা। লোকে কত কি বলে, কিন্তু তাহাতে তাহার আসে যায় না। নদীর বুকে লোহার চিরেও দাগ আঁকে না, স্রোতও বন্ধ হয় না। (পৃঃ ৪)

মঞ্জরীর এই ব্যক্তিত্ব গল্পবিবৃতির ভাঁজে ভাঁজে উন্মোচিত হয়েছে। চরিত্রটি সহজ ও স্বচ্ছন্দ, কিন্তু লঘু নয়। অচরিতার্থ প্রেম তার হৃদয়ের গভীর অন্তঃপুরে মধুচক্র রচনা করেছে; তার আভাস-ইঙ্গিতে যে বেদনা-সুন্দর লঘু বাতাবরণের

সৃষ্টি করেছে,—গল্পটির যথার্থ শিল্পরূপ সেইখানেই নিহিত। পুলিন যেদিন মঞ্জরীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল, মঞ্জরীর সেদিনকার অবরুদ্ধ বেদনা লেখক কত সংযত-ভাবে রূপ দিয়েছেন। পুলিনের দাম্পত্য-সঙ্কটের সে-ই সমাধান করে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করেছে। মঞ্জরী যে রসের সাধিকা, সে রস বেদনাকে সুন্দর করতে জানে। বৈষ্ণবের প্রেমসাধনা তার চরিত্রে যেন রূপপরিগ্রহ করেছে। মঞ্জরীর কণ্ঠে—

লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী,
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী।

সঙ্গীতটিই এই গল্পের যথার্থ ভাবরূপ।

'ঘাসের ফুল' একটি সার্থক নামা গল্প। কলিয়ারির একটি তুচ্ছ কাহিনী—ঘাসের ফুল—কত পথিকই না তাকে পদদলিত করে! কলিয়ারির লেবার-রেজিষ্ট্রার বিনোদ স্বরূপ তরুণ ও সুকণ্ঠ গায়ক। কুলীমেয়ে চুড়কী তার গান শুনতে ভালোবাসে। তার আব্দার, বিনোদকে গান শোনাতে হবে, তার বদলে সে একটি করে জবাফুল দেবে। এমনি করেই কুলীদের এই মেয়েটির সঙ্গে বিনোদের একটি সহজ-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মেয়েটি তার মাঝিকে গোপন করে তার গান শুনতে চায়ঃ 'একটি গান তু কেনে বলবি না বাবু? সোবাই তুর গান শুনে-ছে। আমাকে আমার মাঝি শুনতে দেয় না। বলে কি জানিস—বলে তু বাবুকে ভালো-বেসে ফেলবি।'

এর পরেই এল কাহিনীর চূড়ান্ত মুহূর্ত। অতুলের নেতৃত্বে খাদ বাঁচানোর আয়োজন চলেছে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন খাদের মধ্যে চুড়কীর প্রগল্‌ভতায় বিনোদ তার মুখে জুতো ঘষে দিল। অভিমানাহত চুড়কী কান্নায় ভেঙে পড়ে—সেখান থেকে তার নড়ার ইচ্ছাও ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। সেই অবকাশে চিরদিনের জন্য পনের নম্বর গ্যালারির মুখ বন্ধ হল। বিনোদের শেষ প্রতিবাদের উত্তরে একঘণ্টার জন্য কলিয়ারি ছেড়ে যাওয়ার কঠিন নির্দেশ এল। যন্ত্রের নির্মম পেষণে এইভাবে প্রকৃতির মতো সহজ 'ঘাসের ফুল' চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হল। ছোটগল্পের সংযম ও সংক্ষিপ্ততা এখানেও লক্ষ্যণীয়। এখানে প্রেমের কোনো পূর্ণায়ত ছবি আঁকা হয় নি—দু-একটি সংক্ষিপ্ত রেখায় আভাস দেওয়া হয়েছে মাত্র। যান্ত্রিক জীবনের নির্মম আবর্তনের বৈপরীত্যে এই ছোট্ট বেদনার্দ্র কাহিনীটি ঘাসের ফুলের মতোই রক্তরেখায় জেগে থাকে।

'প্রত্যাবর্তন' গল্পটির মধ্যেও একটি মৃদু সৌকুমার্য আছে। 'ঘাসের ফুলে'র মতো এখানেও তেমন কোনো জোরালো নাটকীয় ঘটনা নেই—কিন্তু গল্পটি

ঘিরে একটি দৈববিড়ম্বিতা নারীর ব্যর্থজীবন করুণ-লাবণ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সৎবাপের তাড়নায় জেলেদের ছেলে পশুপতি পুরীর পাণ্ডাদের দলে ভিড়ে যায়। তারপর নানা ঘটনা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সে জাহাজের খালাসীর কাজ নিয়ে নানাদেশ ঘুরে এসেছে। দেশে ফিরে এসে সে জেলেপাড়ায় মদ-মাংসের ভোজ দিয়েছে। ভোজের আসরে বিদেশের 'জোড়া মিলকে নাচে'র কথা তার মনে পড়েছে। নবীন জেলের যুবতী মেয়ে রমাদাসীকে সে নৃত্যসঙ্গিনী হিসেবে নির্বাচন করেছে। কিন্তু মেয়েটির অদৃষ্ট ভালো না—এই বয়সেই সে তিনবার বিধবা হয়েছে। পশুপতির মা তাই এই বিয়েতে আপত্তি করেছে।

পশুপতি উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম—সে কোনো নীতি-নিয়মের শাসন মানে না। বিয়ে তার ঠিক হল। পাড়ার প্রান্তে ঘরও তৈরি হল। জিনিসপত্র কিনতে পশুপতি চলে গেল কলকাতায়। যাওয়ার সময় রমা মা-চণ্ডীর কবচ তার হাতে বেঁধে দিয়ে বলেছিল : 'আমার কপাল যাই হোক, মা তো মিথ্যে লয়, রণে বনে অরুণ্যে মা তোমায় রক্ষা করবেন।' কিন্তু পশুপতির আর ফেরা হয় নি, কিছুদিন পরে তার সেই নূতন ঘরে রমা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। জার্মান সাবমেরিনের গুপ্ত আক্রমণে একটি জাহাজ ধ্বংস হয়—পশুপতিই একমাত্র রক্ষা পেয়েছিল। রমার কবচই যে তাকে রক্ষা করেছে, পশুপতি একথা দৃঢ়-ভাবেই বিশ্বাস করেছিল।

রমা-পশুপতির সম্পর্কটি বিচিত্র। দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির নরনারীর এই প্রেম-সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত দৈবাহত হয়েছে। পশুপতি উচ্ছৃঙ্খল, ভবঘুরে ও বেপরোয়া। রমার সান্নিধ্যে এসে ক্ষণিকের জন্য তার নীড় রচনার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল মাত্র। কিন্তু তার বন্ধনহীন উদ্দাম জীবনে দেশ-বিদেশের বিদেশিনীদের আকর্ষণ তার সমস্ত সঙ্কল্প ভুলিয়ে দিয়েছিল। কাহিনীর মধ্যে রমার ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। ভাগ্যবিড়ম্বিতা মেয়েটি হয়ত তার অতীত দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করেই পশুপতির হাতে কবচ বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই হতভাগ্য মেয়েটি পশুপতির নূতন ঘরেই আত্মহত্যা করেছে। এই শান্তস্নিগ্ধ মেয়েটির কোনো দীর্ঘ ইতিহাস রচনা করা হয় নি—সহৃদয় পাঠকচিত্ত যাতে কল্পনা ও অনুমানের সাহায্যে সেই অপরিমেয় বেদনাকে পূর্ণতর করে তুলতে পারে, লেখক সে অবকাশ দিয়েছেন। চমৎকার একটি উপমার সাহায্যে এই মেয়েটির চরিত্র-রূপকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—'কাঁচ ঘেরা লণ্ঠনের ভিতরের শিখার মত স্থির, ধীর।' একটি সাধারণ মেয়ের নীরব-প্রেম গল্পটির মধ্যে এক বেদনাঘন সূক্ষ্ম সুরভি সঞ্চারিত করেছে।

'নারী' গল্পটি মনস্তত্ত্বমূলক। বিচিত্ররূপিণী নির্মলার জটিল চরিত্র অঙ্কনে লেখক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তারাশঙ্করের গল্পে ও উপন্যাসে নারী-মনস্তত্ত্বের এমন জটিল চরিত্র যথার্থই দুর্লভ। তাঁর চরিত্রগুলি সাধারণত সরল, সহজ ও বলিষ্ঠ। কিন্তু রহস্যময়ী নির্মলা চরিত্র রচনায় তিনি স্বতন্ত্র শিল্পপদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। বিধবা নির্মলা রমেনের রুগ্না মাকে সাহায্য করতে এসে রমেনের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িত হয়ে সন্তানসম্ভবা হয়। রমেন তাকে বস্তির একটি ঘরে রেখে যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়েছিল। এই উপলক্ষেই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরিচয়। দীর্ঘকাল পরে ডাক্তারের কাছে যখন সে আবার এল, তখন সে বেশ্যা—রক্তে তার উপদংশের বিষ। যে ধনবান ব্যক্তির সে রক্ষিতা, তার অর্থানুকুল্যেই নির্মলা ক্ষয়রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পায়। কিন্তু তার খেয়াল-খুশি মেটাতে গিয়ে নির্মলাও মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়। কয়েক লক্ষ টাকা প্রবঞ্চনার অভিযোগে কণ্ট্রাক্টার ভদ্রলোকটির জেল হয়। এই অবকাশে নির্মলা হাসপাতালের নার্স হল। কিছুকাল পরে বিষ খেয়ে সে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর আগে ডাক্তারের কাছে সে যা লিখেছিল, তা থেকেই তার মানসিক জগতের কিছু আভাস পাওয়া যায়।

নির্মলার জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটেছে। প্রথম দর্শনের দিনে এই শান্তস্তব্ধ ধৈর্যময়ী মেয়েটিকে ডাক্তারের ভালো লেগেছিল। তার সঙ্গে তিনি নৈশ নদীর নিথর রূপের মিল দেখতে পেয়েছিলেন :

> নদীর যে নিজস্ব তরঙ্গক্ষুব্ধ গতিশীল রূপ, দিন রাত্রির মধ্যে তার অবস্থান্তর কি রূপান্তর ঘটে না, কিন্তু মানুষের চোখে রাত্রির অস্পষ্টতার মধ্যে তার রূপের পরিবর্তন ঘটে, তখন নদীর তরঙ্গক্ষুব্ধ গতি চোখে দেখা যায় না। মনে হয় শান্ত শুভ্র সুদীর্ঘ জলধারা নিথর হয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। মধ্যে মধ্যে মৃদু আলোড়নে আবর্ত উঠে এখানে ওখানে সেখানে এক-একটা। (পৃ ৪৩৪)

এই অসামান্য প্রতীকের মধ্য দিয়ে মেয়েটির ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ও অন্তঃপ্রকৃতির স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। 'রাত্রির অস্পষ্টতা' ও 'নদীর তরঙ্গক্ষুব্ধ গতি'—এই দুটি বাক্যাংশ নির্মলার চরিত্ররূপকে ফুটিয়ে তুলেছে। নির্মলার জীবনের দ্বিতীয় পর্বে সে অসঙ্কোচে ডাক্তারবাবুকে জানায় যে, সে বেশ্যা, এবং মদ্যপানে সে অভ্যস্ত। তৃতীয় পর্বে এই রহস্যময়ী নার্স হয়। সেখানে তরুণ ডাক্তারদের গুঞ্জন তিক্তবোধ হওয়ায়—সে মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খায়। আপাতদৃষ্টিতে নির্মলার জীবনের এই তিনটি পর্বের কোনো মিল নেই। কিন্তু একটি নিগূঢ়

মনস্তাত্ত্বিক সূত্র এই তিনটি পর্বকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। নির্মলাই তার মৃত্যুকালীন চিঠিতে এর সঙ্কেত দিয়েছে—'বেঁচে কি লাভ? ভালো লাগছে না। কি চেয়েছিলাম বুঝতে পারলাম না। বোধ হয়, ডাক্তারবাবু, মানুষ তা বুঝতে পারে না। হঠাৎ পেয়ে যায়। পেলে বুঝতে পারে কি চেয়েছিল।'

নির্মলার দোলাচলবৃত্তি কোনো একটি বিশেষ আশ্রয়ে তাকে দীর্ঘদিন থাকতে দেয় নি। তার অর্থ এ নয় যে, মেয়েটি স্বভাবেই বহুবল্লভ। বরং তার চরিত্র থেকে উল্টোটাই প্রমাণিত হয়েছে। তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রধর্ম একটি মৌলিক এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আসলে সে বৈচিত্র্যবিলাসিনী নয়, প্রেম-সন্ধানী। প্রেমই তার প্রার্থিত বস্তু। বহুপুরুষকে আশ্রয় করেও সে প্রেম পায় নি। কখনো কখনো ভালো লাগলেও, ভালোবাসতে সে কাউকেই পারে নি। মানবজীবনের সবচেয়ে বড় সত্যই মৃত্যুর আগে সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না'—রবীন্দ্রোপলব্ধির এই চরম সত্যই নির্মলা চরিত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। কাম্যবস্তু অনুসন্ধানে মেলে না, হঠাৎ পাওয়া যায়। গল্পের শেষে ডাক্তারবাবুর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নির্মলার প্রশ্নের একটি সম্ভাব্য উত্তর খুঁজে পেয়েছে। ভক্তি থেকে প্রেম—নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু নির্মলার জিজ্ঞাসা চিরকালের একটি জটিল প্রশ্ন। মনোবিজ্ঞানী এর যথার্থ সদুত্তর দিতে পেরেছেন। নির্মলা সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে দেহকে বিক্রয় করেও তার মনের উৎকণ্ঠা দূর হয় নি—সেখানে কোনো মালিন্য ছিল না, ছিল প্রেমনিয়তির একটি অগ্নিজ্বালাময় প্রশ্ন। দেহ-মনের এই দ্বন্দ্ব, এই দুঃসমাধেয় প্রশ্ন, পূর্ণতর পটভূমিকায় ও বলিষ্ঠতর প্রতিশ্রুতিতে আর একবার রূপ পেয়েছে 'সপ্তপদী'র রীনা ব্রাউন চরিত্রে। মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় সঙ্কেতে ও প্রেমরহস্যের জটিল জিজ্ঞাসায় 'নারী' গল্পটি তারাশঙ্করের এক বিশিষ্ট সৃষ্টি।

তারাশঙ্কর এক সময় লিখেছিলেন: '...আমি জানি এবং পাঠকেরাও জানেন—প্রেমের গল্প আমার বেশী নেই, প্রেমের গল্পে আমি কিছু আড়ষ্ট।'[১৫] তারাশঙ্কর প্রেমের গল্প বেশী লেখেন নি, একথা সত্য, কিন্তু প্রেমের গল্প রচনায় তিনি 'আড়ষ্ট', একথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। তাহলে প্রেমের গল্পের সংজ্ঞাকেও নূতন করে ভেবে দেখতে হয়। প্রেমের গল্পকে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে দেখলে তারাশঙ্করের এই অভিমতটিকে সত্য বলে মনে হতে পারে। একথা

১৫. 'স্ব-নির্বাচিত গল্প', গোড়ার কথা।

সত্য যে, তাঁর গল্পে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের বিরহ-মিলন নেই, ট্রামে-বাসে কলেজে-কর্মক্ষেত্রে তরুণ-তরুণীর চটুল প্রেমাভিনয় অনুপস্থিত, উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজের ড্রইংরুমে নিম্নকণ্ঠ আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে হৃদয়-বিনিময়ের পালাও এখানে চলে না, দাম্পত্য-জীবনের রঙীন রোমান্স-চিত্রণের দিকেও তাঁর আগ্রহ নেই। তারাশঙ্করের প্রেমচেতনার স্বরূপই স্বতন্ত্র। প্রেমের স্বরূপটিকে তিনি গভীর ভাবেই অনুধাবন করেছেন। তরল ও চটুল প্রেমাভিনয়ের চিত্র চিত্রণে তাঁর কোনোই আগ্রহ নেই।

তারাশঙ্করের প্রেমের গল্প সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া চলে। প্রথমত, তিনি তথাকথিত 'বিশুদ্ধ প্রেমে'র গল্প লেখেন নি। কেননা তাঁর রচনায় প্রেমানুভূতি একাধিক ভাবানুষঙ্গে বিচিত্রিত হয়েছে। কখনো তা জৈববৃত্তির সঙ্গে মিশেছে, কখনো বা কোনো বৃহত্তর আইডিয়ার সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে, আবার কদাচিৎ মনস্তাত্ত্বিক রহস্যে জটিল হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, তারাশঙ্করের প্রেমের গল্পে তারুণ্যের রসোচ্ছলতার চেয়ে প্রৌঢ়ত্বের ভাবস্থির অনুভবই প্রাধান্য লাভ করেছে। তৃতীয়ত, তাঁর প্রেমের গল্পের পরিণতি মিলনান্তক হয় না—সুলভ রোমান্সের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহই নেই। প্রেমনিয়তির বিয়োগান্তক পরিণতি তাঁকে জীবনরহস্য চিত্রণের নূতন সুযোগ দিয়েছে। তিনি প্রেমচেতনাকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবতে পারেন না। প্রেমের কথা ভাবতে গেলেই তাই তাঁর গোটা জীবনের কথাই মনে পড়ে। তারাশঙ্করের প্রেমানুভূতির ধরনটাই আলাদা, এটা তাঁর আড়ষ্টতা নয়—তাঁর শিল্পী-প্রকৃতিরই এই বৈশিষ্ট্য। প্রেমচিত্রণে 'আড়ষ্ট' হলে 'কবি' বা 'সপ্তপদী' রচনা তাঁর পক্ষে কখনো সম্ভব হত না।

তারাশঙ্করের অনেকগুলি গল্পে আদিম জৈবজীবন ও পশুকল্প মানুষের যে কাহিনী আছে, তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অসাধারণ। মানবসভ্যতার অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করে তিনি সেই জৈবানুভূতি-সর্বস্ব জীব-জীবনের গহনে প্রবেশ করেছেন। কয়েকটি গল্পে পশুকল্প মানুষের পাশে সত্যিকারের পশুকেও দাঁড় করানো হয়েছে, তাদের সগোত্রীয়তা দেখানোর জন্য। পশুর চেয়েও পশুকল্প মানুষ বীভৎস। তারাশঙ্কর পশুকল্প মানুষ চিত্রণে প্রবৃত্তির আদিম প্রবলতাকেই এক বিশাল ও মহিমান্বিত রূপ দিয়েছেন। এই প্রবৃত্তির সমুদ্ধত তরঙ্গশীর্ষে কখনো ঈর্ষার অসহ্য নীলাভ রূপ, কখনো বা লালসার পিচ্ছিল ফেনপুঞ্জ, কখনো বা স্নেহের করুণলাবণ্য, আবার কখনো বা সৌন্দর্যতৃষ্ণার পদ্মরাগদীপ্তি উদ্ভাসিত হয়। //তারাশঙ্করের আদিম জীবন-চিত্রণের একটি বিশেষ ফিলোজফি আছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই বাংলা সাহিত্যের স্তবপরিবর্তন ও পটপরিবর্তন দুই-ই ঘটেছে। সভ্যতার কৃত্রিম আচ্ছাদনের আড়ালে মানুষ যে আসলে পশু, এই বিষয়টি নবযুগের সাহিত্যে স্পষ্টভাবে ঘোষিত হল। তারাশঙ্করের বক্তব্য ঠিক তা নয়। আদিম-জীবনের একটি নিজস্ব রূপ আছে—যেখানে সে কারও বিকৃতি নয়, বিকল্প নয়। তারাশঙ্কর সেই আদিমকেই দেখেছেন, যা সমগ্র জীবনরসের গঙ্গোত্রী।

'নারী ও নাগিনী' গল্পটির মধ্যে জৈব আসক্তির এক অসামান্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। সাপের ওঝা খোঁড়া শেখের জৈব আসক্তি বিস্ময়কর। তার জীবনের একদিকে স্ত্রী জোবেদা, অন্যদিকে এক সর্পিনী। পশুকল্প মানুষটির পাশব আসক্তির ভূমিকা রচনা করেছে তার বীভৎস দেহ—'শুধু পা খানি তাহার খোঁড়া নয়, যৌবনে কদাচারের ফলে কুৎসিত ব্যাধিতে খোঁড়ার নাকটা বসিয়া গিয়াছে, সেখানে দেখা যায় শুধু একটা বীভৎস গহ্বর। তারপর হয় তাহার বসন্ত, সেই বসন্তের দাগে কুৎসিত খোঁড়া দেখিতে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।'

খোঁড়া অলঙ্কার পরিয়ে সিঁদুর দিয়ে সেই সর্পিনীকে নিকা করেছে। সে তাকে গলায় জড়িয়ে রাখে, চুমু খায়। আবার জোবেদার উপরও তার আসক্তি কম নয়। তাকেও সে ভাবাবেগের প্রাবল্যে চুমু খেয়ে বলে—'তোর জোরেই তো বেঁচে রইছি জোবেদা। তু হামার জানের চেয়ে বেশী।' তারপর খোঁড়া

শেখের এই দ্বিধাবিভক্ত প্রেমিক-সত্তার উপরে দুর্বিপাক নেমে আসে। জোবেদা সর্পিনীকে দুচোখে দেখতে পারে না—তাকে সে আঘাত করেছে, সাপিনীও জোবেদাকে দংশন করে তার প্রতিহিংসা নিয়েছে। খোঁড়ার প্রতিক্রিয়াটিও এই যুগ্ম আসক্তির মধ্যে অদ্ভুত ভারসাম্য রক্ষা করেছে :

> বিবিকে খোঁড়া বধ করিতে পারে নাই। তাহাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল শুধু—তোর দোষ কি, মেয়েজাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না। (পৃ. ২৯)

এর চেয়ে ভালো উপসংহার গল্পটির হতে পারত না। খোঁড়া তার অসংস্কৃত স্থূল জৈববৃত্তি দিয়ে যা বুঝেছিল, তারই আলোকে গল্পটির মর্মমূল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

তারাশঙ্করের এই গল্পপ্রসঙ্গে ব্যালজাকের 'A Passion in the Desert' গল্পটির কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। সেখানেও একটি পাশব আসক্তির অসামান্য কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মরুচারিণী বাঘিনী রূপমুগ্ধ তরুণ সৈনিকটির কাছে সামান্য বাঘিনী মাত্র নয়—আদিম নারীর বন্যসৌন্দর্য ও খরদীপ্ত বাসনা যেন তার দেহে-মনে সমুদ্ধত হয়ে রয়েছে। সৈনিকটির রূপমুগ্ধ দৃষ্টিতে বাঘিনী—

> It was a Female. The fur upon her breast and thighs shown with whiteness. The number of little spots like velvet looked like charming bracelet around her paws···The presence of the panther even sleeping, made him experience the effect which the magnetic eyes of the serpent are said to exercise upon the nightingale.[১৬]

ব্যালজাকের গল্পটির সেটিং অসামান্য। গল্পটির পটভূমি মরুবেষ্টিত আফ্রিকা। বালুকা সমুদ্রের উপর সূর্যের খররশ্মি, আফ্রিকার দগ্ধদিগন্তের জ্বালাময় উত্তাপ, জনহীন প্রান্তরের ভীষণরমণীয় সৌন্দর্য গল্পটির পরিবেশকে রোমান্টিক করে তুলেছে। এই বিবৃতি-প্রধান পটভূমির চিত্রণ, কাহিনীকে অনেকখানি সাহায্য করেছে। তারাশঙ্করের গল্পে খোঁড়া শেখের জৈব আসক্তি, নাগিনীর প্রতি আকর্ষণেই রূপায়িত হয়েছে। নারী ও নাগিনী একই পুরুষের আসক্তির জন্য

16. The world's Thousand Best Short Stories (Vol. III) Edited by Sir J. A. Hammerton., p. 169.

এই গল্পটির কথা অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন। (বাংলা গল্পবিচিত্রা, পৃ. ১২০)

পরস্পর প্রতিযোগিনী হয়েছে। তারাশঙ্করের গল্পটিতে মানবী ও নাগিনী দুয়েরই আবির্ভাবে বিশ্লেষণটি শাণিতদীপ্ত হয়ে উঠেছে। এই গল্পের উপকরণ সংগ্রহের জন্য তাঁকে কিন্তু অপরিচিত পৃথিবীতে যেতে হয় নি, তিনি রাঢ়ের মৃত্তিকার মধ্যেই এই অলজ্জ জৈব-কামনার ছবি খুঁজে পেয়েছেন। নিপুণ পর্যবেক্ষণ দক্ষতা সত্ত্বেও ব্যালজাক রোমান্টিক যুগের সাহিত্যিক। অপরদিকে মনোধর্মের দিক থেকে তারাশঙ্কর রিয়্যালিস্টিক। কত সামান্য উপকরণকে আশ্রয় করে তিনি বাংলাসাহিত্যের একটি বিস্ময়কর গল্প রচনা করেছেন, ভাবলে বিস্ময় হতে হয়। তীক্ষ্ণতায় ও অন্তর্ভেদী শিল্পদৃষ্টিতে তারাশঙ্কর ব্যালজাককে এখানে অতিক্রম করেছেন।

'কালাপাহাড়' গল্পে দেখতে পাই পশুর সঙ্গে মানুষের নিবিড় আসক্তির আরেক রূপ। এখানে জৈব আসক্তির আর একটি দিক দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর। গল্পটিতে জৈব আসক্তি পরিশেষে সুস্থ মানবিক মমতায় রূপান্তরিত হয়েছে।

রংলাল অবস্থাপন্ন চাষী। চাষকে ভালোবেসে সে তার গরুগুলির সঙ্গেও একাত্ম হয়ে উঠেছে :

> বলশালী প্রকাণ্ড যেমন তাহার দেহ, চাষের কাজে খাটেও সে তেমনই অসুরের মত—কার্পণ্য করিয়া একবিন্দু শক্তিও সে কখনো অবশিষ্ট রাখে না। বোধ হয় এই কারণেই গরুর উপরে তাহার প্রচণ্ড শখ! তাহার গরু চাই সর্বাঙ্গসুন্দর—কাঁচা বয়স, বাহারে রঙ, সুগঠিত শিং, সাপের মত লেজ এবং আরও অনেক কিছু গুণ না থাকিলে গরু তাহার পছন্দ হয় না।...গরুর গলায় সে ঘুঙুর ও ঘণ্টার মালা ঝুলাইয়া দেয়, দুইটি বেলা ছেঁড়া চট দিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গ ঝাড়িয়া মুছিয়া দেয়, শিং দুইটিতে তেল মাখায়; সময়ে সময়ে তাহাদের পদসেবাও করে, কোনোদিন পরিশ্রম বেশি হইলে তাহাদের পা টিপিতে টিপিতে বলে—আহা কেষ্টর জীব! (পৃ. ৪৭)

গল্পের শুরু থেকে রংলালের চরিত্র এমনভাবে আঁকা হয়েছে, যা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সে পশুদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে এক করে তুলেছে। গরু কিনতে গিয়ে সে একজোড়া অতিকায় মোষ কিনে আনল, তাদের নাম দেওয়া হল 'কালাপাহাড়' ও 'কুম্ভকর্ণ'। এই অতিকায় মোষ দুটির কল্যাণে রংলালের কৃষিকর্মের সমৃদ্ধি হল। কিন্তু একদিন চিতাবাঘের হাত থেকে প্রভুকে রক্ষা করতে কুম্ভকর্ণ প্রাণ হারাল। সঙ্গীর বিরহে

কালাপাহাড় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কালাপাহাড়ের উপর রংলালের মমতা কম নয়, তবু বাধ্য হয়ে তাকে বিক্রয় করে দিতে হল। রংলালকে না দেখে সে উন্মত্তের মতো ছুটতে ছুটতে পথ হারিয়ে ফেলল। এবং অবশেষে শহরের শান্তি বিঘ্ন করার অভিযোগে পুলিশ সাহেবের গুলিতে কালাপাহাড়ের বিশাল দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

'নারী ও নাগিনী'তে খোঁড়া শেখের জৈব আসক্তিই তার নিয়তি। কিন্তু 'কালাপাহাড়' গল্পের কেন্দ্রীয় ভূমিকা কালাপাহাড়। তাই এই গল্পে অন্যদিক থেকে বিষয়টিকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কালাপাহাড় রংলালের অনুসন্ধানে উন্মত্তের মতো ছুটে চলেছিল, রংলালকে না দেখে সে আরো ক্ষিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রভুর সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি। প্রভুর প্রতি প্রবল আসক্তিই তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল। পশুসঙ্গী কুম্ভকর্ণ ও মানবসঙ্গী রংলালের প্রতি কালাপাহাড়ের আসক্তি সমসূত্রে আবদ্ধ। কালাপাহাড় যেমন পশুসঙ্গীর মতো মানবসঙ্গীর প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেছে, তেমনি রংলালও পশু-চেতনার সঙ্গে তার একাত্মতা অনুভব করেছে।

'কামধেনু' গল্পটিতে পশুর প্রতি মানুষের আসক্তি মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় সঙ্কেত ও নাটকীয় ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। হত্যার অপরাধে ফাঁসির আসামী নাথুর পূর্বস্মৃতি-পর্যালোচনা দিয়ে গল্পাংশ রচিত হয়েছে। সাধারণ বিবৃতিমূলক কাহিনী নয়। জেলের সেলে আবদ্ধ নাথুর বর্তমান অবস্থা বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে, তার পূর্বস্মৃতির ছায়াছবিগুলি যেন একে একে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে কাহিনী-বিবৃতির নাটকীয়তা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পটুয়াদের ছেলে নাথু। তারই ঘরে আবির্ভূত হল কামধেনু। বর্ণনার চাতুর্যে কামধেনুর বিশিষ্টতা রূপ পেয়েছে :

> গৃহস্থ যখন বন্ধ্যা গাই বলে বিরক্ত হয়ে ওঠে, তখন একদিন বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে কামধেনুর মহিমা প্রকাশ পায়। সন্তান প্রসব করে না, অথচ প্রবালের মত রক্তিম আভায় এবং এক রাশি পদ্মফুলের মত পেলবতায় অপরূপ লাবণ্যে মণ্ডিত হয়ে তার স্তনভাণ্ড স্ফীত হয়ে ওঠে, পাকা বিল্বফলের মত পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে স্তনবৃন্তগুলি ; প্রথমে বিন্দু বিন্দু দুধ দেখা দেয় স্তনবৃন্তের মুখে ; তারপর ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে মাটিতে, কামধেনু সাড়া দেয়, ডাকতে থাকে ; যেমন সন্তানবতী গাভীর স্তনে দুধ জমে উঠলে সে সন্তানকে ডাকে তেমনই ভাবে ডাকে কামধেনু…এতেও

যদি গৃহস্থ বুঝতে না পারে, তবে কামধেনু তখন বসে পড়ে ; স্তনের উপর দেহের চাপ দিয়ে অনর্গল সুধা ক্ষরিত করে দেখিয়ে দেয়। (পৃ. ২২০)

নাথুর কপাল ফিরে গেল। চড়া দামে কামধেনুর দুধ সে বিক্রয় করে। 'সুরভিমঙ্গল গান করে ভিক্ষে পায় চাল। গো-চিকিৎসা করে পায় দু-আনা চার আনা বকশিস।' তারপর দুবছর পরপর হল দৈব-দুর্বিপাক, অজন্মা ও মহামারী। 'পৃথিবীর মাটি শুকিয়ে হল কাঠ, তেতে হল আগুন, আকাশ গেল ঘন কুয়াশায় ভরে—মেঘ গেল উড়ে, বাতাস হয়ে উঠল আবিল, পুকুরে দীঘিতে জেগে উঠল পাঁক—শুকিয়ে শুকিয়ে তাও ফেটে হল চৌচির। মাটি জল বাতাস দূরের কথা, নাথুর কামধেনুর দুধ গেল শুকিয়ে।'

এ পর্যন্ত গল্পটির মধ্যে কোনো অসাধারণত্ব নেই। বিবৃতিধর্মী এই গল্পটি এই অংশে এসে নাটকীয় হয়ে উঠল, দেখা দিল অব্যর্থ-লক্ষ্য গতি ও কেন্দ্রসংহত তীক্ষ্ণতা। ভূমিকম্পে যখন নাথুর স্ত্রী-পুত্র মারা পড়ল, তখন তার 'সামনে এসে দাঁড়াল জগদীশ পটুয়ার বিশ বছরের যুবতী মেয়ে ফুলমণি।' ফুলমণির স্বামী হাঁপানীর রোগী।—পেটের জ্বালায় ফুলমণিকে সে পাইকারের কাছে বিক্রয় করার মতলব করছিল ; সেই অবস্থায় ফুলমণির চোখের নেশা নাথুকে পেয়ে বসল। কিন্তু ফুলমণিকে পেতে গেলে টাকার দরকার। অতএব, রাজবাড়ির গিন্নীমায়ের কাছে সে কামধেনুকে বিক্রি করে ফুলমণিকে কিনে নিল।

'নারী ও নাগিনী' গল্পে খোঁড়া শেখের মনের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না, বিরোধ ছিল নারী ও নাগিনীর মধ্যে। কিন্তু 'কামধেনু' গল্পে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে নাথুর নিজের মনেই। মাসখানেক পর ফুলমণির নেশা ক্রমশ ফিকে হয়ে এল। ভালো-মার বাড়ি গিয়ে তখন সে তার সুরভিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় :

> সুরভিকে দেখে নাথু যেন কেমন হয়ে গেল। এক মাসেই গায়ে ভরে উঠেছে সুরভি। সাদা রোঁয়াগুলি যেন চিকচিক করছে রোদের ছটা পেয়ে। কাঙালের ঘরের মেয়ে বড়লোকের ঘরে বিয়ে হয়ে যেমন রূপে জৌলুসে ফেটে পড়ে, তেমনই চেহারা হয়েছে সুরভির। সুরভি ফিরে তাকালে নাথুর দিকে।
>
> সে চোখ দেখে নাথু ভুলে গেল ফুলমণির চোখ। (পৃ. ২৩১)

এই মুহূর্তটি নাথুর জীবনের চরমতম সঙ্কটের মুহূর্ত। প্রলোভন জয় করতে পারে নি নাথু। বিষধর সাপের মতো লোভ ও লোলুপতা—'লিকলিক করছে

তার জিভ।' সুরভির সুচিক্কণ চামড়ার জন্যে সে তাকে বিষ খাইয়ে সুকৌশলে হত্যা করেছিল। মুচীদের কাছ থেকে সুরভির চামড়াখানাও সে কিনেছিল। ইচ্ছা ছিল চামড়াখানি নিয়েই সে ফকিরী নেবে। কিন্তু এবার লোভ এল আর এক মূর্তিতে। এক পাপ থেকে আর এক পাপের উদ্ভব হল। হেফাজদ্দি পাইকারের প্ররোচনায় সে শুধু চামড়ার ব্যবসাই শুরু করল না, তার কাছে সে ফুলমণিকে দুশো টাকায় বিক্রি করে ব্যবসার মূলধনও সংগ্রহ করল। এখানেও দেখা দিল আর এক দ্বন্দ্ব—'ফুলমণির জন্য সে মহাপাপ করেছে। সকল পাপের মূল ফুলমণি। কিন্তু তবু ফুলমণির জন্যে সে কাঁদে। কতদিন কেঁদেছে।'

হঠাৎ একদিন এক গো-হত্যাকারীর কণ্ঠে গরুর মতো শব্দ শুনে নাথু আত্মসম্বরণ করতে পারল না—সে তাকে গলা-টিপে হত্যা করল। লেখক নাথুর চরিত্রকে বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তীক্ষ্ণোজ্জ্বল ও মনস্তত্ত্বসম্মত করে তুলেছেন। নারীর আকর্ষণ ও পশুর আসক্তি—দুয়ের দ্বন্দ্বে প্রথমে নারীর আসক্তিই জয়ী হয়েছে। নারীর আসক্তি ফিকে হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পশুর আসক্তি অর্থলোলুপতায় রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু তার অর্থলোলুপতা ঐখানেই থেমে থাকে নি। যার জন্য ফুলমণিকেও সে পাইকারের কাছে বেচে দিয়েছে। গো-হত্যাকারীকে মেরে তার ফাঁসি হচ্ছে। মৃত্যুর উপকণ্ঠে দাঁড়িয়েও সে যেন এক আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছে। 'তবে ফাঁসিটা গোরুর আঁতে হলে তার আর কোনো খেদ থাকত না।'

নাথুর জীবনের দ্বন্দ্ব মানব-জীবনেরই এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব। একদিকে লক্ষ্মীরূপিণী কামধেনু, যার লাবণ্যমণ্ডিত স্তনভাণ্ড অমর সুধাভাণ্ডের প্রতীক; অন্যদিকে কামনারূপিণী/ফুলমণির মোহমদিরা, যা চিরদিনই মানুষকে তার কল্যাণপথ থেকে ভ্রষ্ট করেছে। নাথুর জীবনসমুদ্র মন্থন করে বিষামৃতময় জীবনের যে বিচিত্র দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে, লেখক অসাধারণ দক্ষতায় তাকে রূপ দিয়েছেন। গল্পটির উপসংহারের মধ্যেও মানুষের বিষামৃতময় জীবনের রহস্যলীলা চকিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মৃত্যুর উপকণ্ঠে দাঁড়িয়েও নাথু এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে পারে নি। মানব-নিয়তির এই নির্মম রহস্য গল্পটির যথার্থ রস-পরিণাম :

> কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে এপাশে ওপাশে চেয়ে কালকের কয়লাটা তুলে নিল। কি করবে সে এ ক'দিন? কি নিয়ে থাকবে? কাল দুটো চোখ এঁকেছিল। সে দুটোর দিকে তাকিয়ে আজ সে চমকে উঠল। ফুলমণির

চোখ তো হয় নাই। এ যে গরুর চোখ হয়েছে। সুরভির চোখ। তা বেশ হয়েছে। ওরই পাশে আজ ফুলমণির ডবডবে ঢলঢলে চোখ দুটি আঁকবে। ও-চোখের নেশা বেঁচে থাকতে ছাড়তে পারবে না নাথু। (পৃ. ২৩৫)

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে প্রবৃত্তিতাড়িত জীবনের উদ্দাম রূপ ও মানুষের জৈবসত্তার আদিম প্রকাশ অনেক ভঙ্গিতেই রূপ পেয়েছে। তারাশঙ্কর প্রবৃত্তি-তাড়িত জীবনের নির্মম নিয়তি-লীলাকে বিচিত্র ভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। 'তারিণী মাঝি' গল্পটি এই শ্রেণীর গল্পগুলির মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয়।

তারিণী ময়ূরাক্ষীর গন্থটিয়ার ঘাটে যাত্রী পারাপার করে। সে নিঃসন্তান, স্ত্রী সুখীই তার একমাত্র আশ্রয়, সুখীও এই ছোট্ট সংসার নিয়ে পরম পরিতৃপ্ত। গল্পটির মধ্যে ময়ূরাক্ষী নদী প্রধান স্থান অধিকার করেছে। এই নদী শুধু গল্পটির পটভূমিকাই সৃষ্টি করে নি, পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। তারিণী ও ময়ূরাক্ষীর মধ্যে যেন একই জীবনছন্দ প্রবাহিত। ময়ূরাক্ষী শুধু তারিণীর জীবিকার সংস্থানই করে না, তার জীবনের ছন্দও গড়ে তোলে।

ময়ূরাক্ষী রাঢ়ের শুষ্ক নদী, কিন্তু বর্ষায় তার রূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অবিশ্রান্ত বর্ষণে, বাতাসের অট্টহাসি ও নদীর গর্জনে আদিম প্রকৃতির ক্রূর কুটিল রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। অকস্মাৎ উদ্ধত পিঙ্গলবর্ণের জলধারা সাক্ষাৎ মৃত্যুর দোসর হয়ে ওঠে। ময়ূরাক্ষীর প্রলয়ঙ্কর মূর্তি গল্পটির মধ্যে এক নিগূঢ় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে :

> গ্রামের মধ্যেও বন্যা প্রবেশ করিয়াছে। এক কোমর জলে পথঘাট ঘর-দুয়ার সব ভরিয়া গিয়াছে। পথের উপর দাঁড়াইয়া গ্রামের নরনারী আর্ত চীৎকার করিয়া এ উহাকে ডাকিতেছে। গরু ছাগল ভেড়া কুকুরের সে কি ভয়ার্ত চীৎকার। কিন্তু সে সমস্ত শব্দ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল ময়ূরাক্ষীর গর্জন, বাতাসের অট্টহাস্য আর বর্ষণের শব্দ। লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দল অট্টহাস্য ও চীৎকারে যেমন করিয়া ভয়ার্ত গৃহস্থের ক্রন্দন ঢাকিয়া দেয়, ঠিক তেমনই ভাবে। (পৃ. ২৭৭)

ময়ূরাক্ষীর ভয়াবহ বন্যায় সমস্ত গ্রাম যখন ডুবে গেল, তখন তারিণী মাঝি সুখীকে পিঠে করে সাঁতার দিয়েছে। কিন্তু ক্রমশ তারিণীর শরীর আড়ষ্ট হয়ে আসে, তার উপর সুখী তাকে নাগপাশের মতো জড়িয়ে ধরে। ঠিক এই সময়েই এল সুকঠিন পরীক্ষা—একদিকে তারিণীর একমাত্র আশ্রয় তার স্ত্রী সুখী, অন্যদিকে তারিণীর বাঁচার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। তারাশঙ্কর তীক্ষ্ণতায় ও নির্মম নৈপুণ্যে উপসংহারটিকে প্রদীপ্ত করে তুলেছেন :

> বাতাস—বাতাস! যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পর-মুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে কি তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ! হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুল ভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে লইয়া চলিয়াছিল, সেটা খসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। আঃ, আঃ—বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে সে কামনা করিল, আলো ও মাটি। (পৃ. ২১৯)

গল্পটির উপসংহারের মধ্যেই লেখকের মূল বক্তব্য নিহিত। বাঁচার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা এখানে প্রেমকেও গলা-টিপে ধরতে কুণ্ঠিত হয় নি। মানুষ জীবনের এমন একটি সঙ্কট মুহূর্তে এসে কখনো কখনো উপস্থিত হয়, যেখানে অত্যন্ত প্রিয় বস্তুকেও বর্জন করতে সে কুণ্ঠিত হয় না। মানবজীবনের এই নির্মম সত্যাই কেন্দ্রসংহত হয়ে গল্পটির শেষবিন্দুতে উদ্ভাসিত হয়েছে। ছোটগল্পের উপসংহার হিসাবেও এই অংশটি চমকপ্রদ।

৭

তারাশঙ্কর যেমন রুদ্রের দক্ষিণপাণির আশীর্বাদ ও পরমকল্যাণময় স্পর্শ অনুভব করেছেন, তেমনি তাঁর ধ্বংসকরাল রূপকেও অস্বীকার করতে পারেন নি। জীবনরসের বিশুদ্ধ ও পরিশ্রুত লীলারূপের চেয়ে তিনি অনেক বেশী আকর্ষণ অনুভব করেছেন ঐ জীবনেরই অন্য এক রূপে। যেখানে জীবন প্রবৃত্তির উন্মাদনায় অন্ধ, যেখানে মানুষ বন্য মহিষ ও বিষধর সর্পিনীরই সমগোত্রীয়, রাঢ়ের প্রাচীন দগ্ধ মৃত্তিকায় যেখানে জীবনপ্রবাহের আদিম ছন্দ—তারাশঙ্কর সুন্দরের সেই রূপকেই নির্মম বলিষ্ঠতায় রূপ দিয়েছেন।

জীবনের এই দিক আপাতদৃষ্টিতে কুৎসিত ও বীভৎস। পশুকল্প মানুষের দেহ-মনও সভ্য মানুষের পরিশীলিত রুচিতে পীড়াদায়ক মনে হতে পারে। তারাশঙ্করের গল্পের বহু উপকরণই এই জগৎ থেকে সংগৃহীত। কিন্তু সেই আপাত-বীভৎস উপকরণের মধ্যে মানবের চিরন্তন জীবনরহস্যকে যখন তিনি উন্মোচন করেন, তখন বীভৎসও সুন্দর হয়ে ওঠে। এই ভীষণ-রমণীয় ও

বীভৎস-সুন্দর তাঁর সাহিত্যকে একটি অভিনব রস-রহস্যে মণ্ডিত করেছে। তাঁর সৌন্দর্য-দর্শনের সবচেয়ে বড় কথা এই যে, সুন্দরের বিশুদ্ধ কোমল-মাধুর্যের চেয়ে তিনি বেশী আকর্ষণ অনুভব করেছেন সুন্দরের বিচিত্র-বীভৎস ছদ্মবেশে। আপাত-অসুন্দরের মধ্যেই তিনি তাঁর সুন্দরের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। তারাশঙ্করের সুন্দর—ফুলের গন্ধে, জ্যোৎস্নার লাবণ্যে, মেঘমুক্ত শারদাকাশের লঘু আনন্দছন্দে আসেন নি, তিনি এসেছেন তৃণচিহ্নহীন দগ্ধ প্রান্তরের রুক্ষতায়, ময়ূরাক্ষীর পিঙ্গলবর্ণ বন্যার খরতর আবর্তে, কুৎসিত-কদাচারী মানুষের প্রবৃত্তি-তাড়িত দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে। তারাশঙ্কর বীভৎসকে সুন্দর করতে জানেন। বাংলা সাহিত্যে এই রসের রসিক খুব বেশী নেই। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র এ পথে পদক্ষেপ করেন নি। তারাশঙ্কর অনাসক্ত দৃষ্টিতে আপাত-অসুন্দরের মধ্যে সেই সুন্দরকেই দেখেছেন।

'মতিলাল' গল্পে তারাশঙ্কর এক কুৎসিত দর্শন দম্পতির মধ্যে বাৎসল্যরসের সহজ ধারা প্রবাহিত করেছেন। মতিলাল গাজন উৎসবে সঙ সাজে, সেবার সেজেছিল ভালুক। ভালুক যখন তার খোলসগুলি ছাড়িয়ে হাত পা ধুয়ে নিচ্ছিল, তখন তার বিকট মূর্তি দেখে গ্রামের বালক পার্বতী চমকে উঠেছিল :

> হাঁড়ির মত প্রকাণ্ড মাথা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, আলকাতরার মত কালো রঙ, নাকটা থ্যাবড়া, চোখ দুইটা আমড়ার আঁটির মত গোল এবং মোটা, দুই গালের থলথলে মাংস খানিকটা করিয়া চোয়ালের নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মুখ-গহ্বরের পরিধি আকর্ণ-বিস্তৃত। সেই মুখ-গহ্বর মেলিয়া বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া সে হাসিতেছিল, দেখিয়া পার্বতী সভয়ে ছুটিয়া পলাইল। (পৃ. ১৭৯)

এই বীভৎস বর্ণনাটি পড়ে একটি অতিকায় কদাকার জানোয়ারের ছবিই আমাদের সম্মুখে জেগে ওঠে। আবার তার 'ভোবন' বা ভুবনমোহিনীর 'ওই লোকটির যেন ছায়া বা দর্পণের মধ্যের নারীরূপিণী প্রতিবিম্ব। অমনই কালো, অমনই দৈর্ঘ্যে, অমনই পরিধিতে।' শুধু আয়তনের বিশালত্বই নয়, ভুবনও তার স্বামীর মতোই কুৎসিত ও কদাকার। এই পরিবারটিরই উপযুক্ত এক বিশালকায় কুকুর জুটেছে—এই গোবর-গণেশ 'খায় দায় ঘুমায়, চোর আসুক, ডাকাত আসুক—কোনো আপত্তি নাই তাহার, সে কাহাকেও কিছু বলে না।' মতিলাল পাঁচালীর দলে তামাক সাজে, কলকাতায় যাত্রার দলে তার চাকরি হবে—এই প্রত্যাশায় সে দিন গোনে। ভুবনই পরিশ্রম করে সংসার চালায়।

মতিলাল ও ভুবনের এই স্বচ্ছন্দ জীবনের মধ্যে একমাত্র দুঃখ যে তারা নিঃসন্তান। এইজন্য তারা মন্ত্রঃপূত মাদুলি ধারণও করেছে। মতিলাল ছোট ছোট ছেলেকে ভালোবাসে, কিন্তু তারা ভয়ে তার কাছে আসে না, দেখলেই 'ভূত' বলে পালায়। মতিলালের এতে কম আক্ষেপ নয়। বুদ্ধ-পূর্ণিমার পরের দিন যে শোভাযাত্রা হয় ; তাতে মতিলাল কালো রঙ মেখে পরচুলা পরে, রাজ্যের ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে এক বিকট মূর্তি সেজেছিল। এই মূর্তি দেখে পার্বতী নামে ছেলেটি মূর্ছিত হয়ে পড়ে, সেজন্য মতিলালকেও প্রহার করা হয়। গল্পটির উপসংহারে এই কদাকার নর-রাক্ষসটির অন্তস্তল অপূর্ব মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে—তার জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা সেদিনকার আকস্মিক আঘাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এক স্নেহবুভুক্ষু হৃদয়ের বেদনাদীর্ণ প্রকাশ কদাকার মানুষটিকে চিরসুন্দর করে তুলেছে। সামান্য কয়েকটি মিতাক্ষর সংলাপেই তারাশঙ্কর এই সত্যটিকে উন্মোচিত করেছেন :

> ভুবন প্রশ্ন করিল, কে, মেলে কে তোকে ?
>
> —পেসিডেনবাবুর চাপরাসী ; গাঁ ঢুকতে বারণ হয়ে গেল, ছোট ছেলেতে ভয় পাবে আমাকে।—কণ্ঠস্বর তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল।
>
> ভুবন চকিত হইয়া বলিল, ও কি মাদুলি ধরে টানছিস কেনে, ওই ?
>
> পট করিয়া মাদুলির সুতা ছিঁড়িয়া লইয়া মতিলাল বলিল, আমাদের ছেলে আমাদেরই মত কুচ্ছিৎ হবে তো ভোবন! কাজ নাই। (পৃ. ১৯৩)

কুৎসিত আবরণের অন্তরালের আহত মানবাত্মার আর্তকণ্ঠকে ফুটিয়ে তুলে তারাশঙ্কর তাঁর মানবীয় সহানুভূতিকেই শিল্পিত করে তুলেছেন। কদাকার দেহ, অথচ অন্তরে সুস্থ স্বাভাবিক মানবীয় আকৃতি—এই বিপরীতের দ্বন্দ্বে পীড়িত তারাশঙ্করের চরিত্রগুলি তীক্ষ্নরেখায় আত্মপ্রকাশ করেছে। মতিলালের চরিত্রটি ভিক্তর হুগোর নত্‌রদামের সেই বিখ্যাত কদাকার কুব্জ চরিত্র 'কোয়াসেমাদো' চরিত্রটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শুধু 'মতিলাল' গল্পে নয়, সন্তান বুভুক্ষা ও বাৎসল্যরসের চমকপ্রদ অভিব্যক্তি তারাশঙ্করের কয়েকটি গল্পেরই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ চরিত্রকে আশ্রয় করে এই রসের কতকগুলি তির্যক অভিব্যক্তিকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। 'সন্তান' গল্পের গোবিন্দ 'প্রকৃতির বিকৃত মনোবিলাসের সৃষ্টি'। গোবিন্দ যখন মাতৃগর্ভে সেই সময় তার উন্মাদিনী মা বিষ খেয়েছিল—সেই বিষের বিষই গোবিন্দর জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলেছে। বিকৃত বিকলাঙ্গই সেই অভিশাপ। এইদিক দিয়ে সে মতিলালের সগোত্রীয়। কিন্তু

মতিলালের মতো সে শান্ত মানুষ নয়, তার মধ্যে এমন একটি চাপা বিক্ষোভ আছে, যা কদাচিৎ কখনো প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। গোবিন্দর বহিরঙ্গই শুধু কুৎসিত নয়, সে কিছু অস্বাভাবিক চরিত্রের মানুষ। উন্মাদিনী মাতার সে বিষ-জর্জরিত সন্তান। এইটুকু পূর্ব-ইতিহাস দিয়ে লেখক চরিত্রটির দেহ-মনকে একটি কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

গোবিন্দর প্রতিবেশী একদিন এক সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে এল দেখে তার মনও একটি সুন্দরী বধুর জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। ঘটক নরহরি পাল তাকে পরামর্শ দিল যে সে মেয়ের খোঁজ দিতে পারে, কিন্তু তাতে অন্তত তিনশো টাকা লাগবে। টাকার জন্যে স্থানীয় জমিদার লক্ষ্মীবাবুর বাড়িতে সে কাজে লেগে গেল। লক্ষ্মীবাবুর গৃহিণী সূচনাতেই কর্তাকে বললেন—'রোগীর ঘরে ও ঢুকলে রোগী চমকে উঠবে যে!' গোবিন্দ পরিশ্রমী, তার বিকৃত হাতের কর্মনৈপুণ্যও চমৎকার। বিশেষ করে বাড়ির শিশুদের সঙ্গে সহজেই তার ভাব জমে ওঠে—সে তাদের সঙ্গে বিকৃত দেহে নাচে। একদিন লক্ষ্মীবাবুর দৌহিত্র মানিক নাচতে নাচতে মাটিতে পড়ে যায়। গোবিন্দ তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলে—'আমার ছেলে হবা মানিক। হবা? বল কেনে, একবার বাবা বল কেনে? বলবে না? কেনে? ভিখারীকে তো বাবা বলে লোকে। বল কেনে!' বলাবাহুল্য, এরপর গোবিন্দর জবাব হয়ে গেল। তার অন্তরের ক্ষুধাকে কেউ বুঝতে পারে নি:

> ...কয়েক বৎসরে বাসনাটা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিয়াছিল। আবার সেটা প্রবল হইয়া উঠিল। সেটা তাহার জীবনে নারীর প্রয়োজনের জন্য নয়, তাহার অন্তর একটি সুন্দর শিশুর জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। ওই মানিকের মত একটি শিশু। (পৃ. ১৩৮)

আবার পাত্রী অন্বেষণের চেষ্টা চলল। যেদিন গোবিন্দ শুনতে পেল যে, হাম হয়ে মানিকের মৃত্যু হয়েছে, সেদিন 'গোবিন্দের পায়ের তলার মাটিটা যেন থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। চোখের সম্মুখে সব যেন একাকার হইয়া গেল।' শেষ পর্যন্ত নরহরির নির্দেশে গোবিন্দ মাথা ন্যাড়া করে, গলায় কণ্ঠি পরে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করল এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই নিকুঞ্জ বৈষ্ণবের বালবিধবা মঞ্জরীকে বিয়ে করে ফেলল। গোবিন্দর কদাকার দেহ মঞ্জরীরও পরিহাসের বিষয় হল। মঞ্জরীর যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান হল। কিন্তু 'কুৎসিত বিকৃতাঙ্গ এক শিশু, অবিকল তাহার প্রতিমূর্তির এক ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব।' ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে গোবিন্দ শিশুটিকে হত্যা করেছে। তার ধারণা—'মানিক, মানিক আসিবে

বলিয়াছিল, বার বার সে স্বপ্নে তাহাকে সেকথা জানাইয়াছে। না, না, ও শিশু তাহার নয়! না না না!'

গোবিন্দকে পাগলাগারদে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। এবং—

> অনেক তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের পর পাগলাখানার ডাক্তার বহুযত্নে তাহাকে শান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ঘরখানির চারিপাশে ক্যালেণ্ডার টাঙানো, সবগুলিতেই রূপ-লাবণ্যময় শিশুর ছবি। গোবিন্দ তাহাদের সহিত কথা কয়, হাসে, নাচে।
>
> ছবিগুলির নাম—মানিক। (পৃ. ৭৪২)

এখানে দেহমনের বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর বাৎসল্যরসের একটি তির্যক অভিব্যক্তিকে মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতায় রূপ দিয়েছেন।

'শাপমোচন' গল্পটিতেও কুৎসিত কদাকার দেহই নিয়তি হয়ে উঠেছে। দুর্বার প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও কদাকার চেহারা—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বই গল্পটির বিষাদময় উপসংহার রচনা করেছে। দেবীচরণ কুৎসিত বিকৃত দেহ—

> লোমশ পশুর মত ছাই-রঙের দেহবর্ণ, অস্বাভাবিক লম্বা মুখ, তাহার উপর একটা চোখ অহরহ মিটমিট করে, আর একটা চোখ বিস্ফারিত, কে যেন চোখের উপরের কপালের চামড়াটা টানিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। শীর্ণ দেহ, কাঠির মত হাত পা, তাহার উপর চলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া, এক পায়ের শিরাগুলি নাকি অহরহ টানিয়া ধরিয়া থাকে। (পৃ. ৭০৪)

দেবীচরণ নানাজাতীয় কাজ করেছে—কিন্তু তার এই কদাকার রূপই সব কিছুর শত্রু হয়ে দাঁড়াল। সর্বশেষে সে চিকিৎসকের কাজ করছে। আপাত-দৃষ্টিতে দেবীচরণকে অত্যন্ত সুরসিক ও কৌতুকপ্রবণ বলে মনে হয়। তার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, শ্লেষপ্রবণতা ও উপস্থিতবুদ্ধি খুবই উপভোগ্য সন্দেহ নেই। তবু তার দাম্পত্য-জীবন খুব সঙ্কটের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ভামিনী সুন্দরী। দেবীচরণ বহু সাধ্য-সাধনা করেও তার মন পায় না। কিন্তু কদাচিৎ যদি ভামিনীর মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তাহলে সে অসম্বরণীয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রেম নিবেদন করতে যায়। ভামিনী তার অনুপস্থিতিতে বেশ স্বাভাবিক থাকে, কিন্তু স্বামীকে দেখলেই সে একটি বিবর্ণ কাঠের পুতুলে পরিণত হয়। অবশেষে তার ফিটের ব্যারাম শুরু হল। অথচ দেবীচরণ 'ভামিনীর দেহে জীবন-সঞ্চারের জন্য' উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সে কিছুটা সন্দেহ-বাতিকগ্রস্তও হয়ে উঠেছে। মুখুজ্জেদের ছোকরাটার সঙ্গে তার স্ত্রী তো স্বাভাবিকভাবেই

কথা বলে। মূর্ছিতা স্ত্রীর জন্য ঔষধ দিতে গিয়ে সে বিষ খেয়ে নিজের অভিশপ্ত জীবনেরই অবসান ঘটিয়েছে। এই দ্বন্দ্বের সংক্ষিপ্ত চিত্রটি যেমন নির্মম, যেমনি তীক্ষ্ণোজ্জ্বল :

> ও কে ? দেবী চমকিয়া উঠিল। সে নিজে ? এত বর্বর ভয়াবহ রূপ তাহার! দেওয়ালে ঝুলানো আয়নাখানার কাছে গিয়া সে দাঁড়াইল। উঃ, তাহারই ভয় করিতেছে! অভিশাপের রূপ এত ভয়ঙ্কর। না না, অপরাধ নাই, অপরাধ নাই। কন্যা কাময়তে রূপম্। সে বর নয়, সে অভিশাপ। (পৃ. ৭১৭)

তারাশঙ্করের অধিকাংশ গল্পের মতো 'শাপমোচন' গল্পটির গতি মন্থর ও লয় বিলম্বিত। মন্থরগতি গল্পটি শেষপ্রান্তে এসে আকস্মিক দ্রুততাল মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। গল্পটির চূড়ান্ত শীর্ষ (Climax) ও উপসংহার (Catastrophe) একই বিন্দুতে ঘন-সংহত হয়ে এক নির্মম ট্রাজেডিকেই প্রকাশ করেছে।

কুৎসিত, কদাকার ও বিকলাঙ্গ চরিত্র-চিত্রণে তারাশঙ্করের একটি সহজ প্রবণতা লক্ষণীয়। কিন্তু একে তিনি একটি অভিনব শিল্পকৌশল হিসেবেও ব্যবহার করেছেন। কুৎসিত দেহ ও অন্তরে গভীর ও স্বাভাবিক মানবীয় তৃষ্ণা —এই দুয়ের দ্বন্দ্বে তারাশঙ্করের এই জাতীয় চরিত্রগুলি যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়েছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বজর্জর পীড়িত মানুষগুলিকে তিনি অসীম সহানুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

'তমসা' গল্পে তারাশঙ্কর দৈনন্দিন জীবনের গদ্যময় রুক্ষ পরিবেশের মধ্যে এক বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিখারীর পরম রূপতৃষ্ণা আবিষ্কার করেছেন। বাগদীদের বিকলাঙ্গ ছেলে পঞ্চী, অযত্নে অনাদরে সে বর্ধিত হয়েছে। বছরখানেক আগে তার মা তাকে একদিন খুব মেরেছিল। তার দিদি তাকে হাতে ধরে ব্রাঞ্চলাইনের ছোট স্টেশনটিতে রেখে গেল। অন্ধ বিকলাঙ্গ ভিখারী ছেলে পঞ্চীর বীভৎস বহিরাঙ্গের মধ্যে সুন্দরের পিপাসা লুকিয়েছিল। সে গান গায় :

> হায়—হায় আমি যদি হতেম চুড়ি
> কাঞ্চন নয়, কাঁচ-বেলোয়ারি
> থাকতেম তোমার হাতটি বেড়ি
> জেবন সফল করিতে।
> হায়, হায় থাকত না খেদ মরিতে

তার সুপ্ত সৌন্দর্যতৃষ্ণা এক তরুণী খেমটাওয়ালীর পাদস্পর্শে, কণ্ঠস্বরে ও গন্ধবিলাসে এক রূপতন্ময়তার সৃষ্টি করেছে। প্রখর ইন্দ্রিয় চেতনার দ্বারা সে এই মেয়েটির মধ্যে পরম রূপতীর্থের সন্ধান পেয়েছে। তাই প্রণাম করার ছলে পঙ্খী মেয়েটির আলতা-পরা পায়ে মুখ ঘষে, মুখে খানিকটা আলতার রঙ মেখে নিল—'মেয়েটি পায়ে উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করলে, পঙ্খীর বিকৃত চোখ থেকে জল ঝরে তার পায়ে লাগছে।' তারপর সারাজীবন-ব্যাপী সেই সুন্দরেরই অনুসন্ধান চলেছে এ যেন—

তোমারে পেয়েছি কোন প্রাতে,
তারপরে হারিয়েছি রাতে।
তারপরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি,
নও ছবি, নও তুমি ছবি।

অন্ধকারের ওপারে চিরসুন্দরের যে রূপমূর্তি আছে, বিকলাঙ্গ পঙ্খীর মধ্যে সেই চিরন্তন গূঢ় তৃষ্ণাই এক গভীর প্রত্যয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। ছোট স্টেশনের নানা টুকরো ছবি, প্রাত্যহিক জীবনের শ্রীহীনতা,—এসব অতিক্রম করে বিকলাঙ্গ মানুষটির দিব্যদৃষ্টি 'কামলোক' ছাড়িয়ে 'রূপলোক'-এর দিকে অভিসার করেছে। সৌন্দর্য ও বীভৎসতার সীমারেখা এখানে লুপ্ত হয়ে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর পদ্মাসন রচনা করেছে। সুন্দরের গভীর ও অতলস্পর্শ মহিমার এমন রূপালেখ্য বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। গল্পটিতে তারাশঙ্করের রস সাধনার চূড়ান্ত সিদ্ধি ঘটেছে।

৮

তারাশঙ্কর স্নেহ-বাৎসল্য নিয়ে অনেকগুলি গল্প লিখেছেন। 'পুত্রেষ্টি', 'মালাকার', 'বাবুরামের বাবুয়া', 'স্থলপদ্ম' প্রভৃতি গল্পে বাৎসল্যরসের বিচিত্র উৎসকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। স্নেহ-বাৎসল্যের স্বাভাবিক পথগুলি দীর্ঘকালব্যাপী কাব্য, নাটক ও উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়েছে। এই বহুব্যবহারজীর্ণ পথের মধ্যে নূতন কোনো আবেদন আনা সম্ভব নয়। তারাশঙ্কর তাই ব্যতিক্রমের পথগুলিকেই শিল্পীর তির্যক দৃষ্টির সাহায্যে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

[একচল্লিশ]

'পুত্রেষ্টি' গল্পে বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির মেজকর্তার বিচিত্র চরিত্র ও খেয়ালী মেজাজকে ঘিরে স্নেহ-বাৎসল্যের একটি নিগূঢ় ও দুরূহ উৎসভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশ-পঁচিশ বছর আগে মেজকর্তার রসিকতার, মুক্তহস্ততার ও ঔদার্যের একটি খ্যাতি ছিল। তখন নিত্য সন্ধ্যায় মেজকর্তার আড্ডায় মজলিস বসত। কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। গৃহিণীর সনির্বন্ধ অনুরোধে বদ্যিনাথে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী সন্তান-কামনায় ধন্নাও দিয়েছিলেন। ফিরে এসে ছোট ভাইয়ের ছেলেকে পোষ্যপুত্র নেবেন স্থিরও হল। এই উপলক্ষে যাগযজ্ঞ ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি উৎসব-আয়োজনের ফর্দও হল। কিন্তু হঠাৎ ছোট ভাইয়ের একটি তীব্র মন্তব্যে তিনি এমন ভাবে আহত হলেন যে, পূর্ণ দু'মাস শয্যাগ্রহণ করলেন। এর পরেই তাঁর চরিত্রে গভীর পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি অদ্ভুত রকমের খেয়ালী হয়ে উঠলেন। সম্পত্তি ভাগ করে নিলেন, 'জপে-তপে ধর্মে-কর্মে' দেখা দিল তাঁর গভীর অনুরাগ, আর দেখা দিল অর্থসঞ্চয়ের প্রতি মোহ।

মেজগিন্নী যখন চাটুজ্জেদের ভাগ্নেকে পোষ্যপুত্র নিতে চাইলেন, তখন মেজকর্তার ঘোরতর আপত্তি দেখা দিল। অথচ তাঁর চরিত্রে স্নেহ-বাৎসল্যের ধারাটি একেবারে শুকিয়ে যায় নি। পেয়ারা তলায় ছেলেদের তাড়াতে গিয়ে চার বছরের একটি ভয়ার্ত সুন্দর ছেলেকে দেখে তাঁর স্নেহ-দৌর্বল্যের আকস্মিক অভিব্যক্তি সংহত অথচ তীক্ষ্ণরেখায় আত্মপ্রকাশ করেছে :

> মেজকর্তা ছেলেটির দিকে চাহিয়াছিলেন—অতি সুন্দর ছেলেটি! অকস্মাৎ তিনি একান্ত লুব্ধ আগ্রহে যেন ছোঁ মারিয়া শিশুকে বুকে তুলিয়া লইয়া বার-বার চুমা খাইয়া পরমাদরে কহিলেন—ভয় কি, তোমার ভয় কি?—পরমুহূর্তেই চকিত হইয়া উঠিলেন, চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া ছেলেটিকে একরূপ ফেলিয়া দিয়া অতি দ্রুতপদে যেন পলাইয়া আসিলেন। বৈঠকখানায় কেহ ছিল না, নির্জন ঘরে আধ আলো-ছায়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া তিনি হাঁপাইতে ছিলেন। চোখের দৃষ্টি কেমন অস্বাভাবিকরূপে প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। (পৃ. ৬৭৭)

গঙ্গাতীরের শ্মশানে এক অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসী এসেছিলেন। মেজকর্তা গভীর রাত্রিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে জেনে এলেন যে, তন্ত্রমতে পুত্রেষ্টি যাগ করতে হলে নরবলির প্রয়োজন। মেজকর্তা সন্ন্যাসীর কাছে নরবলি দিতে স্বীকৃত হলেন।

এবার মেজবাবুই মেজগিন্নীকে চাটুজ্জেদের ভাগ্নেটিকে এখানে নিয়ে আসতে বললেন—সে খাবে দাবে থাকবে। মেজগিন্নীর কোলের ঘুমন্ত

শিশুটিকে বলির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় মেজকর্তার দ্বিধাগ্রস্ত চিত্ত চমৎকার ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। একটি মর্মভেদী চীৎকার তিনি শুনতে পেলেন—তাঁর মনে হল 'এই শিশুর অশরীরী মাতা যেন দীনভাবে সন্তান ভিক্ষা চাহিতেছে।' সন্তানহারা কুক্কুরীর ক্রন্দনধ্বনি যুক্ত হয়ে গল্পটির ব্যঞ্জনাকে তীক্ষ্ণতর করে তুলেছে। গল্পটি মূলত চরিত্রধর্মী। মেজকর্তার চরিত্রের আপাত-পরুষতার অন্তরালে সুপ্ত স্নেহবৃত্তি, পুত্রকামনার জন্য অপরের সন্তানকে বলি দেওয়ার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অপরাধপ্রবণতা, সন্তানহারা কুক্কুরীর আর্তনাদ, অমাবস্যায় রহস্যাচ্ছন্ন ভীতি-শিহরণ, প্রভৃতি গল্পটিকে এক বিশিষ্ট শিল্পগৌরবে মণ্ডিত করেছে।

'মালাকার' গল্পের নায়ক রজনী মালাকার ডাকসাজ ও আতসবাজির কারিগর। তার উপার্জন আছে, সঞ্চয় নেই। অকৃতদার হলেও তার অর্জিত অর্থ নেশায় ও নারীর আসক্তিতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। কালী সিংয়ের নিম্নজাতীয়া স্ত্রী শ্যামার প্রতি তার আসক্তির ইতিহাসও সুবিদিত। প্রতিবার পূজোতে সে তার 'সেঙাতিনী'কে রঙীন কাপড় দিয়ে থাকে। এই সময় হঠাৎ বিলিতি জিনিস বর্জনের আন্দোলন এল। স্থির হল বিলিতি রাঙতা ও চুমকির কাজ চলবে না। রজনী স্থির করল যে, শুধু সোলা দিয়ে সে প্রতিমার আভরণ তৈরী করবে। কালী সিংয়ের কাছে সে টাকা ধার করে নিয়ে এল। কিন্তু মেলায় সদ্য পরিচিত রূপোপজীবিনীদের জন্য কাপড় কিনে দিতে তার সব পুঁজি নিঃশেষিত হল। এরপর একটি ছোটমেয়ের সোনার বিছে হার চুরি করে সে প্রতিমার সাজ তৈরী করল। কিন্তু চৌর্যবৃত্তির অপরাধ তার মনকে প্রতিমুহূর্তেই পীড়িত করেছে। তাই এবার সে আর মিতেনীর জন্য কাপড় আনে নি, এনেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য জামা। রজনী মালাকারের অপরাধপ্রবণতার সঙ্গে তার মানস-পরিবর্তনের সূত্রটি যুক্ত করে গল্পটির একটি কল্যাণ-সুন্দর প্রসন্ন পরিণামের নির্দেশ দিয়েছেন তারাশঙ্কর।

'বাবুরামের বাবুয়া' গল্পে নিঃসন্তান বাবুরামের স্নেহ-বাৎসল্য বিচিত্র ভঙ্গিতে উৎসারিত হয়েছে। বাবুরাম জমাদারের কাজ করে, তার স্ত্রী সুখীয়া এক সময় হাসপাতালে কাজ করত। নিঃসন্তান এই দম্পতি পরের ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে মানুষ করে। ছেলে একটু বড় হলেই ফিরিয়ে দিতে হয়। বাবুরাম সে সময় বদ্ধ উন্মাদ হয়ে ওঠে। বাবুরামের চরিত্রবৈচিত্র্যের সঙ্গে বাৎসল্যরসের তির্যক অভিব্যক্তি যুক্ত হয়েছে।

'স্থলপদ্ম' গল্পে একটি নিম্নশ্রেণীর মেয়ের চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাৎসল্যরসের অভিব্যক্তি দেখানো হয়েছে। বিধবা মেয়ে পুত্র কামনায় আবার বিবাহ করেছে, কিন্তু তার সমস্ত কামনা কি ভাবে দৈবাহত হয়েছে, তারই করুণ-সুন্দর ব্যঞ্জনাটি গল্পের শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি!

তারাশঙ্করের কয়েকটি গল্পে পারিবারিক জীবনের সম্পর্কবৈচিত্র্য অপূর্ব রূপে রূপায়িত হয়েছে। অবশ্য বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর গল্পের একটি পূর্বতন ধারা আছে। শরৎসাহিত্যে আমাদের পারিবারিক জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় ও সম্পর্কবৈচিত্র্যের ছবি অসামান্য মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তারাশঙ্কর এক্ষেত্রে ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছেন। 'বড়-বৌ' গল্পটিতে পারিবারিক জীবনের একটি রস-মধুর ছবি প্রকাশিত হয়েছে। বড়-বৌ কাদম্বিনীকে নিয়ে দুই ভাই সেতাব ও মহাতাপের বিরোধ একটি মিলনান্তক পরিণতিতে পরিসমাপ্ত হয়েছে। দেবর ও ভ্রাতৃবধূর সম্পর্কটি একটি পরম মাধুর্যের দীপ্তিতে ভরে উঠেছে। এখানে বড়-বৌয়ের স্নেহ-পরায়ণ ব্যক্তিত্বদীপ্ত সংযত চরিত্রটি সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'তাসের ঘর' গল্পটিও পারিবারিক জীবনাশ্রয়ী। শৈল বিনীত, নম্র। কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে বাপের বাড়ির গল্প যেমন সে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বলে, তেমনি বাপের বাড়িতেও শ্বশুর বাড়ি সম্পর্কে বাড়িয়ে বলতে তার বাধে না। নিমন্ত্রিত অতিথিদের সম্মুখে সে বাপের বাড়ির স্বচ্ছলতা সম্পর্কে এমন অত্যুক্তি করেছে যে, শাশুড়ী আহত হয়ে তাকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বাপের বাড়ি এসে শ্বশুর বাড়ি সম্পর্কেও তেমনি অত্যুক্তি করেছে। শাশুড়ী ব্যাপারটাকে বুঝতে পেরে বধুকে ক্ষমা করেছেন। পারিবারিক অশান্তির ধূমায়িত বিক্ষোভ, মধুর প্রশান্তির মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে।

'সুখনীড়' গল্পটির নামকরণের মধ্যেই একটি নির্মম আয়রনি লুকিয়ে আছে। সনকা ও মণির দাম্পত্য জীবনের তুলনামূলক ছবি এঁকে তা দেখানো হয়েছে।

'রাঠোর ও চন্দাবত' গল্পে দুটি পরিবারের বিরোধ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গল্পটির প্রারম্ভে দীর্ঘ ইতিহাস ধারার মধ্য দিয়ে এই বিরোধের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা বিবৃত হয়েছে। রাঠোর-চন্দাবতের বিরোধ কাহিনী মধ্যযুগের রাজপুতনার ইতিহাসের একটি সুবিদিত অধ্যায়। বাংলা দেশের অখ্যাত পল্লীর অধিবাসী হলেও তাদের রক্তধারার মধ্যে সে বিরোধের রেশ ছিলই। ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার সামন্তযুগের বিরোধ-বিসম্বাদের রক্তাক্ত কাহিনী সমন্বিত হয়ে গল্পটির উপযুক্ত পটভূমিকাই সৃষ্টি হয়েছে। চরিত্রগুলি মধ্যযুগের রাজপুত আভিজাত্যের

যেন এক একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। 'রাঠোর ও চন্দাবত' গল্পে যেমন ইতিহাস ও রোমান্সের আবহাওয়ায় পারিবারিক বিরোধের পরিণতি দেখানো হয়েছে, তেমনি—'ট্রিটি' গল্পে কৌতুকহাস্যের উজ্জ্বল রেখায় এই বিরোধের লঘুতার দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গল্পটিকে তারাশঙ্করের বিশুদ্ধ কৌতুকরসের শ্রেষ্ঠ গল্প বলা যায়। কালীচরণ ঘোরতর শাক্ত, রাধাচরণ পরম বৈষ্ণব। দুজন দুজনের একাধারে শ্যালক ও ভগ্নীপতি দুই-ই, কিন্তু দুজনেই দুজনের আবার পরম শত্রু, মুখদর্শন পর্যন্ত নেই। শিষ্যদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে তারাই আসলে লাভবান হয়। গল্প বিবৃতির মধ্যেই একটি লঘু মেজাজ আছে—কালীচরণ ও রাধাচরণ চরিত্র দুটিও কৌতুকরেখায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্কর গম্ভীর রসের শিল্পী, কিন্তু জীবনের লঘুতরল বিকাশ ও অসঙ্গতিগুলিকেও যে তিনি কতখানি শিল্প-সমুজ্জ্বল করে তুলতে পারেন, গল্পটি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

টাইপ চরিত্র অঙ্কনে তারাশঙ্কর পর্যবেক্ষণ-নিপুণ সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রগুলির মধ্যে এমন সমস্ত অসমতল বন্ধুরতা আছে, যা বর্ণনার আলোকে সহজেই দীপ্যমান হয়ে ওঠে। অতি বিশ্লেষণ অথবা জটিল বর্ণনায় তিনি চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলেন না। তার অভাব পূরণ করেছে তাঁর চরিত্র পর্যবেক্ষণের বিশেষ ভঙ্গিটি। বিশেষ কোনো চরিত্রকে তিনি এমনভাবে উপস্থিত করেন, যেখানে দীর্ঘ বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন হয় না। এই সব চরিত্র জনতার ভিড়ে মিশে থাকলেও তাদের চিনতে অসুবিধা হয় না, কারণ তাদের চরিত্রে এমনই বিশেষত্ব থাকে যা তাদের চিনিয়ে দেয়। চরিত্রের অদ্ভুত, উৎকট ব্যতিক্রমের দিকেই চরিত্রস্রষ্টা তারাশঙ্করের প্রবণতা। টাইপ চরিত্র অঙ্কনের এই দক্ষতার জন্যই তাঁর উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্রগুলিও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। অসমতল জীবনের বহুকোণবিশিষ্ট বৈচিত্র্যকে তিনি রূপমণ্ডিত করে তুলেছেন।

পর্যবেক্ষণদক্ষতা ও বহুল অভিজ্ঞতাই তারাশঙ্করের চরিত্রসৃষ্টির মূলে। চরিত্র রচনার জন্য তাঁকে কল্পনার খাদ মেশাতে হয় না—জীবন থেকে সরাসরি তিনি উপকরণ সংগ্রহ করেন। সমালোচকরা চরিত্র-রচনার মোটামুটি দুটি পদ্ধতির কথা বলেছেন :

> Some writers seem to snatch their characters out of thin air, with no conscious reference to anybody they ever heard of ; slap any old names to them, and by a few quick casual strokes that leave most of their personalities unexpressed, make them vivid and notable.

> Others must document, correlate, catalogue their fictional people, laboriously selecting externals indicative of needed traits, and if not literally transcribing living humans bodily to paper, at least building composites all of whose parts are drawn straight from life. [১৭]

বলাবাহুল্য, তারাশঙ্করের চরিত্রসৃষ্টি সমালোচক বর্ণিত দ্বিতীয় শ্রেণীর সগোত্র। জীবনের মর্মমূল ভেদ করে যে প্রাণধারা উৎসারিত হয়েছে, তাকেই তিনি রূপ দিয়েছেন। যেটুকু তিনি উদ্ভাবন করেছেন, তার সম্ভাবনাও ঐ জীবনোৎসের মধ্যেই নিহিত ছিল।

তারাশঙ্করের কয়েকটি গল্পকে বিশেষভাবেই চরিত্রপ্রধান গল্প বলা যায়। সেখানে চরিত্রের বৈচিত্র্যগুলিকে কেন্দ্র করেই যেন গল্পগুলি দানা বেঁধে উঠেছে। 'সনাতন', 'জটায়ু', 'চারহাটির স্টেশনমাস্টার', 'ব্যাঘ্রচর্ম' প্রভৃতি গল্প এই শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। 'সনাতন' গল্পের সনাতন বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। দশ বছর বয়সে এই হাড়ীর ছেলেটি যখন শিবনাথের প্রপিতামহের কাছে কাজ করতে এসেছিল, তখন তার বোকামি ও সরলতা সকলের কৌতুক উদ্রেক করত। ভূতের ভয়ে সে 'মোলকিনী পুকুরে'র ধারে হাঁটতে পারত না। দেবস্থান ও দেবতাদের উপরও তার 'ভয় ছিল বিষম'। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ছিল তার দুর্দান্ত সাহস। গো-চারণভূমিতে সে অজস্র বিষধর সাপকে অনায়াসে হত্যা করেছে। এমন কি একবার সে একটি নেকড়ে বাঘকেও হত্যা করেছিল। সনাতনের বিবাহিত জীবনের বৈচিত্র্যও কম নয়। কারো সঙ্গেই সে ঘর করতে পারে নি—কেউ বা তাকে ছেড়ে পালিয়েছে, আর কাউকে কাউকে সে-ই তাড়িয়ে দিয়েছে। দশ বছর বয়সে যে বাড়িতে সে ঢুকেছিল, সেই বাড়িতে দীর্ঘ পঁচাত্তর বছর পরে তার মৃত্যুদিন যেদিন ঘনিয়ে এল, তখন মৃত্যুর প্রশান্ত মহিমাকে অনাসক্ত চিত্তেই সে গ্রহণ করেছে। অথচ আগে 'মর' বলার জন্য একাধিকবার সে তার স্ত্রীকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে কুন্ঠিত হয় নি। বোকামি, সরলতা, প্রভুভক্তি, বিচিত্র খেয়াল ও সর্বশেষে সহজ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ—সনাতন চরিত্রটিকে তারাশঙ্করের একটি বিশিষ্ট সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

'জটায়ু' গল্পের থিয়েটার-বাতিকগ্রস্ত জটে পাগলার চরিত্রটিকে বিচিত্র ঘটনা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিণত রূপ দেওয়া হয়েছে। কর্মকারদের ছেলে জটে, জন্ম থেকেই পাগল। কিন্তু বাবুদের 'সীতাহরণ' থিয়েটার দেখার পর থেকে সে

১৭. The Short Story, p. 206 : Kenneth Payson Kempton.

একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়। জটায়ুর আত্মদান পাগলাকে মুগ্ধ করেছিল। জটায়ুর পার্ট তার একেবারে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। শিবনাথ 'গ্রামের মুকুটহীন রাজা।'—সেদিন সে রামের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। তার কাছে জটে পাগলা বহুবার 'সীতাহরণ' থিয়েটারটি আবার করার অনুরোধ জানিয়েছে। এবং সেই থিয়েটারে সে জটায়ুর ভূমিকায় অভিনয় করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছে। এইভাবে জটায়ুর কথা সব সময় ভাবতে ভাবতে জটে পাগলা রামায়ণের জটায়ুর সঙ্গে একেবারে একাত্ম হয়ে উঠেছে। কিন্তু জীবনের শেষদিনে প্রথমবার ও শেষবারের মতো সে এই ভূমিকাটির সার্থকতম অভিনয় করেছে। কালা গুণ্ডার হাত থেকে শিবনাথের অসহায়া স্ত্রীকে রক্ষা করতে গিয়ে সে যেমন তাকে হত্যা করেছে, তেমনি নিজেও প্রাণ দিয়েছে। এইভাবে সে তার 'জটায়ু' সাজার বাসনা চরিতার্থ করেছে। জটে পাগলার বিচিত্র সংস্কারটিকে কাহিনীর গতিপ্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে তারাশঙ্কর একটি বিশিষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।

'ব্যাঘ্রচর্ম' ও 'চারহাটির স্টেশনমাস্টার'—গল্প দুটিও চরিত্রপ্রধান। উভয় ক্ষেত্রেই চরিত্রের কৌতুককর অসঙ্গতি ও লঘুরস, গল্পকে উপভোগ্য করে তুলেছে। 'ব্যাঘ্রচর্ম' গল্পের নায়ক রতন হাড়ি অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। বিশাল দেহ নিয়ে সে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-জখমের আস্ফালন করে বেড়ায়। এই সূত্রে সে বড় বড় জমিদারদের কাছে কাজও জোগাড় করে। কিন্তু বলবীর্যের পরীক্ষাকাল যখন উপস্থিত হয়, তখন গোপনে সে পালিয়ে যায়, অন্যত্র চাকরি নেয়। মিথ্যা-ভাষণকেই সে জীবিকার্জনের একমাত্র পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছে। আসলে সে ভীরু কাপুরুষ। চরিত্রটির এই কৌতুককর অসঙ্গতিই গল্পটির প্রাণ। 'চারহাটির স্টেশনমাস্টার' গল্পের স্টেশনমাস্টার লোকটি গোবেচারী ছা-পোষা ভালোমানুষ। ছোট লাইনের এই ছোট্ট স্টেশনটির প্রতি তার অপরিসীম মমতা। কিন্তু এই নিঃসম্বল মানুষটি অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনে ওস্তাদ। দেশের চকমিলান বাড়ি ও ফলের বাগানের ফলাও বর্ণনা তার মুখে লেগেই আছে। যাত্রার অভাবে স্টেশন যখন উঠে গেল, তখন সে কাঁদাকাটি করে বড় সাহেবের কাছে তার প্রকৃত অবস্থার কথা জানিয়ে কয়লার দোকানের বন্দোবস্ত করেছে। তবে বিনে মাইনের টিকিট পরীক্ষা করার অনুমতিটিও চেয়ে নিয়েছে। এই সদানন্দময় কৌতুককর চরিত্রটি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

'প্রতিধ্বনি' গল্পটির মূল রসকেন্দ্র অদ্ভুত ধরনের পাগল রসরাজের চরিত্রটি। কিন্তু রসরাজের পাগলামির মধ্যে একটি সুগভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসা ছিল।

অনেকের ধারণা, যে সে সিদ্ধিলাভও করেছিল। প্লেগ যে বছর মহামারীর আকারে দেখা দেয়, তখন রসরাজ বি-এ ক্লাসের ছাত্র। প্লেগে তার মা-ভাই-বোন মারা গেল। তার বংশের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল পাগলামির বীজ। হঠাৎ সে সর্বত্র দেখতে পেল মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা। 'মৃত্যু কি, তার রূপ, কোথা তার বাস—এ ভিন্ন চিন্তা নেই, মৃত্যু ভিন্ন চোখে কিছু দেখতে পাই না, কান্না ভিন্ন কিছু শুনতে পাই না। অহরহ যেন অনেক লোক একসঙ্গে কাঁদছে।'—এই হল রসরাজের বক্তব্য। এই মৃত্যুজিজ্ঞাসাই তার জীবনের একমাত্র জিজ্ঞাসা হল। চারপাশে মৃত্যু, তাই সে ফুঁ দিয়ে মৃত্যুকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত। 'প্রতিধ্বনি' চরিত্র-প্রধান গল্প হলেও মৃত্যুজিজ্ঞাসা এর ভাবদেহ। এই রহস্যাচ্ছন্ন দার্শনিক অনুভূতিকে পরবর্তীকালে 'আরোগ্য-নিকেতন' উপন্যাসে লেখক পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন। সেখানে শুধু জিজ্ঞাসাই নয়, প্রাচীন ভারতবর্ষের মৃত্যুরহস্য-ভেদকারী সাধনার কথাও আছে। রসরাজের অসমাপ্ত জিজ্ঞাসাই জীবন মশায়ের মধ্যে পরিণতি লাভ করেছে। একদিকে বিচিত্ররূপিণী নিঃশব্দসঞ্চারিণী পিঙ্গলবর্ণা অন্ধ বধির কন্যার অলক্ষ্য ও অব্যর্থ পদসঞ্চার, অন্যদিকে সাধকের মৃত্যুরহস্যভেদী অন্তর্দৃষ্টির ধ্রুবজ্যোতি—সেখানে এক মহিমা-সুগম্ভীর রূপ পরিগ্রহ করেছে।

৯

রাঢ়ভূমির জনশ্রুতি, কিংবদন্তী ও কুসংস্কার তারাশঙ্করের বহু গল্পেরই পটভূমিকা রচনা করেছে। এই কুসংস্কার, কিংবদন্তী ও লোকবিশ্বাসগুলিকে তিনি ঘনিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাদের শিল্পরূপ দিয়েছেন। এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে 'ডাইনী' গল্পটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। গ্রাম্য কুসংস্কার ও কিংবদন্তীর সঙ্গে ছাতি-ফাটার মাঠের তৃণচিহ্নহীন দগ্ধরূপ এক অস্বাভাবিক ও অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। গল্পটির পটভূমিকায় এই বিশাল প্রান্তরের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। এই রৌদ্রজ্বালাময় নিয়তির মতো নির্মম প্রান্তরের বর্ণনায় তারাশঙ্কর অসামান্য শিল্পদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রত্যক্ষতায় ও ঘনবদ্ধ বর্ণনায় এই বিশাল প্রান্তর গল্পটির পটভূমিকাই শুধু রচনা করে নি, পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। এই দগ্ধ প্রান্তরের সঙ্গে জড়িত হয়েছে মহানাগের 'বিষের জ্বালা'র ভয়ঙ্কর জনশ্রুতি।

এই অসাধারণ সেটিংটির উপরে তিনি ডাইনী কাহিনীটি বিন্যস্ত করেছেন। সে একটি অসহায় মেয়ে। দশ-এগার বছর বয়সে বামুনবাড়ির হারু চৌধুরী তার ছেলের পেট-ব্যথার জন্য তার ডাকিনী-দৃষ্টিকেই দায়ী করেছিল। তারপর এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীর মনে অভ্রান্ত ধারণা জন্মেছে যে, মেয়েটি সত্যিই ডাইনী, তার দৃষ্টিতে আছে বিষ। শুধু গ্রাম্যলোকের কুসংস্কারই নয়, সবচেয়ে বড় কথা যে, সে নিজেও ক্রমশ বিশ্বাস করতে শুরু করল, যে সে ডাইনী। বুড়ো শিবতলায় 'অঝোরঝরে সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছিল--হে ঠাকুর, আমার দৃষ্টিকে ভালো করে দাও, না হয় আমাকে কানা করে দাও।' আয়নায় নিজের 'নরুন দিয়া চেরা, ছুরির মত চোখে, বিড়ালীর মত এই দৃষ্টি' দেখে সেও চমকে ওঠে। তাই লোকালয় বর্জন করে ছাতি-ফাটা মাঠের একটি প্রান্তে সে একখানি কুঁড়ে ঘরে দিনযাপন করে। বাউড়ীদের ছেলেকে বাণ মারার অভিযোগে ডাইনীকেই দোষী করা হল। অবশেষে বৃদ্ধা ডাইনীকে উড়িয়ে নিয়ে গেল কালবৈশাখীর ঘূর্ণিঝড়। পরের দিন কণ্টকাকীর্ণ খৈরী গুল্মের তীক্ষ্ণাগ্র শাখায় ঝুলতে দেখা গেল বৃদ্ধা ডাইনীকে। ছাতি-ফাটার মাঠের রুদ্র প্রকৃতির সঙ্গে কুসংস্কার ও কিংবদন্তী সমন্বিত হয়ে একটি অতিপ্রাকৃত ভীতি-শিহরণের সৃষ্টি করেছে। গল্পটি যথার্থই কোনো ডাকিনী বা ভূতের গল্প নয়, একটি অভিশপ্ত মানবীর বেদনাই এখানে অনাসক্ত মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। অভিশপ্ত বৃদ্ধা ডাইনীর বেদনাকে লেখক গভীর সহানুভূতির সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। কিন্তু কী গভীর অনাসক্তির সঙ্গেই না বলিষ্ঠ রেখায় নির্মম কাহিনীর নির্মমতম সমাপ্তিরেখা টেনেছেন!

> অতীতকালের মহানাগের বিষের সহিত ডাকিনীর রক্ত মিশিয়া ছাতি-ফাটার মাঠ আজ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকের দিকচক্ররেখার চিহ্ন নাই; মাটি হইতে আকাশ পর্যন্ত একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। সেই ধূসর শূন্যলোকে কালো কতকগুলি সঞ্চরমাণ বিন্দু ক্রমশ আকারে বড় হইয়া নামিয়া আসিতেছে।
>
> নামিয়া আসিতেছে শকুনির পাল। (পৃ. ৩৮১)

রাঢ়ভূমির পুরাতন মাটির সঙ্গে অতীত যুগের বহু বিস্মৃত অধ্যায়ের অভিশপ্ত কাহিনী জড়িত আছে। এই সমস্ত কাহিনী লোকের মুখে মুখে একালে পর্যন্ত চলে এসেছে। 'আখড়াইয়ের দীঘি' এই জাতীয় একটি কাহিনী। এই গল্পটিকেও পরিবেশ-প্রধান গল্প বলা যায়। দীর্ঘ পরিবেশ বর্ণনার অনেক পরে এসেছে মূল কাহিনীটি। তৃষাতপ্ত বৈশাখী অপরাহ্ণ, ধূলাধূসরিত দগ্ধ আকাশ, আর 'দক্ষিণে

বামে শস্যহীন মাঠ ধু-ধু করিতেছে। গ্রামের চিহ্ন বহু দূরে দিগ্বলয়ে কালির ছোপের মত বোধ হইতেছিল।' তিনজন রাজকর্মচারী বাদশাহী সড়ক ধরে সাইকেলে করে যাচ্ছিলেন। এই তিনজনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গল্পটির আবহাওয়া তৈরী হয়েছে। কোনো এক বাদশাহের কীর্তিকাহিনীকে অবলম্বন করে 'আখড়াইয়ের দীঘির মাটি, বাহাদুরপুরের লাঠি ও কুলীর ঘাঁটি'র রোমাঞ্চকর আখ্যায়িকা গড়ে উঠেছে। চারদিকে ঘনবদ্ধ অন্ধকার, বন্য লতাজালে আচ্ছন্ন বিকটাকৃতি দৈত্যের মতো চারপাশের গাছপালা, নবাবী আমলের ভগ্নপ্রায় বাঁধাঘাট, টর্চের আলোয় চকিতে উদ্ভাসিত দীঘির গর্ভদেশের হিংস্র হাসি, সঞ্চরমাণ পদশব্দ প্রভৃতি একটি ভীতি-শিহরণপূর্ণ অতিপ্রাকৃত আবহাওয়াকে ঘনিয়ে তুলেছে। কালীচরণ বাগদী ও তার পুত্র তারাচরণের কাহিনী সেন্সর কোর্টের নথি থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কাহিনীটি মুখ্য নয়, মুখ্য হল আখড়াইয়ের দীঘির রোমাঞ্চ পরিবেশ। যে আখড়াইয়ের দীঘিতে কালীচরণ তার পুত্রের শবদেহকে পুঁতে রেখেছিল, সেইখানেই তার শেষশয্যা রচিত হল। নির্মম নিয়তির মতো আখড়াইয়ের দীঘির হিংস্র মুখবিবর তাকেও গ্রাস করেছে। দক্ষ চিত্রকর তারাশঙ্কর বলিষ্ঠ রেখাবিন্যাসে এই প্রেতচ্ছায়াবিবর্ণ শ্বাসরোধকারী আবহাওয়াকে চিত্রিত করেছেন।

'বন্দিনী কমলা' গল্পটিও অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের উপর রচিত হয়েছে। রাজহাটের রায়বাড়ির বন্দিনী কমলার কাহিনী শতাব্দীব্যাপী বিচিত্র স্বপ্ন-কল্পনার মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ সংস্কারে পরিণত হয়েছে। এই বংশের পূর্বপুরুষ দেওয়ান গোপীবল্লভের 'পরমা সুন্দরী সহধর্মিনী' কোজাগরী পূর্ণিমার দিন লক্ষ্মীকে বন্দিনী করেছিলেন। সে রাত্রির পরিবেশকে গল্পকার অর্থগূঢ়তায় ভরে তুলেছেন। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে জ্যোৎস্না অন্তর্হিত হল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বজ্রবিদ্যুতের সঙ্গে নেমে এল প্রবল বর্ষণ, প্রবল বাতাসে ঘৃতপ্রদীপগুলি গেল নিবে, পদ্মগন্ধে বাতাস হয়ে উঠল ভারি। সেই দুর্যোগের রাত্রিতে লক্ষ্মী রায়বাড়ির চোর কুঠুরীতে চিরকালের জন্য হলেন বন্দিনী। বলাবাহুল্য এই অলৌকিক কাহিনীর একটি প্রবল অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি হয়েছে গল্পটির উপসংহারে। বাস্তবের রূঢ় আলোকে দীর্ঘকালের সংস্কারের যবনিকা উন্মোচিত হয়েছে— বন্দিনী কমলা পরিণত হয়েছেন নরকঙ্কালে ও একরাশ বিবর্ণ চুলে। 'ডাইনী' গল্পটির মতো এখানেও কিংবদন্তী ও সংস্কারই এর ভিত্তিমূল রচনা করেছে।

কিন্তু এই জাতীয় গল্পে তারাশঙ্করের সবচেয়ে কৃতিত্ব অলৌকিক পরিবেশের ভীতি-শিহরণ রচনায়। এই প্রসঙ্গে 'এক রাত্রি' গল্পটির কথা মনে পড়ে।

জনহীন প্রান্তরে একটি জঙ্গলের মধ্যে একটি প্রাচীন দেবালয় ও তার জীর্ণ নাট-মন্দির। নির্জন দেবস্থানটি ঘিরে রচিত হয়েছে নানা উপকথা—'দেবীর খলখল হাসিতে, ভৈরবের হুম হুম ধ্বনিতে, কৌতুকোচ্ছল দর্শক শিবা, পেচক, শকুনের আনন্দ-ধ্বনিতে আশেপাশের পল্লীর অধিবাসীরা সুষুপ্তির মধ্যেও শিহরিয়া উঠে, গাছে গাছে পাতাগুলি মৃদু কম্পনে থর থর করিয়া কাঁপে।' এই নির্জন দেবভূমির ভীতিসঙ্কুল রহস্যাচ্ছন্ন পরিবেশটিকে লেখক কয়েকটি বলিষ্ঠ রেখাবিন্যাসে ঘনিয়ে তুলেছেন :

> এতক্ষণে অরণ্যের রহস্যময় শব্দরূপ তাহাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া উঠিল। লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝিঁর ঝিল্লি, ছোট পেঁচার কুঁককুঁক শব্দ, বড় পেঁচার কর্কশ ধ্বনি, বাচ্চাগুলার অস্ফুট ভাষা—ঠিক শিসের শব্দ, কলহরত শৃগালের ডাক, সরীসৃপের বুকে হাঁটার পত্রমর্মর-শব্দ, দ্রুত-ধাবমান চতুষ্পদের পদধ্বনি, সকলের উপরে সুদীর্ঘ গাছগুলির মাথার উপর পুরাতন শোকের বিলাপধ্বনির মত শকুনের ডাক, রবহীন মূকের হাসির মত বাদুড়ের পাখার শব্দ-সমন্বয়ে স্থানটি তন্ত্রোক্ত মায়াপুরীর মতই রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। (পৃ. ২৪২-২৪৩)

এই রহস্যাচ্ছন্ন পরিবেশে দুই সন্ন্যাসীর বিচিত্র কথোপকথনের মধ্য দিয়ে একটি রহস্যময় গল্পের কাঠামো তৈরী হয়। গল্পটি অবশ্য পূর্ণাঙ্গ নয়, গল্প না বলে বোধ হয় গল্পের একটি স্কেচ বলাই অধিকতর সঙ্গত। রূপলাল ও কার্তিক—গল্প বর্ণিত দুটি চরিত্র। তরুণ সন্ন্যাসী চলেছেন উত্তর মুখে—হিমালয়ের দিকে রূপলালেরই সন্ধানে। আর প্রৌঢ় সন্ন্যাসী চলেছেন দক্ষিণে—সমুদ্রবেষ্টিত আন্দামানের দিকে, যেখানকার জেলে আছে কার্তিক। অথচ ঐ দুজনে এক রাত্রিতে নির্জন দেবস্থলীতে কত কাছাকাছিই না এসেছিল ; ছোটগল্পের অতর্কিত ইঙ্গিতময় পরিসমাপ্তি এখানে একটি অর্থগূঢ় সঙ্কেত বহন করেছে। বলার চেয়ে না বলাই এখানে বেশী। অব্যক্ত অংশটুকু পাঠকচিত্তে রচিত হতে পারে, সে অবকাশ লেখক এখানে দিয়েছেন।

তারাশঙ্করের শিল্পীপ্রকৃতির মধ্যেই কোথায় একটি গভীর অনাসক্তি ও নির্লিপ্ততা আছে। মানুষের প্রতি কখনো তিনি বিশ্বাস হারান নি, তাই যাদের কোথায়ও স্থান হয় নি, তারাও তাঁর সহানুভূতি পেয়েছে, কিন্তু সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে তিনি ভাবাতিশয্যে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠেন না কখনো। এইখানেই তাঁর শিল্পীমনের যথার্থ পৌরুষ। তাঁর নায়ক-নায়িকারা যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়, আপন প্রবৃত্তির জ্বলন্ত লাভাস্রোতে দগ্ধ হয় ; শিল্পী তারাশঙ্কর তাদের বেদনা

উপলব্ধি করেন, কিন্তু প্রতিকারহীন জীবন-নিয়তির অলঙ্ঘ্য সত্যটিকেই দ্বিতীয় বিধাতার মতো তুলে ধরেন। এই অনাসক্তি ও নির্লিপ্ততাই তাঁর শিল্পীজীবনের প্রত্যয়কে এত গভীর করেছে। তাই তাঁর বস্তুকে ভেদ করে জীবনের মূলে প্রবেশ করার শক্তি অসামান্য। জীবন-নিয়তির স্বরূপ যিনি জানেন, তাঁর পক্ষেই একমাত্র সহানুভূতিশীল হয়েও নির্মম হওয়া সম্ভব।

'না' গল্পটি তারাশঙ্করের সংহত শিল্পকুশলতার একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। পূর্বকাহিনী বর্ণনাই এখানে দীর্ঘস্থান অধিকার করেছে। ব্রজরাণীর সাক্ষ্যের দিনটিতেই গল্পটির সমস্ত বক্তব্য যেন একটি শব্দকে কেন্দ্র করে বিদ্যুৎরেখার মতো প্রদীপ্ত হয়েছে। 'না'—ব্রজরাণীর এই সংক্ষিপ্ত উত্তরমালার উপরেই গোটা গল্পটি অপরূপ ভাবসাম্যে স্থাপিত হয়েছে। কালীনাথ-অনন্ত প্রসঙ্গ দীর্ঘতর হলেও, তাকে গল্পের বহিরঙ্গ বা পূর্বকাহিনী হিসেবে নির্দেশ করা যায়। আসল গল্প ব্রজরাণীর সুকঠিন ব্যক্তিত্বে ও অন্তর্জীবনের অবরুদ্ধ ভাববৃত্তিতে। স্বামীহন্তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সে দীর্ঘ আটবছরব্যাপী প্রতীক্ষা করেছে। স্বামী হত্যাকারী মামাতো দেবরের বিচার হবে। সেইদিনের দিকে চেয়ে সে চুলে তেল দেয় নি। কিন্তু ব্রজরাণীর অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যেই এই আটবৎসরে গভীর পরিবর্তন ঘটেছে—সদাহাস্যময়ী কল্যাণী বধূ এক নির্বাক নিস্পন্দ পাষাণ মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। অনন্তর পিতা ও শ্বশুরের আবেদনকে সে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। ব্রজরাণীর ছেলের ভবিষ্যৎ সংস্থানের প্রস্তাব যখন এল, তখন সে দৃঢ়ভাবেই জানিয়েছে—না।

কিন্তু আদালতে একটি বিশেষ মুহূর্তে তার মনে গভীর পরিবর্তন ঘটে গেল। ব্রজরাণীর স্মৃতিসূত্র ও অনন্তর স্মৃতিসূত্র কোনো এক বিন্দুতে সমন্বিত হয়ে এক গভীর বিপ্লব ঘটিয়ে দিল।/ ব্রজরাণীর মমতা ও অনন্তর আবেগ-উদ্বেল সশ্রদ্ধ মনোভাব এখানে একটি যুগ্মবেণী রচনা করেছে। স্বামীহন্তার সব অপরাধ অস্বীকার করে ব্রজরাণীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল—'না'। দীর্ঘমন্থর গল্পটি ঐ একটি বিন্দুতে এসে যেন সংহত হয়েছে। সেই মুক্তা-নিটোল ভাববিন্দুর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে দুটি যন্ত্রণাজর্জরিত হৃদয়ের সবচেয়ে বড় সত্য ও সবচেয়ে গভীর অনুভব। এই অসাধারণ গল্পটিতে ব্রজরাণীর কণ্ঠনিঃসৃত 'না'-এর তিনটি স্তর: প্রথম স্তর—দৃঢ়তার ও সঙ্কল্পকঠোর মনের। দ্বিতীয় স্তর—ক্ষমার। তৃতীয় স্তর—গভীর প্রশান্তির। এই একটি মাত্র কথার অবিচলিত ভারসাম্যেই গল্পটির শিল্পমূর্তি রচিত হয়েছে। মন্থর কাহিনীটির চকিত পরিসমাপ্তি, রঞ্জনরশ্মির তীক্ষ্ণ আঘাতে যেন গল্পটির মর্মমূলকে পর্যন্ত বিদ্ধ করেছে।

'দেবতার ব্যাধি' তারাশঙ্করের আর একটি অসাধারণ গল্প। মানব-নিয়তির যে দুজ্ঞের্য় রহস্য জীবনশিল্পী তারাশঙ্করের প্রধান জিজ্ঞাসা, এই গল্পে তা তীক্ষ্ণতর রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ডাক্তার গরগরি অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। বহু আপাত-বিরোধী ভাববৃত্তির উপকরণে তার চরিত্রটি রচিত হয়েছে। কিন্তু বিরোধের মধ্যে সমন্বয়ের সূত্রটি গল্পের শেষদিকে ডাক্তারের স্বীকৃতির মধ্যেই উদ্ভাসিত হয়েছে। জীবন-সাধনায় মানুষকে নানা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। এই দ্বন্দ্বে যদি সাধক তাঁর সাধনা থেকে ভ্রষ্ট হন, তাহলে আর উপায় থাকে না। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির এই তীব্র দ্বন্দ্বে একবার প্রবৃত্তির অন্ধলীলার কাছে দাসখত লিখে দিলে মানুষের আর নিষ্কৃতি থাকে না। এই অন্ধ প্রবৃত্তির অপ্রতিরোধ গতি ঘূর্ণিস্রোতের মতো প্রবলতম আকর্ষণে ক্রমশ নিচের দিকে টেনে নিয়ে যায়। মানুষের মধ্যে মহাশক্তিরূপিণী তমস্বিনী সরীসৃপ-প্রবৃত্তির যে মহাসত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, ডাক্তার গরগরির স্বীকৃতি থেকেই তার চমকপ্রদ পরিচয় পাওয়া যায় :

> সেই যে জাগল ক্রূরপ্রবৃত্তি, তার নিবৃত্তি আর হল না। শুধু আর আহুতি নিয়েই তৃপ্ত থাকতে পারলাম না। মানুষের সকৃতজ্ঞ চিত্তের আনুগত্যের সুযোগে বহুভোগের আকাজ্ক্ষা জেগে উঠল। আমার কর্মের মর্মর খণ্ড থেকে এই মানুষগুলি তাদের কৃতজ্ঞতার পরিকল্পনায় গড়ে তুলেছিল যে দেবমূর্তি, আমার আত্মপ্রসাদের পূজায় সে দেবতা জাগল ক্ষুধা দিয়ে। মাস্টার মশাই, শয়তান ক্ষুধার্ত হয়ে মানুষকে আক্রমণ করলে—মানুষ তার সঙ্গে লড়াই করতে সাহস পায়, মানুষ বহু ক্ষেত্রে তাকে বধ করেছে, বহু দৃষ্টান্তই তার আছে। দেবতার ক্ষুধার্ত আক্রমণের মুখে মানুষ কিন্তু অসহায়। সেখানে তার কোনোক্রমেই নিস্তার নাই। (পৃ. ১৬০)

দ্বন্দ্ব জর্জরিত অসহায় মানুষের এই আর্তি তীক্ষ্ণতায় ও জ্বালাময়তায় অসামান্য হয়ে উঠেছে। ডাক্তার গরগরি তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র।

নির্মমতায় ও কুটিল আয়রনির মর্মান্তিকতায় বাংলা সাহিত্যে 'অগ্রদানী' তুলনাহীন। উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্তীর কৌতুককর কাহিনীই এখানে নির্মম আয়রনিতে পরিণত হয়েছে। আহার সম্পর্কে চক্রবর্তীর কোনো বাছ-বিচার ছিল না। ছেলেরা যখন বিভিন্ন লোকের বাগানে গিয়ে আম, জাম, পেয়ারা প্রভৃতি ফল আহরণ করত, লোভী চক্রবর্তী ফলের লোভে তাদের সঙ্গে যোগ দিত—মৌমাছি-বোলতার আক্রমণও তাকে নিরস্ত করতে পারত না। পঞ্চগ্রামের মধ্যে যেখানে যে বাড়িতে যত সামান্যই ব্রাহ্মণ-ভোজনের

আয়োজন হোক না কেন, চক্রবর্তী সেখানে আবির্ভূত হবেই। কিছু জমি ও সিংহবাহিনীর প্রসাদের বিনিময়ে সে তার সদ্যোজাত পুত্রকে বিক্রয় করতেও কুণ্ঠিত হয় নি। প্রাপ্তির আশায় জমিদার-গৃহিণীর শ্রাদ্ধে অগ্রদানী হয়ে নিজের ছেলের কাছ থেকে পিণ্ড নিতে হল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নির্মম নিয়তির কঠিন প্রত্যাদেশের মতো নিজপুত্রের পিণ্ডও তাকেই দেখতে হয়েছে—'শ্রাদ্ধের দিন, গোশালায় বসিয়া বিধবা বধূ পিণ্ডপাত্র চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিল। পুরোহিত বলিল—খাও হে চক্রবর্তী।' গল্পটির তীক্ষ্ণতা ও বিদ্যুদ্দীপ্ত চকিত উপসংহার নিয়তিরই অট্টবজ্রহাস্যে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে।

'তিনশূন্য' আর একটি নির্মম-বীভৎস কাহিনী। গল্পটির প্রথমেই দুর্ভিক্ষের যে নগ্ন বীভৎস মূর্তি আছে তা যেমন বলিষ্ঠ রেখাঙ্কনে সুস্পষ্ট, তেমনি গল্পটিরও একটি চিত্র-প্রতীক হয়ে উঠেছে। লোভ-লালসার এমন আদিম ও হিংস্ররূপ তারাশঙ্করের আর কোনো গল্পে নেই। অন্যত্র তিনি পশুকল্প মানুষ এঁকেছেন, কিন্তু এখানে এঁকেছেন পশুই। দুর্ভিক্ষের সন্তান, বিকৃত ব্যাধি ও অসুস্থ মনোবিকারের বংশধর বিকলাঙ্গ ল্যালা—'চোখে পিচুটি, অবিরাম বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে; মুখে ভাষা নেই, রব আছে, মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে লালা।' নিয়তির নিগূঢ় সঙ্কেত উপসংহারের সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে একটি অর্থদ্যোতনায় ভরে ওঠে।

১০

'তিনশূন্য' গল্পে যেমন তারাশঙ্কর নির্মম অনাসক্তির চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন, তেমনি 'বোবা কান্না' গল্পে মানুষের বেদনার্ত অনুভূতি আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করেছে। মহামারী ও মন্বন্তরের ব্যাপক পটভূমির উপরে গল্পটি রচিত হয়েছে। এই জাতীয় বর্ণনায় তারাশঙ্করের দক্ষতা বহুবার পরীক্ষিত হয়েছে। ত্রিপুরা ভট্টাচার্য ও মিহির মুখার্জির দ্বন্দ্ব কাহিনী দিয়ে কাহিনীটির সূত্রপাত। ত্রিপুরা ভট্টাচার্য চণ্ডীমায়ের পূজারী, তাঁর সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টি ঐশ্বরিক মহিমাকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছে। মিহির মুখার্জি ডাক্তার, আধুনিক বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত। এখানেও সেই পুরাতন ও নূতনের দ্বন্দ্ব—'জলসাঘর', 'পিতা-পুত্র' প্রভৃতি গল্পে যার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু এই দীর্ঘকাহিনীটি

বিচিত্র ভাবানুষঙ্গে বিচলিত হয়েছে। আনু ঠাকুরের তরুণী বধুর বোবা কান্না ও শশী ডোমের আত্মহত্যা মহামারী-বিবর্ণ কাহিনীর উপরে একটি অশ্রুগম্ভীর ছায়াবিস্তার করেছে। দাগী চোর শশী ডোমের হৃদয়ের অন্তস্তলে এক মমতা-মধুর গোপন উৎসকে লেখক এখানে আবিষ্কার করেছেন।

'সন্ধ্যামণি' করুণ রসের গল্প। সন্তান-বাৎসল্য সম্পর্কিত কয়েকটি গল্পের কথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু রসাস্বাদনে এই গল্পটির একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। কুসুম মাদুর বোনে, এই তার জীবিকা। এক ভবঘুরে স্বামী ছাড়া তার কেউ নেই। তিন-চার বছরের এক মেয়ে ছিল—সন্ধ্যামণি। মাস তিনেক হল তার মৃত্যু হয়েছে। মেয়েটির মৃত্যুর পর কুসুমের কাছে তার স্বামী কেনারামও বিশেষ আসে না। কিন্তু তারাশঙ্কর সুকৌশলে এই দৈবাহত দম্পতির অন্তর্বেদনাকে রূপ দিয়েছেন। কেনারাম চাটুজ্জে ভবঘুরে উদাসীন জাতীয় মানুষ। শ্মশানে সে বসে, শ্মশান-চণ্ডাল পৈরুর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, কুকুরের বাচ্চাটির প্রতিও তার মমতার অন্ত নেই। কিন্তু উদাসী মনের গভীরে আছে শোকার্ত পিতৃহৃদয় :

> চিতার দীপ্ত আলোকে পৈরু দেখিল চাটুজ্জের চোখ বাহিয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। অপ্রস্তুতের মত চাটুজ্জে কহিল—মেয়েটাকে মনে পড়ে গেল পৈরু। কুসুমের কথা হলেই তাকে আমার মনে পড়ে যায়। জানিস পৈরু, কুসুমের মুখের দিকে চাইলে আমার কান্না পায়। মা-মণির, আমার সন্ধ্যামণির মুখ যেন ওর মুখের মধ্যে জ্বল জ্বল করে ভাসে। (পৃ. ৫১৮)

দুটি শোকাহত নর-নারীর মৌনবেদনাকে লেখক করুণ ও কোমল রেখায় রূপ দিয়েছেন। মানবহৃদয়ের গভীর ও নিস্তরঙ্গ শোকসমুদ্র এখানে এক অশ্রু-গম্ভীর ধ্রুপদী মহিমা লাভ করেছে। ব্যক্তিগত শোকই এখানে চিরন্তন শিল্প-গরিমার করুণ-লাবণ্যে মণ্ডিত হয়েছে।

তারাশঙ্করের পরিণত শিল্পপ্রজ্ঞা জীবনের জটিল জিজ্ঞাসার সমাধান করতে চেয়েছে। 'শেষকথা' গল্পে এই নতুন ভুবনে উত্তরণের সঙ্কেত আছে। গল্পটিতে মহাত্মা গান্ধীর জীবন ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়েছে। সংঘাত নয়, বিরোধ নয়—সেপথে জীবনের সত্য নেই, পরিপূর্ণতা নেই। জীবনের পূর্ণতা ক্ষমায়, ভালো-বাসায়। নিরক্ষর সনাতন এক সময় সহজে মৃত্যুবরণ করেছিল। কিন্তু বুড়ির মৃত্যু এক মাধুর্যমণ্ডিত পরম পরিণাম, এ মৃত্যু যথার্থই 'শ্যাম সমান।'—

> চোখে জল টলমল করছিল, তবুও বুড়ার মুখে হাসি ফুটে উঠল, বুড়া বললে, বল বুড়ি, কি বুলছ, বল ?

—মরণ ভারি সুন্দর গো বুড়া, মরণ ভারি সুন্দর।

বুড়া হাসতে লাগল, চোখের জল টপ টপ করে ঝরে পড়ল বুড়ির কপালের উপর। বুড়া মুছিয়ে দিতে গেল সে জল। বুড়ি বললে, না থাক। (পৃ. ৮৪৫)

এই উপলব্ধিই শিল্পী তারাশঙ্করের চরম উপলব্ধি। দগ্ধ-তাম্রাকাশের রৌদ্রদুঃসহ বৈশাখী চেতনা হেমন্তসায়াহ্নের নিবিড় প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে। সমস্ত দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে সেখানে ক্ষমার স্নিগ্ধতা ও প্রীতির মহামন্ত্র; সেখানে মৃত্যু-যন্ত্রণাজর্জর মানুষের দেহ শুধু নিয়তিই নয়, সুন্দরেরই নামান্তর মাত্র!

তারাশঙ্করের রচনা-শিল্প ও আঙ্গিকের আলোচনা করলেও তাঁর শিল্পী-প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। মনোধর্মের দিক থেকে তাঁর সঙ্গে স্বভাবকবিদের একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার, সুন্দর-অসুন্দর সব কিছু মিলিয়ে জীবনের যে রহস্যরস উদ্ঘাটিত হয়েছে, তাতে কোনো সচেতন শিল্পপ্রয়াস নেই। তারাশঙ্কর কাহিনী রচনার মধ্যে সেই জীবনকে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কোনোরূপ চাতুর্য ও টীকা-ভাষ্যও সংযুক্ত করেন নি। এক বস্তুনিষ্ঠ ও অনাসক্ত দ্রষ্টার আসনেই তিনি উপবিষ্ট। জীবনের কোনো অংশকেই তিনি কলাকৌশলের যত্নকৃত আভরণে সাজাতে চান নি, কারণ তাতে এই বস্তুনিষ্ঠ জীবনশিল্পের মহিমাই ক্ষুণ্ণ হত। যে সহজ-প্রবল জীবনের তিনি রূপকার, সেই জীবনের ভঙ্গিটিই যেন তাঁর স্টাইলের কাঠামো রচনা করেছে।

আধুনিক যুগের ছোটগল্পে বাইরের ঘটনাকে অনেকখানি সঙ্কুচিত করা হয়েছে। সহজ বিবৃতির পথ ছেড়ে ছোটগল্প তির্যক ভাষণ ও সঙ্কেতের পথ ধরেছে। তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলি প্রধানত দীর্ঘবিন্যস্ত ও বিবৃতিধর্মী। তাই তাঁর গল্পগুলির মধ্যে দীর্ঘ বিবৃতি ও ঘটনা বিন্যাসের এমন অবকাশ থাকে, যা সহজেই উপন্যাসের শিল্পরূপ গ্রহণ করতে পারে। আধুনিক ছোটগল্পের অতিসূক্ষ্ম শিল্পরূপ কোথাও কোথাও ব্যাহত হলেও, জীবনকে দেখার গভীর অন্তর্দৃষ্টি বিস্মিত করে। মোপাসাঁ-পূর্ববর্তী যুগের ফরাসী সাহিত্যে বিলম্বিত লয়ের বিবৃতিধর্মী 'টেল্'-জাতীয় আখ্যায়িকাই খ্যাতি লাভ করেছিল। ব্যালজাক, মেরিমেঁর মতো গল্প-লেখকরাও আধুনিক গল্পের মাপকাঠিতে 'টেল্' রচয়িতা। কিন্তু জীবন রসিকতায় ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণদক্ষতায় তাঁদের গল্পগুলি ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তারাশঙ্করের রচনা পাঠকের কাছে সেই চিরন্তন প্রশ্নটিই নূতনভাবে ধ্বনিত করেছে: 'Life is greater than Art'. ডক্টর

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন: 'তিনি ততটা আর্টিস্ট নহেন, যতটা জীবন রসের রসিক।'[১৮]

তারাশঙ্করের ভাষা ও স্টাইল কলাকৌশল বর্জিত—সহজ, সরল, অতির্যক ও বলিষ্ঠ। বীরভূমের রুক্ষ ধূসর মৃত্তিকার সঙ্গে তাঁর ভাষার একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন: '...আমার পাত্র-পাত্রীর মুখে আমার ভাষার কথা আমি বসাতে পারি না, তাদের নিজেদের ভাষা আমার ভাবনায়—রচনায় বেরিয়ে আসে। মহান পূর্বাচার্যগণের মত নিজস্ব একটি ভাষা আমি এই কারণেই করতে সক্ষম হই নি। সে শক্তি বোধ হয় আমার নেই এবং সে চর্চা করার ঝোঁকও আমার জাগে নি।'[১৯] তাঁর শিল্প-প্রকৃতির সঙ্গে প্রাচীন মহাকাব্যের একটি মিল আছে। মহাকাব্যের বস্তু-নিষ্ঠতা ও সরলতা ব্যক্তিবিশেষের যত্নকৃত রচনা বলে মনে হয় না। স্বক্ষেত্রে তারাশঙ্করের রচনার মধ্যেও যেন এর কিছু আভাস পাওয়া যায়।

তারাশঙ্করের গল্পমালা বিশাল বনস্পতির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মূল মানবজীবনের সেই আদিম মহাশক্তিস্বরূপিণী ধাতু-প্রবৃত্তির উৎস কেন্দ্রে নিহিত, তাদের পত্র-পল্লবে রাঢ়ভূমির উত্তপ্ত ধূলি; জ্বালাময় আকাশের রৌদ্ররসে তারা সমৃদ্ধ। অঙ্গিকের দুর্বলতা, শিল্পগত ত্রুটি-বিচ্যুতি সেখানে বড় কথা নয়—কারণ তারা বিলাসী ধনীর টবের গাছ নয়। বনস্পতির পক্ষে বিশেষ পত্র-পল্লব চোখে পড়ে না—সবটুকু মিলিয়েই তার সম্রাটসুলভ মহিমা ও আভিজাত্য। তাঁর গল্পে মানুষ বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে, ক্ষত-বিক্ষত হয়, বেদনায় কাঁদে, ভালোবাসে ও ভালোবেসে মরে—এ সবের বহু ঊর্ধ্বে এক অনাসক্ত দ্রষ্টার দুটি চোখ জেগে থাকে। একটি চোখে করুণা ও বেদনার ম্লানিমা আর একটি চোখে মহাকালের উদ্যত শাসন—অসহ্য ও মর্মান্তিক তার ধাতব দীপ্তি।

গল্পকার তারাশঙ্করের মর্মলোকে এই ভাবমূর্তিরই প্রতিষ্ঠা।

১৮. বঙ্গ-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (২য় সং) পৃ. ৪৫।

১৯. আমার সাহিত্য-জীবন (১ম পর্ব) পৃ. ২২।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গল্প-পঞ্চাশৎ

পাল-পুকুরের ঘাটের উপরেই প্রকাণ্ড বটগাছটার একটা শিকড় বিশাল অজগরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া গর্তের ভিতর মুখ সেঁধাইয়া যেন পিঠে রোদ পোহাইতেছে। পুলিন দাস তাহার উপর হাঁটুভাঙা দ-এর মত উবু হইয়া বসিয়া জলে খোলামকুচি ছুঁড়িয়া 'ব্যাং ছুড়ছুড়ি' খেলিতেছে। তাহার কাঁধে গামছা, কানে একটা পোড়া বিড়ি।

মিতে বলাই দাস আসিয়া ডাকিল—এই যে পেলা, উঠে আয়। ওরে ও ক্ষেপাচণ্ডী, উঠে আয়। খুড়ো যে—

পুলিন হাতের খোলামকুচিটা জলের পরিবর্তে মাটিতে আছড়াইয়া কহিল—টেঁসেছে বেটা বুড়ো?

বলাই সোৎসাহে কহিল—আর দেরি নাই, উঠে আয়।

উভয়েই গ্রামের পথ ধরিল, বলাই আগে, পুলিন পিছনে।

পুলিন সহসা কহিল—বউটা খুব কাঁদছে, নয় রে বলা?

বলা কহিল—খু-উ-ব, আছাড়-বিছেড় করছে।

মাথাটা তাহার প্রায় ঘাড়ের নিকটে হেলিয়া পড়িল, ঠোঁট দুইটা চিবুক পর্যন্ত বাঁকিয়া গেল।

আবার উভয়েই নীরব, রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে। একটা গাই রাস্তার ধারে পতিত জমিতে লম্বা দড়িতে বাঁধা, ঘাস খাইতেছিল। জানি না, পুলিন কোন কৌতুকে চট করিয়া বাঁ হাতের দুইটা আঙুলে গাইটার পিঠটা টিপিয়া ঘড়-ড-ঘোঁৎ শব্দে নাসিকা গর্জন করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে গাইটাও মাথা নাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল।

পুলিন সলম্ফে হাত দুই সরিয়া আসিয়া কহিল—মাইরি, কি ত্যাজ রে! আমার বউটাও ঠিক এমনই, মাথা নেড়েই আছে।

পুলিনচন্দ্রের এক দেহশ্রী ভিন্ন আর কিছুই প্রশংসা করিবার মত ছিল না। তাহার দেহখানি সুন্দর, দীর্ঘ আকার, সবল দেহ, বর্ণ গৌর, কোঁকড়া চুল,

আর সর্বাঙ্গ বেড়িয়া বেশ একটি মিষ্ট লাবণ্য। এ ছাড়া আর কোনো গুণই ছিল না। বুদ্ধির খ্যাতি তো কোনো কালেই নাই, বাল্যকালেই পাঠশালায় গুরুমহাশয়, 'এক পয়সায় তিনটে আম, তা তিনটে আমের কত দাম' ঝাড়া তিনটি ঘণ্টাতেও বুঝাইতে না পারিয়া নিজেই তাহার বই-দপ্তর গুছাইয়া বগলে পুরিয়া দিয়া কহিয়াছিলেন—বাবা, শুভঙ্কর যে এ জন্মে বৈরাগী-কুলে জন্ম নিয়ে হিসেবে পর্যন্ত বৈরাগ্য করেছেন, তা জানতাম না। তোমায় পড়ানো আমার কর্ম নয়।

ইহার পর সে ছিল যেন মূর্তিমান বে-তাল।

মজলিশে হয়ত লঙ্কাকাণ্ডের মত ভীষণ গম্ভীর আলোচনা চলিতেছে, বুড়া জাম্বুবান হয়ত মন্ত্রণা দিতেছে, মজলিশসুদ্ধ লোক স্তম্ভিত, নিস্তব্ধ। সহসা সেখানে পুলিনচন্দ্র যেন কৌতুকের কাতুকুতুতে গুলগুল করিয়া হাসিয়া উঠে—হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ, এ মাইরি আমার খুড়োকে লিখেছে, তেমুণ্ডে বুড়ো—ইয়া চুল দাড়ি, ঠিক ঠিক, জাম্বুবান, জাম্বুবান—হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ!

আবার হয়ত হনুভানুর মিতালীর রঙ্গে মজলিশ তো মজলিশ, দেবগণ পর্যন্ত হাসিয়া আকুল, সেখানে পুলিন বিস্ময়ে হতবাক, চক্ষু দুইটা ছানা-বড়ার মত বিস্ফারিত, পাশের লোককে বলে—কি মাইরি যে হাসিস, তার ঠিক নাই।—তারপর সোৎসাহে বাহবা দেয়—বলিহারি বাপ হনু! বাবুদের প্যায়দার চেয়েও তুমি জিন্দে পালোয়ান।

গ্রন্থকারও বাদ যান না, পুলিন কহে—বইটার কিন্তু ভারি চহট মাইরি, এ একেবারে অবাক-জলপান লাগিয়ে দিয়েছে!

আবার রাবণ-বধে, সীতা-উদ্ধারে আনন্দিত শ্রোতৃমণ্ডলী আবেগে জয়ধ্বনি করিয়া উঠে। বিচিত্র পুলিন, বিচিত্র তাহার রসবোধ, সে সজল চক্ষে বলে, আহা-হা, এতগুলো বেধবা হল, আহা-হা!

আবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যগ্র অনুসন্ধানে কহে—আচ্ছা, লঙ্কায় তাহলে মাছের সের কত করে হল? এক পয়সা, না দু পয়সা? তা লেখে নাই?

লোকে তাই বুদ্ধিহীনের উপর রঙ চড়াইয়া কহে, ক্ষ্যাপা।

পুলিন রাগে না, হাস্যমুখে উত্তর দেয়—অঁ্যা!

রাগে একজন, আর লজ্জায় দুঃখে মরিয়া যায় আর একজন। দুইজনের প্রথমটি পুলিনের স্ত্রী, বয়স আঠার-উনিশ, গোলগাল আঁটসাঁট দেহ, নাম গোপিনী।

কিন্তু পুলিন কহে, সাপিনী। পুলিনের নির্বুদ্ধিতার লজ্জার খোঁচায়

গোপিনী রাগে, সাপিনীর মতই গর্জায়। কথাগুলিও বাহির হয় সাপিনীর জিহ্বার মতই লকলকে তীক্ষ্ণ ভয়াবহ। নির্বোধ, সর্বজনের হাস্যাস্পদ স্বামীর ঘরে শত লজ্জার মধ্যেও সান্ত্বনার একটি আশ্রয় গোপিনীর মিলিয়াছিল, সে ওই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি, যে পুলিনের জন্য লজ্জায় দুঃখে মরমে মরিয়া থাকিত; সে পুলিনের বৃদ্ধ খুড়া রামদাস মোহান্ত, যাহার সহিত পুলিন জাম্বুবানের সাদৃশ্য দেখিতে পায়।

রামদাসের অবস্থা বেশ ভালোই, মোটা জোতজমা, উঠানে বড় বড় মরাই, ঘরে দুগ্ধবতী গাভী, গ্রামে দু-দশ টাকার তেজারতি।

তবে তাহার চেহারাটা আজ শুধু চুল-দাড়ির জন্যই নয়, চিরকালই কেমন বেয়াড়া বিশ্রী; তাই যৌবনে যখন সে শ্রীমতীকে লইয়া পরম আগ্রহে সংসার পাতিয়াছিল, তখন শ্রীমতী রামদাসের ওই বদ চেহারার জন্যই নাকি তাহার পাতানো সংসারে লাথি মারিয়া কোথায় একদিন উধাও হইয়া গিয়াছিল।

গৃহী-বৈরাগীর বংশধর রামদাস শ্রীমতীর সন্ধানে হরেক রকম তালি দেওয়া আলখাল্লা পরিয়া ঝোলা কাঁধে ভবঘুরে ভিখারী বৈরাগী সাজিল, শোকে সংসারকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল, কিন্তু সংসার তাহাকে ছাড়িল না।

শ্রীমতীর সন্ধান মিলিল না, কিন্তু তাহার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে কোন দিন শ্রী আসিয়া প্রবেশ করিয়া তাহাকে সংসারের দিকে ফিরাইল; তখন ভিক্ষার সঞ্চয়েই তাহার তিনশ টাকা পুঁজি, আর বাড়ির জোতজমার ধান ঠিকাদার-ভাগদারের কাছে বেশ মোটা হইয়া জমিয়াছিল। শ্রীমতীর অভাবে রামদাস শ্রীকে লইয়া বেশ আঁটালো করিয়া সংসার বাঁধিল।

পাঁচজনে কহিল—মোহান্ত, এইবার ভালো করে সংসার পাত, একটি ভালো দেখে বোষ্টমী—

রামদাস কহিল—রাধে রাধে, ও কথা ছাড়ান দাও দাদা। রাধারানী আমার মনেই ভালো, ধ্যানেই সোজা, বাইরে বেজায় বেঁকা। বেঁকা রায়ের লাঞ্ছনাটাই দেখ না! জয় রাধে, শ্রীমতী শ্রীমতী!

কে একজন স্ত্রী-জাতির কি একটা নিন্দা করিল, মোহান্ত মাথা নাড়িয়া জিব কাটিয়া সবিনয়ে প্রতিবাদ করিল—রাধে রাধে, ও কথা বলো না, বলতে নাই। শ্রীমতীর জাত, ওরা সবাই ভালো।

একজন ঠোঁট-কাটা কঠোর রসিকতা করিয়া ফেলিল—তা তোমার শ্রীমতী—

মোহান্ত হাসিয়া কহিল—বললাম যে দাদা—শ্রীমতীর জাত ওরা, সুন্দর নিয়েই যে কারবার ওদের। অসুন্দরকে কে কবে পছন্দ করে দাদা?

এই সময় রামদাসের বড় ভাই শ্যামদাস বছর আষ্টেকের ফুটফুটে মাতৃহীন পুলিনকে রাখিয়া মারা গেল। রামদাস পুলিনকে বুকে করিয়া 'না বিইয়াই শ্যামের মা' হইয়া উঠিল।

সুন্দর পুলিন বড় হইল। বৈষ্ণবের ছেলে, কীর্তনের আখড়ায় খোল করতাল ছাড়িয়া লাঠির আখড়ায় লাঠি ধরিতে শিখিল। বলা সঙ্গী হইল, গাঁজা ধরিল। রামদাস শাসন করিতে পারিল না, শুধু দুঃখই করিল; তবু মনে মনে নিজেই সান্ত্বনা খুঁজিয়া লইল, বেশ একটি গোছালো বউ আসিলেই পুলিন মানুষ হইবে, বোকা বুদ্ধিমান হইবে, ঘর বুঝিবে, না-বুঝে-ঘর ঘাড়ে চাপিয়া পরিচয় করিয়া লইবে।

রামদাস পুলিনের জন্য পাত্রী খুঁজিতে লাগিল।

সৌরভী বৈষ্ণবী আসিয়া কহিল—মোহান্ত, তা আমার মঞ্জরীর সঙ্গে পুলিনের বিয়ে দাও না কেন? ছেলেবেলার সাথী দুটি, ভাবও খুব—

রামদাস কহিল—রাধে রাধে, তা যে হয় না সৌরভী, আমরা হলাম জাত-বোষ্টম, আর তোমরা ভেকধারী।

সৌরভী ছিল ধোপার মেয়ে, ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছে। তাহার মেয়ের সঙ্গে ভাইপোর বিবাহ দিতে রামদাসের রুচি হইল না। না হইলে সৌরভীর মেয়ে মঞ্জরী বেশ সুশ্রী, বেশ নজরে-ধরা মেয়ে। তবে একটু রসোচ্ছলা, যাকে বলে 'ডগমগ' ভাব, সেই ভাবে সে চঞ্চল। চলিতে তাহার দেহে হিল্লোল খেলিয়া যায়, কথা বলিতে হাসি উপছিয়া পড়ে। হাসিতে নিটোল গালে টোল পড়ে, সে গ্রীবাটি ঈষৎ বাঁকাইয়া দাঁড়ায়; নাকে রসকলি কাটে, চূড়া বাঁধিয়া চুল বাঁধে, কথার ধরনটাও তাহার কেমন বাঁকা। লোকে কত কি বলে, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না। নদীর বুকে লোহার চিরেও দাগ আঁকে না, স্রোতও বন্ধ হয় না।

মঞ্জরী পুলিনের চেয়ে বছর চারেকের ছোট, বাল্যসাথী। দুইজনের ভাবও খুব। পুলিন সময়ে অসময়ে মঞ্জরীদের বাড়ি যায়, মঞ্জরী সাদরে অভ্যর্থনা করে, মুখে দীপ্তি ফুটিয়া উঠে, রসোচ্ছলা আরও উচ্ছল হইয়া উঠে।

পুলিন বলে—কি হে রসকলি, করছ কি?

দুইজনে 'রসকলি' পাতাইয়াছে।

মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া সুরে বলে—

তোমায় আঁকছি হে অঙ্গে যতন করে।

পুলিন এ কথার উত্তর খুঁজিয়া পায় না।

অভাব-অভিযোগে কতদিন মঞ্জরীর মা সৌরভী আসিয়া কহে—দেখ লো মঞ্জরী, দুটো টাকা কারু কাছে পাওয়া যায় কি না, নইলে তোর খাড়ুটা বাঁধা দিতে হবে।

মঞ্জরী বলে—খাড়ু আমি বাধা দেব না রসকলি। তুমি টাকা এনে দাও।

পুলিন শশব্যস্তে বলে—সে কি রসকলির মা, খাড়ু বাঁধা দেবে কি! আমি টাকা এনে দিই।

সৌরভী আপত্তি করিলে মঞ্জরী কহে—কেন, রসকলি কি আমার পর?

খুড়ার তহবিল সন্ধান করিয়া না পাইলে চাউল বিক্রয় করিয়া সে টাকা আনিয়া দেয়।

আবার মঞ্জরী কখনও কখনও পুলিনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে—না, তুমি দিতে পাবে না, ও মায়ের চালাকি।

মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া হয়, পুলিন ব্যস্ত হইয়া উঠে, কিন্তু মঞ্জরী কহে—খবরদার আড়ি করব।

দশ বছর বয়সেই মঞ্জরীর একবার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু পাত্রটিকে মঞ্জরীর পছন্দ হয় নাই, তাই তাহাকে সে নাকচ করিয়া দিয়াছে। সে বেচারী বহুবার মঞ্জরীর জন্য হাঁটাহাঁটি করিয়া শেষে অন্যত্র বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছে। মঞ্জরীকে ছাড়পত্র করিয়াছে।

নানা কারণে রামদাস সৌরভীকে প্রত্যাখ্যান করিল।

রামদাস সৌরভীকে ফিরাইয়া দিল। সৌরভীও ঘরে গিয়া পুলিনকে ফিরাইয়া দিল, কহিল—বাবা, মেয়ের আমার সোমত্ত বয়েস, তুমি আর এস না। একেই তো পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে। মনে ভেবেছিলাম, তোমরা দুটি ছেলেবয়সের সাথী, দু-হাত এক করে দিয়ে দেখে চোখ জুড়োব, তোমার কাকা তা দেবে না। আমাকে তো আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে!

কথাটা পুলিনের বড় বাজিল, সে দুইদিন খাইল না, শুইল না, মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইল।

রামদাস শেষে রাজী হইল—বেশ, মঞ্জরীর সঙ্গেই পুলিনের বিবাহ হোক।

সময়টা হোলির, রামদাস শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবে। তাই স্থির হইল যে, রামদাস ফিরিলে বিবাহ হইবে।

কিন্তু উপরওয়ালার অভিপ্রায় অন্যরূপ।

শ্রীধামে সহসা একদিন রামদাসের সঙ্গে হারানো শ্রীমতীর দেখা হইয়া গেল। শ্রীমতী তখন গাছতলায় কলেরায় ছটফট করিতেছে, পাশে

বারো-তেরো বছরের মেয়ে গোপিনী বসিয়া বসিয়া অঝোর-ঝরে কাঁদিতেছিল।

স্ত্রীলোকটির কাতরানিতে আর বালিকাটির কান্নায় দয়াপরবশ হইয়া রামদাস সাহায্যে অগ্রসর হইয়া রোগিণীর পাশে বসিল, ক্ষণেক তাহার মুখপানে চাহিয়া সাগ্রহে ডাকিল—শ্রীমতী!

রোগ যন্ত্রণায় কাতর শ্রীমতী রামদাসের মুখপানে চাহিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, রামদাস উত্তরীয়-প্রান্ত দিয়া চোখ মুছাইয়া দিল। শ্রীমতী তাহার পা দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল—আমার যাবার সময় পায়ের ধুলো দাও। আর এই মেয়েটিকে নাও। বড় ভালো মেয়ে, মায়ের মত নয়, পাব তো পুলিনের সঙ্গে বিয়ে দিও। ভয় নেই অজাতের মেয়ে নয়। সেই যে, বাউল প্রেমদাসকে মনে পড়ে? সেও জাত-বোষ্টম, তারই মেয়ে।

রামদাস কাতর কণ্ঠে কহিল—শ্রীমতী, রাধারানী আমি যে তোমার তরে আজও শূন্য ঘর বেঁধে বসে আছি।

শ্রীমতী সে কথার কোনো উত্তর দিল না, শুধু কন্যা গোপিনীকে কহিল—মা, এই তোর বাপ, এর সঙ্গে যা, আমার চেয়েও আদরে রাখবে। আর একটা কথা গোপিনী, কখনও যেন স্বামী ছাড়িস নি; হই বোষ্টম, থাকুক নিয়ম, তবু ওতে সুখ নেই।

শ্রীমতীকে বৃন্দাবনে বিসর্জন দিয়া গোপিনীকে লইয়া রামদাস বাড়ি ফিরিল।

সৌরভীকে ডাকিয়া পঞ্চাশ, একশ, শেষে দুইশটি টাকা হাতে দিয়া কহিল—সৌরভী, আমায় বাক্যি থেকে খালাস দাও।

একমুঠা টাকা খুঁটে বাঁধিয়া সৌরভী হাসিমুখেই বাড়ি ফিরিল।

সৌরভী মঞ্জরীর জন্য পাত্র ঠিক করিল, কিন্তু মঞ্জরী কহিল—না।

মা শেষে রাগ করিয়া রামদাসের টাকা লইয়া বৃন্দাবন চলিয়া গেল।

মঞ্জরী দিন দুই কাঁদিল; তারপর আবার উঠিল, ক্রমে হাসিল, রসকলি কাটিল, কিন্তু বিবাহ করিল না।

এদিকে পুলিনের সঙ্গে গোপিনীর বিবাহ হইয়া গেল। পুলিন যেন মঞ্জরীর নেশা ভুলিল। সে দিন-রাত্রি ঘরেই থাকে, বাড়ির বাহির হয় না, দেখিয়া রামদাস সুখে হাসিল। মঞ্জরী দুই-চারিদিন পুলিনের অপেক্ষা করিয়া শেষে একদিন চূড়া করিয়া চুল বাঁধিয়া, নাকে রসকলি কাটিয়া, পান

চিবাইতে চিবাইতে রামদাসের বাড়িতে আসিয়া উঠিল। রামদাস তখন বাড়িতে ছিল না; উঠানে দাঁড়াইয়া মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া ঘরের রুদ্ধদ্বারকে উদ্দেশ করিয়াই বলিল—কই হে রসকলি, বউ দেখাও হে!

পুলিন ঘরের ভিতর গোপিনীর সহিত কথা কহিতেছিল, মঞ্জরীর আওয়াজ পাইয়া অন্য দুয়ার দিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। গোপিনী নতমুখে ঘরের মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল। মঞ্জরী ঘরে ঢুকিয়া গোপিনীর ঘোমটা তুলিয়া দেখিয়া ঠোঁটের আগায় পিচ কাটিয়া কহিল—তুমি বউ?

গোপিনী মুখ তুলিয়া চাহিল।

মঞ্জরী আবার কহিল—তা হ্যাঁ বউ, রসকলির তোমাকে পছন্দ হয়েছে?

গোপিনী এবার কথা কহিল, যেন চিমটি কাটিয়া কহিল—না।

মঞ্জরী বলিল—বাঃ, এই যে পাখি পড়ে বেশ। তা হ্যাঁ বউ, কেন পছন্দ হয় নি, কিছু জেনেছ?

গোপিনী সেই চিমটি কাটার মতই কহিল—রসকলি কাটতে জানি না কিনা, তাই।

মঞ্জরী সব বুঝিল, এবার সে হাসিয়া বিস্ময়ের ভঙ্গিতে গালে হাত দিয়া কহিল—ওমা, তাই নাকি? তা আমার কাছে রসকলি কাটা শিখবে বউ?

গোপিনী কহিল—শেখাবে? দেখো, ঠিক তোমার মতনটি হওয়া চাই।

মঞ্জরী কহিল—তাই শেখাব, কিন্তু ধৈরয ধরে থাকা চাই। পারবে তো?

গোপিনী কহিল—পারব, কিন্তু তোমার সময় হবে তো? বলি, আসবে কখন? রসময়রা ছাড়বে তো?

মঞ্জরী এবার ঠেকার দিয়া কহিল—আমার রসময়রা নয় অসময়ে এসে সময় দেবে। তোমার রসময় যে একদণ্ড ছাড়ে না দেখি!

গোপিনী কহিল—ও দুদিন, এখন নতুন নতুন নালতের শাক হে, তারপর বুড়ো গরু ঠিক দামে গিয়ে পড়বে, ভয় নাই।

মঞ্জরী একটু ঝঙ্কার দিয়া কহিল—তা ভাই, বুড়ো গরু বেঁধে রাখলেই হয়! যার দড়ি নাই, তার আবার গরু পোষার শখ কেন?

গোপিনীও এবার একটু ঝঙ্কার দিয়া কহিল—ঘোড়া হলে কি চাবুকের অভাব হয় হে, তা হয় না। যখন গরু পুষেছি, তখন দড়ি কি না জুটবে? বলি পরনের কাপড়ে আঁচল তো আছে, তাতেই বাঁধব।

মঞ্জরী হাসিয়া কহিল—যদি ছিঁড়ে পালিয়ে যায়?

গোপিনী কহিল—ইস, সাধ্যি কি!

মঞ্জরী কহিল—দেখো।

গোপিনী সেই দম্ভভরেই কহিল—তখন না হয় ছেঁড়া আঁচল গলায় দিয়ে ঝুলব হে, তা বলে জ্যান্তে তো আর ভাগাড়ে দিতে পারি না!

ইহার পর মঞ্জরী আর কথা কহিল না, আচমকাই যেন বাড়ি ফিরিল, তখন মুখখানায় হাসি ছিল না, যেন থমথমে জলভরা মেঘ।

পরদিন হইতে রসকলির বাড়িতে পুলিনের আদর যেন বাড়িয়া গেল। লোক পাঠাইয়া পুলিনকে আনাইল, তাহার লজ্জা ভাঙিয়া গেল। এখন আর পুলিনের গাঁজার আড্ডায় মঞ্জরী ঝঙ্কার দেয় না। সঙ্গী বলাকে দেখিয়া বিরক্ত হয় না। এখন কথায় কথায় মঞ্জরী যেন ঢলিয়া পড়ে। পান দেয়। পুলিন আবার বাড়ি ছাড়িল, পূর্বের চেয়ে যেন বেশি শক্ত করিয়া মঞ্জরীর বাড়িতে আড্ডা গাড়িল।

মঞ্জরী মাঝে মাঝে আবার এও বলে—রসকলি, এ তো ভালো কাজ হচ্ছে না।

পুলিন হোঁতকার মত কহে—কি?

মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া বলে—এই, আমার বাড়িতে এমন করে চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে থাকা।

পুলিন তেমন ভাবেই বলে—কেন?

মঞ্জরী সুর করিয়া গান ধরে—

'পাঁচ সিকের বোষ্টুমি তোমার,
ওহে, গোসা করেছে, গোসা করেছে।'

পুলিন কহে—ধ্যেৎ।

গোপিনী সত্য সত্যই রাগ করিল, কিন্তু ভাঙায় কে? যাহার উপর মান, সেই যে মানের মুখে ছাই দিয়া দিল। সে খাবার সময় আসে, দুইটা খায় দেশের দশের হাস্যাস্পদ হইয়া ফেরে, মঞ্জরীর বাড়ি আড্ডা জমায়, ঘরের পয়সা পর্যন্ত মঞ্জরীর ঘরে তুলিয়া দিয়া আসে। মঞ্জরীর নাকি সোনার নথ হইতেছে, গোপিনী জ্বলিয়া গেল। পুলিন যে দুই-চারিটা কথা গোপিনীর সহিত কয়, তাহা পর্যন্ত মঞ্জরী-বিশোভিত। সেদিন রাত্রে কথায় কথায় নির্বোধ কহিল—রসকলি তোমার কি নাম দিয়েছে জান গা? গোপিনী নয়, সাপিনী। তা সত্যি, সবেতেই তোমার ফোঁস।

গোপিনী একটা জ্বলন্ত অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ হানিয়া ছুটিয়া পলাইল। রাত্রি

দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বাহিরে কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল, সে বলিয়াছিল, যদি আঁচল ছেঁড়ে, তবে ছেঁড়া আঁচল গলায় দিয়া ঝুলিবে। উদ্‌ভ্রান্ত ব্যথাহত নারী সত্যই আঁচল ছিঁড়িয়া দড়ি পাকাইতে বসিল। ঘরে পুলিন তখন অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে, বুঝি বা রসকলিকে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া বৃদ্ধ মোহান্ত বাহির হইল, শ্বেতবস্ত্রা গোপিনীকে দেখিয়া চমকিয়া কহিল—কে? কে? এ কি মা! বাইরে কেন, মা আমার?

গোপিনী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বৃদ্ধের স্নেহস্পর্শে তাহার হাতের পাকানো আঁচল এলাইয়া খুলিয়া গেল।

মোহান্ত গোপিনীকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া কহিল—মা, বুড়ো ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ধৈর্য ধর, মা আমার, আমি আশীর্বাদ করছি—ভালো হবে, ভালো হবে তোর।

পুলিনের ব্যবহারে শান্ত স্নেহ-দুর্বল বৃদ্ধ মরমে মরিয়া গেল। কঠোর হইতে চেষ্টা করিল, পয়সায় টান দিল, কথা বন্ধ করিল, কিন্তু তবুও যে পুলিন, সেই পুলিনই রহিয়া গেল। অন্ধের কিবা রাত্রি, কিবা দিন!

শুধু রসকলির বাড়িতে বসিয়া বলার সহিত খুড়ার আয়ুর দিন গণনা করিতে লাগিল।

রামদাস কিন্তু বাঁচিতে চাহিয়াছিল, মরমে মরিয়াও গোপিনীর জন্য বাঁচিতে চাহিত। সর্বদা তাহার ভাবনা হইত, সে মরিলে গোপিনীর দশা কি হইবে?

কিন্তু মানুষ অমর নয়, মরণের পরোয়ানা সঙ্গে লইয়াই জন্ম লওয়া। সহসা একদিন রামদাসের তলব আসিল। মোহান্তের বয়স হইয়াছিল, হাঁপানি ছিল। হঠাৎ একদিন হাঁপানি মৃত্যুর মূর্তিতে বুকে চাপিয়া বসিল।

গোপিনী চোখের জলে বুক ভাসাইয়া সেবা করিতে বসিল। পাড়া-পড়শী আসিয়া জমিল। মোহান্ত যেন কাহার অনুসন্ধান করিতেছিল, কিন্তু সে তখন পাল-পুকুরের ঘাটে বসিয়া 'ব্যাং ছুড়ছুড়ি' খেলিতেছিল।

পাড়া-পড়শী ভিড় জমাইয়া বসিয়া আছে, কেহ বলে—মোহান্ত, হরি বল, বল—জয় রাধারানী!

রাধারানীর জয়গানে চিরমুখরকণ্ঠচারণ কিন্তু আজ এ সময়ে রাধারানীর

ধ্যান করিতে পারিল না। মৃগমায়াচ্ছন্ন রাজা ভরতের মত শুধু বলিল—মা গোপিনী, কিছু করতে পারলাম না মা।

গোপিনী শেষে আছাড় খাইয়া পড়িল। হায়, তাহার নীড় যে ভাঙিয়া যায়! ভ্রষ্টনীড় বিহঙ্গিনীর ক্রন্দন ছাড়া আর উপায় কি? পাড়ার মেয়েরা দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু কেহ এই গোপিনীকে ধরিতে সাহস করিল না। বুড়া রোগী, কখন শেষ নিশ্বাস পড়িবে, খাবি খাইয়া মরিবার নোটিসও হয়ত দিবে না। মড়া ছুঁইয়া কে অশুচি হইবে!

ধরিল শেষে একজন। সে মঞ্জরী।

মঞ্জরী আসিয়াই শোকবিহ্বলা গোপিনীকে ধরিল। কহিল—ভয় কি?

মুমূর্ষু মোহান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া টানিয়া টানিয়া কহিল—গ্রামের পাঁচজন আছেন, আমার শেষ ইচ্ছা বলে যাই।—আমার স্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হল গোপিনী। আর সকলের কাছে এই ভিক্ষে, ছেলেটাকে যেন ওই বেশ্যের হাত হতে বাঁচিও।

কথাটায় সকলের চক্ষু গিয়া পড়িল মঞ্জরীর উপর। সকলেই ভাবিতেছিল, সে কি করিয়া বসে, সে কি করিয়া বসে! কিন্তু মঞ্জরী গোপিনীর এলানো দেহখানি পরম সান্ত্বনাভরে জড়াইয়া বসিয়াছিল, বসিয়াই রহিল, চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

মোহান্ত যখন কথাটা আরম্ভ করে, তখনই বলার সঙ্গে পুলিন আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সেও কথাটা শুনিল।

কথাটা আজ তাহাকে প্রথম আঘাত দিল, মান-অপমানের স্বাদ আজ সে বুঝি প্রথম বুঝিল।

লোকে তখন মোহান্তের শেষ ইচ্ছার সমালোচনায় ব্যস্ত। পুলিন দাওয়া হইতে নামিয়া পড়িল, কেহ লক্ষ্য করিল না; কিন্তু মঞ্জরী ডাকিল—যাচ্ছ কোথা?

পুলিন কহিল—আর এ বাড়িতে নয়।

মঞ্জরী কহিল—ছিঃ, এই কি রাগের সময়? এস, খুড়োর মুখে জল দাও, কানে নাম শোনাও।

পাড়াসুদ্ধ লোক এই বেহায়া মেয়েটার সীমাহীন নির্লজ্জতায় অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মেয়েরা গালে হাত দিল। পুলিনও মঞ্জরীর মুখপানে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে খুড়ার শিয়রে বসিয়া মুখে গঙ্গাজল দিল, ডাকিয়া কহিল—বল কাকা, জয় রাধারানী!

বৃদ্ধ কহিল—জয় রাধারানী! দয়া কর মা, অনাথিনী দুঃখিনীকে দয়া কর মা!

বেলা আড়াই প্রহরের সময় রামদাস মরিল, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইতে রাত্রি এক প্রহর হইয়া গেল।

তখন মঞ্জরী গোপিনীকে কহিল—তবে আমি আসি।

গোপিনী বলিল—এস।

মঞ্জরী চারিদিক চাহিয়া সরলভাবেই কহিল—কত্তা কই? একাটি থাকতে ভয় করবে না তো?

গোপিনীর মনে হইল, মঞ্জরী বুঝি তাহাকে ঠাট্টা করিল। সে উত্তর করিল—আসা যাওয়াই যখন একা, তখন একা থাকতে ভয় করলে চলবে কেন? আর একাই তো থাকা এক রকম।

মঞ্জরী কথাটা গায়ে না লইয়া কহিল—আমি কিন্তু ভাই, একা থাকতে পারতাম না।

গোপিনী কহিল—আমি হলে একা থাকতে যদি না পারতাম, গলায় দড়ি দিতাম, তবু—

মঞ্জরী এবার একটু ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল—বালাই ষাট, মরব কেন? আসি ভাই, কিন্তু রসকলি গেল কোথা?

গোপিনী ক্ষিপ্তের মত কহিল—রসকলি নাকেই আছে, ঘরে গিয়ে আয়না নিয়ে দেখ, পোড়ামুখের ওপরেই ঝলমল করছে।

মঞ্জরী এই আকস্মিক আঘাতে যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল। বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়াও কিন্তু শেষটা উত্তরের বেলায় বলিয়া ফেলিল—রসকলি তো নিজের নাকেই থাকে বউ, এ যে কেড়ে নেওয়া যায় না! তা তুমি যদি চাও তো, না হয় দেবার চেষ্টা করি।

গোপিনী ফোঁস করিয়া বলিয়া দিল—কি বললে তুমি? তোমার কাছ থেকে ভিক্ষে আমি চাই নে, চাই নে। যাও তুমি, যাও।

কথাগুলি ক্রুদ্ধ এক-নিশ্বাসে বলিয়াই সে ঘরে ঢুকিয়া মঞ্জরীর মুখের উপরেই দরজাটা দড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

মঞ্জরী ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিল, বুকের ভিতর তাহার যেন আগুন জ্বলিতেছিল। সাপিনীর এত বিষ! আপনার বিষে হতভাগিনী আপনি জর্জর হইয়া মরুক।

আপন বাড়ি ঢুকিতেই মঞ্জরী দেখিল, পুলিন তাহার দাওয়ার উপর বসিয়া।

মঞ্জরীর দেহ ব্যাপিয়া একটা হিল্লোল বহিয়া গেল। হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল।

পুলিন উঠিয়া কহিল—রসকলি!

মঞ্জরী হাসিয়া উত্তর দিল—বস, বলি।

পুলিন বসিল।

ঘরের তালা খুলিতে খুলিতে মঞ্জরী বলিল—রসকলি, তুমি ভাই সোনা-কপালে পুরুষ। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন।

পুলিন খুব রাগিয়াই কহিল—ও ধন আমার ভাদ্দর-বউ, ছুঁতে পাপ।

মঞ্জরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিল—আর বউটি? কি গো, চুপ করে রইলে যে? উত্তর দিতে পারলে না? আচ্ছা, আমিই বলে দিই, সে তোমার গলার মালা, ঠোঁটের হাসি।

পুলিন কহিল—না রসকলি, হল না, সে আমার গলার ফাঁসি। ঠাট্টা নয় রসকলি, একটা কথা তোমায় বলতে এসেছি, আমি কাল থেকে নিজের বাড়িতে যাব। ও বাড়িতে আর থাকব না।

নিজের বাড়ি অর্থে পুলিনের পৈতৃক বাড়ি। বাস্তব চক্ষে বাড়িটি একটি মূর্তিমন্ত বিভীষিকা, কিন্তু কল্পনায় বাড়িটি বেশ, অর্থাৎ উঠান-ভরা বনফুল, প্রাচীর ভাঙিয়া সীমা অসীমে মিশিয়াছে, ঘরের ভিতরেও চাঁদের আলো খেলে।

মঞ্জরী কহিল—বেশ, তা ভালো, তারপর খাবে কি করে?

পুলিন চট করিয়াই কহিল—বোষ্টমের ছেলে ভিক্ষে করে খাব।

মঞ্জরী কহিল—আরও ভালো; কিন্তু ভিক্ষেতে মেলে তো চাল, তা রাঁধবে কে? বউকে নিয়ে যাও।

পুলিন প্রবল প্রতিবাদে মাথা নাড়িয়া কহিল—না।

মঞ্জরী কহিল—কেন? আর, তুমি না বললেও সে যদি না ছাড়ে?

পুলিন কহিল—ছাড়বে না? মারের চোটে ভূত ছাড়ে, তা জান? হুঁ হুঁ কথায় আছে, পড়লে পরে দুধু ভাতু, না পড়লে ঠেঙার গুঁতু।

মঞ্জরী কহিল—বেশ। রসকলি আমার বলে ভালো, এ যেন সেই ও পারেতে ধান পেকেছে লম্বা লম্বা শীষ, টুকুস করে মরে গেল লঙ্কার রাবণ। তা যেন হল, আজ রাত্রের মত তো বাড়ি যাও।

পুলিন বলিল—না, আর নয়।

মঞ্জরী পরিহাস-ছলেই কহিল—তবে আজ রাতটা পাল-পুকুরের বটগাছেই কাটাবে নাকি?

পুলিন কহিল—না, তোমার দাওয়াতেই পড়ে থাকব।

মঞ্জরী হাসিল। দুই আর দুইয়ে চার হয়—এ কথাটা যে বুঝে না, সে চারের গুরুত্ব না বুঝিলে তাহার উপর রাগ করিয়া লাভ কি?

তবু সে বলিল—লোকে বলবে কি?

পুলিন বাহির-দরজার দিকে ফিরিল।

মঞ্জরী কহিল—যাও কোথা?

পুলিন কহিল—দেখি কোথাও—

মঞ্জরী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—যেতে হবে না, এস, শোবে এস।

পুলিন ব্যস্ত হইয়া বলিল—না না, লোকে বলবে কি?

মঞ্জরী কহিল—যা বলবার তারা তো বলেই নিয়েছে, আবার বলবে কি? শোন নি, আজই তোমার কাকা বললে, ওই—

পুলিন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল—তোমার পায়ে ধরি রসকলি, ছি, ও কথা তুমি বলো না।

মঞ্জরী হাসিয়া মৃদুস্বরে গান ধরিল—

'লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী,
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী।'

পুলিন তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল। স্পর্শে তাহার সে কি উত্তাপ! মঞ্জরী মৃদু আকর্ষণে হাতখানি ছাড়াইয়া শান্ত মধুর কণ্ঠে কহিল—ছাড়, বিছানা করি।

তকতকে ঘরখানি, লাল মাটি দিয়া নিকানো, আলপনার বিচিত্র ছাঁদে চিত্রিত; দেওয়ালে খান-কয়েক পট—সেই পুরানো গোরাচাঁদ, জগন্নাথ, যুগল-মিলন; সবগুলির পায়ে চন্দনের চিহ্ন। মেঝের উপর একখানি তক্তাপোশ, এক দিকে পরিষ্কার বেদীর উপর ঝকঝকে বাসনগুলি সাজানো।

তক্তাপোশের উপর গুটানো বিছানা বিছাইয়া দিয়া একটি ছোট চৌকির উপর রক্ষিত তোলা বিছানার গাদা হইতে দেখিয়া দেখিয়া একখানা সিজুনি আনিয়া পুরাতন বিছানার উপর বিছাইয়া দিল। সিজুনিটি মঞ্জরীর নিজের হাতে অতি যত্নে প্রস্তুত, চারুশিল্পের অপরূপ ছাঁদে বিচিত্রিত। বিছানাটি বেশ করিয়া কয়বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া ডাকিল—এস।

পুলিন ঘরে আসিয়া তক্তাপোশে বসিল। দেখিল, মঞ্জরী অভ্যাসমত ঈষৎ বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া। সেই হাসি সেই সব; শুধু দৃষ্টিটুকু নূতন। সে তখন মুগ্ধ, আবিষ্ট, একাগ্র।

পুলিন কথা কহিল, ভাবটা গদ্‌গদ, কিন্তু সঙ্কুচিত—রসকলি!

মঞ্জরী চমক ভাঙিয়া কহিল—কি গো?

পুলিন কহিল, তুমি—তুমি—আমার—আমার—আমার—

কথাটা শেষ করিতে পারিল না, প্রতিবারই বাধিয়া যায়, আর পুলিন রাঙা হইয়া উঠে।

মঞ্জরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার—তোমার—তোমার—কি গো?

কৌতুকে গ্রীবা বাঁকাইয়া খানিকক্ষণ পুলিনের নত লজ্জিত মুখের উপর উজ্জ্বল দৃষ্টি হানিয়া সহসা মঞ্জরী তাহার মুখ পুলিনের কানের কাছে লইয়া গিয়া বলিল—আমি তো তোমারই গো।

কথাটা বলিয়াই সে চট করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, চঞ্চল লঘু গতিতে, ছোট ত্বরিতগতি ঝরণাটির মতই। বাহিরে গিয়াই দরজাটা টানিয়া শিকল আঁটিয়া দিল। একরাশ দমকা দখিনা বাতাস আসিয়া যেন পুলিনকে তৃপ্ত করিয়া অন্তরকে দীপ্ত করিয়া আচমকাই চলিয়া গেল।

শিকল টানিয়া দিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে ঢেঁকিশালায় আসিয়া মঞ্জরী আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রিতে পুলিন আসে নাই, বেলা এক প্রহর হইয়া গেল, তবুও দেখা নাই। গোপিনী অপেক্ষায় বসিয়া ছিল, সহসা সে সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিল, স্নান সারিয়া রান্না চড়াইল।

খুট করিয়া শব্দ হইল, ওই বুঝি আসিল! প্রবল অভিমানে ব্যগ্র দৃষ্টিকে রান্নার কড়ায় সে নিবিষ্ট করিল, হাতের খুন্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত অতি-বিক্রমে ঘুরিয়া উঠিল, খন—খন—খন।

এই বুঝি ডাকে, সাপিনী হে!

পোষা বিড়ালটা দাওয়ায় লাফাইয়া উঠিয়া ডাকিল, ম্যাও—ম্যাও—ম্যাও।

আর দৃষ্টি মানিল না, ফিরিল; কিন্তু কই? শূন্য অঙ্গন, ভেজানো হির্দ্বার—মানুষের বার্তা তো দিল না।

হাতের খুন্তিটা সজোরে বিড়ালটার পিঠে হানিয়া গোপিনী গালি পাড়িল, বেরো, বেরো, বেরো, আপদ বেরো।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল, গোপিনীর মনে হইল, বুঝি বা একটা যুগ।

সহসা বহির্দ্বার খুলিয়া বলাই আসিয়া দাওয়ায় বসিল। হাতের হুঁকা টানিতে টানিতে কহিল—শুনেছ মিতেনী, কাল রেতে মিতে যে মঞ্জরীর বাড়িতে—

বলাই পুলিনের মিতে, তাই গোপিনীকে ডাকিত—মিতেনী। গোপিনী ডাকিত—মিতে।

গোপিনী কহিল—শুনি নাই, তবে জানি।

বলাই বলিল—আবার নিজের ঘর সাফ হচ্ছে, সেইখানেই থাকবে, এ বাড়িতে থাকবে না।

একটা লজ্জা ঢাকতে পাঁচটা লজ্জা মাথায় লইতে হয়। গোপিনী কহিল—আমিই যে থাকতে দেব না, সে আমি কাল বলে দিয়েছি, বাড়ি ঢুকলে ঝাঁটার বাড়ি দেব।

বলাই বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল—ও তাই বুঝি এত! আবার মঞ্জরীকে পত্র করবে!

বুকে পাথর চাপা দিলেও মানুষ কাতরাইতে পারে, কিন্তু এই কথাটি এমন স্থানে গোপিনীকে আঘাত করিল যে, সে আর কথা কহিতে পারিল না।

বলাই কহিল—কাল রেতে জমিদার গাঁয়ে এসেছেন, তুমি নালিশ কর।

গোপিনী দীপ্ত প্রতিবাদে কহিল—না।

তারপর উভয়েই নীরব; গোপিনীর হাতের খুন্তি নড়ে না, চোখ কড়ার উপর কিন্তু দৃষ্টি নাই, পলকও পড়ে না।

বলাই মনে মনে কি যেন মকৃশ করিতেছিল, শেষে দালালির ভঙ্গিতে রসান দিয়া কহিল—বেশ বলেছ, সেই ভালো, ও দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভালো।

তারপর আবার হুঁকায় টান পড়িল—ফড়র ফড়র। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল—আমাদের তো ছিঁড়লে মালা গাঁথতে আছে, ভাবনাই বা কি! ভাত থাকলে কি কাকের অভাব হয়, কি বল মিতেনী? আমি রয়েছি, সব ঠিক করে দেব তোমার।

পরিশেষে সম্মতির আশায় মিতেনীর মুখপানে চাহিল।

মিতেনী কোনো কথার উত্তর না দিয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। রান্না পুড়িতে লাগিল।

পুলিন কোদালি হাতে বাড়ি সাফ করিতেছিল। অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়চড় করে, পুলিন ঘামিয়া যেন নাহিয়া উঠিয়াছে। হাত টাটাইয়া উঠিয়াছে, শিরদাঁড়া টনটন করিতেছে, তবু কাজ সারা চাই। স্ত্রীলোকের অন্নদাস, ছিঃ—তার বড় লজ্জা আর কি!

মিতে বলাই আসিয়া কহিল—ভ্যালা রে মিতে, তা ভালো।

পুলিন কোদালি নামাইয়া বলিল—কল্কেতে কিছু আছে? হুঁকো লয়, অশুচ আমার।

বলা কলিকাটা খসাইয়া পুলিনকে দিল। ধুতরো-ফুলি ছাঁদে হাত ফাঁদিয়া পুলিন টান মারিল, হুশ—হুশ—হুশ।

বলাই কহিল—তা এক কাজ করলি না কেন মিতে? জমিদার এসেছেন, তাঁর কাছে কথাটা পাড়লে একবার হত না? তোর হল সোদর খুড়ো, আর ওর সৎবাবা। ওয়ারিশ হলি তুই, ও মাগী সম্পত্তির কে? চল তুই একবার দেখবি, এখুনি তোর সম্পত্তি তোর হবে।

অদ্ভুত পুলিন, বিচিত্র তার সংসার-বোধ, সে কহিল—ওর কি হবে?

বলাই বলিল—তোর বউ—তুই খেতে দিবি।

পুলিন কহিল—না না, আমি যে রসকলিকে—

বলাই সোৎসাহে কহিল—রসকলিকে পত্র করবি, ও মরুকগে—যা মন করুকগে। তোর কি?

সে যে নেহাত আমানুষী হয়, হাজার হউক সে স্ত্রী। মনটা পুলিনের মোচড় দিয়া উঠিল। পূর্বে তাহার সান্ত্বনা ছিল, তাহার প্রাপ্য ধনমূল্যে গোপিনীর নিকট মুক্তি পাইবার হকদার সে।

পুলিন বলিল—না মিতে, তা হয় না।

—যেমন দেবা, তেমনই দেবী!—বলাই বিরক্তভাবে উঠিল, রাস্তা ধরিল জমিদারের কাছারির পানে।

পুলিন ভাঙা দাওয়াটার উপর ভাবিতে বসিল।

জমিদারের পশ্চিমা চাপরাসী আসিয়া ভাঙ্গা কাঁসরের মত খনখন করিয়া কহিল—আরে পুলিয়া, আসো আসো, বাবুর তলব আসে।

পুলিন চমকাইয়া বলিল—ক্যানে ক্যানে, কাহেসে দারোয়ানজী ?

পশ্চিমা কহিল—সো হামি জানে না।

জমিদারের কাছারিতে পুলিন আসিয়া প্রণাম করিল।

বাবু ফরসিতে তামাক টানিতেছিলেন, গোমস্তা কলম পিষিতেছে। কয়জন মাতব্বর এধারে বসিয়া ছিল, আর ওধারে এক পাশে আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সঙ্কুচিতা গোপিনী।

বাবু পুলিনের দিকে চাহিয়া কাছারিকে উদ্দেশ করিয়াই কহিলেন—সে হারামজাদী কই ?

রাখাল পাইক বসিয়া ছিল, কহিল—আজ্ঞে, তিনি চানে গেল, আসছেন।

বাবু পুলিনকে বলিলেন—পুলিন, তোমার খুড়োর সম্পত্তি খারিজ করতে হবে।

পুলিন শশব্যস্তে কহিল—আজ্ঞে, সম্পত্তি আমার নয় ওরই।

জোড়হস্তে অঙ্গুলি-নির্দেশে গোপিনীকে দেখাইয়া দিল।

বাবু কহিলেন—ওই হল—হে ওই হল, স্বামী আর স্ত্রী। মুখ থাকতে নাকে ভাত খায় কে হে ? আর তুমি থাকতে সম্পত্তির ও কে ? ও সম্পত্তি পেলে কি করে ?—কথা কও গো, চুপ করে থাকলে চলবে না।

অগত্যা গোপিনী মৃদু কণ্ঠে বলিল, আজ্ঞে তিনি আমায় দিয়ে গিয়েছেন।

বাবু কহিলেন—তোমাকেই তবে খারিজ করতে হবে, পাঁচশ টাকা লাগবে।

পুলিন বলিল—আজ্ঞে, ও মেয়েমানুষ—

বাবু ধমক দিয়া কহিলেন—তুই থাম বেটা ! বল গো, তুমি বল। আবার চুপ করলে যে, উত্তর দাও, পাঁচশ টাকা চাই আমার।

পথভ্রান্তকে যে পথ দেখাইয়া দেয়, সেই পথেই সে চলে। কিংকর্তব্য-বিমূঢ়া গোপিনী পুলিনের কথা ধরিয়াই বলিল—আজ্ঞে, আমি যে মেয়েমানুষ—

বাবু কহিলেন—আরে, সম্পত্তি তো মেয়েমানুষ নয়। আচ্ছা, না পার, সম্পত্তি তুমি পুলিনকে ছেড়ে দাও।

পুলিন শশব্যস্তে বলিল—আজ্ঞে না।

গেপিনীও বলিল—আজ্ঞে না।

বাবু চটিয়া কহিলেন—আচ্ছা, তবে সম্পত্তি সদরে বাজেয়াপ্ত হবে। আর পুলিন, তুই বেটা ওই মঞ্জরীকে নিয়ে গাঁয়ে ঢলাঢলি করছিস কেন ? ওসব হবে না, পরিবার নিয়েই থাকতে হবে।

অভিমান অনবুঝ, স্থানকাল-জ্ঞান নাই ; পুলিন কিছু না বলিতেই গোপিনী মাথা নাড়িয়া বলিল—না।

প্রতিবাদে বাবু চটিয়া দীপ্ত কণ্ঠে কহিলেন—চোপরাও হারামজাদী ওই পুলিনকে নিয়েই তোকে থাকতে হবে।

গোপিনী আঁতকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঠিক তখনই মঞ্জরী আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল—বাবু, আমায় তলব করেছেন ?

বাবু মুখ ফিরাইয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না। সম্মুখে রসোচ্ছলা মেয়েটি—চূড়ার মত চুল বাঁধা, নাকে রসকলি আঁকা, মুখে মিষ্ট হাসি, গালে দুইটি ঈষৎ টোল। মঞ্জরীকে দেখিয়া ক্ষণেক তাঁহার কথা সরিল না।

মঞ্জরী পুনরায় বলিল—হুজুর !

চমক ভাঙিয়া বাবু কহিলেন—হ্যাঁ, এস।—শুনছ গো, ওসব চলবে না, পুলিনের সঙ্গেই ঘর করতে হবে।

শেষটা কহিলেন গোপনীকে। কথার নির্দেশে মঞ্জরীর দৃষ্টি পড়িল ভয়ত্রস্তা গোপনীর উপর, সে ত্বরিত পদে নিকটে গিয়া গোপিনীকে কাছে টানিয়া লইল।

আশ্বাস লোকে কথাতেও পায়, দৃষ্টিতেও পায়, স্পর্শেও পায়। গোপিনী মঞ্জরীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—রসকলি !

উজ্জ্বল হাসিতে মঞ্জরীর মুখখানি দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল—ভয় কি রসকলি ?

বাবু পুনরায় কহিলেন—বুঝলে, এই আমার হুকুম। উত্তর দাও, রাজী কি না ? শুনছিস পুলিন।

পুলিন, গোপিনী উভয়েই নীরব। উত্তর দিল মঞ্জরী, তেমনই হাসিয়া—হুজুর, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া কি ধমকে মেটে ?

বাবু কহিলেন—আলবাত মিটবে, না মিটলে চলবে না।

মঞ্জরী বলিল—নাই যদি মেটে হুজুর, তাই বা কি ? আমরা জাতে বোষ্টম, ছিঁড়লে মালা আমরা নতুন গাঁথি !

বাবু কহিলেন—বেশ, তবে ও বলাকে পত্র করুক।

ওপাশে বসিয়া বলা মুচকি হাসিল।

গোপিনী প্রবল প্রতিবাদে বলিল—না না !

বাবু কহিলেন—তবে কি মতলব শুনি ? কিন্তু আমার রাজ্যে ওসব বদমায়েসি চলবে না।

পুলিন কি একটা প্রতিবাদ করিল, কিন্তু এত ক্ষীণ যে কাহারও খেয়ালে আসিল না। সে নড়িয়া-চড়িয়া বসিল, যেন স্থৈর্য আর থাকে না। গর্তের সাপ ধরা পড়িবার পূর্বে যেমনতর বাহির হইতেও পারে না, অথচ ক্রোধে গর্তের ভিতরে কুণ্ডলী পাকাইয়া যেমন ঘোরে, তেমনই ভাবে তাহার মনটা পাক খাইতেছিল।

মঞ্জরী কিন্তু বেশ সবিনয়ে সবল প্রতিবাদ করিল, জিব কাটিয়া সে বলিল—ছি ছি, বাবু, আপনাকে ওসব কথা বলতে নাই।

বাবু অপ্রস্তুত হইয়া মঞ্জরীকে ধমক দিয়া কহিলেন—আচ্ছা আচ্ছা। তোমারও এখানে থাকা চলবে না, পাঁচজনে তোমার নামে পাঁচ কথা বলছে, তোমায় গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে।

মঞ্জরী সবিনয়ে বলিল—আজ্ঞে, কোথায় যাব? মেয়েমানুষ আমি—

বাবু তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিলেন—আচ্ছা, আমার সঙ্গে চল তুমি, আমার বাড়িতে থাকবে।

মঞ্জরী বলিল—আজ্ঞে, ঝি-গিরি আমি করতে পারব না।

বাবু কহিলেন—আচ্ছা, কাজ তোমায় করতে হবে না।

মঞ্জরী হাসিয়া বলিল—বাপ রে! রানীমা তাহলে ভাত দেবেন কেন?

বাবু এবার বেশ রস দিয়া কহিলেন—সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। আমাদের বাগানে তোমার কুঞ্জ করে দেব, এখানে যেমন আছ তেমনই থাকবে—বলিয়া বাবু হাসিলেন, হাসিটি গেঁজলা রসের মত, কেমন যেন বিশ্রী কুৎসিত গন্ধের আভাস দেয়।

মঞ্জরী কহিল—আমার পোড়ার মুখকে কি আর বলব! সত্যি সত্যিই এ মুখে আগুন দিতে হয়। আপনি রাজা, আপনিও শেষে—! না হুজুর, আমি এ গাঁ ছেড়ে কোথাও যাব না. সে যে যা বলবে বলুক।

বাবু মেয়েটার স্পর্ধা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, সহসা তিনি উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া কহিলেন—কেয়া হারামজাদী? ভূতসিং লাগাও জুত্তি হারামজাদীকো।

বদ্ধ লৌহদ্বার মত্ত হস্তীও ঠেলিয়া খুলিতে পারে না, আবার অর্গল খুলিলে আঘাতের অপেক্ষাও সয় না, খুলিয়া যায়। পুলিনের মনের দরজার ঠিক অর্গলটিতে হাত পড়িতেই সে খুলিয়া গেল, ভিতরের মানুষটি বাহিরে আসিল, সে একটা ভীষণ দাপে হাঁকিয়া উঠিল—খবরদার!

রাখাল পাইকের শিথিল মুষ্টির লাঠিগাছটা কাড়িয়া লইয়া মাটিতে ঠুকিয়া পুলিন বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপারটা গড়াইত কতদূর কে জানে, কিন্তু লোকে ব্যাপারটা গোটা বুঝিতে না বুঝিতে মঞ্জরী ত্বরিতপদে পুলিন ও গোপিনীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

স্তম্ভিত ভাবটা কাটিতেই বাবু কহিলেন—ভূতসিং!

বলা মৃদুকণ্ঠে কহিল—হুজুর, ওই মঞ্জরীর সঙ্গে গোকুলবাটীর থানার দারোগার পরিবারের সঙ্গে খুব সুখ, একটু বুঝে—

বলার কথাটা ঢাকিয়া দিয়া লাঠি হস্তে ভূতসিং ঘ্যানঘ্যান করিয়া বলিল—হুজৌর, হুকুম।

বাবু কহিলেন—কুছ নেহি, যাও।

মঞ্জরী দুইজনের হাত ধরিয়া আসিয়া উঠিল একেবারে রামদাসের বাড়িতে সারাটা পথ সে যেন কি ভাবনায় ভোর হইয়া ছিল; ভাবনা বলিলে ঠিক হয় না, সে যেন একটা আবেশ, একটা নেশা।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই মঞ্জরী দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া, একগাছা মোটা লাঠি আনিয়া পুলিনের হাতে দিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—বাইরে বস, পাহারাওয়ালা।

পুলিন লাঠি হাতে বাহিরে বসিল, আর ঘরের মেঝেতে বসিয়া নীরবে চোখের জল ফেলিতেছিল দুইটি নারী। গোপিনী নত দৃষ্টিতে, আর মঞ্জরী তাহার মুখের পানে চাহিয়া যেন নেশায় ভোর হইয়া বসিয়া ছিল।

সহসা হাসিয়া সে কহিল—রসকলি!

গোপিনী মুখ তুলিয়া হাসিল—বড় বিষাদের হাসি, যেন মলিন ফুলটি।

মঞ্জরী বলিল—এক কাছারি লোকের সামনে রসকলি পাতিয়েছ, না বললে তো চলবে না।

গোপিনী কহিল—হঁ্যা।

মঞ্জরী বলিল—তা ভাই, অনুষ্ঠানটা হয়ে যাক, তুমি আমার নাকে রসকলি এঁকে দাও, আমি তোমার দিই—যা নিয়ম তা তো করতে হবে।—বলিয়াই খুঁজিয়া-পাতিয়া সব সরঞ্জাম বাহির করিয়া তিলক-মাটি ঘষিতে বসিল।

তারপর গোপিনীর কোল ঘেঁষিয়া বসিয়া কহিল—তুমি ভাই আগে বলেছ, আগে তোমার পালা। দাও আমার নাকে রসকলি এঁকে দাও।—বলিয়া নিজের আঁকা রসকলিটি মুছিয়া ফেলিল।

হতভম্ব গোপিনী কম্পিত করে মঞ্জরীর নাকে রসকলি আঁকিয়া দিল।

মঞ্জরী বলিল—দাঁড়াও, সাক্ষী ডাকি।—বলিয়া বাহিরে পুলিনকে ডাকিল, সেই মধুভরা কণ্ঠ—রসকলি, এস বলি।

পুলিনকে লইয়া গোপিনীর হাতে হাতে নিজের হস্তবন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া কহিল—এই নাও রসকলি, আমার রসকলি তোমায় দিলাম।

পুলিনের কথা সরিল না।

তারপর পুলিনকে বলিল—আমি দিচ্ছি, না বলো না।

গোপিনী ও পুলিন বিস্মিত, নির্বাক।

সহসা গোপিনী মঞ্জরীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—না না, তুমি সুদ্ধ এস, আমরা দু বোনে—

রসোচ্ছলা রসোচ্ছলার মতই কহিল—দূর, আমি যে রসকলি!

বৈকালের মুখে মঞ্জরী কহিল—দাঁড়াও, আমি একবার গাঁয়ের হালচাল দেখে আসি।

পুলিন বাধা দিয়া কহিল—সে কি! একলা?

মঞ্জরী হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল, বলিল—ভয় কি? আমার রসকলি যে সঙ্গে।—বলিয়া নাকের রসকলি দেখাইয়া দিল। তারপর আবার কহিল—ভয় নাই, আমি বাইরে বাইরে খবর নেব, তেমন তেমন বুঝলে আমি গোকুলবাটী থানায় যাব। আজ রাত্রে না ফিরতেও পারি, বুঝলে? খবরদার, তোমরা বেরিও না, দিব্যি রইল, মাথা খাও।

সে কণ্ঠস্বরে পরিহাসের বিন্দুও ছিল না, পুলিন সে কথা অবহেলা করিতে পারিল না।

মঞ্জরী চলিয়া গেল, রাত্রে ফিরিল না।

পরদিন প্রাতে বলাই আসিয়া ডাকিল—মিতে!

মঞ্জরীর সংবাদের আশায় নিজের বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া পুলিন দরজা খুলিয়া কহিল—এস।

বলাই বলিল—বেশ বেশ, তা মঞ্জরীকে দিয়ে টাকাটা পাঠালি কেন? নিজে গেলেই তো হত। তা ও বেশ ভালোই হল। বাবুও বললেন, বলাই, পুলিন যখন পঞ্চাশ টাকা জরিমানাই দিলে, তখন আর তার ওপর রাগ নাই আমার। তা পুলিন বোধ হয় ভয়ে আসে নাই, তাই মঞ্জরীকে দিয়ে পাঠিয়েছে। মঞ্জরীকেও মাপ হয়ে গিয়েছে। তা একবার আজ যাস, বাবুকে পেন্নাম করে আসিস। ভয় নাই, আমিও সব বলে কয়ে দিয়েছি।

পুলিনের কথা সরিল না।

জমিল না দেখিয়া বার-কয়েক হুঁকা টানিয়া বলাই চলিয়া গেল। পুলিন স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল, কে জানে কতক্ষণ! একটি পুঁটলি কাঁখে মঞ্জরী আসিয়া হাসিমুখে অভ্যাসমত হেলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল—রসকলি!

পুলিন কথা কহিল না।

হাসিয়া মঞ্জরী বলিল—রসকলি রাগ করেছ?

পুলিন অভিমানভরে বলিল—তুমি জমিদারকে—

মঞ্জরী কহিল—জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বাদ করা কি চলে গো? তাই মিটিয়ে ফেললাম।

পুলিন কহিল—টাকা—?

মঞ্জরী কথা কাড়িয়া বলিল—সে তো তোমারই গো, আমি কি তোমার পর?—তারপর পুলিনের হাত দুইটি ধরিয়া কহিল—তবে আসি।

উদ্‌ভ্রান্তের মত পুলিন বলিল—কোথায়?

মঞ্জরী কহিল—বৃন্দাবন।

পুলিন অভিমান করিয়া বলিল—রসকলি!

মঞ্জরী কহিল—আমি তো তোমারই গো।

গোপিনী দ্বারের পিছনে ছিল, সম্মুখে আসিয়া যেন দাবি করিল—না যেতে পাবে না।

মঞ্জরী বলিল—তীর্থের সাজ খুলে কুকুর হব?

গোপিনী কহিল—বল তবে, ফিরে আসবে?

মঞ্জরী বলিল—আসব।

গোপিনী কহিল—আসবে? দেখো।

উত্তর না দিয়া মঞ্জরী হাসিয়া পুঁটলিটি তুলিয়া লইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। বিচিত্র সে হাসি, রহস্যের মায়া-মাধুরীতে ভরা, কে জানে তার অর্থ। চলিতে চলিতে গান ধরিল—

'লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী,
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী গো
আমি গরবিনী।'

নাকে তাহার রসকলি, মুখে তাহার হাসি, চলনে সে কি হিল্লোল, রসধারা যেন সর্বাঙ্গ ছাপাইয়া ঝরিতেছিল।

নারী ও নাগিনী

ইটের পাঁজা হইতে খোঁড়া শেখ ইট ছাড়াইতেছিল। খোঁড়া শেখের নাম যে কি তাহা কেহ জানে না; বোধ করি খোঁড়ার নিজেরও মনে নাই। কোন শৈশবে তাহার বাঁ-পাখানি ভাঙার পর হইতেই সে খোঁড়া নামেই চলিয়া আসিতেছে। শুধু পাখানি তাহার খোঁড়া নয়, যৌবনে কদাচারের ফলে কুৎসিত ব্যাধিতে খোঁড়ার নাকটা বসিয়া গিয়াছে, সেখানে দেখা যায় শুধু একটা বীভৎস গহ্বর। তারপর হয় তাহার বসন্ত, সেই বসন্তের দাগে কুৎসিত খোঁড়া দেখিতে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার মনেই খোঁড়া ইট ছাড়াইতেছিল!

অদূরে অদাই ওরফে ওয়াহেদ শেখ গাড়ি লইয়া আসিতেছিল। গরু দুইটার লেজ দুমড়াইয়া সে গান ধরিয়া দিল—একটা অশ্লীল গান। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার তালভঙ্গ হইয়া গেল। গরু দুইটা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। অদাই একটা ঝাঁকানি খাইয়া গান ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল—শালার গরু, কিছু না বলেছি—

প্রচণ্ড ক্রোধে পাঁচন-ছড়িটা সে তুলিল, গরু দুইটার অবাধ্যতার শাস্তি দিতে। গরু দুইটাও ক্রমাগত ফোঁস-ফোঁস করিয়া গর্জন করিতেছিল। অদাইয়ের কিন্তু প্রহার করা হইল না, সে চীৎকার করিয়া উঠিল—খোঁড়া খোঁড়া, সাপ—সাপ!

অদাইয়ের গাড়ির সম্মুখেই একটি কিশোর সাপ ফণা তুলিয়া অল্প অল্প দুলিতেছিল। অদাই গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একটা ইট উঠাইল।

ওদিক হইতে খোঁড়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ছুটিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল—মারিস না, অদাই, মারিস না। যাই, আমি যাই।

অদাইয়ের হাতের ইট তোলাই রহিল, সে বলিল—কি বাহারের সাপ মাইরি! মুখখানা সিঁদুরের মত টকটকে লাল। মাথার চক্করই বা কি বাহারের! কিন্তু পালাল—পালাল যে, শিগগির আয়।

সাপটা এইবার দ্রুতবেগে পলাইয়া যাইতেছিল। কিন্তু চলিয়াছিল

খোঁড়ার দিকেই, অদাইকে পিছনে ফেলিয়া পলায়নই তাহার উদ্দেশ্য। খোঁড়াকে সে দেখে নাই।

খোঁড়া হাঁকিল—দে তো অদাই, তোর পাঁচনখানা ছুঁড়ে। যাঃ সে, ঢুকে পড়ল পাঁজার ভেতর। উদয়নাগ রে সাপটা, এ সাপ বড় পাওয়া যায় না। ধরতে পারলে কিছু রোজগার হত রে।

খোঁড়া সাপের ওঝা। শুধু ওঝা নয়, সাপ লইয়া খেলাও সে করে। ঘরের চালের কানাচে বড় বড় মুখ-বন্ধ হাঁড়ি তাহার খাটানোই আছে। তাহারই মধ্যে সাপগুলোকে সে বন্দী করিয়া রাখে। জীর্ণ হইলে দূরে মাঠে গিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিয়া আসে। কত সাপ মরিয়াও যায়। সাপ যখন থাকে তখন খোঁড়া মজুর খাটে না। তখন দেখা যায়, বিষম-ঢাকি ও তুবড়ি-বাঁশি লইয়া খোঁড়া সাপের খেলা দেখাইতে চলিয়াছে। রোজগারও মন্দ হয় না। কিন্তু গাঁজা-আফিঙের বরাদ্দ তখন বাড়িয়া যায়। কখনো কখনো মদও চলে। ফলে সাপগুলি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়া আবার ঝুড়ি ও বিড়া লইয়া বাহির হয়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে বীভৎস মুখখানি ঈষৎ বাড়াইয়া বলে—মজুর খাটাবে গো—মজুর ?

তোষামোদ করিয়া সে হাসে, বীভৎস ভয়ঙ্কর মুখ আরও, বীভৎস আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে; মজুরি মিলিলে সে প্রাণপণে খাটে, সেখানে সে ফাঁকি দেয় না। যেদিন না মেলে, সেদিন ঝুড়ি কাঁধেই ভিক্ষা আরম্ভ করে। যাহা পায়, তাই দিয়াই খানিকটা গাঁজা-আফিঙ কেনে। কিনিয়াও যদি কিছু থাকে, তবে খানিকটা পচাই-মদ গিলিয়া বাড়ি ফিরিয়া জোবেদা বিবির পা ধরিয়া কাঁদিতে বসে, বলে, আমার হাতে পড়ে তোর দুর্দশার আর সীমা থাকল না। না খেতে দিয়ে মেরে ফেললাম।

জোবেদা হাসিতে হাসিতে স্বামীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলে—লে, লে, ক্ষেপামি করিস না, ছাড় আমাকে—দুটো চাল দেখে আনি।

খোঁড়ার কান্না বাড়িয়া যায়, সে এবার জোবেদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে—এক জেরা লতুন কানি কখনো দিতে লারলাম। পুরানো তেনা পরেই তোর দিন গেল।—

যাক ওসব কথা। পরদিন অতি প্রত্যূষে খোঁড়া ইটের পাঁজাটার কাছে আসিয়া হাজির হইল। হাতে ছোট একটা লাঠি। বগলে একটা ঝাঁপি। সম্মুখে পূর্ব-দিকচক্রবালে সবে রক্তাভা দেখা দিতে শুরু করিয়াছে। গাছের

বুকের মধ্যে বসিয়া পাখিরা মুহুর্মুহু কলরব করিতেছিল। গ্রামের মধ্যে কোনো হিন্দু দেব-মন্দিরে মঙ্গলারতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিতেছে। একটা উঁচু ঢিবির উপর বসিয়া খোঁড়া চারিদিকে সতর্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল।

পূর্বাচলের রাঙা রঙ ক্রমশ গাঢ় হইয়া পরিধিতে বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। সে রঙের আভায় পাঁজার পোড়া ইটগুলো আরও রাঙা হইয়া উঠিল। খোঁড়ার ময়লা কাপড়খানায় পর্যন্ত লাল রঙের ছোপ ধরিয়া গিয়াছে। খোঁড়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ওই—ওই না?

ঈষদ্দূরের প্রান্তরের বুকে বোধহয় সেই কিশোর সাপটিই পূর্বাকাশের দিকে মুখ তুলিয়া ফণা নাচাইয়া খেলা করিতেছিল। প্রাতঃসূর্যের রক্তাভায় তাহার রঙ দেখাইতেছিল যেন গাঢ় লাল। সেই লাল রঙের মধ্যে ফণার ঘন কালো চক্রচিহ্ন অপূর্ব শোভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রজাপতির রাঙা পাখার মধ্যে কালো বর্ণলেখার মতই সে মনোরম। খোঁড়া মুগ্ধ হইয়া গেল। আপনার মনেই মৃদুস্বরে সে বলিয়া উঠিল—বাঃ!

তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। সর্পশিশু উদীয়মান সূর্যের অভিনন্দনে এত মাতিয়া উঠিয়াছিল যে খোঁড়ার পদশব্দেও তাহার খেলা ভাঙিল না। অতি সন্নিকটে আসিতেই সে সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। পর-মুহূর্তে সে গর্জন করিয়া ছোবল মারিল। কিন্তু ফণা আর সে তুলিতে পারিল না। খোঁড়া ক্ষিপ্রহস্তে বাঁ হাতের লাঠিখানি দিয়া তখন তাহার মাথা চাপিয়া ধরিয়াছে। ডান হাতে সাপের লেজ ধরিয়া গোটা-দুই ঝাঁকি দিয়া খোঁড়া বেশ করিয়া সাপটাকে দেখিয়া বলিল—সাপিনী।

মাস ছয়েক পর। গাঁজার দোকান হইতে ফিরিয়া খোঁড়া জোবেদাকে বলিল—কি এনেছি দেখ।

উঠানে ঝাঁটা বুলাইতে বুলাইতে জোবেদা বলিল—কি?

কাপড়ের খুঁট খুলিয়া খোঁড়া ছোট চিকচিকে একটি বস্তু বাহির করিয়া হাতের তালুর উপর রাখিয়া জোবেদার সম্মুখে ধরিল। বস্তুটি ছোট একটি মিনি—নাকে পরিবার অলঙ্কার।

জোবেদা প্রশ্ন করিল—এত ছোট মিনি কি হবে?

হাসিয়া খোঁড়া বলিল—বিবিকে পরিয়ে দেব।

জোবেদা অবাক হইয়া গেল, হাসিতে হাসিতে খোঁড়া ঘরে প্রবেশ করিল। তারপর গলায় একটি সাপ জড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। সেই সাপটি। এতদিনে আরও একটু বড় হইয়াছে। কিন্তু সে তেজ নাই। শান্ত আক্রোশহীনভাবে ধীরে ধীরে মুখটি ঈষৎ তুলিয়া খোঁড়ার গলায় কাঁধে ফিরিতেছিল।

জোবেদা বলিল—দেখ, ও কোরো না। যতই তেজ না থাক, ও-জাতকের বিশ্বেস নাই।

হাসিয়া খোঁড়া বলিল—বিশ্বেস নাই ওদের বিষ-দাঁতকে। নইলে ওরাও তো ভালোবাসে জোবেদা। বিষ-দাঁতই নাই, কিন্তু আর দাঁত তো রয়েছে, কই আমাকে তো কামড়ায় না। কেমন ভালো মেয়ের মত বিবি আমার ফিরছে বল দেখি!—বলিয়া সে সাপটির ঠোঁট দুইটি চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে একটা চুমা খাইয়া বসিল।

জোবেদা বিস্মিত হইল না, কারণ এ দৃশ্য তাহার নিকট নূতন নয়। কিন্তু সে বিরক্তিভরে বলিল—ছি ছি ছি! তোমার কি ঘেন্না-পিত্তিও নাই। কতবার তোমাকে বারণ করেছি, বল তো?

সে কথায় খোঁড়া কানই দিল না। সে বলিল, দেখ দেখ, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে, দেখ দেখি। জানিস, সাপিনী আর সাপে যখন খেলা করে, তখন ঠিক এমন করে জড়াজড়ি করে ওরা। দেখেছিস কখনও? আঃ, সে যে কি বাহারের খেলা, মাইরি!

জোবেদা বলিল—দেখে আমার কাজ নাই, তুই দেখেছিস সেই ভালো! কিন্তু তোর খেলাও ওই শেষ করবে, তা বুঝি।

খোঁড়া তখন একটা সূচ লইয়া বিবির নাক ফুঁড়িতে বসিয়াছে। পায়ের আঙুল দিয়া সাপটার লেজ চাপিয়া ধরিয়াছে আর বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়াছে মুখটা। ডান হাতে সূঁচ ধরিয়া নাক ফুঁড়িয়া মিনি পরাইয়া দিয়া সাপটাকে ছাড়িয়া দিল। যন্ত্রণায় ক্রোধে গর্জন করিয়া বিবি বারংবার খোঁড়াকে ছোবল মারিতে আরম্ভ করিল। ঝাঁপির ডালাটা ঢালের মত সম্মুখে ধরিয়া বিবির আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে করিতে সে বলিল—রাগ করিস না বিবি, রাগ করিস না। দেখ তো কেমন খুবসুরত লাগছে তোকে। দে তো জোবেদা আয়নাটা দে তো? দেখুক একবার নিজের চেহারাখানা।

জোবেদা বলিল—লারব আমি।

—দে দে, তোর পায়ে পড়ি, একবার দে। দেখি না নিজের চেহারা দেখে ও কি করে!

জোবেদা স্বামীর এ অনুনয় উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে আয়না আনিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল।

খোঁড়া বলিল—একজেরা সিন্দুর আনিস তো মেহেরবানি করে।

জোবেদা ঘর হইতেই প্রশ্ন করিল—কি, হবে কি?

পরম কৌতুক হাস্য করিয়া খোঁড়া বলিল—দেখবি কি হবে। আগে হতে বলছি না।

জোবেদা আয়না সিঁদুর লইয়া আসিয়া ঈষদ্দূরে নামাইয়া দিল। খোঁড়া সুকৌশলে বিবিকে ধরিয়া একটি কাঠির ডগায় সিঁদুর লইয়া সাপটির মাথায় একটি লাল রেখা আঁকিয়া দিল। তারপর হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল—ওয়াকে আমি নিকা করলাম জোবেদা, ও তোর সতীন হল।

পরে বিবিকে বলিল—দেখ দেখ বিবি, কি বাহার তোর খুলেছে দেখ দেখি!—সাপটাকে ছাড়িয়া দিয়া সে আয়নাটা বিবির সম্মুখে ধরিল। তারপর বিষম-ঢাকিটা বাজাইয়া কর্কশ অনুনাসিক স্বরে গান ধরিল—

জানি না গো এমন হবে—
গোকুল ছাড়িয়া কেষ্ট মথুরা যাবে
ও জানি না গো—

আরো মাস কয়েক পর।

বর্ষার মাঝামাঝি একটা দুরন্ত বাদলা করিয়াছে। খোঁড়া কোথায় গিয়াছে, বাদলে দুর্যোগে ফিরিতে পারে নাই। জোবেদা অনুভব করিল, ঘরের মধ্যে কেমন একটা গন্ধ উঠিতেছে—গন্ধটা ক্ষীণ, কিন্তু মিষ্ট এবং কেমন রকমের! এদিক ওদিক ঘুরিয়াও সে কিছু বুঝিতে পারিল না।

দিন-দুই পরে খোঁড়া ফিরিল, জলের দেবতাকে একটা অশ্লীল গালি দিয়া বলিল—কিছু খেতে দে দেখি জোবেদা, বড় ভুক লেগেছে।

জোবেদা ঘরের মধ্যে একটা থালায় পান্তাভাত বাড়িয়া দিল। পায়ের কাদা ধুইয়া খোঁড়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিল—গন্ধ কিসের বল দেখি জোবেদা?

জোবেদা বললে—কে জানে বাপু, ক-দিন থেকেই ঘরে এমনই গন্ধ উঠছে।

খোঁড়া কথা কহিল না, সে শুধু ঘন ঘন শ্বাস টানিয়া গন্ধটার স্বরূপ

নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিল। এদিক ওদিক ঘুরিয়া বিবির ঝাঁপির কাছে দাঁড়াইল। মানুষের পদশব্দে ঝাঁপির ভিতর নাগিনীটা গর্জন করিয়া উঠিল।

খোঁড়া বলিল—হুঁ।

জোবেদা ঔৎসুক্যভরে প্রশ্ন করিল—কি বল দেখি?

খোঁড়া বলিল—বিবির গায়ের গন্ধ। সাপিনী তো, সাপের সঙ্গে দেখা হবার সময় হয়েছে, তাই। ওই গন্ধেই সাপ চলে আসে।

জোবেদা অবাক হইয়া গেল। বলিল—কে জানে বাপু তোদের কথা তোদেরই ভালো। নে, এখন পান্তি কটা খেয়ে ফেল।

ভাত খাইতে খাইতে খোঁড়া বলিল—ওটাকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে মাঠে। এ সময় ধরে রাখতে নাই।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে কথাটা শেষ করিল।

জোবেদা পরম আশ্বাসের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সেই ভালো বাপু, ওটাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। এত সাপ মরে, ওটা মরেও না তো!

ভাত খাইয়া খোঁড়া ঝাঁপি হইতে বিবিকে বাহির করিল। মুখটি চাপিয়া ধরিয়া সে আদরের কথা কহিল।

জোবেদা বলিল—এই দেখ, কদিন ওকে কামানো হয় নাই, ওর দাঁত গজিয়েছে। আর মায়াই বা কেন বাপু? যা না, ওকে ছেড়ে দিয়ে আয়।

খোড়া বলিল—দেখ দেখ, কেমন আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে, দেখ।

অপরাহ্নে খোঁড়া বিমর্ষ হইয়া বসিয়া ছিল। বিবিকে পার্শ্বের জঙ্গলটায় ছাড়িয়া দিয়াছে। জোবেদা বলিল, এমন করে বসে কেন বল তো? গাঁজা-টাজা খা কেনে!

খোঁড়া কহিল—বিবির লেগে মন কি করছে রে!

জোবেদা হাসিয়া বলিল—মর মর। তোর কথা শুনে কি হয় আমার—

—না রে জোবেদা, মনটা ভারি খারাপ করছে।

জোবেদা এবার স্বামীর পাশে বসিয়া আদর করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—কেন রে, আমাকে তোর ভালো লাগে না?

সাদরে তাহাকে চুম্বন করিয়া খোঁড়া বলিল—তোর জোরেই তো বেঁচে রইছি জোবেদা। তু হামার জানের চেয়ে বেশি।

জোবেদা বলিয়া উঠিল—দেখ দেখ বিবি ফিরে এসেছে। ওই দেখ—নালার মধ্যে!

জলনিকাশী নালার মধ্যে সত্যই বিবি ফণা তুলিয়া বেড়াইতেছিল।

খোঁড়া উঠিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—ধরে আনি, দাঁড়া।

জোবেদা স্বামীকে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—না।

তারপর কর্কশ কণ্ঠে বলিল, বেরো—হেট, হেট।

বাঁ হাতেকরিয়া একখানা ঘুঁটে ছুঁড়িয়া সে বিবিকে মারিল। সাপটা সক্রোধে মাটির উপর কয়টা ছোবল মারিয়া ধীরে ধীরে নালা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর বোধ হয়, জোবেদা চীৎকার করিয়া উঠিল—ওঠ ওঠ, কিসে আমায় কাটলে !

খোঁড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিল, সত্যই জোবেদার বাঁ পায়ের আঙুলে একফোঁটা রক্ত জলবিন্দুর মত টলমল করিতেছে।

জোবেদা আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—বিবি—তোর বিবি আমাকে কেটেছে, ওই দেখ।

একটা হাঁড়িতে বেড় দিয়া নাগিনী ধীরে ধীরে চলিয়াছিল। খোঁড়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সাপটাকে ধরিয়া ঝাঁপিতে বন্দী করিয়া বলিল—জোবেদা যদি না বাঁচে, তবে তোকেও শেষ করব আমি।

জোবেদা কিন্তু বাঁচিল না। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাইল। মাথার চুল টানিতেই খসখস করিয়া উঠিয়া আসিল। ওঝারা চলিয়া গেল। বীভৎস ভয়ঙ্কর মুখ সকরুণ করিয়া খোঁড়া শিয়রে বসিয়া রহিল।

একজন ওস্তাদ বলিল—তুইও যেতিস খোঁড়া, খুব বেঁচে গিয়েছিস। ভারি আক্রোশ ওদের, হয়ত তোকে কামড়াতেই এসেছিল।

সাশ্রুনেত্রে খোঁড়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না।

খোঁড়া ফকিরি লইয়াছে। তাহার ভিটাটা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। খোঁড়ার বাড়ির পাশ দিয়াই একটা পায়ে-চলা পথ ছিল, সে পথ এখন বন্ধ, সেদিক দিয়া এখন কেহ হাঁটে না। বলে, বড় সাপের ভয়। সাপগুলা বড় খারাপ সাপ—উদয়নাগ। প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের সময়ে দেখা যায়, রাঙা রঙের সাপ ফণা দুলাইয়া খেলা করিতেছে।

বিবিকে খোঁড়া বধ করিতে পারে নাই। তাহাকে সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল শুধু—তোর দোষ কি, মেয়েজাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।

অ গ্র দা নী

একটা ছয় ফুট সাড়ে ছয় ফুট লম্বা কাঠিকে মাঝামাঝি মচকাইয়া নোয়াইয়া দিলে যেমন হয়, দীর্ঘ শীর্ণ পূর্ণ চক্রবর্তীর অবস্থাও এখন তেমনই। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বে সে এমন ছিল না, তখন সে বত্রিশ বৎসরের জোয়ান, খাড়া সোজা। লোকে বলিত—মই আসছে, মই আসছে।—কিন্তু ছোট ছেলেদের সে ছিল মহা প্রিয়পাত্র।

বয়স্ক ব্যক্তিদের হাসি দেখিয়া সে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিত—হুঁ। কি রকম, হাসছ যে ?

—এই দাদা, একটা রসের কথা হচ্ছিল।

—হুঁ। তা বটে, তা তোমার রসের কথা, ও তোমার রসখাওয়ারই সমান।

একজন হয়ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বলিয়া দিত—না দাদা, তোমাকে দেখেই সব হাসছিল, বলছিল, মই আসছে।

চক্রবর্তী আকর্ণ দাঁত মেলিয়া হাসিয়া দিত—হুঁ, তা বটে। তা কাঁধে চড়লে স্বগ্‌গে যাওয়া যায়। বেশ পেট ভরে খাইয়ে দিলেই, ব্যস, স্বগ্‌গে পাঠিয়ে দোব।

—আর পতনে রসাতল, কি বল দাদা ?

চক্রবর্তী মনে মনে উত্তর খুঁজিত। কিন্তু তাহার পূর্বেই চক্রবর্তীর নজরে পড়িত, অল্প দূরে একটা গলির মুখে ছেলের দল তাহাকে ইশারা করিয়া ডাকিতেছে। আর চক্রবর্তীর উত্তর দেওয়া হইত না, সে কাজের ছুতা করিয়া সরিয়া পড়িত।

কোনোদিন রায়েদের বাগানে, কোনোদিন মিঞাদের বাগানে ছেলেদের দলের সঙ্গে গিয়া হাজির হইয়া আম, জাম, বা পেয়ারা আহরণে মত্ত থাকিত। সরস পরিপক্ক ফলগুলির মিষ্টগন্ধে সমবেত মৌমাছি-বোলতার দল ঝাঁক বাঁধিয়া চারিদিক হইতে আক্রমণের ভয় দেখাইলেও সে নিরস্ত হইত না; টুপটাপ করিয়া মুখে ফেলিয়া চোখ বুজিয়া রসাস্বাদনে নিযুক্ত থাকিত।

ছেলেরা কলরব করিত—ওই, অ্যাঁ—তুমি যে সব খেয়ে দিলে, অ্যাঁ!

সে তাড়াতাড়ি ডালটা নাড়া দিয়া কতকগুলা ঝরাইয়া দিয়া আবার গোটা দুই মুখে পুরিয়া বলিত—আঃ!

কেহ হয়ত বলিত—বাঃ পুন্ন কাকা, তুমি যে খেতে লেগেছ? ঠাকুরপূজো করবে না?

পূর্ণ উত্তর দিত—ফল ফল, ভাত-মুড়ি তো নয়, ফল ফল।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে যেদিন এ কাহিনীর আরম্ভ, সেদিন স্থানীয় ধনী শ্যামাদাসবাবুর বাড়িতে এক বিরাট শান্তি-স্বস্ত্যয়ন উপলক্ষে ছিল ব্রাহ্মণ-ভোজন। শ্যামাদাসবাবু সন্তানহীন, একে একে পাঁচ-পাঁচটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা গিয়াছে। ইহার পূর্বেও বহু অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, কোনো ফল হয় নাই। এবার শ্যামাদাসবাবু বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রী শিবরানী সজল চক্ষে অনুরোধ করিল, আর কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখ; তারপর আমি বারণ করব না, নিজে আমি তোমার বিয়ে দেব।

শিবরানী তখন আবার সন্তান-সম্ভবা। শ্যামাদাসবাবু সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন। শুধু তাই নয়, এবার তিনি এমন ধারা ব্যবস্থা করিলেন যে, সে ব্যবস্থা যদি নিষ্ফল হয় তবে যেন শিবরানীর পুনরায় অনুরোধের উপায় আর না থাকে। কাশী, বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বর এবং স্বগৃহে একসঙ্গে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইল। স্বস্ত্যয়ন বলিলে ঠিক হয় না, পুত্রেষ্টিযজ্ঞই বোধ হয় বলা উচিত।

ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজনও বিপুল। শ্যামাদাসবাবু গলবস্ত্র হইয়া প্রতি পঙ্‌ক্তির প্রত্যেক ব্রাহ্মণটির নিকট গিয়া দেখিতেছেন—কি নাই, কি চাই। একপাশে পূর্ণ চক্রবর্তীও বসিয়া গিয়াছে, সঙ্গে তাহার তিনটি ছেলে। কিন্তু পাতা অধিকার করিয়া আছে পাঁচটি। বাড়তি পাতাটিতে অন্ন-ব্যঞ্জন-মাছ স্তূপীকৃত হইয়া আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাতাটি তাহার ছাঁদা; তাহার নাকি এটিতে দাবি আছে। সে-ই শ্যামাদাসবাবুর প্রতিনিধি হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ জানাইয়া আসিয়াছে, আবার আহারের সময় আহ্বান জানাইয়াও আসিয়াছে—তাহারই পারিশ্রমিক এটি। শুধু শ্যামাদাস-বাবুর বাড়িতে এবং এই ক্ষেত্র-বিশেষটিতেই নয়, এই কাজটি তাহার যেন নির্দিষ্ট কাজ, এখানে পঞ্চগ্রামের মধ্যে যেখানে যে বাড়িতেই হউক এবং যত সামান্য আয়োজনের ব্রাহ্মণ-ভোজন হউক না কেন, পূর্ণ চক্রবর্তী আপনিই সেখানে গিয়া হাজির হয়; হাঁটু পর্যন্ত কোনোরূপে ঢাকে এমনই বহরের তাহার পোশাকী কাপড়খানি পরিয়া এবং বাপ-পিতামহের আমলের

রেশমের একখানি কালী-নামাবলী গায়ে দিয়া হাজির হইয়া বলে—হুঁ, তা কর্তা কই গো, নেমন্তন্ন কি রকম হবে একবার বলে দেন? ওঃ মাছগুলো যে বেশ তেলুক তেলুক ঠেকছে! হুই হুই! নিয়েছিল এক্ষুনি চিলে!

চিলটা উড়িতেছে দূর আকাশের গায়, পূর্ণ চক্রবর্তী সেটাকেই তাড়াইয়া গৃহস্থের হিতাকাঙ্ক্ষার পরিচয় দেয়। দুর্দান্ত শীতের গভীর রাত্রি পর্যন্ত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিয়া সে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফেরে; প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরেও আহারের আহ্বান জানাইতে চক্রবর্তী ছেঁড়া চটি পায়ে, মাথায় ভিজা গামছাখানি চাপাইয়া, কর্তব্য সারিয়া আসে; সেই কর্মের বিনিময়ে এটি তাহার পারিশ্রমিক। যাক।

শ্যামাদাসবাবু আসিয়া পূর্ণকে বলিলেন—আর কয়েকখানা মাছ দিক চক্রবর্তী?

চক্রবর্তীর তখন খানবিশেক মাছ শেষ হইয়া গিয়াছে; সে একটা মাছের কাঁটা চুষিতেছিল, বলিল—আজ্ঞে না, মিষ্টি-টিষ্টি আবার আছে তো। হরে ময়রার রসের কড়াইয়ে ইয়া ইয়া ছানাবড়া ভাসছে, আমি দেখে এসেছি।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন—সে তো হবেই; একটা মাছের মুড়ো?

পূর্ণ পাতাখানা পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল—ছোট দেখে।

মাছের মুড়াটা শেষ করিতে করিতে ওপাশে তখন মিষ্টি আসিয়া পড়িল।

চক্রবর্তী ছেলেদের বলিল—হুঁ, বেশ করে পাতা পরিষ্কার কর সব, হুঁ। নইলে নোস্তা ঝোল লেগে খারাপ লাগবে খেতে! এঃ, তুই যে কিছুই খেতে পারলি না, মাছসুদ্ধ পড়ে আছে!—বলিয়া ছোট ছেলেটার পাতার আধখানা মাছও সে নিজের পাতে উঠাইয়া লইল। মাছখানা শেষ করিয়া সে গলাটা ঈষৎ উঁচু করিয়া মিষ্টি পরিবেশনের দিকে চাহিয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে হাঁকিতেছিল, এই দিকে।

ওপাশে সকলে তাহাকে দেখিয়া টেপাটেপি করিয়া হাসিতেছিল, একজন বলিল—চোখ দুটো দেখ, চোখ দুটো দেখ!

—উঃ, যেন চোখ দিয়ে গিলছে!

—আমি তো ভাই, কখনও ওর পাশে খেতে বসি না। উঃ, কি দৃষ্টি!

ততক্ষণে মিষ্টান্ন চক্রবর্তীর পাতার সম্মুখে গিয়া হাজির হইয়াছে।

চক্রবর্তী মিষ্টান্ন-পরিবেশকের সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল—ছাঁদার পাতে আমি আটটা মিষ্টি পাব।

—বাঃ, সে তো চারটে করে মিষ্টি পান মশায়।

—সে ছুটো করে যদি পাতে পড়ে, তবে চারটে। আর চারটে যখন পাতে পড়ছে, তখন আটটা পাব না, বাঃ!

শ্যামাদাসবাবু আসিয়া বলিলেন—ষোলটা দাও ওঁর ছাঁদার পাতে। ভদ্রলোক বিনি মাইনেতে নেমন্তন্ন করে আসেন; দাও দাও, ষোলটা দাও।

পূর্ণ চক্রবর্তী আঁচল খুলিতে খুলিতে বলিল—আঁচলে দাও, আমার আঁচলে দাও।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন—চক্রবর্তী, কাল সকালে একবার আসবে তো? কেমন, এখানে এসেই জল খাবে।

—যে আজ্ঞে, তা আসব।

ওপাশ হইতে কে বলিল—চক্রবর্তী, বাবুকে ধরে পড়ে তুমি বিদূষক হয়ে যাও—আগেকার রাজাদের যেমন বিদূষক থাকত।

চক্রবর্তী গামছায় ছাঁদার পাতাটা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—হুঁ। তা তোমার, হলে তো ভালোই হয়; আর তোমার, ব্রাহ্মণের লজ্জাই বা কি? রাজা-জমিদারের বিদূষক হয়ে যদি ভালোমন্দটা—বলিতে বলিতেই হাসিয়া উঠিল।

বাড়িতে আসিয়া ছাঁদা-বাঁধা গামছাটা বড়ছেলের হাতে দিয়া চক্রবর্তী বলিল—যা, বাড়িতে দিগে যা।

ছেলেটা গামছা হাতে লইতেই মেজমেয়েটা বলিল—মিষ্টিগুলো?

—সে আমি নিয়ে যাচ্ছি, যা।

—অ্যাঁ, তুমি লুকিয়ে রাখবে। ষোলটা মিষ্টি কিন্তু গুনে নোব, হ্যাঁ।

—আরে আরে, এ বলছে কি! ষোলটা কোথা রে বাপু! দিলে তো আটটা, তাও কত ঝগড়া করে।

—মা, মা! দেখ, বাবা মিষ্টিগুলো লুকিয়ে রেখেছে, অ্যাঁ।

চক্রবর্তী-গৃহিণী, যাহাকে বলে রূপসী মেয়ে। দারিদ্র্যের শতমুখী আক্রমণেও সে রূপকে জীর্ণ করিতে পারে নাই। দেহ শীর্ণ, চুল রুক্ষ, পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র; তবুও হৈমবতী যেন সত্যিই হৈমবতী। কাঞ্চননিভ দেহবর্ণ দেখিয়া সোনার প্রতিমা বলিতেই ইচ্ছা করে। চোখ দুইটি আয়ত সুন্দর, কিন্তু দৃষ্টি তাহার নিষ্ঠুর মায়াহীন। মায়াহীন অন্তর ও রূপময়ী কায়া লইয়া হৈম যেন উজ্জ্বল বালুস্তরময়ী মরুভূমি; প্রভাতের পর

হইতেই দিবসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মরুর মতই প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠে।

হৈমবতী আসিয়া দাঁড়াইতেই চক্রবর্তী সভয়ে মেয়েকে বলিল—বলছি, তুই নিয়ে যেতে পারবি না ; না মেয়ে চেঁচাতে—

হৈমবতী কঠোর স্বরে বলিল—দাও।

চক্রবর্তী আঁচলের খুঁটটি খুলিয়া হৈমর সম্মুখে ধরিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ছেলেটা বলিল—বাবাকে আর দিও না, মা। আজ যা খেয়েছে বাবা উঃ! আবার কাল সকালে বাবু নেমন্তন্ন করেছে বাবাকে, মিষ্টি খাওয়াবে।

হৈম কঠিন স্বরে বলিল—বেরো বলছি আমার সুমুখ থেকে, হতভাগা ছেলে! বাপের প্রতি ভক্তি দেখ! তোরা সব মরিস না কেন, আমি যে বাঁচি!

পূর্ণ এবার সাহস করিয়া বলিল—দেখ না, ছেলের তরিবত যেন চাষার তরিবত।

হৈম বলিল—বাপ যে চামার! লোভী চামারের ছেলে চাষাও যে হয়েছে সেটুকু ভাগ্যি মেন। লেখাপড়া শেখাবার পয়সা নেই, রোগে ওষুধ নেই, গায়ে জামা নেই, তবুও মরে না ওরা। রাক্ষসের ঝাড়, অখণ্ড পেরমাই!

চক্রবর্তী চুপ করিয়া রহিল। হৈম যেন আগুন ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া গেল। চক্রবর্তী ছেলেটাকে বলিল—দেখ দেখি রে, এক টুকরো হত্তুকি কি সুপুরি এককুচি যদি পাস। তোর মার কাছে যেন চাস নি বাবা।

সন্ধ্যার পর চক্রবর্তী হৈমর কাছে বসিয়া ক্রমাগত তাহার তোষামোদ করিতে আরম্ভ করিল। হৈম কোলের ছেলেটাকে ঘুম পাড়াইতেছিল। চক্রবর্তী এবং ছেলেরা আজ নিমন্ত্রণ খাইয়াছে, রাত্রে আর রান্নার হাঙ্গামা নাই, যে ছাঁদাটা আসিয়াছে তাহাতে হৈম এবং কোলের ছেলেটারও চলিয়া গিয়াছে।

বহু তোষামোদেও হৈম যেন তেমন প্রসন্ন হইল না, অন্তত চক্রবর্তীর তাই মনে হইল ; সে মনের কথা বলিতে সাহস পাইল না। তাহার একান্ত ইচ্ছা যে, রাত্রে কয়েকটা ছানাবড়া সে খায়। তাহার তৃপ্তি হয় নাই, বুকের মধ্যে লালসা ক্রমবর্ধমান বহ্নি-শিখার মত জ্বলিতেছে।

ধীরে ধীরে হৈমবতী ঘুমাইয়া পড়িল, শীর্ণ দুর্বল দেহ তাহার উপর আবার সে সন্তানসম্ভবা, সন্ধ্যার পরই শরীর যেন তাহার ভাঙিয়া পড়ে। ছেলেগুলাও ঘুমাইয়াছে। চক্রবর্তী হৈমর দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল, হ্যাঁ, হৈম ঘুমাইয়াছে। চক্রবর্তী আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, হৈমর আঁচল

হইতে বাঁধা কয়টা চাবির গোছা খুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই ছেলেরা নাচিতে নাচিতে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, ছানাবড়া খাব। বড়ছেলেটা ঘুর-ঘুর করিয়া বার বার মায়ের কাছে আসিয়া বলিতেছিল, আমাকে কিন্তু একটা গোটা দিতে হবে মা।

হৈম বিরক্ত হইয়া বলিল—সব—সব—সবগুলো বের করে দিচ্ছি, একটা কেন?

সে চাবি খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই একটা রূঢ় বিস্ময়ের আঘাতে স্তব্ধ ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে শিকাটাতে মিষ্টিগুলি ঝুলানো ছিল, সেটা কিসে কাটিয়া ফেলিয়াছে, মিষ্টান্নগুলির অধিকাংশই কিসে খাইয়া গিয়াছে; মাত্র গোটা তিন-চার মেঝের উপর পড়িয়া আছে, তাও সেগুলি রসহীন শুষ্ক, নিঃশেষে রস শোষণ করিয়া লইয়া ছাড়িয়াছে। ছেঁড়া শিকাটাকে সে একবার তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, কাটা নয়, টানিয়া কিসে ছিঁড়িয়াছে। অতি নিষ্ঠুর কঠিন হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

বাবু বলিলেন—চক্রবর্তী, গিন্নীর একান্ত ইচ্ছে যে, তুমি এবার তাঁর আঁতুড়-দোরে থাকবে।

এখানকার প্রচলিত প্রথায় সূতিকাগৃহের দুয়ারের সম্মুখে রাত্রে ব্রাহ্মণ রাখিতে হয়। চক্রবর্তীর সন্তানদের মধ্যে সব কটিই জীবিত, চক্রবর্তী-গৃহিণী নিখুঁত প্রসূতি; তাহার সূতিকা-গৃহের দুয়ারে চক্রবর্তীই শুইয়া থাকে। তাই শিবরানী এবার এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। কল্যাণের এমনই সহস্র খুঁটিনাটি লইয়া সে অহরহ ব্যস্ত। শ্যামাদাসবাবুও তাহার কোনো ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিবেন না।

চক্রবর্তী বলিল, হুঁ—তা আজ্ঞে—

একজন মোসায়েব বলিয়া উঠিল—তা, না না—কিছু নেই চক্রবর্তী। দিব্যি এখানে এসে রাজভোগ খাবে রাত্রে, ইয়া পুরু বিছানা, তোফা ভরা পেটে, বুঝেছ?—বলিয়া সে ঘড়-ঘড় করিয়া নাক ডাকাইয়া ফেলিল।

আহার ও আরামের বর্ণনায় পুলকিত চক্রবর্তী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হুঁ, তা হুজুর যখন বলছেন, তখন না পারলে হবে কেন?

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন—বস তুমি, আমি জল খেয়ে আসছি।

তোমারও জলখাবার আসছে।—বলিয়া তিনি পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

একজন চাকর একখানা আসন পাতিয়া দিয়া মিষ্টান্নপরিপূর্ণ একখানা থালা নামাইয়া দিল।

একজন বলিল—খাও চক্রবর্তী।

—হুঁ। তা একটু জল, হাতটা ধুয়ে ফেলতে হবে।

আর একজন পারিষদ বলিল—গঙ্গা গঙ্গা বলে বসে পড় চক্রবর্তী। অপবিত্র পবিত্রো বা, ওঁ বিষ্ণু স্মরণ করলেই সব শুদ্ধ, বসে পড়।

গ্লাসের জলেই একটা কুলকুচা করিয়া খানিকটা হাতে বুলাইয়া লইয়া চক্রবর্তী লোলুপভাবে থালার সম্মুখে বসিয়া পড়িল।

পাশের ঘরে জলযোগ শেষ করিয়া আসিয়া শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, পেট ভরল চক্রবর্তী?

চক্রবর্তীর মুখে তখন গোটা একটা ছানাবড়া। একজন বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে, কথা বলবার অবসর নেই চক্রবর্তীর এখন।

সেটা শেষ করিয়া চক্রবর্তী বলিল—আজ্ঞে পরিপুন্ন। তিল ধরবার জায়গা নেই আর পেটে।

সে উঠিয়া পড়িল।

শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, তোমার কল্যাণে যদি মনস্কামনা আমার সিদ্ধ হয় চক্রবর্তী, তবে দশ বিঘে জমি আমি তোমাকে দোব। আর আজীবন তুমি সিংহবাহিনীর একটা প্রসাদ পাবে। তাহলে তোমার কথা তো পাকা, কেমন?

সিংহবাহিনীর প্রসাদ কল্পনা করিয়া চক্রবর্তী পুলকিত হইয়া উঠিল। সিংহবাহিনীর ভোগের প্রসাদ—সে যে রাজভোগ!

—হুঁ, তা পাকা বইকি! হুজুরের—

কথা অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া সে বলিয়া উঠিল—দেখি, দেখি, ওহে, দেখি দেখি!—চোখ তাহার যেন জলজল করিয়া উঠিল।

খানসামাটা শ্যামাদাসবাবুর উচ্ছিষ্ট জলখাবারের থালাটা লইয়া সম্মুখ দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল। একটা অভুক্ত ক্ষীরের সন্দেশ ও মালপোয়া থালাটার উপর পড়িয়া ছিল। চক্রবর্তীর লোলুপতা অকস্মাৎ যেন সাপের মত বিবর হইতে ফণা বিস্তার করিয়া বাহির হইয়া বিষ উদ্গার করিল। চক্রবর্তী স্থান-কাল সমস্ত ভুলিয়া বলিয়া উঠিল—দেখি দেখি, ওহে, দেখি দেখি!

শ্যামাদাসবাবু হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন—কর কি, কর কি, এঁটো, ওটা এঁটো! নতুন এনে দিক!

চক্রবর্তী তখন থালাটা টানিয়া লইয়াছে। ক্ষীরের সন্দেশটা মুখে পুরিয়া বলিল—আজ্ঞে, রাজার প্রসাদ!

আর সে বলিতে পারিল না, আপনার অন্যায়টা মুহূর্তে তাহার বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আর উপায় ছিল না, বাকিটাও আর ফেলিয়া রাখা চলে না। লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া সেটাও কোনোরূপে গলাধঃকরণ করিয়া তাড়াতাড়ি কাজের ছুতা করিয়া সে পলাইয়া আসিল।

বাড়িতে তখন, মরুতে যেন ঝড় বহিতেছে। হৈম মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে, ছোট ছেলেগুলা কাঁদিতেছে। বড়টা কোথায় পলাইয়াছে।

মেজমেয়েটা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—মিষ্টিগুলো কিসে খেয়ে দিয়েছে, তাই দাদা ঝগড়া করে মাকে মেরে পালাল। মা পড়ে গিয়ে—

কথার শেষাংশ তাহার কান্নায় ঢাকিয়া গেল। চক্রবর্তীর চোখে জল আসিল : জলের ঘটি ও পাখা লইয়া সে হৈমর পাশে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে করিতে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে হৈমর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চেতনা হইতেই হৈম স্বামীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—ছি ছি ছি! তোমাকে কি বলব আমি, ছিঃ!

চক্রবর্তী হৈমর পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু হৈম চীৎকার করিয়া উঠিল—মাথা ঠুকে মরব আমি, ছাড়, পা ছাড়।

সমস্ত দিন হৈম নির্জীবের মত পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার দিকে সে সুস্থ হইয়া উঠিলে চক্রবর্তী সমস্ত কথা বলিয়া কহিল, তোমার বলছ আবার ওই সময়েই! তাহলে না হয়, কাল বলে দেব যে পারব না আমি।

হৈম চীৎকার করিয়া উঠিল—না না না। মরুক মরুক, হয়ে মরুক আমার। আমি খালাস পাব। জমি পেলে অন্যগুলো তো বাঁচবে।

শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহেই। সেদিন সন্ধ্যায় শ্যামাদাসবাবুর লোক আসিয়া চক্রবর্তীকে ডাকিল—চলুন আপনি, গিন্নীমায়ের প্রসববেদনা উঠেছে।

চক্রবর্তী বিব্রত হইয়া উঠিল ; হৈমরও শরীর আজ কেমন করিতেছে।

হৈম বলিল—যাও তুমি।

—কিন্তু—

—আমাকে আর জ্বালিও না বাপু, যাও। বাড়িতে বড় খোকা রয়েছে, যাও তুমি।

চক্রবর্তী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। জমিদার-বাড়ি তখন লোকজনে ভরিয়া গিয়াছে। শ্যামাদাসবাবু বলিলেন—এস চক্রবর্তী, এস। আমি বড় ব্যস্ত এখন। তুমি রান্নাবাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিও।

চক্রবর্তী সটান গিয়া তখনই রান্নাশালাতে উঠিল।

—হুঁ, ঠাকুর, কি রান্না হচ্ছে আজ? বাঃ, খোসবুই তো খুব উঠেছে! কি হে ওটা, মাছের কালিয়া, না মাংস?

—মাংস। মায়ের পূজো দিয়ে বলি দেওয়া হয়েছে কিনা।

—হুঁ, তা তোমার রান্নাও খুব ভালো। তার ওপর তোমার বাদলার দিন। কত দূর, বলি দেরি কত? দাও না, দেখি একটু চেখে।

একখানা শালপাতা ছিঁড়িয়া ঠোঙা করিয়া একবারে কড়াই ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল। ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিল—আচ্ছা লোভ তোমার কিন্তু চক্রবর্তী!

—হুঁ. তা বলেছ ঠিক। তা একটু বেশি। তা বটে।

একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল—সিদ্ধ হতে দেরি আছে নাকি?

হাতাতে করিয়া খানিকটা অর্ধসিদ্ধ মাংস তাহার ঠোঙাতে দিয়া ঠাকুর বলিল—এই দেখ, বললে তো বিশ্বাস করবে না। নাও হুঁঃ।

সেই গরম ঝোলই খানিকটা সড়াত করিয়া টানিয়া লইয়া চক্রবর্তী বলিল—হুঁ। বাঃ, ঝোলটা বেড়ে হয়েছে! হুঁ, তা তোমার রান্না যাকে বলে উৎকৃষ্ট।

ঠাকুর আপন মনেই কাজ করিতেছিল, সে কোনো উত্তর দিল না। চক্রবর্তী আবার বলিল—হুঁ। তা তোমার, এ চাকলায় তো কাউকে তোমার জুড়ি দেখলাম না। মাংসটা সিদ্ধ এখনও হয় নি, তবে তোমার গিয়ে খাওয়া চলছে।

ঠাকুর বলিল, চক্রবর্তী, তুমি এখন যাও এখান থেকে। খাবার হলে খবর দেবে চাকররা। আমাকে কাজ করতে দাও। যাও, ওঠ।

চক্রবর্তী উঠিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই সময়েই তাহার বড় ছেলেটা আসিয়া ডাকিল—বাবা।

চক্রবর্তী উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—কে রে?

—একবার বাড়ি এস। ছেলে হয়েছে।

—তোর মা। তোর মা কেমন আছে?

—ভালোই আছে গো। তবে দাই-টাই কেউ নেই, দাই এসেছে বাবুদের বাড়ি; নাড়ী কাটতে লোক চাই।

চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি ছেলের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

—হৈম!

—ভয় নেই, ভালোই আছি। তুমি শুদ্দুরদের দাইকে ডাক দেখি, নাড়ী কেটে দিয়ে যাক। আমাদের দাইকে তো পাওয়া যাবে না।

তাহাই হইল। দাইটা নাড়ী কাটিয়া বলিল—সোন্দর খোকা হইচে বাপু, মা-বাপ সোন্দর না হলে কি ছেলে সোন্দর হয়! মা কেমন—তা দেখতে হবে!

হৈম বলিল—যা যা বকিস নি বাপু; কাজ হল তোর, তুই যা।

চক্রবর্তী বলিল—হুঁ, তাহলে, তাই তো! খোকা যাক, বলে আসুক বাবুকে অন্য লোক দেখুন ওঁরা।

হৈম বলিল, জ্বালিও না আমাকে। যাও বলছি, যাও।

চক্রবর্তী আবার অন্ধকারের মধ্যে বাবুদের বাড়ির দিকে চলিল।

মধ্যরাত্রে জমিদার-বাড়ি শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। শিবরানী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

পূর্ব হইতেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত ছিল, সে-ই যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিয়া নাড়ী কাটিল। গরম জলে শিশুর শরীরের ক্লেদাদি ধুইয়া মুছিয়া দাইয়ের কোলে শিশুটিকে সমর্পণ করিয়া সে যখন বিদায় লইল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

প্রভাতে চক্রবর্তী বাড়ি আসিতেই হৈম বলিল—ওগো, ছেলেটার যেন জ্বর হয়েছে মনে হচ্ছে।

চক্রবর্তী চমকিয়া উঠিল—হুঁ, তা—

অবশেষে অনুযোগ করিয়া বলিল—বললাম তখন, যাব না আমি। তা তুমি একেবারে আগুন হয়ে উঠলে! কিসে যে কি হয়—হুঁ।

হৈম বলিল, ও কিছু না, আপনি সেরে যাবে। এখন পয়সা-টাকের সাবু কি দুধ-টুধ যদি একটু পাও তো দেখ দেখি। আমাকে কাটলেও তো এক ফোঁটা দুধ বেরুবে না।

পয়সা ছিল না, চক্রবর্তী প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বাবুদের বাড়ির দিকেই

চলিল, দুধের জন্য। কাছারি-বাড়িতে ঘটি হাতে দাঁড়াইয়া সে বাবুকে খুঁজিতেছিল। বাবু ছিলেন না। লোকজনও সব ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চলাফেরা করিতেছে। কেহ চক্রবর্তীকে লক্ষ্যই করিল না।

খানসামাটা বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইতেছিল, সে চক্রবর্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আজ পেসাদ-টেসাদ মিলবে না ঠাকুর; যাও বাড়ি যাও।

চক্রবর্তী ম্লানমুখে ধীরে ধীরে বারান্দা হইতে নামিয়া আসিল। একজন নিম্ন-শ্রেণীর ভৃত্য একটা আড়াল দেখিয়া বসিয়া তামাক টানিতেছিল, চক্রবর্তী তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ বাবা, ছেলের জন্যে গাই দোয়া হয় নি?

সে উত্তর দিল—কেন ঠাকুর, ধারস্ত (ধারোষ্ণ) খাবে নাকি? আচ্ছা পেটুক ঠাকুর যা হোক। না, গাই দোয়া হয় নি; বাড়িতে ছেলের অসুখ; ওসব হবে না এখন, যাও।

শিশুর অসুখ বোধ হয় শেষরাত্রেই আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু বোঝা যায় নাই, সারারাত্রিব্যাপী যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শিবরানীও এলাইয়া পড়িয়াছিল, রাত্রি-জাগরণক্লিষ্টা দাইটাও ঘুমাইয়াছিল।

প্রভাতে, বেশ একটু বেলা হইলে, শিবরানী উঠিয়া বসিয়া ছেলে কোলে লইয়াই আশঙ্কায় চমকিয়া উঠিল। এ কি, ছেলে যে কেমন করিতেছে! তাহার পূর্বের সন্তানগুলিও তো এমনি ভাবেই—! চোখের জলে শিবরানীর বুক ভাসিয়া গেল। শিশুর শুভ্রপুষ্পতুল্য দেহবর্ণ যেন ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শিবরানী আর্তস্বরে ডাকিল--যমুনা, একবার বাবুকে ডেকে দে তো!

শ্যামাদাসবাবু আসিতেই সে বলিল—ডাক্তার ডাকাও, ছেলে কেমন হয়ে গেছে! সেই অসুখ!

শ্যামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—দুর্গা দুর্গা!

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডাক্তার আনিতে লোক পাঠাইলেন। স্থানীয় ডাক্তার তৎক্ষণাৎ আসিল এবং তাহার পরামর্শমত শহরেও লোক পাঠানো হইল বিচক্ষণ চিকিৎসকের জন্য। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, শিবরানীর আশঙ্কা সত্য; সত্যই শিশু অসুস্থ। ধীরে ধীরে শিশুর দেহবর্ণ হইতে আকৃতি পর্যন্ত যেন কেমন অস্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে। এই সর্বনাশা রোগেই শিবরানীর শিশুগুলি এমন করিয়াই সূতিকা-গৃহে একে একে বিনষ্ট হইয়াছে।

অপরাহ্ণে সদর হইতে বড় ডাক্তার আসিয়া শিশুকে কিছুক্ষণ দেখিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—চলুন, আমার দেখা হয়েছে।

দাইটা বলিয়া উঠিল—ডাক্তারবাবু, ছেলে—

তাহার প্রশ্ন শেষ হইবার পূর্বেই ডাক্তার বলিল—ওষুধ দিচ্ছি।

শ্যামাদাসবাবুর সঙ্গে ডাক্তার বাহির হইয়া গেল।

শ্যামাদাসবাবুর মাসীমা সূতিকা-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাইকে বলিলেন, কই, ছেলে নিয়ে আয় তো দেখি!

ছেলের অবস্থা দেখিয়া তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, অা আমার কপাল রে!—বলিয়া ললাটে করাঘাত করিলেন। ঘরের মধ্যে শিবরানী তখন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল।

মাসীমা আপন মনেই বলিলেন—আর ও বার করে দিতে হয়েছে। কি করেই বা বলি! আর পোয়াতীর কোলেই বা—

ডাক্তার শ্যামাদাসবাবুকে বলিল—কিছু মনে করবেন না শ্যামাদাসবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—বলুন।

ডাক্তার শ্যামাদাসবাবুর যৌবনের ইতিহাস প্রশ্ন করিয়া সংগ্রহ করিয়া বলিল—আমিও তাই ভেবেছিলাম। ওই হল আপনার সন্তানদের অকাল-মৃত্যুর কারণ।

—তা হলে ছেলেটা কি—

—না, আশা আমি দেখি না।—বলিয়া ডাক্তার বিদায় হইল।

শ্যামাদাসবাবু বাড়ির মধ্যে আসিতেই মাসীমা আপনার মনের কথাটা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, নইলে কি পোয়াতীর কোলে ছেলে মরবে? সে যে দারুণ দোষ হবে বাবা, আচার-আচরণগুলোও মানতে হবে তো।

আচার রক্ষা করিতে হইলে বিচার করার কোনো প্রয়োজন হয় না; এবং হিন্দুর সংসারে আচারের উপরেই নাকি ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শিবরানীর কোল শূন্য করিয়া দিয়া শিশুকে সূতিকা-গৃহের বাহিরে বারান্দায় মৃত্যু-প্রতীক্ষায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। তাহার কাছে রহিল দাই, এবং প্রহরায় রহিল ব্রাহ্মণ, আর মাথার শিয়রে রহিল দেবতার নির্মাল্যের রাশি। ঘরের মধ্যে পুত্রশোকাতুরা শিবরানীর সেবা ও সান্ত্বনার জন্য রহিল যমুনা-ঝি।

শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রি। চক্রবর্তী বসিয়া ঘন ঘন তামাক খাইতেছিল। তাহার ঘরের শিশুটিও অসুস্থ; কিন্তু সে সারিয়া উঠিবে। চক্রবর্তী মধ্যে মধ্যে আপন মনেই বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, বিধিলিপি! তাহার শিশুটি মরিয়া যদি এটি বাঁচিত, তবে চক্রবর্তী অন্তত বাঁচিত। দশ বিঘা জমি আর সিংহবাহিনীর প্রসাদ নিত্য একথালা! ভাগ্যের চিকিৎসা কি আর ডাক্তারে করিতে পারে!

শিশুটি মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ কণ্ঠে অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে।

চক্রবর্তী দাইটাকে বলিল—একটু জল-টল মুখে দে রে বাপু!

নিদ্রাকাতর দাইটা বলিল—জল কি যাবে গো ঠাকুর? তা বলছ, দিই।

সে উঠিয়া ফোঁটা দুই জল দিয়া শিশুর অধর ভিজাইয়া দিল। তারপর শুইতে শুইতে বলিল, ঘুমোও ঠাকুর, তোমার কি আর ঘুম-টুম নাই!

চক্রবর্তীর চক্ষে সত্যই ঘুম নাই। সে বসিয়া আকাশজোড়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আপন ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল। তাহার ভাগ্যাকাশও এমনই অন্ধকার। আঃ, ছেলেটা যদি যাদুমন্ত্রে বাঁচিয়া উঠে! চক্রবর্তী পৈতা ধরিয়া শিশুর ললাটখানি একবার স্পর্শ করিল। অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে সর্বাঙ্গ তাহার থরথর করিয়া কাঁপে।

না না, সে হয় না। জানিতে পারিলে সর্বনাশ হইবে। দেখিতে দেখিতে তাহার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠিল। সে আবার তামাক খাইতে বসিল।

দাইটা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। ঘরের মধ্যেও শিবরানীর মৃদু ক্রন্দনধ্বনি আর শোনা যায় না। কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে চক্রবর্তী আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল; জলন্ত অঙ্গারের প্রভায় চোখের মধ্যেও যেন তাহার আগুন জ্বলিতেছে।

উঃ, চিরদিনের জন্য তাহার দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে! এ শিশুর প্রভাত হইতেই বিকৃত মূর্তি, তাহার শিশুও কুৎসিত নয়, দরিদ্রের সন্তান হইলেও জননীর কল্যাণে সে রূপ লইয়া জন্মিয়াছে। সমস্ত সম্পত্তি তাহার সন্তানের হইবে! উঃ!

পাপ যেন সম্মুখে অদৃশ্য কায়া লইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছিল। গভীর অন্ধকারের মধ্যেও আলোকিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চক্রবর্তীর চোখের সম্মুখে ঝলমল করিতেছে। চক্রবর্তী উঠিয়া দাঁড়াইল। শিশুর নিকট আসিয়া কিন্তু আবার তাহার ভয় হইল। কিন্তু সে এক মুহূর্ত। পরমুহূর্তে সে মৃতপ্রায় শিশুকে বস্ত্রাবৃত করিয়া লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িল।

অদ্ভুত, সে যেন চলিয়াছে অদৃশ্য বায়ুপ্রবাহের মত!—নিঃশব্দে লঘু দ্রুত গতিতে। অন্ধকার পথেও আজ সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ কেহ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করে না, তাহারও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

ভাঙা ঘর। চারিদিকে প্রাচীরও সর্বত্র নাই। হৈমর সূতিকাগৃহের দরজাও নাই, একটা আগড় দিয়া কোনোরূপে আগলানো আছে। হৈমও গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

চক্রবর্তী আবার বাতাসের মত লঘু ক্ষিপ্র গতিতে ফিরিল।

দাইটা তখনও নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।

রোগগ্রস্ত শিশু, মৃত্যু-রোগগ্রস্ত নয়। সে থাকিতে থাকিতে অপেক্ষাকৃত সবল ক্রন্দনে আপনার অভিযোগ জানাইল। দাইটার কিন্তু ঘুম ভাঙিল না। চক্রবর্তী ঘুমের ভান করিয়া কাঠ মারিয়া পড়িয়া রহিল।

শিশু আবার কাঁদিল।

ঘরের মধ্যে শিবরানীর অস্ফুট ক্রন্দন এবার যেন শোনা গেল।

শিশু আবার কাঁদিল।

এবার যমুনা ঈষৎ দরজা খুলিয়া বলিল—দাই, ও দাই! ওমা, নাক ডাকছে যে। ঠাকুরও দেখছি মড়ার মত ঘুমিয়েছে! ও দাই!

দাইটা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। যমুনা বলিল—এই বুঝি তোর ছেলে আগলানো! ছেলে যে কাতরাচ্ছে, মুখে একটু করে জল দে।

দাইটা তাড়াতাড়ি শিশুর মুখে জল দিল; শুষ্ককণ্ঠে শিশু ঠোঁট চাটিয়া জলটুকু পান করিয়া আবার যেন চাহিল। দাই আবার দিল।

এবার সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—ওগো, জল খাচ্ছে গো ঠোঁট চেটে চেটে!

শিবরানী দুর্বল দেহে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, নিয়ে আয়, ঘরে নিয়ে আয় আমার ছেলে, কারও কথা আমি শুনব না।

প্রভাতে আবার লোক ছুটিল সদরে। এবার অন্য ডাক্তার আসিবে। মৃত্যুদ্বার হইতে শিশু ফিরিয়াছে। দেবতার দান, ব্রাহ্মণের প্রসাদ! চক্রবর্তী নাকি আপন শিশুর পরমায়ু রাজার শিশুকে দিয়াছে! হতভাগ্যের সন্তানটি মারা গিয়াছে। প্রায়ান্ধকার সূতিকাগৃহে শিবরানী জ্বর-কাতর শিশুকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। তাহার ভাগ্য-দেবতা, তাহার হারানো মানিক!

দশ বিঘা জমি চক্রবর্তী পাইল। সিংহবাহিনীর প্রসাদও এক থালা

করিয়া নিত্য সে পায়। হৈম অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছে। কিন্তু চক্রবর্তী সেই তেমন করিয়াই বেড়ায়।

লোকে বলে—স্বভাব যায় না মলে।

চক্রবর্তী বলে—হুঁ, তা বটে। কিন্তু ছেলের দল দেখেছ, এক-একটা ছেলে যে একটা হাতির সমান।

হৈম ছেলেগুলিকে ইস্কুলে দিয়াছে। বড়ছেলেটি এখন ইতরের মত কথা বলে না, কিন্তু বড় বড় কথা বলে।—বাবার ব্যবহারে ইস্কুলে আমার মুখ দেখানো ভার মা। ছেলেরা যা-তা বলে। কেউ বলে, ভাঁড়ের বেটা খুরি। কেউ আবার দেখলেই সড়াত করে মুখে ঝোল টানে। তুমি বাপু, বারণ করে দিও বাবাকে।

হৈম সে কথা বলিতেই চক্রবর্তী সহসা যেন আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। তাহার অস্বাভাবিক রূপ দেখিয়া হৈমও চমকিয়া উঠিল।

চক্রবর্তী বলিল—চলে যাব, চলে যাব আমি সন্নেসী হয়ে।

ব্যাপারটা আরও অগ্রসর হইত। কিন্তু বাহির হইতে কে ডাকিল—চক্রবর্তী!

—কে?

—বাঁড়ুজ্জেরা পাঠালে হে। ওদের মেয়ের বাড়ি তত্ত্ব যাবে, তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে; ওরা কেউ যেতে পারবে না। লাভ আছে হে, ভালোমন্দ খাবে, বিদেয়টাও পাবে।

—আচ্ছা, চল যাই।

চক্রবর্তী বাহির হইয়া পড়িল। বাঁড়ুজ্জেদের বাড়ি গিয়া যেখানে মিষ্টি তৈয়ারী হইতেছিল সেখানে চাপিয়া বসিয়া বলিল, ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণং গতি। হুঁ, তা যেতে হবে বইকি! উনানের আঁচটা একটু ঠেলে দিই, কি বল হে মোদকমশায়?

সে সতৃষ্ণ নয়নে কড়াইয়ের পাকের দিকে চাহিয়া রহিল।

বৎসর দশেক পর। শিবরানী হঠাৎ মারা গেল। লোকে বলিল, ভাগ্যবতী! স্বামী-পুত্তুর রেখে ডঙ্কা মেরে চলে গেল!

শ্যামাদাসবাবু শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিপুল আয়োজন আরম্ভ করিলেন। চক্রবর্তীর এখন ওইখানেই বাসা হইয়াছে। সকালবেলাতেই ঠুক ঠুক করিয়া গিয়া হাজির হয়, বসিয়া বসিয়া আয়োজনের বিলি-বন্দোবস্ত দেখে, মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলে।

সেদিন বলিল—হুঁ, ছাঁদা একটা করে তো দেওয়া হবে। তা তোমার লুচিই বা কখানা আর তোমার মিষ্টিই বা কি রকম হবে?

একজন উত্তর দিল—হবে হবে। একখানা করে লুচি, এই চালুনের মত। আর মিষ্টি একটা করে, তোমার লেডিকেনি, এই পাশ-বালিশের মত, বুঝলে!

সকলে মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল। শ্যামাদাসবাবু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—একটু থাম তো সব। হ্যাঁ, কি হল, পাওয়া গেল না?

একজন কর্মচারীর সঙ্গে তিনি কথা কহিতেছিলেন। কর্মচারীটি বলিল, আজ্ঞে, তাদের বংশই নির্বংশ হয়ে গিয়েছে।

—তা হলে অন্য জায়গায় লোক পাঠাও। অগ্রদানী না হলে তো শ্রাদ্ধ হয় না।

—আচ্ছা তাই দেখি। অগ্রদানী তো বড় বেশী নেই, দশ-বিশ ক্রোশ অন্তর একঘর আধঘর।

কে একজন বলিয়া উঠিল—তা আমাদের চক্রবর্তী রয়েছে! চক্রবর্তী, নাও না কেন দান, ক্ষতি কি? পতিত করে আর কে কি করবে তোমার?

শ্যামাদাসবাবুও ঈষৎ উৎসুক হইয়া উঠিলেন—মন্দ কি চক্রবর্তী! শুধু দান-সামগ্রী নয়, ভূ-সম্পত্তিও কিছু পাবে; পঁচিশ বিঘে জমি দেব আমি, আর তুমি যদি রাজী হও, তবে বছরে পঞ্চাশ টাকা জমিদারী সম্পত্তির মুনাফা দেব আমি, দেখ।—বলিয়াই তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া চাকরকে ডাকিলেন, ওরে, চক্রবর্তীকে জলখাবার এনে দে। কলকাতার মিষ্টি কি আছে, নিয়ে আয়।

শ্রাদ্ধের দিন সকলে দেখিল, শ্যামাদাসবাবুর বংশধর শিবরানীর শ্রাদ্ধ করিতেছে, আর তাহার সম্মুখে অগ্রদান গ্রহণ করিবার জন্য দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করিয়া বসিয়া আছে পূর্ণ চক্রবর্তী।

তারপর গোশালায় বসিয়া তাহারই হাত হইতে গ্রহণ করিয়া চক্রবর্তী গোগ্রাসে পিণ্ড ভোজন করিল।

গল্পের এখানেই শেষ, কিন্তু চক্রবর্তীর কাহিনী এখানে শেষ নয়। সেটুকু না বলিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

লোভী, আহার-লোলুপ চক্রবর্তীর আপন সন্তানের হাতে পিণ্ড ভোজন করিয়াও তৃপ্তি হয় নাই। লুব্ধ দৃষ্টি, লোলুপ রসনা লইয়া সে তেমন করিয়াই

ফিরিতেছিল। এই শ্রাদ্ধের চৌদ্দ বৎসর পর সে একদিন শ্যামাদাসবাবুর পায়ে আসিয়া গড়াইয়া পড়িল। শ্যামাদাসবাবু তাঁহার দুই বৎসরের পৌত্রকে কোলে করিয়া শুষ্ক অশ্বত্থতরুর মত দাঁড়াইয়া ছিলেন।

চক্রবর্তী তাঁহার দুইটি পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—পারব না বাবু, আমি পারব না।

শ্যামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—না পারলে উপায় কি, চক্রবর্তী? আমি বাপ হয়ে তার শ্রাদ্ধের আয়োজন করছি, কচি মেয়ে—তার বিধবা স্ত্রী শ্রাদ্ধ করতে পারবে, আর তুমি পারবে না বললে চলবে কেন? দশ বিঘে জমি তুমি এতেও পাবে।

শ্যামাদাসবাবুর বংশধর শিশু-পুত্র ও পত্নী রাখিয়া মারা গিয়াছে, তাহারই শ্রাদ্ধ হইবে।

চক্রবর্তী নিরুপায় হইয়া উঠিয়া চলিয়া আসিল।

শ্রাদ্ধের দিন, গোশালায় বসিয়া বিধবা বধূ পিণ্ডপাত্র চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিল।

পুরোহিত বলিল—খাও হে চক্রবর্তী!

কা লা পা হা ড়

সংসারে অবুঝকে বুঝাইতে যাওয়ার তুল্য বিরক্তিকর আর কিছু নাই। বয়স্ক অবুঝ, শিশুর চেয়ে অনেক বেশী বিপত্তিকর। শিশু চাঁদ চাহিলে তাহাকে চাঁদের পরিবর্তে মিষ্টান্ন দিলে সে শান্ত হয়, তাহা না হইলে প্রহার করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়া শান্ত হয়। কিন্তু বয়স্ক অবুঝ কিছুতেই বুঝিতে চায় না, এবং ভবীর মত ভুলিতেও চায় না।

যশোদানন্দন বহু যুক্তিতর্ক দিয়াও বাপকে বুঝাইতে পারিল না, অবশেষে যাহাকে বলে তিক্ত-বিরক্ত, তাই হইয়া সে বলিল—তবে তুমি যা মন তাই কর গে যাও, দুটো হাতি কিনে আন গে।

কল্পিত হাতি দুইটা বোধ করি শুঁড় ঝাড়িয়া রংলালের গায়ে জল ছিটাইয়া দিল, রংলাল রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। সে হুঁকা টানিতেছিল, কথাটা শুনিয়া

কয়েক মুহূর্ত ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর অকস্মাৎ হাতের হুঁকাটা সজোরে মাটির উপর আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া বলিল—এই নে।

যশোদা অবাক হইয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রংলাল বলিল—হাতি, হাতি। বলি, ওরে হারামজাদা, কখন আমি হাতি কিনব বলেছি?

যশোদা এ কথার কোনো জবাব দিল না, সেও রাগে ফুলিতেছিল। গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

রংলাল এতক্ষণে বোধ হয় 'হাতি কেনা' কথাটার একটা জবাব খুঁজিয়া পাইয়াছিল—সেও এবার শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল—হাতি কেন? দুটো ছাগল কিনবি বরং, ফলাও চাষ হবে। বাঁশের ঝাড়ের মত ধানের ঝাড় হবে, তিন হাত লম্বা শীষ! চাষার ছেলে নেকাপড়া শিখলে এমনি মুখ্যুই হয় কিনা! বলি হাঁ রে মুখ্যু, ভালো গরু না হলে চাষ হয়? লাঙল মাটিতে ঢুকবে এক হাত করে, এক হেঁটো মাটি হবে গদ্‌গদে মোলাম, ময়দার মত, তবে তো ধান হবে, ফসল হবে।

রংলাল ধরিয়াছে এবার সে গরু কিনিবে। এই গরু-কেনার ব্যাপার লইয়া মতদ্বৈধহেতু পিতা-পুত্রে কয়েকদিন হইতেই কথা কাটাকাটি চলিতেছে। রংলাল বেশ বড় চাষী, তাহার জোতজমাও মোটা, জমিগুলিও প্রথম শ্রেণীর। চাষের উপর যত্ন অপরিসীম। বলশালী প্রকাণ্ড যেমন তাহার দেহ, চাষের কাজে খাটেও সে তেমনই অসুরের মত—কার্পণ্য করিয়া একবিন্দু শক্তিও সে কখনো অবশিষ্ট রাখে না। বোধ হয়, এই কারণেই গরুর উপরে তাহার প্রচণ্ড শখ! তাহার গরু চাই সর্বাঙ্গসুন্দর—কাঁচা বয়স, বাহারে রঙ, সুগঠিত শিং, সাপের মত লেজ এবং আরও অনেক কিছু গুণ না থাকিলে গরু তাহার পছন্দ হয় না। আরও একটা কথা—এ চাকলার মধ্যে তাহার গরুর মত গরু যেন আর কাহারও না থাকে। গরুর গলায় সে ঘুঙুর ও ঘণ্টার মালা ঝুলাইয়া দেয়, দুইটি বেলা ছেঁড়া চট দিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গ ঝাড়িয়া মুছিয়া দেয়, শিং দুইটিতে তেল মাখায়; সময়ে সময়ে তাহাদের পদসেবাও করে, কোনোদিন পরিশ্রম বেশি হইলে তাহাদের পা টিপিতে টিপিতে বলে—আহা কেষ্টর জীব!

গত কয়েক বৎসর অজন্মার জন্য এবং পুত্র যশোদাকে স্কুলে পড়াইবার খরচ বহন করিতে হওয়ায় রংলালের অবস্থা ইদানীং একটু অস্বচ্ছল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যশোদা এবার ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে, আর গতবার ধানও

মন্দ হয় নাই ; এইজন্য এবার রংলাল ধরিয়া বসিয়াছে, ভালো গরু তাহার চাই-ই। একজোড়া গরু গতবার মাত্র কেনা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রতি রংলালের মমতা নাই। গরু দুইটি ছোটও নয় এবং মন্দও কোনোমতে বলা চলে না ; কিন্তু এ অঞ্চলে তাহাদের চেয়ে ভালো গরুও অনেকেরআছে।

যশোদা বলিতেছে—এ বৎসরটা ওতেই চলুক, আমি চাকরি-বাকরি একটা কিছু করি ; আর এবারও যদি ধান ভালো হয়, তবে কিনো এখন আসছে বছর। কিনতে গেলে দুশ টাকার কম তো হবেই না, সে টাকা তুমি এখন পাবে কোথা ?

টাকা কোথা হইতে আসিবে, সে রংলাল জানে না, তবু গরু তাহার চাই-ই।

অবশেষে রংলালের জিদই বজায় থাকিল। যশোদা রাগ করিয়াই আর কোনো আপত্তি করিল না। টাকাও যোগাড় হইয়া গেল। যে গরু-জোড়াটা তাহার ছিল, সে জোড়াটা বেচিয়া হইল একশত টাকা, বাকি একশত টাকার সংস্থান করিয়া দিল যশোদার মা। সে রংলালকে গোপনে বলিল, ওর সঙ্গে ঝগড়া করে কি হবে ? তুমি গরু কিনে আন না ! কিনে আনলে তো কিছু বলতে লারবে।

রংলাল খুশী হইয়া বলিল—বেশ বলেছ, তাই করি। তারপর উ আপনার মাথা ঠুকুক কেনে ?

যশোদার মা বলিল—এ গরু দুটো বেচে দাও, আর এই নাও—এইগুলো বন্ধক দিয়ে গরু কেনো তুমি। ভালো গরু নইলে গোয়াল মানায় ?

সে আপনার গয়না কয়খানি রংলালের হাতে তুলিয়া দিল। রংলাল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

যাক, রংলাল টাকা-কড়ি সংগ্রহ করিয়া পাঁচুন্দি গ্রামের গরু-মহিষের বাজারে যাইবার সঙ্কল্প করিল। বাছিয়া বাছিয়া মনের মত দুইটি গরু সংগ্রহ করিবে। হয় দুধের মত সাদা, নয় দধিমুখো কালো। কিন্তু পাঁচুন্দির হাটে প্রবেশ মুখেই সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। হ-হ ! এ যে—ওরে বাস রে—এ যে হাজার হাজার রে বাবা !

হাজার হাজার না হইলেও গরু-মহিষ দুই মিলিয়া হাজারখানেক পাঁচুন্দির হাটে আমদানি হয়। আর মানুষ তেমনই অনুপাতে জুটিয়াছে। গরু-মহিষের চীৎকারে, মানুষের কলরবে—সে এক অদ্ভুত কোলাহল ধ্বনিত

হইতেছে। মাথার উপর সূর্য তখন মধ্যাকাশে। যেখানটায় জানোয়ার কেনা-বেচা হইতেছে, সেখানে এক ফোঁটা ছায়া কোথাও নাই। মানুষের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, তাহারা অক্লান্তভাবে ঘুরিতেছে। রংলাল সেই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

গরুগুলি এক জায়গায় গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে, চোখে চকিত দৃষ্টি। পাইকারগুলো চীৎকার করিতেছে ফেরিওয়ালার মত—এই যায়! এই গেল! বাঘ-বাচ্ছা! আরবী ঘোড়া!

রংলাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আপনার মনের মত সামগ্রীর সন্ধান করিতেছিল।

ওদিকটায় গোলমাল উঠিতেছে প্রচণ্ডতর। কান পাতা যায় না। মনে হয় যেন দাঙ্গা বাধিয়াছে। রংলাল ওই দিকটার পানেই চলিল। এ দিকটায় মহিষের বাজার। কালো কালো দুর্দান্ত জানোয়ারগুলাকে অবিরাম ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। পাইকারের দল চীৎকার করিয়া বড় বড় বাঁশের লাঠি দিয়া অবিশ্রান্ত পিটিতেছে, আর জানোয়ারগুলা ছুটিয়া বেড়াইতেছে জ্ঞানশূন্যের মত। কতকগুলা একটা পুকুরের জলে পড়িয়া আছে। নেহাত কচি বাচ্চা হইতে বুড়া মহিষ পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য আনিয়াছে। কতকগুলার গায়ের চামড়া উঠিয়া গিয়া রাঙা ঘা থকথক করিতেছে। আরও একটু দূরে আমগাছ-ঘেরা একটা পুকুরের পাড়েও লোকের ভিড়। রংলাল সেখানে কি আছে দেখিবার জন্য চলিল। একটা পাইকার মহিষ তাড়াইয়া আনিতেছিল, সহসা তাহার আস্ফালিত লাঠি-গাছটা হাত হইতে খসিয়া রংলালের কাছেই আসিয়া পড়িল। রংলালের একটু রাগ হইল, সে লাঠিগাছটা তুলিয়া লইল।

পাইকারটার অবসর নাই, সে অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া বলিল—দাও দাও, লাঠিগাছটা দাও হে!

—যদি আমার গায়ে লাগত!

—তা তুমার লাগত না হয় খানিক টুকচা রক্ত পড়ত, আর কি হত?

রংলাল অবাক হইয়া গেল—রক্ত পড়ত আর কি হত!

—দাও দাও ভাই, দিয়ে দাও। হাত ফসকে হয়ে গেইছে, দাও দাও! রংলালকে ভালো করিয়া দেখিয়া এবার পাইকারটি বিনয় প্রকাশ করিল।

লাঠিগাছা দিতে গিয়া রংলাল শিহরিয়া উঠিল—এ কী, লাঠির প্রান্তে যে সূচের অগ্রভাগ বাহির হইয়া রহিয়াছে!

পাইকারটা হাসিয়া বলিল—উ আর দেখে কাজ নাই, দিয়ে দাও ভাই!

রংলাল বেশ করিয়া দেখিল—সূচের অগ্রভাগই বটে ; একটা নয়, দুই-তিনটা। হঠাৎ একটা শোনা-কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—পাইকাররা লাঠির ডগায় সূচ বসাইয়া রাখে, ওই সূচের খোঁচা খাইয়াই মহিষগুলা এমন জ্ঞানশূন্যের মত ছুটিয়া বেড়ায়।—উঃ!—সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

পাইকারটা বলিল—কি, কিনবে কি কর্তা? মহিষ কিনবে তো লাও, ভালো মহিষ দিব, সস্তা দিব—অ্যাই—অ্যাই!—বলিয়া রংলালকে দেখাইয়াই সে মহিষগুলাকে ছুটাইতে আরম্ভ করিল।

—বাপ রে, বাপ রে, বলিহারি বাপ রে আমার!—মধ্যে মধ্যে আবার আদরও সে করিতেছে।

রংলাল আসিয়া উঠিল বাগানে।

চারি পাশেই মহিষের মেলা ; এগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর অযথা তাড়নার ফলে ছুটিয়াও বেড়াইতেছে না। শান্তভাবে কোনোটি বসিয়া, কোনোটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চোখ বুজিয়া রোমন্থন করিতেছে।

গরু এ বাগানে নাই। রংলাল সেখান হইতে ফিরিল, কিন্তু একেবারে বাগানের শেষ প্রান্তে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—এ কি! মহিষ, না হাতি? এত প্রকাণ্ড বিপুলকায় মহিষ রংলাল কখনও দেখে নাই। কয়জন লোকও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। একজন বলিতেছিল—এ মোষ কে লেবে বাবা?

পাইকারটা বলিল—এ লেবে ভাই রাজায় জমিদারে, আর লেবে যার লক্ষ্মী নাই সেই। ঘুরছি তো পাঁচ-সাত হাট ; দেখি, আবার কোথাও যাব।

অন্য একজন বলিল—এ মোষ গেরস্তেতে নিয়ে কি করবে? এর হালের মুঠো ধরবে কে? তার জন্যে এখন লোক খোঁজ!

পাইকার বলিল—আরে ভাই, বুদ্ধিতে মানুষ বাঘ বশ করেছে, আর এ তো মোষ। লাঙল বড় করলেই জানোয়ার জব্দ! এর লাঙল মাটিতে ঢুকবে দেড় হাত।

রংলাল তীক্ষ্ণ প্রশংসমান দৃষ্টিতে মহিষজোড়াটার দিকে চাহিয়া ছিল—বলিহারি, বলিহারি! দেহের অনুপাতে পাগুলি খাটো, অবক্ষ পঙ্ক হইতে অন্তত বিশ মন ওজন তো স্বচ্ছন্দে ওই খাটো পায়ে খুঁটি দিয়া তুলিয়া লইবে! কী কালো রঙ! নিকষের মত কালো। শিং দুইটির বাহার সবচেয়ে বেশি, আর দুইটিই কি এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছে—যেন যমজ শিশু!

কিন্তু দামে কি সে পারিবে? আচ্ছা, দেখাই যাক, হাট ভাঙিয়া শেষ লোকটি পর্যন্ত চলিয়া যাক, তখন দেখা যাইবে ; পাইকারটাও তো বলিল,

পাঁচ-সাতটা হাটে কেহ খরিদ্দার জুটে নাই। কথা তো শুধু টাকারই নয়, সকলের চেয়ে বড় কথা, ওই জানোয়ার দুইটির দুইটি বিপুল উদর।

রংলাল ওই মহিষ দুইটাই কিনিয়া ফেলিল, কিছুতেই সে প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিল না। ঐ টাকাতেই তাহার হইল; পাইকারটাও কয়েকটা হাট ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকগুলি টাকা তাহার এত দিন আবদ্ধ হইয়া আছে। সে যখন দেখিল, সত্যই রংলালের আর সম্বল নাই, তখন একশত আটানব্বুই টাকাতেই মহিষ দুইটি রংলালকে দিয়া দিল। রংলালের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কল্পনানেত্রে দেশের লোকের সপ্রশংস বিস্ফারিত দৃষ্টি যেন প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিল। কিন্তু যত সে বাড়ির নিকটবর্তী হইল, ততই তাহার উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া অবসাদ প্রবল হইয়া উঠিল। লেখাপড়া-জানা ছেলেকে তাহার বড় ভয়। তাহার কথাবার্তার জবাব দিতে রংলালকে হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। তা ছাড়া, এত বড় দুইটা জানোয়ারের উদর পূর্ণ করা তো সহজ নয়! এক-একটাতেই দৈনিক এক পণেরও বেশি খড় নস্যের মত উদরসাৎ করিয়া ফেলিবে।

গিন্নী—যশোদার মা কি বলিবে? সে মহিষের নাম শুনিলে জ্বলিয়া যায়। রংলাল মনে মনে চিন্তা করিয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে এক সময় বিদ্রোহ করিয়া উঠে। কেন, কিসের ভয়, কাহাকেই বা ভয়? ঘরই বা কাহার? সম্পত্তির মালিকই বা কে? কাহার কথার অপেক্ষা করে সে? চাষ কেমন হইবে, সে কথা কেহ জানে? রংলালের মনে হইল—মাটির নীচে ঘুমন্ত লক্ষ্মীর যেন ঘুম ভাঙিতেছে—মাটির নিরন্ধ্র আস্তরণ লাঙলের টানে চৌচির করিয়া দিলেই মা ঝাঁপিখানি কাঁখে করিয়া পৃথিবী আলো করিয়া আসন পাতিয়া বসিবেন। এক হাঁটু দলদলে কাদা, কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ! ধানের চারা তিন দিনে তিন মূর্তি ধরিয়া বাড়িয়া উঠিবে।

কিন্তু এভাবটুকুও তাহার স্থায়ী হয় না, সে আবার ছেলে ও স্ত্রীর মুখ মনে করিয়া স্তিমিত হইয়া পড়ে। মনে মনে সে তাহাদের তুষ্টিসাধনের জন্য তোষামোদ-বাক্য রচনা আরম্ভ করিল।

বাড়িতে আসিয়াই সে যশোদাকে হাসিতে হাসিতে বলিল—হাতিই এক জোড়া কেনলাম, তোর কথাই থাকল।

যশোদা মনে করিল, বাবা বোধহয় প্রকাণ্ড উঁচু একজোড়া বলদ

কিনিয়াছে। সে বলিল—বেশি বড় গরু ভালো নয় বাপু! বেশ শক্ত শক্ত গিঠ-গিঠ গড়ন হবে, উঁচুতেও খুব বড় না হয়—সেই তো ভালো।

একমুখ হাসিয়া রংলাল বলিল—গরুই কিনি নাই আমি, মোষ কিনলাম।

যশোদা সবিস্ময়ে বলিল—মোষ?

—হ্যাঁ।

যশোদার মাও বলিল—মোষ কিনলে তুমি?

—হ্যাঁ।

—আর অমন করে হেস না বাপু তুমি, আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।—যশোদার মা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

—আহা হা, আগে তাই চোখেই একবার দেখ, দেখেই যা হয় বল। লাও লাও, জলের ঘটি লাও, হলুদ লাও, তেল লাও, সিঁদুর লাও—চল, দুগ্‌গা বলে ঘরে ঢুকাও তো!

দেখিয়া শুনিয়া যশোদার মুখ আরও ভারি হইয়া উঠিল, সে বলিল—নাও, এইবার চালের খড় ক'গাছাও টেনে নিয়ে দিও শেষে। ও কি সোজা পেট! এক-একটির কুম্ভকর্ণের মত খোরাক চাই। যুগিও কোথা হতে যোগাবে।

যশোদার মা অবাক হইয়া মহিষ দুইটাকে দেখিতেছিল, হোক ভয়ঙ্কর, তবুও একটা রূপ আছে—যাহার আকর্ষণে মানুষকে চাহিয়া দেখিতে হয়। মহিষ দুইটা ঈষৎ মাথা নামাইয়া তির্যক ভঙ্গিতে সকলকে চাহিয়া দেখিতেছিল। চোখের কালো অংশের নীচে রক্তাভ সাদা ক্ষেত্র খানিকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।—ভীষণ রূপের উপযুক্ত দৃষ্টি।

রংলাল বলিল—দাও, পায়ে জল দাও।

—বাবা রে! ওদের কাছে আমি যেতে পারব না।

—না না না। এস তুমি, কাছে এস, কোনো ভয় নাই, চলে এস তুমি। ভারি ঠাণ্ডা!

যশোদার মা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আগাইয়া আসে। মহিষ দুইটি ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কিছু বোধ করি বলিতে চাহে। রংলাল বলিল—অ্যাই খবরদার! মা হয় তোদের, ফেন দেবে, ভাত দেবে, ভুষি দেবে। বাড়ির গিন্নী, চিনে রাখ!

তবুও যশোদার মা সরিয়া আসিয়া বলিল—না বাপু, এই তেল সিঁদুর হলুদ তুমি দিয়ে দাও, ও আমি পারব না। যে কালাপাহাড়ের মত চেহারা!

রংলাল বলিয়া উঠিল—বেশ বলেছ। একটার নাম থাকুক কালাপাহাড়।

—এইটা, এইটাই বেশি মোটা, এইটাই হল কালাপাহাড়। আর এইটার নাম কি হবে বল দেখি ?

একটু চিন্তা করিয়াই সে আবার বলিল, আর একটার নাম—কুম্ভকর্ণ। যশোদা বলেছে। বেশ বলেছে !

যশোদার মাও খুশী হইয়া উঠিল, কিন্তু যশোদা খুশী হইল না।

রংলাল বিরক্ত হইয়া বলিল—গোমড়া মুখ আমি দেখতে লারি।—সে গুরুই হোক আর গোঁসাই হোক।

রংলাল কালাপাহাড়ের পিঠে চড়িয়া কুম্ভকর্ণকে তাড়া দিতে দিতে তাহাদের নদীর ধারে চরাইতে লইয়া যায় সকালেই, ফেরে বেলা তিনটায়। শুধু যে এটা খড় বাঁচাইবার জন্যই সে করে, তা নয় ; এটা তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছে। বাড়ির সমস্ত লোক ইহার জন্য বিরক্ত, এমন কি যশোদার মা পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রংলাল হাসিয়া বলে—এবার খড় কত টাকার বেচি তা দেখ ! খড় বেচেই এবার একখানা গয়না তোমার হবে।

যশোদার মা বলে—গয়নার জন্যে আমার ঘুম হয় না, না তোমাকে দিনরাত আগুনের ছেঁকা দি, বল তো তুমি ?

যশোদা বলে—যাবে কোন দিন সাপের কিংবা বাঘের পেটে।

সত্য কথা, নদীর ধারে সাপের উপদ্রব খুব এবং বাঘও মাঝে মাঝে দুই-একটা ছটকাইয়া আসিয়া পড়ে। রংলাল সে সব গ্রাহ্যই করে না, সে নদীর ধারে গিয়া একটা গাছতলায় গামছা বিছাইয়া শুইয়া পড়ে। মহিষ দুইটা ঘাস খাইয়া বেড়ায়। উহারা দূরে গিয়া পড়িলে সে মুখে এক বিচিত্র শব্দ করে, আঁ—আঁ ! অবিকল মহিষের ডাক ! দূর হইতে সে শব্দ শুনিয়া কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ ঘাস খাওয়া ছাড়িয়া মুখ উঁচু করিয়া শোনে, তারপর উহারাও ওই আঁ—আঁ শব্দে সাড়া দিতে দিতে দ্রুতবেগে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া আসে ; কখনও কখনও বা ছুটিতে আরম্ভ করে ! রংলালের কাছে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়ায়, যেন প্রশ্ন করে—ডাকিতেছ কেন ?

রংলাল দুইটাব গালেই দুই হাতে একটা করিয়া চড় বসাইয়া দিয়া বলে—পেটে তোদের আগুন লাগুক। খেতে খেতে কি বেলাত চলে যাবি না কি ? এই কাছে-পিঠে চরে খা।

মহিষ দুইটা আর যায় না, তাহারা সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিয়া রোমন্থন করে। কখনও বা নদীর জলে আকণ্ঠ ডুবিয়া বসিয়া থাকে ;-রংলাল ডাকিলে জলসিক্ত গায়ে উঠিয়া আসে।

মাঠে যখন সে লাঙল চালায়, তখন প্রকাণ্ড বড় লাঙলখানা সজোরে মাটির বুকে চাপিয়া ধরে, কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অবলীলাক্রমে টানিয়া চলে, প্রকাণ্ড বড় বড় মাটির চাঁই দুই ধারে উল্টাইয়া পড়ে। এক হাতেরও উপর গভীর তলদেশ উন্মুক্ত হইয়া যায়। প্রকাণ্ড বড় গাড়িটায় একতলা ঘরের সমান উঁচু করিয়া ধানের বোঝা চাপাইয়া দেয়—লোকে সবিস্ময়ে দেখে ; রংলাল হাসে।

মধ্যে মধ্যে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণকে লইয়া বিষম বিপদ বাধিয়া উঠে। এক-একদিন তাহাদের মধ্যে কী মনান্তর যে ঘটে ;—উহারা দুইটা যুধ্যমান অসুরের মত সামনাসামনি দাঁড়াইয়া ক্রোধে ফুলিতে থাকে। মাথা নীচু করিয়া আপন আপন শিং উদ্যত করিয়া সম্মুখের দুই পা মাটিতে ঠুকিতে আরম্ভ করে, তারপরই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। এক রংলাল ছাড়া সে সময় আর কেহ তাহাদের মধ্যে যাইতে সাহস করে না। রংলাল প্রকাণ্ড এক-গাছা বাঁশের লাঠি হাতে নির্ভয়ে উহাদের মধ্যে পড়িয়া দুর্দান্তভাবে দুইটাকে পিটাইতে আরম্ভ করে। প্রহারের ভয়ে দুইটাই সরিয়া দাঁড়ায়। রংলাল সেদিন দুইটাকেই সাজা দেয়, পৃথক গোয়ালে তাহাদের আবদ্ধ করিয়া অনাহারে রাখে ; তারপর পৃথকভাবেই তাহাদের স্নান করাইয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া তবে একসঙ্গে মিলিতে দেয় ; সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপদেশও দেয়, ছিঃ ঝগড়া করতে নাই। একসঙ্গে মিলে-মিশে থাকবি—তবে তো!

যাক। বৎসর তিনেক পরে অকস্মাৎ একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। গ্রীষ্মের সময় রংলাল নদীর ধারে বেশ একটি কুঞ্জবনের মত গুল্মাচ্ছাদনের মধ্যে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন ছিল। কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ অদূরেই ঘাস খাইতেছে। অকস্মাৎ একটা বিজাতীয় ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দে ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিয়াই রংলালের রক্ত হিম হইয়া গেল। নিবিড় গুল্মবনটার প্রবেশ-পথের মুখেই একটা চিতাবাঘ হিংস্র দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। হিংস্র লোলুপতায় তাহার দাঁতগুলা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সে ফ্যাঁসফ্যাঁস শব্দ করিয়া বোধ হয় আক্রমণের সূচনা করিতেছে। রংলাল ভীরু নয়, সে পূর্বে কয়েকবার চিতাবাঘ শিকারে একা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। রংলাল

বেশ বুঝিতে পারিল—সংকীর্ণ প্রবেশ-পথের জন্যই বাঘটা ভিতরে প্রবেশ করিতে ইতস্তত করিতেছে। নতুবা ঘুমন্তই অবস্থাতেই সে তাহাকে আক্রমণ করিত। সে দ্রুত হামাগুড়ি দিয়া বিপরীত দিকে পিছাইয়া গিয়া কুঞ্জবনটার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড গাছটাকে আড়াল করিয়া আরম্ভ করিল, আঁ—আঁ—আঁ!

মুহূর্তের মধ্যে উত্তর আসিল—আঁ—আঁ—আঁ!

বাঘটা চকিত হইয়া কুঞ্জবনটার মুখ হইতে সারিয়া আসিয়া চারিদিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল—উহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ। সেও দন্ত বিস্তার করিয়া গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। রংলাল দেখিল—কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণের সে এক অদ্ভুত মূর্তি! তাহাদের এমন ভীষণ রূপ সে কখনও দেখে নাই। তাহারা ক্রমশ পরস্পরের নিকট হইতে সরিয়া বিপরীত দিকে চলিতেছিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেল—বাঘটার একদিকে কালাপাহাড়, অন্যদিকে কুম্ভকর্ণ, মধ্যে বাঘটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়াছে। বাঘটা ছোট, তবুও সে বাঘ। সে বোধহয় অসহিষ্ণু হইয়া অকস্মাৎ একটা লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণের উপর পড়িল। পরমুহূর্তেই কালাপাহাড় তাহার উদ্যত শিং লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। কালপাহাড়ের শৃঙ্গাঘাতে বাঘটা কুম্ভকর্ণের পিঠ হইতে ছিটকাইয়া দূরে পড়িয়া গেল। আহত কুম্ভকর্ণ উন্মত্তের মত বাঘটার উপর নতমস্তকে উন্নত শৃঙ্গ লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। কুম্ভকর্ণের শিং দুইটা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং অপেক্ষাকৃত সোজা—একটা শিং বাঘটার তলপেটে সোজা ঢুকিয়া গিয়া বাঘটাকে যেন গাঁথিয়া ফেলিল। মরণযন্ত্রণা-কাতর বাঘটাও দারুণ আক্রোশে তাহার ঘাড়টা কামড়াইয়া ধরিল। ওদিক হইতে কালাপাহাড়ও আসিয়া বাঘটার উপর শৃঙ্গাঘাত আরম্ভ করিল। রংলালও তখন বাহির হইয়া আসিয়াছে, সেও দারুণ উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্যের মত চালাইতে আরম্ভ করিল তাহার বাঁশের লাঠি। কিছুক্ষণের মধ্যেই যুধ্যমান দুইটা জন্তুই মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। বাঘটার প্রাণ তখনও থাকিলেও সে অত্যন্ত ক্ষীণ, শরীরে শুধু দুই-একটা আক্ষেপমাত্র স্পন্দিত হইতেছিল। কুম্ভকর্ণ পড়িয়া শুধু হাঁপাইতেছিল, তাহার দৃষ্টি রংলালের দিকে, চোখ হইতে দরদর ধারে জল গড়াইতেছে।

রংলাল বালকের মত কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বিপদ হইল কালাপাহাড়কে লইয়া। সে অবিরাম আঁ—আঁ করিয়া চীৎকার করে আর কাঁদে।

রংলাল বলিল—জোড় নইলে ও থাকতে পারছে না। জোড় একটা এই হাটেই কিনতে হবে।

পর হাটেই সে অনেক দেখিয়া শুনিয়া চড়া দামে কালাপাহাড়ের জোড় কিনিয়া ফেলিল। টাকা লাগিল অনেক। একটারই দাম দিতে হইল দেড়শত টাকা। কিন্তু তবুও কালাপাহাড়ের যোগ্য সাথী হইল না। তবে এটার বয়স এখনও কাঁচা, এখনও বাড়িবে। ভবিষ্যতে দুই-এক বৎসরের মধ্যেই কালাপাহাড়ের সমকক্ষ হইবে বলিয়া মনে হয়। এই তো সবে চারখানি দাঁত উঠিয়াছে।

কালাপাহাড় কিন্তু তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে শিং বাঁকাইয়া পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। রংলাল তাড়াতাড়ি কালাপাহাড়কে শিকলে আবদ্ধ করিয়া দূরে বাঁধিয়া বলিল—পছন্দ হচ্ছে না বুঝি ওকে? না, ওসব হবে না। মারলে হাড় ভেঙে দোব তোমার তাহলে, হ্যাঁ!

নূতনটাকেও বাঁধিয়া জাব দিয়া সে বাড়ির ভিতর আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, কালাপাহাড় তো ক্ষেপে উঠেছে একে দেখে। সে রাগ কত!

যশোদার মা বলিল—আহা বাপু, কুম্ভকর্ণকে বেচারা ভুলতে লারছে। কত দিনের ভাব!—কথাটা বলিয়াই সে স্বামীর দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

রংলালও হাসিল। এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সে ফিসফিস করিয়া বলিল—যেমন তোমাতে আমাতে!

—মরণ তোমার, কথার ছিরি দেখ কেনে? ওরা হল বন্ধু।

—তা বটে!—রংলাল পরাজয় মানিয়াও পুলকিত না হইয়া পারিল না, তারপর বলিল—ওঠ ওঠ। চল, জল তেল সিঁদুর হলুদ নিয়ে চল।

ঠিক এই সময়েই বাড়ির রাখালটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল—ওগো মোড়ল মাশায়, শীগগির এস গো! কালাপাহাড় নতুনটাকে মেরে ফেলালে!

—সে কি রে? শেকল দিয়ে বেঁধে এলাম যে!

রংলাল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাখালটাও পিছনে পিছনে আসিতে আসিতে বলিল, গোঁজ উপুড়ে ফেলালছে মাশায়! আর যে গাঙারছে! এতক্ষণ হয়ত মেরেই ফেলালে!

রংলাল আসিয়া দেখিল রাখালটার কথা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নয়। শিকল সমেত খুঁটিটাকে উপড়াইয়া সে আবদ্ধ নূতন মহিষটাকে দুর্দান্ত ক্রোধে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতেছে। নূতনটা একে কালাপাহাড়ের অপেক্ষা দুর্বল এবং এখনও তাহার বাল্যবয়স উত্তীর্ণ হয় নাই, তাহার উপর আবদ্ধ অবস্থায় একান্ত অসহায়ের মত পড়িয়া গিয়া সে শুধু কাতর আর্তনাদ করিতেছে। রংলাল লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তবু কালাপাহাড়ের গ্রাহ্য নাই; সে নির্মমভাবেই নবাগতকে আঘাত করিতেছিল। বহু কষ্টে যখন কালাপাহাড়কে কোনোরূপে আয়ত্তাধীন করা গেল, তখন নূতন মহিষটার শেষ অবস্থা। রংলাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

যশোদা বলিল—ওকে আর ঘরে রাখা হবে না। বেচে দাও ওকে। আবার ওর জোড় আনলে ও আবার মারামারি করবে। ও মোষ গরম হয়ে গিয়েছে।

রংলাল কথার উত্তর দিতে পারিল না; সে নীরবে ভাবিতেছিল, যশোদার কথার জবাব নাই। সে সত্যই বলিয়াছে, কালাপাহাড়ের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে। মহিষের মেজাজ একবার খারাপ হইলে আর শান্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সে অশান্তই হইয়া উঠে। কিন্তু তবু চোখ দিয়া তাহার জল আসে। দিন কয়েক পর রাখালটা আসিয়া বলিল—আমি কাজ করতে লারব মাশায়। কালাপাহাড় যে রকম ফোঁসাইছে কোনদিন হয়ত মেরেই ফেলাবে আমাকে।

রংলাল বলিল—ফোঁসফোঁস করা মোষের স্বভাব। কই, চল দেখি—দেখি।

রংলাল কালাপাহাড়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রক্তচক্ষু লইয়া রংলালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কালাপাহাড় তাহার মুখটা রংলালের কোলে তুলিয়া দিল। রংলাল পরম স্নেহে তাহার মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু রংলাল তো অহরহ কালাপাহাড়ের কাছে থাকিতে পারে না যে, তাহাকে শান্ত করিয়া রাখিবে। অন্য কেহ গেলেই কালাপাহাড় অশান্ত স্বভাবের পরিচয় দেয়। মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া চীৎকার আরম্ভ করে—আঁ—আঁ—আঁ।

সে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া কুম্ভকর্ণকে খোঁজে। দড়ি ছিঁড়িয়া সে ডাকিতে ডাকিতে ওই নদীর ধারের দিকে চলিয়া যায়। রংলাল ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে ফিরাইতে গেলেই সে রুখিয়া দাঁড়ায়।

সেদিন আবার একটা গরুর বাছুরকে মারিয়া ফেলিল। এই বাছুরটির

সহিত উহাদের বেশ একটি মিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। কুম্ভকর্ণ ও কালাপাহাড় যখন পূর্ণ উদরে রোমন্থন করিত, তখন সে আসিয়া তাহাদের ডাবা হইতে জাব খাইয়া যাইত। নিতান্ত অল্প বয়সে বহুদিন অবুঝের মত সে তাহাদের পেটের তলায় মাতৃস্তন্যের সন্ধান করিত। কিন্তু সেদিন কালাপাহাড়ের মেজাজ ভালো ছিল না, বাছুরটা ডাবায় জাব খাইবার জন্য আসিয়া তাহার মুখের সম্মুখ দিয়াই মুখ বাড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড ক্রোধে শিং দিয়া আঘাত করিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল।

যশোদা আর রংলালের অপেক্ষা করিল না। সে পাইকার ডাকিয়া কালাপাহাড়কে বিক্রয় করিয়া দিল। নিতান্ত অল্প দামেই বেচিতে হইল।

পাইকারটা বলিল—ষাট টাকাই হয়ত আমার লোকসান হবে। এ গরম মোষ কি কেউ নেবে মশায় ?

যশোদা অনেক কথা-কাটাকাটি করিয়া আর পাঁচটি টাকা মাত্র বাড়াইতে সক্ষম হইল। পাইকারটা কালাপাহাড়কে লইয়া চলিয়া গেল।

রংলাল নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

আঁা—আঁা—আঁা!

রংলাল তখনও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। আঁা—আঁা শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। সত্যই তো কালাপাহাড়! কালাপাহাড় ফিরিয়া আসিয়াছে। রংলাল ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। কালাপাহাড় তাহার কোলে মাথাটা তুলিয়া দিল।

পাইকারটা আসিয়া বলিল—আমার টাকা ফিরে দেন মশায়। এ মোষ আমি নেব না। বাপ রে, বাপ রে! আমার জান মেরে ফেলাত মশায়!

জানা গেল, খানিকটা পথ কালাপাহাড় বেশ গিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরই সে এমন খুঁট লইয়া দাঁড়াইল যে, কার সাধ্য উহাকে এক পা নড়ায়!

পাইকারটা বলিল—লাঠি যদি তুললাম মশায়—ওরে বাপ রে, সে ওর চাউনি কি! তারপর এমন তাড়া আমাকে দিলেক, আমি আধকোশ ছুটে পালাই, তবে রক্ষে। তখন উ আপনার ফিরল, একবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে এল। আমার টাকা কটা ফিরে দেন মশায়।

সে আপনার টাকা ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। যশোদা বলিল—এক কাজ কর তবে, হাটে যাও বরং।

রংলাল বলিল—আমি পারব না।

—আর কে নিয়ে যেতে পারবে, না গেলে ?

অগত্যা রংলালই লইয়া গেল। পথে সে অনেক কাঁদিল। এই হাট হইতেই কালাপাহাড়কে সে কিনিয়াছিল।

কিন্তু ফিরিল সে হাসিতে হাসিতে। কালাপাহাড়কে কেহ কেনে নাই। ওই পাইকারটা সেখানে এমন দুর্নাম রটাইয়াছে যে, কেহ তাহার কাছ দিয়াও আসে নাই।

যশোদা বলিল—তবে পরের হাটে যাও। এদিককার পাইকার ও হাটে বড় যায় না।

রংলালকে যাইতে হয়। যশোদা লেখাপড়া-জানা রোজগেরে ছেলে, সে এখন বড় হইয়াছে, তাহাকে লঙ্ঘন রংলাল করিতে পারে না। আর কালাপাহাড়কে রাখিবার কথা যে সে জোর করিয়া বলিতে পারে না। অনেক ক্ষতিই যে হইয়া গেল! মহিষটার দাম দেড় শত টাকা, তারপর গোহত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্তের খরচ সাত-আট টাকা! এই এক মাস চাষ বন্ধ হইয়া আছে, সে ক্ষতির মূল্য হিসাব-নিকাশের বাহিরে।

হাটে একজন পাইকার কালাপাহাড়কে দেখিয়া অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কিনিল, এক বড় জমিদারের এমনই একটি মহিষের বরাত আছে। দামও সে ভালোই দিল—একশ পাঁচ টাকা।

রংলাল বলিল—এই দেখ ভাই, মোষটা আমার ভারি গা ঘেঁষা। এখন এইখানে যেমন বাঁধা আছে থাক, আমি চলে যাই, তারপর তোমরা নিয়ে যেও। নইলে হয়ত চেঁচাবে, দুষ্টুমি করবে।

তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। পাইকারটা হাসিয়া বলিল—তা বেশ, থাকুক এইখানেই। তুমি যাও।

রংলাল তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া একেবারে শহরের স্টেশনে ট্রেনে চাপিয়া বসিল। হাঁটিয়া ফিরিবার মত শক্তি তাহার ছিল না।

কিছুক্ষণ পরই পাইকার কালাপাহাড়ের দড়ি ধরিয়া টান দিল। কালাপাহাড় তাহার দিকে চাহিয়া চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ডাকিল—আঁ—আঁ—আঁ!

সে রংলালকে খুঁজিতেছিল। কিন্তু কই—সে কই? পাইকারটা লাঠি দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া তাড়া দিল—চল চল।

কালাপাহাড় আবার ডাকিল, আঁা—আঁা—আঁা!

সে খুঁট পাতিয়া দাঁড়াইল, যাইবে না।

পাইকারটা আবার তাহাকে আঘাত করিল। কালাপাহাড় পাগলের মত চারিদিকে রংলালকে খুঁজিতেছিল।

কই, সে কই? নাই, সে তো নাই।

কালাপাহাড় দুর্দান্ত টানে পাইকারের হাত হইতে আপন গলার দড়ি ছিনাইয়া লইয়া ছুটিল।

এই পথ! এই পথ দিয়া তাহারা আসিয়াছে। ঊর্ধ্বমুখে সে ছুটিতেছিল, আর প্রাণপণে ডাকিতেছিল—আঁা—আঁা—আঁা!

পাইকারটা কয়েকজনকে জুটাইয়া লইয়া কালাপাহাড়ের পথরোধ করিল, কিন্তু দুর্দান্ত কালাপাহাড় পিঠের উপর লাঠিবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া সম্মুখের লোকটাকেই শিং দিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া আপন পথ মুক্ত করিয়া লইয়া উন্মত্তের মত ছুটিল।

কিন্তু এ কি! এ সব যে তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত!

শহরের রাস্তার দুই পাশে সারি সারি দোকান, এত জনতা। ওটা কী?

একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিতেছিল। কালাপাহাড় ভয়ে একটা পাশের রাস্তা দিয়া ছুটিল।

রাস্তার লোকজন হৈ হৈ করিতেছিল—কার মোষ? কার মোষ?

ও, কি অদ্ভুত আকার—বিকট শব্দ!

একখানা মোটরকার আসিতেছে। কালাপাহাড়ের জ্ঞান লোপ পাইয়া গেল, তাহার মনশ্চক্ষে আপনার বাড়িখানি দেখিতেছিল, আর রংলালকে তারস্বরে ডাকিতেছিল। সে একেবারে একখানা পানের দোকান চুরমার করিয়া দিয়া আবার বিপরীত দিকে ফিরিল।

লোকজন প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইতেছিল। কালাপাহাড়ও প্রাণভয়েই ছুটিতেছিল। দেখিতে দেখিতে দুইটা লোক জখম হইয়া গেল। কালাপাহাড় ছুটিতেছে, আর রংলালকে ডাকিতেছে, আঁা—আঁা—আঁা! কিন্তু এ কি! ঘুরিয়া ফিরিয়া সে কোথায় যাইতেছে? কোথায় কতদূরে তাহার বাড়ি?

আবার সেই বিকট শব্দ! সেই অপরিচিত জানোয়ার! এবার সে ক্রুদ্ধ বিক্রমে তাহার সহিত লড়িবার জন্য দাঁড়াইল।

মোটরখানাও তাহারই সন্ধানে আসিয়াছে। পুলিশ সাহেবের মোটর। পাগলা মহিষের সংবাদ পৌঁছিয়া গিয়াছে।

মোটরখানাও দাঁড়াইল। কালাপাহাড় প্রচণ্ড বিক্রমে অগ্রসর হইল।—কিন্তু তাহার পূর্বেই ধ্বনিত হইল একটা কঠিন উচ্চ শব্দ। কালাপাহাড় কিছু বুঝিল না, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন নিদারুণ যন্ত্রণা—মুহূর্তের জন্য। তারপর সে টলিতে টলিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

সাহেব রিভলবারটা খাপে পুরিয়া সঙ্গের কনেস্টবলকে নামাইয়া দিলেন, বলিলেন—ডোমলোগকো বোলাও।

যা দু ক রী

শরতের নির্মল জলভরা বায়ুহিল্লোলিত দীঘিতে কলরব করিয়া যেন একদল বালিহাঁস আসিয়া পড়িল।

আশ্বিন মাস। আকাশ নীল, রৌদ্রে সোনালী আভা, ঘরে ঘরে পূজার আয়োজন-উদ্যোগের সাড়া, দোকানে দোকানে পণ্যসম্ভার; পরিপূর্ণতায়, চঞ্চলতায় গ্রামখানি নির্মল জলভরা বায়ুহিল্লোলিত দীঘির সঙ্গেই তুলনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই মধ্যে বালিহাঁসের মতই কলরব করিয়া আসিয়া পড়িল দশ-বারোটি বাজিকরের মেয়ে ও জনচারেক বাজিকর পুরুষ। বাজীকর অথবা যাদুকর।

বাজিকর একটি বিচিত্র জাতি। বাংলা দেশে অন্য কোথাও আছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায় না। বীরভূমের সীথল গ্রামে এবং আশেপাশেই ইহাদের বসতি। বেদে নয় তবু যাযাবরত্বে বেদেদের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। ধর্মে হিন্দু, কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো জাতি বা সম্প্রদায় জাতিকুলপঞ্জিকা ঘাঁটিয়াও নির্ণয় করা যায় না। পুরুষেরা ঢোলক লইয়া গান করে, যাদু-বিদ্যার বাজি দেখায়। নিরীহ শান্ত প্রকৃতি, গলায় তুলসীর মালা, পরনে মোটা তাঁতের কাপড়, দুই কাঁধে দুইটা ঝোলা ও ঢোলক, মুখে এক অদ্ভুত টানের মিষ্ট ভাষা। ঐ ভাষা হইতেই লোকে চিনিয়া লয় ইহারা বাজিকর। মেয়েরা কিন্তু পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিলাসিনীর জাতি। কেশে বেশে বিন্যাস তাহাদের অহরহ, রাত্রে শুইবার সময়ও একবার কেশবিন্যাস করিয়া লয়, প্রভাতে উঠিয়া প্রথমেই বসে চুল বাঁধিতে। পরনে রেশমী শৌখীন-পাড় শাড়ি, হাতে একহাত করিয়া কাচের অথবা গিলটির চুড়ি, গলায়

গিলটির হার, উপর হাতে তাগা অথবা বাজুবন্ধ, নাকে নাকছাবি, কানে আগে পরিত সারিবন্দী মাকড়ী, এখন পরে গিলটির ঝুমকা, দুল প্রভৃতি আধুনিক ফ্যাশানের কর্ণভূষা। কাঁকালে একটা গোবর-মাটিতে লেপন দেওয়া বিচিত্র-গঠন ঝুড়ি, তাহার মধ্যে থাকে সাপের ঝাঁপি, বাজির ঝোলা, ভিক্ষা সংগ্রহের পাত্র; সেগুলিকে ঢাকিয়া থাকে ভিক্ষায় সংগৃহীত পুরানো কাপড়। মেয়েদের প্রধান অবলম্বন গান ও নাচ। নিজেদের বাঁধা গান, নিজেদের বিশিষ্ট সুর, নাচও তাই—বাজিকরের মেয়ে ছাড়া সে নাচ নাচিতে কেহ জানে না। লোকে বলে তামার বদলে রুপা দিলে নির্বিকারচিত্তে নগ্ন অবয়বে নাচে বাজিকরের মেয়ে। দর্শকে চোখ নামায়, কিন্তু বাজিকরের মেয়ে চোখের অকুন্ঠিত দৃষ্টিতে পলক পড়ে না; দুনিয়ার লোকে ছি ছি করে, কিন্তু বাজিকরের সমাজে ইহার নিন্দা নাই, বাজিকরের মনের ছন্দ পর্যন্ত মুহূর্তের জন্য অস্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে না।

গ্রামে ঢুকিয়া তাহারা ছড়াইয়া পড়িল। দল বাঁধিয়া উহারা ভিক্ষা করে না; দল দূরের কথা—স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে কখনও গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া দাঁড়ায় না।

—ভিক্ষা দাও মা রানী, চাঁদবদোনী, স্বামীসোহাগী, রাজার মা!

মুখুজ্জে-গিন্নী তরকারির বঁটিতে বসিয়া আনাজ কুটিতেছিলেন, চোখের কোণে দুই ফোঁটা জল টলমল করিতেছিল। সম্মুখে বসিয়াছিল কন্যা রমা, বিষণ্ন নতমুখে সে নখ দিয়া মাটি খুঁটিতেছিল অকারণে। গিন্নী বিরক্তিভরে বলিলেন—ওরে, ভিক্ষে দিয়ে বিদেয় কর তো, পূজো এল আর এই আরম্ভ হল বাজিকরের আমদানী।

—নাচন দ্যাখেন মা, গান শোনেন। কই, আমাদের রমা ঠাকরন কই?

—না। নাচ দেখবার মত মনের সুখ নাই আমার। ওরে—

—বালাই! ষাঠ! শত্রুর মনের সুখ যাক। আপনকার দুঃখ কিসের—

—বকিস নে বলছি! এমন হারামজাদা জাত তো কখনো দেখি নাই। ওরে রমা, ঝি কোথায় গেছে, তুই-ই দে তো ভিক্ষে।

রমা ভিক্ষা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বাজিকরের মেয়েটি রমার চেয়ে বয়সে বড় হইলেও দেখিতে প্রায় সমবয়সী মনে হয়। তাহার মুখ স্মিতহাস্যে ভরিয়া উঠিল, পরমুহূর্তেই বলিয়া উঠিল—ভোজটা ফাঁকি পড়লাম দিদি ঠাকরন।

রমা বিরক্তিভরেই বলিল—নে নে, ভিক্ষে নে।

—কোন মাসে বিয়া হল ঠাকরুন? কোথা হল বিয়া?

গৃহিণী উঠিয়া আসিলেন, রূঢ়ভাবে বলিলেন—ভিক্ষে নিবি তো নে, না নিবি তো বিদেয় হ।

—ওরে বাপ রে। তাই পারি! আজ শুধু ভিখ নিয়া যেতে পারি! দিদি ঠাকরুনের বিয়ার ভোজ খেতে পেলম নাই, বিদায় পেলম নাই—আজ শুধু ভিখ নিয়া যেতে পারি! আজ নাচ দেখাব, গান শুনাব, শিরোপা নিব। কাঁকালের ঝুড়িটা নামাইয়া কাপড়ের আঁচল কোমরে জড়াইয়া বলিল—কাপড় নিব, রমা দিদির কাছে নিব কাঁচের চুড়ির দাম, তবে ছাড়ব।—বলিয়াই সে আরম্ভ করিল—

হায় গো দিদি, কাঁচের চুড়ির ঝমঝমানি
উর-র-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা—
জার ঘিনিনা—
চুড়ির ওপর রোদের ছটা
হায় মরি কি রঙের ঘটা
সোনারুপো বাতিল হল কাঁদছে বসে স্যাকরানী।
বেলাত হতে জাহাজ বোঝাই
হল চুড়ির আমদানী।
উর-র-র জাগ জাগিন ঘিনা—
জার ঘিনিনা—

সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের চুড়ি সে তালে তালে বাজাইতেছিল—ঝম্ ঝম্! ঝম্ ঝম্! একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পাক খাইয়া খাইয়া বাজিকরীর সর্বাঙ্গ নাচিতেছিল সাপিনীর মত। গিন্নী ও রমা দুজনের বিষণ্ণ মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল—অতি মৃদু ক্ষীণ রেখায়। বাড়ির এবং পাশের বাড়ির মেয়েরাও আসিয়া জুটিয়া গেল। বাজিকরী নাচিয়াই চলিয়াছে—চোখের তারা দুইটি নেশার আমেজে যেন ঢুল ঢুল করিতেছে, সঙ্গে বিচিত্র সঙ্গে সুরের গান।

পাড়ার যত এয়োস্ত্রীরি—শাঁখা ফেলে পরছে চুড়ি—
লালপরী সবুজপরী—মাঝখানে হলুদ পারা—
ওগো চুড়ির বাহার দেখে যা, তোরা—
এবার যদি না দাও চুড়ি, ত্যজ্য করব
এ ঘর বাড়ি—

নয়কো দোব গলায় দড়ি
তবু চুড়ি পরব গো—
হাতের শাঁখা ঘাটে ভেঙে
ফেলব চোখের নোনা পানি।—
উররর জাগ জাগ—

গান শেষ করিয়া বাজিকরী থামিল।

চুড়ির জন্য গলায় দড়ি দিবার সঙ্কল্প শুনিয়া মেয়েরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল, একজন বলিল—মরণ!

বাজিকরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—চুড়ি লইলে মরণ ভালো গো ঠাকরন। রমাদিদি, চুড়ির পয়সা লিয়ে এস—কাপড়-গয়না নিব তোমার বরের কাছে। বর কখন আসবে বল। চিঠি লিখ তুমি। আমার নাম করে লিখ।

রমা বা গিন্নী কোনো কথা বলিল না, একজন প্রতিবেশিনী তরুণী বলিল —তুই যা না হারামজাদী তার কাছে।

—র‍্যাল ভাড়া দাও, ঠিকানা দাও, চিঠি লিখে দাও। আজই যাব। বর লিয়ে আসব—নাকে দড়ি দিয়া বেঁধ্যা রমাদিদির দরবারে।

—মরণ! ও-পাড়ায় যেতে আবার র‍্যাল ভাড়া লাগে নাকি?

গালে হাত দিয়া মেয়েটা সবিস্ময়ে বলিল—গাঁয়ে গাঁয়ে বিয়া না কি?

—ঢং করছে। কিছু জানিস না নাকি?

—কি কর‍্যা জানব দিদি, আমরা ফিরেছি তো দেশে তিন দিন।

বাজিকরের জাত ভিক্ষা করিয়া দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাযাবর সম্প্রদায়ের মত গৃহহীন নয়, ভূমিহীন নয়—ঘর আছে। প্রাচীনকাল হইতে নিষ্কর জমিও ইহারা ভোগ করে, তবু ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। পূজার পূর্বে দেশে আসে, পূজার পর বাহির হয়, ফেরে ফসল উঠিবার সময়, ফসল তুলিয়া, জমিগুলি ভাগচাষে বিলি করিয়া আবার বাহির হয় নীল সংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসবের পর। গাজন ইহাদের বিশেষ উৎসব।

মেয়েটি বলিল—ও পাড়ার বাঁড়ুজ্জে বাড়ির দেবুকে জানিস?

চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া বাজিকরী বলিল—খোকাবাবু? কলকাতায় কলেজে পড়ে, টকটকে রঙ, শিবঠাকুরের মত ঢুলু ঢুলু চোখ,—লল্‌ছা পারা বাবুটি?

—হ্যাঁ।

—অ-মাগ! আমি কুথা যাব গ!—মেয়েটা যেন হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। —বুঝলে ঠাকরন, বাবুটিকে দেখতম আর ভাবতম ইয়ার গলায় মালা কে দিবে? আর রমাদিদিকে দেখ্যা ভাবতম ই লক্ষ্মী ঠাকরনটি কার গলায় মালা দিবে?

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখুজ্জে-গিন্নী বলিলেন—থাম বাবু তুই, আদিখ্যেতা করিস নে। কপালে আমার আগুন লেগেছিল—তাই ওই ঘরে বরে আমি বিয়ে দিতে গিয়েছিলাম।

—কেনে মা?—মেয়েটা চকিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে সকলের মুখের দিকে সে একবার চাহিয়া দেখিল, সকলেরই মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। রমা দাঁড়াইয়াছে দূরে, নতমুখে; না দেখিয়াও চতুরা বাজিকরী বুঝিয়া লইল—রমার চোখে জল ছলছল করিতেছে।

ক্ষতসন্ধানী মক্ষিকার মত মেয়েটা ব্যগ্রতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

মুখুজ্জেরা অবস্থাপন্ন লোক। গ্রামখানি বেশ বড়, গ্রামের চেয়ে ছোট শহর বলিলেই ঠিক হয়—ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণে দিন দিন বড় এবং শহরের শ্রীতেই সমৃদ্ধ হইয়া চলিয়াছে; অবস্থাপন্ন ব্যবসাদারও কয়েকজন আছে, তবু মুখুজ্জেদের অবস্থাপন্ন বলিয়া খ্যাতি আছে। রমা পিতামাতার একমাত্র সন্তান। শ্রীমতী মেয়ে বাপ-মায়ের আদরের দুলালী। মেয়েকে চোখের আড়াল করিতে পারিবেন না বলিয়াই গ্রামে বিবাহ দিয়াছেন। ঘরজামাইকেও মুখুজ্জে-কর্তা ঘৃণা করেন। ও-পাড়ার বাঁড়ুজ্জেরা এককালে সম্ভ্রান্ত সঙ্গতিপন্ন ঘর ছিল—এখন শুধু সম্ভ্রম আছে, সঙ্গতি নাই। এই বাঁড়ুজ্জেদের দেবনাথ ছেলেটি বড় ভালো। সুরূপ সুন্দর ছেলে, বি-এ পাশ করিয়া এম-এ পড়িতেছে। এই ছেলেটির সঙ্গে মুখুজ্জেরা রমার বিবাহ দিয়াছেন। ক্ষেতের কলা-মূলা হইতে রান্না-করা তরকারী পর্যন্ত—যাহা নিজেদের ভালো লাগিবে তাহাই মেয়ে-জামাইকে পাঠাইয়া দিবেন, মেয়ে একবেলা থাকিবে শ্বশুরবাড়িতে, একবেলা থাকিবে বাপের বাড়িতে এই ছিল তাঁহাদের কল্পনা।

বিবাহের পর কিন্তু বিরোধ বাধিয়াছে এইখানেই। বনিয়াদী বাঁড়ুজ্জেরা কলা-মূলা রান্না-করা তরকারী উপঢৌকনে অপমান বোধ করিয়াছেন। বধূর একবেলা এখানে—একবেলা ওখানে থাকাও তাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছিল, অকস্মাৎ একদিন রমাই সেটাকে বিবাদে পরিণত করিয়া তুলিল। রোজ অপরাহ্ণে মুখুজ্জে-বাড়ির ঝি

আসিয়া রমাকে লইয়া যাইত—দুধ এবং জল খাইবার জন্য। সেদিন কিসের ছুটিতে দেবনাথ আসিয়াছিল বাড়ি। রমার শাশুড়ী আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছিলেন—দেবু বাড়ি এসেছে, আজ আর বৌমা যাবে না।

পরক্ষণেই দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন—আর রোজ রোজ কচি খুকীর মত দুধ খেতে যাওয়াই বা কেন? গরীব বলে কি দুধও খাওয়াতে পারি নে আমি বেটার বউকে? বলিস তুই, একটা পাড়া অন্তর রোজ আমার বেটার বউ আমি পাঠাব না।

ঝিটা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—আজকের মত পাঠিয়ে দেন মা, মা আজ খাবার-দাবার করেছেন—

—না-না-না!—রূঢ়স্বরে রমার শাশুড়ী জবাব দিয়াছিলেন।

ঝি ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখা গিয়াছিল—বউ বাড়িতে নাই। গ্রামের মেয়ে মা-বাপের আদরের দুলালী ততক্ষণে জনবিরল গলি পথে পথে মায়ের কাছে গিয়া হাজির হইয়াছিল।

আরও কিছুক্ষণ পর মুখুজ্জে-বাড়ি হইতে এক প্রবীণা আত্মীয়া আসিয়াছিলেন দেবনাথের নিমন্ত্রণ লইয়া—কই হে দেবুর মা, দেবুর আজ নেমন্তন্ন ও-বাড়িতে। তার শ্বশুর পাঁঠা কেটেছে। শাশুড়ী খাবার করেছে।

নিমন্ত্রণ স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই না করিয়া দেবুর মা জানাইয়াছিলেন কেবল ভদ্রতাসম্মত সম্ভাষণ—এস বস।

—বসব না ভাই। নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম। বউও তোমার ও-বাড়িতে। খেয়ে দেয়ে বউ-বেটা তোমার ও-বাড়িতেই আজ থাকবে; কাল সকালে আসবে।

বাঁড়ুজ্জে-গিন্নীর মুখ আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের মত থমথমে হইয়া উঠিয়াছিল—কথার জবাব তিনি দেন নাই।

—তা হলে চললাম ভাই। সন্ধ্যাতেই পাঠিয়ে দিও দেবুকে—

—দেবুকেই কথাটা বলে যাও।

—সে কি!

—হ্যাঁ। ব্যাটার শ্বশুরবাড়ির কথাতেও আমি নাই, বউয়ের কথাতেও আমি নাই।

দেবনাথ রাত্রে যায় নাই। সেও বধূর এই আচরণে ক্ষুব্ধ না হইয়া পারে নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীর এই প্রশ্রয়পূর্ণ ব্যবহারও তাহার ভালো লাগে

নাই। তাহার উপর ক্ষুব্ধ মাকে উপেক্ষা করিয়া এই নিমন্ত্রণ রক্ষার কোনো উপায়ই ছিল না।

ঝগড়ার সূত্রপাত এইখানেই।

দেবনাথের মা বলিলেন—বধূর পিতামাতাকে কন্যাকে লইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া এ বাড়িতে দিয়া যাইতে হইবে।

রমার মা বলিলেন, দেবনাথ নিজে আসিয়া রমার অভিমান ভাঙাইয়া তাহাকে লইয়া যাইবে—তবে তিনি কন্যাকে পাঠাইবেন।

উপেক্ষিতা রমা সেদিন নাকি কাঁদিয়াছিল। ধীরে ধীরে সেই বিবাদ কঠিন পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। দেবনাথ স্ত্রীকে চিঠিপত্র পর্যন্ত লেখে না। দেবনাথের মা আস্ফালন করেন, ছেলের তিনি বিবাহ দিবেন। ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক—এই অকাল কয়মাসের অপেক্ষা।

রমার মা ইহাতে ভয় পান না; তিনি কন্যার জন্য দালান-কোঠার প্ল্যান করেন। ইদানীং তিনি খোরপোশ আদায়ের আরজি পর্যন্ত মুসাবিদা করিতে শুরু করিয়াছেন।

ভরসা কেবল দুই পক্ষের পিতা।

মুখুজ্জে-কর্তা ব্যবসা-বাণিজ্যে মহাজনি লইয়া ব্যস্ত। বাঁড়ুজ্জে-কর্তা আজীবন মাস্টারী করিয়াছেন। রিটায়ার করিয়াও তিনি আজও পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত। ইতিহাসের মাস্টার। ভাঙা মূর্তি, পুরানো পুঁথি সংগ্রহ করিয়া গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। দুই পক্ষের গিন্নী তারস্বরে চীৎকার করিয়াও অপদার্থ মানুষ দুইটাকে সচেতন করিতে পারেন না বলিয়া মধ্যে মধ্যে কপালে করাঘাত করেন।

বাজিকরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া সারা হইল।

মুখুজ্জে-গিন্নীর প্রতিবেশিনীর বাড়িতে বসিয়া কথা হইতেছিল। প্রতিবেশিনী বিরক্ত হইয়া বলিল—মর, এতে আবার হাসি কিসের?

—হাসি নাই? ছাগলের লড়াই দেখেছ ঠাকরন?—বলিয়া আবার খিল খিল করিয়া হাসি!

—হাসি-তামাসা, পরের কথা রাখ; এখন আমি যা বললাম তার কি বল!

তাহার দিকে চাহিয়া বাজিকরী বলিল—তুমার হাতে যোগবশের ওষুদ খাটবে না ঠাকরন!

মেয়েটি বশীকরণের ঔষধ চায়। সবিস্ময়ে সে বলিল—খাটবে না! কেন?

—রাগ কর নাই। তুমি বড় ময়লা থাক ঠাকরন। আমার ওষুদ লিতে হলে তুমাকে পরিষ্কার হতে হবে কিন্তুক।

—আমি তো রোজ চান করি—

—স্নান করা লয় ঠাকরন; পরিষ্কারের অনেক করণ আছে। তোমাকে কাপড় পরতে হবে, কেশ-বিন্সেস করতে হবে, ঢলকো করে চুল বাঁধবা, কপালে সিঁদুরের টিপ পরবা। গায়ে গন্ধ লিবা। আলতা পরবা। খোঁপাতে ফুল পরবা, সেই ফুল কর্তার হাতে দিবা। ভেব্যা দেখ, এসব পার তো এলাচ আন, আমি মন্তর দিয়া পড়ে দি।

স্থিরদৃষ্টিতে বাজিকরীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া মেয়েটি বলিল—পারব।

—তবে আন, এলাচ আন। ছোট এলাচ, দারচিনি, বড় এলাচ; মন্তর পড়ে দিব, তাই দিয়া মোটা খিলি করে পান সাজবা, নিজে খাবা; খেয়ে কর্তাকে দিবা। কিন্তুক যা বললাম—তা না করলে খাটবে নাই ওষুদ। তখন যেন আমাকে গাল দিয়ো না। আর পাঁচটি পয়সা লাগবে, পাঁচ পাই চাল লাগবে, পাঁচটি সুপারী, সিঁদুর—আর পুরানো কাপড় একখানি। লিয়ে এস।

বাজিকরী চলিয়াছে বাজারের পথে।

একটা দোকানের সম্মুখে লোকের ভিড় জমিয়াছে, বাজিকর পুরুষ বাজি দেখাইতেছে।

—লাগ—লাগ—লাগ—লাগ ভেল্কী লাগ! লাগ বললে লাগবি, ছাড় বললে ছাড়বি। ভাটরাজার দোহাই দিয়ে ডুববি বেটা টুপ টুপিয়ে—! বাহা রে বেটা—বাহা রে!

একটা বাটির জলে একটা কাঠের হাঁস ক্রমাগত ডুবিতেছিল, আর উঠিতেছিল।

—হাঁ—হাঁ বেটা, আর ডুবিস না, সর্দি লাগবে, জ্বর হবে!

হাঁসটা ডোবা বন্ধ করিল।

—এইবার আমার কাঠের হাঁস—শুন আমার কথা, ক্ষিধায় জ্বলছে পেট, ঘুর্‌্যা পরছে মাথা; প্যাঁক প্যাঁকিয়ে ডাক ছেড়্যা, দে দেখি একটা ডিম পেড়্যা; আগুন জ্বেল্যা পুড়ায়ে খাই।

একটা ঝুড়ির ভিতর কাঠের হাঁসটাকে চাপা দিয়া বাজিকর বোল আওড়াইয়া একটা হাড় ঝুড়িটাতে ঠেকাইয়া দিল।—ভাটরাজার দোহাই

দিয়ে, ওঠ বেটা প্যাক পেঁকিয়ে! দোহাই, ভাটরাজার দোহাই।—সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়িটা উঠাইতে দেখা গেল—কাঠের হাঁস জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঠোঁট দিয়া সে পালক খুঁটিতেছে, পাশে একটা ডিম।

দর্শকের দল আনন্দে বিস্ময়ে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। ছোট ছেলের দলে হাততালি আর থামে না!

বাজকিরী মৃদু হাসিতে হাসিতে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিল।

—এই বাজকরুনী! এই!

থানার বারান্দায় বসিয়াছিল কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী। তিনজন ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়াছিল। জনকয়েক বসিয়াছিল বারান্দায়। একজন ডাকিল—এই বাজকরুনী। এই!

বাজিকরী আসিয়া কাঁকালের ঝুড়িটি নামাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।—পেনাম দারোগাবাবু!

—তোর নাচ দেখা দেখি! এই বাবু তোদের নাচ দেখেন নাই, দেখবেন।

বাজকিরী দেখিল, তাহার চেনা বড় দারোগা ও ছোট দারোগার পাশে নূতন একটি বাবু। চতুরা বাজিকরীর ভুল হইল না, সে মুহূর্তে চিনিল, এও এক দারোগাবাবু। গোঁফের এমন জাঁকালো ভঙ্গি, কপালে এমন গোল দাগ, গায়ে এমন হাতকাটা খাঁকীর জামা, দারোগা ছাড়া কাহারও হয় না।

বড় দারোগাকে প্রণাম করিয়া সে বলিল—আপনি ই-থান থেক্যা চল্যা যাবেন বাবু?

—হঠাৎ আমাকে বিদেয় করবার জন্যে তোর এত গরজ কেন?

—আজ্ঞে, লতুন দারোগাবাবু এলেন—তাথেই বলছি!

—উনি এখানে কাজে এসেছেন।

—কাজে?

—হ্যাঁ, তোকে ধরে নিয়ে যাবেন। পরোয়ানা আছে তোর নামে।

—আমার নামে?—মেয়েটি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—হাসছিস যে! তুই হারামজাদী পাকা চোর।

হাসিতে হাসিতে বাজিকরী বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ! কিন্তু ধর্যা কি করবেন হুজুর, মন চুরির বামাল যে সনাক্ত হয় না।

নূতন দারোগাবাবুটি চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—ওরে বাপরে—

বাজিকরী দুই হাতে তুড়ি দিয়া আরম্ভ করিল—

উর-র জাগ জাগ জাঘিন ঘিনা জারঘিনি না—

সরু কাপড় নক্সিপেড়ে—মাকড়ী চুড়ি গয়না—

গোট পাটা সাপ কাঁটায় পুঁজিপাটা রয় না—

বিদায় হইয়া বাজিকরী চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বারান্দায় উপবিষ্ট কনেস্টবল দলের জনদুয়েক উঠিয়া গিয়া থানার বড় বটগাছটার আড়াল হইতে তাহাকে ডাকিল।

হাসিয়া বাজিকরী বলিল—বল, কি বলছ!

—আমাদের আলাদা করে নাচ দেখাতে হবে।

—দেখাব।

—ল্যাংটা হয়ে নাচতে হবে। এরা এসেছে ভরতপুর থেকে, দেখবে।

মুখের দিকে চাহিয়া বাজিকরী বলিল—একটি টাকা লিব কিন্তুক।

—আমি দেব।

—তুমি ভরতপুরের সিপাই?

—হ্যাঁ।

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বাজিকরী বলিল—কিসের লেগে এলে ভুমরা?

—কাজ আছে, পুলিশের কাজ।

ফিক করিয়া হাসিয়া মেয়েটা এবার বলিল—কার মাথা খেতে এসেছ আর কি।

কনেস্টবলটিও হাসিল।

বাজিকরী তাহার গা-ঘেঁষিয়া চলিতে চলিতে মৃদুস্বরে বলিল—মানুষটা কে বঁধু?

কনেস্টবলটা তাহার মুখের দিকে চাহিল; মদিরদৃষ্টিতে বাজিকরী তাহারই দিকে চাহিয়াছিল, ঠোঁটের রেখায় রেখায় মাখানো লাস্যভরা হাসি।

মেয়েটা সত্যই নাচে সমস্ত আবরণ পরিত্যাগ করিয়া। এতটুকু সঙ্কোচ নাই, কুণ্ঠা নাই, যৌবন-লীলায়িত অনাবৃত তনুদেহ, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। সকলের কলুষ দৃষ্টি তাহার দিকে নিবদ্ধ থাকিলেও তাহার দৃষ্টি কাহারও দিকে নিবদ্ধ ছিল না। কণ্ঠে মৃদুস্বরে সঙ্গীত—

হায়রে মরি গলায় দড়ি

তুমি হরি লাজ দিবা

হায়রে মরি গলায় দড়ি
তুমি হরি লাজ দিবা,
তুমার লাজেই আমি মরি
নইলে আমার লাজ কিবা
কুল ত্যজিলাম মন সঁপিলাম
কলঙ্কেরই কাজল নিলাম—
হায়রে মরি বস্ত্র নিয়া
তুমি আমায় লাজ দিবা !
উর-র জাগ জাগ জাগিন ঘিন— ;

আগন্তুক কনেস্টবলটি একটা টাকাই দিল। খানিকটা পথও তাহাকে আগাইয়া দিল। মেয়েটি বলিল—এইবার এস লাগর, আর লয়।

হাসিয়া সিপাহী বলিল—আচ্ছা।

—তুমি কিন্তুক লোক ভালো লয়।

—কেন ?

—বল না কথাটা।—মেয়েটি ফিক করিয়া হাসিল।

আশ্বিনের প্রথম নির্মেঘ নির্মল নীল আকাশে মধ্যাহ্ন ভাস্কর, ভাস্বরতম দীপ্তিতে জ্বলিতেছে। বৈশাখের আকাশ প্রখরতর বটে কিন্তু এমন উজ্জ্বল নয়। বিগত বর্ষার বর্ষণসিক্ত মাটি হইতে সূর্যের উত্তাপে যেন বাষ্পোত্তাপ উঠিতেছে। ঘামে ভিজিয়া মানুষ সারা হইয়া গেল।

বাজিকরের দল এখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গৃহস্থের বাড়িতে তাহাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। এইবার সেইখানে গিয়া পাতা পাড়িয়া বসিবে।

বাঁড়ুজ্জে-বাড়িতে সেই বাজিকরী আসিয়া চাপিয়া বসিল।

—পেসাদ হল মা ঠাকরণ ? বাবুদের সেবা হল ? পড়ল পাতার এঁটোকাঁটা ?

বাঁড়ুজ্জে গিন্নি বলিলেন—বস বস, চেঁচাস নে।

ছেলে দেবনাথ পান মুখে দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, সে বাহির দরজার ওপাশ হইতে মেয়েটাকে ডাকিল—শোন।

কাছে আসিয়া ঠুক করিয়া একটি প্রণাম করিয়া মেয়েটা ফিক করিয়া হাসিল, বলিল—আপনকার ভিতরটা পাথরে গড়া।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবনাথ বলিল—বলেছিস মাকে ?

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া মেয়েটি বলিল—মিছা বলেছি তো বেটাবেটীর মাথা খাব বাবু!

—তুই দেখেছিস?

—নিজের চোখে গো। বাপ কাঁদছে, মা কাঁদছে, মেয়ের সেই রূপণ!

কথাবার্তায় বাধা পড়িল। ভিতর হইতে গিন্নী ডাকিলেন—হ্যাঁলা বাজকরুনী, গেলি কোথায়?

দেবনাথ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল—দেখ, মা ডাকছেন।

গিন্নী বলিলেন—ওই শোন, ওর কাছে।

বাড়ুজ্জে-কর্তা মেয়েটার দিকে চাহিয়া বলিলেন—বাজিকর তোরা?

—আজ্ঞা হ্যাঁ বাবু; আপনকাদের চরণের ধূলা।

—হুঁ। সাপ আছে? বাজি দেখাতে পারিস? গান গাইতে পারিস? মন্তরতন্তর ওষুধপত্র জানিস?

—আজ্ঞা হ্যাঁ হুজুর।

—ভাটরাজাকে জানিস? ভাটরাজা?

বারবার প্রণাম করিয়া মেয়েটা বলিল—ওরে বাপ রে। দেবতা আমাদের। ভগবান আমাদের। এখনও জমি খাই। দোহাই দিয়ে বাজি দেখাই।

মৃদু হাসিয়া কর্তা বলিলেন—ভাটরাজা নয়। তাঁর নাম হল ভবদেব ভট্ট। আর তোদের গ্রামের নাম কি জানিস? সীথল গাঁ নয়—সিদ্ধল, সিদ্ধল।

গিন্নী রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন—বলি হ্যাগা! ঐ সব জিজ্ঞেস করতে তোমায় ডাকলাম বুঝি? যত বাজে—

—বাজে নয়। রাঢ়দেশে সিদ্ধলে ভবদেব ভট্ট মহাপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি—

—এই দেখ, এইবারে আমি মাথা খুঁড়ে মরব।

কর্তা একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন।

মেয়েটারও বিস্ময়ের সীমা ছিল না; সীথল গ্রামের নাম সিদ্ধল, ভাটরাজার নাম ভবদেব ভট্ট! সে বলিল—কর্তাবাবু, আপনি এত কি কর‍্যা জানলা গো?

গিন্নী বলিলেন—বউমার কথা জিজ্ঞেস কর ওকে। ও নিজের চোখে দেখেছে।'

—জিজ্ঞেস আর কি করব! আজই ব্যবস্থা করছি আমি—কর্তা চলিয়া

গেলেন পড়ার ঘরে। সিদ্ধলে ভবদেব ভট্টের ইতিহাসটা আজও তাঁহার অসমাপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। আজ এই বাজিকরীকে দেখিয়া মনে পড়িয়া গিয়াছে।

অপরাহ্লেরও শেষভাগ।

বাজিকরের দল গ্রাম ছাড়িয়া আপন গ্রাম সীথল গ্রামের দিকে চলিয়াছে। গ্রামের প্রান্তে আসিয়া সেই বাজিকরীটা থমকিয়া দাঁড়াইল।

—তুরা চল গো। সবরাজপুরের হোথা দাঁড়াস খানিক, আমি এলাম বল্যে।

দলের কেহ কোনো প্রশ্ন করিল না, বলিল—আচ্ছা।

—হঁ্যা, ও নটবর, তুর বাজির ঝোলা আর ঢোলকটা দিবি ?

নটবর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তু বড় বাড়াবাড়ি করছিস কিন্তুক।

মেয়েটা উত্তরে কেবল হাসিল। নটবর মুখে ও-কথা বলিলেও ঝুলি ও ঢোলক দিতে আপত্তি করিল না। কাঁকালের ঝুড়িতে কাপড় চাপা দিয়া বেশ করিয়া ঢাকিয়া লইয়া মেয়েটা দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল। আসিয়া উঠিল ডোমপাড়ায়।

ডোমপল্লী—এ অঞ্চলের বিখ্যাত চোর-ডাকাতের পল্লী। পল্লীর প্রত্যেক মানুষটির রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে অসংখ্য কোটি চৌর্যপ্রবণতার বীজাণু যেন কিলবিল করে।

—গান শোনবা গো। গান! নাচন দেখ। নাচন!—মেয়েটা শশী ডোমের বাড়ি আসিয়া ঢুকিল। কাহারও সম্মতির অপেক্ষা করিল না, গান আরম্ভ করিয়া দিল। গান গাহিতে গাহিতে চকিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সহসা নজরে পড়িল কোঠার জানলায় একখানি মুখ। বাইশ-চব্বিশ বৎসরের জোয়ানের মুখ। মুখখানা তাহার ভালো লাগিল। গান শেষ করিয়া সে শশীকে ডাকিল—শোন।

—কি ?

—উপরে মানুষটি কে ?

শশী ক্রোধে ভীষণ হইয়া উঠিল।

হাসিয়া মেয়েটি বলিল—রাগ করছ কেনে, ভালো বলছি। তুমার জামাই, হামি জানি।

শশী স্তম্ভিতের মত মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি বলিল—ভরতপুর থেকে দারোগা এসেছে, সিপাই এসেছে। কাল সকালে তুমার ঘর থানাতল্লাস হবে, উয়ার নামে পরোয়ানা আছে।

শশী এবার শুকাইয়া গেল।

—তুমার দুয়ারে সারাদিন নোক মোতায়েন আছে। সাঁজের পরে ঘর ঘেরাও করবে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শশী বলিল, জানি।

—এক কাজ কর। এই ঢোলক দাও, এই ঝুলি দাও উয়ার কাঁধে। মাথায় মুখে গামছাটা বেঁধ্যা দাও ফেটা করে। আমার সাথে সাপ আছে। আমি ধরি মুখটা—উ ধরুক লেজটা। তুমরা চেঁচাও সাপ সাপ বল্যা। আমি উয়াকে নিয়ে চল্যা যাই, পুলিশের নোক বুঝতে লারবে, ভাববে আমরা বাজিকর।

মেয়েটা হাসিতে আরম্ভ করিল, সে যেন আকণ্ঠ মদ খাইয়া নেশায় বিভোর হইয়া পড়িয়াছে।

বাজিকরী চলিয়াছে, সঙ্গে তাহার নকল বাজিকর। দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিয়া গ্রাম পার হইয়া চলিতেছে। দক্ষিণপাড়া ভদ্রলোকের পল্লী, পল্লীপথে একখানা পাল্কী আসিতেছে। সঙ্গে দুইজন লোকের মাথায় বাক্স ও কুটুম্ব-বাড়ির তত্ত্বতল্লাসের জিনিসপত্র।

পাল্কীটা আসিয়া থামিল বাড়ুজ্জে-বাড়িতে। পাল্কী হইতে নামিল বাঁড়ুজ্জে বাড়ির বধূ—মুখুজ্জে-বাড়ির মেয়ে রমা। বাঁড়ুজ্জে-গিন্নী আজই দেবনাথকে পাল্কী সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার বধূ আজই সন্ধ্যার পূর্বে মাহেন্দ্রযোগে পাঠাইয়া দিতে হইবে। মুখুজ্জে-কর্তার অমত কোনোকালেই ছিল না। মুখুজ্জে-গিন্নীও আর অমত করেন নাই। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল—দেবনাথ নিজে আসিয়া কন্যার অভিমান ভাঙাইয়া লইয়া যাইবে, তবে পাঠাইবেন। দেবনাথ নিজে লইতে আসিয়াছে, কন্যার অভিমান নাই, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সম্মত হইয়া পাঠাইয়া দিলেন। জামাইয়ের হাত ধরিয়া চোখের জলও ফেলিয়াছেন। কাল তিনি বেয়ানের কাছেও আসিবেন। বাপ রে, তিনি জামাইয়ের মা, তাহার উপর তিনি গাহিতে পারেন? মেয়ে পাঠাইয়া তিনি কর্তার কাছে চলিলেন—মেয়ে-জামাইয়ের পূজার তত্ত্বের ফর্দ লইয়া।

মুখুজ্জে-গিন্নী কর্তার ঘরে ঢুকিয়া লজ্জায় গালে হাত দিলেন। তাঁহার

প্রতিবেশীর ঘরের খোলা জানালা দিয়া যাহা তিনি দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার লজ্জার অবধি রহিল না। প্রতিবেশিনী মেয়েটি তো খুকী নয়, সে আজ রঙীন শাড়ি পরিয়াছে, ব্লাউজ পরিয়াছে, কেশবিন্যাসের কি পারিপাট্য, খোঁপায় ফুল। স্বামীর সহিত যাহার দিনরাত ঝগড়া হইত—সে হাসিয়া স্বামীর হাতে পান দিতেছে। স্বামীও হাসিতেছে।

রমা পাল্কী হইতে নামিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া নীরবে অপরাধিনীর মত দাঁড়াইল।

শাশুড়ী সেটুকু অনুভব করিয়া সস্নেহে বধূর মাথায় সিঁদুর দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—ছি মা, কি সর্বনাশ হত, বল দেখি!

রমার চোখ হইতে টপ টপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। গিন্নী বলিলেন —যাও, আপনার ঘর দেখে শুনে নাও গে। আমি বুড়োমানুষ পারব কেন, তবু যা পেরেছি গুছিয়ে রেখেছি।

গিন্নী কর্তার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। কর্তা ঘাড় গুঁজিয়া লিখিতেছিলেন।

—দেখ, কথাটা সত্যি।

—হুঁ।

—আফিং যদি সত্যি না খেতে চাইবে তবে, বৌমা কাঁদল কেন? বাজকরুনী ভাগ্যে দেখেছিল! ছুঁড়িটা এইদিন এলে একখানা কাপড় দেব।

কর্তা মুখ তুলিয়া বিজ্ঞের মত খানিকটা হাসিয়া বলিলেন—ওদের খবর মিথ্যা হয় না গিন্নী। ওরা কারা জান?—আবার খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, ওরা নিজেরা অবশ্য জানে না; বাংলা দেশেই বা কজনে জানে? শোন—রাঢ়ের সিদ্ধলরাজ ভবদেব ভট্ট—গুপ্তচরের এক অতি নিপুণ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নটী ও রূপোপজীবিনীদের সন্ততি লইয়া গঠিত হইয়াছিল এই সম্প্রদায়। নারী এবং পুরুষ—উভয় শ্রেণীই গুপ্তচরের কাজ করিত। ইহাদিগকে ভোজবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র, অবধৌতিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত, নারীরা নৃত্যগীতে নিপুণ ছিল। এই সম্প্রদায় যাযাবরের মত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশ দেশান্তরের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিত। তৎকালীন অন্যান্য রাজারাও এই দৃষ্টান্তে—

গিন্নী চলিয়া যাইতেছিলেন, কর্তা বলিলেন—শেষটা শোন—

গিন্নী পিচ কাটিয়া বলিলেন—ওসব শুনবার আমার এখন সময় নেই। যত সব উদ্ভট কথা।

গ্রামের প্রান্তে নকল বাজিকরকে বিদায় দিয়া বাজিকরী বলিল—চললাম লাগর। এইবার চল্যা যাও সোজা।

দ্রুতপদে বাজিকরী সবরাজপুরের দিকে চলিল।

এত বড় ডোম জোয়ানটি বারবার কথা বলিতে চাহিয়াও পারিল না। বহু কষ্টে অবশেষে তাহার কথা ফুটিল, সে ডাকিল—শোন!

কেহ উত্তর দিল না। রাত্রির অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখে ডোম ছেলেটি দৃষ্টি হানিয়া তাকাইল—কিন্তু দেখিতে পাইল না। বাজিকরী যেন মিলাইয়া গিয়াছে।

বে দে নী

শম্ভু বাজিকর এ মেলায় প্রতি বৎসর আসে। তাহার বসিবার স্থানটা মা কঙ্কালীর এস্টেটের খাতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত কায়েমী হইয়া গিয়াছে। লোকে বলে, বাজি; কিন্তু শম্ভু বলে, ভোজবাজি—'ছারকাচ'। ছোট তাঁবুটার প্রবেশপথের মাথার উপরেই কাপড়ে আঁকা একটা সাইনবোর্ডেও লেখা আছে 'ভোজবাজি—সার্কাস'। লেখাটার এক পাশে একটা বাঘের ছবি, অন্য পাশে একটা মানুষ, তাহার এক হাতে রক্তাক্ত তলোয়ার, অপর হাতে একটা ছিন্নমুণ্ড। প্রবেশমূল্য মাত্র দুই পয়সা। ভোজবাজি অর্থে 'গোলোকধামের' খেলা। ভিতরে পট টাঙাইয়া কাপড়ের পর্দায় শম্ভু মোটা লেন্স লাগাইয়া দেয়, পল্লীবাসীরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেই লেন্সের মধ্য দিয়া দেখে 'আংরেজ লোকের যুদ্ধ', 'দিল্লীকা বাদশা', 'কাবুলকে পাহাড়', 'তাজবিবিকা কবর'। তারপর শম্ভু লোহার রিং লইয়া খেলা দেখায়, সর্বশেষে একটা পর্দা ঠেলিয়া দেখায় খাঁচায় বন্দী একটা চিতাবাঘ! বাঘটাকে বাহিরে আনিয়া তাহার উপরে শম্ভুর স্ত্রী রাধিকা বেদেনী চাপিয়া বসে, বাঘের সম্মুখের থাবা দুইটা ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া আপন ঘাড়ের উপর চাপাইয়া মুখামুখি দাঁড়াইয়া বাঘটাকে ।সমর্বায় 'খশেষে বাঘটার মুখের ভিতর আপনার

প্রকাণ্ড চুলের খোঁপাটা পুরিয়া দেয়, মনে হয় মাথাটাই বাঘের মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল। সরল পল্লীবাসীরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিশ্বাসরুদ্ধ করিয়া দেখিতে দেখিতে করতালি দিয়া উঠে। তাহার পরই খেলা শেষ হয়, দর্শকের দল বাহির হইয়া যায়। সর্বশেষ দর্শকটির সঙ্গে শম্ভুও বাহির হইয়া আসিয়া আবার তাঁবুর দুয়ারে জয়ঢাকটা পিটিতে থাকে—দুম দুম দুম। জয়ঢাকের সঙ্গে স্ত্রী রাধিকা বেদেনী একজোড়া প্রকাণ্ড করতাল বাজায়—ঝন-ঝন-ঝন।

মধ্যে মধ্যে শম্ভু হাঁকে—বাঘ! ওই বড় বা-ঘ!

বেদেনী প্রশ্ন করে—বড় বাঘ কি করে?

—পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের চুমা খায়, জ্যান্ত মানুষের মাথা মুখের মধ্যে পোরে, কিন্তু খায় না।

কথাগুলা শেষ করিয়াই সে ভিতরে গিয়া বাঘটাকে তীক্ষ্ণাগ্র অঙ্কুশ দিয়া খোঁচা মারে, সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা বার বার গর্জন করিতে থাকে। তাঁবুর দুয়ারের সম্মুখে সমবেত জনতা ভীতিপূর্ণ কৌতূহল-কম্পিত বক্ষে তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয়।

দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বেদেনী দুইটি করিয়া পয়সা লইয়া প্রবেশ করিতে দেয়।

এ ছাড়াও বেদেনীর নিজের খেলা আছে। তাহার আছে একটা ছাগল, দুইটা বাঁদর আর গোটাকতক সাপ। সকাল হইতেই সে আপনার ঝুলি-ঝাঁপি লইয়া গ্রামে বাহির হয়, গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি খেলা দেখাইয়া, গান গাহিয়া উপার্জন করিয়া আনে।

এবার শম্ভু কঙ্কালীর মেলায় আসিয়া ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কোথা হইতে আর একটি বাজির তাঁবু আসিয়া বসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটা অবশ্য খালিই পড়িয়া আছে, কিন্তু এ বাজির তাঁবুটা অনেক বড় এবং কায়দাকরণেও অনেক অভিনবত্ব আছে। বাহিরে দুইটা ঘোড়া, একটা গরুর গাড়ির উপর একটা খাঁচা রহিয়াছে, নিশ্চয় উহাতে বাঘ আছে।

গরুর গাড়ি তিনখানা নামাইয়া শম্ভু নূতন তাঁবুর দিকে মর্মান্তিক ঘৃণায় হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তারপর আক্রোশভরা নিম্নকণ্ঠে বলিল, শালা!

তাহার মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল। শম্ভুর সমগ্র আকৃতির মধ্যে একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ছাপ যেন মাখানো আছে। ক্রূর-নিষ্ঠুরতাপরিব্যঞ্জক একধারার উগ্র তামাটে রঙ আছে—শম্ভুর দেহবর্ণ সেই উগ্র তামাটে; আকৃতি দীর্ঘ,

সর্বাঙ্গে একটা শ্রীহীন কঠোরতা, মুখে কপালের নীচেই একটা খাঁজ, সাপের মত ছোট ছোট গোল চোখ, তাহার উপর সে দন্তুর, সম্মুখের দুইটা দাঁত যেন বাঁকা হিংস্র ভঙ্গিতে অহরহ বাহিরে জাগিয়া থাকে। হিংসায় ক্রোধে সে আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

রাধিকাও হিংসায় ক্রোধে ধারালো ছুরি যেমন আলোকের স্পর্শে চকমক করিয়া উঠে, তেমনই ঝকমক করিয়া উঠিল; সে বলিল—দাঁড়া, বাঘের খাঁচায় দিব গোক্ষুরার ডেঁকা ছেড়্যা!

রাধিকার উত্তেজনার স্পর্শে শম্ভু আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে ক্রুদ্ধ দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া নূতন তাঁবুটার ভিতর ঢুকিয়া বলিল—কে বটে, মালিক কে বটে?

—কি চাই?—তাঁবুর ভিতরের আর একটা ঘরের পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল একটি জোয়ান পুরুষ, ছয় ফিটের অধিক লম্বা, শরীরের প্রতি অবয়বটি সবল এবং দৃঢ়, কিন্তু তবুও দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়; লম্বা হালকা দেহ;— তেজী ঘোড়ার যেমন মনোরম লাবণ্য ঝকমক করে—লোকটির হালকা অথচ সবল দৃঢ় শরীরে তেমনই একটি লাবণ্য আছে। রঙ কালোই, নাকটি লম্বা টিকালো, চোখ সাধারণ, পাতলা ঠোঁট দুইটির উপর তুলি দিয়া আঁকা গোঁফের মত একজোড়া গোঁফ সূচ্যগ্র করিয়া পাক দেওয়া, মাথায় বাবরি চুল, গলায় কারে ঝুলানো একটি সোনার ছোট চাকা তক্তি—সে আসিয়া শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। দুইজনেই দুইজনকে দেখিতেছিল।

—কি চাই?—নূতন বাজিকর আবার প্রশ্ন করিল, কথায় সঙ্গে সঙ্গে মদের গন্ধে শম্ভুর নাকের নীচে বায়ুস্তর ভুরভুর করিয়া উঠিল!

শম্ভু খপ করিয়া ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিল, বলিল— এ জায়গা আমার। আমি আজ পাঁচ বৎসর এইখানে বসছি।

ছোকরাটিও খপ করিয়া আপন ডান হাতে শম্ভুর বাঁ হাত চাপিয়া ধরিল, মাতালের হাসি হাসিল, বলিল—সে হবে, আগে মদ টুক্‌চা—

শম্ভুর পিছনে জলতরঙ্গ বাদ্যযন্ত্র দ্রুততম গতিতে যেন গৎ বাজিয়া উঠিল, বলিল, কটি বোতল আছে তুমার নাগর—মদ খাওয়াইবা?

ছোকরাটি শম্ভুর মুখ হইতে পিছনের দিকে চহিয়া রাধিকাকে দেখিয়া বিস্ময়ে মোহে কথা হারাইয়া নির্বাক হইয়া গেল। কালো সাপিনীর মত ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গিনী বেদেনীর সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা; তাহার ঘন কুঞ্চিত কালো চুলে, চুলের মাঝখানে সাদা সূতার মত সিঁথিতে, তাহার ঈষৎ বঙ্কিম

নাকে, টানা টানা অর্ধনিমীলিতভঙ্গির মদিরদৃষ্টি দুইটি চোখে, সূচালো চিবুকটিতে—সর্বাঙ্গে মাদকতা। "সে যেন মদিরার সমুদ্রে স্নান করিয়া উঠিল। মাদকতা তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়া ফুলের গন্ধ যেমন নিশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও তেমনই চোখে ধরাইয়া দেয় একটা নেশা। শুধু রাধিকারই নয়, এই বেদে জাতের মেয়েদের এটা একটা জাতিগত রূপবৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য রাধিকার রূপের একটা প্রতীকের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু মোহময় মাদকতার মধ্যে আছে ক্ষুরের মত ধারের ইঙ্গিত, চারিদিকে হিংস্র তীক্ষ্ণ উগ্রতার আভাস, মোহমত্ত পুরুষকেও থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়, ভয়ের চেতনা জাগাইয়া তোলে, বুকে ধরিলে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।

রাধিকার খিলখিল হাসি থামে নাই. সে নূতন বাজিকরের বিস্ময়বিহ্বল নীরব অবস্থা দেখিয়া আবার বলিল, বাক হর্‌্যা গেল যে নাগরের?

বাজিকর এবার হাসিয়া বলিল-—বেদের বাচ্চা গো আমি। বেদের ঘরে মদের অভাব। এস।

কথা সত্য, এই জাতিটি মদ কখনও কিনিয়া খায় না। উহারা লুকাইয়া চোলাই করে, ধরাও পড়ে, জেলেও যায়; কিন্তু তা বলিয়া স্বভাব কখনও ছাড়ে না। শাসন-বিভাগের নিকট পর্যন্ত ইহাদের এই অপরাধটা অতি সাধারণ হিসাবে লঘু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শম্ভুর বুকখানা নিশ্বাসে ভরিয়া এতখানি হইয়া উঠিল। আহ্বানকারীও তাহার স্বজাতি, নতুবা—সে রাধিকার দিকে ফিরিয়া কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—তুই আইলি কেন এখেনে?

রাধিকা এবারও খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরণ তুমার! আমি মদ খাব নাই?

তাঁবুর ভিতরে ছোট একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে মদের আড্ডা বসিল। চারিদিকে পাখির মাংসের টুকরা টুকরা হাড়ের কুচি ও একরাশি মুড়ি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে; একটা পাতায় এখনও খানিকটা মাংস, আর একটায় কতকগুলা মুড়ি পেঁয়াজ লঙ্কা, খানিকটা নুন, দুইটি খালি বোতল গড়াইতেছে, একটা বোতল অর্ধসমাপ্ত। বিস্রস্তবাসা একটি বেদের মেয়ে পাশেই নেশায় অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, মাথার চুল ধূলায় রুক্ষ, হাত দুইটি মাথার উপর দিয়া ঊর্ধ্ববাহুর ভঙ্গিতে মাটির উপর লুণ্ঠিত, মুখে তখনও মদের ফেনা বুদ্বুদের মত লাগিয়া রহিয়াছে। হৃষ্টপুষ্ট শান্তশিষ্ট চেহারার মেয়েটি।

রাধিকা তাহাকে দেখিয়া আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল —তোমার বেদেনী? ই যি কাটা কলাগাছের পারা পড়েছে গো!

নূতন বাজিকর হাসিল, তারপর সে স্খলিতপদে খানিকটা অগ্রসর হইয়া একটা স্থানের আলগা মাটি সরাইয়া দুইটা বোতল বাহির করিয়া আনিল।

মদ খাইতে খাইতে কথা যাহা বলিবার বলিতেছিল নূতন বাজিকর আর রাধিকা।

শম্ভু মত্ততার মধ্যেও গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিল। প্রথম পাত্র পান করিয়াই রাধিকা বলিল—কি নাম গো তুমার বাজিকর?

নূতন বাজিকর কাঁচা লঙ্কা খানিকটা দাঁতে কাটিয়া বলিল, নাম শুনলি গালি দিবা আমাকে বেদেনী।

—কেনে?

—নাম বটে কিষ্টো বেদে।

—তা গালি দিব কেনে?

—তুমার যে নাম রাধিকা বেদেনী, তাই বুলছি।

রাধিকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, পরক্ষণেই সে আপনার কাপড়ের ভিতর হইতে ক্ষিপ্র হস্তে কি বাহির করিয়া নূতন বাজিকরের গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—কই, কালিয়াদমন কর দেখি কিষ্টো, দেখি!

শম্ভু চঞ্চল হইয়া পড়িল; কিন্তু কিষ্টো বেদে ক্ষিপ্র হাতে আঘাত করিয়া সেটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। একটা কালো কেউটের বাচ্চা! আহত সর্পশিশু হিস্‌-হিস্‌ গর্জনে মুহূর্তে ফণা তুলিয়া দংশনোদ্যত হইয়া উঠিল; শম্ভু চীৎকার করিয়া উঠিল—আ-কামা—অর্থাৎ বিষদাঁত এখনও ভাঙা হয় নাই। কিষ্টো কিন্তু ততক্ষণে তাহার মাথাটা বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হাসিতে হাসিতে সে ডান হাতে ট্যাঁক হইতে ছোট একটা ছুরি বাহির করিয়া দাঁত দিয়া খুলিয়া ফেলিয়া ফেলিল; এবং সাপটার বিষদাঁত ও বিষের থলি দুই-ই কাটিয়া ফেলিয়া রাধিকার গায়ে আবার ছুঁড়িয়া দিল। রাধিকাও বাঁ হাতে সাপটাকে ধরিয়া ফেলিল; কিন্তু রাগে সে মুহূর্তপূর্বের ওই সাপটার মতই ফুলিয়া উঠিল, বলিল, আমার সাপ তুমি কামাইলা কেনে?

কিষ্টো বলিল, তুমি যে বলল্যা গো দমন করতে।—বলিয়া সে এবার হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাধিকা মুহূর্তে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁবু হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বেই।

নূতন তাঁবুতে আজ হইতেই খেলা দেখানো হইবে, সেখানে খুব সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। বাহিরে মাচা বাঁধিয়া সেটার উপর বাজনা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, একটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালিবার উদ্যোগ হইতেছে। রাধিকা আপনাদের ছোট তাঁবুটির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের খেলার তাঁবু এখনও খাটানো হয় নাই। রাধিকার চোখ দুইটি হিংস্রভাবে যেন জ্বলিতেছিল।

শম্ভু নিকটেই একটা গাছতলায় নামাজ পড়িতেছিল, আরও একটু দূরে একটা গাছের পাশে নামাজ পড়িতেছে কেষ্টো। বিচিত্র জাত বেদেরা। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে, বলে বেদে। তবে ধর্মে ইসলাম। আচারে পুরা হিন্দু, মনসা পূজা করে, মঙ্গলচণ্ডী-ষষ্ঠীর ব্রত করে, কালী-দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে, নাম রাখে শম্ভু শিব কৃষ্ণ হরি, কালী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী। হিন্দু পুরাণ-কথা ইহাদের কণ্ঠস্থ। এমনই আর একটি সম্প্রদায় পট দেখাইয়া হিন্দু-পুরাণ গান করে, তাহারা নিজেদের বলে—পটুয়া, বিপুল চিত্রকরের জাতি। বিবাহ-আদান-প্রদান সমগ্রভাবে ইসলাম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে হয় না, নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ। বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলামি পদ্ধতিতে, মরিলে পোড়ায় না, কবর দেয়। জীবিকায় বাজিকরেরা সাপ ধরে, সাপ নাচাইয়া গান করে, বাঁদর ছাগল লইয়া খেলা দেখায়। অতি সাহসী কেহ কেহ এমনই তাঁবু খাটাইয়া বাঘ লইয়া খেলা দেখায়, কিন্তু নূতন তাঁবুর মত সমারোহ করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ের কেহ কখনও খেলা দেখায় নাই। রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবল ভাসিয়া উঠিতেছিল উহাদের সবল তরুণ বাঘটির কথা। ইহারই মধ্যে লুকাইয়া বাঘটাকে সে কাঠের ফাঁক দিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। সবল দৃঢ় ক্ষিপ্রতাব্যঞ্জক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চকচকে চিকন লোম; মুখে হাসির মত ভঙ্গি যেন অহরহই লাগিয়া আছে। আর তাহাদের বাঘটা স্থবির শিথিলদেহ, অতি কর্কশ, খসখসে লোমগুলো দেখিলে রাধিকার শরীর ঘিনঘিন করিয়া উঠে। কতবার যে শম্ভুকে বলিয়াছে একটা নূতন বাঘ কিনিবার জন্য, কিন্তু শম্ভুর কি যে মমতা ঐ বাঘটার প্রতি, তাহার হেতু সে কিছুতেই খুঁজিয়া পায় না।

নামাজ সারিয়া শম্ভু ফিরিয়া আসিতেই সে গভীর ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল—তুর ওই বুড়া বাঘের খেলা কেউ দেখতে আসবে নাই।

ক্রুদ্ধ শম্ভু বলিল—তু জানছিস সব!

রাধিকা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল—না, জেনে না আমি! তু-ই জানছিস সব!

শম্ভু চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু রাধিকা থামিল না, কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিয়া উঠিল—ওরে মড়া, মড়ার নাচ দেখতে কার কবে ভালো লাগে রে! আমারে বলে তুই জানছিস সব!

শম্ভু মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, পরিপূর্ণভাবে তাহার হিংস্র দুই পাটি দাঁত ওই বাঘের মত ভঙ্গিতেই বাহির করিয়া সে বলিল—ছোকরার উপর বড় যে টান দেখি তুর!

রাধিকা সর্পিনীর মত গর্জন করিয়া উঠিল—কি বুললি বেইমান?

শম্ভু আর কোনো কথা বলিল না, অঙ্কুশভীত বাঘের মত ভঙ্গিতেই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রোধে অভিমানে রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। বেইমান তাহাকে এতবড় কথাটা বলিয়া গেল? সব ভুলিয়া গিয়াছে সে? নিজের বয়সটাও তাহার মনে নাই? চল্লিশ বৎসরের পুরুষ। তুই তো বুড়া! রাধিকার বয়সের তুলনায় তুই বুড়া ছাড়া আর কি? রাধিকা এই সবে বাইশে পা দিয়াছে। সে কি দায়ে পড়িয়া শম্ভুকে বরণ করিয়াছে? রাধিকা তাড়াতাড়ি আপনাদের তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া গেল।

সত্য কথা। সে আজ পাঁচ বৎসর আগের ঘটনা। রাধিকার বয়স তখন সতের! তাহারও তিন বৎসর পূর্বে শিবপদ বেদের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। শিবপদ ছিল রাধিকার চেয়ে বৎসর তিনেকের বড়। আজও তাহার কথা মনে করিয়া রাধিকার দুঃখ হয়। শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কোমল মুখশ্রী, বড় বড় চোখ। সে চোখের দৃষ্টি যেন মায়াবীর দৃষ্টি। সাপ, বাঁদর ছাগল এসবে তাহার আসক্তি ছিল না। সে করিত বেতের কাজ,—ধামা বুনিত, চেয়ার পালিশের কাজ করিত, ফুলের শৌখিন সাজি তৈয়ার করিত, তাহাতে তাহার উপার্জন ছিল গ্রামের সকলের চেয়ে বেশি। তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে বাহির হইত; সে কাঁধে ভার বহিয়া লইয়া যাইত তাহার বেতের জিনিস, রাধিকা লইয়া যাইত তাহার সাপের ঝাঁপি, বাঁদর, ছাগল। শিবপদের সঙ্গে আরও একটি যন্ত্র থাকিত, তাহার কোমরে গোঁজা থাকিত

বাঁশের বাঁশী। রাধিকা যখন সাপ নাচাইয়া গান গাহি :, শিবপদ রাধিকার স্বরের সহিত মিলাইয়া বাঁশী বাজাইত।

ইহা ছাড়াও শিবপদর আর একটা কতবড় গুণ ছিল। তাহাদের সামাজিক মজলিসে বৃদ্ধদের আসরেও তাহার ডাক পড়িত। অতি ধীর প্রকৃতির লোক শিবপদ, এবং লেখাপড়াও কিছু কিছু নিজের চেষ্টায় সে শিখিয়াছিল, এইজন্য তাহার পরামর্শ প্রবীণেরাও গ্রহণ করিত। গ্রামের মধ্যে সম্মান কত তাহার! আর সেই শিবপদ ছিল রাধিকার ক্রীতদাসের মত। টাকাকড়ি সব থাকিত রাধিকার কাছে! তাঁতে বোনা কালো রঙের জমির উপর সাদা সূতার ঘন ঘন ঘরকাটা শাড়ি পরিতে রাধিকা খুব ভালোবাসিত, শিবপদ বার মাস সেই কাপড়ই তাহাকে পরাইয়াছে।

এই সময় কোথা হইতে দশ বৎসর নিরুদ্দেশ থাকার পর আসিল এই শম্ভু, সঙ্গে এই বাঘটা, একটা ছেঁড়া তাঁবু, আর এক বিগতযৌবনা বেদেনী। বাঘ ও তাঁবু দেখিয়া সকলের তাক লাগিয়া গেল। রাধিকা প্রথম যেদিন শম্ভুকে দেখিল, সেদিনের কথা তাহার আজও মনে আছে। সে এই উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধতদৃষ্টি কঠোর বলিষ্ঠদেহ মানুষটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

শম্ভুও তাহাকে দেখিতেছিল মুগ্ধ বিস্ময়ের সহিত, সে-ই প্রথম ডাকিয়া বলিল—এ-ই বেদেনী, দেখি তুর সাপ কেমন!

রাধিকার কি যে হইয়াছিল, সে ফিক করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—শখ যে খুব! পয়সা দিবা?

বেশ মনে আছে, শম্ভু বলিয়াছিল, পয়সা দিব না; তু সাপ দেখালে আমি বাঘ দেখাব।

বাঘ! রাধিকা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কে লোকটা? যেমন অদ্ভুত চেহারা, তেমনই কি অদ্ভুত কথা; বলে—বাঘ দেখাইবে। সে তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিল, সত্যি বলছ?

—বেশ, দেখ, আগে আমার বাঘ দেখ! সে তাহাকে তাঁবুর ভিতর লইয়া গিয়া সত্যই বাঘ দেখাইয়াছিল। রাধিকা সবিস্ময়ে তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—ই বাঘ নিয়া তুমি কি কর?

—লড়াই করি, খেলা দেখাই।

—এ্যাঁ!

—হ্যাঁ, দেখবি তু?—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে খাঁচা খুলিয়া বাঘটাকে বাহির

করিয়া তাহার সামনের দুই থাবা দুই হাতে ধরিয়া বাঘের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল। বেশ মনে আছে, রাধিকা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। শম্ভু বাঘটাকে খাঁচায় ভরিয়া রাধিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল—তু এইবার সাপ দেখা আমাকে।

রাধিকা সে কথার উত্তর দেয় নাই, বলিয়াছিল—উটা তুমার পোষ মেনেছে?

হি-হি করিয়া হাসিয়া শম্ভু সবলে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, হি, বাঘিনী পোষ মানাতেই আমি ওস্তাদ আছি।

কি যে হইয়াছিল রাধিকার, এক বিন্দু আপত্তি পর্যন্ত করে নাই। দিনকয়েক পরেই সে শিবপদর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া শম্ভুর তাঁবুতে আসিয়া উঠিয়াছিল। চোখের জলে শিবপদর বুক ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে রাধিকার মমতা হওয়া দূরে থাক, লজ্জা হওয়া দূরে থাক, ঘৃণায় বীতরাগে তাহার অন্তর রি-রি করিয়া উঠিয়াছিল। রাধিকার মা-বাপ, গ্রামের সকলে তাহাকে ছি-ছি করিয়াছিল, কিন্তু রাধিকা সে-সব গ্রাহ্যই করে নাই।

সেই রাধিকার আনীত শিবপদর অর্থেই শম্ভুর এই তাঁবু ও খেলার অন্য সরঞ্জাম কেনা হইয়াছিল। সে অর্থ আজ নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে, দুঃখেই দিন চলে আজকাল; শম্ভু যাহা রোজগার করে, সবই নেশায় উড়াইয়া দেয়, কিন্তু রাধিকা একটি দিনের জন্য দুঃখ করে নাই। আর বেইমান কিনা এই কথা বলিল? সে একটা মদের বোতল বাহির করিয়া বসিল।

ওদিকে নূতন তাঁবুতে আবার বাজনা বাজিতেছে। দোসরা দফার খেলা আরম্ভ হইবে। মদ খাইয়া রাধিকা হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল, ওই বাজনার শব্দে তাহার সমস্ত অন্তরটা যেন জ্বালা করিয়া উঠিল। উহাদের তাঁবুতে নিশীথরাত্রে আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয়?

সহসা তাহাদের তাঁবুর বাহিরে শম্ভুর ক্রুদ্ধ উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে মত্ততার উপর উত্তেজিত হইয়া বাহিরে আসিল। দেখিল, শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিষ্টো। তাহার পরনে ঝকঝকে সাজ-পোশাক, চোখ রাঙা, সে-ই তখন কথা বলিতেছিল, কেনে ইথে দোষটা কি হল? তুমরা বসে রইছ, আমাগোর খেলা হছে! খেলা দেখবার নেওতা দিলাম, তা দোষটা কি হল?

শম্ভু চীৎকার করিয়া উঠিল—খেল দেখাবেন খেলোয়ারী আমার! অপমান করতে আসছিস তু!

কিষ্টো কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্বেই উত্তেজিত রাধিকা একটা

ইট কুড়াইয়া লইয়া সজোরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ড়িয়া বসিল। অব্যর্থ লক্ষ্য, কিন্তু কিষ্টো অদ্ভুত, সে ইটটা বলের মত লুফিয়া ধরিয়া ফেলিল, তারপর লুফিতে লুফিতে চলিয়া গেল। বিস্ময়ে রাধিকা সামান্য কয়টা মুহূর্তের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, সে ঘোর কাটিতেই সে বর্ধিত উত্তেজনায় আবার একটা ইট কুড়াইয়া লইল ; শম্ভু তাহাকে নিবৃত্ত করিল, সে সাদরে তাহার হাত ধরিয়া তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। রাধিকা বিপুল আবেগে শম্ভুর গলা জড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

শম্ভু বলিল—এই মেলার বাদেই বাঘ কিনে লিয়ে আসব।

ওদিকের তাঁবু হইতে কিষ্টোর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, খোল কানাত, ফেলে দে খুল্যে।

তাঁবুর একটা ছেঁড়া ফাঁক দিয়া রাধিকা দেখিল, তাঁবুর কানাত খুলিয়া দিতেছে, অর্থাৎ ভিতরে না গেলেও তাহারা যেন দেখিতে বাধ্য হয়। সে ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিল, দিব আগুন ধরাইয়া তাঁবুতে।

শম্ভু গম্ভীর হইয়া ভাবিতেছিল। কিষ্টো চলন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়াইয়া কসরত দেখাইতেছে। রাধিকা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নতুন খেলা কিছু বার কর তুমি, নইলে বদনামী হবে, কেউ দেখবে না খেলা আমাগোর।

শম্ভু দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, পুলিশে ধরাইয়া দিব শালাকে। মদের সন্ধান দিয়া দিব।

ওদিকে টিয়াপাখিতে কামান দাগিল, সেই মেয়েটা তারের উপর ছাতা মাথায় দিয়া নাচিল, বাঘটার সহিত কিষ্টো লড়াই করিল, ইঃ—একটা থাবা বসাইয়া দিল বাঘটা!

রাধিকা আপনাদের খেলার দৈন্যের কথা ভাবিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশেও ফুলিতেছিল। তাঁবুতে আগুন ধরিলে ধু-ধু করিয়া জ্বলিয়া যায়! কেরোসিন তেল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয়?

পরদিন সকালে উঠিতে রাধিকার একটু দেরি হইয়া গিয়াছিল ; উঠিয়া দেখিল, শম্ভু নাই ; সে বোধ হয় দুই-চারিজন মজুরের সন্ধানে গ্রামে গিয়াছে। বাহিরে আসিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কিষ্টোর তাঁবুর চারিপাশে পুলিশ দাঁড়াইয়া আছে। দুয়ারে একজন দারোগা বসিয়া আছেন। এ কি! সে

সটান গিয়া দারোগার সামনে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। দারোগা তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন—ডাক সব, আমরা তাঁবু দেখব ?

আবার সেলাম করিয়া বেদেনী বলিল—কি কসুর করলাম হুজুর ?

—মদ আছে কি না দেখব আমরা। ডাক বেটাছেলেদের। এইখান থেকেই ডাক।

রাধিকা বুঝিল, দারোগা তাহাকে এই তাঁবুরই লোক ভাবিয়াছেন ; কিন্তু সে আর তাঁহার ভুল ভাঙাইল না। সে বলিল—ভিতরে আমার কচি ছেলে রইছে হুজুর—

—আচ্ছা, ছেলে নিয়ে আসতে পার তুমি। আর ডেকে দাও পুরুষদের।

রাধিকা দ্রুত তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই দেখা জায়গাটার আলগা মাটি সরাইয়া দেখিল, তিনটা বোতল তখনও মজুত রহিয়াছে। সে একখানা কাপড় টানিয়া লইয়া ভাঁজ করিয়া বোতল তিনটাকে পুরিয়া ফেলিল এবং সুকৌশলে এমন করিয়া বুকে ধরিল যে, শীতের দিনে সযত্নে বস্ত্রাবৃত অত্যন্ত কচি শিশু ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তাঁবুর মধ্যেই কিষ্টো অঘোরে ঘুমাইতেছিল, পায়ের ঠেলা দিয়া রাধিকা বলিল—পুলিশ আইছে, বসে রইছে দুয়ারে, উঠ্যা যাও।

সে অকম্পিত সংযত পদক্ষেপে স্তন্যদানরত মাতার মত শিশুকে যেন বুকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল ! তাহার পিছনে পিছনেই কিষ্টো আসিয়া দারোগার সম্মুখে দাঁড়াইল।

দারোগা প্রশ্ন করিলেন—এ তাঁবু তোমার ?

সেলাম করিয়া কিষ্টো বলিল—জী হুজুর।

—দেখব তাঁবু আমরা, মদ আছে কিনা দেখব।

মেলার ভিড়ের মধ্যে শিশুকে বুকে করিয়া বেদেনী ততক্ষণে জলরাশির মধ্যে জলবিন্দুর মত মিশিয়া গিয়াছে।

শম্ভু গুম হইয়া বসিয়া ছিল, রাধিকা উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। শম্ভু তাহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিয়াছে। শম্ভু ফিরিয়া আসিতে বিপুল কৌতুকে সে হাসিয়া পুলিশকে ঠকানোর বৃত্তান্ত বলিয়া তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল, বলিল—ভেল্কি লাগায়ে দিছি দারোগার চোখে।

শম্ভু কঠিন আক্রোশভরা দৃষ্টিতে রাধিকার দিকে চাহিয়া রহিল। রাধিকার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না, সে হাসিয়া বলিল—খাবা, ছেলে খাবা ?

শম্ভু অতর্কিতে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া নির্মমভাবে প্রহার করিয়া বলিল—সব মাটি করে দিছিস তু; উয়াকে আমি জেহেলে দিবার লাগি পুলিশে বলে এলাম, আর তু করলি এই কাণ্ড!

রাধিকা প্রথমটায় ভীষণ উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শম্ভুর কথা সমস্তটা শুনিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল গতরাত্রির কথা, সত্যই এ কথা তো সে বলিয়াছিল! সে আর প্রতিবাদ করিল না, নীরবে শম্ভুর সমস্ত নির্যাতন সহ্য করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ অপরাহ্ণ হইতে এই তাঁবুতে খেলা আরম্ভ হইবে।

শম্ভু আপনার জীর্ণ পোশাকটি বাহির করিয়া পরিয়াছে, একটা কালো রঙের চোঙের মত সরু প্যান্টালুন, আর একটা কালো রঙেরই খাটো-হাতা কোট। রাধিকার পরনে পুরানো রঙিন ঘাগরা আর অত্যন্ত পুরানো একটা ফুলহাতা বডিস। অন্য সময় মাথার চুল সে বেণী বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিত, কিন্তু আজ সে বেণীই বাঁধিল না, আপনাদের সকল প্রকার দীনতা ও জীর্ণতার প্রতি অবজ্ঞায় ক্ষোভে তাহার যেন লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল! উহাদের তাঁবুতে কিষ্টোর সেই বিড়ালীর মত গাল-মোটা, স্থবিরার মতো স্থূলাঙ্গী মেয়েটা পরিয়াছে গেঞ্জীর মত টাইট পাজামা, জামা, তাহার উপর জরিদার সবুজ সাটিনের একটা জাঙ্গিয়া ও কাঁচুলি ঢঙের বডিস। কুৎসিত মেয়েটাকেও যেন সুন্দর দেখাইতেছে। উহাদের জয়ঢাকটার বাজনার মধ্যে কাঁসা-পিতলের বাসনের আওয়াজের মত একটা রেশ শেষকালে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। আর এই কতকালের পুরানো একটা ঢ্যাপঢ্যাপে জয়ঢাক, ছি!

কিন্তু তবুও সে প্রাণপণে চেষ্টা করে, জোরে করতাল পেটে।

শম্ভু বাজনা থামাইয়া হাঁকিল, ও—ই ব—ড় বা—ঘ।

রাধিকা রুদ্ধস্বর কোনোমতে সাফ করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—বড় বাঘ কি করে?

শম্ভু খুব উৎসাহভরেই বলিল—পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে, মানুষের মাথা মুখে ভরে, চিবায় না।

সে এবার লাফ দিয়া নামিয়া ভিতরে গিয়া বাঘটাকে খোঁচা দিল, জীর্ণ বৃদ্ধ বনচারী হিংস্রক আর্তনাদের মত গর্জন করিল।

সঙ্গে সঙ্গে ও-তাঁবুর ভিতর হইতে সবল পশুর তরুণ হিংস্র ক্রুদ্ধ গর্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মাচার উপরে রাধিকা দাঁড়াইয়াছিল, তাহার শরীর

যেন ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। ক্রূর হিংসাভরা দৃষ্টিতে সে ওই তাঁবুর মাচানের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিষ্টো হাসিতেছে। রাধিকার সহিত চোখাচোখি হইতেই সে হাঁকিল—ফিন একবার।

ও-তাঁবুর ভিতর হইতে দ্বিতীয়বার খোঁচা খাইয়া উহাদের বাঘটা এবার প্রবল গর্জনে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। রাধিকার চোখে জ্বলিয়া উঠিল আগুন। জনতা স্রোতের মত কিষ্টোর তাঁবুতে ঢুকিল।

শম্ভুর তাঁবুতে অল্প কয়েকটি লোক সস্তায় আমোদ দেখিবার জন্য ঢুকিল। খেলা শেষ করিয়া মাত্র কয়েক আনা পয়সা হাতে শম্ভু হিংস্র মুখ ভীষণ করিয়া বসিয়া রহিল। রাধিকা দ্রুতপদে মেলার মধ্যে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরিল একটা কিসের টিন লইয়া।

শম্ভু বিরক্তি সত্ত্বেও সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কি উটা?

—কেরাচিন। আগুন লাগায়ে দিব উহাদের তাঁবুতে। পুরা পেলুম নাই, দু সের কম রইছে।—তাহার চোখ জ্বলিতেছে।

শম্ভুর চোখও হিংস্র দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সে বলিল—লিয়ে আয় মদ।

মদ খাইতে খাইতে রাধিকা বলিল—দাউ-দাউ করে জ্বলবেক যখন!

সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে অন্ধকারের মধ্যে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, ওই তাঁবুতে তখনও খেলা চলিতেছে। তাঁবুর ছেঁড়া মাথা দিয়া দেখা যাইতেছিল, কিষ্টো দড়িতে ঝুলানো কাঠের লাঠিতে দোল খাইতে খাইতে কসরত দেখাইতেছে। উঃ, একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিয়া দুলিতে লাগিল! দর্শকেরা করতালি দিতেছে।

শম্ভু তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বলিল—এখুন লয়, সেই, সেই নিশুত রাতে!

তাহারা আবার মদ লইয়া বসিল।

সমস্ত মেলাটা শান্ত স্তব্ধ; অন্ধকারে সব ভরিয়া উঠিয়াছে; বেদেনী ধীরে ধীরে উঠিল, এক মুহূর্তের জন্য তাহার চোখে ঘুম আসে নাই।

বুকের মধ্যে একটা অস্থিরতায়, মনের একটা দুর্দান্ত জ্বালায় সে অহরহ যেন পীড়িত হইতেছে। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। গাঢ় অন্ধকার থমথম করিতেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ। সে খানিকটা এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিল, কেহ কোথাও জাগিয়া নাই। সে আসিয়া তাঁবুতে ঢুকিল, ফস করিয়া একটা দেশলাই জ্বালিল, ওই কেরোসিনের টিনটা রহিয়াছে। তারপর

শম্ভুকে ডাকিতে গিয়া দেখিল, সে শীতে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার উপর ক্রোধে ঘৃণায় রাধিকার মন ছি-ছি করিয়া উঠিল। অপমান ভুলিয়া গিয়াছে, ঘুম আসিয়াছে! সে শম্ভুকে ডাকিল না, দেশলাইটা চুলের খোঁপায় গুঁজিয়া, টিনটা হাতে লইয়া একাই বাহির হইয়া গেল।

ওই পিছন দিক হইতে দিতে হইবে। ওদিকটা সমস্ত পুড়িয়া গেলে তবে এদিকটায় মেলার লোকে আলোর শিখা দেখিতে পাইবে। ক্রূর হিংস্র সাপিনীর মতই সে অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া সনসন করিয়া চলিয়াছিল। পিছনে আসিয়া টিনটা নামাইয়া সে হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

চুপ করিয়া বসিয়া সে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁবুর ভিতরটা একবার দেখিয়া লইবার জন্ম সে কানাতটা সন্তর্পণে ঠেলিয়া বুক পাতিয়া মাথাটা গলাইয়া দিল। সমস্ত তাঁবুটা অন্ধকার। সরীসৃপের মত বুকে হাঁটিয়া বেদেনী ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। খোঁপার ভিতর হইতে দেশলাইটা বাহির করিয়া ফস করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া ফেলিল।

তাহার কাছেই এই যে কিষ্টো একটা অসুরের মত পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। রাধিকার হাতের কাঠিটা জ্বলিতে লাগিল, কিষ্টোর কঠিন সুশ্রী মুখে কি সাহস! উঃ বুকখানা কি চওড়া, হাতের পেশীগুলো কি নিটোল। তাহার আশেপাশে ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ—ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে কিষ্টো নাচিয়া ফেরে। ঐ যে কাঁধে সদ্য ক্ষতচিহ্নটা—ওই দুর্দান্ত সবল বাঘটার নখের চিহ্ন। দেশলাইটা নিবিয়া গেল।

রাধিকার বুকের মধ্যেটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, যেমন করিয়াছিল শম্ভুকে প্রথম দিন দেখিয়া। না, আজিকার আলোড়ন তাহার চেয়েও প্রবল। উন্মত্তা বেদেনী মুহূর্তে যাহা করিয়া বসিল, তাহা স্বপ্নের অতীত। সে উন্মত্ত আবেগে কিষ্টোর সবল বুকের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

কিষ্টো জাগিয়া উঠিল, কিন্তু চমকাইল না, ক্ষীণ নারীতনুখানি সবল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিল, কে? রাধি—

তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া রাধিকা বলিল—হ্যাঁ, চুপ।

কিষ্টো চুমোয় চুমোয় তার মুখ ভরিয়া দিয়া বলিল—দাঁড়াও, মদ আনি।

—না। চল, উঠ, এখুনই ইখান থেক্যে পালাই চল।

রাধিকা অন্ধকারের মধ্যে হাঁপাইতেছিল।

কিষ্টো বলিল—কুথা?

—হু-ই, দেশান্তরে।

—দেশান্তরে ? ই তাঁবু-টাবু—?

—থাক পড়্যা। উ ওই শম্ভু লিবে। তুমি উয়ার রাধিকে লিবা, উয়াকে দাম দিবা না ?

সে নিম্নস্বরে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উন্মত্ত বেদিয়া, তাহার উপর দুরন্ত যৌবন, কিষ্টো দ্বিধা করিল না, বলিল—চল।

চলিতে গিয়া রাধিকা থামিল, বলিল—দাঁড়াও।

সে কেরোসিনের টিনটা শম্ভুর তাঁবুর উপর ঢালিয়া দিয়া মাঠের ঘাসের উপর ছড়া দিয়া চলিতে চলিতে বলিল—চল।

টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়া কেরোসিনসিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরুক বুড়া পুড়্যা।

ত ম সা

ব্রাঞ্চ লাইনের ছোট একটি স্টেশন।

লাল কাঁকর-বিছানো মাটির-সঙ্গে-সমতল প্লাটফর্ম, তাও একটা প্লাটফর্মের কোলে পয়েন্টিং-করা ছোট একখানা ঘরে স্টেশন-রুম, বাকীটা একটা টিনের শেড, সেই শেডের মধ্যেই ইট দিয়ে ঘেরা একখানা পার্সেল-রুম, তার পাশে এক টুকরো ঘরের দরজার মাথায় লেখা 'জেনানা'।

স্টেশনের পিছন দিকে চা ও খাবারের স্টল। রেলের লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভেণ্ডারের স্টল। স্টেশনের দেওয়ালের গায়ে টিনের চালা নামানো হয়েছে। তার পরেই গুডস শেডের সাইডিং লাইন। ওখান থেকেই চলে গিয়েছে সোজা উত্তরমুখে লাল মাটির গ্রাম্য রাস্তা। ইউনিয়ন বোর্ডের কল্যাণে দুপাশে নালা কাটা হয়েছে, দড়ি ধরে বেশ সোজা লাইনে নয়, সাপের দাগের মত আঁকাবাঁকা করেই কাটা, তবু তাতেই খানিকটা সম্ভ্রান্ত চেহারা হয়েছে গ্রাম্যবাবুর মত। গ্রামের লোকে বলে স্টেশন-রোড, ইউনিয়ন বোর্ডের খাতাতেও তাই লেখা আছে।

স্টেশন-সীমানা বা এরিয়া সামান্য। বুকিং অফিস, রেলওয়ে-লাইসেন্স প্রাপ্ত ভেণ্ডারের চায়ের স্টল, মাল-গুদাম, দুটো মাত্র শান্টিং লাইন। ব্যস

—স্টেশন-এরিয়া শেষ। স্টেশন-সীমানার পরেই রাস্তার দুপাশে খানকয়েক ঘর, একখানায় পান-বিড়ি-সিগারেট আর চা-খাবারের দোকান। দুখানায় কয়লার ডিপোর গদী। একখানায় স্টেশন-ভেণ্ডারের বাসা। এদের পাশে এক বর্ধিষ্ণু ভদ্রলোকের পাকাবাড়ি। বাকীটা ফাঁকা। বড় বড় বটগাছের ছায়া-ঢাকা তকতকে জায়গা। এইখানে গ্রামান্তরের গাড়ি এসে আড্ডা নেয়। এখান থেকে খানিকটা গিয়ে গ্রামের বসতি।

সকালে আপ ডাউন দুটো ট্রেন। এখানেই ক্রসিং হয়। লোকে বলে মীট হয়। ট্রেন দুটো চলে গিয়েছে। স্টেশনের শেডের মধ্যে স্বল্প কয়েকটি লোক। অধিকাংশই স্থানীয়। যাত্রীর মধ্যে একটা খ্যামটা নাচের দল। দুটি তরুণী, একটি বুড়ি-ঝি, পুরুষ তিনজনের একজন হারমোনিয়ম-বাজিয়ে, একজন বেহালাদার, একজন বাজায় ডুগি-তবলা। তাদের ট্রেন বেলা দুটোয়। মেয়ে দুটির একটি কালো, দীর্ঘাঙ্গী। সে সেইখানে বসেই চুল বাঁধছে। অপরটি দেখতে সুন্দরী, সে একখানা বেঞ্চে ঘুমুচ্ছে। হারমোনিয়ম-বাজিয়েটি বেশ ফ্যাশন-দুরস্ত ছোকরা. সিগারেট মুখে সে প্লাটফর্মের এধার থেকে ওধার পায়চারী করে ফিরছে।

একটা অন্ধ ছেলে বসে আপন মনেই ঢুলছিল। কুৎসিত চেহারা। চোখ দুটো সাদা, সামনের মাড়িটা অসম্ভব রকমের উঁচু, চারটে দাঁত বেরিয়ে আছে, হাত-পাগুলো অপুষ্ট, অশক্ত। পরনে একখানা মোটা সুতোর খাটো ময়লা কাপড়। মাথার চুলের পিছন দিকটা অত্যন্ত বিশ্রীভাবে ছোট করে কাটা। একটা ডুবকি হাতে নিয়ে আপন মনেই সে দুলছে, মধ্যে মধ্যে হাসছে, মধ্যে মধ্যে ঠোঁট নাড়ছে, আপন মনেই কথা বলছে বুঝা যায়। মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠছে। কিছু শোনবার চেষ্টা করছে। কখনও জোরে নিশ্বাস নিয়ে কিছু শুঁকতে চাচ্ছে। জন কয়েক কুলি স্টেশনের স্টলের কাছে বসে আছে, গল্প-গুজব করছে, মধ্যে মধ্যে স্টলের উনোন থেকে কাঠি জ্বালিয়ে বিড়ি ধরাচ্ছে। নিভে যাচ্ছে, আবার ধরাচ্ছে।

প্লাটফর্মের প্রান্তে দাঁড়িয়ে হারমোনিয়ম-বাজিয়ে ছোকরা শিষ দিচ্ছিল। এখনও ঘণ্টা পাঁচেক এখানে কাটাতে হবে। নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন স্থান। দেখবার কিছু নাই। এমন কি তার সঙ্গে তরুণী দুটিকে দেখে ঈর্ষান্বিত হবার মত তরুণ ভদ্রগণের পর্যন্ত অভাব এখানে। চৈত্রের শেষ; সামনে খোলা শস্যহীন মাঠে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত পাতলা ধোঁয়ার একটা ছিলকে পড়েছে যেন। মধ্যে মধ্যে তাও যেন কাঁপছে।

স্টেশন-ঘরে কোকিল আছে। কোকিল ডাকছে স্টেশনের মধ্যে!

বিস্মিত হল হারমোনিয়ম-বাজিয়ে। পাপিয়াও আছে না কি? 'চোখ গেল' ডাক ক্রমেই চড়ছে।

কি বিপদ! চিড়িয়াখানা না কি? ভেড়া ডাকছে! আরে দিনে শেয়াল ডাকে! হারমোনিয়ম-বাজিয়ে অদম্য কৌতূহলের আকর্ষণে ফিরল স্টেশনের দিকে। ও হরি! ও, অন্ধ ছোঁড়াটা! ছোঁড়াটা তখন ডুবকি বাজিয়ে গান ধরেছে।

গলাখানি তো চমৎকার মিঠে! ও বাবা! শুধু গলাই মিঠে নয়, রসিকও খুব। গানখানা সত্যিই রসিকের উপযুক্ত।

'চোখে ছটা লাগিল,
তোমার আয়না-বসা চুড়িতে।
মরি, মরি, বলিহারি—চোখে যে আর
সইতে নারি,
ঝিকিমিকি ঝিলিক নাচে,
হাতের ঘুরি-ফিরিতে।'

বেশ জমে উঠেছে এরই মধ্যে। ছোকরা উবু হয়ে বসে ডুবকি বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছে, দস্তুর মুখে একমুখ হাসি, তালে তালে দুলছে। কুলীর দল তার দিকে ফিরে বসেছে। হারমোনিয়ম-বাজিয়ের সঙ্গিনীদের মধ্যে কেশপ্রসাধনরতা কালো মেয়েটির বেণী-রচনারত হাত দুখানি থেমে গিয়েছে, যে ঘুমুচ্ছিল সে ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেছে, তার সদ্য ঘুমভাঙ্গা বড় বড় চোখ দুটিতে স্মিত কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি। বুড়ি-ঝিটা দোক্তা সহযোগে পান চিবুচ্ছিল বেশ আরাম করে, তার পান চিবুনো বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

'রিনিঠিনি রিনিঠিনি, চুড়ি আবার
তোলে ধ্বনি,
আমার প্রাণের ব্যয়্‌লা (বেহালা)
বাজে তোমার চুড়ির ছড়িতে!'

গানের গতি দ্রুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোঁড়াটার দোলার মাত্রাও দ্রুততর হচ্ছে। উল্টে পড়ে না যায়। ওপাশে বেঞ্চের উপর সদ্য ঘুমভাঙ্গা মেয়েটি উঠে বসল। চুল বাঁধছিল কালো মেয়েটি, সে মুচকে হেসে বললে—মরণ!

ছোকরার তখন মাতন লেগেছে।—

'হায়—হায়, আমি যদি হতেম চুড়ি,
কাঞ্চন নয়, কাচ-বেলোয়ারী

থাকতেম তোমার হাতটি বেড়ি
জেবন (জীবন) সফল করিতে।
হায় হায়, থাকত না খেদ মরিতে।'

তেহাই দিয়েই সে গান শেষ করলে

শ্রোতার দল উচ্ছ্বসিত কলরবে বাহবা দিয়ে উঠল। প্রশংসায় পরিতৃপ্ত অন্ধ দস্তুরের মুখ হাসিতে ভরে গেল। একজন শ্রোতা একটা জলন্ত বিড়ি ওর হাতে সন্তর্পণে ধরিয়ে বললে—নে, খা।

—বিড়ি ?

—হ্যাঁ। খা।

হেসে অন্ধ বললে—কে সিগারেট খাচ্ছে। একটা ছান না কেনে গা!

দোকানী বলে উঠল—বেটা আমার বালকদাসী। আমার নাম বালক-দাসী, ভালোমন্দ খেতে ভালোবাসি! সিগারেট খাবে! একটা সিগারেটের দাম কত জানিস ?

—আমার গানের বুঝি দাম নাই ?

—নে নে খা। এই নে।—এবার হারমোনিয়ম-বাজিয়ে একটা সিগারেট বার করে দিলে তাকে।

সিগারেটটি নিয়ে সে সবিনয়ে বললে—পেনাম বাবুমশায়! ঘোড়া দিলেন, চাবুক ছান। দেশলাই জ্বেলে ছান!

দেশলাই জ্বেলে দিলে হারমোনিয়ম-বাজিয়ে। ওর সাদা ছাদনী পড়া চোখে আলোক শিখার প্রতিবিম্ব পড়ে না। উত্তাপ অনুভব করে সে।

অন্ধ সিগারেট টানে প্রাণপণে। সে টানের শক্তি প্রয়োগে ওর মাথা ঘাড় থরথর করে কাঁপে। দম ফুরিয়ে এলে তবে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ছোঁড়াটা ধূমরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—আঃ।

সকলে হাসে তার ভঙ্গি দেখে। হারমোনিয়ম-বাজিয়ে বাবুটি বললে—তুই তো বেশ গান গাইতে পারিস রে! এ্যা!

—হ্যাঁ ভালো! বুঝলেন বাবুমশায়, সবাই বলে ভালো। তা—।

একটু চুপ করে থেকে একটু হেসে বললে—খুব ভালো করে গাইলে, মানে পাণ-মন সমপ্পন করে গাইলে মোহিত করে দিতে পারি। বুঝলেন!

এবার তরুণী দুটি খিল-খিল করে হেসে উঠল। সে হাসির শব্দে চমকে

উঠল অন্ধ। হাতের সিগারেটটা পড়ে গেল মাটিতে। মাটির উপর আঙুলের প্রান্ত দিয়ে অনুভব করে সে সিগারেটটা খুঁজতে খুঁজতে বললে—হাসছে? কে? কারা?—তারপর মৃদুস্বরে ডাকলে—মলিন্দ।

মলীন্দ ওই কুলীদের একজন। সে বললে—কি?

—শোন, বলি।—সিগারেটটা হাতের ইশারায় ঠিক গোড়ার দিক ধরে তুলে নিলে।

—কি?

—সরে আয় কানে কানে বলব।

—কি? বল!

—মেয়েছেলেতে হাসছে। ভদ্দনোক, লয়?

—হ্যাঁ। বদ্দমানের।

—হুঁ। ঠিক বুঝতে পেরেছি আমি।

—কি করে বুঝলি?—অবিশ্বাসের হাসি হাসলে মলীন্দ।

—বুঝলাম গলার রজ্ (আওয়াজ) থেকে?

—কিন্তু ভদ্দনোক জানলি কি করে।—মলীন্দ প্রশ্ন করলে।

হেসে বললে অন্ধ—চুড়ির শব্দতে আর মিষ্টি সুবাস থেকে। অনেকক্ষণ থেকেই ও দুটো পাচ্ছিলাম, মনে মনে সন্দ লাগছিল। ছোটনোক হলে গায়ে ঘাম-গন্ধ ওঠে। কাচের চুড়িতে এমন মিঠে শব্দ ওঠে না। সোনার চুড়ি আছে হাতে, লয়?

—হ্যাঁ।

নীরবে সিগারেট টানতে টানতে অন্ধ বার বার জোরে নিশ্বাস টানে ওই মিষ্ট গন্ধ নেবার জন্য। হঠাৎ সে বললে—তা, ঠাকরুনরা হাসছেন, আপনাদিগে বলছি—

কালো মেয়েটি মুখরা, চপলা। খোঁপায় কাঁটা আঁটছিল সে। ঘাড়টি ঈষৎ ফিরিয়ে অন্ধের দিকে চেয়ে বললে—আমাদের বলছ?

—হ্যাঁ, আপনারা হাসলেন কেনে?

কালো মেয়েটিই এবার মুখ টিপে হেসে বললে—সে আমরা নই, অন্য লোকে।

—অন্য নোকে?—অন্ধ ঘাড় নেড়ে মৃদু হেসে বলে—উঁহু।

—উঁহু কেন? অন্য লোকেই তো হাসলে।

ছোকরা এবার একটু বেশী হেসে বললে—শিঙেতে বাঁশী বাজে না ঠাকরুন, ক্যানেস্তারায় তবলার বোল ওঠে না।

—ও মা গো !—মেয়েটি বিস্ময়ে কৌতুকে চোখ বিস্ফারিত করে সঙ্গিনীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে।

সুন্দরী তরুণীটির মুখেও মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সে হাসির চেহারা যেন ভিন্ন রকমের। সে এবার বললে—আমরা হেসেছি বলে তুমি রাগ করছ নাকি ?

—রাগ ?—অন্ধ হেসে বললে—ওরে বাপ রে, আপনকাদের ওপর কি রাগ করতে পারি মশায় ? তবে হাসলেন কেনে, তাই শুধালাম, বলি—অন্যায় কিছু বললাম না কি ?

—হারামজাদা !—দোকানী বলে উঠল—ওরে শূয়ার, হাসছেন তোমার মোহিত শুনে।

—কেনে, মোহিত করে দিতে পারি না আমি ?

—খুব হয়েছে থাম !

—কেনে ?

—কাকে কি বলছিস জানিস ?

অন্ধ এবার সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

—ওঁরা হলেন কলকাতার গাইয়ে, কলের গান শোন নাই হারামজাদা। সেই রকম গাইয়ে, বড় বড় বাইজী ! বেটা পঞ্চীরাজ ওঁদিকে মোহিত করে দেবেন !

অপরাধীর মত সে এবার বললে—তা হলে তো অপরাধ হয়ে যেয়েছে।

—হ্যাঁ, তা হয়েছে।

কালো মেয়েটি চুল বাঁধা শেষ করে গামছা কাঁধে ফেলে স্যুটকেশ খুলে সাবান বার করে নিয়ে বললে—কাছেই পুকুর-ঘাট, নেয়ে আসি আমি।

অন্ধ হাতের সিগারেটটা ফেলে দিলে ছুঁড়ে। উপরের দিকে মুখ করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিঃশব্দে হাঁ করে হাসতে লাগল—নাকের ডগাটা তার ফুলে ফুলে উঠছিল। অত্যন্ত হাস্যকর এবং কুৎসিত সে মুখভঙ্গি।

দোকানী বললে—দেখ, দেখ, হারামজাদার মুখ দেখ। এই হারামজাদা পঞ্চে !

অন্ধের নাম 'পঞ্চী'। পঞ্চে আকর্ণ-বিস্তার নিঃশব্দ হাসি হেসে বললে—ভারি সুন্দর বাস উঠছে সিংজী। পরান একেবারে মোহিত করে দিলে।

সুন্দরী মেয়েটি বললে—তোমার সেই মোহিত-করা গান যদি গাও তবে তোমাকে ওই সাবানখানা দিয়ে যাব।

মাথা চুলকে পঞ্চী বললে—দিয়ে যাবেন ? গান গাইলে ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তুক।—একটু চুপ করে থেকে পঞ্চী বললে—আমার আস্পদ্দা হয়ে যেয়েচে আজ্ঞে। গান কি আপনকাদের ছামনে গাইতে পারি আমি ?

—কেন ? তুমি তো ভালো গান গাইতে পার। ভারি সুন্দর গলা তোমার!

—ভালো লেগেছে আপনকার ?—অভ্যস্ত নিঃশব্দ হাসিতে মুখ ভরে গেল পঞ্চীর।

কালো মেয়েটি বললে হারমোনিয়ম-বাজিয়েকে—এস আমার সঙ্গে। ঘাটে একটু দাঁড়াবে।

পঞ্চী বললে—একটা কথা বলব ঠাকরুন ?

স্নিগ্ধ হাসি হেসে সুন্দরী মেয়েটি বললে—বল।

—রাগ করবেন না তো ?

—না না! বল।

পঞ্চী কিন্তু চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বললে—নেতাই, মলিন্দ! চলে গেলি না কি ? নেতাই ?

—কেনে, নিতাইকে কেনে ?—দোকানের দরজা বন্ধ করতে করতে দোকানী বললে—জল খাবে না সব ? বাড়ি যাবে না ?

হেসে পঞ্চী বললে—আপনিও দোকানে তালা দিছেন লাগছে !

—হুঁ দিলাম। জল খাবি তো আয়—আমি যাচ্ছি বাড়ি।

—উঁহু। ক্ষিদে নাই আজ।

সাড়ে দশটা পার হয়ে গিয়েছে। চৈত্র মাসে এবার এরই মধ্যে চারিদিক ধূলিধূসর এবং উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। স্টেশনে টিনের উত্তাপের প্রাখর্যে মধ্যে মধ্যে কটাং কটাং শব্দ উঠছে। লাইনের জোড়ের মুখেও শব্দ উঠছে।

সুন্দরী তরুণীটি একদৃষ্টিতে অন্ধ পঞ্চীর দিকে চেয়ে রয়েছে। পঞ্চী স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কখনও কখনও মুখ তুলছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই ঘাড় নামাচ্ছে।

মেয়েটি বললে—কই বললে না তো ?

—আজ্ঞে ?

—কি বলবে বলছিলে ?

—বলছিলাম—!—পঞ্চী লজ্জিত অপরাধীর মত হেসে ঘাড় নামালে।

—বল।—বলে মেয়েটি প্রতীক্ষা করে থাকে। প্রতীক্ষার মধ্যেই সে অন্যমনস্ক হয়ে ধূলিধূসর দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকে একদৃষ্টিতে। পঞ্চী ঘাড়

তোলে মধ্যে মধ্যে, আবার ঘাড় নামায় এই অবসরের মধ্যে। হঠাৎ সে বলে ফেললে—বলছিলাম—কি—?

ঠিক এই সময়েই মাথার উপর টিনের শেডের উপর শব্দ উঠল অত্যন্ত জোরে। মেয়েটি চমকে উঠল—কিরে বাবা ?

—উঁ আজ্ঞে—। বিজ্ঞের মত হেসে পঞ্চী বললে—রোদের তাতে টিনে শব্দ উঠছে।

—তাই নাকি ? রোদের তাপে টিনে শব্দ ওঠে ?

—হঁ্যা। এ এখন সেই সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত উঠবে। এই দেখুন—এ শব্দ কিন্তু তাতের নয়, কাক বসল চালে।

মেয়েটি বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল প্লাটফর্মের উপর। কৌতূহল হল তার। সত্যিই কাক বসেছে। সে বিস্মিত হয়ে ফিরে এসে দাঁড়াল পঞ্চীর কাছে। পঞ্চী চঞ্চল হয়ে উঠল। কয়েকবার স্ফীত হয়ে উঠল নাসারন্ধ্র, মৃদুস্বরে সবিনয়ে বললে—বলছিলাম কি আজ্ঞে—।

মেয়েটি দুটি আঙুল ওর চোখের সামনে নাড়ছিল।

পঞ্চী বললে—বলব মশায় নির্ভয়ে ?

মেয়েটি আঙুল সরিয়ে নিলে পঞ্চীর নিষ্পলক চোখের সামনে থেকে। —বলবে ? বল। বারবারই তো বলতে বলছি !

—আপুনি একটি গান যদি গাইতেন।—কথা অর্ধসমাপ্ত রেখে, নিঃশব্দ হাসিতে বিস্ফারিত মুখে সে মাথা চুলকাতে লাগল।

মেয়েটি হাসলে।—গান শুনবে ?

মাটিতে হাত বুলিয়ে অনুভব করে পঞ্চী মেয়েটির পায়ের আঙুলের প্রান্ত স্পর্শ করে বললে—আপনাদের চরণ কোথা পাব বলেন ? গানই বা শুনব কি করে ? তবে—। একটু নীরব থেকে উপরের দিকে দৃষ্টিহীন মুখ তুলে বললে—সাধ তো হয়। মনিষ্যি তো বটে। আর গান শুনতে ভালোবাসি আমি।

কি মনে হল মেয়েটির, করুণা হয়ত, হয়ত খেয়াল, বললে—আচ্ছা। বলেই আবার চিন্তিত মুখে বললে—হারমোনিয়ামটা যে দেখি অনেক জিনিস চাপা পড়েছে।

—হারমনি ?

—হঁ্যা ?

—হারমনি থাক। আপুনি এমনি গান। আস্তে আস্তে গান। রোদ বেজায় চড়েছে। শুধু গলায় আস্তে আস্তে গান ভারি ভালো লাগবে।

কল্পনাটি বড় ভালো লাগল মেয়েটির। ঠিক বলেছে অন্ধ। সে গান ধরলে মৃদুস্বরে—

'কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি।
কভু পথের পরে, কভু নদীর পারে
চেয়ে চেয়ে ক্ষয়ে গেল আমার
কাজল-পরা জোড়া আঁখি।'

পঙ্খীর সর্বাঙ্গ যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। মস্তিষ্কের মধ্যে শিরায় উপশিরায় ওই গানের ধ্বনি-ঝঙ্কার বীণের বহুতন্ত্রী ঝঙ্কারের মত ধ্বনি তুলে সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তার।

গান শেষ হয়ে গেল। অন্ধকে গান শুনিয়ে মেয়েটির ভারি তৃপ্তি হল। ঈষৎ হেসে সে প্রশ্ন করলে—কেমন? ভালো লাগল?

—আজ্ঞে?—চকিত হয়ে উঠল পঙ্খী। তার অসাড় নিস্পন্দ শরীরে মুহূর্তে চেতনার প্রবাহ বয়ে গেল।

—ভালো লাগল?

পঙ্খী বললে—জেবন ধন্য হল আমার, ঠাকরুন।

মেয়েটি এবার হেসে ফেললে।

—হাসছেন? তা—। একটু চুপ করে থেকে পঙ্খী বললে—তা এমন গান জেবনে কোথা শুনতাম বলেন!

পঙ্খীর কথাগুলির মধ্যে একটি বেদনার সুর ছিল, তার স্পর্শে মেয়েটি আর হাসতে পারলে না। চুপ করে গেল। কোনো কথাও খুঁজে পেলে না।

পঙ্খী বললে—একটি পেনাম করব আপনকাকে।

—প্রণাম? কেন?

—ভারি সাদ হচ্ছে।

লোভ হল মেয়েটির। মুগ্ধদৃষ্টি, অজস্র প্রশংসা, প্রেম-গুঞ্জন, অনেক পেয়েছে সে এবং পায়। কিন্তু প্রণাম? মনে পড়ল না তার। নিজেদের সমাজের ছোটরা অবশ্য প্রণাম করে। কিন্তু এ প্রণামের দাম অনেক বেশী বলে মনে হল তার। সে প্রতিবাদ করলে না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

পঙ্খী হাত বুলালো তার পায়ের উপর, তারপর মেয়েটির দুখানি পায়ের উপর নিজের মুখখানি রাখলে।

মেয়েটির ভারি ভালো লাগল।

মেয়েটি পায়ে উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করলে, পঞ্চীর বিকৃত চোখ থেকে জল ঝরে তার পায়ে লাগছে। তবু সে পা সরিয়ে নিলে না। ধূলিধূসর দিগন্তের দিকে অর্থহীন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে সে চুপ করেই দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ প্রশ্ন করলে—তোমার কে কে আছে বাড়িতে? মা! মা আছে? বাপ আছে?—শুনছ?—ওঠ! ওঠ? অনেক প্রণাম করা হয়েছে। ওঠ। ওঠ।

—আরে এই বেটা! এই ! ও হচ্ছে কি? এই!—হারমোনিয়ম-বাজিয়ে এবং সেই কালো মেয়েটি স্নান সেরে ফিরে এসেছে। হারমোনিয়ম-বাজিয়ে ধমক দিলে পঞ্চীকে।

কালো মেয়েটি বললে—মরণ!

সুন্দরী তরুণীটি মৃদুস্বরে আবার বললে—ওঠ! ওঠ!

এবার পঞ্চী উঠল। তার দিকে চেয়ে কালো মেয়েটি এবং হারমোনিয়ম-বাজিয়ে একসঙ্গে হেসে উঠল। পঞ্চীর চোখের জলে ভিজে মেয়েটির পায়ের আলতা অন্ধের মুখময় লেগেছে। গালে নাকে কপালে ঠোঁটে—মুখময় লাল রঙ।

মেয়েটি বললে—মুখটা মোছ। গোটা মুখে তোমার লাল রঙ লেগেছে।

—লাল রঙ?

—হ্যাঁ, আলতা লেগেছে।

—আলতা?

—হ্যাঁ, ঠোঁটে মুখে, গালে নাকে—মুছে ফেল।

—থাকুক আজ্ঞে।

কালো মেয়েটি বললে সঙ্গিনীকে—নে নে ওর সঙ্গে আর ন্যাকামি করতে হবে না। ওদিকে দেখে এলাম ভাত হয়েছে। নেয়ে নিবি তো নেয়ে আয়। সুন্দর জল পুকুরের।

—কত দূর?

পঞ্চী উঠে দাঁড়াল।—এই কাছেই আজ্ঞে। কাছেই। চলেন আমি নিয়ে যাচ্চি। আসুন।

—তুমি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কানাদের পথঘাট মুখস্থ। ঠিক নিয়ে যাবে। যা না।—কালো মেয়েটি একটু হেসে বললে—নিশ্চিন্দি চান করবি, ও বসে থাকবে ঘাটে।

সত্য কথা। দিব্য পথে পথে চলে পঞ্চী। মধ্যে মধ্যে পা বুলিয়ে অনুভব

করে নেয়। স্টেশন-রাস্তার ধারে প্রথম বটগাছটার তলার ছায়ায় এসে বলে —এই বটতলা এয়েচে। আসেন এই বাঁ ধারে।

একটু অগ্রসর হতেই পুকুর দেখা যায়। কালো কাজলের মত জল।

মেয়েটি বললে—তোমার নাম কি?

—আমার নাম? আমার নাম 'পঙ্খে'। পঙ্খী আর কি।

—পঙ্খী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ছেলেবেলায় পাখীর মতন চিঁ চিঁ করে চেঁচাতাম কিনা! কানা বলে মা হেনস্তা করত। ভুঁয়ে পড়ে চেঁচাতাম।

—মা-বাবা আছে তোমার?

—হ্যাঁ। যাই আমি বাড়ি মাঝে মাঝে। বাবা আমার নোক ভালো। বাবার নাম—এখানে—। হঠাৎ কথায় ছেদ ফেলে দেয় নিজেই—উপরের দিকে মুখ তুলে বলে—হ্ হ্। মরালের বড় ঝাঁকটা এসেছে লাগছে।

মেটে রঙের বুনো হাঁসের একটা প্রকাণ্ড ঝাঁক সত্যই মাথার উপর পাক দিচ্ছিল, তাদের পাখার ডাক ধরেছে আকাশে।

মেয়েটিও আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে।

পঙ্খী বললে, তার অর্ধসমাপ্ত কথা শেষ করলে সে।—বাবার নাম এখানে সবাই জানে। কৃত্তিবাস বাগ্দীর নাম।

বাবার নাম কৃত্তিবাস। অন্ধ অপরিণত অপুষ্টাঙ্গ ছেলের চীৎকার শুনেই তার নামকরণ করেছিল—পঙ্খী। ভালো মিষ্ট গৌরবজনক নাম রাখার প্রয়োজনই অনুভব করে নি কোনোদিন।

পঙ্খী বললে। ঘাটের ধারে বসেছিল সে, মেয়েটি ঠাণ্ডা জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে তার কথা শুনছিল। পঙ্খী বললে, আমার এক দিদি আছে। দিদি আমাকে ভালোবাসত, কোলে নিত। তা—এই আপনকার মতন বয়েস হবে তার।

—আমার মত?—ঈষৎ হেসে মেয়েটি বললে—আমার বয়েস কি করে বুঝলে তুমি?

সলজ্জ হাসি হেসে মাথা চুলকে পঙ্খী বললে—তা আপনি আমার চেয়ে এই খানিক বড় হবেন। তার বেশী নন।—একটু চুপ করে থেকে বললে—গলার রজ্ (আওয়াজ) শুনে বুঝতে পারি কি না খানিক-আধেক। আপনার গলা এখনও বাঁশের বাঁশীর মত। খাদ মেশে নাই। তা ছাড়া—

পঙ্খী থেমে গেল। সে বলতে পারলে না কথাটা। পায়ের উপর মুখ রেখেছিল সে, কোমল মসৃণ স্পর্শ এখনও সে যেন অনুভব করছে।

কথাটা পাল্টে বললে—এখান থেকে বাড়ি আমার ক্রোশ চারেক হবে। বছর খানেক আগে মা একদিন খুব মেরেছিল। তা দিদি বললে—পঞ্চে, তুই তো গান গাইতে পারিস, তা ভালো বাজারে-জায়গায় যা না কেনে। গান গাইবি, ভিখ করবি। কথাটা মনে লাগল আমার। দিদিই একদিন আমার হাত ধরে এখানে রেখে গেল। সেই অবধি।—নিঃশব্দে হেসে সে চুপ করে গেল।

হঠাৎ এক সময় বলে উঠল—আপনকার গানের ওইটুকুন ভারি সোন্দর। সেই কি—কালা তোমার যখন বাজে বাঁশী।—বলতে বলতে সে সুরেই গাইতে আরম্ভ করলে।—

'ঘর-কন্না সব ভুলে যাই ছুটে যে আসি।
আমার গা-ঘষা হয় না, আমার কেশ-বাঁধা হয় না।
আরও হয় না কত কি!'

মেয়েটি সাবান মাখছিল, বিস্ময়ে তার হাত থেকে সাবানখানা পড়ে গেল। অবিকল স্বরে নির্ভুল গানখানি গাইছে পঞ্চী।

—আঃ, নাইতে আর লাগে কতক্ষণ? ওদিকে যে ট্রেনের সময় হয়ে এল।

হারমোনিয়ম-বাজিয়ে ডাকলে ঠিক এই সময়ে। ঘাট থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে ডাকতে এসেছে।

সত্যই স্টেশনে টিকিটের ঘণ্টা বেজে উঠল।

ট্রেন চলে গেল। থ্যামটার দলটিও চলে গেল। দোকানী সিং ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের চা-সরবত, জলখাবার বিক্রি শেষ করে ডাকলে—পঞ্চে! পঞ্চে!

পঞ্চের সাড়া পাওয়া গেল না! গেল কোথায়?

দোকানী ওকে সত্যই ভালোবাসে। দোকানীর স্ত্রীও ভালোবাসে। যেদিন পঞ্চীর কোথাও অন্ন না জোটে সেদিন দোকানী ডেকে খেতে দেয়। দুটোর ট্রেন গেলেই দোকানী একবার পঞ্চীর খোঁজ করে। পঞ্চীর সাড়া পাওয়া গেল না। বোধ হয় গ্রামের মধ্যে গোবিন্দ-বাড়িতে গিয়েছে প্রসাদের জন্য, কিংবা গিয়েছে চণ্ডীতলায়। চণ্ডীতলায় পঞ্চপর্বে বলি হয়—পঞ্চে হিসাব রাখে—কবে অমাবস্যা, কবে চতুর্দশী, কবে অষ্টমী, কবে সংক্রান্তি—সেদিন সে চণ্ডীতলায় যাবেই। নিশ্চয় দু জায়গার এক জায়গায় গিয়েছে সে। দোকানী আপনার দোকানের কাজে মন দিলে। দুটোর ট্রেনের পর আবার চারটেয় আসবে আর একখানা ট্রেন।

চারটের ট্রেন এল, চলে গেল। দোকানী এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল—পঞ্চি এখনও ফিরল না কেন? সে গেল কোথায়? ট্রেনে খ্যামটার দলের সঙ্গে চলে গেল না কি?

সত্যই তাই। পঞ্চী চুপি চুপি ট্রেনে চেপে পড়েছিল। বেঞ্চের তলায় ঢুকে শুয়েছিল। জংশন স্টেশনে নেমে কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তাদের হারিয়ে ফেললে।

ব্রাঞ্চ লাইনের গার্ড ড্রাইভার সবাই পঞ্চীকে চেনে। তারা বললে—তুই এখানে?

আকর্ণ-বিস্তার হাসি হেসে সে বললে—হ্যাঁ। এখানেই এলাম। বলি একবার ঘুরে ফিরে আসি।—একটু চুপ করে থেকে হাসিটা আরও একটু বিস্তৃত করে বললে—নতুন জায়গা দেখতে শুনতে তো সাধ হয়!

হেসে দত্তবাবু গার্ড বললে—বেশ, দেখা তো হল। এইবার চল।

ফিরে যেতে কিন্তু পঞ্চীর কেমন লজ্জা হল। সে বললে—না। থাকব এইখানে দুদিন দশদিন।

—থাকবি?

—হ্যাঁ। এখানকার বাজারটা কি রকম দেখি একবার।

উত্তর শুনে হেসে দত্ত গার্ড চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই পঞ্চীর একটা কথা মনে হল।—গাডবাবু! গাডবাবু

গার্ডবাবুকে সে বলতে চাইছিল এখানকার স্টেশন-মাস্টার, জমাদার, স্টলওয়ালা, এদের কাছে তার জন্যে একটু বলে দেবার জন্য।

গার্ডবাবুর সাড়া পাওয়া গেল না। গার্ড তখন স্টেশনের ভিতরে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পঞ্চী চলতে আরম্ভ করলে। ঠিক এসে উঠল স্টলের সামনে।

—কি ভাজছেন দোকানীমশায়? সিঙাড়া কচুরী?

দোকানী তার দিকে চেয়ে বললে—সরে বস!

সরেই একটু বসল পঞ্চী। তারপর সে তার ডুবকিতে আঙুলের ঘা দিয়ে আরম্ভ করলে—ও কালা!…

দত্ত গার্ডকে প্রয়োজন হল না। নিজেকে নিজেই চিনিয়ে নিলে পঞ্চী। দোকানী, স্টেশন-মাস্টার, জমাদার, জমির উপর পাতা লাইন, সিগন্যালের তার, বাজার, পথ, ঘাট, সব তার পরিচিত হয়ে গেল। কালীমায়ের স্থান, গৌরাঙ্গের আখড়ার পথও তার মুখস্থ। জংশনের সারি সারি রেললাইন প্রায়

অনায়াসেই পার হয়ে যায় সে। প্রথমে এসে একটুখানি দাঁড়ায়, লোকের সাড়' পেলে জিজ্ঞাসা করে—কে বটেন গো ? লাইনে গাড়ি রয়েছে না কি ?

লোক না থাকলে—কান পেতে শোনে ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যায় কি না তারপর এগিয়ে এসে লাইনের উপর পা দেয়। স্পর্শ করে বুঝে নেয় চলন্ত ট্রেনের গতিবেগ তার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে কি না। পঞ্চী বলে—ভ লাগলে শিরদাঁড়া যেমন শির-শির করে, তেমনি শিরশিরিনি বয় লাইনে। সন্দেহ হলে লাইন ছেড়ে সে ওভারব্রিজের দিকে যায়, এক পাশের রেলিং ধরে স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যায় সে। সিঁড়ির সংখ্যা তার মুখস্থ।

ডুবকির সঙ্গে এখন একটা হাঁড়ি সুদ্ধ রেখেছে। আঙুল দিয়ে বাজিয়ে অনেক পরীক্ষা করে কিনেছে। হাঁড়ি বাজিয়ে গান করলে লোক জমে বেশী।

মধ্যে মধ্যে স্টেশন-ঘরের দরজায় গিয়ে বসে। বসবার সময়টি তার দুপুর বেলায়, একটা থেকে আড়াইটার মধ্যে। এ সময়টায় মাস্টারবাবুরা বসে গল্প-গুজব করে। সে শোনে। গল্পের মধ্যে ছেদ পড়লেই বলে—মাস্টারবাবু

—কি রে ব্যাটা ? এসেছ তো!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা কি বলছ ?

—আজ্ঞে !—মাথা চুলকায় পঞ্চী।

—কি জিজ্ঞাস্য ? বর্ধমান কত দূর ? কত ভাড়া ?

—আজ্ঞে না, বলছিলাম বলি—। হাসির ভঙ্গিতে দন্তুর পঞ্চী আরও একটু দন্ত বিস্তার করে বাবুদের কাছ থেকে উৎসাহ-বাক্য প্রত্যাশা করে পায়ও সে উৎসাহ-বাক্য।

—কি বলছিলে ? বর্ধমান শহরটা কেমন ? কত বড় ?

—হ্যাঁ।—আরও একটু বেশী দন্তবিস্তার করে সবিনয়ে।

—বর্ধমান যাবি ? দেব একদিন চড়িয়ে গাড়িতে ?

পঞ্চী চুপ করে থাকে। সম্মতি জানাতে শঙ্কিত হয়। গাড়ি-ঘোড়া, লোকজন, গলি-ঘুঁজি, প্রকাণ্ড বড় শহর—তার মধ্যে কোথায়—?

টেলিগ্রাফের যন্ত্রটা শব্দ করে ওঠে, ওদিকে টেলিগ্রাফের ঘণ্টা বাজে ঠিন—ঠিন। বাবুরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পঞ্চী উঠে আসে। ভাবতে ভাবতে প্লাটফর্মের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। কাছেই টেলিগ্রাফের পোস্টে বাতাসের প্রবাহে শব্দ ওঠে, গায়ে-লাগানো মাইল-লেখা লোহার প্লেটটা অত্যন্ত দ্রুত শব্দ করে কাঁপে। পঞ্চী ধীরে ধীরে টেলিগ্রাফ-পোস্টে কান লাগিয়ে দাঁড়ায়। পোস্টের

গায়ে আঙুল বাজিয়ে বলে—টরে-টক্কা, টরে-টক্কা, টক্কা-টক্কা টরে।—তারপর বলে—হ্যালো! হ্যালো ঠাকরুন, বর্ধমানের ঠাকরুন। আমি পঞ্চী। গান গাইছি আমি।—ও তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি!

দিন যায়। এক বৎসর হয়ে গেল। পঞ্চী জংশনেই রয়েছে। টাকা পয়সা কিছু জমেছে তার। দোকানীর কাছে রাখে তার কিছু অংশ। দোকানী জানে ঐ তার সব। কিন্তু পঞ্চী তার উপার্জনকে ভাগ করে। কিছু নিজের কাছে রাখে। বাকীটা রাখে কাঠে-ঘেরা ছোট্ট চোর-কুঠুরীর মত জেনানা ওয়েটিং-রুমের এক কোণে মাটিতে পুঁতে। জংশন হলেও ব্রাঞ্চ লাইনের প্লাটফর্মটা পাকা নয়। জেনানা ওয়েটিং-রুমটার মেঝেও কাঁকরমাটির মেঝে। তার উপর রাখে তার বিছানাটা। বিছানা একখানা বস্তা। রাত্রে ওইখানে বস্তা বিছিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে।

বর্ধমানের বাতিকটা কমে গিয়েছে। কালা তোর তরে—গানখানা সে গায়, লোকে তারিফ করে, পঞ্চী সবিনয়ে হাসে, কিন্তু আর সেই চৈত্র-দুপুরে গেঁয়ো স্টেশন-প্লাটফর্মে নরম দুখানি পায়ের উপর মুখ রেখে প্রণাম করার কথা মনে পড়ে না। সেই মিষ্টি প্রাণমাতানো গন্ধের কথাও মনে পড়ে না। মনে পড়ে না ঠিক নয়, মনে পড়ে কিন্তু বুকের ভেতরটা তেমন 'আকুলি' করে ওঠে না।

কত দিন পর। অনেক দিন।

হঠাৎ সেদিন সমস্ত শরীরে তার শির শির করে কি বয়ে গেল! লাইনের উপর ট্রেন গেলে যেমন শব্দ-স্পর্শে শিহরণ জাগে। সেই গান! সেই গলা! আজ আর গান শুধু নয়, গানের সঙ্গে যন্ত্র বাজছে। স্টেশনের ঘরের সামনে ঠাকরুন গান করছে। কালা তোর তরে—!

পঞ্চী প্রায় ছুটে এসে দাঁড়াল। বেশ বুঝতে পারলে ঠাকরুনের সঙ্গে অনেক লোক রয়েছে। ছোট ছেলেও রয়েছে।

গান শেষ হতেই সে হাত জোড় করে বললে—ঠাকরুন!

—কে রে তুই?

—আজ্ঞে যে ঠাকরুন গান গাইলেন তাকেই বলছি আমি।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। একজন বললে—মরণ!

আবার গান আরম্ভ হল। 'চোখে ছটা লাগিল'—পঞ্চীর বুক একেবারে দুলে উঠল। তার সেই গান। নিতাই কবিয়ালের কাছে সে শিখেছিল, ঠাকরুন শিখেছিল তার কাছে।

গান শেষ হল।

—আমাকে চিনতে পারলেন না ঠাকরুন। আমি পঞ্চী—!

—এই ব্যাটা, এই। ভাগ!

ভাগিয়ে দিলেও সে এবার সঙ্গ ছাড়বে না। সে সজাগ হয়ে বসে থাকে। ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল। যাত্রীর দলটি আসর গুটিয়ে নিলে। একজন বললে—গ্রামোফোনটা ভালো করে বন্ধ করিস। রেকর্ডগুলো বাক্সের মধ্যে পুরে নে।

গাড়ি এল, চলে গেল। স্টেশন-স্টাফ, স্টলওয়ালা বিস্মিত হল—পঞ্চী নাই।

আরও অনেক কাল পর। অনেকগুলি বৎসর চলে গিয়েছে। পঞ্চীর চুলে সাদা ছোপ পড়েছে। দন্তুর মুখের দাঁত পড়েছে কয়েকটা। কানে শোনার শক্তি কমে এসেছে। লাইনে পা দিয়ে দূরে ট্রেন আসছে কি না আর ধরতে পারে না।

পঞ্চী এক তীর্থক্ষেত্রে পথের ধারে বসে ভিক্ষা করে। গানও আর তেমন গায় না। বলে—অন্ধজনে দয়া কর বাবা। অন্ধকে একটি পয়সা দাও মা। মা লক্ষ্মী জননী!

মা-জননীরা যখন যায় তখন পঞ্চী বেশী আকুলতা প্রকাশ করে। জুতোর শব্দ থাকে না—অথচ খস-খস শব্দ ওঠে গরদের কাপড়ের, পূজার ফুলের গন্ধ ওঠে, পঞ্চী বুঝতে পারে মা-লক্ষ্মীরা আসছেন।

যেদিন ভিক্ষে কম হয়, সেদিন গান করে।

সেদিন সে গান গাইছিল। 'চোখে ছটা লাগিল'—গাইতে আজকাল ভালো লাগে না। ভক্তিরসের গানই বেশী গায়। 'কালা তোর তরে' গানখানা মাঝে মাঝে গায়। সেদিন গাইছিল সে ওই গানখানাই।

গান শেষ হতেই একজন হেসে বললে—খুব গেয়েছিলে গানখানা রেকর্ডে। ঘাটে মাঠে হাটে ছড়িয়ে গেল।

নারী-কণ্ঠের অতি মৃদু হাসির শব্দ শুনতে পেলে পঞ্চী। মেয়েটি বললে—গাইলাম, কিন্তু কালা শুনলে কই?

—ওই তোমার এক ঢং! আর তীর্থে কাজ নেই। চল ফিরে চল।

—নাঃ। বয়স অনেক হল। অন্ধকার হয়ে আসছে দুনিয়া। আর—

অসহিষ্ণু পঞ্চী বলে উঠল—কিছু দয়া হবে মা? অন্ধ—

তার হাতে এসে পড়ল কি একটা।

পুরুষটি বললে—আধুলি; পয়সা নয় রে বেটা।

—আধুলি ?

—হ্যাঁ।

আধুলি! মেকী নয় তো? হাত বুলিয়ে—মাটিতে ফেলে শব্দ পরখ করে নিলে পঞ্চী। তারপর পরম কৃতজ্ঞতাভরে হাত বাড়িয়ে মেয়েটির পায়ে হাত বুলিয়ে প্রণাম করলে।

তারা চলে গেল। পায়ের শব্দ উঠল।

পাখীরা ডাকছে। দিন বোধ হয় শেষ হল। পঞ্চীও উঠল।

রা য় বা ড়ি

১২৭০ সাল—ইংরেজী ১৮৬৩ সালের ঘটনা। সিপাহীযুদ্ধ সবে শেষ হইয়াছে। অগ্নি নিবিয়াছে, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ তখনও সম্পূর্ণরূপে বিকিরিত হয় নাই। দেশের লোকের অসি গিয়াছে, কিন্তু বাঁশের লাঠি তখনও বাঁশীতে পরিণত হয় নাই। তখন লোকে বাবরি চুল রাখিত, কিন্তু বব ছাঁটে নাই। জমিদার তখনও ভূস্বামী, এবং তাঁহাদের সে স্বামিত্বের সত্যকার অর্থ তাঁহারা বজায় রাখিয়াছিলেন।

রাজারামপুরের রায়বাড়ির তখন অসীম প্রতাপ। এখনও একটা কথা প্রচলিত আছে—রায়বাড়ির রাজ্যের মধ্যে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল পান করিত, দুর্দান্ত বাঘকেও নাকি হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। রায়-বংশের চতুর্থ পুরুষ রাবণেশ্বর রায় তখন রায়বাড়ির একক উত্তরাধিকারী। ১০৯২ নম্বর লাট হুদ্দা-শ্যামপুরের মাতব্বর প্রজারা আসিয়া সদরে কাঁদিয়া গড়াইয়া পড়িল—হুজুর, রক্ষা করুন।

হুদ্দা-শ্যামপুরে দুর্দান্ত মুসলমান, বাগদী ও হাড়ি লাঠিয়ালের বাস, এবং এখানকার সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন অধিবাসীরা কূট-কৌশলী, পাকা ষড়যন্ত্রী। আজ দুই পুরুষ তাহারা বিনা খাজনায় ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, পঞ্চাশ বৎসর কোনো জমিদার এখানে পুণ্যাহ করিতে পারেন নাই। চার-পাঁচ ঘর জমিদারের হাত-ফের হইয়া অবশেষে হুদ্দা-শ্যামপুর রাবণেশ্বর রায়ের হাতে আসিল। শেষ জমিদার আক্রোশভরে রাবণেশ্বর রায়কে ডাকিয়া পত্তনি বিলি করিলেন। রায় তাঁহার ইষ্টদেবী কালীমাতার সেবায়তস্বরূপে সম্পত্তি পত্তনি গ্রহণ করিলেন।

আজ পূর্ণ এক বৎসর বিরোধ চালাইয়া বোধ হয় ক্লান্ত হইয়াই প্রজারা আসিয়া রায় দরবারে গড়াইয়া পড়িল।

প্রজারা সংখ্যায় ছিল চল্লিশজন। লাট শ্যামপুরের মধ্যে গ্রামের সংখ্যা ছত্রিশখানি—ছত্রিশখানি গ্রামের ছত্রিশ জন মণ্ডল-প্রজা আসিয়াছিল; তাহার উপর সঙ্গে ছিল শ্যামপুরের কবিরাজ রামপ্রাণ গুপ্ত, সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জোতদার রাধানাথ দাস, আর ছিল ঘাঁটিতোড় গ্রামের মুসলমান প্রজাদের মুখপাত্র ওবেদার রহমান ও তিনু মিয়া। বেলা তখন অপরাহ্নেরও শেষভাগ, সন্ধ্যা হইতে বিশেষ বিলম্ব ছিল না। রায়-সরকারের কাছারি তখন আবার দ্বিতীয় দফায় আরম্ভ হইয়াছে। চারিদিকে তকমা-আঁটা হরকরা-চাপরাসীদের যাওয়া-আসার বিরাম নাই, লোকজনে কাছারি গিসগিস করিতেছে। শ্যামপুরের প্রজারা ইহার পূর্বে কয়েক ঘর জমিদারের সহিত বিবাদ করিয়াছে এবং তাঁহাদের ঘায়েল করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহারা ছিলেন মধ্যশ্রেণীর জমিদার, এতবড় জমিদার শ্যামপুরের প্রজারা দেখে নাই। কাছারির পরিধি ও গাম্ভীর্য দেখিয়া তাহাদের মুখ শুকাইয়া গেল।

কবিরাজ রামপ্রাণ গুপ্ত রসিক লোক, সে উঁকি মারিয়া দেখিয়া-শুনিয়া অনাবশ্যকভাবে কাছাটা আর একটু সাঁটিয়া বলিল, কাছারিই বটে রে বাবা—কাছার অরি! কিন্তু হুজুর কই? শ্যামপুরের নির্দিষ্ট গোমস্তা ঠাকুরদাস চক্রবর্তী হাসিয়া বলিল, হুজুর বসেন দোতলায়। সকলের দৃষ্টি আপনা হইতেই উপরে দোতলার জানালার দিকে নিবদ্ধ হইল। সুদীর্ঘ অট্টালিকার দ্বিতলে সারি সারি জানালা, আবার ওপাশে নূতন ভারা বাঁধা রহিয়াছে—আরও ঘর তৈয়ারি হইতেছে। রায়-হুজুর শখ করিয়া নাচ-গান-মজলিসের জন্য প্রকাণ্ড একটি ঘর তৈয়ারি করাইতেছেন। প্রজারা সভয়বিস্ময়ে প্রত্যেক জানালার দিকে চাহিয়া তাহাদের কল্পনার মানুষটিকে খুঁজিতেছিল।

গোমস্তা বলিল এ দোতলায় হল সব নায়েব সেরেস্তা, নায়েববাবুরা বসেন এখানে। হুজুরের কাছারি এখান থেকে দেখা যায় না, ও-পাশে ফুলবাগানের সামনে—

ঠিক এই সময় একজন হরকরা আসিয়া কথায় বাধা দিল, গোমস্তাকে বলিল, নায়েববাবু ডাকছেন আপনাকে।

গোমস্তা চলিয়া গেল।

গুপ্ত হাসিয়া বলিল, দাসজী, দেশে বর্গী এসেছে, দুষ্টু ছেলেদের ঘুম পাড়াও—গোলমাল করলেই বিপদ।

রাধানাথ দাস চিন্তাকুল মুখে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তাই দেখছি।

গুপ্ত এবার ওবেদার রহমানকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোবা তোবা বল চাচা, মুখে যে মাছি ঢুকছে! বলি, হাঁ করে দেখছ কি?

পিছন হইতে রতন মণ্ডল বলিল, বাহারের লক্ষা কেটেছে কিন্তু দালানে গুপ্ত মশায়!

অপর একজন বলিয়া উঠিল, এ যে গোলকধাঁধা রে বাপু, ইদিকে দালান, উদিকে দালান—আড়ে দীঘে ওর নাই রে বাবা—হ-হ!

—আসুন, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।—একজন সরকার আসিয়া তাহাদের সকলকে আহ্বান করিল।

গুপ্ত বলিল, আমাদিগে বলছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের ভার আমার ওপর, আমি কালীমায়ের দেবোত্তরের সরকার।—সরকার অগ্রসর হইল।

গুপ্ত কৃত্রিম ভয়ে বিহ্বলতার ভান করিয়া মৃতুস্বরে বলিল ও দাসজী, কোথায় নিয়ে যাবে হে বাপু! গারদে, না একেবারে—

বিরক্তিভরে বাধা দিয়া রাধানাথ দাস কহিল, চুপ কর গুপ্ত, সব সময়েই তোমার ইয়ে—হ্যাঁ!

ওবেদার রহমান হাসিয়া বলিল, ভয় কি চাচা? আমাদের বাড়িও ঘাঁটিতোড়, লাঠির ডগায় ঘাঁটি তোড়াই হল আমাদের ব্যবসা। ভয় কি? ঘাঁটি ভেঙে তোমাকে পিঠে করে নিয়ে পালাব।

কাছারি পার হইয়া রাধাগোবিন্দজীর মন্দির, তাহার পর জগদ্ধাত্রীর বাড়ি, তাহার পর একেবারে গঙ্গার কূলের উপরেই রায়-চৌধুরীদের কালীবাড়ি। গঙ্গা যখন কূলে কূলে পাথার হইয়া উঠে, তখন কালীবাড়ির বাঁধা ঘাটের প্রশস্ত চত্বরের গায়ে গঙ্গার জল ছল-ছল করিয়া আঘাত করে। ভিতরে দক্ষিণমুখী মন্দিরের সম্মুখে সুবৃহৎ সুউচ্চ নাটমন্দির; নাটমন্দিরকে পরিবেষ্টন করিয়া তিন দিকে খিলানের বারান্দাযুক্ত সারি সারি একতলা ঘর। দক্ষিণ দিকের বারান্দার কোণে পাশাপাশি দুইটি ঘরের দরজা খোলা ছিল; খোলা দরজা দিয়া দেখা যাইতেছিল, ঘরে শতরঞ্জির উপর সাদা চাদর ধপধপ করিতেছে, এক দিকে সারি সারি বালিশ পড়িয়া আছে। ঘরের দরজার সম্মুখেই প্রকাণ্ড দুইটা জালায় জল ও বড় বড় ঘটি রাখিয়া দুই জন চাকর অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

সরকার বলিল, এইখানে আপনারা বিশ্রাম করুন। মুসলমান যাঁরা আছেন, তাঁদের জন্যে ওপাশে ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। ঘরে জিনিসপত্র রেখে দিন।

আগন্তুকদের কেহ কোনও উত্তর দিল না, সকলে সবিস্ময়ে দেখিতেছিল ঠাকুরবাড়ি।

হাত-মুখ ধুইয়া নাটমন্দিরে উঠিয়া তাহাদের বিস্ময় বিপুল হইয়া উঠিল। শুধু বিস্ময় নয়, শ্যামপুরের দুর্দান্ত অধিবাসীদলের শরীর কেমন ছমছম করিয়া উঠিল। প্রকাণ্ড নাটমন্দিরের অসাধারণ উচ্চতা সত্যই মানুষকে কেমন অভিভূত করিয়া ফেলে। তাহার উপর এতবড় নাটমন্দিরটার অভ্যন্তর-ভাগ তখন আধ-আলো আধ-ছায়ায় যেন থমথম করিতেছিল। চোখের সম্মুখের অন্ধকার ধীরে ধীরে কাটিয়া পরিবেষ্টনীর সম্পূর্ণ রূপ তাহাদের দৃষ্টিতে ধরা দিতেই তাহারা সভয়ে শিহরিয়া উঠিল। নাটমন্দিরের চারিপাশে থামের গায়ে নানা আকারের বলির খড়্গ আলোকের অভাবে প্রভাহীন শাণিত রূপ লইয়া ঝুলিতেছিল। মন্দিরের ঠিক সম্মুখেই দক্ষিণে বামে সুবৃহৎ দুই যূপকাষ্ঠ।

দেবীমন্দিরের দ্বার তখন রুদ্ধ ছিল। রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখেই প্রণাম সারিয়া তাহারা আসিয়া বসার ঘরে আশ্রয় লইল। দুর্দান্ত ভয়ে ও আকুল চিন্তায় আচ্ছন্ন ও নির্বাক হইয়া সব বসিয়া রহিল।

সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রাধানাথ দাস বিরক্তি-ভরে বলিয়া উঠিল, কে রে বাপু, ফোঁস ফোঁস করছিস কে ?

কেহ উত্তর দিল না। এই সময় একজন চাকর আলো লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সেই আলোয় দেখা গেল, এক কোণে বালিশে মুখ গুঁজিয়া প্রৌঢ় বিপিন মোড়ল ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতেছে। দাস দাঁত কিসকিস করিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্বেই চাকরটা বলিয়া উঠিল, হুজুর আসছেন। —বলিতে বলিতেই সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ঘরের ছাদের উপর রাবণেশ্বর রায়ের খড়মের শব্দ খটখট করিয়া কঠোর শব্দে বাজিতেছিল, সমস্ত ছাদটা সঞ্চারিত করিয়া একটা কম্পন অনুভূত হইতেছিল।

দাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, ওঠ ওঠ সব, নজরের টাকা বার কর। গুপ্ত—গুপ্ত, শেখজীদের সব ডাক হে। আঃ, সব মাটি করলে!

বাহিরে নাটমন্দিরে তখন দেওয়ালগিরিতে ঝাড়-লণ্ঠনে সারি সারি বাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। প্রজারা সকলে সারি দিয়া নাটমন্দিরে উঠিবার সিঁড়ির মুখে রায়-হুজুরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

রাবণেশ্বর রায় নামিতেছিলেন দোতলার সিঁড়ি বাহিয়া। নাটমন্দিরের আলোকমালার ছটার প্রাচুর্যে প্রজারা তাঁহাকে সভয়-বিস্ময়ে দেখিল। দীর্ঘাকার পুরুষ, খড়্গের মত তীক্ষ্ণ দীর্ঘ নাসিকা, আয়ত চোখ, সর্বাঙ্গের মধ্যে স্থূলতার এতটুকু চিহ্ন নাই; কিন্তু সিংহের মত বলিষ্ঠ দেহ—প্রশস্ত বক্ষ, ক্ষীণ কটি। বয়স প্রায় চল্লিশ। পরিচ্ছদ ও ভূষণের মধ্যে পরনে গরদের কাপড়, কাঁধে নামাবলী, অনাবৃত বক্ষে শুভ্র উপবীত ও রুদ্রাক্ষের মালা, দক্ষিণ বাহুতে সোনার তাগায় একটি মোটা রুদ্রাক্ষ, হাতের অনামিকায় নবরত্নের একটি আংটি।

হিন্দু প্রজারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, মুসলমান প্রজারা আভূমি নত হইয়া সেলাম করিল। সঙ্গে সঙ্গে ঠুং ঠুং শব্দ উঠিতেছিল নজরের টাকার।

রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথাকার প্রজা?

কর্তার পিছনে ছিল দেবোত্তরের নায়েব, সে উত্তর দিল, আজ্ঞে, হুদ্দা-শ্যামপুর—কালীমায়ের নতুন মহাল।

—হুদ্দা-শ্যামপুর?

রাবণেশ্বর রায় ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, তাঁহার কাঁধের নামাবলীখানা স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। নায়েব তাড়াতাড়ি সেখানা উঠাইয়া লইল। রায় গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তারা—তারা।

তারপর ভ্রূক্ষেপহীন পদক্ষেপে নাটমন্দিরের উপরে উঠিয়া গেলেন। সে পদক্ষেপের তাড়নায় নজরের টাকাগুলি চারদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নায়েব দেখিয়া-শুনিয়া নজরের টাকাগুলি গুনিয়া-গাঁথিয়া তুলিয়া লইল। ওদিকে তখন দেবী-মন্দিরের দ্বার খোলা হইয়াছে, প্রকাণ্ড কাঁসরখানায় ঘন ঘন শব্দে ঘা পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাক কাঁসি শিঙা বাজিতেছিল। পবিত্র ষোড়শাঙ্গ ধূপের গন্ধে নাটমন্দির আমোদিত।

আরতি শেষ হইতেই প্রজারা নীরবে প্রণাম সারিয়া আবার আসিয়া ঘরে আশ্রয় লইল। সরকার আসিয়া আহ্বান করিল, আসুন আপনারা, মায়ের শীতলের প্রসাদ নিয়ে জল খাবেন আসুন।

নাটমন্দির হইতে ডাক আসিল—সরকার!

একজন খানসামাকে ও দেবীমন্দিরের পরিচারককে জলযোগের ব্যবস্থায় নিযুক্ত করিয়া সরকার তাড়াতাড়ি কর্তার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। বারান্দায় বসিয়া জলযোগ করিতে করিতে প্রজারা শুনিল, কর্তা প্রশ্ন করিতেছেন—প্রজারা কতজন এসেছে?

—আজ্ঞে, চল্লিশ জন।

—খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—মাছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যবস্থা হয়েছে।

—কত ?

—আজ্ঞে, দশ সের।

—হুঁ। দুধ ?

সরকার এবার চুপ করিয়া রহিল। কর্তা আবার প্রশ্ন করিলেন, দুধের ব্যবস্থা হয়েছে ?

—আজ্ঞে, অবেলায়—। সরকার আর উচ্চারণ করিতে পারিল না।

কর্তা বলিলেন, অতিথি তিথি মেনে আসে না, বেলা দেখে আসে না। যাও, বাড়ির দুধ নিয়ে এস।

সরকার যেন বাঁচিল, সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইল। কর্তা আবার বলিলেন, গিন্নীর কাছে খবর নাও, লক্ষ্মীনারায়ণজীর দরবারে, মা-জগদ্ধাত্রীর দরবারে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না!

সরকার চলিয়া গেল। রায়-কর্তা জপমালা লইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন—তন্ত্রমতে সন্ধ্যাতর্পণ জপ করিবেন।

নিস্তব্ধ নাটমন্দির। পরিচারক পূজারীর দল নিস্তব্ধভাবেই আনাগোনা করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে মন্দির-অভ্যন্তর হইতে মোটা ভরাট গলায় রায়-কর্তা ডাকিতেছিলেন, তারা—তারা—

সে কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটি অকৃত্রিম আবেগ রন রন করিয়া বাজিতেছিল।

অনেকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সরকার ও শ্যামপুরের গোমস্তা ঠাকুরদাস চক্রবর্তী আসিয়া ডাকিল—উঠুন সব, খাবারের ঠাঁই হয়েছে।

গুপ্ত নিজে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—মরেছে রে, বেটা চাষারা সব মরেছে। নরম বালিশ মাথায় দিয়েছে কি মরণ-ঘুমে—

গোমস্তা চক্রবর্তী মৃদুস্বরে বলিল, চুপ চুপ, বাইরে হুজুর আছেন।

প্রজারা বাহিরে আসিয়া দেখিল, রায়-কর্তা নিজে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পরনে এখন কোঁচানো মিহি থান-ধুতি, গায়ে গিলা-করা পাঞ্জাবি, পায়ে চটি। সকলে মাথা হেঁট করিয়া খাইতে বসিল।

কর্তা বলিলেন কি হে, হুদ্দা-শ্যামপুরের সব বড় বড় বীরের কথা শুনেছি; কিন্তু কই, আহার কই সব? খাচ্ছ কই তোমরা?

কর্তার কণ্ঠস্বর ঈষৎ জড়িত, কিন্তু একটি অনাবিল প্রসন্নতায় হৃদ্য।

গুপ্ত অভয় পাইয়া বলিল—আজ্ঞে হুজুর, মা-লক্ষ্মী বড় কাহিল-কাহিল ঠেকছেন, আমরা ভালো খেতে পারছি না হুজুর।

কর্তা বলিলেন—ভেঙে বল তো বাপু, কি হয়েছে?

—আজ্ঞে, এই সরু চালের অন্ন আমাদের কেমন জল-জল লাগছে। এই মোটা আকাঁড়া চালের ভাত ভিন্ন আমাদের মিষ্টি লাগে না হুজুর।

কর্তা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, তারপর হুকুম করিলেন, ঠাকুর, মোটা চালের ভাত নিয়ে এস।

সুযোগ বুঝিয়া রাধানাথ দাস বলিয়া উঠিল, হুজুর যদি অভয় দেন তো একটি নিবেদন পাই।

হৃদ্য কণ্ঠস্বরে কর্তা বলিলেন—বল বল।

—হুজুর, রাজায় প্রজায় সম্বন্ধ হল বাপ আর বেটা।

কর্তার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিলেন, শুনে তো আসছি তাই চিরকাল। কিন্তু বেটায় এত বাপ বদল করে কেন হে? পছন্দ হয় না?

রাধানাথের মাথা হেঁট হইয়া গেল। সকলের আহার শেষ হইলে সমস্ত ঠাকুরবাড়িগুলি ঘুরিয়া রায়-কর্তা দ্বিতলে উঠিলেন।

পরদিন প্রাতে প্রজাদের কাছারিতে তলব হইল। মিটমাটের কথাবার্তা সমস্ত সুশেষ করিয়া প্রজারা বিদায় লইল। প্রত্যেকের বিদায় মিলিল ধুতি ও চাদর, এবং ফিরিবার গাড়িভাড়া প্রত্যেককে দেওয়া হইল। গুপ্তকে চিকিৎসক জানিয়া সম্মানীস্বরূপ পাঁচ বিঘা নিষ্কর ভূমির সনন্দ রায়-কর্তা সহি করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। নূতন জলসাঘরের নকশাগুলি তিনি দেখিয়া দিবেন।

মাসখানেক পর।

রাবণেশ্বর রায় আহারান্তে দ্বিপ্রহরে অন্দরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। রায় গিন্নী পাশে বসিয়া পাখার বাতাস দিতেছিলেন। ঝি আসিয়া খবর দিল, কোন গোমস্তার পরিবার এসেছে, খুব কান্নাকাটি করছে।

কর্তা উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, উঠে যাও গিন্নী, দেখ কার কি হল!

রায়-গিন্নী উঠিয়া গিয়া একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

স্ত্রীলোকটির কাপড়খানা জীর্ণ নয়, কিন্তু কাদায় ধূলায় মালিন্যের আর তাহাতে শেষ নাই, তাহার কোলে একটি শিশু।

শিশুটিকে রায়-কর্তার পায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া মেয়েটি মূর্তিমতী বিষণ্ণতার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

গিন্নী সজল চক্ষে কহিলেন, হুদ্দা-শ্যামপুরের গোমস্তা ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর স্ত্রী।

মেয়েটি এবার হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কর্তার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। কর্তা শশব্যস্তে বলিলেন, ওঠ মা, ওঠ, কি হয়েছে বল ?

গিন্নী বলিলেন, প্রজারা চক্রবর্তীকে পুড়িয়ে মেরেছে। নগদী কোনো রকমে এদের নিয়ে এখানে এসেছে—

রায়-গিন্নীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। দরদর ধারে চোখের জলে বক্ষবাস সিক্ত হইয়া উঠিল।

কর্তা গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, যুগলা !

যুগলা খানসামা দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কর্তা বলিলেন, দেখ্ কাছারিতে কোথায় হুদ্দা-শ্যামপুরের নগদী এসেছে। তাকে নিয়ে আয়।

সবিস্ময়ে যুগলা প্রশ্ন করিল, এখানে ?

কর্তা যুগলার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন শুধু। যুগলা আর উত্তরের প্রতীক্ষা করিল না, দ্রুতপদে চলিয়া গেল। কর্তা ধীরপদক্ষেপে কক্ষের মধ্যে পদচারণা করিতে করিতে বলিলেন, মৃত্যুর ওপরে হাত নেই মা, কি করব বল ? তবে নিশ্চিন্ত থাক তুমি, আমার ছেলে বিশ্বেশ্বর যদি খেতে পায়, তাহলে তোমার ছেলেও পাবে। যাও গিন্নী, ওঁকে স্নান করিয়ে কিছু খেতে দাও। যাও মা, তুমি ওঁর সঙ্গে যাও।

মেয়েটি ধীরে ধীরে গিন্নীর সহিত চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই যুগলা নগদীকে সঙ্গে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে যাহা বলিল, তাহা এই—প্রজারা এখানে মৌখিক মিটমাটের কথা শেষ করিয়া গেলেও ভিতরে ভিতরে তাহারা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিতেছিল। হুজুর নাকি এখানে তাহাদের বাপ তুলিয়া কি গালিগালাজ করিয়াছিলেন ! জমিদারপক্ষীয় কেহ কিন্তু তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারে নাই। ঘটনার দিন গোমস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া গুড়-তৈয়ারি-করা উনানের মধ্যে পুড়াইয়া মারিয়াছে। সঙ্গের চাপরাসী দুইজনও জখম হইয়া এখনও সেখানে যে কি অবস্থায় আছে, তাহা সে বলিতে পারে না। তাহার পরই উন্মত্ত প্রজারা আসিয়া কাছারি-ঘরে

আগুন দেয়। নগদী কোনো রকমে গোমস্তার স্ত্রীপুত্রকে লইয়া সদরে আসিয়া হাজির হইয়াছে।

রায়-কর্তা একটা ক্রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হুঁ।

তারপর পাশের ঘরে গিয়া ঘুমন্ত একমাত্র পুত্র বিশ্বেশ্বরের হার খুলিয়া লইয়া নগদীর হাতে দিয়া বলিলেন, নিয়ে যা। যুগলা, গিন্নীর কাছে একে নিয়ে যা, বলবি—বিশ্বেশ্বর যা খায়, তাই যেন একে খেতে দেওয়া হয়। নিজে পাশে বসে যেন তিনি খাওয়ান। আর কেলে বাগদীকে ডেকে নিয়ে আয়—এখুনি—এইখানে।

কিছুক্ষণ পরে যুগলার পিছন পিছন দীর্ঘ শীর্ণ প্রেতের মত এক মূর্তি অন্দরে একেবারে কর্তার শয়নকক্ষে নিঃশব্দ-পদক্ষেপে গিয়া প্রবেশ করিল। কালী বাগদীর পদশব্দ নাকি বিড়াল কি বাঘের পদশব্দের মত শোনা যায় না। কিন্তু কালী বাগদীর অন্দরে-প্রবেশে অন্দরবাসিনীরা সচকিত হইয়া উঠিল। এ ব্যবস্থা অভিনব, রায়-অন্দরে খানসামা ও কদাচিৎ নায়েব ব্যতীত অপর কেহ কখনও প্রবেশ করে নাই। অন্দরের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন গুঞ্জিত হইয়া উঠিল।

রায়-গিন্নী কথাটা শুনিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কালী বাগদীর পরিচয় তাঁহার কাছে অজ্ঞাত ছিল না। তিনি তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেলেন। ঘরে প্রবেশ-মুখেই তিনি শুনিলেন, রায়-কর্তা বলিতেছেন—ছত্রিশ মৌজা কালো করে দিয়ে আসতে হবে। একখানা চালা বাঁচবে না, বুঝলি? কেউ যেন এক ফোঁটা জল আগুনে দিতে না পারে।

কালী অত্যন্ত শান্ত স্বরে বলিল, এই বেলাতেই বেরিয়ে পড়ছি আমরা।

রায়-গিন্নী ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—না, তা হবে না, আমি হতে দেব না।

কর্তা বাঘের মত গর্জন করিয়া উঠিলেন, কি হবে না?

—গ্রাম পোড়াতে আমি দেব না। প্রজা-শাসন—

রায়-কর্তা বাধা দিয়া বলিলেন, যা বোঝ না গিন্নী, সে বিষয়ে হাত দিতে যেও না।

গিন্নী এবার বলিলেন, কালী, তুই যদি যাবি—

কালীর দিকে ফিরিয়া তিনি দেখিলেন, কই কালী? কালী কখন নিঃশব্দ-পদক্ষেপে চলিয়া গিয়াছে।

গিন্নী বলিলেন, ফিরিয়ে আন, ডাক ওকে।

—গিন্নী, মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের শ্যামপুরের প্রজারা আমার মাথায় পা দিয়েছে।

—কেন, আমার বাবাও তো জমিদারি শাসন করেন—

হাসিয়া রায়-কর্তা বলিলেন, বৈষ্ণবী মতে। কিন্তু আমরা শাক্ত গিন্নী, তোমার বাপের সঙ্গে আমাদের মতে মিলবে না। দেখলে তো, সেপাই-হাঙ্গামা কোম্পানি কেমন করে শাসন করলে!

রায়-গিন্নীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। বলিলেন--দেখ, প্রজা না হয় দোষ করেছে, কিন্তু তাদের স্ত্রী-পুত্র—

রায়-কর্তা ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, অসময়েই আজ অন্দর হইতে বাহির হইয়া কাছারিতে চলিয়া গেলেন।

দিন পাঁচেক পর। রায়-কর্তা কালীমন্দিরে সন্ধ্যাতর্পণ করিয়া নাটমন্দির হইতে নীচে নামিতেছেন, এমন সময় নাটমন্দিরের থামের সুদীর্ঘ ছায়া যেন কায়া গ্রহণ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছায়ার সঙ্গে মিশিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—কালী বাগদী। সে আসিয়া প্রণাম করিয়া এক পাশে দাঁড়াইল।

কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কালী?

শান্ত মৃদুস্বরে কালী কহিল, কাজ হয়ে গিয়েছে হুজুর।

কর্তা বলিয়া উঠিলেন, তারা—তারা!—তারপর ডাকিলেন, অক্ষয়!

অক্ষয় কালী-মন্দিরের পরিচারক। সে আসিলে বলিলেন, কালীকে মায়ের প্রসাদী কারণ দাও গিয়ে।

আবার বলিলেন, কিছুদিন পর আবার একবার।

কালী নিঃশব্দে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

রায়-গিন্নীর কাছে সংবাদটা কিন্তু গোপন রহিল না। তিনি কাঁদিয়া কহিলেন, উঃ, এই বোশেখ মাস—কাল-বোশেখীর দুর্যোগ— ছেলেমেয়ে নিয়ে—উঃ!

রায়-কর্তা গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলেন।

রায়-গিন্নী আবার বলিলেন, লোকের দীর্ঘশ্বাসকে তুমি ভয় কর না? আমার ওই একটি সন্তান—

বাধা দিয়া রায়-কর্তা বলিলেন, রায়বংশে আমাকে নিয়ে চার পুরুষ, বিশ্বেশ্বর পঞ্চম পুরুষ—ওই এক সন্তানই হয়ে আসছে ব্রজরানী, আর দুর্দান্ত প্রজা-শাসনও এই ধারায় আমাদের হয়ে আসছে। তুমি ওই ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর স্ত্রী-পুত্রের

দিকে তাকিয়ে কথা বল। জান, দ্রৌপদীর বেণী দুঃশাসনের রক্তেই বাঁধা হয়েছিল? কৌরববংশে বিধবার আর সংখ্যা ছিল না।

ব্রজরানী বলিলেন, কিন্তু গান্ধারীর অভিশাপ? প্রভাসের কথাও স্মরণ কর।

কর্তা স্থিরদৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ব্রজরানী বলিলেন, জান, আজ কদিন থেকেই আমি স্বপ্ন দেখি—

এবার হা-হা করিয়া হাসিয়া কর্তা বলিলেন, ছেড়ে দাও স্বপ্নের কথা। আর ভবিষ্যৎই যদি স্বপ্নে তুমি দেখে থাক, তবে তো সে ভবিতব্য, মা-তারার—আনন্দময়ীর ইচ্ছা।

তারপর গভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, তারা—তারা!

রায়-গিন্নী কি বলিতে গেলেন, কিন্তু তাহার পূর্বেই যুগলা খানসামা সাড়া দিয়া সসম্ভ্রমে দরজা খুলিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। দরদালান হইতে হাসিতে হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন—রায়-কর্তার শ্যালক বীজনগরের জমিদার হরিনারায়ণ সরকার। আহ্বানের পূর্বেই তিনি বলিলেন, রাধারানীর হঠাৎ বিয়ের স্থির হয়ে গেল রায় মশায়। আপনাদের নিতে এলাম।

কর্তা গম্ভীরভাবে বলিলেন, ভগ্নী-ভাগ্নেকে নিয়ে যাও ভাই, আমায় নিয়ে যেও না।

চকিত হইয়া হরিনারায়ণ বলিলেন, কেন, আমাদের কি অপরাধ হল?

ব্রজরানীও উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাবণেশ্বর গম্ভীরভাবে বলিলেন, তোমাকে যে আমি ছাড়া অপরে শালা বলবে, এ আমার সহ্য হবে না। আমার সম্মানে শরিক—

কথা সমাপ্ত না হইতেই হরিনারায়ণ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ব্রজরানীও হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, এখনও শখ আছে নাকি? বল তো সত্যভামার মত আমিই না হয় রাধারানীকে তোমার রথে তুলে দিই।

কর্তা শ্যালকের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, বেশ তো গো সত্যভামা দেবী, তার আগে তোমার নারায়ণ-কর্তার মতটা নাও।

ব্রজরানী চোখ-মুখ লাল করিয়া বলিলেন, যাও।

মাস দেড়েক পর। আষাঢ় মাস। সেদিন রথযাত্রার পূর্বদিন।

রাধারানীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কর্তা কয়েকদিন পরেই ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু গিন্নী ও পুত্র বিশ্বেশ্বর তখনও ফিরেন নাই। কর্তার শাশুড়ী

বলিয়াছিলেন, বাবা, ব্রজর তো আসা বড় একটা ঘটে না, যখন এসেছে, তখন মাস খানেক মায়ের মুখ চেয়ে রেখে যাও।

রাবণেশ্বর সে অনুরোধ ঠেলিতে পারেন নাই; যুগলা খানসামা, কালী বাগদী প্রমুখ কয়েকজনকে সেখানে রাখিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আগামী কল্য রথযাত্রার দিন রায়বাড়ির সদরে পুণ্যাহ হইবে। এই দিনটি পুণ্যাহের জন্য বরাবর নির্দিষ্ট হইয়া আসিয়াছে। পুণ্যাহের দিন দান-ধ্যান, কাঙালী-ভোজন, নাচ-গান, জলসা ইত্যাদি সমারোহের বিপুল আয়োজন হইতেছে। সমস্ত রায়বাড়ির এই সময় রঙ ফিরানো হইয়া থাকে। লতায় পাতায় ঠাকুরবাড়ি সাজানো হইতেছে। কয়েকজন বিখ্যাত গায়ক, ওস্তাদ ও যন্ত্রী আসিয়াছেন—সন্ধ্যায় জলসাঘরে জলসা হইবে। রায়-হুজুর জলসার ও নাচ-গানের জন্য নূতন ঘর তৈয়ারি করাইয়াছেন, সেই ঘরে এই পুণ্যাহ উপলক্ষ্যে প্রথম মজলিস বসিবে। সমারোহের প্রাচুর্য এবার কিছু বেশি।

আজ ব্রজরানী ও বিশ্বেশ্বর ফিরিবেন। আগামী কল্য রায়-গিন্নী উপস্থিত না থাকিলেই নয়। রায়-কর্তা কালীবাড়ি হইতে পুণ্যাহের রৌপ্য-কলস মাথায় করিয়া রাধাগোবিন্দজীর দরবারে আনিয়া স্থাপন করিবেন, গোবিন্দ-মন্দিরে সে কলসী কাঁখে তুলিবেন রায়-গিন্নী। অন্দরে লক্ষ্মীর সিংহাসনে লইয়া গিয়া সে কলসী তিনি স্থাপন করিবেন; রাত্রে লক্ষ্মীপূজা করিবেন।

রায়-সরকারের ভূ-সম্পত্তি বহুবিস্তৃত, সারা বাংলাময়ই ছড়াইয়া আছে। প্রত্যেক মৌজায় নিমন্ত্রণপত্র গিয়াছে, পুণ্যাহপাত্র মণ্ডল-প্রজারা সব—পুণ্যাহের টাকা লইয়া উপস্থিত হইবে। হুদ্দা-শ্যামপুরেও নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হইয়াছে, কিন্তু এখনও কেহ উপস্থিত হয় নাই।

সন্ধ্যার ঠিক পূর্বে নায়েব আসিয়া বলিল, কই, গিন্নীমায়ের বজরা তো এসে পৌঁছল না!

রায়-কর্তা একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, সময় এখনও যায় নি। কিন্তু হুদ্দা-শ্যামপুরের—

কথা শেষ না করিয়াই তিনি নীরব হইলেন।

নায়েব বলিল—কই, এখনও তো কেউ আসে নি।

এ কথার কোনও জবাব না দিয়া কর্তা বলিলেন, জলসাঘরে বাতি দিতে বল, আসর বসবে।

নায়েব বলিল, যে আজ্ঞে।—তারপর আবার বলিল, গিন্নীমায়ের বজরা দেখবার ছিপ দুখানা—আজকাল ভরা নদী—

সচকিত হইয়া কর্তা বলিলেন, দাও, পাঠিয়ে দাও।

জলসাঘরে মজলিস চলিতেছিল। প্রকাণ্ড বড় একখানি হল-ঘর ; এক শত লোকের স্বচ্ছন্দে স্থান সংস্থান হইতে পারে ; এক দিকে বড় বড় জানালা ও বারান্দার দিকে বড় বড় দরজা। সেই ঘরের মেঝে জুড়িয়া বহুমূল্য গালিচা পাতিয়া তাহার উপর আসর বসিয়াছে। দেওয়াল ঘেঁষিয়া বড় বড় তাকিয়া দেওয়া আছে। মাথার উপরে সারি সারি বেলোয়ারী ঝাড় ও দেওয়ালে দেওয়ালগিরির বাতির আলোয় সমস্ত ঘরখানা ঝলমল করিতেছিল। দেওয়ালের গায়ে রায়বংশের পূর্বপুরুষগণের ছবি টাঙানো হইয়াছে। সকলেরই বিলাসবেশের ছবি। আতর-গোলাপজলের গন্ধে ঘর আমোদিত। বারান্দার উপর দরজার মুখে মুখে দাঁড়াইয়া চাকরেরা বড় বড় তালপাখার মৃদু আন্দোলনে ঘরে বায়ুপ্রবাহ সঞ্চারিত করিতেছিল। শ্রোতার দল নিস্তব্ধ, বাহিরে পরিচারকের দল সন্তর্পিত পদক্ষেপে মূকের মত চলাফেরা করিতেছে। একজন সেতারী সেতার লইয়া সুরের জাল বুনিতেছেন। তবলচী তবলায় সঙ্গত করিয়া চলিয়াছেন। যন্ত্র-ঝঙ্কারে বাতাসে যেন মৃদু তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে—ঝাড়ের বাতির শিখা মৃদু মৃদু কম্পিত, ঘরের সমস্ত ধাতব পাত্রের মধ্যে সে ঝঙ্কারের রেশ সঞ্চারিত— করস্পর্শে বেশ অনুভব করা যায়। সঙ্গীতে যেন ঘরখানা ভরিয়া উঠিয়াছে।

অকস্মাৎ জলসাঘরের বারান্দায় আর্তনাদ করিয়া কে আছাড় খাইয়া পড়িল! সে আর্তনাদ যত মর্মভেদী, সে কণ্ঠস্বরও তেমনই ভয়াবহ কর্কশ। মুহূর্তে রাক্ষসের মত সে আর্তনাদ পুঞ্জীভূত সঙ্গীত-ঝঙ্কারকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ঘরসুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিল, অতর্কিতে চকিত যন্ত্রীর যন্ত্রের তার ছিঁড়িয়া গেল।

বীজনগর হইতে আসিবার পথে আকস্মিক একটা ঝড়ের তাড়নায় ময়ূরাক্ষী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে ঘূর্ণিতে পড়িয়া বজরা ডুবি হইয়াছে। রায়-গিন্নী, বিশ্বেশ্বর —কেহ ফিরেন নাই। ফিরিয়াছে একা কালী বাগদী। বারান্দার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল কর্দমলিপ্ত দীর্ঘাকৃতি প্রেতমূর্তির মত কালী।

রায় গভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, তারা—তারা—

তারপর অন্ধকার স্তব্ধ রায়বাড়ি। গভীর রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে কালী-মন্দিরের প্রাঙ্গণে রব উঠিতেছিল, তারা—তারা—

নাটমন্দিরে পদচারণা করিতে করিতে রাবণেশ্বর সহসা স্তব্ধ অন্ধকার পুরীর দিকে চাহিয়া ভাবিলেন, জলসাঘর—আর ও-ঘরে আলো জ্বলবে না। প্রথম দিনেই নিবে গেল। রায়-বংশ আজ নির্বংশ। জলসাঘর নয়, রায়বংশের সমাধি-গৃহ।

কোনোমতে পুণ্যাহ সমাপ্ত হইল। পুণ্যাহের পরদিন রায়-কর্তা নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন, শ্রাদ্ধের ফর্দ কর। পুরনো ফর্দে হবে না, নতুন ফর্দ কর। রায়বাড়িতে এত বড় শ্রাদ্ধ যেন আর কেউ না করে থাকে। দশ দিনের মধ্যেই আমি কাজ শেষ করব।

রায়-কর্তা নিজে অন্দরের মধ্যে বসিয়া মুসাবিদা আরম্ভ করিলেন—দানপত্রের। সমস্ত সম্পত্তি দেবত্রে অর্পণ করিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িবেন। এ অন্ধকার পুরীতে আর নয়। মা-আনন্দময়ীর প্রজা তিনি, নিরানন্দ রাজ্যে থাকিতে পারিবেন না। বার বার ব্রজরানীর প্রতিকৃতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে মনে বলিলেন, তুমি জানতে পেরেছিলে, ঐশ্বর্য তোমায় মত্ত করতে পারে নি। তারা—তারা—

ধন এবং জনের অভাব রায়বাড়ির ছিল না, কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রাদ্ধের উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল। সময় সংক্ষেপের জন্য সমস্ত ফর্দ শ্রীরামপুর হইতে ছাপা হইয়া আসিল।

দেশ-দেশান্তর হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবে রায়বাড়ি শোকের সমারোহে মুখর হইয়া উঠিল। হাজারে হাজারে সমাগত কাঙালীতে রাজারামপুর ভরিয়া গেল। মহলে মহলে নিমন্ত্রণ গিয়াছিল; মাতব্বর মণ্ডল-প্রজাও সকলে আসিয়াছিল। পুণ্যাহে না আসিলেও হুদা-শ্যামপুরের প্রজারা এবার না আসিয়া পারিল না।

রায় বলিলেন, এসেছ তোমরা, ভালোই হয়েছে। গিন্নীর একটা অনুরোধ ছিল তোমাদের কাছে, আমিই সেটা জানাই। তোমরা দুঃখ পেয়েছ, তোমাদের সে দুঃখে তিনি কাতর হয়েছিলেন। তোমাদের যার যা ক্ষতি হয়েছে, সেটা তোমরা গ্রহণ কর।

প্রজারা এবার সত্যই রাজার পায়ে গড়াইয়া পড়িল।

রায়-কর্তা অবিচলিত অশ্রুহীন চক্ষে পত্নী-পুত্রের শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ করিলেন। একে একে সমাগত ব্যক্তিরা বিদায় লইলেন। হরিনারায়ণও আসিয়াছিলেন, তিনি অপরাধীর মত বলিলেন, আমার অপরাধ আমি ভুলতে পারছি না রায় মশায়। আমিই নিমিত্ত হলাম।

রায় হাসিয়া বলিলেন, নিমিত্ত মানে হল কারণ। আনন্দময়ীর প্রসাদী কারণ একটু খাবে হরিনারায়ণ, তাহলে বুঝবে, কারণের মালিক কে?

হরিনারায়ণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাবা-মা একটা কথা আপনাকে জানিয়েছেন।

—বল।

ইতস্তত করিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন, বলেছেন—ব্রজরানীর অভাবে এতবড় রায়বংশ যেন ভেসে না যায়।

—তারা—তারা!

কর্তা ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিলেন, রায়বংশ-শেষের কথা এই মুহূর্তে হরিনারায়ণ তাঁহার প্রত্যক্ষ চিন্তার মধ্যে আনিয়া দিয়াছেন। বহুক্ষণ পরে হরিনারায়ণ আবার বলিলেন, আমার কথা এখনও শেষ হয় নি রায় মশায়।

রায় বলিলেন, বল তুমি হরিনারায়ণ। মাকে ডাকার তো সময়-অসময় নেই, ডাকলাম একবার এমনই। বল, কি বলবে বল?

—বাবা-মার অনুরোধ, আমারও প্রার্থনা আপনার কাছে—নন্দরানীকে আপনি—

—অর্থাৎ আমার শালা-ডাক তোমার বড়ই মিষ্টি লাগে, কেমন?—বলিয়া তিনি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। নন্দরানী হরিনারায়ণের সর্বকনিষ্ঠা বিবাহযোগ্যা ভগ্নী। হরিনারায়ণ কিন্তু এ হাসিতে মাথা নত করিয়া রহিলেন, আর তিনি অনুরোধ করিতে পারিলেন না। সর্বশেষ বিদায় লইলেন তিনি।

রায় এবার নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন, সমস্ত এবার চুকিয়ে দাও, আর বাকি কি?

—আজ্ঞে, হিসেবনিকেশ হতে এখনও কিছুদিন লাগবে। তা ছাড়া, ভাণ্ডারই এখনও ভাঙা হয় নি। সব জিনিসই দেখছি অনেক উদ্বৃত্ত হয়েছে—কোনো জিনিস ছ-আনা, কোনো জিনিস সিকি—

বাধা দিয়া বিরক্তিভরে রায় বলিলেন, থাক, ভাণ্ডার যেমন আছে তেমনই থাক। তুমি এই কাগজগুলো একবার দেখে দলিলে চড়িয়ে নিয়ে এস।—এক গোছা কাগজ তিনি নায়েবের হাতে তুলিয়া দিলেন। কাগজ-গোছার একখানার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া নায়েব সকাতরে প্রভুর দিকে চাহিল। রায় সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া অদূরবর্তী ভরা গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

চার-পাঁচদিনের মধ্যেই দলিল-দস্তাবেজ প্রস্তুত হইয়া গেল। রায় সেদিন ভাবিতে-ছিলেন, এগুলি সদরে লইয়া গিয়া পাকা করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু দারুণ বর্ষা নামিয়াছে, বর্ষণের আর বিরাম নাই, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। এই দুর্যোগের মধ্যে—

সহসা তাঁহার হাসি আসিল, দুর্যোগ! এখনও দুর্যোগের ভয়!

আবার মনে হইল, আর পাকা করিবারই বা প্রয়োজন কি? যে বস্তু ত্যাগই

করিবেন, তাহার জন্য আবার মায়া কেন? বন্দোবস্ত করিয়া ত্যাগের কি কোনও অর্থ আছে? খোলা সিন্দুকের সম্মুখেই দলিলগুলি পড়িয়া রহিল, সিন্দুকের চাবি পড়িয়া রহিল শয্যার উপর। রায় গঙ্গার দিকের জানালা খুলিয়া দাঁড়াইলেন। বৃষ্টির ছাটে ও বাতাসে ঘরখানা বিপর্যস্ত হইয়া গেল, তাঁহারও সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। তাঁহার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ ছিল না, সবিস্ময়ে তিনি গঙ্গার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দুই কূল ভাসিয়া গঙ্গা পাথার হইয়া উঠিয়াছে। আর কি গর্জন! কিন্তু এত ফেনা কেন? রাশি রাশি পদ্মপুষ্পের মত ফেনা ভাসিয়া চলিয়াছে। বহুকাল গঙ্গাব এমন ভৈরবী মূর্তি তিনি দেখেন নাই। থাকিতে থাকিতে সব চিন্তা ডুবাইয়া দিয়া ওই গঙ্গার সলিলরাশির মধ্য হইতে ব্রজরানী ও বিশ্বেশ্বরের মুখ ভাসিয়া উঠিল। গঙ্গার রাক্ষসী-রূপ দেখিয়া তাহাদের কথাই মনে জাগিয়া উঠিল।

—হুজুর!

ব্যস্তসমস্ত হইয়া নায়েব আসিয়া বহির্দ্বার হইতে ডাকিল, কিন্তু সে ডাক রায়-কর্তার কানে পৌঁছিল না। সাহস করিয়া নায়েব ঘরে প্রবেশ করিল।

—সর্বনাশ হয়েছে হুজুর, ওপরে দীঘলমারীর বাঁধ ভেঙেছে। বানের জল ছুটে আসছে তালগাছের মত উঁচু হয়ে।

রায়ের কানে গেল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, ওই যে গঙ্গার কল-কল্লোল, ও কি তাঁহার ব্রজরানীর ডাক? ব্রজরানী এত মুখরা হইল কি করিয়া?

নায়েব আর একবার ডাকিল, কিন্তু কোনও সাড়া না পাইয়া অগত্যা চলিয়া গেল।

কতক্ষণ পর রায় হঠাৎ ডাকিলেন, কে রয়েছিস?

একজন খানসামা আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন, কেলে বাগদীকে পাঠিয়ে দে। সে চলিয়া গেল, রায় তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালীচরণ আসিয়া নতমুখে জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

রায় বলিলেন, সন্ধ্যের সময় কালীবাড়ির ঘাটে একখানা ডিঙি নিয়ে তৈরি থাকবি। সঙ্গে কাউকে দরকার নেই। আমি ধরব বোটে।

নিঃশব্দে কালীচরণ চলিয়া গেল। ভৃত্যটা এবার সাহস করিয়া বলিল, হুজুর, সর্বাঙ্গ যে ভিজে গেল!

পরম প্রসন্নকণ্ঠে রায় বলিলেন, হ্যাঁ রে, নিয়ে আয়, আমার কাপড় নিয়ে আয়, স্নান সেরে মন্দিরে যাব। তারা—তারা! ও কি! গোলমাল কিসের রে নীচে?

—আজ্ঞে, গাঁয়ে বান ঢুকেছে, তাই লোকে চিৎকার করছে।

রায় দ্রুতপথে নীচে নামিয়া গেলেন। কালীবাড়ি-গোবিন্দবাড়ির সম্মুখ তখন দরিদ্র নরনারীতে ভরিয়া উঠিয়াছে—সামান্য সম্বল পোঁটলায় বাঁধিয়া, মাথায় করিয়া, শিশু-নারীর হাত ধরিয়া রায়বাড়ির সম্মুখে সকলে দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষুধাতুর শিশু-বালকের চিৎকারে চারিদিক যেন ফাটিয়া পড়িতেছে।

রায় প্রথমেই বলিলেন, ফটক খুলে দাও, ফটক খুলে দাও।

নায়েব বলিল, সর্বনাশ হয়ে গেল—ওপরে দীঘলমারীর বাঁধ ভেঙেছে।

রায় শিহরিয়া উঠিলেন, সর্বনাশ—তাহলে গ্রাম যে ডুবে যাবে! মুহূর্ত চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, এখুনি তুমি বেরিয়ে পড়। গ্রামের সমস্ত ভদ্র পরিবারকে জোড় হাত করে আহ্বান জানিয়ে এখানে নিয়ে এস। অন্দর সদর সমস্ত মহল খুলে দাও।

ওদিকে ক্ষুধার্তের দল চিৎকার করিতেছিল, রাজাবাবু, খেতে দাও। হুজুর, রক্ষে কর।

রায় নায়েবের দিকে চাহিলেন। নায়েব বলিল, কোনও ভাবনা নেই গিন্নী-মায়ের শ্রাদ্ধের ভাণ্ডার এখনও পরিপূর্ণ।

রায় ঊর্ধ্বমুখে ব্রজরানীকেই স্মরণ করিলেন। এ কি, কে—কে?

নায়েব ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—উঠুন, উঠুন গাঙুলী মশায়! কি, হল কি?

বৃদ্ধ নবীন গাঙুলী আসিয়া রায়-কর্তার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে।

রায় তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া প্রতি-প্রণাম করিয়া কহিলেন, বলুন, আমাকে কি করতে হবে?

গাঙুলী বলিল, রক্ষে করুন রায় মশায়, আমার মান-ইজ্জত সব গেল আমার কন্যার আজ বিবাহ। পাত্রপক্ষ এসে গেছে। কিন্তু হঠাৎ বন্যাতে আমার সব পণ্ড হল। তৈরী রান্নার ওপর রান্নাঘর ভেঙে পড়েছে।

রায় নিজেই অগ্রসর হইয়া বলিলেন, আপনার নয়, আমার কন্যার বিবাহ ভয় কি! আসুন, বিবাহ হবে রায়বাড়িতে। চলুন, আমি পাত্র নিয়ে আসি।

নায়েব হাঁক দিয়া কহিল, ছাতা—ছাতা—

সমস্ত রায়বাড়ির সদর-অন্দর গ্রামের লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। চিৎকারে কলরবে গঙ্গার গর্জনও ঢাকা পড়িয়াছে। বন্ধ আছে শুধু রায়-কর্তার শয়ন-কক্ষ লক্ষ্মীর ঘর ও জলসাঘর।

রায়-কর্তা ঘরের মধ্যে পদচারণা করিতেছিলেন, আর মুহুর্মুহু বাহিরের দিকে চাহিতেছিলেন। প্রগাঢ় অন্ধকারের প্রতীক্ষায় তিনি আছেন।

নায়েব আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, বিবাহের আসর কোথায় হবে? নাটমন্দির সব ভরে গেছে। হুকুম হলে জলসাঘরে—

কথা সে সমাপ্ত করিতে পারিল না। রায়ের কানে কিন্তু কোনো কথাই প্রবেশ করিল না, তিনি অন্যমনস্কভাবেই বলিলেন, হুঁ।

নায়েব চলিয়া গেল। আরও কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া রায় ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলেন। পরিধানে একমাত্র বস্ত্র, নগ্ন পদ, কপর্দক পর্যন্ত সম্বল নাই; হাতে শুধু একটি লাঠি লইয়া রায় অন্দরের খিড়কির পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

গভীর অন্ধকার, ভীষণ দুর্যোগ।

রায় ঘাটে আসিয়া ডাকিলেন, কেলে!

অন্ধকারে গাঢ়তর অন্ধকারের মত কালীচরণ নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল। রায় একবার রায়বাড়ির দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

এ কি, জলসাঘর আলোয় আলোময় হইয়া উঠিয়াছে যে! উন্মুক্ত সুবৃহৎ জানালার মধ্য দিয়া রায় দেখিলেন, জলসাঘরে বিবাহের মণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছে। এক দিকে দাঁড়াইয়া বর, কন্যা তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে। ঘন ঘন হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে জলসাঘর উৎসবময়ী হইয়া উঠিয়াছে। রায় দেখিলেন, বাতিদানের বাতিগুলি সমস্তই ছোট ছোট, প্রায় অর্ধেক। ওঃ, সেদিনের নির্বাপিত অর্ধদগ্ধ বাতিগুলি আবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে!

রায় স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছিলেন, এ কি, পনেরো দিন পূর্বে নির্বংশ রায়বাড়িতে, আজ এই ঘনায়মান দুর্যোগের মধ্যে—পৃথিবী যখন আর্ত চিৎকারে ভরিয়া উঠিয়াছে, তখন কেমন করিয়া সেখানে বিবাহের বাসর সাজিয়া উঠিল? অকালে নির্বাপিত দীপমালা, এই দুর্যোগের অন্ধকারে এই পরম মুহূর্তটিতে কে জ্বালাইয়া দিল? তাঁহার চোখে জল আসিল, সজল চক্ষে সেই অন্ধকারের মধ্যে মৃদু বর্ষণ মাথায় করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। পাশে নির্বাক কালীচরণ।

এ দিকে নাটমন্দিরে আহার-তৃপ্ত ক্ষুধার্তেরা ঘন ঘন জয়ধ্বনি তুলিতেছিল—অক্ষয় হোক রায়-হুজুরের রাজত্বি, অক্ষয় হোক; আমরা সুখে বেঁচে থাকি।—রায় আবার জলসাঘরের দিকে চাহিলেন। দেওয়ালে বিলম্বিত তাঁহার পূর্বপুরুষগণের প্রতিকৃতিগুলি সজল বাতাসে মৃদু মৃদু দুলিতেছিল। এ কি, ভুবনেশ্বর রায়,

ত্রিপুরেশ্বর রায় কি তাঁহাকে ডাকিতেছেন? তিনি গভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, তারা—তারা—আনন্দময়ী—তারা—

সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে তিনি বলিলেন, ফিরে আয় কেলে।

কালীচরণ নিঃশব্দ দ্রুত পদক্ষেপে উপরে উঠিয়া কালীবাড়ির রুদ্ধ দ্বারে প্রচণ্ড করাঘাত করিল।

জলসাঘর

ভোর তিনটার সময় নিয়মিত শয্যাত্যাগ করিয়া বিশ্বম্ভর রায় ছাদে পায়চারি করিতেছিলেন। পুরাতন খানসামা অনন্ত গালিচার আসন ও তাকিয়া পাতিয়া, ফরসি ও তামাক আনিবার জন্য নীচে চলিয়া গেল। বিশ্বম্ভর চাহিয়া একবার দেখিলেন, কিন্তু বসিলেন না। নতশিরে যেমন পদচারণা করিতেছিলেন, তেমনই করিতে থাকিলেন। অদূরে রায়বাড়ির কালী-মন্দিরের তলদেশে শুভ্র স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা ক্ষীণধারায় বহিয়া চলিয়াছে।

আকাশের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শুকতারা ধকধক করিয়া জ্বলিতেছিল। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ওই তারাটির সহিত যেন দীপ্তির প্রতিযোগিতা করিয়াই এ অঞ্চলের হালে-বড়লোক গাঙ্গুলীবাবুদের প্রাসাদশিখরে বহুশক্তিবিশিষ্ট একটি বিজলী-বাতি অকম্পিতভাবে জ্বলিতেছিল। ঢং-ঢং-ঢং করিয়া গাঙ্গুলীবাবুদের ছাদে তিনটার ঘড়ি এতক্ষণে পেটা হইল। পূর্বে দুই শত বৎসর ধরিয়া এ অঞ্চলে ঘড়ি বাজিত রায়বাবুদের বাড়িতে, এখন আর বাজে না। এখন বিশ্বম্ভরবাবুর ঘুম ভাঙে অভ্যাসের বশে, আর পারাবতের গুঞ্জনে। শুকতারা আকাশে দেখা দিলেই উহাদের কলরব শুরু হয়। ভোরের বাতাসের সঙ্গে একটি অতি মিষ্ট গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। বসন্ত সমারোহ করিয়া রায়বাড়িতে আর আসে না। তাহার পাদ্য-অর্ঘ্য দিবার মত শক্তিও রায়বংশের নাই। মালীর অভাবে ফুলের বাগান শুকাইয়া গিয়াছে। আছে মাত্র কয়টা বড় গাছ—মুচুকুন্দ, বকুল, নাগেশ্বর, চাঁপা। সেগুলিও এই বংশেরই মত শাখাপ্রশাখাহীন, এই প্রকাণ্ড ফাটল-ধরা প্রাসাদখানার মতই জীর্ণ। সত্য সত্যই কয়টা গাছের কাণ্ডের মধ্যে গহ্বরও দেখা দিয়াছে। সেই জীর্ণ শাখার প্রান্তে বসন্ত দেখা দেয়, না, গাছগুলিই বসন্তকে ধরিবার চেষ্টা করে, কে জানে!

আস্তাবল হইতে একটা ঘোড়া ডাকিয়া উঠিল।

ফরসির মাথায় কলিকা বসাইয়া নলটি হাতে ধরিয়া অনন্ত খানসামা ডাকিল, হুজুর!

বিশ্বম্ভরবাবুর চমক ভাঙিল, বলিলেন, হুঁ।

ধীরে ধীরে গালিচায় বসিতেই অনন্ত নলটি তাঁহার হাতে আগাইয়া দিল। নীচে ঘোড়াটা আবার ডাকিয়া উঠিল।

নলে দুই-একটা মৃদু টান দিয়া বিশ্বম্ভরবাবু বলিলেন, মুচকুন্দ ফুল ফুটতে আরম্ভ হয়েছে, শরবতের সঙ্গে দিবি আজ থেকে।

মাথা চুলকাইয়া অনন্ত বলিল, আজ্ঞে পাকে নি এখনও পাপড়িগুলো।

এদিকে আস্তাবলে ঘোড়াটা অসহিষ্ণুভাবে ডাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রায় ঈষৎ বিরক্তিভরেই বলিলেন, নিতে বেটার কি বুড়ো বয়সে ঘুম বাড়ছে নাকি? যা দেখি, নিতেকে ডেকে দে। তুফান ছটফট করছে, ডাকছে, শুনছিস না?

তুফান ওই ঘোড়াটার নাম। রায়বাড়ির নয়টি আস্তাবলের মধ্যে এই একটা ঘোড়া অবশিষ্ট আছে। বৃদ্ধ তুফান পঁচিশ বৎসর পূর্বের অসমসাহসী জোয়ান বিশ্বম্ভর রায়ের দুর্দান্ত বাহন। সেকালে—সেকালে কেন, দুই বৎসর পূর্বেও দেশ-দেশান্তরের পথচারী বাদশাহী-সড়কের উপর প্রকাণ্ড সাদা ঘোড়ার পিঠে মাথায় পাগড়ি-বাঁধা গৌরবর্ণ বীরবপু আরোহীকে দেখিয়া এ দেশের লোককে জিজ্ঞাসা করিত, কে হে উনি?

লোকে বলিত, আমাদের রাজা উনি—বিশ্বম্ভর রায়। বড়দরের শিকারী, বাঘ মারা ওঁর খেলা।

অপরিচিত পথিক সসম্ভ্রমে চোখ তুলিয়া দেখিত, সাদা ঘোড়া তাহার আরোহীকে লইয়া দূরান্তরে মিলাইয়া গিয়াছে। দূরে উড়িতেছে শুধু ধুলার একটা কুণ্ডলী, একটা প্রক্ষিপ্ত ঘূর্ণি যেন পাক দিতে দিতে দিগন্তে মিশিবার জন্য ছুটিয়াছে।

নিত্যনিয়মিত দুর্দান্ত তুফান বিশ্বম্ভর রায়কে লইয়া ভোরে বাহির হইত। দুই বৎসর পূর্বে যেদিন মহাজন গাঙুলীরা সমারোহ করিয়া গ্রামে গ্রামে ঢোল-শোহরত দ্বারা দখল-ঘোষণা করিল, সেই দিন হইতে দেখা গেল—তুফানের পিঠ সওয়ার-শূন্য, নিতাই সহিস মুখের লাগাম ধরিয়া তুফানকে টহল দিয়া ঘুরাইয়া আনিতেছে।

নায়েব তারাপ্রসন্ন একদিন বলিয়াছিল, আপনার এতদিনের অভ্যেস ছাড়লে শরীর—

বিশ্বম্ভরের দৃষ্টি দেখিয়া তারাপ্রসন্ন কথা শেষ করিতে পারে নাই।

রায় উত্তর দিয়াছিলেন দুটি কথায়, ছি তারাপ্রসন্ন!

অনন্ত নীচে যাইতেছিল। বিশ্বম্ভর আবার ডাকিলেন, শোন।

অনন্ত ফিরিল।

রায় বলিলেন, নিতাই কাল বলছিল, তুফান দানা নাকি পুরো পাচ্ছে না!

অনন্ত বলিল, ছোলা এবার ভালো হয় নি, তাই নায়েববাবু বললেন—

—হুঁ।

আবার ফরসিতে গোটাকয় টান মারিয়া বলিলেন, তুফান কি খুব রোগা হয়ে গেছে?

অনন্ত মৃদুস্বরে বলিল, না। তেমন কই—

—হুঁ।

কিছুক্ষণ পর আবার বলিলেন, দানা পুরোই দিবি, বুঝলি? নায়েবকে আমার নাম করে বলবি। যা তুই নিতাইকে ডেকে দে।

অনন্ত চলিয়া গেল। তাকিয়ার উপর ঠেস দিয়া ঊর্ধ্বমুখে বিশ্বম্ভরবাবু আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নলটা পাশে পড়িয়া আছে। আকাশের তারাগুলি একের পর এক নিবিয়া আসিতেছিল। বিশ্বম্ভর অন্যমনস্কভাবে বোধ করি আপনার প্রশস্ত বুকে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিলেন—এক—দুই। প্রথম দিন তুফানের পিঠে সওয়ার হইতে গেলে এই পাঁজরখানাতেই ধাক্কা লাগিয়াছিল। সেদিনের সে কি রূপ তুফানের! সে কি দুর্দান্তপনা! শান্ত হইত সে শুধু বাজনার শব্দে। বাজনা বাজিলে সে কখনও বেতালা পা ফেলে নাই। ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া সে কি নৃত্য তাহার!

বিশ্বম্ভরবাবু উঠিয়া পড়িলেন। অতীতের স্মৃতি তারকারাজির মত বুকের আকাশে রায়বংশের মর্যাদার ভাস্কর-প্রভায় ঢাকা পড়িয়া থাকে। আজ মমতার ছায়ায় সে ভাস্করে অকস্মাৎ সর্বগ্রাসী গ্রহণ লাগিয়া গেল। স্মৃতির উজ্জ্বলতম তারকা—তুফান, সেই আকাশে সর্বাগ্রে জ্বলজ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিল। আজ দুই বৎসর তিনি নীচে নামেন নাই। দুই বৎসর পরে তুফানকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। খড়ম জোড়াটা পায়ে দিয়া রায় দোতলায় নামিলেন। চক-মিলানো বাড়ির সুপরিসর সুদীর্ঘ বারান্দা রায়ের বলিষ্ঠ পদের খড়মের শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। বারান্দায় সারি সারি থামের মাথায় খড়খড়ি হইতে সচকিত কতকগুলা চামচিকা ফরফর করিয়া উড়িয়া গেল। এ পাশে অন্ধকার তালাবন্ধ ঘরগুলার ভিতরেও চামচিকার শব্দ পাওয়া যাইতেছিল। ছাদের সিঁড়ির পাশেই

বিছানাঘর। তুলার টুকরা বারান্দায় পড়িয়া আছে। তাহার পরই একটা দুর্গন্ধ। এটা ফরাশঘর। জাজিম, শতরঞ্জি, গালিচা থাকে ঘরটায়। বোধ হয় কিছু পচিয়া থাকিবে। পরের ঘরটায় চামচিকার পক্ষতাড়নের সঙ্গে ঝুনঝুন শব্দ উঠিতেছে। বাতিঘর এটা। বেলোয়ারী ঝাড়ের কলমগুলি বোধ হয় দুলিতেছে। ইহার পরই এ পাশের কোণের ঘরটা ছিল ফরাশ-বরদারের। এই সমস্ত জিনিসের ভার ছিল তাহার উপর। ঘরখানা শূন্য পড়িয়া আছে।

পূর্বমুখে রায় মোড় ফিরিলেন। পত্তনিদার মহল এটা। রায়দের দপ্তরে বিভিন্ন জেলার বড় বড় ধনী পত্তনিদার ছিল। পাঁচ শত হইতে পাঁচ হাজার টাকা খাজনা রাখিত, এমন পত্তনিদারের অভাব ছিল না। তাঁহারা আসিলে এইখানে তাঁহাদের বাসস্থান দেওয়া হইত। বারান্দার দেওয়ালে বড় বড় ছবি টাঙানো রহিয়াছে। মুখ তুলিয়া রায় একবার চাহিলেন। প্রথমখানির ছবি নাই, কাচ নাই, শুধু ফ্রেমখানা ঝুলিতেছে। দ্বিতীয়খানার কাচ নাই। তৃতীয়খানার ছবির স্থান শূন্য। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রায় আবার নতমুখে চলিলেন। উপরে কড়ির মাথায় পায়রাগুলি অবিরাম গুঞ্জন করিতেছে। পূর্বমুখে বারান্দার প্রান্তেই সিঁড়ি। সিঁড়ি বাহিয়া রায় নীচে আসিয়া নামিলেন। সেরেস্তাখানার সারি সারি ঘরে রায়বংশের রাশি রাশি কাগজ বোঝাই হইয়া আছে।

সাত রায়ের ইতিহাস। বিশ্বম্ভর রায় জমিদার রায়বংশের সপ্তম পুরুষ। অন্ধকারের মধ্যে রায় ঈষৎ হাসিলেন। তাঁহার মনে পড়িল রায়বংশের আদিপুরুষের কথা। তিনি নাকি বলিতেন, মা-লক্ষ্মীকে বাঁধতে হলে মা-সরস্বতীর দয়া চাই। কাগজের ওপর কালির গুটির শেকল—ও বড় কঠিন শেকল। হিসেবনিকেশের শেকল ঠিক রেখ—চঞ্চলার আর নড়বার ক্ষমতা থাকবে না। তিনি ছিলেন নবাব-দরবারের কানুনগো।

কাগজ, কলম, কালি—সবই ছিল, কিন্তু মা-লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছেন।

বারান্দার শেষপ্রান্তে একটা কুকুর কোথায় অন্ধকারে শুইয়া ছিল, সেটা ঘেউ ঘেউ শব্দে চিৎকার করিয়া উঠিল। রায় গ্রাহ্য করিলেন না, অগ্রসর হইয়া চলিলেন। কুকুরটার ঘেউ ঘেউ থামিয়া গেল। সে লেজ নাড়িয়া বার বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া রায়কে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাঁহার সহিত চলিতে আরম্ভ করিল। কুকুরটা শখ করিয়া কেহ পোষে নাই। রায়বাড়ির উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরের সন্ততি কেহ।

কাছারির দেউড়ি পার হইয়া দক্ষিণে গোশালা, বামে আস্তাবল।

তাহার ওদিকে দেবতাদের মন্দির।

রায় ডাকিলেন, নিতাই !

সসম্ভ্রম কণ্ঠের জবাব আসিল, হুজুর !

তুফানের উচ্চ হ্রেষারবে সে জবাব ঢাকা পড়িয়া গেল। ওদিক হইতে একটা হাতীর গর্জন শোনা গেল।

রায় অগ্রসর হইয়া তুফানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। অস্থিরভাবে পা ঠুকিয়া ডাক দিয়া বৃদ্ধ তুফান শিশুর মত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার মুখে হাত বুলাইয়া রায় বলিলেন, বেটা !

তুফান মাথাটা মনিবের হাতে ঘষিতে লাগিল। ওদিকে হাতীটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমাগত ডাকিয়া ডাকিয়া সে পায়ের শিকল ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। মাহুত রহমৎ প্রভুর সাড়া পাইয়া উঠিয়া আসিয়া আপনার হাতীর নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। সে অতি মৃদু অনুযোগের স্বরে বলিল, হুজুর, ছোটগিন্নী শিকলি ছিঁড়ে ফেলবে।

হস্তিনীটির নাম ছোটগিন্নী। বিশ্বম্ভরবাবুর মায়ের বিবাহের যৌতুক এই ছোটগিন্নী। তখন নাম ছিল মতি। কিন্তু কর্তা ধনেশ্বর রায় শিকার করিয়া ফিরিয়া মতি বলিতে পাগল হইয়া উঠিলেন। মতি একটা চিতাবাঘকে শুঁড়ে ধরিয়া পদদলিত করিয়াছিল। মতির প্রতি যত্নের আধিক্য দেখিয়া বিশ্বম্ভরের মা তাহার নাম দিয়াছিলেন, সতীন। কর্তা বলিয়াছিলেন, সেই ভালো রায়-গিন্নী, ওর নামও থাকুক—গিন্নী।

বিশ্বম্ভরবাবুর মা বলিয়াছিলেন, শুধু গিন্নী নয়—ছোটগিন্নী, ও তোমার দ্বিতীয় পক্ষ।

রহমতের কথায় বিশ্বম্ভরবাবু তুফানকে ছাড়িয়া ছোটগিন্নীর সম্মুখে গেলেন। পিছনে তুফানের অসন্তুষ্ট হ্রেষারব ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রায় ছোটগিন্নীকে বলিলেন, কি গো মা-লক্ষ্মী ?—ছোটগিন্নী আপনার শুঁড়খানি বাঁকাইয়া রায়ের সম্মুখে ধরিল। এটুকু তাঁহাকে সওয়ার হইবার জন্য অনুরোধ ; রায় হাতীতে উঠিতেন শুঁড় বাহিয়া।

রায় তাহার শুঁড়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, এখন নয় মা।

ছোটগিন্নী কথা বুঝিল। সে শুঁড়খানি রায়ের কাঁধের উপর রাখিয়া লক্ষ্মী মেয়েটির মতই শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রায় কহিলেন—নিতাই, তুফানকে ঘুরিয়ে নিয়ে আয়।

একান্ত সঙ্কোচভরে নিতাই বলিল, তুফান আর যাবে না আজ হুজুর। আপনাকে দেখেছে, আপনি সওয়ার না হলে—

রায় এ কথার কোনও জবাব দিলেন না। ছোটগিন্নীর শুঁড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, লক্ষ্মী মেয়ে, মা আমার লক্ষ্মী মেয়ে!

অকস্মাৎ নিস্তব্ধ প্রত্যুষের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিচিত্র সঙ্গীতে কোথায় ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। সচকিত রায় ছোটগিন্নীর শুঁড়খানি নামাইয়া দিয়া সরিয়া আসিয়া বলিলেন, ব্যাণ্ড বাজে কোথায় রে?

নিতাই মৃদুস্বরে জবাব দিল, গাঙ্গুলীবাড়িতে বাবুর ছেলের ভাত।

অভ্যাসমত রায় বলিলেন, হুঁ।

তুফান তখন ঘাড় বাঁকাইয়া তালে তালে নাচিতে শুরু করিয়াছে। রায় মৃদু হাসিয়া তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। পিছনে ছোটগিন্নীর পায়ের শিকলও তালে তালে নূপুরের মত বাজিতেছিল, ঝুম—ঝুম—ঝুম।

রায় দেউড়ি পার হইয়া অন্ধকার পুরীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মনে পড়িল, এককালে ভোরের নহবতের সঙ্গে এমনই করিয়া নিত্য নাচিত—এক দিকে তুফান, অন্য দিকে ছোটগিন্নী।

দোতলায় উঠিয়া তিনি ডাকিলেন, অনন্ত!

—হুজুর।

—নায়েবকে ডেকে দে।

রায় ছাদে গিয়া বসিলেন। প্রৌঢ় নায়েব তারাপ্রসন্ন আসিয়া নীরবে সম্মুখে দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, মহিম গাঙ্গুলীর ছেলের অন্নপ্রাশন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—নিমন্ত্রণপত্র করেছে বোধ হয়?

কুণ্ঠিতভাবে তারাপ্রসন্ন বলিল, হ্যাঁ।

—একখানা গিনি আর থালা—একখানা কাঁসার থালাই পাঠিয়ে দেবে।

তারাপ্রসন্ন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতিবাদ করিবার সাহস তাহার ছিল না। কিন্তু ব্যবস্থাটাও বেশ মনঃপূত হয় নাই।

রায় বলিলেন, মোহর একখানা আমার কাছ থেকে নিয়ে যেয়ো।

নায়েব চলিয়া গেল। রায় নীরবে বসিয়া রহিলেন। অনন্ত আসিয়া কলিকা পাল্টাইয়া দিয়া নলটি ধরিয়া বলিল, হুজুর!

রায় অভ্যাসমত হাতটি বাড়াইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, ছোটগিন্নীর পিঠের গদি, জাজিম, ঘণ্টা বের করে দিবি। নায়েব যাবেন গাঙ্গুলীবাড়ি লৌকুতো দিতে।

তিন পুরুষ ধরিয়া রায়েরা করিয়াছিলেন সঞ্চয়। চতুর্থ পুরুষ করিয়াছিলেন রাজত্ব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষ করিলেন ভোগ ও ঋণ। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলেই রায়বাড়ির লক্ষ্মী সে ঋণসমুদ্রে তলাইয়া গেলেন। বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীহীন দেবরাজের মত শুধু বসিয়া বসিয়া দেখিলেন। শুধু এই মাত্রই নয়। রায়বংশ এই সপ্তম পুরুষে নির্বংশও হইয়া গেল। জেলার জজকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারের নির্দেশমত রায়বংশের লক্ষ্মী তখন ঝাঁপি হাতে দুয়ারে দাঁড়াইয়াছেন। অপেক্ষা মাত্র প্রিভি কাউন্সিলের আদেশের।

পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষ্যে বিপুল উৎসবে রায়বাড়ি মুখরিত হইয়া উঠিল ; দানভোজন বিলাসব্যসন চলিয়াছিল পূর্ণিমার জোয়ারের মত। তারপরই পড়িল ভাটা। ভাটার টানে রায়বংশের সমস্ত প্রবাহটুকু নিঃশেষ হইয়া গেল। সাত দিনের দিন বিলাস হইয়া উঠিল বিষ। বাড়িতে কলেরা দেখা দিল। তাহার পর সাত দিনের মধ্যে রায়গিন্নী, দুই পুত্র, এক কন্যা, কয়েকজন আত্মীয়—সব শেষ হইয়া গেল। শুধু বিশ্বম্ভর রায় বিন্ধ্যগিরির অগস্ত্য-প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষার মত নতশিরে মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ভুল বলা হইল। মৃত্যুর প্রতীক্ষা সেই দিন হইতে করিয়াছিলেন কি না কে জানে, কিন্তু নতশির সেদিনও তিনি হন নাই। নতশির হইলেন আরও দুই বৎসর পরে। প্রিভি কাউন্সিলের রায় যেদিন বাহির হইল, সেই দিন। নতুবা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মৃত্যুর পরও এ বাড়িতে জলসাঘরে বাতি জ্বলিয়াছে, সেতার সারেঙ্গ ঘুঙুর বাজিয়াছে। বিপুল হাস্যধ্বনিতে নিশীথরাত্রি চকিত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ছোটগিন্নীর পিঠে শিকারের হাওদা চড়িয়াছে। তুফান সেদিনও রোষে ক্ষোভে দড়াদড়ি ছিঁড়িয়াছে।

যাক, প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে রায়বংশের ভূসম্পত্তি সব চলিয়া গেল। রহিল বাড়িঘর ও লাখরাজের কায়েমী বন্দোবস্তটুকু। রায়বংশের আদিপুরুষ কাগজের উপর কালির শিকলে এইটুকু এমন করিয়া বাঁধিয়াছিলেন যে, সেইটুকুতে হাত দিবার ক্ষমতা কাহারও হইল না। ওই বন্দোবস্তেই দেবসেবা চলে, ছোটগিন্নীর বরাদ্দ চাল আসে, রহমতের বেতন হয়। মোট কথা, এখনও যেটুকু আছে, সে সেই বন্দোবস্তেরই কল্যাণে। এখন মাসের প্রথমেই চাল আসে—মাসবরাদ্দ বাদশাভোগ চাল, নিত্য প্রাতে লাখরাজ বিল বন্দোবস্তের দরুন আসে মাছ, ওই বিল হইতেই জলচর পাখীর বন্দোবস্তের ফলে আসে—পাখী। এ সমস্ত অতীত, কিন্তু স্মরণাতীত নয়। তাই এই জীর্ণ ফাটল-ধরা রায়বাড়ির নাম এখনও রাজবাড়ি, শ্রীভ্রষ্ট বিশ্বম্ভর রায়ের নামই এ অঞ্চলে রায়-হুজুর।

সেইটুকুই হইল নূতন ধনী গাঙুলীবাবুদের ক্ষোভের কারণ। তাঁহারা সোনার দেউল তুলিয়াছেন মরা-পাহাড়ের আড়ালে। পৃথিবী দেখে ওই মরা-পাহাড়কেই, সোনার দেউলের দিকে কেহ চায় না। তাঁহাদের দামী মোটরের চেয়ে বৃদ্ধা হস্তিনীর খাতির বেশী।

মহিম গাঙুলী ভাবে, মরা-পাহাড়ের চূড়ো ভাঙতেই হবে আমার।

ছোটগিন্নীর পিঠে ঘণ্টা উঠিতেই, সে গরবিনীর মত গা দোলাইতে আরম্ভ করিল। ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, ঢং—ঢং—ঢং—

নায়েব তারাপ্রসন্ন আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল। বিশ্বম্ভরবাবু বসিয়া ছিলেন অন্দরের হল-ঘরে। এখন এই একখানি ঘরই তিনি ব্যবহার করেন। দেওয়ালে রায়বংশের কর্তা-গিন্নীদের ছবি টাঙানো। সকলেরই প্রৌঢ় বয়সের প্রতিকৃতি। সকলেরই গায়ে কালী-নামাবলী, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে জপমালা। বিশ্বম্ভরবাবু সেই ছবির দিকে চাহিয়া ছিলেন। নায়েবকে দেখিয়া ধীরে ধীরে চোখ ফিরাইয়া ডাকিলেন, অনন্ত, হাত-বাক্সটা দে তো।

হাত-বাক্স হইতে লোহার সিন্দুকের চাবি লইয়া সিন্দুকটা খুলিয়া ফেলিলেন। সিন্দুকের উপরের থাকে রায়বাড়ির লক্ষ্মীর ঝাঁপি শোভা পাইতেছিল। নীচের থাকে দুই-তিনটি বাক্স। রায় টানিয়া বাহির করিলেন একটি অতি সুদৃশ্য বাক্স। এটি তাঁহার মৃতা পত্নীর গহনার বাক্স। রায় বাক্সটি খুলিলেন। বাক্সটির গর্ভ প্রায় শূন্য। অলঙ্কারের মধ্যে একটি সিঁথি রহিয়াছে। এই সিঁথিটি সাতপুরুষের বধূবরণের মাঙ্গলিক সামগ্রী। ওইটি ছাড়া সব গিয়াছে। পাশের একটি খোপে কয়খানি মোহর।

এগুলির কয়খানি রায়-গিন্নীর আশীর্বাদের মোহর, কয়খানা যুবক বিশ্বম্ভরের পত্নীকে প্রথম উপহার। বিবাহের বৎসরই প্রথম তিনি মহালে যান। নজরানার মোহর হইতে কয়খানা তিনি পত্নীকে উপহার দিয়াছিলেন। তাহারই একখানা লইয়া নায়েবের হাতে নিঃশব্দে তিনি তুলিয়া দিলেন। নায়েব চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরই ছোটগিন্নীর ঘণ্টার শব্দ সুউচ্চ হইয়া উঠিল। রায় আসিয়া জানালায় দাঁড়াইলেন।

ছোটগিন্নীর মাথায় তেল দেওয়া হইয়াছে—ললাটের তৈলসিক্ত অংশটুকু ঘিরিয়া সিন্দুরের রেখা আঁকা। ছোটগিন্নী হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে।

অপরাহ্ণে গাঙ্গুলীদের ঝকঝকে মোটরখানা আসিয়া লাগিল রায়বাড়ির ভাঙা দেউড়িতে। গাড়ি হইতে নামিলেন মহিম গাঙ্গুলী নিজে। নায়েব তারাপ্রসন্ন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, আসুন, আসুন।

অনন্তও দোতলা হইতে ঘটনাটা দেখিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া রায়বাড়ির খাস বৈঠকখানার দরজাটা খুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

মহিম কহিল, ঠাকুরদা কোথায়—দেখা করব যে!

গাঙ্গুলীবংশ চিরদিন রায়-দপ্তরের এলাকায় মহাজনি করিয়াছে। মহিমের পিতা জনার্দন পর্যন্ত রায়বাড়ির কর্তাকে বলিয়াছে—হুজুর। তারাপ্রসন্ন মহিমের কথার ভঙ্গিতে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মুখে মিষ্টভাবেই বলিল, হুজুর এখনও ওঠেন নি। খেয়ে শুয়েছেন।

মহিম বলিল, ডেকে তুলতে বলে দিন।

তারাপ্রসন্ন শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, সে সাহস আমাদের কারও নেই। আপনি বরং বলে যান আমাকে কি বলতে হবে, আমি বলব।

অসহিষ্ণুভাবে মহিম বলিল, না, আমাকে দেখা করতেই হবে।

অনন্ত আসিয়া রুপার গ্লাসে গাঙ্গুলীর সম্মুখে শরবত ধরিল।

গ্লাসটি লইয়া মহিম অনন্তকে প্রশ্ন করিল, ঠাকুরদা উঠেছেন রে?

—উঠেছেন। আপনার খবর দিয়েছি। ডাকছেন আপনাকে তিনি।

শরবত পান করিয়া মহিম উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাঃ, চমৎকার গন্ধটুকু তো! কিসের শরবত রে?

অনন্ত মিথ্যা কথা বলিল, আজ্ঞে, কাশীর মসলা, আমি জানি না ঠিক।

দোতলায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই মহিম বলিল, কই ঠাকুরদা, আপনি যে খেতে গেলেন না?

বিশ্বম্ভর হাসিয়া বলিলেন—এস এস, বস ভাই।

মহিম বলিল, আমার ভারি দুঃখ হয়েছে ঠাকুরদা।

তেমনই হাসিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন, বুড়ো ঠাকুরদাদা বলে ভুলে যাও ভাই। বুড়ো মানুষ, নিয়মের ব্যতিক্রম দেহে সহ্য হয় না।

মহিম বলিল, সে দুঃখ ভুলব, কিন্তু রাত্রে পায়ের ধুলো দিতেই হবে।

বিশ্বম্ভর ফরসি টানার ভানে নীরব রহিলেন।

মহিম বলিয়া গেল, শখ করে লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজী আনিয়েছি। তাদের গানের কদর আপনি ভিন্ন আমরা বুঝব না।

কিছুক্ষণ নীরবে তামাক টানিয়া নলটি রায় রাখিয়া দিলেন। তারপর

বলিলেন, শরীর আমার বড় খারাপ ভাই মহিম, বুকে একটা ব্যথা হয়েছে ইদানীং, সেটা মাঝে মাঝে বড় কাতর করে আমাকে।

মহিম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা, তাহলে উঠি ঠাকুরদা। আমায় যেতে হবে একবার সদরে। সাহেব-সুবোদের নিয়ে আসতে হবে আবার, তাঁরা সব আসবেন কিনা।

বিশ্বম্ভর শুধু বলিলেন, দুঃখ করো না ভাই।

মহিম ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বারান্দায় একবার দাঁড়াইয়া সহসা বলিয়া উঠিল, বাড়িটা করে রেখেছেন কি ঠাকুরদা, মেরামত করানো দরকার যে।

সে কথার কেহ জবাব দিল না।

অনন্ত শুধু বলিল, আসুন হুজুর।

গাঙুলীবাড়িতে নাচের আসর আলোর ঐশ্বর্যে ঝকমক করিতেছিল। চাঁদোয়ার চারিপাশে নানা রঙের আলো। গাঙুলীদের নিজেদের ডায়নামো। ইলেক্‌ট্রিক তারের লাইন বাড়াইয়া আলোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খুঁটিগুলি গাছের পাতা ও ফুল দিয়া সাজানো। রঙিন কাগজের মালা চারিপাশ বেড়িয়া ঝুলিতেছে। নীচে শতরঞ্জির উপর চাদর বিছাইয়া আসর পড়িয়াছে। এক দিকে সারি সারি চেয়ার, অন্য দিকে ঢালা বিছানায় সাধারণ শ্রোতাদের বসিবার স্থান। খানিক দূরে মেয়েদের আসন।

রাত্রি আটটার মধ্যেই আসর ভরিয়া গেল। তবলচী, সারেঙ্গী আপন আপন যন্ত্রের সুর বাঁধিতেছিল। দুইজন পশ্চিমা নর্তকী পেশোয়াজ-ওড়নায়-অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া আসরে আসিয়া বসিল। আসরের কোলাহল মুহূর্তে নীরব হইয়া গেল। হ্যাঁ, রূপ বটে!

গান আরম্ভ হইল। ওদিকে চেয়ারে বিশিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে মহিম গাঙুলী বসিয়া।

দুইজন নর্তকীর মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা উঠিয়া গান ধরিয়াছিল। দীর্ঘ সুরে রাগিণীর আলাপে আসরখানা যেন ঝিমাইয়া আসিল। শ্রোতাদের মধ্যে মৃদু কথাবার্তা শুরু হইয়া গেল। বিশিষ্ট শ্রোতামহলে কি একটা হাস্যপরিহাস চলিতেছিল। গাঙুলীবাড়ির চাপরাসীর দল সাধারণ শ্রোতাদের পিছনে দাঁড়াইয়া হাঁকিয়া উঠিল, চুপ—চুপ।

গান শেষ হইবার মুখে মহিম ভদ্রতা করিয়া বলিয়া উঠিল, বাঃ—বাঃ!

নর্তকীর নৃত্যগতি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। গান শেষ করিয়া সে বসিয়া পড়িল। তরুণীটির সহিত মৃদু হাসিয়া কি কয়টা কথা বলিয়া এবার তাহাকে উঠিতে ইঙ্গিত করিল।

দেখিতে দেখিতে আসর জমিয়া উঠিল। চপলগতির কণ্ঠসঙ্গীতে ও চটুল নৃত্যভঙ্গীতে যেন একটা পাহাড়ী ঝরনা আসরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তারিফে তারিফে আসরের মধ্যে একটা কলরোল উঠিল। বিশিষ্ট শ্রোতামহল হইতে টাকা নোট বকশিশ আসিল।

তারপর আবার—আবার—আবার। আর আসর অলসমন্থর হয় নাই। আসর ভাঙিলে মহিম ডাকিয়া বলিল, সকলে খুব খুশী হয়েছেন।

সেলাম করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠা কহিল, আপনাদের মেহেরবানি।

সত্যই মহিমের মেহেরবানির অন্ত ছিল না। তিন দিন বায়নার স্থলে পাঁচ দিন গাওনা হইয়া তবে শেষ হইল।

বিদায়ের দিন আরও মেহেরবানি সে করিল। বিদায় করিয়া বলিয়া দিল, এখানে আমাদের রাজবাড়ি আছে, একবার ঘুরে যেয়ো। বিশ্বম্ভর রায় সমঝদার আমীর লোক। গাওনা হয়ত হতে পারে।

বয়োজ্যেষ্ঠা সম্ভ্রমভরে কহিল, ওঁর কথা আমরা শুনেছি হুজুর। জরুর যাব রাজাবাহাদুরের দরবারে। সে মতলব আমার প্রথম থেকেই আছে।

তারাপ্রসন্ন মনে মনে আগুন হইয়া উঠিল। সে বেশ বুঝিয়াছিল, এ ওই কুটিল মহিম গাঙুলীর কূট চাল। অবশেষে একটা বেশ্যাকে দিয়া অপমানের চেষ্টা করিয়াছে। সে গম্ভীরভাবে বলিল, বাবুর তবিয়ত আচ্ছা নেই—নাচগান এখন হবে না।

বয়োজ্যেষ্ঠা বাইজীটি বলিল, মেহেরবানি করকে—

বাধা দিয়া তারাপ্রসন্ন বলিল, সে হয় না।

বাইজী দুঃখিতভাবে বলিল, মেরে নসীব।

তাহারা উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

এমন সময় দোতলা হইতে হাঁক আসিল, তারাপ্রসন্ন!

তারাপ্রসন্ন আসিতেই বিশ্বম্ভর বলিলেন, কে ওরা?

নতমুখে তারাপ্রসন্ন উত্তর দিল, গাঙুলীদের বাড়ি ওরাই এসেছিল মুজরো করতে।

—হুঁ।—তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, শুধু ফিরিয়ে দিলে?

—সেলাম পৌঁছে হুজুরকো পাশ।—মুসলমানী কায়দায় আভূমিনত অভিবাদন করিয়া বাইজী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

কাছারি-ঘর হইতে এদিকের বারান্দা ও ঘরের খানিকটা দেখা যায়। বিশ্বম্ভরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাইজী তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া আসিয়াছে।

এত্তালা না দিয়া উপরে উঠিয়া আসার জন্য বিশ্বম্ভর রুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে রাগ রহিল না। বাইজীর রূপ তাঁহার চিত্ত কোমল করিয়া দিল।

বাইজী আবার অভিবাদন করিয়া বলিল, কসুর মাপ করতে হুকুম হয় মেহেরবান; এত্তালা না দিয়ে এসে পড়েছি।

বিশ্বম্ভর দেখিতেছিলেন বাইজীর রূপ। দাড়িমের দানার মত রঙ, সুর্মা-আঁকা টানা দুইটি চোখ—মাদকতা-ভরা চাহনি, গোলাপের পাপড়ির মত দুই ঠোঁট, ঈষৎ দীর্ঘ দেহখানি, ক্ষীণ কটি, নৃত্য যেন আলস্যভরে দেহখানিতে বিরাম লইয়াছে। এ চঞ্চল হইলেই সে মুখর হইয়া উঠিবে।

বিশ্বম্ভর প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন, বৈঠিয়ে।

অদূরবর্তী গালিচার উপর বাইজী সসম্ভ্রমে বসিয়া বলিল, হুজুর বাহাদুরের দরবারে বাঁদী গান শোনাবার জন্য হাজির।

বিশ্বম্ভর বলিতে গেলেন, তাঁহার তবিয়ত খারাপ। কিন্তু কেমন লজ্জা হইল, একটা তওয়াইফের সম্মুখে মিথ্যা বলিতে বুঝি ঘৃণা হইল।

বাইজী বলিল, সবার মুখে শুনেছি, এখানকার বড় ভারি সমঝদার হুজুর বাহাদুর। গাঙুলীবাবুও বললেন—আমীর, এখানকার রাজা আপনি।

রায়ের নলের ডাক বন্ধ হইয়া গেল। মৃদু হাসিয়া বাইজীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, হবে মজলিস সন্ধ্যের সময়।—তারপর ডাকিলেন, অনন্ত!

অনন্ত বাহিরেই ছিল। সম্মুখে আসিতেই বলিলেন, এঁদের বাসা দিয়ে দে। নীচে তালুকদারের ঘর একখানা খুলে দে।

অনন্ত বলিল, আসুন।

বাংলা বলিতে না পারিলেও বাংলা বুঝিতে বাইজীর কষ্ট হইল না। উঠিয়া অভিবাদন করিয়া সে কহিল, বহুৎ নসীব মেরে—বহুৎ মেহেরবানি হুজুরকো।

অনন্তকে অনুসরণ করিয়া সে চলিয়া গেল।

নায়েব তারাপ্রসন্ন দাঁড়াইয়া ছিল—নির্বাক হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সে কহিল, গাঙুলীদের বাড়ি একশ টাকা করে রাত্রি নিয়েছে ওরা।

কয়বার নলে টান দিয়া রায় বলিলেন, তোমার তহবিলে কি—কথা অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি আবার নলে টান দিতে আরম্ভ করিলেন।

তারাপ্রসন্ন বলিল, দেবোত্তরের তহবিলে শুধু শ-দেড়েক টাকা আছে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া রায় উঠিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া বাহির করিলেন সেই বাক্সটি। বাক্সের মধ্য হইতে রায়-বংশের মাঙ্গলিক সিঁথিখানি তুলিয়া তারাপ্রসন্নর হাতে দিয়া বলিলেন, দেবোত্তরের খাতায় খরচ লেখ—আনন্দময়ীর জন্য জড়োয়া সিঁথি খরিদ, দাম ওই দেড়শ টাকা।

আনন্দময়ী রায়-বংশের ইষ্টদেবী পাষাণময়ী কালী।

বহুদিন পর নিস্তব্ধ রায়বাড়ি তালা খোলার শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। জলসাঘরের দরজা-জানালা খুলিয়া গেল। বাতিঘরের তালা খুলিল। ফরাশঘরে আলোক প্রবেশ করিল।

অনন্ত ঘর-দুয়ার ঝাড়িতেছিল। সাহায্য করিতেছিল নিতাই ও রহমৎ। ঠাকুরবাড়ির পুরানো ঝি মাজিতেছিল—আশাসোঁটা গড়গড়া, বড় বড় পরাত, গোলাপপাশ, আতরদান। নায়েব তারাপ্রসন্ন দাঁড়াইয়া সমস্ত দিকের তদারক করিতেছিল।

অনন্ত বলিল, সদরে লোক পাঠাতে হবে নায়েববাবু।

নায়েব বলিল, ফর্দ করেছি আমি। শোন দেখি, কিছু ভুল হল কি না!

ফর্দ শুনিয়া অনন্ত কহিল, সবই হয়েছে, বাদ পড়েছে দুটো জিনিস। ভরি দুই আতর আর বিলিতী বোতল কটা।

নায়েব বলিল, ছিল তো একটা।

—তাতে আর খানিকটা আছে। মাঝে মাঝে একটু একটু এক-একদিন খান তো। কিন্তু আজ যদি চান, তবে একটা বোতলে হবে না নায়েববাবু।

নায়েব বলিলেন, কিন্তু পাঠাই কাকে? পায়ে হেঁটে সন্ধ্যের আগে কি ফিরবে?

অনন্ত দ্বিধাভরে বলিল, তুফানকে নিয়ে নিতাই-ই নয় যাক।

নিতাই বলিল, হুজুর হুকুম না করলে—

নায়েব বলিল, আচ্ছা, আমি বলে আসছি।

বিশ্বম্ভরবাবু শুইয়া ছিলেন। নায়েব গিয়া দাঁড়াতেই তিনি বলিলেন, তোমাকে ডাকব ভাবছিলাম। একবার গাঙুলীবাড়িতে যাও, মহিমকে নিমন্ত্রণ করে এস। আর গ্রামে ভদ্রলোক বেছে বেছে নিমন্ত্রণ করতে হবে। গাঙুলীবাড়ি যাও তুমি নিজে।

নায়েব বলিল, তাই যাব।

রায় বলিলেন, ছোটগিন্নীর পিঠে গদি দিতে বল।

নায়েব কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল, তুফানকে নিয়ে নিতাইকে পাঠানো দরকার সদরে।

—হুঁ।

কিছুক্ষণ পর রায় বলিলেন, তাই যাক।

আরও কিছুক্ষণ পর তুফানের হ্রেষা শুনিয়া রায় সম্মুখের জানালাটা খুলিয়া দিলেন। বাড়ির পিছন দিয়া দেবদারুছায়াচ্ছন্ন রায়েদের নিজস্ব পথখানি পরিষ্কার দেখা যায়। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ সে পথে বাজিয়া উঠিল। রায় দেখিলেন, ঘাড় বাঁকাইয়া দীপ্ত পদক্ষেপে তুফান দুর্দান্তপনা করিতে করিতে চলিয়াছে। তেমনই বাঁকানো ঘাড়, তেমনই পদক্ষেপ।

আরও কিছুক্ষণ পর ছোটগিন্নীর পিঠের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

রায় উঠিয়া বসিলেন। জানালা দিয়া দেখিলেন, গরবিনী ছোটগিন্নী চলিয়াছে। রায় বিছানা ছাড়িয়া ঘরের মেঝের উপর পদচারণা আরম্ভ করিলেন। দেহ-মন কেমন তাঁহার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

সমারোহ! রায়বাড়িতে বহুদিন পর সমারোহ!

ওদিকের জলসাঘর হইতেই বোধকরি শব্দ আসিতেছিল—ঠুং—ঠাং—ঠুং—ঠাং। বেলোয়ারী ঝাড়ের শব্দ। রায় ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় বাহির হইয়া পড়িলেন। অনন্ত ঝাড়-দেওয়ালগিরি হুকে হুকে টাঙাইতেছিল। পদশব্দে দুয়ারের দিকে চাহিয়া দেখিল, দুয়ারে দাঁড়াইয়া বিশ্বম্ভর রায়। তিনি চাহিয়া আছেন—দেওয়ালের ছবিগুলির দিকে। প্রকাণ্ড হলের চারিদিকের প্রাচীর-বিলম্বিত রায়বংশের মালিকদের যুবাবয়সের প্রতিকৃতি। আদিপুরুষ ভুবনেশ্বর রায় হইতে তাঁহার নিজের পর্যন্ত—সকলেরই বিলাস ও ব্যসনে মত্ত প্রতিকৃতি। প্রপিতামহ রাবণেশ্বর রায় দাঁড়াইয়া আছেন—শিকার-করা বাঘের উপর পা রাখিয়া, হাতে সড়কি-বল্লম, পিঠে ঢাল। পিতা ধনেশ্বর বসিয়া আছেন গদির উপর, পাশে বসিয়া ছোটগিন্নী। যুবক বিশ্বম্ভর তুফানের উপর আরূঢ়।

রায়বংশ এই ঘরে ঝড়ের খেলা খেলিয়া গিয়াছেন। রায়ের মনে পড়িল কত কথা। দুর্দান্ত রাবণেশ্বর এ বংশের প্রথম ভোগী পুরুষ। তিনিই এই জলসাঘর তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। কিন্তু ভোগ করিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। প্রথম যে দিন এই জলসাঘরে তিনি মজলিস করিয়াছিলেন, সেই দিনই রাবণেশ্বরের

স্ত্রী-পুত্র সব শেষ হইয়াছিল। বাতিদানের বাতি অর্ধদগ্ধ অবস্থাতেই নিবিয়াছিল। তাহার পর আর তিনি সাহস করিয়া জলসাঘরের দুয়ার খোলেন নাই।

সেই দিন রায়বংশের শেষ হইলেই যেন ভালো হইত। কিন্তু রাবণেশ্বর রায়বংশের মমতায় পুনরায় আপনার শ্যালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, এ তাঁহার আনন্দময়ীর আদেশ। তাঁহারই পুত্র তারকেশ্বর এই জলসাঘরের দুয়ার খুলিয়া আবার বাতি জ্বালিয়াছিলেন। তিনি এক রাত্রে এই ঘরে এক আমীর বন্ধুর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পাঁচ শত মোহর এক বাইজীকে বকশিশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের কথা মনে পড়িল—চন্দ্রা, চন্দ্রাবাই! আসর ভাঙার পর বন্ধুদের লুকাইয়া চন্দ্রার সহিত আলাপ বুকের মধ্যে অক্ষয় হইয়া আছে। ফুলের স্তবকের মত চন্দ্রা!

অনন্তর হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মনিবের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাত আর সরিতেছিল না। রায়ের মুখখানা থমথমে রাঙা—যেন কোনো রুদ্ধমুখ শিরা খুলিয়া আবদ্ধ রক্তধারা সে মুখে উৎসের মত আজ উথলিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্বে অনন্ত পরাতের উপর রূপার গ্লাসে শরবত বসাইয়া রায়ের সম্মুখে নিঃশব্দে ধরিয়া দিল। রায় চাহিয়া দেখিলেন, অনন্তর অঙ্গে জরিদার চোপদারের উর্দি, কোমরে পেটি, মাথায় পাগড়ি, বুকে রায়বাড়ির তকমা। তিনি নিঃশব্দে গ্লাসটি উঠাইয়া লইলেন। অনন্ত চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সম্মুখে কোঁচানো ধুতি, শুভ্র ফিনফিনে মিহি মুসলমানী ঢঙের পাঞ্জাবি, রেশমের চাদর নামাইয়া রাখিল। রায় চিনিলেন, পাঁচ বৎসর পূর্বে মুর্শিদাবাদে জমিদার-বন্ধুর বাড়ি যাইবার সময় এই পোশাক তৈয়ারী হইয়াছিল।

প্রশ্ন করিলেন, সব ঠিক আছে?

মৃদুস্বরে অনন্ত বলিল, বাতি জ্বালা হচ্ছে।

—লোকজন?

অনন্ত বলিল, নাখরাজদার ভাণ্ডারীরা বাপ-বেটায় এসেছে। দেবোত্তরে নাখরাজদার পাইক এসেছে চারজন, তারা দেউড়িতে আছে।

নীচে মোটরের হর্ন বাজিয়া উঠিল।

অনন্ত ত্রস্তপদে নীচে চলিয়া গেল। মহিম গাঙুলী আসিয়াছে। সিঁড়ির বুকে চলা-ফেরার শব্দ শোনা যায়। নীচের তলায় অতিথি-অভ্যর্থনার সাদর-

সম্ভাষণ, পরস্পরের সহিত আলাপের গুঞ্জন উঠিতেছে। ক্রমে জলসাঘরে তারের যন্ত্রের মৃদু স্বর জাগিয়া উঠিল। তবলার ধ্বনিও শোনা গেল। সুর বাঁধা হইতেছে।

অনন্ত আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, হুজুর!

বিশ্বম্ভর বেশ পরিবর্তন করিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছিলেন। উত্তর দিলেন, হুঁ?

—আসর বসতে পারছে না।

—হুঁ।

কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি বলিলেন, জুতো দে।

অনন্ত ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া একটু ইতস্তত করিয়া নীরবে কোণের টেবিলের দেরাজ খুলিয়া বোতল ও গ্লাস বাহির করিল। দেরাজের উপরে সেগুলি নামাইয়া দিয়া সে জুতা বাহির করিয়া ঝাড়িতে বসিল। রায় একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আবার পায়চারি শুরু করিলেন। নীচে যন্ত্রসঙ্গীতের সুর ক্রমশ উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল।

অনন্ত ডাকিল, হুজুর!

রায় শুধু বলিলেন, হুঁ।

আবার কয়বার তিনি ঘুরিলেন। সে গতি যেন ঈষৎ দ্রুত। অনন্ত প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে রায় টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, সোডা।

প্রকাণ্ড বড় হলটার তিন দিকে লম্বা ফালির মত গদি পাতিয়া তাহার উপর জাজিম বিছাইয়া শ্রোতাদের বসিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। পিছনে সারি সারি তাকিয়া। হলের ছাদে পাশাপাশি তিনটি বেলোয়ারী ঝাড়ে বাতি জ্বলিতেছিল। দেওয়ালে দেওয়ালে দেওয়ালগিরিতে বাতির আলো বাতাসে ঈষৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

ঝাড় ও দেওয়ালগিরির কতকগুলি শেজ না থাকায় বাতাসে বাতিগুলি নিবিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে তাই মধ্যে মধ্যে স্পন্দমান ছায়ারেখা দীর্ঘাকারে জাগিয়া উঠিতেছে প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার মত।

আসর বসিয়াছে—কিন্তু গতি এখনও অতি মৃদু। যন্ত্রবাদ্যের ঝঙ্কার অঙ্কুরের মত সবে দেখা দিয়াছে। চারিপাশের আসরে বসিয়া ত্রিশ-চল্লিশজন ভদ্রলোক মৃদু গুঞ্জনে আলাপ করিতেছেন। চার-পাঁচটা গড়গড়া-ফরসিতে তামাক পুড়িতেছে। তওয়াইফ দুইজন নীরবে বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে কেবল

মহিম গাঙ্গুলীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সিগারেটে টান দিয়া সে নিবন্ত বাতিগুলার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, কটা বাতি নিবে গেল যে হে!—কেহ এ কথার জবাব দিল না। সে ডাকিল, নায়েববাবু!—তারাপ্রসন্ন দরজার সম্মুখে দাঁড়াইতেই সে বলিল, দেখুন আলো বেশ খোলে নি। আমার ড্রাইভারকে বলে দিন, দুটো পেট্রোম্যাক্স নিয়ে আসুক।

নায়েব চুপ করিয়া রহিল। বয়োজ্যেষ্ঠা নর্তকীটি কেবল উর্দুতে বলিল, যেন স্বগতোক্তি করিল—এ ঘরে সে আলো মানায় কি?

বাহিরে ভারি পায়ের জুতার আওয়াজে নায়েব পিছনে চাহিয়া দেখিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত পরেই অনন্তর পিছনে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন বিশ্বম্ভর রায়। বাইজী দুইজন সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। মজলিসের সকলেও উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মহিমও আপনার অজ্ঞাতসারে অর্ধোত্থিত হইয়া হঠাৎ আবার বসিয়া পড়িল।

রায় স্বল্প হাসিয়া বলিলেন, আমার একটু দেরি হয়ে গেল। তারপর তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া মহিম সেটাকে সরাইয়া দিল পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাকিয়াটাকে কয়বার ঝাড়িয়া লইয়া বিরক্তভরে সে বলিল, বাপ রে বাপ, কি ধুলো!—তারাপ্রসন্ন আতর বিলি করিয়া গেল। সমস্ত গড়গড়া-ফরসির কলিকা বদল করিয়া রায়ের সম্মুখে তাঁহার নিজের ফরসি নামাইয়া অনন্ত হাতে নল তুলিয়া দিল।

বয়োজ্যেষ্ঠা বাইজী কুর্নিশ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে। সেই দীর্ঘ মন্থর গতিতে রাগিণীর আলাপ। কিন্তু একটু বৈচিত্র্য ছিল। আসর আজ নিস্তব্ধ। রায় চোখ মুদিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন গানের দীর্ঘ মন্থর গতির সমতায় বিশাল দেহ তাঁহার ঈষৎ দুলিতেছে। থাকিতে থাকিতে তাঁহার বাম হাতখানি উদ্যত হইয়া পাশের তাকিয়াটির উপর একটি মৃদু আঘাত করিল। ঠিক ওই সঙ্গে তবলচীর চর্মবাদ্য ঝঙ্কার দিয়া উঠিল রায় চোখ মেলিলেন, বাইজীর পায়ের ঘুঙুর মৃদু সাড়া দিয়াছে। নৃত্য আরম্ভ হইল। কলাপীর নৃত্য। আকাশে মেঘ দেখিয়া উতলা ময়ূরীর মত নৃত্যভঙ্গী গ্রীবা ঈষৎ বাঁকিয়াছে, দুই হাতে পেশোয়াজের দুই প্রান্ত আবদ্ধ, পেখমের মত তালে তালে নাচিতেছে। চরণে ঘুঙুর বাজিয়া উঠিল।

রায় বলিয়া উঠিলেন, বাঃ!

সঙ্গে সঙ্গে নর্তকীর নৃত্যমুখর চরণচাপল্য স্থির হইয়া গেল। ওদিকে তবলায় পড়িল সমাপ্তির আঘাত।

মহিম সরিয়া আসিয়া রায়ের কানে কানে বলিল, ঠাকুরদা, আসর যে জমছে গলা শুকিয়ে এল! কৃষ্ণাবাই সব ঠাণ্ডা করে দিলে যে!

কৃষ্ণাবাই ঈষৎ হাসিল, বোধ করি সে বুঝিল। অনন্ত শরবত আনিয়া মহিমের সম্মুখে ধরিয়াছিল। মহিম কহিল, থাক কদিন রাত্রি জেগে সর্দি করে আছে আমার।

রায় ঈষৎ হাসিয়া অনন্তকে ইঙ্গিত করিলেন।

অনন্ত ফিরিয়া গিয়া বড় একটা পরাতের উপর হুইস্কি, সোডার বোতল, গ্লাস লইয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

পানীয় প্রস্তুত করিয়া [illegible] মহিমকে [illegible] দ্বিতীয় [illegible] দিকে চাহিল। সকলে নতশির হইয়া বসিয়া ছিল। সে বিশ্বম্ভরবাবুর সম্মুখে সসম্ভ্রমে পানীয় অগ্রসর করিয়া ধরিল। নীরবে রায় গ্লাসটি ধরিলেন। মহিম অনেকক্ষণ ধরিয়া তরুণী বাইজীকে লক্ষ্য করিতেছিল, একটু নড়িয়া বসিয়া বলিল, পিয়ারীবাই, এবার তুমি একবার আগুন ছড়িয়ে দাও দেখি!

পিয়ারী গান ধরিল। জলদ গতি। রায় চোখ মুদিয়া ছিলেন, একবার কেবল ফাঁকের ঘরে বলিলেন—জেরা ধীরসে।

কিন্তু অভ্যাসের বশে পিয়ারী চটুল নৃত্যে, চপল সঙ্গীতে মজলিসের মধ্যে যেন অজস্র লঘু ফেনার ফানুস উড়াইয়া দিল। মহিম মুহুর্মুহু হাঁকিতে লাগিল, বহুৎ আচ্ছা!

রায়-কর্তার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহিমের সঙ্গতি-ছাড়া উচ্ছ্বাস তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল।

কিন্তু তবু তিনি দুলিতেছিলেন সঙ্গীতমুগ্ধ অজগরের মত। দেহের মধ্যে শোণিতের ধারা—রায়বংশের শোণিতের অভ্যস্ত উগ্রতায় বেগবতী হইয়া উঠিয়াছে। পিয়ারী নাচিতেছে বিচিত্রবর্ণা প্রজাপতির মত। পিয়ারীকে দেখিয়া মনে পড়ে লক্ষ্ণৌয়ের জোহরার কথা। কৃষ্ণার সঙ্গে সাদৃশ্য দিল্লীওয়ালী চন্দ্রাবাইয়ের। চন্দ্রাবাই তাঁহার জীবনের একটা অধ্যায়। পিয়ারীর নৃত্য শেষ হইল। রায় ভাবিতেছিলেন অতীতের কথা। চিন্তা ভাঙিয়া গেল টাকার শব্দে। মহিম পিয়ারীকে বকশিশ দিল। মহিম নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। প্রথম ইনাম দিবার অধিকার গৃহস্বামীর। চকিত হইয়া রায় সম্মুখে পাশে চাহিলেন। নাই—সম্মুখে রূপার পরাত নাই—আধারও নাই, আধেয়ও নাই। মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন। কৃষ্ণাবাই তখন গান ধরিয়াছে। আসরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তরঙ্গের মত তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া

ফিরিতেছিল। তাহার গতিতাড়িত বায়ুতরঙ্গ শ্রোতাদের বুকে আঘাত করিতেছে। সে গাহিতেছিল—কানাইয়ার বাঁশী বাজিয়াছে; উচ্ছ্বসিত যমুনা উজানে ফিরিল; তরঙ্গের পর তরঙ্গাঘাতে তটভূমি ভাঙিয়া কানাইয়াকে সে বুকে টানিয়া লইতে চায়। সে সঙ্গীত ও নৃত্যের উচ্ছ্বাস অপূর্ব! রায় সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সঙ্গীত শেষ হইল। রায় বলিয়া উঠিলেন, বহুত আচ্ছা চন্দ্রা!

কৃষ্ণা সেলাম করিয়া কহিল, বাঁদীকে নাম কৃষ্ণাবাই।

ওদিক হইতে মহিম ডাকিল, কৃষ্ণাবাই, থোড়া ইনাম ইধার।

রায় উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। ধীর পদক্ষেপে মজলিস অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বারান্দার বুকে পাদুকাশূন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া মিলাইয়া গেল।

মহিম বলিল, পিয়ারীবাই, এবার তোমার আর একখানা।

কৃষ্ণা বলিল, হুজুর বাহাদুরকে আনে দিজিয়ে।

মহিম বলিল, আসছেন তিনি, তার আর কি! ওই—ওই বোধ হয় আসছেন তিনি।

রায় নয়—প্রবেশ করিল নায়েব তারাপ্রসন্ন। একটি রূপার রেকাবি আসরে সে নামাইয়া দিল। রেকাবের উপর দুইখানি মোহর।

নায়েব বলিল, বাবু ইনাম দিলেন।

মহিম অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, তিনি কই?

তাঁর বুকে ব্যথা ধরেছে। তিনি আর আসতে পারবেন না। আপনারা গান শুনুন। তিনি মাফ চেয়েছেন সকলের কাছে।

মজলিসের মধ্যে অস্ফুট একটা গুঞ্জন উঠিল।

মহিম উঠিয়া তাচ্ছিল্যময় আলস্যভরে একটা আড়মোড়া ভাঙিয়া বলিল, উঠি তারাপ্রসন্ন। কাল আবার সাহেব আসবেন।

তারাপ্রসন্ন আপত্তি করিল না। অপর সকলেও উঠিয়া পড়িল। মজলিস ভাঙিয়া গেল।

ঘরের মেঝের উপর রায়-গিন্নীর হাতবাক্সটা খোলা পড়িয়া ছিল। গর্ভ তাহার শূন্য। রায় নিজে ভ্রূক্ষেপহীনভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন উন্নত শিরে। রায়বাড়ির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। উত্তেজনায়, সুরার উগ্রতায় দেহের রক্ত যেন ফুটিতেছিল। স্থান-কাল আজ সব ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। অন্যমনস্কভাবে তিনি ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন। জলসাঘরের আলোকের

দীপ্তি তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। আবার আসিয়া তিনি জলসাঘরে প্রবেশ করিলেন। শূন্য আসর। দেওয়ালের বুকে শুধু জাগিয়া আছেন রায়বংশধরগণ। বিশ্বম্ভর খোলা জানালার দিকে চাহিলেন। জ্যোৎস্নায় ভুবন ভাসিয়া গিয়াছে। বসন্তের বাতাসের সর্বাঙ্গে মুচুকুন্দ ফুলের গন্ধ মাখা। কোথায় কোন গাছে বসিয়া একটা পাপিয়া অশ্রান্ত ঝঙ্কার তুলিয়া ডাকিতেছে, পিউ-কাঁ-হাঁ—পিউ-কাঁ-হাঁ! রায়ের মনের মধ্যে সঙ্গীত গুঞ্জন করিয়া উঠিল। বহুদিনকার ভুলিয়া-যাওয়া চন্দ্রার মুখের বেহাগ—শুনু যা শুনু যা পিয়া—। মাথার উপরে চাহিয়া দেখিলেন, চাঁদ মধ্যগগনে। পদশব্দে পিছন ফিরিলেন। অনন্ত বাতি নিবাইবার উদ্যোগ করিতেছে।

রায় নিষেধ করিলেন, বলিলেন, থাক।

অনন্ত চলিয়া যাইতেছিল। রায় ডাকিলেন, এস্রাজটা এনে দে আমার।

অনন্ত এস্রাজ লইয়া আসিল। জানালার সম্মুখে এস্রাজ-কোলে রায় বসিয়া বলিলেন, ঢাল।—পরাতের উপর খোলা বোতল পড়িয়া ছিল—রায় ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিলেন। পানীয় দিয়া অনন্ত চলিয়া গেল।

এস্রাজের তারের বুকে ছড়ির টান পড়িল। নিস্তব্ধ পুরীর মধ্যে সুর জাগিয়া উঠিল। বিভোর হইয়া রায় এস্রাজ বাজাইয়া চলিয়াছেন। এস্রাজ কি কথা কহিয়া উঠিল? মৃদু ভাষা যে স্পষ্ট শোনা যায়!

গানের কথাগুলি রায়ের কানে বাজিতেছিল—নিশীথরাত্রে হতভাগিনী বন্দিনী, দুয়ারের পাশে প্রহরায় জাগিয়া বিষাক্ত ননদিনী; নয়নে আমার নিদ্রা আসে না, নিদ্রার ভানে আমি তোমারই রূপ ধ্যান করি; হে প্রিয়, এ সময়ে কেন তুমি বাঁশী বাজাইলে?

রায় এস্রাজ ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মৃদুস্বরে তিনি ডাকিলেন, চন্দ্রা—চন্দ্রা!

তাঁহার চন্দ্রা! এ গানও যে চন্দ্রার! বাহির হইতে মিঠা গলায় কে ডাকিল, জনাব!

রায় ব্যগ্রভাবে ডাকিলেন, চন্দ্রা—চন্দ্রা, আও, ইধর আও। দোস্ত লোক চলা গিয়া। চন্দ্রা!

কৃষ্ণা স্মিত সলজ্জ মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া অতি মধুর করিয়া যে গানটি তিনি এস্রাজে বাজাইতেছিলেন, তাহার শেষ চরণ গাহিল—হে প্রিয়, এ সময়ে কেন তুমি বাঁশী বাজাইলে?—হাসিয়া রায় তাঁহার মোটা গলা যথাসম্ভব চাপিয়া গান ধরিলেন—ওগো প্রিয়া, এমন রাত্রি, বুকে আমার বিজয়োল্লাস, একা কি আর থাকা যায়?

রায় বোতলের ছিপি খুলিতেছিলেন। হাত বাড়াইয়া কৃষ্ণাবাই বলিল, জনাবকে হুকুম হোয়ে তো বাঁদী দে শক্তে হেঁ।

মৃদু হাসিয়া রায় বোতল ছাড়িয়া দিলেন। কৃষ্ণা বোতল খুলিয়া দিল। মদ ঢালিয়া গ্লাস রায়-বাবুর হাতে তুলিয়া দিল।

আবার এস্রাজের সুর উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা মৃদুস্বরে গান ধরিল। কৃষ্ণা গাহিতে গাহিতে নাচিতে আরম্ভ করিল। সে গাহিল—হে প্রিয়, ঝরা ফুলের মালা আমি গাঁথি না ; উচ্চ শাখায় ওই যে ফুলের স্তবক, ওই আমায় দাও ; আমায় তুমি তুলিয়া ধর, আমি নিজে চয়ন করিব তোমার জন্য। উর্ধ্বমুখে হাত দুইটি বাড়াইয়া সে নাচিতেছিল। রায় এস্রাজ ফেলিয়া টপ করিয়া হাতের মুঠাতে কৃষ্ণার পা দুইটি ধরিয়া উচ্চে তুলিয়া তালে তালে তাহাকে নাচাইয়া দিলেন। গান শেষ হইল। কৃষ্ণা পড়িয়া যাইবার ভানে চিৎকার করিয়া উঠিল। পর-মুহূর্তে সে নামিয়া পড়িল। সুরামত্ত রায় আদর করিয়া ডাকিলেন, চন্দ্রা—চন্দ্রা—পিয়ারী!

গানের পর গান চলিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরা। একটা বোতল শেষ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বোতলটাও শেষ হয়-হয়। একটু পরেই বাইজীর অবশ দেহ এলাইয়া পড়িল—ফরাশের উপর। বিশ্বম্ভর তখনও বসিয়া—মত্ত নীলকণ্ঠের মত। বাইজীর অবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন। একটা তাকিয়া সযত্নে তাহার মাথায় দিয়া ভালো করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিলেন। তারপর এস্রাজ টানিয়া লইয়া আবার বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় বোতলটা শেষ হইতে চলিল। কিন্তু রাত্রি শেষ হইল না। এমন সময় গাঙুলীবাড়ির তিনটার ঘড়ি বাজিয়া উঠিল, ঢং—ঢং—ঢং।

রায়বাড়ির খিলানে খিলানে পারাবতের গুঞ্জন উঠিল। রায়ের চমক ভাঙিল। নিত্য এই শব্দে নিদ্রা ভাঙে—তিনি উঠিয়া পড়িলেন। একবার শুধু নিদ্রিতা কৃষ্ণাকে আদর করিলেন, চন্দ্রা—চন্দ্রা—পিয়ারী! তারপর বারান্দার বাহিরে আসিয়া তিনি ডাকিলেন, অনন্ত!

অনন্ত গিয়াছিল ছাদে প্রভুর জন্য তাকিয়া গালিচা পাতিতে। নীচে নামিয়া আসিতেই রায় তাহাকে বলিলেন, পাগড়ির চাদর, সওয়ারের পোশাক দে। নিতাইকে বলে দে তুফানের পিঠে জিন দিতে—জলদি।

সবিস্ময়ে অনন্ত প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, রায় গোঁফে চাড়া দিতেছেন।

এ মূর্তি তাহার অপরিচিত নয়, কিন্তু বহুদিন দেখে নাই। সে মৃদুস্বরে বলিল, মুখে হাতে জল দিন।

কিছুক্ষণ পরই তুফানের হর্ষপূর্ণ হ্রেষায় শেষরাত্রির বুক ভরিয়া উঠিল। তারাপ্রসন্নর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। জানালা হইতে সে দেখিল—তুফানের পিঠে বিশ্বম্ভর রায়। পরনে চোস্ত পায়জামা, গায়ে আচকান, মাথায় সাদা পাগড়ি। অন্ধকারে সম্পূর্ণ না দেখিলেও তারাপ্রসন্ন কল্পনা করিল—পায়ে জরিদার নাগরা, হাতে চামর দেওয়া চাবুক। তুফান নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া গেল।

মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া ধুলার ঘূর্ণি উড়াইয়া তুফান তুফানের বেগে ছুটিয়াছিল। শেষরাত্রির শীতল বায়ু হু-হু করিয়া রায়ের উত্তপ্ত ললাট স্পর্শ করিতেছিল। সুরার উগ্রতা ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসিতেছিল। প্রান্তর শেষ হইয়া গ্রাম—গ্রামখানার নাম কুসুমডিহি। পাশ দিয়া তরকারি-বোঝাই একখানা গাড়ি চলিয়াছে। আরোহী তাহাতে দুই জন। বোধ হয় তাহারা হাটে চলিয়াছিল। কয়টা কথা তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছাইল, গাঙুলীবাবুরা কিনে থেকে—

রায় সজোরে লাগাম টানিয়া তুফানের গতিরোধ করিলেন।

তখনও গাড়ির আরোহা বলিতেছিল, খাজনা দিয়ে লাভ কিছু আর থাকে না। সুখ ছিল রায়-রাজাদের আমলে—

চারদিক চাহিয়া দেখিয়া রায় চমকিয়া উঠিলেন।

তুফানের পিঠের উপর! কোথায়!—এ তিনি কোথায়! ক্রমে চিনিলেন, হারানো লাট কীর্তিহাট সম্মুখে। মুহূর্তে সোজা হইয়া, লাগাম টানিয়া তুফানকে ফিরাইয়া সজোরে তাহাকে কশাঘাত করিলেন। আবার কশাঘাত। তুফান বিপুল বেগে ছুটিল। আস্তাবলের সম্মুখে আসিয়া রায় চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন, পূর্বদিকে আলোর রেশ ফুটিতেছে। রজনী এখনও যায় নাই।

রায় ডাকিলেন, নিতাই!

তিনি হাঁপাইতেছিলেন। অনুভব করিলেন, তুফানও থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। রায় নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন লাগামের টানে তুফানের মুখ কাটিয়া গিয়াছে। তাহার সমস্ত মুখটা রক্তাক্ত। শ্রান্ত তুফান কাঁপিতেছিল। রায় তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, বেটা—বেটা!

তুফান মুখ তুলিতে পারিল না। সুরার মোহ বোধ করি তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ যায় নাই। বলিলেন, ভুল বেটা, তোরও ভুল, আমারও ভুল। লজ্জা কি বেটা তুফান! ওঠ—ওঠ।

নিতাই পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, বড় হাঁপিয়ে পড়েছে, ঠাণ্ডা হলেই উঠবে।

চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া রায় দেখিলেন, নিতাই। নিতাইয়ের হাতে তুফানকে দিয়া ত্বরিতপদে রায় বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলেন, জলসাঘর তখনও খোলা। উঁকি মারিয়া দেখিলেন, ঘর শূন্য, অভিসারিকা চলিয়া গিয়াছে। সুরার শূন্য বোতল আসরে গড়াগড়ি যাইতেছে। ঝাড়-দেওয়ালগিরির বাতি তখনও শেষ হয় নাই। এখনও আলো জ্বলিতেছে। দেওয়ালের গায়ে দৃপ্ত রায়বংশধরগণ, মুখে মত্ত হাসি। সভয়ে রায় পিছাইয়া আসিলেন। সহসা মনে হইল, দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন—মোহ! কেবল তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহ এই ঘরে জমিয়া আছে।

দরজা হইতেই তিনি ফিরিলেন। রেলিঙে ভর দিয়া ভীতার্তের মত তিনি ডাকিলেন, অনন্ত—অনন্ত!

অনন্ত সাড়া দিয়া ছুটিয়া আসিল। প্রভুর এমন কণ্ঠস্বর সে কখনও শোনে নাই। সে আসিয়া দাঁড়াইতেই রায় বলিয়া উঠিলেন, বাতি নিবিয়ে দে, বাতি নিবিয়ে দে—জলসাঘরের দরজা বন্ধ কর—জলসাঘরের—

আর কথা শোনা গেল না। হাতের চাবুকটা শুধু সশব্দে আসিয়া জলসাঘরের দরজায় আছড়াইয়া পড়িল।

দে ব তা র ব্যা ধি

দীর্ঘকাল পরে বুড়ো হেডমাস্টার চিঠি পেলেন—ডাক্তার গরগরির কাছ থেকে। ডাক্তার গরগরি। কতকাল আগের কথা! অনেক দিন আগের কথা। ঠিক কতদিন হল কারোরই মনে নেই। তবে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে, এতে আর ভুল নেই।

ছ ফুটের উপর লম্বা একটি মানুষ, পাতলা হিলহিলে কাঠামো, মাথাটি ছোট, টিয়াপাখির ঠোঁটের মত নাক, চোখ দুটিতে কোনো বিশেষত্ব না থাকলেও চোখের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত রুক্ষ—তীব্র। এই ছিল গরগরি ডাক্তারের চেহারা। ডাক্তার এসে উঠল—সন্ন্যাসীচরণ প্রধান মশায়ের নটকানের দোকানে। দোকানের পাশেই ছিল ছোট ছোট দুটি কুঠুরি—সেই কুঠুরি দুটি ভাড়া নিয়ে প্রথমেই টাঙিয়ে দিলে দুটি টিনের পাতে লেখা সাইনবোর্ড। একটায় ইংরেজীতে লেখা—Doctor Gargari, Experienced Physician. অপরটায় বাংলায় লেখা

—ডাক্তার গরগরি, স্থবিজ্ঞ চিকিৎসক। লোকে ঠাট্টা করে নাম দিলে ডক্টর গ্রে-গ্রেী।

রাঢ়দেশের পল্লীগ্রাম—গণ্ডগ্রাম অবশ্য বলা চলে, সপ্তাহে দুদিন হাট বসে, ছোটখাট বাজারও আছে; মিষ্টির দোকান, নটকানের দোকান, কাপড়ের দোকান, মনিহারি দোকান, কাটা কাপড়ের দোকান না থাকলেও বৈরিগী খোঁড়া আর তিনু মিয়া, দুজনের দুটো সেলাইয়ের কল চলে—একটা বাজারের এ-মাথায় একটা ও-মাথায়। কিন্তু বাজার হাট—সব এই দিকে হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের যাকে বলে মুখপাত, সেটা এদিকে নয়। সেটা হল ভদ্রলোক-পল্লীতে। সে আমলের কথা। তখন টাকা-পয়সা যার যত থাক, জমিদারেরাই ছিল সমাজের প্রধান। গ্রামটির ভদ্রলোক-পল্লীটির চেহারা ছিল—বেঙাচি-ভরা খিড়কি ডোবার মত। জমিদারে জমিদারে প্রায় শিবময় কাশীধামের মত অবস্থা। বছরে পঞ্চাশ-একশ-দুশ, পাঁচশ-হাজার-দু হাজার আয়ের জমিদার সব। তিন-চারঘর চার-পাচ হাজারী, একঘর পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে ক্রমে ক্রমে বাড়ছেন দিন দিন শুক্লপক্ষের চাঁদের মত। ঘরে ঘরে মজলিস বসে, কাছারি হয়, খানা-পিনা গীত-বাদ্য হয়, রাত্রি বারোটা-একটা পর্যন্ত আসর সরগরম থাকে।

ডাক্তার ঘাড় বেঁকিয়ে তির্যকভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সন্ন্যাসী প্রধান মশায়কে বললে, আই ডোণ্ট কেয়ার। ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মি মিঃ প্রডানা?

সন্ন্যাসীচরণ ইংরেজী বুঝত না। সে ডাক্তারের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, কি বলছেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার গরগরি বললে, ওদের আমি গ্রাহ্যও করি না।—বলে হাসলে। বোধ হয় কথাটাকে একবার পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে বললে, আপনাদের ওই জমিদারদের।

তারপর ডাক্তার বের হল—সাজগোজ করে বিকেলবেলা বেড়াবার জন্যে। ডক্টর বলে, ইভনিং ওয়াক। মর্নিং ওয়াক অবশ্য সব চেয়ে ভালো; বাট, ইউ সি, ভোরে ঘুম আমার ভাঙে না।—আবার হেসে বলে, ইট ইজ এ ডক্টরস ডিজিজ। সব বড় ডাক্তারের ঘুম ভাঙে নটার পরে।—বলে সে ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে বেরিয়ে পড়ল। ছ ফুট লম্বা ডাক্তারের মাথায় একটা গুজরাটী কালো টুপি, গায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঝুল চায়না কোট, পরনে সাদা থান কাপড়, পায়ে সে আমলের হুডবার্নিশ, পাশে স্প্রিং দেওয়া জুতো। মুখে একটি সিগার। কড়া সিগারের

গন্ধে রাস্তার লোক নাকে কাপড় দেয়। ডাক্তার তাদের দিকে তাকিয়ে বলে, আন্‌সিভিলাইজ্‌ড ক্রীচার্স। ডাক্তার নাকে রুমাল দেয় বাড়ির পাশের ড্রেন-গুলো দেখে! বলে, ডার্টি, নুইসেন্স! তার বেশভূষার দিকে হাঁ করে যারা চেয়ে থাকে, তাদের সে বলে—হামবাগ!

পশ্চিম রাঢ়ের পল্লী, লোকেদের কথায় বিচিত্র টান, ঐ-কার, এ-কার, চন্দ্রবিন্দু, ড়-কারের ছড়াছড়ি; 'গিয়েছে' 'হয়েছে' স্থলে বলে—'গৈছে' 'হৈছে'; 'কেন'কে বলে—'কেনে'; 'খেয়েছি'কে বলে—'খেঁয়েছি'; 'হার'কে—'হাড়', 'রাম'কে বলে—'ড়াম'। নিতান্ত নিম্নস্তরের লোকে আবার 'রাম'কে বলে—'আম' আর 'আম'কে বলে—'ড়াম'। ডাক্তার শুনে বলে, বারবেরিয়ানস ব্রুটস্! বাংলাতে বলে, অনার্য—বর্বরের দেশ।

বাজারের ভিতরের রাস্তাটা ধরে সে বরাবর চলে গেল ইস্কুলের দিকে। এখানে একটি এম. ই. ইস্কুল আছে। পথে থানা। সে আমলের থানা, খানকয়েক চেয়ার, দুখানা টেবিল থাকলেও তক্তাপোশের আধিক্য ছিল বেশি; দারোগাবাবুরও ভুঁড়ি ছিল; তক্তাপোশের উপরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে তিনি পান চিবুচ্ছিলেন আর গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন। হঠাৎ এই এমন সজ্জায় সজ্জিত ডাক্তারকে দেখে তিনি ডাকলেন, চামারী সিং, দেখো তো--উ কৌন যাতা হ্যায়!

চামারী সিং পালোয়ান লোক, সে এসে গম্ভীরভাবে বললে, এ বাবু সাব!

মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে ডাক্তার অল্প একটু ফিরে বললে, ইয়া-স?

'ইয়েস'কে ডাক্তার বলে—'ইয়া-স', লম্বা করে টেনে উচ্চারণ করে।

চামারী ইষৎ চকিত হয়ে গেল, বললে, আপকো দরোগাবাবু বোলাতে হেঁ।

—হোয়া-ট? বোলাতে হেঁ? হোয়াই? কাহে? আই অ্যাম নট এ চোর, নট এ জুয়াচোর, নায়দার এ ডেকইট—নর এ ফেরারী আসাইমী। দেন, হোয়াই? থানামে কাহে যায়েগা?

চামারী উত্তরোত্তর ভড়কাচ্ছিল, তবুও সে থানার জমাদার লোক, বললে, কেয়া নাম আপকা? পাতা কেয়া? কাঁহা আয়ে হ্যায় হিঁয়া—বাতাইয়ে তো।

ডাক্তার পকেট থেকে একখানা কার্ড বের করে চামারীর হাতে দিয়ে বললে, সব লিখা হায় ইসমে। দে দেও তোমহারা দারোগাবাবুকো।—বলেই আবার চুরুটটা মুখে দিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে অগ্রসর হল।

পথে কয়েকটা কুকুর টুপি-পরা অপরিচিত এই মানুষটিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল। ডাক্তার হাতের ছড়িটা তুললে বিরক্তি ভরে; দেখতে শৌখিন

হলেও তার ছড়িটা বাবুছড়ি নয়—দস্তুরমত যষ্টি। পাকা বেতের এবং মোটা, অর্থাৎ বেড়ে প্রায় সে আমলের ডবল পয়সার মত, তার ওপর ডাক্তারের মত লম্বা মানুষের উপযুক্ত লম্বা; দু-চার ঘা বেশ দেওয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই হেসে ফেলে ডাক্তার ছড়ি নামিয়ে নিলে। কুকুরগুলোকেই বললে, গ্যাটস গুড। বিশ্বাসী গ্রামভক্ত কুকুর! এঁটো-কাঁটার নুন খেয়ে নিমকহালাল! অ্যাঁ! গ্যাটস গুড!—বলেই আবার অগ্রসর হল।

গ্রামের প্রান্তে এম. ই. ইস্কুল। খড়ো বাংলো-ধরনের লম্বা বাড়ি। পাশেই একটা কোঠাঘরে হেডমাস্টার থাকেন। প্রবীণ লোক। বাসার সামনে বেঞ্চি পেতে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন, আর খবরের কাগজ পড়ছিলেন। সে আমলের কাগজ—সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, অবশ্য ইংরেজী। ডাক্তার তার সামনে এসে দাঁড়াল।—হ্যালো, আর ইউ দি ভেনারেবল হেডমাস্টার অব দি স্কুল?

হেডমাস্টার উঠে দাঁড়ালেন।—ইয়েস।—বলে সবিস্ময়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ডাক্তার বললে, গুড ইভনিং!—তারপর নিজের একখানি কার্ড বের করে হেডমাস্টারের হাতে দিয়ে বললে, এখানে প্র্যাকটিস করতে এসেছি আমি। বাট ইউ সি, জীবনে বন্ধুর প্রয়োজন। আই হ্যাভ কাম টু আস্ক ইউ টু বি এ ফ্রেণ্ড অব মাইন।

হেডমাস্টার হেসে বললেন, বসুন—বসুন।

—লেট মি হ্যাভ ইওর হ্যাণ্ড ফার্স্ট।—মাস্টারের হাতখানি নিয়ে হ্যাণ্ডশেক করে ডাক্তার বসল।

মাস্টার মশায় জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় উঠেছেন? এখানে কেউ জানা-শোনা আছে কি না? দেশে কে কে আছে? কোথায় দেশ? কেমন অবস্থা—সে কথাও ইঙ্গিতে জানতে চাইলেন।

বেঞ্চের উপর বসে ডাক্তার তার লম্বা পা দুখানির একখানি নাচাতে নাচাতে উত্তর দিলে আর চুরুট টানলে। শেষের প্রশ্নের উত্তরে বললে, দেশ কলকাতার কাছেই। মা আছেন, তিনি থাকেন কাশীতে; স্ত্রী আছেন, পুত্র আছেন—কন্যাও আছে। গরিব মানুষ আমি, হেডমাস্টার—এ পুয়োর ম্যান।

মাস্টার প্রশ্ন করলেন, এইখানেই যখন থাকবেন, তখন নিয়ে আসবেন তো এখানে?

ডাক্তারের পা দুটো ঘন ঘন নাচতে আরম্ভ করলে।—না হেডমাস্টার, সে আইডিয়া আমার নাই।

—তাহলে? তাঁরা সেখানে থাকবেন কার কাছে?

—ও!—ডাক্তার বললে, তাদের আমি বাপের বাড়িতে, আই মীন, আমার আমার শ্বশুর-বাড়িতে রেখে এসেছি। সেখানেই তারা থাকবে। একটু চুপ করে থেকে অনেকটা যেন ভেবে হঠাৎ আবার বললে, ইয়া-স হেডমাস্টার, সেইখানেই তারা থাকবে। এখানে আনার কথা আমি ভাবতেও পারি না।

এর পরে সে প্রায় চুপ করেই গেল এবং অত্যন্ত দ্রুতভঙ্গিতে পা নাচাতে আরম্ভ করলে।

হেডমাস্টার বললেন, চলুন, আমি যাব গ্রামের দিকে। ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ হবে। চলুন।

ডাক্তারও উঠে দাঁড়াল—সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে টুপি মাথায়, চায়না কোট পরা, লম্বা লোকটিকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল, স্থির সুদীর্ঘ একটি রেখার মত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে বললে, গুড নাইট, হেডমাস্টার।

—সে কি? গ্রামের মধ্যে যাবেন না?

—নো। মাফ করবেন হেডমাস্টার। তাঁরা সব ধনী ব্যক্তি, পুরুষানুক্রমে জমিদার। আমি একজন গরিব মনুষ্য। খেটে খাই। ওয়াটার অ্যাণ্ড অয়েল, ইউ সি, হেডমাস্টার—কখনও মিশ খায় না। গুড নাইট!

কথাটা অজানা রইল না কারুর। জানাতে অবশ্য বারণ করে নি ডাক্তার কিন্তু ঢাক বাজিয়ে বলার মত ইচ্ছেও তার ছিল না। ঢাক বাজিয়ে যে কথাই বলতে যাক, তাতে গলাই শুধু উঁচুতে চড়ে না, রঙ চড়ে, কথাও ফলাও হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যক্তিক্রম হল না। গাঁয়ের বাবুপাড়ায় কথাটা ঘোরালো এবং জোরালো হয়ে আলোচিত হতে আরম্ভ হল। কেউ বললেন, ডাক্তার বলেছে—গুণ্ডার দল সব। না-কামিয়ে দম্ভি। বাপের পয়সায় খায় নিষ্কর্মার দল। মাতাল। লম্পট। অত্যাচারী।

ডাক্তারও শুনলে। শুনে হেসে বললে, ওরা নিজেরা নিজেদের সত্যি বিশেষণগুলো রাগের মাথায় আমার কথা বলে বলে ফেলেছে। ওর কোনোটা আমার কথা নয়।

কেউ বললে, ডাক্তার বলেছে—ইতর, ওদের আমি ঘেন্না করি। বলে থু থু করে থুথু ফেলেছে।

ডাক্তার গম্ভীর ভাবে বললে, না। এ কথা আমি বলতে পারি না।

বাবুরা বললে, দেখে নেব আমরা।

ডাক্তার এবারও কোনো জবাব দিলে না। শুধু হাসলে।

বাবুরা প্রায় হুকুম জানিয়েই প্রচার করে দিলে, ওকে বাবুরা কেউ ডাকবেই না। অন্য লোকেও যেন না ডাকে। দারোগাবাবুর সঙ্গে বাবুদের খুবই সদ্ভাব। দারোগাবাবুও সে মজলিসে ছিলেন।

সন্ন্যাসী প্রধান বললে, ডাক্তারবাবু, কাজটা ভালো হচ্ছে না। চলুন, একদিন বাবুদের ওখানে যাই। গেলেই ব্যাপারটা মিটে যাবে।

ডাক্তার নিবানো আধখানা চুরুটটা কামড়ে ধরে দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে ফেললে, বললে, বাবুরা আপনার যদি ক্ষতি করতে পারে বলে মনে করেন সন্ন্যাসীবাবু, বলবেন আমাকে, আমি তাহলে চলে যাব আপনার এখান থেকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা ব্যাপার ঘটে গেল ; বাবুদের টমটমে চামারী সিং ছাতা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল একটি ছেলেকে—দশ-বারো বছরের ছেলে। ছেলেটি চীৎকার করে উঠল, ও মাগো—ও বাবারে! প্রায় সে নেতিয়ে পড়ে গেল টমটমের উপর। চামারী সিং ব্যস্ত হয়ে উঠল, টমটমের কোচম্যানকে বললে, রোখো। গাড়িটা দাঁড়াল।

চামারী লাফ দিয়ে নেমে সন্ন্যাসীকে বললে, থোড়া পানি দেবেন তো প্রধান মাশা।

ডাক্তার উঠে এগিয়ে গেল গাড়ির কাছে। ছেলেটি পেট ধরে কাতরাচ্ছে। চামারী জল আনতেই ডাক্তার প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে এর ?

চামারী বললে, দারোগাবাবুর লেড়কা।

—লেড়কা তো বটে। কি হয়েছে ?

প্রধান বললে, ভারি দুঃখের কথা ডাক্তারবাবু, ছেলেটির এই বয়সেই অম্বল-শূল হয়েছে।

—আই সি। তা, এই রোদ্দুরে এই অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে কোথায় ?

—কালীতলা পাশের গাঁ দেবীপুরে ভারি জাগ্রত কালীমা আছেন, সেইখানে যাচ্ছে। ফি মাসে অমাবস্যেতে যেতে হয়। কালীমায়ের ওখানেই পড়েছে শেষ পর্যন্ত।

—হুঁ ! কে বললে—শূলবেদনা ?

—মা-কালীর ভরণে বলেছে।

ডাক্তার বললে, হামবাগ।

চামারী বিব্রত হয়ে প্রধানকে বললে, কি করি হামি প্রধান মাশা ?

ডাক্তার নিজেই ছেলেটিকে কোলে নিয়ে নিজের ঘরে এনে শোয়ালে। চামারীকে বললে, বোলাও তোমার দারোগাবাবুকে। যাও বলছি।

ডাক্তার দারোগাকে বললে, শূল-ফূল নয়। এ আপনাদের মা কালীর বাবারও সাধ্যি নাই যে ভালো করে দেয়। বুঝলেন ?

দারোগা অবাক হয়ে গেলেন, বিশেষ করে ডাক্তার যখন মা-কালীর বাবা তুলে জোর দিয়ে বললে, তখন আর তিনি কোনো জবাব খুঁজে পেলেন না। কারণ কালীকেই তিনি ভালো করে জানেন না, কিন্তু ডাক্তার তার বাবার সংবাদ পর্যন্ত জানে। সে ক্ষেত্রে তিনি আর কি জবাব দেবেন।

ডাক্তার বললে, আমি ভালো করে দিতে পারি। কিন্তু ফী দু টাকা, ওষুধের দাম এক টাকা—তিন টাকা লাগবে। ভালো না হয় টাকা ফেরত দেব আমি।

দারোগা বললেন, ওষুধ দিন, আমি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চুরুটে টান দিয়ে ডাক্তার হঠাৎ অত্যন্ত নিরাসক্ত হয়ে বললে, ধারে কারবার আমি করি না।

চামারী সিং দৌড়াল। সন্ন্যাসী ব্যস্ত হয়ে বললে, আমি টাকা দিচ্ছি ডাক্তারবাবু।

—দেবেন তাতে আমার আপত্তি কি আছে? কিন্তু আপনি ফের পাবেন তো ?

ডাক্তার ওষুধ দিলে। একটা পুরিয়া আর এক দাগ ওষুধ। বললে, পাইখানা হবে। ভয় পাবেন না।

দারোগা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলেন।—পাইখানার সঙ্গে নাড়ীর মত লম্বা কি বেরিয়েছে! ডাক্তার বললে, শূল বেরুচ্ছে। কৃমি—কৃমি। ছেলের পেটে কৃমি ছিল।

—এত বড় কৃমি ?

—হ্যাঁ। ভালো হয়ে গেল শূলবেদনা। যান, বাড়ি যান।—তারপর আবার বললে, আপনার মাথাতেও দেখছি কৃমি আছে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন যে বড়!—হাসতে হাসতে আবার বললে, ওর ওষুধ আমার কাছে নাই। যান, বাড়ি যান। প্রধান মশাইয়ের টাকা তিনটে দিয়ে দেবেন। বুঝলেন ?

এক চিকিৎসাতেই ডাক্তারের পসার জমে গেল। দারোগা প্রত্যেককে বললেন, ধন্বন্তরি—সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।

ডাক্তার এতেও হাসে। এ হাসি কিন্তু অন্য রকম। ডাক্তারের কথায় যে একটা ধারালো ভাব আছে, সেটা নেই এ হাসিতে। সন্ন্যাসীচরণও একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। ডাক্তার সন্ধ্যায় হেডমাস্টারের ওখানে যেতেই হেডমাস্টার হেসে বলেন, যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, রাতারাতি বিখ্যাত ব্যক্তি।

ডাক্তার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে লম্বা ঘাড়টা একটু তুলে আপন মনে চুরুট টেনে যায়। আসর জমে না।

হেডমাস্টার জিজ্ঞাসা করেন, কি ব্যাপার ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে চুরুটটার দিকে তাকিয়ে বলে, নাথিং হেডমাস্টার।

—তবে?

ডাক্তার কোনো উত্তর না দিয়ে বসে থাকে চুপ করে। ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে, আকাশে তারা ফুটে ওঠে; ডাক্তার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ বলে, হেডমাস্টার!

—বলুন।

—এগুলো ঠিক আমি পছন্দ করি না।

—কি? কি পছন্দ করেন না? ব্যাপারটা কি বলুন তো?

—ব্যাপার কিছু নয়। এই যে অনাবশ্যক—অনুচিত—অবাঞ্ছনীয় কৃতজ্ঞতা। দারোগার ছেলেটার কৃমি হয়েছিল পেটে, অত্যন্ত সাধারণ সোজা অসুখ—এক পুরিয়া স্যান্টোনাইন, এক ডোজ ক্যাস্টর অয়েলে ভালো হয়ে গেল; আমি তার জন্যে দু টাকা ফীজ—এক টাকা ওষুধের দাম নিয়েছি। তবুও দারোগা আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে গেল। চারিদিকে বলে বেড়াচ্ছে, আমি ধন্বন্তরি। এগুলো অত্যন্ত—অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় মনে করি।

হেডমাস্টার অবাক হয়ে গেলেন।—কি বলছেন ডাক্তারবাবু? মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

—না।—ডাক্তারের কণ্ঠস্বর যত রূঢ় তত দৃঢ়।

হেডমাস্টার খানিকটা আহত হলেন মনে মনে, ডাক্তারের কথা বলার এই ধরনের জন্য। তিনি একটু চুপ করে থেকে বেশ শক্তভাবেই জবাব দিলেন, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না আমি।

—ইউ আর এ ফু-ল।

—কি বলছেন আপনি?

—ইউ ডোণ্ট নো হেডমাস্টার, ইউ ডোণ্ট নো। এই ধরনের কৃতজ্ঞতা ব্যাড—ভেরি ব্যাড, অত্যন্ত খারাপ।

হেডমাস্টার দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে উঠলেন, কখনও না। এটা আপনার মনের দোষ।

ডাক্তার আবার বললে, ইউ আর এ ফু-ল।

এর পর ডাক্তারের সঙ্গে হেডমাস্টারের আরম্ভ হয় ঈষদুষ্ণ তর্ক। ক্রমশ সে উষ্ণতা বাড়তে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর—অত্যন্ত রূঢ় তীব্র উচ্চধ্বনিতে চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছিল। বলতে ভুলেছি, ডাক্তারের কণ্ঠস্বরটাই তীক্ষ্ণ, সরু আওয়াজ, কিন্তু ডাক্তারের আকৃতির মতই প্রস্থে কম হলেও ছ ফুট উঁচু ডাক্তারের মতই বর্শাফলকের মত দীর্ঘ এবং ধারালো।

ইস্কুলের সঙ্গে সঙ্গে লাগাও একটা ছোট বোর্ডিং আছে,—এই বাদ-প্রতিবাদের উচ্চ কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে ছেলেরা অন্ধকারের মধ্যে অদূরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের দিকে দৃষ্টি পড়তেই হেডমাস্টার চুপ করে গেলেন। তিনি আসন ছেড়ে উঠে স্থানত্যাগ করে এগিয়ে গেলেন ছেলেদের সঙ্গে।

ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। তারপর উঠল এবং উচ্চস্বরে বললে, হেডমাস্টার, আমি চললাম। গুড নাইট!

কয়েক দিনের মধ্যেই ডাক্তারের খ্যাতি আরও বেড়ে গেল। খ্যাতি বইকি। সু কিংবা কু সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা যে ডাক্তারের বাড়ল, তাতে আর সন্দেহ নেই। লোকে বলতে লাগল, ভারি তেজি ডাক্তার। আগুন একেবারে।

কেউ বললে, ডাক্তার ভালো হলে কি হবে, যেমন দুর্মুখ, তেমনই চামার।

কেউ বললে, পাষণ্ড।

দারোগা একদিন নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন, ডাক্তার তাঁকে প্রায় হাঁকিয়ে দিয়েছে।—না না, না, ওসব আমার অভ্যেস নেই। রোগীর বাড়ি ফীজ নিই, চিকিৎসা করি। নেমন্তন্ন খাই না।

মানুষ মরছে, কি মরে গেছে—সেখানেও ডাক্তার ফীয়ের জন্যে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দয়ার জন্যে কেউ কাকুতি করলে বলে, দয়া করতে আমি আসি নি এখানে স্ত্রী-পুত্র ঘর-বাড়ি ছেড়ে। ফীজ ছাড়তে আমি পারব না। না দিতে পার, ডেক না আমাকে।

হেডমাস্টারকে বলে, হেডমাস্টারের সঙ্গে পরের দিনই আবার মিটে গেছে—বিনা বেতনে আগেকার গুরুদেবের মত ছেলে পড়াতে পারেন আপনি?

হেডমাস্টার চুপ করে থাকেন। এই উগ্রমস্তিষ্ক লোকটির সঙ্গে কোনো মতামত নিয়ে আলোচনা করতে তিনি চান না। বিশেষ করে যেখানে সামান্য মত-বিরোধের সম্ভাবনা থাকে।

ডাক্তার পা নাচাতে শুরু করে। চুরুট টানতে টানতে বাঁকা সুরে বলে, অবশ্য এর চেয়ে তাতে লাভ বেশী, হেডমাস্টার।

হেডমাস্টার মৃদু হাসেন।

ডাক্তার বলে, আরুণি গুরুর আল বাঁধতে গিয়ে জল আটকে শুয়ে থাকে। উতঙ্ক দেবদুর্লভ কুণ্ডল এনে দেয় গুরুপত্নীর জন্য। গুঁড়ো থেকে, গরু থেকে ধন-রত্ন মণি-মাণিক্য সব পাওয়া যায়। এমন কি শিষ্যের জীবনও চাইলে পাওয়া যায়।

আবার একটু চুপ করে হেসে বলে, আমি ঠিক জানি না, তবে আমার মনে হয়, আরও বহুতর গুরুদক্ষিণার উপাখ্যান পুরাণে উল্লিখিত হয় নাই। আমি যদি ডাক্তার না হতাম হেডমাস্টার, তবে এগুলো নিয়ে রিসার্চ করতে পারতাম।

ব্যাপারটা চরমে উঠল। একটা সদনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী তরুণ অনেক জল্পনা-কল্পনা করে একটি সেবা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করলে। দরিদ্র গৃহস্থকে সাহায্য, অনাথ-আতুরের সেবা করবে তারা। প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়িতে একটি করে ভাঁড় দিয়ে বলে গেল, দৈনন্দিন গৃহস্থের খোরাকির চাল থেকে এক মুঠো করে এই ভাঁড়ে তুলে রাখবেন। সাত দিনের সাত মুঠো চাল রবিবারে এসে নিয়ে যাব।—এ ছাড়া অবশ্য ভদ্রলোকদের, ব্যবসায়ীদের কাছে মাসিক চাঁদাও তারা পাবে।

তারা ডাক্তারকে এসে বললে, আপনার কাছে টাকা সাহায্য আমরা নেব না। আপনাকে আমাদের ডাক্তার হিসাবে সাহায্য করতে হবে।

ডাক্তার প্রায় ক্ষেপে গেল। সোজা বলে দিলে, থিয়েটার কর তো চাঁদা দেব। মদ খাও, গাঁজা খাও, তাতে কোনোদিন পয়সার অভাব হয়, আমার কাছে এস। কিন্তু এ সব চলবে না।

তারা অবাক হয়ে গেল।

ডাক্তার বললে, যাও যাও। ক্লিয়ার আউট, ক্লিয়ার আউট!

একজন রুখে উঠল, কি বললেন আপনি?

ডাক্তার বললে, আমি বলছি—গেট আউট। চলে যাও এখান থেকে।

গোটা গ্রাম জুড়ে এবার ডাক্তারের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন উঠল।

জনকতক ছেলে ডাক্তারকে প্রহার দেবার জন্য ষড়যন্ত্র করলে। জনকতক তাকে বয়কট করবার চেষ্টা করতে লাগল, অন্য ডাক্তার আনবার জন্য।

ডাক্তার কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। দাওয়ার উপর চেয়ারখানিতে

বসে পা দোলাতে লাগল। প্রধান মশায় কিছু অস্বস্তি বোধ করছিল। অদ্ভুত মানুষ! লোকের অনুরাগে বিরাগে সমান নিস্পৃহ। নিঃসন্দেহে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর। লোকটি গ্রামের লোকের প্রীতি অনুরাগ সব কিছুকে কর্কশভাবে উপেক্ষা করে অপমানিত করে তারই ঘরে রয়েছে, এতে তার মন খানিকটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করে পারছিল না। কিন্তু উপায় নেই, ডাক্তার পুরো বছরের ভাড়া দিয়ে রেখেছে। তা ছাড়া, তার ব্যবহারে রূঢ় কর্কশ যাই হোক, অন্যায্য কিছু নেই। সে তিক্ত অথচ শঙ্কিত দৃষ্টিতেই নিজের গদিতে বসে আড়চোখে ডাক্তারের দিকে প্রায় চেয়ে দেখে।

ডাক্তার শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে চুরুট টানে।

হঠাৎ যেন ডাক্তার উদাসীন হয়ে গেল। এটা নজরে পড়ল সর্বাগ্রে প্রধানের। সে কিন্তু কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলে না। তারপরই লক্ষ্য করলেন হেডমাস্টার। ডাক্তার যেন অতিরিক্ত মাত্রায় স্তব্ধ। তর্ক প্রসঙ্গে অত্যধিক উগ্র হয়ে ওঠার পর ডাক্তার অনেক সময় স্তব্ধ হয়ে থাকে। হেডমাস্টার লোকটিকে ভালোবেসে ফেলেছেন। তিনি তখন বলেন, কি মশাই? এখনও আপনার রাগ গেল না?

ডাক্তার তাতেও উত্তর না দিলে হেসে মাস্টার বলেন, অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না, আমিও চীৎকার করব না; রাগ যদি না মিটে থাকে তো আমাকে নয় দু ঘা মেরেই রাগটা মিটিয়ে ফেলুন।

ডাক্তার তাতে হেসে ফেলে।

কিন্তু এবারে স্তব্ধতার সে রকম কোনো কারণই নেই। তা ছাড়া এ স্তব্ধতার ধরনটাও অন্য রকমের। ডাক্তার শুধু স্তব্ধই নয়, অত্যন্ত অন্যমনস্ক, চুরুট খাওয়ার মাত্রাও বেড়ে গেছে। তর্কে পর্যন্ত রুচি নেই।

হঠাৎ উঠে ডাক্তার চলে যায়; খানিকটা গিয়ে বোধ হয় মনে পড়ে বিদায়-সম্ভাষণের কথা। থমকে দাঁড়িয়ে বলে, গুড নাইট, হেডমাস্টার!

হেডমাস্টার প্রশ্ন করেন নানাভাবে, কি হল ডাক্তার?

চুরুট টানতে টানতে ডাক্তার বলে, নাথিং হেডমাস্টার।

—বাড়ির খবর ভালো তো!

ভালো। হুঁ, ভালো। গুড নাইট, হেডমাস্টার।—ডাক্তার উঠে পড়ে।

হেডমাস্টার চিন্তিত হলেন। কয়েকদিনই ডাক্তার আসছেন না। নিজেই সেদিন গেলেন তিনি ডাক্তারের ওখানে। কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল না। ডাক্তার

বেড়াতে বেরিয়েছে! প্রধান মশায় ছিলেন দোকানে। তিনি সসম্ভ্রমে মাস্টারকে বসতে দিলেন তাঁর দোকানের সবচেয়ে ভারি চেয়ারখানায়। 'তামাক, তামাক' করে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

মাস্টার বললেন, থাক। ব্যস্ত হবেন না প্রধান মশায়। আমি তো রয়েছি। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা না করে যাচ্ছি না। ধীরে-সুস্থে আসুক না তামাক।

প্রধান বললেন, আশ্চর্য কাণ্ড হয়ে গেল মাস্টার মশায়। ডাক্তার হয় ক্ষেপে গেছে, নয় ছ মাসের বেশী বাঁচবে না। হঠাৎ আর এক রকম হয়ে গেল।

—বলেন কি!

—হ্যাঁ। গরিব-দুঃখীর কাছে ফীজ নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, ওষুধও অনেককে বিনা পয়সায় দিচ্ছে। আবার কাউকে কাউকে পথ্যের জন্যে পয়সাও দিচ্ছে।

হেডমাস্টার হাঁপ ছাড়লেন। বরাবরই তাঁর সন্দেহ ছিল। মনে হত, এ কঠোরতাটা তার অস্বাভাবিক, ধার করা, ছদ্মবেশের মত। যাক, লোকটা তা হলে স্বাভাবিক হয়েছে।

ডাক্তার ফিরল প্রায় রাত্রি নটার সময়। নিস্তব্ধ পল্লীর পথ। ডাক্তার গান গাইতে গাইতে আসছিল; অবশ্য মৃদুস্বরে গান। হেডমাস্টারকে দেখে স্মিতহাস্যে সে বললে, হেডমাস্টার!

—হ্যাঁ।—হেডমাস্টার উঠে ডাক্তারের হাত চেপে ধরে বললেন, আই অ্যাম ভেরি গ্ল্যাড—আই অ্যাম ভেরি গ্ল্যাড ডক্টর। সব শুনলাম।

ডাক্তার একটু চুপ করে থেকে বললে, কি শুনলেন হেডমাস্টার।

হেসে হেডমাস্টার বললেন, আপনার গান তো নিজের কানেই শুনলাম। তারপর শুনলাম, আজকাল আপনার ছদ্মবেশ ফেলে দিয়েছেন। গরিব-দুঃখীদের বিনা পয়সায় দেখছেন, ওষুধও দিচ্ছেন অনেককে বিনা পয়সায়, কাউকে কাউকে পথ্যের পয়সাও দিচ্ছেন। আমার সন্দেহ বরাবরই ছিল ডাক্তার।

ডাক্তার একটু চুপ করে থেকে বললে, এক কালে—প্রথম যৌবনে মাস্টার মশাই—। আজ আর সে হেডমাস্টার বললে না, বললে, মাস্টার মশাই।—আমি সেবাধর্মকে গ্রহণ করেছিলাম জীবনের ব্রত হিসাবে। বিবাহ করি নি। সংকল্প ছিল এমনি ভাবেই জীবন কাটিয়ে দেব। সে কি আনন্দ, সে কি তৃপ্তি! কিন্তু—। ডাক্তার চুপ করে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, কিন্তু উপকারের ঋণ বড় মারাত্মক ঋণ, মাস্টার মশাই। আর মানুষ বড় ভালো—অত্যন্ত ভালো, এ ঋণ শোধ করতে তারা—। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার বললে,

জীবনও দিতে পারে মানুষ। ডাক্তার আবার চুপ করে গেল। এবার বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, তারপর বললে, গুড নাইট হেডমাস্টার!

পরের দিন হেডমাস্টার প্রত্যাশা করেছিলেন—ডাক্তার আজ আসবে, কিন্তু ডাক্তার এল না। তার পরের দিন সকালেই প্রধান এসে সংবাদ দিলে, ডাক্তার চলে গেছে কাল রাত্রে।

—চলে গেছে!—হেডমাস্টার চমকে উঠলেন। চলে গেছে! ব্যাপার কি?

ঘাড় নেড়ে প্রধান বললে, জানি না। যাবার সময় শুধু বলে গেল—তক্তাপোশ চেয়ার এগুলো আপনি নেবেন প্রধান মশায়। ওষুধপত্রগুলো সদর শহরের ডাক্তারখানায় দিলাম। চিঠি লিখে দিলাম একটা—তাদের লোক এলে দিয়ে দিবেন। শেষ কথা বললে—দয়া ধর্ম একবার যখন করেছি, তখন আর এর জের মিটবে না। এ আর বন্ধ হবে না। সুতরাং এখানে আর থাকা চলবে না।

হেডমাস্টার স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

দীর্ঘকাল পরে হেডমাস্টার একখানা চিঠি পেলেন। ডাক্তার লিখেছে। মৃত্যুশয্যায় লেখা চিঠি—ডাক্তারের মৃত্যুর পর একজন উকিল চিঠিখানা রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়েছে—ডাক্তারের অভিপ্রায় অনুযায়ী। বৃদ্ধ হেডমাস্টার পড়ে গেলেন। সুদীর্ঘ চিঠি। লিখেছে—মাস্টার মশাই, যে কথা আপনার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের দিনে শেষ করে বলে আসতে পারি নি, আজ সেই কথা সম্পূর্ণ অকপট চিত্তে জানালাম সুসমাপ্ত করে। কথাটা—মানুষের পুণ্যের, আমার পাপের। মনে আছে, আপনাকে বলেছিলাম উপকারের ঋণ মারাত্মক ঋণ, আর মানুষ বড় ভালো—এ ঋণ শোধ করতে জীবন পর্যন্ত দিতে পারে? এক বিন্দু অতিরঞ্জন করি নি।

মাস্টার মশাই, আমার তখন তরুণ বয়স, অফুরন্ত উদ্যম, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দীন-দুঃখী অনাথ-আতুরের সেবা করে বেড়াতাম।

মানুষের দুঃখে সত্যই বুক ফেটে যেত, চোখে জল আসত। বিশ্বাস করুন, এক বিন্দু কপটতা ছিল না। প্রবলের অত্যাচার, জমিদারের জুলুম, পুলিশের অন্যায় শাসন, মহাজনের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করতাম তাদের। ভয় কাউকে করতাম না। তাদের স্নেহ করতাম সর্বান্তঃকরণে। মানুষেরও কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না, অকপট—অপরিমেয় কৃতজ্ঞতা। দেবতার মত ভক্তি করত, আমার পায়ে কাঁটা ফুটলে তারা দাঁত দিয়ে তুলে দিত। ছেলেরা অসঙ্কোচে পরমাত্মীয়ের

মত আমার কাছে এসে দাঁড়াত। যুবকেরা ক্রীতদাসের আনুগত্য নিয়ে আমার মুখের কথার অপেক্ষা করত। বৃদ্ধেরা এসে বসত, বলত—আমার পায়ের ধুলো পেলে তাদের সর্বপাপ মোচন হবে, পরলোকে সদ্গতি হবে। পথ দিয়ে চলে যেতাম—কিশোরী, যুবতী, বৃদ্ধা, কন্যা, বধূরা শ্রদ্ধা-দীপ্ত অসঙ্কোচ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে চেয়ে থাকত। আমার মনে হত মাস্টার মশাই, সত্যিই আমি নেমে এসেছি দেবলোক থেকে– তরুণ দেবতা আমি।

তারা অপরিসীম কৃতজ্ঞতায়—আমার কাছে নৈবেদ্যের মত নিয়ে আসত তাদের দৈনন্দিন জীবনের শ্রেষ্ঠ আহরণগুলি—ফুল-ফল, দুধ-মাছ। মাস্টার মশাই, শ্রেষ্ঠ বস্তু এনে তারা আমার দরজায় দাঁড়াত, দেবমন্দিরে যেমন ভাবে তারা দিয়ে আসে তাদের সর্ব বস্তুর অগ্রভাগ।

মাস্টার মশাই, হঠাৎ সব বিষিয়ে উঠল। অনিবার্য পরিণতিই বলব একে! জীবন-সমুদ্র মন্থন করতে গেলে বিষ উঠবেই। আমার ছিল না নীলকণ্ঠের শক্তি। মাস্টার মশাই, এ ভাবে অমৃতের লোভে জীবন-সমুদ্র মন্থন করবার অধিকারী আমি ছিলাম না। যাক, যা ঘটেছিল তাই জানাই। সেবার রথযাত্রা উপলক্ষে যাত্রীদল গিয়েছিল শ্রীক্ষেত্রে। তারা ফিরে এল কলেরা নিয়ে। একটি দরিদ্র পরিবার ছিল দলের মধ্যে। প্রৌঢ় বাপ, প্রৌঢ় মা আর বিধবা যুবতী কন্যা। বাপ পথে মারা গিয়েছিল, কন্যাটির রোগ সবে দেখা দিয়েছে, এমন সময় এসে পৌঁছল তারা গ্রামে। কন্যাটি যায় যায়, মা আক্রান্ত হল। দুটি রোগীর মাঝখানে বসে রাত কাটালাম আমি। এতটুকু ত্রুটি করলাম না। পরিশ্রম সম্পূর্ণ সার্থক হল না, মা-টি মারা গেল। মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এল কন্যাটি। অনাথা মেয়েটি রোগমুক্ত হয়ে, নিরুপায় হয়ে চলে গেল তার মামার বাড়ি। মাস কয়েক পরে একদিন পথে যেতে হঠাৎ দেখা হল মেয়েটির সঙ্গে। স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে, বৈধব্যের নিরাভরণতার মধ্যে তার সকরুণ মূর্তিখানি বড় ভালো লাগল আমার। বললাম, এই যে, চমৎকার শরীর সেরেছে তোমার! বাঃ ভারি আনন্দ হল। ভারি ভালো লাগছে তোমাকে দেখে।

পরদিন সে এল কয়েকটা গাছের ফল নিয়ে।

দু দিন পর সে আবার এল তার নিজের হাতের তৈরি মিষ্টান্ন নিয়ে।

আবার একদিন সে এল কিছু ফুল নিয়ে। কয়েকটি দুর্লভ ফুল—সে ফুলের গাছ ওদের বাড়িতে ছিল। আমি অন্য কোথাও দেখি নি। মাস্টার মশাই, ওই ফুলের রূপ এবং গন্ধের মধ্যে ছিল বিষ।

মন আমার বিষিয়ে উঠল। তার মনে কি ছিল জানি না। কিন্তু আমার

মনে কামনার হলাহল যেন উথলে উঠল। সেই দিন রাত্রেই আমি গিয়ে দাঁড়ালাম তার জানলার নীচে। মৃদুস্বরে ডাকলাম। জানলা খুলে আমায় দেখে সে অবাক হয়ে গেল।

মাস্টার মশাই, সে প্রথমটা শিউরে উঠেছিল আমার প্রস্তাবে। কিন্তু আমার মধ্যে তখন প্রবৃত্তির আলোড়ন জেগে উঠেছে—কালবৈশাখীর ঝড়ের মত আমি বললাম, এই তোমার কৃতজ্ঞতা! সে খাতকের মতই দীনভাবে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে আমার বুভুক্ষিত প্রবৃত্তির কাছে। সেই যে জাগল ক্রূর প্রবৃত্তি, তার নিবৃত্তি আর হল না। শুধু আর আহুতি নিয়েই তৃপ্ত থাকতে পারলাম না। মানুষের সকৃতজ্ঞ চিত্তের আনুগত্যের সুযোগে বহুভোগের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। আমার কর্মের মর্মর খণ্ড থেকে এই মানুষগুলি তাদের কৃতজ্ঞতার পরিকল্পনায় গড়ে তুলেছিল যে দেবমূর্তি, আমার আত্মপ্রসাদের পূজায় সে দেবতা জাগল ক্ষুধা দিয়ে। মাস্টার মশাই, শয়তান ক্ষুধার্ত হয়ে মানুষকে আক্রমণ করলে—মানুষ তার সঙ্গে লড়াই করতে সাহস পায়, মানুষ বহু ক্ষেত্রে তাকে বধ করেছে, বহু দৃষ্টান্তই তার আছে। দেবতার ক্ষুধার্ত আক্রমণের মুখে মানুষ কিন্তু অসহায়। সেখানে তার কোনোক্রমেই নিস্তার নাই। আমার ক্ষুধার্ত দেবরূপ অবাধ গতিতে আদায় আরম্ভ করলে তার নৈবেদ্য—তার বলি।

আজ হয়ত আপনি মাস্টারি করেন না; যদি করেন, তবে অনুরোধ রইল—ছেলেদের দেবতা হবার উপদেশ দেবেন না। মানুষ—শুধু মানুষ হতে উপদেশ দেবেন। দেবতাকে পূজা করতেও উপদেশ দেবেন না। তার সঙ্গে লড়াই করবার মত সাহস দেবেন তাদের। তারা যেন—। যাক এসব কথা।

এর পর নিজেকে সংযত করতে চাইলাম; রাত্রির পর রাত্রি কাঁদলাম, উপবাস করলাম, তবুও—তবুও সংযত হল না প্রবৃত্তি। অনুশোচনারও অন্ত ছিল না। একদা মনকে স্থির করে সেবাব্রত ত্যাগ করে দেশে ফিরে এসে বিবাহ করলাম। আমার স্ত্রী সুন্দরী, গুণবতী, কিন্তু আশ্চর্য মাস্টারমশাই, তাকে ভালোবাসতে পারলাম না। আমি জানি, তাকে আমি ভালোবাসি নি। তাই তাদের কাছেও থাকতে পারি নি। প্রাকটিসের অজুহাতে একখান থেকে অন্যখানে ঘুরেছি। জীবনে রূঢ় হতে চেয়েছি, মানুষকে দূরে রাখতে চেয়েছি। কটু বলেছি নিষ্ঠুরের মত, কিছু আদায় করে পিশাচ হতে চেয়েছি—মানুষের কৃতজ্ঞতার ভয়ে। ক্রমে বহু পরিবর্তন হয়ে গেল জীবনে, আমার ভাষা ছিল মিষ্ট—হলাম রুক্ষভাষী, কথায় কথায় রাগ হতে আরম্ভ হল, তর্ক করা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু আসল পরিবর্তন হল না। সাপের বিষের থলি শূন্য করে

দিলেও আবার সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে ; দংশনের প্রবৃত্তিও তার যায় না মাস্টার মশাই। বার বার ঠকলাম। একবার কাউকে কৃতজ্ঞ হবার সুযোগ দিলে রক্ষা থাকত না। আমার অন্তরের সরীসৃপ জেগে উঠত। সেই সুযোগে সে প্রবেশ করতে চাইত তার ঘরে। তাই প্রাণপণে সংসারটাকে নিছক দেনা-পাওনার হিসেবের খতিয়ানের খাতায় পরিণত করতে চেয়েছি। কিন্তু পারি নি। হঠাৎ একদা আর আত্মসম্বরণ করতে পারতাম না। সেদিন সত্যই সৎপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই করুণায়—কর্তব্যের প্রেরণাতেই মানুষের দুঃখের ভাগ নিতাম। তারপর আর রক্ষা থাকত না। আরম্ভ হয়ে যেত আমার জীবনের জটিল খেলার নূতন দান।

আপনাদের ওখানে হঠাৎ একদিন কল থেকে ফিরবার পথে দেখলাম একটি দরিদ্র তাঁতীর ঘরে একটি ছোট ছেলের তড়কা হয়েছে। প্রায় শেষ অবস্থা। কান্নাকাটি পড়ে গেছে। আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না। অযাচিতভাবে গিয়ে শিশুটির আসন্ন বিপদ কাটিয়ে দিলাম। মন ভরে উঠল প্রসন্নতায়। সেদিন আপনি আমায় গান গাইতে শুনেছিলেন। আপনি বলার পূর্ব পর্যন্ত নিজে গান গেয়েও আমার সে সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল না। আমি সেদিন গাইছিলাম—'বহু যুগের ওপার থেকে আষাঢ় এল আমার মনে।' সেদিন হঠাৎ আপনার কথায় চেতনা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেয়েছিলাম আমার ভবিষ্যৎ। ছেলেটির মাকে মনে পড়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। মনে পড়ে গিয়েছিল, আসন্ন বিপদাশঙ্কায় বিহ্বল মায়ের অসম্বৃত বেশবাসের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিতে পড়া তার দেহের কথা।

মাস্টার মশায়, সমস্ত রাত্রি সমস্ত দিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে জিতেছিলাম। অজগরকে ঝাঁপিতে পুরে ওখান থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম।

মৃত্যুর পরপার যদি থাকে, তবে সেখানে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল ভাবে আপনি আমার সম্বন্ধে কি বলেন শোনবার প্রতীক্ষা করব। বলবেন।

মাস্টারমশাই দুটি হাত তুলে আপন মনে বললেন, নমস্কার।

আখড়াইয়ের দীঘি

কয়েক বৎসর পর পর অজন্মার উপর সে বৎসর নিদারুণ অনাবৃষ্টিতে দেশটা যেন জ্বলিয়া গেল। বৈশাখের প্রারম্ভেই অন্নাভাবে দেশময় হাহাকার উঠিল। রাজসরকার পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সত্যই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কি না তদন্তের জন্য রাজকর্মচারী-মহলে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল।

এই তদন্তে কান্দী সাব-ডিভিসনের কয়টা থানার ভার লইয়া ঘুরিতেছিলেন রজতবাবু ডি. এস. পি., সুরেশবাবু ডেপুটি, আর রমেন্দ্রবাবু কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর। অতীতকালের সুপ্রশস্ত বাদশাহী সড়কটা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া গো-পথের মত মানুষের অব্যবহার্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের ঠিকাদার মাটির ঢেলা বিছাইয়া পথটিকে আরও দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে কোনোরূপে তিনজনে এক পাশের পায়ে-চলা পথরেখার উপর দিয়া বাইসিক্ল ঠেলিয়া চলিয়া ছিলেন।

বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণবেলা। দগ্ধ আকাশখানা ধূলাচ্ছন্ন ধূসর হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও কণামাত্র মেঘের লেশ নাই। হু-হু করিয়া গরম বাতাস পৃথিবীর বুকের রস পর্যন্ত শোষণ করিয়া লইতেছিল। একখানা গ্রাম পার হইয়া সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর আসিয়া পড়িল। ও-প্রান্তের গ্রামের চিহ্ন এ-প্রান্ত হইতে দৃষ্টিতে ধরা দেয় না। দক্ষিণে বামে শস্যহীন মাঠ ধূ-ধূ করিতেছে। গ্রামের চিহ্ন বহু দূরে দিগ্বলয়ে কালির ছাপের মত বোধ হইতেছিল।

রজতবাবু চলিতেছিলেন সর্বাগ্রে। তিনি ডাকিয়া কহিলেন—নামছি আমি। আপনারা ঘাড়ের উপর এসে পড়বেন না যেন।

তিনজনেই বাইসিক্ল হইতে নামিয়া পড়িলেন। সঙ্গীরা কোনো প্রশ্ন করিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন, কই মশাই, সামনে গ্রামের চিহ্ন যে দেখা যায় না। এদিকে দিবা যে অবসানপ্রায়।

রমেন্দ্রবাবু কোমরে ঝুলানো বাইনাকুলারটা চোখের উপর ধরিয়া কহিলেন, দেখা যাচ্ছে গ্রাম, কিন্তু অনেক দূরে। অন্তত পাঁচ-ছ মাইল হবে।

রজতবাবু রিস্টওয়াচটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—পৌনে ছটা। এখনও আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার দিনের আলো পাওয়া যাবে। কিন্তু এদিকে যে বুক মরুভূমি হয়ে উঠল মশাই। আমার ওয়াটার ব্যাগে তো একবিন্দু জল নেই। আপনাদের অবস্থা কি?

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, আমারও তাই। সুরেশবাবু, আপনার অবস্থা কি? আপনি যে কথাও বলেন না, দৃষ্টিটাও বেশ বাস্তব জগতে আবদ্ধ নয় যেন। ব্যাপার কি বলুন তো?

সুরেশবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, সত্যি বর্তমান জগতে ঠিক মনটা নিবদ্ধ ছিল না। অনেক দূর অতীতের কথা ভাবছিলাম আমি।

রজতবাবু সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, অতীত যখন, তখন ইণ্টারেস্টিং নিশ্চয়, চাই কি রোমাণ্টিকও হতে পারে। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আর ভাবতে হবে না। উঠে পড়ুন গাড়িতে। গাড়িতে চলতে চলতেই আপনি গল্প বলতে শুরু করুন। আমরা শুনে যাই। কিন্তু এই চার-পাঁচ মাইল পথ কভার করবার মত গল্পের খোরাক হওয়া চাই মশায়!

সুরেশবাবু আপনার জলাধারটি খুলিয়া আগাইয়া দিয়া বলিলেন, আমার জল এখনও আছে। জল পান করে একটু সুস্থ হন আগে।

জলপানান্তে সুরেশবাবুকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়া রজতবাবু বলিলেন, আপনি কথক। আপনাকে আগে যেতে হবে।

সকলে গাড়িতে চড়িয়া বসিলেন।

সুরেশবাবু বলিলেন, আমাদের জলের চিন্তার কথা শুনেই কথাটা আমার মনে পড়ল।

পিছন হইতে রমেন্দ্রবাবু হাঁকিলেন, দাঁড়ান মশায়, দাঁড়ান। বাঃ, আমাকে বাদ দিয়ে গল্প চলবে কি রকম?···বেশ, এইবার কি বলছিলেন বলুন? একটু উচ্চকণ্ঠে কিন্তু।

সুরেশবাবু বলিলেন, যে রাস্তাটায় চলেছি আমরা এ রাস্তাটার নাম জানেন? এইটেই অতীতের বিখ্যাত বাদশাহী সড়ক। এ রাস্তায় কোনো পথিক কোনো দিন জলের জন্য চিন্তা করে নি। ক্রোশ-অন্তর দীঘি আর ডাক-অন্তর মসজিদ এ-পথের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল, দীঘিগুলি এখনও আছে—

বাধা দিয়া রজতবাবু প্রশ্ন করিলেন, ডাক-অন্তর মসজিদটা কি ব্যাপার?

—ডাক-অন্তর মসজিদের অর্থ হচ্ছে—এক মসজিদের আজানের শব্দ যত দূর পর্যন্ত যাবে, তত দূর বাদ দিয়ে আর একটি মসজিদ তৈরি হয়েছিল। এক মসজিদের আজান-ধ্বনি অপর এক মসজিদ থেকে শোনা যেত। একদিন ভাবুন —দেশদেশান্তরব্যাপী সুদীর্ঘ এই পথখানির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একসঙ্গে আজানধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠত। ওই—ওই দেখুন, পাশের ওই যে

ইটের স্তূপ—ওটি একটি মসজিদ ছিল। আর প্রতি ক্রোশে একটি দীঘি আছে তাই বলছিলাম, এ-রাস্তায় কেউ কখনও জলের ভাবনা ভাবে নি।

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, বাদশাহী সড়ক যখন, তখন কোনো বাদশাহের কীর্তি নিশ্চয়। কোন বাদশাহের কীর্তি মশাই ?

—ঠিক বুঝতে পারা যায় না। ঐতিহাসিকরা বলতে পারেন। তবে এ বিষয়ে সুন্দর একটি কিংবদন্তী এ দেশে প্রচলিত আছে। শোনা যায় নাকি কোনো বাদশাহ বা নবাব দিগ্বিজয়ে গিয়ে ফেরবার মুখে এক সিদ্ধ ফকিরের দর্শন পান। সেই ফকির তাঁর অদৃষ্ট গণনা করে বলেন—রাজধানী পৌছেই তুমি মারা যাবে। বাদশাহ ফকিরকে ধরলেন—এর প্রতিকার করে দিতে হবে। ফকির হেসে বললেন—প্রতিকার ? মৃত্যুর গতি রোধ করা কি আমার ক্ষমতা ? বাদশাহও ছাড়েন না। তখন ফকির বললেন—তুমি এক কাজ কর, তুমি এখান থেকে এক রাজপথ তৈরি করতে করতে যাও তোমার রাজধানী পর্যন্ত। তার পাশে ক্রোশ-অন্তর দীঘি আর ডাক-অন্তর মসজিদ তৈরি কর।

সুরেশবাবু নীরব হইলেন। রজতবাবু ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন, তারপর মশাই, তারপর ?

হাসিয়া সুরেশবাবু বলিলেন, তারপর বুঝুন না কি হল। আজকাল গল্প সাজেস্‌টিভ হওয়াই ভালো। বাদশাহ রাজধানী পৌছেই মারা গেলেন। কিন্তু কত দিন তিনি বাঁচলেন অনুমান করুন। এই পথ, এই সব দীঘি, এতগুলি মসজিদ তৈরি করতে যতদিন লাগে, ততদিন তিনি বেঁচে ছিলেন।

রজতবাবু বলিলেন, হাম্‌বাগ—বাদশাহটি একটি ইডিয়ট ছিলেন বলতে হবে। তিনি তো পথটা শেষ না করলেই পারতেন—আজও তিনি বেঁচে থাকতে পারতেন।

রমেন্দ্রবাবু গাড়ি হইতে নামিবার উদ্যোগ করিয়া কহিলেন—দাঁড়ান মশাই, এ পথের ধুলো আমি খানিকটে নিয়ে যাব, আর মসজিদের একখানা ইট।

সুরেশবাবু কহিলেন, আর একটা কথা শুনে তারপর। পথ তো ফুরিয়ে যায় নি আপনার।

রজতবাবু তাগাদা দিলেন, সেটা আবার কি ?

—এ দেশে একটা প্রবচন আছে, সেটার সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকা সম্ভব। পুলিশ-রিপোর্টে সেটা আছে—

রমেন্দ্রবাবু অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন, চুলোয় যাক মশাই পুলিশ-রিপোর্ট। কথাটা বলুন তো আপনি।

—তাড়া দেবেন না মশাই। গল্পের রস নষ্ট হবে। কথাটা হচ্ছে, 'আখড়াইয়ের দীঘির মাটি, বাহাদুরপুরের লাঠি, কুলীর ঘাঁটি।—এই তিনের যোগাযোগে এখানে শত শত নরহত্যা হয়ে গেছে। রাত্রে এ পথে পথিক চলত না ভয়ে। বাহাদুরপুরে বিখ্যাত লাঠিয়ালের বাস। কুলীর ঘাঁটিতে তারা রাত্রে এই পথের উপর নরহত্যা করত। আর সেই সব মৃতদেহ গোপনে সমাহিত করত আখড়াইয়ের দীঘির গর্ভে।

রজতবাবু বলিয়া উঠিলেন, ও, তাই নাকি? এই সেই জায়গা?

সুরেশবাবু উত্তর দিলেন, তার কাছাকাছি এসেছি আমরা।

রজতবাবু কহিলেন, এখনও পূজোর আগে এখানে চৌকিদার রাখবার ব্যবস্থা আছে।

—আর তার দরকার নেই বোধ হয়। এখন এরা শাসন মেনে নিয়েছে।

রমেন্দ্রবাবুর গাড়িখানি এই সময় একটা গর্তে পড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া পড়িয়া গেল। রমেন্দ্রবাবু লাফ দিয়া কোনোরূপে আত্মরক্ষা করিলেন। সকলেই গাড়ি হইতে নামিয়া আগাইয়া আসিলেন। গাড়িখানা তুলিয়া রমেন্দ্রবাবু বলিলেন, যন্ত্র বিকল। এখন ইনিই আমার ঘাড়ে চেপে যাবার মতলব করেছেন। একখানা চাকা ধাক্কায় বেঁকে টাল খেয়ে গেছে। আমাদের হাতের মেরামতের বাইরে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছিল। রজতবাবু অস্পষ্ট সম্মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এ যে মহাবিপদ হল সুরেশবাবু!

—কি করা যায়?

হাসিয়া সুরেশবাবু বলিলেন, পথপার্শ্বে বিশ্রাম। মালপত্র নিয়ে পেছনের গো-যান না এলে তো উপায় বিশেষ দেখছি নে।

আপনাকে বিপদের হেতু ভাবিয়া রমেন্দ্রবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তখনও গাড়িখানা লইয়া মেরামতের চেষ্টা করিতেছিলেন। রজতবাবু কহিলেন, ঘাড়ে তুলুন মশাই বাহনকে। একটা বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান নেওয়া যাক।

বাইসিক্লে ঝুলানো ব্যাগ হইতে টর্চটা বাহির করিয়া সুরেশবাবু সেটার চাবি টিপিলেন। তীব্র আলোক-রেখায় সম্মুখের প্রান্তর আলোকিত হইয়া উঠিল। অদূরে একটা মাটির উঁচু স্তূপ দেখিয়া সুরেশবাবু কহিলেন, এই যে, সম্মুখেই বোধ হয় আখড়াইয়ের দীঘি। চলুন, ওরই বাঁধাঘাটে বসা যাবে।

রজতবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, অতীত যুগের কত শত হতভাগ্য পথিকের প্রেতাত্মার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথাবার্তা অতি উত্তমই হবে।

এতক্ষণে হাসিয়া রমেন্দ্রবাবু কথা কহিলেন, আর বাহাদুরপুরের দু-একখানা লাঠির সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয়, সে উত্তমের পরে অযোগ্য মধ্যম হবে না। কি বলেন ?

কোমরে বাঁধা পিস্তলটায় হাত দিয়া রজতবাবু কহিলেন, তাতে রাজী আছি।

প্রকাণ্ড দীঘিটা অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া আছে। শুধু আকাশের তারার প্রতিবিম্বে জলতলটুকু অনুভব করা যাইতেছিল। চারি পাড় বেড়িয়া বন্য লতাজালে আচ্ছন্ন বড় বড় গাছগুলিকে বিকট দৈত্যের মত মনে হইতেছিল। চারিদিক অন্ধকারে থম-থম করিতেছে। দীঘিটার দীর্ঘ দিকের মধ্যস্থলে সে-আমলের প্রকাণ্ড বাঁধাঘাট। প্রথমেই সুপ্রশস্ত চত্বর। তাহারই কোল হইতে সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে জলগর্ভে। সিঁড়ির দুই পার্শ্বে দুইটি রানা। এক দিকের রানা ভাঙিয়া পাশেরই একটা সুগভীর খাদের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে।

ঘাটের চত্বরটির মধ্যস্থলে তিনজনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এক পাশে সাইকল তিনখানা পড়িয়া আছে। ছোট একখানা শতরঞ্জি রমেন্দ্রবাবুর গাড়ির পিছনে গুটানো ছিল, সেইখানা পাতিয়া রমেন্দ্রবাবু বসিয়া ছিলেন। পাশেই সুরেশবাবু আকাশের দিকে চাহিয়া শুইয়া আছেন। রজতবাবু শুধু চত্বরটায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

সুরেশবাবু বলিলেন, সাবধানে পায়চারি করবেন রজতবাবু। অন্যমনস্কে খাদের ভেতরে গিয়ে পড়বেন না যেন। দেখছেন তো খাদটা ?

হাতের টর্চটা টিপিয়া রজতবাবু বলিলেন, দেখছি।

আলোক-ধারাটা সেই গভীর গর্তে তিনি নিক্ষেপ করিলেন। সুগভীর খাদটার গর্ভদেশটা আলোকপাতে যেন হিংস্র হাসি হাসিয়া উঠিল। রজতবাবু কহিলেন, উঃ, এর মধ্যে পড়লে আর নিস্তার নেই। ভাঙা রানাটার ইটের ওপর পড়লে হাড় চুর হয়ে যাবে।

তিনি এদিকে সরিয়া আসিয়া নিরাপদ দূরত্ব বজায় করিলেন। আলোক নিবিবার পর অন্ধকারটা যেন নিবিড়তর হইয়া উঠিল। ওদিকে পশ্চিম দিকপ্রান্তে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্দীপ্তি চকিত হইয়া উঠিতেছিল। সুরেশবাবু নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, কে কি ভাবছেন বলুন তো ?

রমেন্দ্রবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, ওদিকে কি যেন একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে। কি বলুন তো ?

সঙ্গে সঙ্গে দুইটা টর্চের শিখা দীঘির বুক উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। রজতবাবু কহিলেন, কই ?

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, ওপারে ঠিক জলের ধারে। লম্বা মত—মানুষের মত কি ঘুরে বেড়াচ্ছিল বোধ হল।

সুরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন, দীঘির গর্ভের কোনো অশান্ত প্রেতাত্মা হয়ত।

—কিংবা বাহাদুরপুরের লাঠিয়াল কেউ।

রজতবাবু কহিলেন, সে হলে তো মন্দ হয় না, একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়, সময় কাটে। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু হলেই যে বিপদ। যাদের সঙ্গে কথা চলে না মশাই—সাপ বা জানোয়ার? ওটা কি?

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাঁ-হাতের টর্চটা জ্বলিয়া উঠিল। ডান হাত তখন পিস্তলের গোড়ায়। সচকিত আলোয় দেখা গেল সেটা একগাছা দড়ি।

সুরেশবাবু বলিলেন, গুড লাক!—রজ্জুতে সর্পভ্রমে লজ্জা আছে, বিপদ নেই। কিন্তু সর্পে রজ্জুভ্রম প্রাণান্তকর।

সকলেই হাসিলেন। কিন্তু সে হাসি মৃদুমন্থর। আনন্দ যেন জমাট বাঁধিতেছিল না।

আবার সকলেই নীরব।

অকস্মাৎ দীঘির ওদিকের কোণে জল আলোড়িত হইয়া উঠিল।

শব্দে মনে হয়, কেহ যেন জল ভাঙিয়া চলিয়াছে। টর্চের আলো অত দূর পর্যন্ত যায় না। আলোক-ধারার প্রান্তমুখে অন্ধকার সুনিবিড় হইয়া উঠে, কিছু দেখা গেল না।

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, এখনও বলবেন আমার ভ্রম!

সুরেশবাবু কথার উত্তর দিলেন না। তিনি নিবিষ্টচিত্তে শব্দটা লক্ষ্য করিতেছিলেন। শব্দটা নীরব হইয়া গেল।

সুরেশবাবু আরও কিছুক্ষণ পর বলিলেন, ভ্রমই বোধ হয়। জলচর কোনো জীবজন্তু হবে।

গরম বাতাসের প্রবাহটা ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া চারিদিকে একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

সুরেশবাবু আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—নাঃ, শুধু রমেন্দ্রবাবুকে দোষ দেব কেন—আমরা সকলেই ভয় পেয়েছি। সিগারেট খাওয়া পর্যন্ত ভুলে গেছি মশাই! নিন, একটা করে সিগারেট খাওয়া যাক।

রজতবাবু বলিলেন, না মশাই, একেই আমি অভ্যস্ত নই, তার ওপর খালি-পেটে শুকনো গলায় সহ্য হবে না, থাক।

—আসুন তবে রমেনবাবু, আমরা দুজনেই—ও কি?

মানুষের মৃদু কণ্ঠস্বরে তিনজনেই চকিত হইয়া উঠিলেন।

কে যেন আত্মগত ভাবেই মৃদুস্বরে বলিতেছিল, তারা, তারাচরণ! এইখানেই তো ছিল। কোথা গেল?

রজতবাবুর হাতের টর্চটা প্রদীপ্ত রশ্মিরেখায় জ্বলিয়া উঠিল।

রমেনবাবু ত্রস্ত স্বরে বলিলেন, এদিকে, এদিকে, ভাঙা রানাটার পাশে জলের ধারে। ওই, ওই। কিন্তু দপ দপ করে জ্বলছে কি? চোখ কি?—ওই—ওই—

দীর্ঘ রশ্মিধারা ঘুরিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরেশবাবুর টর্চটাও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। জলের ধারে দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যমূর্তি দাঁড়াইয়া ছিল। আলোকচ্ছটার আঘাতে চকিত হইয়া সে রশ্মির উৎস লক্ষ্য করিয়া মুখ ফিরাইল। রমেন্দ্রবাবু অস্ফুট চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন। সুরেশবাবুর হাতের টর্চটা নিবিয়া গিয়াছিল। অদ্ভুত অতি ভীতিপ্রদ সে মূর্তি!

দীর্ঘ বিবর্ণ চুল, দীর্ঘ দাড়িগোঁফে সমস্ত মুখখানা আচ্ছন্ন, অস্বাভাবিক দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ দেহখানা কর্দমলিপ্ত। কোটরগত জ্বলন্ত চোখ দুইটিতে আলো পড়িয়া ঝকঝক করিতেছিল। সে মূর্তি ধরণীর সর্বমাধুর্য বর্জিত, মাটির জগতের বলিয়া বোধ হয় না।

রজতবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তবুও তিনি কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কে? কে তুমি? উত্তর দাও! কে তুমি?

নিথর নিস্তব্ধ মূর্তির পেশীগুলি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে অধররেখা ভিন্ন হইয়া গেল। সে ভঙ্গিমা যেমন হিংস্র, তেমনি ভয়ঙ্কর।

রজতবাবু আকাশ লক্ষ্যে পিস্তলটার ঘোড়া টিপিলেন। সুগভীর গর্জনে নিবিড় অন্ধকার চমকিয়া উঠিল। বৃক্ষনীড়াশ্রয়ী পাখির দল কলরব করিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত আর একটা গর্জনে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। একটা বিকট হিংস্র গর্জন করিয়া সেই বিকট মূর্তি লাফ দিয়া ছুটিয়া আসিল। সে মূর্তি তখন জানোয়ারের চেয়ে হিংস্র—উন্মত্ত। রজতবাবুর বাঁ-হাতের টর্চটা হাত হইতে পড়িয়া গেল। ডান হাতে পিস্তলটা কাঁপিতেছিল। অন্ধকারের মধ্যে গুরুভার কিছু পতনের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আহত পশুর মত একটা আর্তনাদ ধ্বনিয়া উঠিল।

রজতবাবু কহিলেন, সুরেশবাবু, শীগগীর চর্টটা জ্বালুন। আমারটা কোথায় পড়ে গেছে।

সুরেশবাবুর হাতের আলোটা জ্বলিয়া উঠিল।

রজতবাবু কহিলেন, এখানে আসুন—খাদের মধ্যে।

খাদের মধ্যে আলোকপাত করিতেই রজতবাবু বলিলেন, মানুষই, কিন্তু মরে গেছে বোধ হয়। ঘাড় নিচু করে পড়েছে, ঘাড় ভেঙ্গে গেছে।

সুরেশবাবু ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—ভগ্ন ইষ্টকস্তূপের মধ্যে হতভাগ্যের মাথাটা অর্ধ-প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। যন্ত্রণার আক্ষেপে ঊর্ধ্বমুখে সমগ্র দেহখানা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। উপর হইতে রমেন্দ্রবাবু সভয়ে কাহাকে প্রশ্ন করিলেন, কে? ও কি? কিসের শব্দ?

ক্ষণিক মনোযোগসহকারে শুনিয়া সুরেশবাবু কহিলেন—গাড়ি। গরুর গাড়ির শব্দ।

গন্তব্য থানায় পৌছিতে বাজিয়া গেল বারোটা।

তিনটি বন্ধুতেই নীরব। একটা বিষণ্ণ আচ্ছন্নতার মধ্যে যেন চলাফেরা করিতেছিলেন। শবদেহটা গাড়িতে বোঝাই হইয়া আসিয়াছে।

সেটা নামানো হইলে রজতবাবু সাব-ইন্সপেক্টরকে বলিলেন, লোকটাকে এখানকার কেউ চিনতে পারে কি না দেখুন তো?

মুখাবরণ মুক্ত করিয়া দারোগা চমকিয়া উঠিলেন।

রজতবাবু প্রশ্ন করিলেন, চেনেন আপনি?

—না। কিন্তু এ কি মানুষ?

জমাদার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল—আমি চিনি স্যার। এ একজন দ্বীপান্তরের আসামী। আজ দিন দশেক খালাস হয়ে বাড়ি এসেছে। সেদিন এসেছিল থানায় হাজিরা দিতে। বাহাদুরপুরের লোক, নাম কালী বাগদী।

—বেশ। তা হলে রিপোর্ট লেখ। একটা গামছায় বাঁধা কোমরে ওর কি কতকগুলো ছিল—দেখতো সেগুলো কি?

অনুসন্ধানে বাহির হইল একখানা কাপড়, ছোট ঘড়ি একটা, কয়খানি কাগজ। কাগজগুলি একটা মোকদ্দমার নথি ও রায়। নথিগুলিতে বহরমপুর জেলের ছাপ মারা—জেল-গেটে জমা ছিল। সঙ্গে একখানি চিঠি, হাইকোর্টের কোনো উকিলের লেখা—এরূপভাবে দণ্ডাদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য আপীল করা অস্বাভাবিক ও আমাদের ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিজনক। সেইজন্য ফেরত পাঠানো হইল।

রজতবাবু নথিটা পড়িয়া গেলেন—

সেন্সর কোর্টের নথি। ১৯০৮ সালের ৫নং খুনী মামলার ইতিহাস। সম্রাট বাদী, আসামী কালীচরণ বাগদী—

অভিযোগ ঃ আসামী তাহার পুত্র তারাচরণ বাগদীকে হত্যা করিয়াছে। সাক্ষী তিনজন।

প্রথম সাক্ষী মোবারক ; মোল্লা। এই ব্যক্তি বাহাদুরপুরের নান্‌কাদার, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। এই ব্যক্তিকে সরকার পক্ষের উকিল প্রশ্ন করেন—কালীচরণ বাগদীকে আপনি চেনেন ?

উত্তর—হ্যাঁ। এই আসামী সেই লোক।

—কি প্রকৃতির লোক কালীচরণ ?

—দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল।

—আপনার সঙ্গে কি কালীচরণের কোনো ঝগড়া আছে ?

—না। সে আমার ওস্তাদ। আমি তার কাছে লাঠিখেলা শিখেছি।

—তারাচরণ বাগদীকে আপনি জানতেন ?

—হ্যাঁ। ওস্তাদ কালীচরণেরই ছেলে সে।

—আচ্ছা, এটা কি ঠিক যে, কালীচরণ তারাচরণকে ভালো দেখতে পারত না ?

—না। তবে ছেলেবেলায় তারাচরণ খুব রুগ্ন দুর্বল ছিল বলে ওস্তাদের ছেলেতে মন উঠত না। বলত, বেটাছেলে যদি বেটাছেলের মত না হয়, তবে সে ছেলে নিয়ে করব কি ?

—তারপর, বরাবরই তো সেই রকম ভাব ছিল ?

—না। তারাচরণ বারো-তেরো বছর বয়স থেকে সেরে উঠে জোয়ান হতে আরম্ভ হলে ওস্তাদের চোখের মণি হয়ে উঠেছিল সে।

—কালীচরণ কি তারাচরণকে আখড়ায় মারত না ?

—হ্যাঁ, ভুল করলে ওস্তাদের হাতে কারও রেহাই ছিল না, নিজের ছেলে বলে দাবির ওপর—

—থাক ও-কথা। আচ্ছা, আপনি কি জানেন, কুলীর ঘাঁটিতে রাত্রে পথিক খুন হয় ?

—জানি। শুনেছি বহুকাল থেকে—বোধ হয় একশ বছর ধরে এ কাণ্ড ঘটে আসছে।

—কারা এ সব করে জানেন ?

—না।

—শোনেন নি ?

—বহুজনের নাম শুনেছি।

—আপনাদের গ্রামের বাগদীদের নাম—এই কালীচরণ, তার পূর্বপুরুষ—এদের নাম শুনেছেন কি ?

—শুনেছি।

সরকারপক্ষের উকিল সাক্ষীকে আর জেরা করিতে ইচ্ছা করেন না।

দ্বিতীয় সাক্ষী এলোকেশী বাগদিনী। মৃত তারাচরণ বাগদীর স্ত্রী। বয়স আঠারো বৎসর।

প্রশ্ন—এই আসামী কালীচরণ তোমার শ্বশুর ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা বাপু, তোমার স্বামীর সঙ্গে কি তোমার শ্বশুরের ঝগড়া ছিল ?

—না।

—কখনও ঝগড়া হত না ?

—ঝগড়া হত বইকি! কতদিন টাকা-পয়সা নিয়ে ঝগড়া হত। কিন্তু তাকে ঝগড়া বলে না।

—কিসের টাকা-পয়সা নিয়ে ঝগড়া ?

—খুনের, ডাকাতির। আমার শ্বশুর, আমার স্বামী মানুষ মারত। ডাকাতিও করত।

—কেমন করে জানলে তুমি ?

—বাড়িতে শাশুড়ীর কাছে শুনেছি, আমার স্বামীর কাছে শুনেছি, এদের বাপ-বেটার কথাবার্তায় বুঝেছি। আর কতদিন রক্তমাখা টাকা-গয়না জলে ধুয়ে পরিষ্কার করেছি।

—তোমার স্বামী তারাচরণকে কে খুন করেছে জান ?

—জানি। আমার শ্বশুর খুন করেছে। আমি নিজে চোখে দেখেছি।

বিচারক প্রশ্ন করেন—তুমি নিজের চোখে খুন করা দেখেছ ?

—হ্যাঁ, হুজুর, সমস্ত দেখেছি।

বিচারক আদেশ করেন—কি দেখেছ তুমি ? আগাগোড়া বল দেখি ?

সরকার পক্ষের উকীলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বন্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইল।

সাক্ষীর উক্তি :

—হুজুর, শ্রাবণ মাসের প্রথমেই আমি বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। শ্রাবণের আটাশে আমার ছোট বোনের বিয়ে ছিল। আমার স্বামী পঁচিশে তারিখে সেই বিয়ের নিমন্ত্রণে এখানে আমার বাপের বাড়িতে আসে। আরও অনেক কুটুম্ব-স্বজন এসেছিল। জাত-বাগদী আমরা হুজুর, সকলেই আমাদের লাঠিয়াল।

আর ছোট জাতের আমোদ-আহ্লাদে মদই হল হুজুর প্রধান জিনিস। বড় বড় জোয়ান সব দিবারাত্র মদ খেয়েছে আর ঘাঁটি-খেলা খেলেছে!

বিচারণ প্রশ্ন করেন—ঘাঁটি খেলা কি?

—হুজুর, ডাকাতি করতে গিয়ে যেমন লাঠি খেলে, গেরস্তর ঘর চড়াও করে বাইরের লোককে আটকে রাখে, সেই খেলার নাম ঘাঁটি-খেলা। সেই খেলা খেলতে গিয়ে আমার স্বামীর সঙ্গে আমার দাদার ঝগড়া হয়। তিন তিন বার আমার দাদার ঘাঁটি ভেঙে দিয়ে বলেছিল—এ ছেলেখেলা ভালো লাগে না বাপু। মনের রাগে দাদা রাত্রে খাবার সময় আমার স্বামীর কুলের খোঁটা তুলে অপমান করে। আমার ননদ নীচ জাতের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই নিয়ে কুলের খোঁটা। স্বামী আমার তখনই উঠে পড়ে সেখান থেকে চলে আসে। আমার সঙ্গে দেখা করে নি হুজুর, তাহলে তাকে আমি সেই অন্ধকার বাদল রাতে বেরুতে দিতাম না। আমি যখন খবর পেলাম তখন সে বেরিয়ে চলে গেছে। আমি আর থাকতে পারলাম না—থাকতে ইচ্ছাও হল না। যে মরদ স্বামীর জন্য আমার সমবয়সীরা আমাকে হিংসে করত, তার অপমান আর সহ্য হল না। আর আমাকে সে যেমন ভালোবাসত—

সাক্ষী এই স্থলে কাঁদিয়া ফেলে। কিছুক্ষণ পর আত্মসম্বরণ করিয়া আবার বলিল, অন্ধকার বাদল রাত্রি সেদিন—কোলের মানুষ নজর হয় না এমনি অন্ধকার। পিছল পথ, বারবার পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলাম। গ্রামের বাইরে এসে আমি চীৎকার করে ডাকলাম—ওগো, ওগো! ঝিপ ঝিপ করে বৃষ্টির শব্দ আর বাতাসের গোঙানিতে সে শব্দ সে বোধ হয় শুনতে পায় নাই। শুনলে সে দাঁড়াত—নিশ্চয় দাঁড়াত হুজুর। তবে আমি তার গলা শুনতে পাচ্ছিলাম। বাতাসটা সামনে থেকে বইছিল। সে গান করতে করতে যাচ্ছিল, বাতাসে সে গান পিছু দিকে বেশ ভেসে আসছিল।

সাক্ষী আবার নীরব হইল।

কিছুক্ষণ পরে সাক্ষী আবার আরম্ভ করিল:

—আমি প্রাণপণে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পিছল পথ, তাড়াতাড়ি চলবার উপায় ছিল না। সামনে থেকে জলের ফোঁটা কাঁটার মত মুখ চোখে বিঁধছিল। হঠাৎ একটা চীৎকারের শব্দ কানে পৌছল—বাবা, বাবা! শেষটা আর শুনতে পেলাম না। চিনতে পারলাম আমার স্বামীর গলা, ছুটে এগিয়ে যেতে গিয়ে পথে পড়ে গেলাম। উঠে একটু দূরে এগিয়ে যেতে দেখি, একজোড়া আঙরার মত চোখ ধক্‌ধক্‌ করে জলছে। এই চোখ দেখে চিনলাম, সে আমার শ্বশুর।

আমার শ্বশুরের চোখের তারা বেড়ালের চোখের মত খয়রা রঙের, সে চোখ আঁধারে জ্বলে। অন্ধকারের মধ্যে চলে চলে চোখে তখন অন্ধকার সয়ে গিয়েছিল, আমি তখন দেখতেও পাচ্ছিলাম। দেখলাম, আমার শ্বশুর একটা মানুষকে কাঁধে ফেলে আখড়াইয়ের দীঘির পাড় দিয়ে নেমে গেল। বুক ফেটে কান্না এল, কিন্তু কাঁদতে পারলাম না। গলা যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, চোখে যেন আগুন জ্বলছিল। আমিও তার পিছন নিলাম।

সাক্ষীকে বাধা দিয়ে বিচারক প্রশ্ন করিলেন, তোমার ভয় হল না?

সাক্ষী উত্তর দিল, আমরা বাগদীর মেয়ে। আমাদের মরদে খুন করে, আমরা লাস গায়েব করি হুজুর, আমরা লাস গায়েব করি। হুজুর, আমার হাতে যদি তখন কিছু থাকত তবে ঐ খুনেকে ছাড়তাম না।

সাক্ষী অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া কাঠগড়া হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া আসামীকে আক্রমণের চেষ্টা করে। তাহাকে ধরিয়া ফেলা হয় ও তাহার উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া সেদিনকার মত বিচার স্থগিত রাখিতে আদেশ দেওয়া হয়। সাক্ষী কিন্তু বলে যে, সে বলিতে সমর্থ এবং আর সে এরূপ আচরণ করিবে না।

সে কহিল—তারপর দীঘির গর্ভে দেহটাও পুঁতে দিলে সে, আমি দেখলাম। তখন পশ্চিম আকাশে কাস্তের মত এক ফালি চাঁদ মেঘের আড়ালে উঠেছিল। অন্ধকার অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। সেই আলোতে পরিষ্কার চিনতে পারলাম, খুনী আমার শ্বশুর! সে বাড়ির দিকে হনহন করে চলে গেল। আমি পিছু ছাড়ি নাই।

বাড়িতে এসে লাফ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে সে বাড়ি ঢুকল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। অল্পক্ষণ পরেই কে বুক ফাটিয়ে কেঁদে উঠল, চিনলাম সে আমার শাশুড়ীর গলা, কিন্তু একবার কেঁদেই চুপ হয়ে গেল—

এই সময় আসামী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—আমি তার মুখ চেপে ধরে-ছিলাম। হুজুর, আর সাক্ষী-সাবুদে দরকার নাই। আমি কবুল খাচ্ছি। আমিই আমার ছেলেকে খুন করেছি। হুকুম পেলে আমি সব বলে যাই।

বিচারক এরূপ ক্ষেত্রে বিবেচনা করিয়া আসামীকে স্বীকারোক্তি করিবার আদেশ দিলেন।

আসামী বলিয়া গেল, হুজুর, আমরা জাতে বাগদী, আমরা এককালে নবাবের পল্টনে কাজ করতাম। আজও আমাদের কুলের গরব—লাঠির ঘায়ে, বুকের ছাতিতে। কোম্পানির আমলে আমাদের পল্টনের কাজ যখন গেল, তখন

থেকে এই আমাদের ব্যবসা। হুজুর, চাষ আমাদের ঘেন্নার কাজ; মাটির সঙ্গে কারবার করলে মানুষ মাটির মতই হয়ে যায়। মাটি হল মেয়ের জাত। জমিদার লোকের বাড়িতে এককালে আমাদের আশ্রয় হত। কিন্তু কোম্পানির রাজত্বে থানা-পুলিশের জবরদস্তিতে তারাও সব একে একে গেল। যারা টিঁকে থাকল তারা শিং ভেঙে ভেড়া ভালোমানুষ হয়ে বেঁচে রইল। তাদের ঘরে চাকরি করতে গেলে এখন নীচ কাজ করতে হয়, গাড়ু বইতে হয়, মোট মাথায় করতে হয়, জুতো খুলিয়ে দিতেও হয় হুজুর। তাই আমরা এই পথ ধরি। আজ চার পুরুষ ধরে আমরা এই ব্যবসা চালিয়ে এসেছি। জমিদারের লগদীগিরি লোক-দেখানো পেশা ছিল আমাদের। রাত্রির পর রাত্রি চামড়ার মত পুরু অন্ধকারে গা ঢেকে কুলীর ঘাঁটিতে ওত পেতে বসে থেকেছি। মদের নেশায় মাথার ভেতরে আগুন ছুটত। সে নেশা ঝিমিয়ে আসতে পেত না। পাশেই থাকত মদের ভাঁড়। সেই ভাঁড়ে চুমুক দিতাম। অন্ধকারের মধ্যে পথিক দেখতে পেলে বাঘের মত লাফ দিয়ে উঠতাম। হাতে থাকত ফাবড়া—শক্ত বাঁশের দু-হাত লম্বা লাঠি, সেই লাঠি ছুঁড়তাম মাটির কোল ঘেঁষে। সাপের মত গোঙাতে গোঙাতে সে লাঠি ছুটে গিয়ে পথিকের পায়ে লাগলে আর তার নিস্তার ছিল না। তাকে পড়তেই হত। তারপর একখানা বড় লাঠি তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চেপে দাঁড়াতাম, আর পা দুটো ধরে দেহটা উল্টে দিলেই ঘাড়টা ভেঙে যেত।—

এই সময় একজন জুরি অজ্ঞান হইয়া পড়ায় আদালত সেদিনকার মত বিচার বন্ধ রাখিতে আদেশ দিলেন।

—পরদিন বিচারক ও জুরিগণ আসন গ্রহণ করিলে আসামী বলিতে আরম্ভ করিল—

কত মানুষ যে খুন করেছি তার হিসেব আমার নেই। সে-সময়ে কোনো কথা কানে আসে না হুজুর। তাদের কাতরানি যদি সব কানে আসত, মনে থাকত হুজুর, তাহলে সত্যি পাথর হয়ে যেতাম। মনে পড়ে শুধু দুটি দিনের কথা। যেদিন আমার বাপের কাছে আমি হাতেখড়ি নিই, আর আমি আমার ছেলে তারাচরণকে যেদিন হাতেখড়ি দিই, এই দুদিনের কথা মনে আছে। সরল বাঁশের কোঁড়ার মত দীঘল কাঁচা জোয়ান তখন তারাচরণ। অন্ধকার রাত্রে শিকারের গলায় দাঁড়িয়ে বললাম, দে, পা-দুটো ধরে ধড়টা ঘুরিয়ে দে। সে থরথর করে কেঁপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি শিকার শেষ করলাম, কিন্তু মনটা কেমন সেদিন হিম হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল, প্রথমদিন আমিও এমনি করে কেঁপেছিলাম। তারপর হুজুর, অভ্যাসে সব হয়—ক্রমে ক্রমে তারা আমার

হয়ে উঠল গুলিবাঘ। পালকের মত পাতলা গা—পাথরের মত শক্ত ছাতি—শিকার পথের উপর পড়লে আমি যেতে না-যেতে সে গিয়ে কাজ শেষ করে রাখত। ঘটনার দিন হুজুর—

আসামী নীরব হইল। সে পানীয় জল প্রার্থনা করিল। জল পান করিয়া সে কহিল—সেদিনের সে ভুল তারাচরণের, আমার ভুল নয়। তবে সে আমার ভাগ্যের দোষ। আর নয়তো যাদের খুন করেছি, তাদের অভিসম্পাতের ফল। তবে এ যে হবে এ আমি জানতাম—আমার বাবা বলেছিল, আমাদের বংশ থাকবে না—নির্ব্বংশ হতেই হবে।

আবার আসামী নীরব হইল। আসামী কাতর হইয়া পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া আদালত কিছুক্ষণ সময় দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আসামী তাহা চাহে না। সে কহিল—আমার শেষ হয়েছে হুজুর। তবে আর একটু জল। পুনরায় জলপান করিয়া সে বলিয়া গেল—

—সেদিন তারার আসবার কথা নয়। কুটুম্ববাড়িতে বিয়ের নেমন্তন্নে গিয়ে বিয়ের রাত্রেই সে চলে আসবে এ ধারণা আমি করতে পারি নাই হুজুর। সেদিন অন্ধকার রাত্রি। ঝিপ ঝিপ করে বাদলও নেমেছিল। আমার বউমার কাছে শুনেছেন, আমার চোখ অন্ধকারে বেড়ালের মত জ্বলে। আমার চোখেও আমি সেদিন ভালো দেখতে পাচ্ছিলাম না। সর্বাঙ্গ ভিজে হিম হয়ে যাচ্ছিল। আমি ঘন ঘন মদের ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। দু-পহর রাত পর্যন্ত শিকার না পেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠে আসছি—এমন সময় কার গানের খুব ঠাণ্ডা আওয়াজ শুনতে পেলাম। বাতাস বইছিল আমার দিক থেকে। আওয়াজটা বাতাস ঠেলে উজানে ঠিক আসছিল না। সেদিন হাতে পয়সাকড়ি কিছু ছিল না। মানুষের সাড়া পেয়ে মদের ভাঁড়ে চুমুক মেরে অভ্যেসমত লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে চলন্ত মানুষ নড়ছিল—মারলাম ফাবড়া। লাস পড়ল। চীৎকার করে সে কি বললে কানে এল না। ছুটে গিয়ে গলায় লাঠি দিয়ে উঠে দাঁড়াব, শুনলাম, বাবা—বাবা—আমি—

কথাটা কানেই এল, কিন্তু মনে গেল না, তার গলা আমি চিনতে পারলাম না। লাঠির ওপরে দাঁড়িয়ে বললাম—এ সময়ে বাবা সবাই বলে।

আসামী নীরব হইল। আবার সে বলিল—পেয়েছিলাম আনা-ছয়েক পয়সা আর তার কাপড়খানা।

আবার সে নীরব হইল। কিন্তু মিনিট খানেকের মধ্যেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

রায়ে বিচারক দণ্ডাদেশের পূর্বে লিখিয়াছেন—যুগ-যুগান্তরের সাধনায় মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখার নির্দেশ করিয়াছে। তাঁহার নামে সৃষ্টি ও সমাজের কল্যাণে অন্যায় ও পাপের রোধহেতু দণ্ডবিধির সৃষ্টি হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রতিভূস্বরূপ বিচারক সেই বিধি অনুসারে অন্যায়ের শাস্তি-বিধান করিয়া থাকেন। এই ব্যক্তির যে অপরাধ, বর্তমান রাষ্ট্রতন্ত্রের দণ্ডবিধিতে তাহার যোগ্য শাস্তি নাই। এ ক্ষেত্রে একমাত্র চরমদণ্ডই বিধি। আমার স্থির বিশ্বাস, সেইজন্যই সমগ্র বিশ্বের অদৃশ্য পরিচালক তাহার দণ্ডবিধান স্বয়ং করিয়াছেন; চরমদণ্ড এ ক্ষেত্রে সে গুরুদণ্ডকে লঘু করিয়া দিবে। ঈশ্বরের নামে বিচারকের আসনে বসিয়া তাঁহার অমোঘ বিধানকে লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস ইহার শাস্তি বিহিত হইল।

রায় শেষ হইয়া গেল।

তিনজনেই নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। মনের বিচিত্র চিন্তাধারার পরিচয় বোধ হয় প্রকাশ করিবার শক্তি কাহারও ছিল না।

অকস্মাৎ রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, একটা কথা বলব সুরেশবাবু?

মৃদুস্বরে সুরেশবাবু বলিলেন, বলুন।

—পুলিশ এক্‌জিকিউটিভ আপনারা দুজনেই তো এখানে রয়েছেন। দেহটা আর মর্গে পাঠাবেন না। ওই আখড়াইয়ের দীঘির গর্ভেই ওকে শুয়ে থাকতে দিন।

ম তি লা ল

'চোত-পরব' অর্থাৎ গাজনের সঙ বাহির হইয়াছিল। ঢাক-ঢোল বাজাইয়া শোভাযাত্রার মধ্যে বাবা বুড়োশিবের দোলা চলিয়া গেল, তাহার পিছনে পিছনে সঙের দল চলিতেছিল। একজন বাজিকর সাজিয়াছে, সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড বড় ভালুক, একটা হনুমান; বাজিকরের বগলে একটা সাপের ঝাঁপি। এই বাজিকরের পিছনেই যত ছেলের ভিড়। কৌতুকের সীমা নাই, অথচ ভয়ও আছে, একটু দূরে দূরে কোলাহল করিতে করিতে তাহারা চলিয়াছে। ভালুকটা প্রকাণ্ড বড় —বোধ হয় বুড়া—গায়ের রোঁয়াগুলো অনেকস্থলে উঠিয়া গিয়াছে, ছেলের পাল

সেটাকে লক্ষ্য করিয়াই বাজিকরের অলক্ষ্যে ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়িতেছিল। বুড়া ভালুকটা কয়েকবার এমনই ভাবে আঘাত পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গোঁ-গোঁ করিয়া উঠিল। সভয়-কৌতুকে ছেলের দল এদিকে-ওদিকে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। ভালুকটা খিলখিল করিয়া হাসিয়া আবার বাজিকরের সঙ্গে চলিতে লাগিল।

ছেলেদের দলের অগ্রগামী পার্বতী তাহার পার্শ্বচর মদনকে বলিল, মানুষ রে, মানুষ—হাসছে। সেজেছে।

মদন বলিল, ধেৎ! নারায়ণবাবুদের কাছারীতে জ্বরে কাঁপছিল, দেখিস নি? ভালুক না হলে জ্বর আসে—কাঁপে? গাঁজা খেলে—

চোটা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্যামগোপালবাবুর বৈঠকখানাটা সম্মুখেই, সেখানে তখন শ্যামগোপালবাবু ইউনিয়ন বোর্ডের খাতাপত্র দেখিতেছিলেন। বাজিকরের হনুমানটা 'উপ্' শব্দে লাফ দিয়া দাওয়ার উপর উঠিয়া বসিল, ভালুকটা প্রণাম করিয়া ধপ করিয়া সেইখানে পড়িয়া জ্বরে কাঁপিতে আরম্ভ করিল। হনুমানটা প্রেসিডেণ্টবাবুকে দাঁত দেখাইয়া ঘন ঘন চোখ মিটমিট করিতে আরম্ভ করিল।

শ্যামবাবু অল্প একটু হাসিয়া বলিলেন, বেশ বেশ! ওবেলায় এসে পয়সা নিয়ে যাস।

বাজিকর জোড়হাত করিয়া বলিল, আজ্ঞে, এই বেলাতেই পেলে—

শ্যামবাবু বলিলেন, যা বেটা, দেখছিস না এখন সরকারী কাজ করছি?

বাজিকর আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, সে প্রণাম করিয়া ফিরিল।

শ্যামবাবুর খোট্টা চাপরাসীটা পাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, আরে ভাল্‌কো তো বহুৎ লড়াই করে রে, দেখে তেরা কেমন ভাল্‌কো।—বলিতে বলিতে সে ধাঁ করিয়া ভালুকটাকে বেশ কায়দা করিয়া জাপটাইয়া ধরিল। অতর্কিত আক্রমণে ভালুকটা বেকায়দায় নিচে পড়িয়া গেল।

বাজিকর চটিয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল, ই কি করেন তোমার সিংজী? বলেহার বেটা, বলেহার বেটা ভালুক রে!

ভালুকটা নিজের অসতর্ক অবস্থা তখন অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে। চারিদিকে দর্শক জমিয়া গিয়াছিল। সম্মুখেই দাঁড়াইয়া পার্বতী আর মদন যুধ্যমান ভালুক ও চাপরাসীটার প্যাঁচ-কষাকষির সঙ্গে আপন আপন দেহ লইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিতেছিল, কখনও দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া বলিতেছিল দে—দে—দে!

শুধু মদন আর পার্বতী নয়, ওরূপ ধারায় মুখভঙ্গি করিতেছিল আরও অনেকে, মায় শ্যামগোপালবাবু পর্যন্ত। ভালুকটা যখন চাপরাসীটাকে চিত

করিয়া ফেলিয়া দিল, তখন তিনি ধনুকের মত বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দর্শকরা হাসিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় হনুমানটা চট করিয়া উঠিয়া পরাজিত চাপরাসীটার মুখের উপর বাঁ পায়ের একটা মৃদু লাথি মারিয়া দিয়া দর্শকদের একবার দাঁত দেখাইয়া দিল। দর্শকের মধ্যে হাসির একটা হাঁড়ি যেন সশব্দে ফাটিয়া পড়িল। পার্বতী পথের উত্তপ্ত ধুলার উপরেই একটা ডিগবাজি মারিয়া দিল।

চাপরাসীটা অপমানে চটিয়া উঠিয়াছিল, শ্যামবাবুও চটিয়াছিলেন; কিন্তু এতগুলি লোকের সহানুভূতির বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। শুধু গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিলেন, হনুমান সেজেছে ওর নাম কিরে? কানে ধর তো বেটার, এই চৌকিদার!

ভিড়ের মধ্য হইতে কে বলিয়া উঠিল, আসছে বারে ভোট দোব না কিন্তু।

অত্যন্ত রুষ্টকণ্ঠে শ্যামবাবু কহিলেন, কে?

বক্তা আসিয়া সম্মুখে জোড়হাতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, প্রভু, আমি।

শ্যামবাবু ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, বক্তা তাঁহার এক আত্মীয় এবং বন্ধু—হবুকাকা।

শ্যামবাবু কহিলেন, এস এস, তামাক খাও খুড়ো।

হবুকাকা বলিলেন, যা যা সব, যা এখন।

সঙের দল চলিয়া গেল। সমস্ত গ্রামখানা ঘুরিয়া বাজিকর যখন শিবতলায় ফিরিল, তখন বেলা প্রায় চারিটা। দর্শকদলের বেশি কেহ আর তখন সঙ্গে ছিল না, শুধু পার্বতী তখনও পিছন ছাড়ে নাই। গাজনের পাণ্ডা হরিলাল পাত্র দাওয়ায় দাঁড়াইয়াছিল, বিরক্তিভরে সে বলিল, ওঃ, আমোদ তোদের আর শেষই হয় না। নে বাপু, নৈবিদ্যি নিয়ে যা।

সঙ্গে সঙ্গে হনুমান, ভালুক, বাজিকর এক এক গামছা খুলিয়া বসিল। হরিলাল সের খানেক করিয়া চাল, কয়টা কলা ও সামান্য কয়েকখানা বাতাসা বিতরণ করিয়া দিয়া বলিল, এইবারে আমি খালাস বাবা।

পার্বতী আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল, সে আরও আশ্চর্য হইয়া গেল, যখন বাজিকর জানোয়ার দুইটাকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। হনুমানটাও এক দিকে চলিয়া গেল, ভালুকটাও পাশের গ্রামের পথ ধরিল। ভয়ে সে দূরত্ব একটু বাড়াইয়া দিয়া নাচিতে নাচিতে ভালুকটার পিছন ধরিল।

খানিকটা মাঠ পার হইয়াই 'মৌলকিনী' পুকুর, ভালুকটা পুকুরের ঘাটে

নামিয়া বসিল, তারপর হাত পা মুখ ও দেহ হইতে একে একে খোলসগুলি ছাড়াইতে আরম্ভ করিল।

পার্বতীর আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না,—তাহার অনুমানই সত্য হইয়াছে। সে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, মানুষই বটে, মানুষই বটে, ওরে বাবা রে!

শব্দ শুনিয়া ভালুক তাহার দিকে চাহিয়া পরমানন্দে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছিল। কিন্তু সে কি ভীষণ মূর্তি! হাঁড়ির মত প্রকাণ্ড মাথা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, আলকাতরার মত কালো রঙ, নাকটা থ্যাবড়া, চোখ দুইটা আমড়ার আঁটির মত গোল এবং মোটা, দুই গালের থলথলে মাংস খানিকটা করিয়া চোয়ালের নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মুখগহ্বরের পরিধি আকর্ণ-বিস্তৃত। সেই মুখগহ্বর মেলিয়া বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া সে হাসিতেছিল, দেখিয়া পার্বতী সভয়ে ছুটিয়া পলাইল। ভালুক তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, ও খোকাবাবু, ও খোকাবাবু!

পার্বতী একবার দাঁড়াইয়া ফিরিয়া চাহিল। ভয় অপেক্ষা বিস্ময়ের মাত্রা তাহার অনেক গুণ অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। এত লম্বা এত মোটা আর এত কালো লোক সে কখনও দেখে নাই। সমস্ত গা বাহিয়া কালো আঠার মত কি ঝরিতেছে! বুকও গুরগুর করিতেছিল, ভালুক, না ভূত? না, তাহার চেয়েও বেশি মেলে গয়লাদের কাদামাখা মহিষগুলার সঙ্গে। লোকটা একখানা বাতাসা হাতে তুলিয়া তখনও তেমনই হাসিতে হাসিতে ডাকিতেছিল, পেসাদ, পেসাদ, শিবের পেসাদ।

পার্বতী সভয়ে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল, ভালুকের কথা শুনিয়া সে দুই পা পিছাইয়া গেল। ভালুক এবার কয় পা তাহার দিকে আগাইয়া আসিল, আরও খানিকটা বেশি হাসিয়া বলিল, ভয় কি খোকাবাবু, এস।

পার্বতী নিমেষের মধ্যে পিছন ফিরিয়া ছুটিল এবং পথপার্শ্বের জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। ভালুক হাসিতে হাসিতে ঘাটে ফিরিয়া নৈবেদ্যের পুঁটলিটা খুলিয়া বসিল।

সবসুদ্ধ গামছাটা জলে ভিজাইয়া লইয়া চাল কলা ও বাতাসায় মাখিয়া প্রকাণ্ড বড় বড় গ্রাসে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ করিয়া ফেলিল। উচ্ছিষ্টলোভী কয়টা কাক দূরে বসিয়াছিল, শূন্য গামছাখানা সে বার কয়েক তাহাদের দিকে সজোরে ঝাড়িয়া দিয়া বলিল, ওই লে, ওই লে।—তারপর গামছাখানা জলে কাচিয়া লইয়া ভালুকের পোশাক ঘাড়ে ফেলিয়া সে পথ

ধরিল। ডোমপাড়ায় পৌঁছিয়া একটা বাড়িতে ঢুকিয়া ডাকিল, ভোবন, আজ যে মজা, বুঝলি কিনা!

'ভোবন' অর্থাৎ ভুবনমোহিনী ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, জ্বালাস না আমাকে আর, আপন জ্বালাতে বলে মলাম আমি! ভাতের হাঁড়িটা নামা দেখি।

ভুবনমোহিনী ওই লোকটির যেন ছায়া বা দর্পণের মধ্যের নারীরূপিণী প্রতিবিম্ব। অমনই কালো, অমনই দৈর্ঘ্যে, অমনই পরিধিতে। মাথার সম্মুখেই সিঁথি জুড়িয়া একটা টাক, প্রকাণ্ড বড় মুখের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র দুইটা চোখ, লম্বা নাক, তাহার উপর উপরের ঠোঁটের এক পাশের খানিকটা মাংস নাই, সে দিক দিয়া দুইটি দাঁত নিচের ঠোঁটের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে।

ভালুকের পোশাকটা ঘাড় হইতে ফেলিয়া পুরুষটি ভাতের হাঁড়ি নামাইতে চলিল।

ভুবন বলিল, আমার মাথা বলে খসে গেল? ওষুধ নাই, পত্তর নাই, আর বাঁচব না আমি।—ও মা!

পুরুষটি কোনো উত্তর দিল না, কোথা হইতে একটা পোড়া বিড়ি বাহির করিয়া উনানের আগুনে সেটাকে ধরাইতে বসিল। ভুবন তাহার কাছে আসিয়া বসিল, তু ঘরে বসে থাকবি কেনে, বল? একা মেয়েমানুষ আমি কত রোজগার করব?

ভালুক নিজের কনুইটা দেখিতে দেখিতে বলিল, তাই বলি, জ্বলছে কেনে? মাস ছেড়ে গিয়েছে দলকাছাড়া হয়ে।

তারপর ভুবনের দিকে চাহিয়া বলিল, বাবুদের ওই খোট্টা চাপরাসী বেটা আচমকা আমাকে চেপে ধরে কায়দা করে ফেলিয়েছিল আর টুকচে হলে।

ভুবন বলিল, ত্যাল লাগা খানিক।—বলিয়াই সে মাটির উপর শুইয়া পড়িল, আঃ, গা-গতর যেন ঢেঁকিতে কুটছে!—বাবা!

ভালুকের কথা তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিতেছিল, তেমনই দিয়েছি বেটাকে ঠিক করে। আমাকে পারবে কেনে বেটা, আমার ক্ষ্যামতায় আর—

মুখের কথা কাড়িয়া ভুবন বলিল, তাই তো বলছি, ওই ক্ষ্যামতায় খাটলে যে রোজকার হয়! আচ্ছা, কেন খাটিস না, বল দেখি?

ভালুক বলিল, উ গাঁয়ে একটি কি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে, বুঝলি ভোবন—

ভুবন ভুলিল না, সে বাধা দিয়া বলিল, তোর ভাত আমি যোগাতে পারি? খাটুনিকে এত ভয় কিসের তোর?

—ভয় আবার কি?

—তবে ?

নিজের বিশাল দেহের দিকে চাহিয়া ভালুক কহিল, খাটতে গেলে গতর দেখে সব। বলে, গতর দেখ আর খাটছে দেখ। খুঁড়ে খুঁড়ে আমার গতর কমে গেল। উঁহু, উ সব হবে না। দত্ত-কাকা বলেছে, কলকাতার যাত্রার দলে ঢুকিয়ে দেবে আমাকে।

এ কথা ভুবনের বহুবার শোনা কথা। বহু কাণ্ড এই লইয়া হইয়া গিয়াছে ; ভুবন চুপ করিল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ যেন তাহার কি মনে পড়িয়া গেল, সে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সঙ সাজলি, তার পয়সা কই, লৈবিদ্যি কই ?

ভালুক বলিল, পয়সা এখনও ভাগা হয় নাই।

—লৈবিদ্যি ? বলি, লৈবিদ্যি কি হল ?

ভালুক ডাকিল, আয় আয় গোবরা, আয়।

গোবরা এক বিশালকায় কুকুর, এ পরিবারটির উপযুক্ত জীব। শুধু গোবরা নয়, গোবরগণেশ উহার নাম। খায় দায় ঘুমায়, চোর আসুক, ডাকাত আসুক —কোনো আপত্তি নাই তাহার, সে কাহাকেও কিছু বলে না।

ভুবন সরোষে বলিল, বলি, লৈবিদ্যি কি হল ?

—খেয়ে দিয়েছি। যে ক্ষিদে, বাবাঃ !

ভুবন আবার শুইয়া পড়িয়া কাতরাইতে লাগিল। ভালুক ভাতের হাঁড়িটা নামাইয়া ফেলিয়া বলিল, আজ আর ক্ষিদে বেশি নাই। লৈবিদ্যি খেয়ে ক্ষিদে পড়ে গেল।

ভুবন বলিল, আমি টাকা দোব, তু গরু কেন এক জোড়া, ভাগে চাষ—

ভালুক মধ্যপথেই ভুবনকে বাধা দিয়া বলিল, ধেৎ! টাকা টাকা করেই মরবি তু। ছেলে নাই, পিলে নাই, দুটো পেট শুধু ; বেশ তো চলছে।

ভুবন বলিল, হা রে মুখপোড়া গাঁদা মোষ, বলি—খেটে খেটে যে আমার গতর পড়ে গেল!

ভালুক হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তোর গতরের এক সরষেও কমে নি ভোবন। দাঁড়া, একখানা বড় আরশি এনে দোব তোকে। একটা টাকা দিস দেকি নি।

হাতের কাছেই পড়িয়া ছিল একটা শুকনা গাছের ডাল, ভুবন স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া সজোরে সেটাকে ছুঁড়িয়া মারিল। ভালুক কিন্তু ভুবনের মতলব পূর্বেই বুঝিয়াছিল, সে একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। ডালটা বোঁ শব্দে ডাক ছাড়িয়া উঠানের পেয়ারাগাছে প্রতিহত হইল।

ভালুক হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতেই বলিল, ওইটো যদি লাগত ভোবন! শেষে তো তোকেই ত্যাল মালিশ করতে হ'ত।

ভুবন বলিল, ওই ছিরিতে আর দাঁত বার করে হাসিস নে বাপু। আহা-হা!

ভালুক হা-হা করিয়া হাসিয়া ঘরখানা ভরাইয়া দিল।

ভুবনও না হাসিয়া পারিল না, সেও সলজ্জভাবে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

কথাটা পুরাতন দিনের কথা।

ভালুকের নাম মতিলাল, জাতিতে সে হাড়ী। এ গ্রামের বাসিন্দা তাহারা নয়; এখান হইতে ক্রোশ পাঁচেক দূরে তাহার পৈতৃক বাস। এ গ্রামে তাহার মাতুলালয়; নিঃসন্তান মাতুলের ভিটায় সে ভুবনকে লইয়া বৎসর-খানেক আসিয়া বাস করিতেছে।

ভুবন কিন্তু এই গ্রামের মেয়ে। তাহাদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী ভুবনের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় প্রথম বিবাহ হয়। তখন তাহার ঠোঁটের পাশটা কাটা ছিল না।

বৎসর দশেক বয়সের সময় গাছে গাছে ঝাল্লু খেলিতে গিয়া ঠোঁট কাটিয়া দাঁত বাহির হইয়া গেল। তখন সে ছিল লম্বা, কিন্তু ছিপছিপে পাতলা। এগারো বৎসর বয়স হইতেই দেহে তার জোয়ার ধরিতে আরম্ভ হইল। তখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর। সেবার জামাইষষ্ঠীতে বাপ তাহার জামাই লইয়া আসিল। জামাইটি দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়, সচরাচর নিম্নশ্রেণীর জোয়ান যেমন হইয়া থাকে তেমনি। শাশুড়ী জামাইকে পরমাদরে বসাইয়া পা ধুইতে এক ঘটি জল নামাইয়া দিল। ভুবনের বাপ গিয়াছিল মাছের সন্ধানে। মাও তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল তেলের বোতল হাতে,—ভুবনের চুলটা বাঁধিয়া দিতে হইবে। ছেলেটি পা না ধুইয়াই এদিক-ওদিক চাহিতেছিল ভুবনের সন্ধানে। ঠিক এই সময়টিতে ভুবন আসিয়া বাড়ি ঢুকিল। কাঁখে এক প্রকাণ্ড বড় কলসী। গ্রাম হইতে মাইলখানেক দূরে ঝরনার জল আনিতে গিয়াছিল সে।

বাড়ি ঢুকিয়াই সে স্বামীকে প্রশ্ন করিল, কে বটিস রে তু, কোথা বাড়ি?

বাপের ফিরিবার কথা ছিল সন্ধ্যায়, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহারা দ্বিপ্রহরের পূর্বেই আসিয়া পড়িয়াছে। ভুবনের স্বামী অবাক হইয়া বিপুলকায়া ভুবনের কুৎসিত মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

ভুবন আবার প্রশ্ন করিল, রা কাড়িস না কেনে রে ছোঁড়া, কোথা বাড়ি তোর?

তেলের বোতল হাতে মা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, মাথায় কাপড় দে হারামজাদী, জামাই রয়েছে।

দারুণ লজ্জায় সহাস্থে পুরু জিবটা এতখানি বাহির করিয়া ভুবন তুমতুম শব্দে দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। মাও তাহার পিছন পিছন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বস, চুল বেঁধে দি তোর আগে। ও বাবা কানাই, হাত মুখ ধোও বাবা, শ্বশুর তোমার আইচে বলে।

অল্প কিছুক্ষণ পর ভুবনের বাপ মাছ হাতে বাড়ি ঢুকিয়া বলিল, কই, কোথা গেলি গো? কানাই কোথা গেল?

শাশুড়ী বাহিরে আসিয়া বলিল, এই হেতাই তো— কানাই, অ বাবা!

কেহ কোথাও ছিল না, জলের ঘটিটা পর্যন্ত তেমনই পূর্ণ অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া আছে। ধূলা পায়েই কানাই পলাইয়াছে।

সে আর আসে নাই, আবার সে বিবাহ করিয়াছে।

তাহার পর কত সম্বন্ধ যে ভুবনের বাপ করিল তাহার হিসাব নাই। কিন্তু ভুবনকে দেখিয়া সকলেই একরূপ পলাইয়া গেল।

ভুবনকে দেখিলেই পাড়ার ছেলেরা ফিক করিয়া হাসিত। ভুবন সে ব্যঙ্গ-হাসির জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিত। একদিন সে ক্রোধে আপনার কপালে নোড়ার ঘা মারিয়া রক্তে মুখ ভাসাইয়া ফেলিল।

মামার অসুখের সংবাদ পাইয়া মতিলাল সেদিন এই গ্রামে আসিয়াছিল। তখন তাহার তিনটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু গৃহ গৃহিণীশূন্য। গ্রামে ঢুকিবার পথেই ভুবনের সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। তাহার রূপের কারুকার্য দেখিয়া মতিলাল না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

ভুবন ঘৃণার সহিত বলিল, ওই ছিরিতে আর দাঁত বার করে হাসিস নে বাপু। আহা-হা!

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তাহার কয়েক দিন পরই ভুবনের সহিত মতিলালের বিবাহ হইয়া গেল। মতিলাল ভুবনকে লইয়া ধুমধামের সহিত আপনার ভিটায় গিয়া সংসার পাতিয়া বসিল। প্রথমদিনই সন্ধ্যায় সে ভুবনকে ডাকিয়া বলিল, শোন একটা কথা বলি।

সে আসিয়া বলিল, কি?

—বস, একটা জিনিস এনেছি, দেখ। তোকে কেমন সোন্দর করে দি, দেখ।

মতিলাল খানিকটা খড়ির মত সাদা গুঁড়া জলে গুলিতে বসিল। ভুবন আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, উ কি?

মতিলাল অহংকারভরে বলিল, যাত্রায় সব মুখে মাখে, দেখিস নাই ? কালো কুচ্ছিতও এতে সোন্দর হয়—বলিয়া সে ভুবনকে রঙ মাখাইতে বসিল। তারপর একটা আয়না মুখের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, দেখ।

ভুবন তাহার হাত হইতে আয়নাখানা টানিয়া লইয়া নিবিষ্ট চিত্তে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে বসিল। তারপর সহসা আয়নাখানা রাখিয়া দিয়া বলিল, আয়, তোকে মাখিয়ে দি আমি।

গম্ভীরভাবে মতিলাল বলিল, উঁহু, তু পারবি না। ই সব ভাগ-মাপ শিখতে হয়। দে, আমি মাখি।—বলিয়া সে নিজেই রঙ মাখিতে বসিল।

ভুবন কিন্তু অভিমান করিল। সেটুকু আবিষ্কার করিয়া মতিলাল বলিল, তোকে শিখিয়ে দোব, তু একদিন মাখিয়ে দিস।

ভুবন বলিল, তু কোথায় শিখেছিস, শুনি ?

মতিলাল হাসিয়া বলিল, যাত্রার দলে শিখেছি। তা ছাড়া আমি কত রকম সাজতে পারি বলে ! দেখবি ?

সে তাহার একটা ঝাঁপি খুলিয়া বাহির করিল, বস্তার তৈয়ারী ভালুকের খোলস, পেত্নী সাজিবার ছেঁড়া কাঁথা, আরও কত কি !

তাহার পর ক্রমশ ভুবন আবিষ্কার করিল, মতিলালের ওই পেশা। খাটুনির নাম নাই, খায়-দায় ঘুমায়, যাত্রার দলের ভার বয়, তামাক সাজে, আর মাঝে মাঝে সঙ সাজিয়া বেড়ায়।

ভুবন কিন্তু দারুণ পরিশ্রমী মেয়ে, শরীরে শক্তিও তাহার বিপুল ; সে ধান ভানিয়া, ঘুঁটে দিয়া, ঘাস বেচিয়া স্বচ্ছন্দ আহারের প্রাচুর্যে বিপুলকায় মতি-লালকে আরও স্ফীত এবং কুৎসিত করিয়া তুলিল, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও তাহাই হইয়া উঠিল। মতিলালকে সে অহরহ তিরস্কার করে রোজগারের জন্য। মতি-লালের সেই এক উত্তর—খাটতে গেলে গতরে লজর দেয় সব, উ হবে না। যাত্রার দলে এবার মাইনে হবে। আর ছেলেপিলে হোক, তখন না হয়—। ছেলে না হলে কি ঘর—! বলিয়া সে পুলকে হি-হি করিয়া হাসে।

ভুবন বলিল, হবে তো ছেলেপিলে।

মতিলালের মনে পুলক বাড়িয়া গেল, দাঁড়া, আজ মাদুলি এনে দোব তোকে।

মাদুলি সে আনিয়াও দিল, একটা নয়, একটা একটা করিয়া পাঁচ-ছয়টা মাদুলি ভুবনের বুকে এখন ঝোলে।

বেশ চলিতেছিল। কর্মপরায়ণা ভুবনের কর্মের মধ্যেই দিন কাটিয়া যাইত। সেদিন সহসা তাহার দৃষ্টিতে পড়িল, পুকুরের ধারে মতিলাল বসিয়া হি-হি করিয়া

হাসিতেছে, আর যাত্রার দলের কয়েকটা ছেলে তাহাকে কাদা মাখাইতেছে। একজনের কথাও তাহার কানে আসিল, সে মতিলালকে বলিতেছিল, গাঙের পলি যদি মাখতে পারিস, তবে রঙ ফরসা হবে নিশ্চয়। এতেও হবে তবে ফিটু গোরা হবে না।

সে কথার দিকে মতিলালের মন ছিল না। সে দূরের কতকগুলো ছোট ছেলের কথা শুনিয়া হাসিতেছিল।

তাহারা হাততালি দিয়া নাচিতেছিল আর সুর করিয়া গাহিতেছিল, আয় রে কালে মোষ, কাদা মাখবি বস।

ভুবনের অঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে মতিলালকেই ডাকিল, ও মুখপোড়া, বলি শোন।

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া আসিল।

যাত্রার দলের একজন বলিল, মাধব তাঁতীর লীলেবতী।

ক্রোধে ভুবনের চোখে জল দেখা দিল, মতিলাল কিন্তু হাসিয়া বলিল, বলুক কেনে; তোরও যেমন!

ইহার পর ক্রমশ ভুবন আবিষ্কার করিল, এ কথা এ গ্রামের সকলেই বলে, কর্মের ব্যস্ততার মধ্যে ভুবন এতদিন শুনে নাই, বা শুনিতে পায় নাই। ভুবন জেদ করিয়া বসিল, এখানে সে থাকিবে না। মতিলাল বলিল, মামার ভিটে তো মোটে এইটুকুন ছোট ঘর, ছেলেপিলে হলে কুলাবে কেনে?

ভুবন বলিল, ঘর করে লিবি, অত বড় হাঁদা মুনিষ।

প্রবল আপত্তি করিয়া মতিলাল বলিল, উঁহু, সি আমি পারব না। বাবা, ঘর তুলা কি সোজা কথা!

ভুবন তবু মানিল না, সে বলিল, ঘরের খরচ আমি দিব! আর বাবা আছে, দাদা আছে—

বাধ্য হইয়া বৎসর খানেক পূর্বে মতিলাল মাতুলালয়ে আসিয়া বাস আরম্ভ করিল। ভুবনের চেষ্টায় ও অর্থে ঘর হইয়াছে। মতিলাল এখানকার পাঁচালির দলে এখন তামাক সাজে। দত্ত-কাকার দরবারে নিয়মিত হাজিরা দেয়, দত্ত-কাকা তাহাকে কলিকাতার যাত্রার দলে চাকরি করিয়া দিবেন। ভুবন যেমন খাটিত, তেমনই খাটে। তাহার পরিশ্রমে এখানেও স্বচ্ছন্দ সংসার, কোনো অভাব নাই। বলিতে ভুলিয়াছি, এখন ঘরের কাজ, ভাত রাঁধা, জল তোলা, এগুলি মতিলালকে করিতে হয়! বাড়িতে পা দিলেই ভুবনের শরীরে অসুখ দেখা দেয়।

ওই চৈত্র সংক্রান্তির দিনই।

মতিলাল রান্নাবান্না শেষ করিয়া স্নান করিয়া আসিল। দুইখানা গামলায় হাঁড়ির ভাত ঢালিয়া ডাকিল, ভোবন, ওঠ।

ভুবন উঠিয়া বসিল। মতিলালের গামলার দিকে চাহিয়া বলিল, এই যে বললি, ক্ষিদে নাই আজ! চারটি ভিজিয়ে রাখলে কালকের মুড়ি আসান হত।

থাবা ভরিয়া গ্রাস তুলিতে তুলিতে মতিলাল বলিল, আবার লেগেছে ক্ষিদে।

ভুবন বলিল, তোর ওই কুকুরের ভাত আমার হেনসেল থেকে দোব না আজ। তোর ভাত থেকে তু দে। লইলে লৈবিঙ্খি আন।

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল, দেখবি, রেতে চেঁচাবে ক্ষিদেতে, ঘুম হবে না তোর।

ভুবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের দৃষ্টিতে যেন অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, নেতার মেরে দোব তাহলে আজ ওর।

মতিলাল সকাতর কণ্ঠে বলিল, আহা-হা ভোবন, কেষ্টের জীব! আর জানিস, তোর যখন ছেলে হবে, তখন দেখবি কত কাজ করে গোবরা!

ভুবন উষ্মাভরেই কহিল, কি, করবে কি শুনি?

—এই ছেলে শুয়ে থাকবে, গোবরা পাহারা দেবে, কাক তাড়াবে।

সত্য, গোবরগণেশের ওই গুণটি আছে, বাড়িতে কাক নামিতে দেয় না।

ভুবন শুধু বলিল, হুঁ।

মতিলালের দৃষ্টিতে পড়িল, পার্বতী ও মদন দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে! সে গাল ভরিয়া হাসিয়া বলিল, এই দেখ ভোবন, এই ছেলেটার কথা বলেছিলাম।

পার্বতী মদনকে বলিতেছিল, ওই দেখ।

ভুবন মুখ ফিরাইয়া তাহাদের দেখিয়া বলিল, এস খোকাবাবুরা, প্যায়রা আছে দোব, বস।

—ওরে বাবা রে, ধরবে ভাই!—বলিয়া মদন ছুটিয়া পলাইল।

পার্বতী তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। মতিলাল বলিল, প্যায়রা খাবে এস খোকাবাবু। যাবার সময় আমি হাতি সেজে পিঠে করে দিয়ে আসব তোমাকে—বলিয়াই সে মাটিতে হাত পাড়িয়া চতুষ্পদ সাজিয়া পার্বতীকে দেখাইল।

মদন পিছন হইতে ডাকিল, পালিয়ে আয় রে, ধরবে।—পার্বতী আর থাকিতে সাহস করিল না, পলাইল।

রদিন কিন্তু সকালেই তাহারা আসিয়া হাজির। ঢেঁকিশালে ভুবন ভুমদুম
ব্দে ধান ভানিতেছিল। মতিলাল দাওয়ায় বসিয়া মুড়ি খাইতেছিল।

দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া পার্বতী বলিল, ভালুক, প্যায়রা দিবি?

মুখে একমুখ মুড়িসুদ্ধই মতিলাল দাঁত বাহির করিয়া বলিল, এস এস,
খাকাবাবু এস।

মদন বলিল, ওখান থেকে ছুঁড়ে দে। তুই ভূত? সে রাক্কসী কই, সেই
াত বার করে?—বলিয়াই সে দাঁত বাহির করিয়া দেখাইয়া দিল।

মতিলাল হা-হা করিয়া হাসিয়াই সারা হইল।

–কে রে, খালভরা ছেলে!—ভুবন ঢেঁকিশাল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

পার্বতী ও মদন ছুটিয়া পলাইল। ভুবন আপন মনেই বকিতেছিল, ভদ্দ-
নাকের ছেলে, ভদ্দনোক সব, বাকিয় দেখ দেখি! ভূত, রাক্কুসী! অঃ!

মতিলাল তখন সবলে পেয়ারা গাছটাকে নাড়া দিতেছিল। সে হি-হি
রিয়া হাসিয়া বলিল, তুও যেমন ভোবন, বলুক কেনে!

ভুবন ঝঙ্কার দিয়া বলিল, না, বলবে কেনে, কিসের লেগে? ছেলের কথা
দখ দিকি নি!

গ্রামের ধারে দাঁড়াইয়া মদন তখন পার্বতীকে বলিতেছিল, না, যাস নি ভাই,
নিস নি রাক্কুসীর গল্প? ওরা ঠিক ভূত আর রাক্কুসী—মানুষ সেজে আছে।

—খোকাবাবু, ও খোকাবাবু, প্যায়রা নিয়ে যাও।—আঁচলে করিয়া পেয়ারা
ইয়া মতিলাল হাসিতে হাসিতে তাহাদের ডাকিতেছিল।

মদন বলিল, ওইখানে ঢেলে দে। তুই সরে যা।

মতিলাল হাসিয়া পেয়ারাগুলি ঢালিয়া দিয়া সরিয়া গেল।

পেয়ারাগুলি তুলিয়া লইয়া পার্বতী বলিল, ভালুক হয়ে যা দেখি, সেই
লকের মত।

মতিলাল হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল, দাঁড়াও তোমরা, আসছি আমি।

কয়েক মিনিট পরেই ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ শুনিয়া পেয়ারা খাইতে ব্যস্ত মদন ও
র্বতী দেখিল, ভালুক আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মদন প্রচণ্ড বেগে ছুটিল। পার্বতীও
াহার অনুসরণ করিল। ভালুক উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, অ খোকাবাবু!

হলে দুইটির সঙ্গে মতিলালের একটু আত্মীয়তা হইল, কিন্তু সে আত্মীয়তা
বিড় হইল না। তাহারা পেয়ারার জন্য রোজ আসে, কিন্তু মতিলালকে ধরা
ল না।

মতিলাল হাসিমুখে ডাকে, তাহারা খানিকটা সরিয়া গিয়া বলে, না।

মতিলাল তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে, কত সাজতে পারি আমি, তোমাদিগে দেখাব।

মদন বলে, ছাই ; বস্তা গায়ে দিয়ে! ভালুকের রোঁয়া নেই, যাঃ!

পার্বতী বলে, ভূত সাজতে পার ?

হাসিতে হাসিতে মতিলাল বলে, হুঁ। দুধ খাও তো ? না খেলে আমি ভূত সেজে ধরব।

—কই, সাজ দেখি ভূত।

—সেই ধরমপূজোর সময়। আর দেরি নাই।

—বাঘ সাজতে পার ?

—হুঁ।

—সব সাজতে পার তুমি ?

—হুঁ।

ভীত অথচ মুগ্ধ-বিস্ময়ে ছেলে দুইটি মতিলালের দিকে চাহিয়া থাকে।

মতিলাল ডাকে, শোন শোন, একটা কথা বলি।—সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই আগাইয়া আসে। ছেলে দুইটি সভয়ে ছুটিয়া পলাইয়া যায়।

ভুবন বলে, তোর যেমন আদিখ্যেতা! উ কি তোর স্বভাব ?

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া বলে, ওরা ভয় করে ; আমার ভারি ভালো লাগে ভোবন। আমি আবার বলি কি জানিস, দুধ খাও তো, না খেলে আমি ধরব! একদিন পেত্নী সাজব, দাঁড়া।

ভুবন বলিল, ভূত তো সেজেই আছিস, আর পেত্নী সাজতে হবে না বাপু, থাম।

মতিলালের হাসি আর থামিতে চায় না।

রাঢ় দেশ। বৈশাখ মাসে বুদ্ধ-পূর্ণিমায় ধর্মরাজের পূজা, নিম্নজাতির এক বিরাট উৎসব। মতিলালের গ্রামে—মহুগ্রামে ধর্মরাজের পূজার উৎসবে প্রচুর ধুমধাম হয়। মহুগ্রামের ধর্মদেবতা নাকি ভারি জাগ্রত। চার-পাঁচখানা গ্রামের নিম্নজাতির সকলেই এই ধর্মরাজের পূজা-অর্চনা করে। এবার উৎসবের আড়ম্বর খুব বেশী। পাশের বর্ধিষ্ণু গ্রামে স্বর্ণকাররা পাল্লা দিয়া নাকি উৎসব করিবে। এবার ঢাক আসিল ত্রিশটা। মহুগ্রামে বরাদ্দ হইয়াছে পঁয়ত্রিশটা। সংবাদট কিন্তু গোপন রাখা হইয়াছে। ও গ্রামের ভক্তের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ পূ

করিবার জন্য খুব চেষ্টা হইতেছে। মহুগ্রামের ভক্তের সংখ্যা ষাট ছাড়াইয়া গিয়াছে।

চুলওয়ালা দত্ত-খুড়োর সঙ্গে মতিলাল মহা উৎসাহে তদ্বির-তদারক করিতেছিল। দত্ত-খুড়ো বলিল, তুইও একজন ভক্ত হলি না কেন মতিলাল ?

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল, উপোস করতে লারব খুড়োমশায়। উ হবে না।

দত্ত-খুড়ো হাসিয়া বলিলেন, পেটটি না ভরলে মতিলালের আমার চলবে না, না কি বল মতিলাল ?

মতিলাল হাসিয়া বলিল, ভোবন কি বললে জানো ? বললে, প্যাটে ছুরি মার তু।

দত্ত বলিল, তা বেশ ! তোকে কিন্তু ইদিকের কাজ ডাক-হাঁক সব করতে হবে। বোলানের দল সব আনতে হবে। আর, সঙ এবার কিন্তু খুব আচ্ছা বঁঢিয়া রকমের হওয়া চাই।

মতিলাল একমুখ হাসিয়া বলিল, পাঁচ জুতো খাব, উ গাঁকে হারাতে না পারি তো।

সার্ধ দুই সহস্র বৎসরেরও পূর্বে যে তিথিতে অর্ধ-জগতের ধর্মগুরু মহামানব বুদ্ধ সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করিয়া নতুন করিয়া স্নানান্তে মরণ-পণে তপস্যায় বসিয়াছিলেন, সেই পূর্ণিমার ঠিক প্রথম লগ্নে উৎসবের প্রারম্ভ। সেই দিন হয়—মুক্তিস্নান।

দলে দলে ভক্তরা 'মুক্তচান' করিয়া উত্তরী পরিতেছিল। ঢাকের বাজনায় সচকিত পাখির দল কলরব করিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, কোনো স্থানে বসিতে তাহাদের সাহসই ছিল না। হনুমানের দলও দ্রুতবেগে বিপুল শব্দ করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতেছিল।

মতিলাল আপনার সঙের পোশাকের থলি বাহির করিয়া বসিয়াছিল, দুই টুকরা সোলাকে সে ধারালো ছুরি দিয়া চাঁচিতেছিল।

ভুবন বলিল, আ মরণ তোর, দেশের লোক গেল মুক্তচান দেখতে, আর পেটুক রাক্ষসের কাজ দেখ !

সাদা সোলা দুই টুকরা দুই গালে দুই দিকে পুরিয়া মতিলাল হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিল, ধঁরব, খাঁব তোঁকে।

ভুবনও দুই পা সরিয়া গিয়া বলিল, এই দেখ, ভালো হবে না বলছি।

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভুবন বলিল, দেখ দেখি, মানুষকে ভয় লাগিয়ে দেয়। খোল বাপু, তোর দাঁত খোল।

মতিলাল পরম পরিতুষ্ট হইয়া প্রশ্ন করিল, তোরও ভয় লাগল ভোবন?

ভুবন বলিল, হ্যাঁ, ভয় লাগতে আমার দায়! কিন্তু তু যে বললি, ধম্মরাজের মাদুলি এনে দিবি?

ট্যাঁক হইতে খুলিয়া মাদুলি বাহির করিয়া দিয়া মতিলাল বলিল, একটো পাঠা কিনে রাখতে হবে আবার। ছেলে হলে পাঁঠা লাগবে—দেবাংশী বলেছে।

পরদিন পূর্ণিমার অবসান-সময়ে ব্রতের উদ্‌যাপন। ঢাক-শিঙা কাঁসি-কাঁসর ঘণ্টা-শঙ্খ বাজাইয়া শোভাযাত্রা বাহির হইল। প্রথমেই একদল ঢাক ও বাদ্যভাণ্ড, তাহার পরেই শ্রেণীবদ্ধভাবে বারো-চৌদ্দ সারি ভক্তের দল ভাঁড়াল মাথায় করিয়া চলিয়াছে। ভাঁড়াল এক-একটি জলপূর্ণ মঙ্গল-কলস, কলসগুলির গলায় ফুলের মালা; ভক্তের দলেরও প্রত্যেকের গলায় মোটা মোটা কল্কে আউচ ও গুলঞ্চ ফুলের মালা। ভক্তদলের চারিপাশে সারি সারি ধুপদানি হইতে ধুপের ধোঁয়া উঠিতেছে। তাহারা ঢাকের বাজনার তালে তালে ভক্ত-নাচ নাচিয়া চলিয়াছে। আবার পিছনে একদল ঢাক। তাহার পিছনে দশখানা গ্রামের নিম্নশ্রেণীর নরনারী কাতারে কাতারে চলিয়াছে।

মহুগ্রামের ভাঁড়াল আসিয়া বর্ধিষ্ণু গ্রামখানায় প্রবেশ করিল। মহুগ্রাম এই গ্রামের বাবুদেরই জমিদারী, চিরকাল ভাঁড়াল এ গ্রামে আসে। রাস্তার দুই পাশের ঘরের দাওয়া ভদ্র নরনারীতে পরিপূর্ণ। ভাঁড়ালের দলের ভক্তদের সঙ্গে তালে তালে তাহাদেরই মত নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে কত ছেলে। তাহার মধ্যে অগ্রবর্তী পার্বতী ও মদন।

আপনাদের দাওয়া হইতে পার্বতীর মা ডাকিল, ওরে, ও হতভাগা, উঠে আয়। এই বোশেখ মাসের দুপুর-রোদ—উঠে আয়।

পার্বতী নাচিতে নাচিতেই মাকে এক ভেংচি কাটিয়া দিল।

সমস্ত দলের পিছনে একখানা ঢাকের বাদ্যধ্বনি অকস্মাৎ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ার্ত কলরব। পিছনের দিক হইতে ভিড় ভাঙ্গিয়া চতুর্দিকে সব ছুটিয়া পলাইতেছিল। বামন গুলপী বুড়ি মাত্র হাত দুই লম্বা, সে পলাইতে না পারিয়া একটা বাড়ির দেওয়ালে মুখ গুঁজিয়া মুদিত চোখে কাঠের মত লাগিয়া গেল।

ভয়েরই কথা। ঢাকের সম্মুখে তালে তালে নাচিতে নাচিতে আসিতেছি

—বিকট এক মূর্তি! মাথায় এক আঁটি খড়ে কালো রঙ মাখাইয়া পরচুলা পরিয়াছে, বিকটাকার মুখে দুই গালের পাশে গজদন্তের মত দুই দাঁত, রাজ্যের ছেঁড়া কাঁথা পরনে, জানু পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে দুই স্তন, সর্বোপরি ভয়াল তাহার দুই হাত—প্রত্যেকটি চার-পাঁচ হাত করিয়া লম্বা, এক হাতে এক ঝাঁটা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভক্তদল ও বাদ্যভাণ্ড ছাড়া রাস্তা পরিষ্কার হইয়া গেল। মদন যে কোথায় পলাইল, তাহার সন্ধান পার্বতী পাইল না। সে ছুটিয়া আসিয়া লুকাইল মায়ের পিছনে।

মাও ভয় পাইয়াছিল, তবু সে বলিল, যাবি, যাবি আর? ডাকব ঝাঁটা-বুড়িকে? শোন শোন, ও ঝাঁটাবুড়ি!

ঝাঁটাবুড়ি ঘুরিয়া দাঁড়াইল। পার্বতীকে ঠেলিয়া সম্মুখে আনিয়া মা বলিল, এই দেখ, রাস্তায় পেলেই ধরবি একে।

ঝাঁটাবুড়ি পরমানন্দে নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে বিচিত্র নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল সেইখানে।

হারুবাবুর মা খপ করিয়া পার্বতীর চোখ ও কপাল আবৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, পালাও, তুমি পালাও।

নাচিতে নাচিতে ঝাঁটাবুড়ি চলিয়া গেল।

হারুবাবুর মা তখন বলিতেছিলেন, জল—জল—পাখা—পাখা।

মতিলাল বাঁড়ুজ্জে-বাড়িতে বকশিশ পাইল দুই টাকা। বাবু ভারি খুশি হইয়াছিলেন। তিনি নিজে ভয়ে বু-বু করিয়া উঠিয়াছিলেন।

বাড়িতে সে তখন পোশাক ছাড়িতেছে, দত্ত-খুড়ো বাড়ি পর্যন্ত আসিয়া তারিফ করিয়া বলিলেন, খুব ভালো হয়েছে মতিলাল।

সবিনয়ে মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিল শুধু।

দত্ত বলিল, বামন গুলপী বুড়ি থাকতে থাকতে ধপাস করে পড়ে গেল। মুখুজ্জেদের পার্বতীর চেতন করাতে তো ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। আর বাঁড়ুজ্জে-কত্তা তো—

চমকিয়া উঠিয়া মতিলাল প্রশ্ন করিল, পার্বতীর চেতন হয়েছে?

দত্ত বলিলেন, হ্যাঁ তবে একটু বেগ পেতে হয়েছিল। ওর মায়ের যেমন—

পোশাক-পরিচ্ছদ সব পড়িয়া রহিল, মতিলাল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া পেয়ারার গাছ ঝরাইয়া এক কোঁচড়

পেয়ারা লইয়া সে বাহির হইয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিয়া কতকগুলো কি লইয়া চলিয়া গেল।

পার্বতী শুইয়াছিল, তাহার মা শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছিল। বাপ ফুলু মুখুজ্জে ক্রমাগত আপন মনে তিরস্কার করিতেছিল পত্নীকে, হুঁ, আক্কেল দেখ দেখি, হুঁঃ!

বাহির হইতে কে ডাকিল, বাবু!

—কে?—ফুলু মুখুজ্জে বাহিরে আসিয়া আঁতকাইয়া ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বাহির হইতে সাড়া আসিল, আজ্ঞে ভয় নাই, আমি মতিলাল। খোকাবাবুকে ডেকে দেন, ভালুক সেজে এসেছি আমি, ভালুক দেখলে তার ভয় ভেঙ্গে যাবে।

দরজা খুলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মতিলালের মাথায় পড়িল এক লাঠি। লাঠি মারিয়া মুখুজ্জে বলিল, বেরো শালা, বেরো।

এক লাঠিতে মতিলালের কিছু হইবার কথা নয়, হয়ও নাই; খানিকটা মাথার চামড়া কাটিয়া গিয়াছিল শুধু। পরদিন সে দত্ত-খুড়োর বাড়িতে বসিয়া প্রশ্ন করিতেছিল, না খেলে শরীর বাঁচবে, কাকামশায়? আর রঙ ফরসা হয় কি সাবানে, বলেন দেখি?

বেণী ডোম—চৌকিদার আসিয়া তাহাকে ডাকিল, তোকে ডাকছে মতিলাল, পেসিডেনবাবু।

—কেন?—মতিলাল অবাক হইয়া প্রশ্ন করিল।

বেণী বলিল, কাল তোকে লাঠি মারে নাই ফুলু মুখুজ্জে? তাই লালিশ-টালিশ করতে বলবে তোকে হয়ত।

মতিলাল হাসিয়া বলিল, উ আমার লাগে নাই বেনো জেঠা। লালিশ আবার করে নাকি—ওই লিয়ে?

—তা বলে আয় গিয়ে বাপু।

মতিলাল উঠিল। পথে ছেলের পাল সভয়-কৌতুকে দূরে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল, ঝাঁটাবুড়ি, ও ঝাঁটাবুড়ি!

মতিলাল হি-হি করিয়া হাসিতেছিল।

পথে নারাণবাবুর বাড়ির ভিতর কে বলিতেছিল, দুধ খাও সুকু, ডাকব ঝাঁটাবুড়িকে?

মতিলাল বিনা দ্বিধায় বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া একমুখ দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, দুধ খাও খোকাবাবু।

ছেলেটা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। মা ছেলেকে লইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া বলিল, বেরিয়ে যাও তুমি, বেরিয়ে যাও।

মতিলাল বাহির হইয়া আসিতেই বেণী জিজ্ঞাসা করিল, কি, হল কি তোর মতিলাল, অ্যাঁ? মতিলাল—মতে!

মতিলাল বাড়ি ফিরিল প্রহারজর্জরিত দেহে।

ভুবনের চোখে আজ জল দেখা দিল, সে তাড়াতাড়ি তেলের বাটি লইয়া বসিয়া বলিল, কি হল, কে মেলে?

মতিলাল ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিল, ছোট ছেলে আমাকে দেখে প্যাঙাসপারা হয়ে গেল ভোবন!

ভুবন প্রশ্ন করিল, কে, মেলে কে তোকে?

—পেসিডেনবাবুর চাপরাসী; গাঁ ঢুকতে বারণ হয়ে গেল, ছোট ছেলেতে ভয় পাবে আমাকে।—কণ্ঠস্বর তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল।

ভুবন চকিত হইয়া বলিল, ও কি, মাদুলি ধরে টানছিস কেনে, ওই?

পট করিয়া মাদুলির সুতা ছিঁড়িয়া লইয়া মতিলাল বলিল, আমাদের ছেলে আমাদেরই মত কুচ্ছিৎ হবে তো ভোবন! কাজ নাই।

পি তা - পু ত্র

আহ্নিক গতিতে পৃথিবী আবর্তিত হয়, দিনের পর রাত্রি আসে, রাত্রির পর হয় দিন, যুগের শেষে হয় যুগান্তর, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির কত রূপান্তর হয়। এই রূপান্তরের মধ্য দিয়া জগৎ চলে,—যুগের পথ-চলা। নিয়তির লীলার আকর্ষণেই হউক আর মানুষের ভবিষ্যৎ-সন্ধানী মনের চালনাতেই হউক, সমষ্টিগতভাবে মানুষ চলে, সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও চলিতে হয়। কিন্তু বিপ্রনান্দী গ্রামখানি যেন ইহার ব্যতিক্রম! অবশ্য গতিশীল জগতের সঙ্গে গ্রামখানির যোগসূত্রও যে অত্যন্ত ক্ষীণবল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বোলপুর রেল-স্টেশন বারো মাইল দূরে, মোটর-বাস বা ট্যাক্সি আসিবার রাস্তা পর্যন্ত নাই; কাঁচা রাস্তায় যানের মধ্যে সনাতনী পদ্ধতিতে গরুর গাড়ি কোনো রকমে চলে, আর বাহনের মধ্যে চলিতে পারে ঐ এক গরুই, ক্ষুর জোড়া বলিয়া কাদায় ঘোড়াও চলে না। কিন্তু গরুর

উপর মানুষের চড়া চলে না, কাজেই আপন চরণজোড়া ছাড়া অন্য বাহনও অচল। কিন্তু এই যোগসূত্রের ক্ষীণতাই ইহার হেতু নয়। কারণ এই অচলতার মধ্যে জড়তা গ্রামখানিকে স্পর্শ করে নাই, একটি অটল মহিমায় সে সূর্যকরদীপ্ত পাহাড়ের চূড়ার মত দাঁড়াইয়া আছে। আশপাশের গতিশীল জগৎ অহরহ তাহাকে টানিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু বিপ্রনান্দী গ্রাম নড়ে না। বারো মাইল দূরে ট্রেন চলিয়া যায়, নিশীথরাথে তাহার শব্দ-তরঙ্গে গ্রামের শূন্যমণ্ডলে শিহরণ উঠে, মাটির বুকে সঞ্চারিত কম্পনেবেগে গৃহ-প্রাচীর কাঁপে, মধ্যে মধ্যে গ্রামের যুবকেরা দশজনে মিলিয়া দশমুণ্ড রাবণের মত কুড়ি হাতে জীবনকে নাড়া দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ফল হয় না। সামান্য একটু কম্পন অনুভব করিলেই, কৈলাস-শিখরাসীন বিশ্বম্ভরের মত শিবশেখর ন্যায়তীর্থ বিপ্রনান্দীর বুকে পদনখাগ্র চাপিয়া ধরেন, সঙ্গে সঙ্গে সব স্থির হইয়া যায়।

ন্যায়তীর্থ মানুষটি খর্বকায় ছোটখাট ; গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর, সর্ব অবয়ব একটি অনমনীয় দৃপ্ততার দীপ্তিতে ভাস্বর, অথচ তাঁহার মুখে চোখে কপালে ঠোঁটে একটি হাস্যময় প্রশান্তি ঝলমল করে। পরনে ক্ষারে-ধোয়া ধবধবে থান ধুতি, অনাবৃত বুকের উপর আঠায়-মাজা শুভ্র উপবীত, গলায় সোনার তারে গাঁথা ছোট রুদ্রাক্ষের একগাছি মালা পরিয়া ন্যায়তীর্থ আপনার টোলের বারান্দায় ছোট একখানি চৌকির উপর বসিয়া থাকেন। তাঁহারই একটি অখণ্ড এবং প্রগাঢ় প্রভাব গ্রামখানিকে নিষ্কম্প দীপালোকের মত আলোকিত এবং আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। গ্রামে কোনো চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলেও তিনি চঞ্চল হন না, হাসিমুখেই তিনি কথা বলেন, কিন্তু তাঁহার খড়মের শব্দ তখন একটু উচ্চ ও কঠোর হইয়া উঠে, দাঁড়ান ঈষৎ দৃঢ়তর ঋজু ভঙ্গিতে—খড়মের চাপও যেন একটু বেশি পড়ে। তাহাতেই কাজ হইয়া যায়। চঞ্চল গ্রাম্য-জীবন স্থির হইয়া শান্ত হয়। তাই বলিতেছিলাম, কৈলাসবাসী বিশ্বম্ভরের মতই পদনখাগ্রে গ্রামের বুকখানাকে চাপিয়া ধরেন।

শিবশেখর ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু ভাগবতেই তাঁহার অনুরাগ প্রগাঢ়। এই প্রগাঢ় অনুরাগের জন্যই তিনি প্রাচীন ধর্মজীবনকে গ্রামখানির মধ্যে প্রাণ-শক্তিতে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন। মাত্র গ্রামের মধ্যেই তাঁহার প্রভাব অখণ্ড এবং প্রগাঢ় হইলেও খ্যাতি তাঁহার বহুবিস্তৃত—বাংলা দেশে একজন মনীষী বলিয়া তিনি বিখ্যাত। বিশেষ করিয়া ভাগবত-ধর্মের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য, আলোচনা করিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে মধ্যে মধ্যে অনেক পণ্ডিত এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াও তাঁহার নিকট আসিতেন। সেবার একজন ইউরোপীয়

পণ্ডিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আসিয়া তাঁহার সন্ধান পাইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তিনিকেতন বিপ্রনান্দী হইতে মাইল দশেক পথ।

আলোচনা শেষ করিয়া ইউরোপীয় ভদ্রলোক হাসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকটিকে আপন ভাষায় কি বলিলেন। অধ্যাপক ঈষৎ হাসিয়া ন্যায়তীর্থকে বলিলেন—ইনি কি বলছেন জানেন?

ন্যায়তীর্থ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন।

অধ্যাপক বলিলেন—গ্রীক বীর আলেকজান্দার আমাদের দেশে এসে এক যোগী পুরুষকে দেখে বলেছিলেন, আমি যদি আলেকজান্দার না হতাম, তবে এই ভারতের যোগী হতে চাইতাম। উনিও ঠিক সেই কথাই বলছেন। বলছেন—ইউরোপে না জন্মালে আমি ভারতবর্ষে এমনি পণ্ডিত হয়ে জন্মগ্রহণের কামনা করতাম।

ন্যায়তীর্থ হাসিয়া বলিলেন—আমার এ ব্রাহ্মণ-জন্ম না হলেও আমি কিন্তু এই দেশের কীটপতঙ্গ হয়েই জন্মাতে চাইতাম, অন্যত্র জন্মকামনা করতাম না।

ইউরোপীয় পণ্ডিতটি ন্যায়তীর্থের কথার মর্ম শুনিয়া অতি মৃদু হাসিয়া অধ্যাপককে ইংরাজীতে বলিলেন—একে আমরা বলি ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স।

অধ্যাপকটির মুখ লাল হইয়া উঠিলেও ভদ্রতার খাতিরে কোনো রূঢ় প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। ন্যায়তীর্থ ইংরাজী বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু বক্তার হাসির রূপ ও ভঙ্গি হইতে ব্যঙ্গ ও শ্লেষের স্বরটুকু বেশ বুঝিলেন। তবুও তিনি কথাগুলির মর্মার্থ বুঝিবার কোনও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, প্রশান্ত হাসি-মুখেই সম্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু ন্যায়তীর্থের যোগ্যপুত্র শশিশেখর দৃঢ়স্বরে ইংরাজীতে বলিয়া উঠিল, না, ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স নয়, এই তাঁর অন্তরের বিশ্বাস। তোমাদের পাশ্চাত্য বিদ্যায় মনকে তোমরা বুঝতে পার, কিন্তু তার বেশি কিছু পার না; আত্মাকে তোমরা চেন না। আমাদের জ্ঞানের লক্ষ্য হল চিত্তজয়—আত্মোপলব্ধি; আমাদের মন আত্মাকে পরিচালিত করে না, আত্মার নির্দেশে মনকে চলতে হয় বাহনের মত।

ইউরোপীয় ভদ্রলোকটি সপ্রশংস দৃষ্টিতে শশিশেখরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, অধ্যাপকটি ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন—পাছে পরিণতিতে অপ্রীতিকর কিছু ঘটিয়া যায়। ন্যায়তীর্থ বিপুল বিস্ময়ে বিস্মিত হইয়া শশিশেখরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সর্বাগ্রে তিনিই সে বিস্ময়কে জয় করিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, শশী, তুমি ওঁকে কি বলছ তার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না,

কিন্তু যা বলছ সেটা ভঙ্গিতে ও স্বরে বড় রূঢ় বলে মনে হচ্ছে আমার। উনি আমাদের অতিথি, তুমি গৃহস্থ, আপন ধর্ম তুমি লঙ্ঘন করছ।

শশিশেখর চুপ করিল। বক্তব্য তাহার শেষই হইয়াছিল, তবুও তাহার ঈষৎ সঙ্কুচিত ও লজ্জিত ভঙ্গির মধ্যে ন্যায়তীর্থের আজ্ঞাপালনে আনুগত্যটুকু বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ইউরোপীয় ভদ্রলোকটি শশিশেখরের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—এই তরুণ বন্ধুটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

অধ্যাপক বলিলেন—ইনিই ন্যায়তীর্থের পুত্র, শশিশেখর ন্যায়তীর্থ। এই বৎসরই ন্যায়ের উপাধি-পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

—উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র।—বলিয়া শশিশেখরকে অভিবাদন করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিলেন, আমি বড় আনন্দ লাভ করলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। সকলের চেয়ে বেশি আনন্দ হল আপনি ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করেছেন। সমগ্র পাশ্চাত্য দর্শনের দ্বার আপনার কাছে এখন উন্মুক্ত। আশা করি, নিতান্ত সংস্কারবশেই আপনি সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন না!

শশিশেখর তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, সহস্র ধন্যবাদ আপনাকে! পাশ্চাত্য দর্শন পড়ব বলেই আমি ইংরেজী শিখেছি।

গ্রামের প্রান্ত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ইউরোপীয় পণ্ডিতটির সঙ্গে গিয়া বিদায় দিয়া শশিশেখর বাড়ি ফিরিল। খানিকটা আসিতে আসিতেই মন তাহার সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তাহার গোপন কথা আজ উত্তেজনার অসতর্ক অবস্থায় পিতার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত ইংরেজী পড়িতে ন্যায়তীর্থ বাধা দেন নাই। স্বীকার করিয়াছিলেন, রাজভাষা সাংসারিক প্রয়োজনেও একটু দরকার, ইস্কুলে পড়াটা শেষ করাই ভালো।

শশিশেখর প্রথম বিভাগে বেশ কৃতিত্বের সহিত ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিল। তাহার স্কুলের একজন শিক্ষক ন্যায়তীর্থকে অনুরোধ করিল, আপনি শশীকে কলেজেই পড়তে দিন! ভবিষ্যতে ও খুব ভালো ফল করবে। অঙ্কে কাঁচা বলেই শশী বৃত্তি পেলে না, নইলে সংস্কৃতে ইংরেজীতে খুব ভালো ফল করেছে।

ন্যায়তীর্থ প্রসন্ন হাস্যের সহিত বলিয়াছিলেন, আপনি ভালোবাসেন শশীকে, আপনার কল্যাণ হোক। কিন্তু আপনি যা বলেছেন, সে হয় না মাস্টার মশায়!

—কেন? ইংরেজী খারাপ কিসে?

তেমনি হাসিয়াই ন্যায়তীর্থ বলিলেন—না না, ইংরেজী বিদ্যার উপর আমার বিদ্বেষ নেই কিছু, তবে আস্থাও নেই; আর আমাদের বংশগত বিদ্যার উপর

একটা বিশেষ শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস দুইই আছে। ইংরেজী জ্ঞানের দৃষ্টিটা নিতান্তই ঐহলৌকিক, চর্মচক্ষুর দৃষ্টির ওপারে আর তার গতি নেই। অথচ অবাঙ্‌মনসোগোচরের সাধনা আমাদের কুলধর্ম। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ; সুতরাং ও অনুরোধ আর করবেন না।

মাস্টার ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, আমাদের ইচ্ছা ছিল শশিশেখর সংস্কৃত এবং ইংরেজী দুইয়েই পণ্ডিত হয়।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন, ওটা নিতান্তই বিলাতী পিণ্ড রাঁধার ব্যবস্থা মাস্টার মশায়। জীবনের সাধনা একমুখী হওয়াই ভালো। মন দ্বিধাবিভক্ত হলে অবস্থা হবে গরুর ক্ষুরের মত, দ্রুত চলার শক্তি হারিয়ে যাবে। জন্মান্তরের ফের বেড়ে যাবে।

মাস্টার মহাশয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন শুধু, মুখে কিছু বলিলেন না।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন, আর শিখলেও তো খানিকটা। কাজ অনেকটা ওতেই চলে যাবে। মাস্টার হাসিলেন, বলিলেন, ও যা শিখেছে তাতে ভালো করে কথা কওয়াও চলে না, ন্যায়তীর্থ মশাই।

এ অনেক দিনের কথা। ইহার পর শশিশেখর ন্যায়তীর্থের কাছেই কয়েক বৎসর পড়াশুনা করিয়া ব্যাকরণ পরীক্ষা দিল, তারপর সাহিত্য অলঙ্কার পড়িয়া দর্শন পড়িতে আরম্ভ করিল। এই সময়েই ন্যায়তীর্থ তাহাকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, চিকিৎসকের যেমন আপনার পরম আত্মীয়ের চিকিৎসা করা উচিত নয়, এও তেমনি আর কি! আমার অনেকগুলি ছাত্র, শশী এখানে পড়লে শিক্ষা আমার পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে।

শশিশেখর নবদ্বীপে আসিয়া ন্যায় পড়িতে পড়িতে পিতার চোখের আড়ালের সুযোগ পাইয়া সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে গোপনে ইংরেজীর চর্চাও আরম্ভ করিল। মনীষী পিতার মেধাবী সন্তান সে, তাহার উপর ছিল জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ। ন্যায়ের উপাধি-পরীক্ষা দিবার পূর্বেই সে পাশ্চাত্য দর্শন মোটামুটি পড়িয়া ফেলিল। শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও তাহার আয়ত্ত হইয়াছে। এ সংবাদ ন্যায়তীর্থের কাছে অতি যত্নে সে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাহা এমনি এক অভাবনীয় ঘটনা-সংস্থানে উত্তেজনাময় অবস্থার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

শশিশেখর মনে মনে শঙ্কিত হইয়াই বাড়ি ফিরিল।

প্রশান্তমুখে ন্যায়তীর্থ বসিয়া ছিলেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া ইতিমধ্যেই একটি ক্ষুদ্র জনতা জমিয়া উঠিয়াছে। একদিকে টোলের ছাত্রেরা দাঁড়াইয়া আছে,

ন্যায়তীর্থের কয়েকজন বন্ধু ও মুগ্ধ ভক্ত একখানি কম্বল বিছাইয়া আসর করিয়া সম্মুখেই বসিয়াছে, এমন কি সদগোপ-পাড়ার জন তিনেক মণ্ডলও আসিয়া বারান্দার নীচে উপ্ হইয়া বসিয়া আছে।

কোনো একটা কথা হইতেছিল। শশিশেখর আসিয়া দাঁড়াইতেই কথাটার যেন মোড় ফিরিয়া গেল। ন্যায়তীর্থের বন্ধু হিরণ্যভূষণ চক্রবর্তী শশীকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, এস বাবাজী এস। তোমার কথাই হচ্ছিল। তুমি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছ। মহৎ থেকেই মহতের উদ্ভব হয়, উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান তুমি। তোমা হতে বিপ্রনান্দীর গৌরব বজায় থাকবে। বলিহারি বলিহারি! ইংরেজী বলে গেলে তুমি একেবারে ঝর ঝর করে—খাস বিলিতী সাহেবের সঙ্গে!

প্রৌঢ় হরিশ চাটুয্যেও ন্যায়তীর্থের বন্ধু, গ্রামের মধ্যে তিনি বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি, তিনি বলিলেন, কথাটা তোমার ঠিক হল না হিরণ্য! শশিশেখর হতে গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি হবে। ন্যায়তীর্থের বংশের মুখ আরও উজ্জ্বল হবে। পুত্রের কাছে পরাজয় মহাভাগ্যের কথা। শিবশেখর ধার্মিক জ্ঞানী। জ্ঞানবান পুণ্যবানের বংশ। এমন ভাগ্য শিবশেখরের হবে না তো কি হবে তোমার আমার? পুণ্যবল না থাকলে কি ভগবানের আশীর্বাদ পাওয়া যায়!

শশিশেখরের শঙ্কা ইহাতেও দূর হইল না, সে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ন্যায়তীর্থের মুখ প্রসন্ন, এতক্ষণে তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, দশের আশীর্বাদই হল ভগবানের আশীর্বাদ। এ সমস্তই হল তোমাদের দশ জনের স্নেহের ফল হরিশ। এখন আশীর্বাদ কর যেন শশী স্বধর্মচ্যুত না হয়।

হরিশ চাটুয্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, সহস্র বার, লক্ষ বার সে আশীর্বাদ করি এবং আজও করছি শিবশেখর।

হরিশের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলেই তাঁহার আশীর্বাদ-বাক্যকে সমর্থন করিয়া একটি মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তুলিয়া ফেলিলেন। শশিশেখর অভিভূত হইয়া গিয়াছিল, এমনভাবে প্রশংসার অজস্র বর্ষণের মধ্যে চোখ তুলিয়া সে যেন দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। ন্যায়তীর্থ বলিলেন, প্রণাম কর শশী। তোমাকে আশীর্বাদ করলেন আর তুমি প্রণাম করতে ভুলে গেলে! ইংরেজী শিক্ষা না করে যদি শুধু সংস্কৃত শাস্ত্র পড়তে, তবে এ ভুল তোমার কখনই হত না।

শশিশেখর অতিমাত্রায় লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি সকলকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। হরিশ কিন্তু বলিলেন, এটা তোমার বক্রোক্তি হল ভাই ন্যায়তীর্থ। শুধু বক্রই নয়, তীক্ষ্ণও যথেষ্ট পরিমাণে।

ন্যায়তীর্থ হাসিয়া বলিলেন, অলঙ্কৃত করতে গেলেই নাক-কান স্চ দিয়ে ফ‌ুঁড়তে হয় হরিশ। স্চ তীক্ষ্ণ এবং অলঙ্কারগুলি এক্ষেত্রে বক্রই হয়ে থাকে।

ঠিক এই সময়েই সকলকে প্রণাম শেষ করিয়া শশিশেখর ন্যায়তীর্থকে প্রণাম করিল। ন্যায়তীর্থের অসাধারণ সংযম সত্ত্বেও চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মুখে তিনি কিছু বলিলেন না, শুধু হাতখানি ছেলের মাথার উপর রাখিলেন।

হিরণ্যভূষণ বলিলেন, কিন্তু তুমি এমন ইংরেজী কেমন করে শিখলে শশী? একেবারে ঝর ঝর করে জলের মত বলে গেলে! কি বলে, এনটেরান্স না ম্যাটরিক পাশ তো হামেশাই দেখছি হে, বি-এ এম-এ পাশ করা উকিলের বহরও দেখেছি। একেবারে ঝর ঝর করে জলের মত, অ্যাঁ!

শশী কুণ্ঠিতভাবে সংক্ষেপে ইংরেজী শেখার ইতিহাস প্রকাশ করিয়া বলিয়া অপরাধীর মতই ন্যায়তীর্থের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিশ শশীর মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাপারটা খানিকটা অনুমান করিয়া লইলেন, শিবশেখর কিছু বলিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন, শশীকে এর জন্যে তোমার পুরস্কৃত করা উচিত শিবশেখর। শশিশেখরের এ সাধনা একলব্যের সাধনার সঙ্গে তুলনীয়।

শিবশেখর হাসিয়া বলিলেন, পুরস্কৃত না করলেও তিরস্কার করব না হরিশ, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার মনোভাব আমি বুঝতে পেরেছি।

হরিশও হাসিয়া বলিলেন, বুঝবে বইকি শিবশেখর, আমাদের পরস্পরকে জানা যে অনেকদিনের। বাল্যকালে চীৎকার করে ডাকলে তুমি চীৎকার করে সাড়া দিয়ে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে, আবার আম-জাম চুরির মতলব নিয়ে যখন চুপি চুপি জানালার ধারে দাঁড়াতাম, তখন তুমিও বেরিয়ে আসতে চুপি চুপি খিড়কির দোর দিয়ে। আমাকে বুঝতে কোনোদিনই তোমার ভুল হয় না। যে দিন ভুল হবে, সে দিন বুঝব তুমি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছ, মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয়েছে তোমার। সে দিন তুমি তোমার গৃহিণীকেও বুঝতে পারবে না।

শিবশেখরের অন্তরঙ্গের দল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। শশিশেখর এবং অল্পবয়স্কেরা লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিল; শিবশেখরও লজ্জিত হইলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, রসের আধিক্য হলে বিকার হয় হরিশ; তুমি বৈদ্যের শরণাপন্ন হও।

হরিশ বলিলেন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও তোমার পড়া আছে ন্যায়তীর্থ; আজ রাত্রে আমার বাড়িতে তোমার আহ্বান রইল। ষড় রস আস্বাদন করতে

করতে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে। বাবাজীকেও নিয়ে যেতে হবে। বাবাজীকে খাইয়ে-দাইয়ে তারপর দুজনে বসে একসঙ্গে খাব, বুঝলে?

মজলিস শেষ করিয়া ন্যায়তীর্থ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, গৃহিণী যেন প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, মুখে তাঁহার শঙ্কার ছায়া। ব্যস্ত হইয়া ন্যায়তীর্থ প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে শিবরানী, তুমি এমন ভাবে দাঁড়িয়ে?

শিবরানী কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন—হ্যাঁ গো, শশী নাকি তোমাকে না জানিয়ে ইংরেজী শিখেছে?

হাসিয়া শিবশেখর বলিলেন—হ্যাঁ। সাহেবটির সঙ্গে চমৎকার ইংরেজীতে কথা কইলে! তুমি রত্নগর্ভা!

—তুমি রাগ করেছ? সত্যিই শশী অন্যায় করেছে।

—না না না, রাগ করব কেন শিবরানী, শশী আমাদের বংশগৌরব উজ্জ্বল করেছে। এ কি রাগ করবার কথা?

এতক্ষণে শিবরানীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন, আমার কিন্তু ভারি ভয় হয়েছিল। তার ওপর খড়মের শব্দ শুনে—আজ তোমার খড়মের শব্দ টোলের বারান্দা থেকে শোনা যাচ্ছিল!

শিবশেখর শিবরানীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—রাগ নয়, দুঃখ আমার হয়েছিল শিবরানী; শশি-শেখরের এ কথাটা এতদিন ধরে আমার কাছে গোপন করে রাখাটা উচিত হয় নি।

সন্তানের অপরাধ শিবরানীই যেন মাথায় করিয়া লইলেন, মাথা হেঁট করিয়া বলিলেন—সত্যিই এ শশীর অপরাধ। আমি শশীকে বলব।

—না না না। উপযুক্ত ছেলে, তা ছাড়া—শশী আজও পর্যন্ত কোনো দুঃখ আমাদের দেয় নি। এ নিয়ে তাকে কিছু বললে সে কি মনে করবে! তা ছাড়া বউমা কি মনে করবেন?

—কি মনে করবেন? শশীই বা কি মনে করবে? কেন করবে?—

শিবরানী আশ্চর্য হইয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া শিবশেখর বলিলেন—নাঃ, অপরাধের চেয়ে গুণের পরিচয়ই শশীর বেশি। তাকে আমার পুরস্কৃত করাই উচিত। তুমি অনিরুদ্ধ স্বর্ণকারকে একবার ডাকাবে তো, বউমার জন্যে একজোড়া রুলি গড়াতে দেব, শশীর জন্যে একটি আংটি আর চন্দ্রশেখরের জন্যে বিছেহার।

চন্দ্রশেখর শশিশেখরের এক বৎসরের খোকা।

শিবরানী হাসিয়া বলিলেন—আর ছেলের মা বুঝি বাদ যাবে ?

ন্যায়তীর্থও হাসিলেন, বলিলেন,—স্ত্রীলোকের ঈর্ষা সাহিত্যকারের মিথ্যা কল্পনা নয় ; অলঙ্কারের বিষয়ে মাতা কন্যার ঈর্ষা করে, কন্যা মাতার ঈর্ষা করে।

শিবরানী ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে হাসিতেই বলিলেন—আর পুরুষেরা ?

ন্যায়তীর্থ বলিলেন, পুরুষেরা যা নিয়ে বিবাদ করে, ঈর্ষা করে, ভগবান তার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। সাম্রাজ্য দূরের কথা, সামান্য বিষয়ও আমার নেই শিবরানী। ক' বিঘে ব্রহ্মত্র, তাও নারায়ণের। দাও, এখন আমার আহ্নিকের জায়গা করে দাও।

পল্লিবাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মাটির ঘর, দেওয়ালগুলি রাঙামাটির গোলা দিয়া নিকানো ; প্রদীপের মৃদু আলোয় চারিদিকে একটি নম্র, পরিচ্ছন্ন শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পিলসুজের উপর প্রদীপটি জ্বলিতেছিল, তাহারই সম্মুখে আসনের উপর বসিয়া শশিশেখর কি লিখিতেছিল। ঘরের ভেজানো দুয়ার ঠেলিয়া শিবশেখর ঘরে প্রবেশ করিলেন। শশিশেখর কিন্তু মুখ ফিরাইল না, পিছন দিক হইতেও শিবশেখর পুত্রের একাগ্রতার গভীরতা সুস্পষ্টরূপেই অনুভব করিলেন। একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবেই ডাকিলেন, শশী !

সে আহ্বানে সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া শশী বিস্ময়ে যেন অভিভূত হইয়া গেল।

তাহার বিবাহের পর ন্যায়তীর্থ কখনও তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন নাই। শিবশেখর কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন—কোনো আলোচনা করছ বুঝি ?

শশী ততক্ষণে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাপের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিল—আমাকে কিছু বলছেন ?

হাসিয়া শিবশেখর বলিলেন—আমাকে দেখে এত চঞ্চল হচ্ছ কেন শশী ! তুমি উপযুক্ত হয়েছ, পাণ্ডিত্য অর্জন করেছ। এখন আমরা পিতাপুত্রে আলোচনা করব, তর্ক করব।

শশী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—তোমার কাছে আমার কিছু শিক্ষার বিষয় আছে শশী। পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা আমি তোমার কাছে পেতে চাই, ইংরেজী ভাষা আমি জানি না। তুমি আমায় অনুবাদ করে বলবে, আমি শুনব।

শশিশেখর এবারও মুখে কথার জবাব দিল না, নীরবে বাপের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় স্পর্শ করিল। স্নেহের উচ্ছ্বসিত আবেগে ন্যায়তীর্থের কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—তুমি আমার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র। তুমি দীর্ঘজীবী হও, ধর্মে জ্ঞানে নিষ্ঠা তোমার অটুট থাক।

শশী নীরবে মাথা নত করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিল। শিবশেখর বোধ করি শশীর একাগ্রতার কথা তখনও ভুলিতে পারেন নাই, তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন—এমন একাগ্রভাবে কি লিখছিলে শশী? কোনো পত্র কি?

শশী কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে বলিল—আজ্ঞে না। আমি বেদান্ত ও পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করছি।

ন্যায়তীর্থের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তিনি কোনও কথা না বলিয়া বিপুল আগ্রহে শশীর আসনে বসিয়া খাতাখানি টানিয়া লইলেন। পরক্ষণেই বলিলেন—আমার চশমা জোড়াটা আন তো শশী।

শশী চশমা আনিয়া হাতে দিতেই গভীর মনঃসংযোগ করিয়া শশীর লেখার উপর তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

"শব্দস্পর্শাদয়োবিদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।
ততোবিভক্তা তৎসম্বিদৈকরূপান্ন ভিদ্যতে॥"

ন্যায়তীর্থ শ্লোকের নীচের টীকায় মনোনিবেশ করিলেন। অদ্ভুত! এত চমৎকার টীকা করিয়াছে শশিশেখর! ন্যায়তীর্থ শ্লোকের পর শ্লোক, পাতার পর পাতা পড়িয়া চলিলেন।

রাত্রি প্রায় দু-পহর হইয়া আসিল। গৃহিণী শিবরানী আসিয়া কাসিয়া সাড়া দিয়া স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। ন্যায়তীর্থ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পড়িতে পড়িতেই বলিলেন—কি, হল কি?

—রাত্রি যে দুপুর গড়িয়ে এল।

—কি হয়েছে তাতে? আমার শুতে বিলম্ব আছে।

—বউমা চাঁদকে কোলে করে দাওয়ায় বসে বসে ঢুলছেন। মশায় যে খেয়ে ফেললে! শশীও যে শুতে পাচ্ছে না।

—ও!—বলিয়া খাতার পাতা উল্টাইয়া দেখিয়া আবার বলিলেন—তত্ত্ব-বিবেক অধ্যায়টা শেষ হলেই উঠব। একটু অপেক্ষা কর। আমি যা পারি নি, শশী তাই করেছে। শশী গ্রন্থরচনা করেছে।

অধ্যায়টি শেষ করিয়া তিনি খাতাখানি হাতে লইয়া উঠিয়া আপনার ঘরে আসিয়া বসিলেন। শিবরানী প্রশ্ন করিলেন—শশী গ্রন্থরচনা করেছে?

বেদান্তের প্রভাব হইতে তখনও ন্যায়তীর্থ মুক্ত হন নাই, তবুও একাগ্র গম্ভীর মুখে অল্প একটু হাসি টানিয়া বলিলেন—হুঁ।

স্নেহ-গৌরবে পুলকিত শিবরানী বলিলেন—কেমন হয়েছে ?

—সুন্দর, চমৎকার! কিন্তু—

—কিন্তু কি ?

—সঠিক এখন বুঝতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে যেন জ্ঞানে শুষ্কতা একটু প্রকট হয়ে উঠেছে।

শিবরানী তেলের বাটি, জল ও গামছা লইয়া স্বামীর পায়ের তলায় বসিয়া বলিলেন—সে তুমি দেখে-শুনে দিয়ো।

ন্যায়তীর্থ চিন্তা-বিভোর অবস্থাতেই বলিলেন—দেব।

স্বামীর একটা পা টানিয়া লইয়া শিবরানী বলিলেন—কি এত ভাবছ বল তো ?

মৃদু হাসিয়া এবার যেন কতকটা সচেতন ভাবে ন্যায়তীর্থ বলিলেন—বড় কঠিন চিন্তা করছিলাম শিবরানী। ফলভোগের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে মনে।

শিবরানী রহস্যের স্বরেই হাসিয়া বলিলেন—আমার এক মুস্কিল হয়েছে বাপু, স্বামী পণ্ডিত, ছেলে পণ্ডিত, কে যে কি বলছে, মূর্খ মানুষ আমি, বুঝতেই পারি না। আবার ওই চাঁদটা, সেও এক পণ্ডিত হবে আর কি!

গম্ভীর মুখেই ন্যায়তীর্থ বলিলেন—এইবার সংসার ত্যাগ করে ভগবানের শরণ নেওয়া উচিত হয়েছে শিবরানী। কিন্তু প্রলোভনও হচ্ছে, এমন ছেলে নিয়ে ঘর করি—বাপ-বেটায় মিলে আগেকার কালের মত পাণ্ডিত্যে দিগ্বিজয় করে আসি। কিন্তু বর্তমানের সুখের মধ্যেই নাকি ভবিষ্যতের দুঃখ লুকিয়ে থাকে, সেই হেতু ফলভোগের অধিকার গীতায় নিষিদ্ধ। চল, এইবার আমরা কোনও তীর্থে গিয়ে বাস করব।

শিবরানী অবাক হইয়া গেলেন। ন্যায়তীর্থের এমন সঙ্কল্পের কথা তাঁহার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত, ইহার পূর্বে কোনও দিন ঘুণাক্ষরেও ন্যায়তীর্থ প্রকাশ করেন নাই, শিবরানীও আভাসে পর্যন্ত অনুমান করিতে পারেন নাই।

কিছুক্ষণ পর বিস্ময়ের ঘোরটা কাটাইয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন—তোমার যত উদ্ভট কল্পনা! সুখের মধ্যে দুঃখ লুকিয়ে থাকে ?

আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কথাটা যেন ভাবিয়া বুঝিয়া দেখিলেন,

তারপর বলিলেন,—থাকে তো থাক। এই যদি বিধানই হয়, তবে তা মাথা পেতে নিতেও হবে।

ন্যায়রত্ন চুপ করিয়া রহিলেন। এমনই ধারার উদ্ভট চিন্তায় মন তাঁহার উদাসীন হইয়া উঠিয়াছে।

প্রগাঢ় যত্নের সহিত সমস্ত খাতাখানি পড়িয়া, অনেক চিন্তা করিয়া শশিশেখরের রচনার কয়েকটি স্থান ন্যায়তীর্থ সংশোধন করিয়া দিলেন; শশিশেখর খাতাখানি লইয়া ঘরে আসিয়া সংশোধন করা জায়গাগুলি দেখিতে আরম্ভ করিল। প্রথম সংশোধন শশী দেখিল—'সুস্পষ্ট' শব্দটিকে কাটিয়া ন্যায়তীর্থ লিখিয়াছেন 'বিস্পষ্ট'। আবার সে পাতা উল্টাইল। বেলা অনেক হইয়াছে, বধূ চারু আসিয়া বলিল—মা স্নান করতে বললেন। বেলা কত হয়েছে দেখ তো!

শশী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া খাতাটির সংশোধিত পাতাগুলিতে কাগজ দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িল। শিবরানী নিজেই ততক্ষণে আসিয়া হাজির হইলেন, বলিলেন—বাবা, তোমাদের বাপ-বেটার বিদ্যের আঁচে আমাদের শাশুড়ী-বউয়ের হাড়ে কালি পড়ল। গরম ভাত যে কেমন, তা ভুলেই গেলাম।

শশিশেখর অপরাধ বোধ করিল, তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—কই, এর আগে তো ডাক নি তুমি!

শিবরানী হাসিয়া বলিলেন—দোষ হয়েছে বাবা! তোমাদের ক্ষিদে পেয়েছে, সেটা আমার মনে করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল! ক্ষিদে-তেষ্টা বুঝতে না পারা পণ্ডিতদের একটা লক্ষণ, এটা আমি জানতাম না! বস, আমি মাথায় তেলটা দিয়ে দিই।—ছেলের মাথায় তেল দিতে দিতে শিবরানী বলিলেন—হাঁরে, উনি তোর খাতা দেখে কেটেকুটে ঠিক করে দিলেন?

শশিশেখর চিন্তান্বিত হইয়াই তেল মাখিতেছিল, মায়ের কথা তাহার কানে ঢুকিলেও মনকে যেন স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না, সে চিন্তা-বিভোর ভাবেই উত্তর দিল—হ্যাঁ, দিয়েছেন।

শিবরানী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—কি ভাবছিস এত?

শশী উত্তর দিল—ভাবি নি। এমনি আর কি!

রাত্রেও শশী এমনি চিন্তান্বিত ভাবে খাতাখানি খুলিয়া বসিয়া ছিল। চারু আসিয়া ছেলেকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীকে এমনি ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—হ্যাঁ গা, তুমি সারাদিন এমন করে কি ভাবছ বল তো ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শশী বলিল—বড় সমস্যায় পড়েছি চারু ! বোধ হয় এমন সমস্যায় জীবনে কখনও পড়ি নি।

চারু বলিল—বেশ ! ঠাকুরের কাছে যাও না। দেশ-বিদেশের লোক এসে তোমার বাপের কাছ থেকে মুস্কিলের আসান করে নিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি ঘরে বসে মুস্কিল নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছ !

শশী কথার উত্তর দিল না, একটু হাসিল।

চারুর মনে হইল শশী তাহাকেই অবজ্ঞা করিয়া হাসিল, এই জন্য সে রাগ করিয়াই প্রশ্ন করিল—হাসলে যে ?

শশী আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—দরজাটা বন্ধ করে দাও, তারপর বলছি।

চারু দরজা বন্ধ করিয়া দিল, শশী বলিল—বস এইখানে, একটা পরামর্শ দাও দেখি। তুমি আমার সচিব, সখী, অনেক কিছু। একথা তুমি ছাড়া আর কাউকে বলার আমার উপায় নেই, মাকে পর্যন্ত না। কথা যে বাবাকে নিয়েই।

কথাটার ভূমিকা শুনিয়াই চারু ভয় পাইয়া গেল, সে শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শশী বলিল অত্যন্ত মৃদুস্বরে—বাবা যে সংশোধনগুলি করেছেন, সেগুলি ভাষার দিক দিয়েই সংশোধন করেছেন, দু-এক জায়গায় বৌদ্ধ-শূন্যবাদ সম্পর্কে মন্তব্যে তিনি অত্যন্ত কঠোর হয়ে পড়েছেন। কিন্তু দুই-ই আমার মতে অন্যায় হয়েছে। ভাষার দিক দিয়ে প্রাচীন ধারা অনুযায়ী আধুনিক লেখার সংশোধন খাপ খায় না ; কটু হয় শুনতে, আরও অনেক দোষ হয়। আর বৌদ্ধশূন্যবাদ কেউ গ্রহণ করতে না পারে, কিন্তু বিদ্বেষ নিয়ে তাকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গেলে গ্রন্থকারকে ধর্মভ্রষ্ট হতে হবে।

চারুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, ভয়ার্ত অথচ মৃদুস্বরে সে বলিল—না, না, ওগো, বাবাকে তুমি অমান্য কর না।

শশী চিন্তিত ভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতে অস্বীকারের ভঙ্গিতে ধীরভাবে বার কয় মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল—জ্ঞান হল সত্য, সত্যের মর্যাদা আমি ক্ষুণ্ণ করতে পারব না চারু।

বহুদিনের রঙ-করা মাটির পুতুলের মত চারু বসিয়া রহিল।

কয়েকদিন পর সেদিন প্রাতঃকালেই টোলের একটি ছাত্র বাড়ির ভিতর আসিয়া শশিশেখরকে ডাকিল—অধ্যাপক মশায় ডাকছেন আপনাকে।

শশী সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া আসিল। টোলের ছেলেরা বারান্দায় বসিয়া পড়িতেছে, ন্যায়তীর্থ অভ্যাসমত ছোট চৌকিটির উপর বসিয়া আছেন, শশী আসিয়া বিনীতভাবে প্রশ্ন করিল, আমাকে ডেকেছেন ?

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—হ্যাঁ। বস। তোমার সঙ্গে কিছু পরামর্শ আছে। বস কম্বলের উপর বস। দেখ, কয়েকদিন ধরেই আমি একটা কথা ভাবছি—ভাগবতধর্মের তত্ত্বব্যাখ্যা বোধ হয় আমার লিপিবদ্ধ করে যাওয়া উচিত। কি বল তুমি ?

শশী উৎসাহিত হইয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। এটা আপনার কর্তব্য বলে আমার মনে হয়।

—তাহলে আরম্ভ করে দেওয়াই উচিত, কি বল ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এবার মৃদু হাসিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—দেখ, কাজটা আমি আরম্ভ করে দিয়েছি। অপেক্ষা কর, আমি আসছি।—বলিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া খালি পায়েই বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেলেন। শশী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাপের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি সত্ত্বেও তাঁহার আজিকার এই উৎসাহ দেখিয়া সে মনে মনে কৌতুক বোধ না করিয়া পারিল না। চারিদিকে ছাত্রেরা মৃদুগুঞ্জনে পড়িতেছে, তাহার মধ্য হইতে সহসা একটা কথা যেন তাহার কানে আসিয়া খট করিয়া বাজিল। কথাটা—বিস্পষ্ট। শশী ছেলেটিকে ডাকিয়া বলিল—শোন। 'বিস্পষ্ট' না বলে 'সুস্পষ্ট' বল। 'বিস্পষ্ট' কথাটা ধ্বনির দিকে রূঢ় আর ব্যবহারেও প্রায় অপ্রচলিত।

ছেলেটি বলিল—আজ্ঞে না, ওটা 'বিশেষ রূপে স্পষ্ট' কিনা। 'সু'-শব্দ 'সুন্দর'-দ্যোতক—ওতে কাব্যের মাধুর্য আছে।

হাসিয়া শশী বলিল—তাহলে 'সুকঠিন' প্রয়োগ-বিধিটা ভুল হত। প্রচলন ভেদে ধাতুগত অর্থের তারতম্য হয়ে যায়, সেটাকে স্বীকার করে নিলে শব্দের মধ্যে অর্থের ব্যাপকতা বাড়ে; তাতে ভাষার গৌরববৃদ্ধিই হয়।

ঠিক এই সময়েই গলার সাড়া দিয়া ন্যায়তীর্থ বাহির হইয়া আসিলেন।

আসনে বসিয়া খাতাখানি কোলের উপর রাখিলেন, তারপর বলিলেন—তুমি 'বিস্পষ্ট' স্থলে 'সুস্পষ্ট' ব্যবহারের পক্ষপাতী শশী ?

শশী বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, শব্দের ধ্বনি—

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—তোমার যুক্তি শুনেছি আমি। তারপর ছাত্রটির দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওটা তুমি এখন 'বিস্পষ্ট'ই পড়ে যাও, পরে আমি বিচার করে দেখব।

ছাত্রটি চলিয়া গেল। ন্যায়তীর্থ নীরব হইয়াই বসিয়া রহিলেন, খাতাখানি কোলের উপরই পড়িয়া রহিল; তিনিও শশীর হাতে তুলিয়া দিলেন না, শশীও নিজে হাত বাড়াইয়া লইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শশী বলিল—তা হলে—

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—হ্যাঁ, যেতে পার তুমি।

মনে খানিকটা উত্তাপ জমা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে যেন তাঁহার কোনো হাত ছিল না। ধীরে ধীরে সে উত্তাপ কমিয়া আসিলে মনে মনে তিনি শশীর যুক্তিকে স্বীকার করিয়া লইলেন। ছাত্রটিকে ডাকিয়া একথা বলিবার পূর্বে তিনি শশীকে কথাটা জানানো প্রয়োজন মনে করিলেন। শশীর রচনার মধ্যেও তিনি প্রথমেই 'সুস্পষ্ট'কে কাটিয়া 'বিস্পষ্ট' করিয়াছেন। সেটিও নিজে হাতে কাটিয়া দিবার সঙ্কল্প লইয়া শশীর ঘরের দুয়ারে আসিয়া ডাকিলেন—শশী!

ঘরের দুয়ার খুলিয়া দিল পুত্রবধূ চারু। ন্যায়তীর্থ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শশী নাই। চারু ঘর পরিষ্কার করিতেছিল। ন্যায়তীর্থ বাহিরে আসিতে গিয়া আবার ঘুরিলেন, শশীব কলমটি তুলিয়া লইয়া খাতাখানি খুলিলেন। দেখিয়াও তিনি যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার লেখা 'বিস্পষ্ট' শব্দ কাটিয়া আবার 'সুস্পষ্ট' লেখা হইয়া গিয়াছে! কলমটি তিনি রাখিয়া দিলেন। তারপর একে একে পাতা উল্টাইয়া গেলেন। তাঁহার সমস্ত সংশোধন শশী কাটিয়া দিয়াছে। ন্যায়তীর্থের হাত কাঁপিতেছিল, পাতার লেখা সেই কম্পনহেতু আর পড়া যায় না; তিনি খাতাখানি রাখিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। দেওয়ালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—বউমা খড়ম জোড়াটা এগিয়ে দাও তো।

চারু খড়ম জোড়াটি আনিয়া একরূপ পায়ে পরাইয়া দিল। ন্যায়তীর্থ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। চারু শঙ্কায় বিবর্ণ হইয়া গেল, নীচে রান্নাঘরে শিবরানীর হাতের দ্রুত-সঞ্চালিত খুন্তি স্তব্ধ হইয়া গেল। এ কেমন খড়মের শব্দ! অপটু পায়ের চালিত খড়মের শব্দের মত ছন্দোহীন কেন? অথবা অধীর ন্যায়রত্নের পায়ের অস্থিরতা হেতু এমন অসমচ্ছন্দে পা পড়িতেছে!

ন্যায়তীর্থ যেন অতিমাত্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন, অথচ সেই স্তব্ধতার মধ্যে তাঁহার নিকটে আসিবার অবসরও কেহ পায় না। পুঁথির সাগরে তিনি ডুব দিয়াছেন। যে সময়টা পড়েন না, সে সময় তিনি ঠিক স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন। কথা বলিলে দুই-একটার উত্তর দেন; বাকিগুলি নিরুত্তরই রহিয়া যায়। সেদিন তখন তিনি বসিয়াই ছিলেন, বন্ধু হরিশ চাটুয্যে একখানি কাগজ হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ন্যায়তীর্থ সংক্ষেপে আহ্বান করিলেন —এস!

হরিশ স্থূল দেহখানি লইয়া ধপ করিয়া কম্বলের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন —হাঁঃ, হাঁপ ধরে গেল, মোটা শরীর নিয়ে ছোটা কি সোজা কথা! জিভ বেরিয়ে গেল। কটি মেয়ে দেখে যা হাসলে শিবশেখর, লজ্জায় আমি ঘেমে গেলাম।

ন্যায়তীর্থ অল্প একটু হাসিলেন, নিতান্ত ভদ্রতা রক্ষার জন্য শুষ্ক হাসি। হরিশ কাগজখানি ন্যায়তীর্থের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—নাও, দেখ!

—কি?

—সেই সাহেবের কাণ্ড। 'ভারতে কি দেখিলাম' তাই লিখেছে খবরের কাগজে। এখানকার কথা, তোমাদের পিতা-পুত্রের খুব প্রশংসা করে সব লিখেছে। অমর আমাকে পত্র লিখেছে, কাগজও পাঠিয়ে দিয়েছে।

অমর হরিশের বড় ছেলে, কলিকাতায় চাকরি করে।

কাগজখানি হাতে লইয়া ন্যায়তীর্থ হাসিয়া বলিলেন—দুধ বলে পিটুলি গোলা খাওয়াচ্ছ যে! এ যে ইংরেজী!

হরিশ বলিলেন—বাবাজী কই, আমাদের পণ্ডিতের পুত্র পণ্ডিত-প্রবর পড়ুক, পড়ে শোনাক আমাদের! তবে অমর লিখেছে আমাকে মোটামুটি। সাহেব বলেছে—বলিয়া পকেট হইতে অমরের পত্র বাহির করিয়া পড়িলেন— একটি বড় দুর্গম গ্রামের মধ্যে এমন প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার। সমুদ্রের তলদেশের মণিরত্নের সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। অথচ দেশের গভর্নমেণ্ট এঁদের খোঁজ রাখেন না, এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কিছু হতে পারে না। পণ্ডিত শিবশেখর ন্যায়তীর্থ ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর পুত্র সংস্কৃত এবং ইংরেজী উভয় ভাষাতেই সুপণ্ডিত, প্রাচ্য-প্রতীচ্য দর্শনে ইনি পিতার মতই সুপণ্ডিত। ভাবীকালে এঁর ভবিষ্যৎ—

বাধা দিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—থাক। প্রশংসার কামনায় শাস্ত্রচর্চা করি নি হরিশ, ওতে আমার প্রয়োজন নাই। ওটা বরং শশীকে পাঠিয়ে দাও। তরুণ বয়স, তাতে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাব কিছু আছে—সে পড়ে খুশী হবে।

হরিশ হাসিয়া বলিলেন—সেই ভালো। ওহে, এটা আমাদের বাবাজীকে দিয়ে এস তো ; কি নাম তোমার ?

হরিশ বলিলেন—কিন্তু তোমার এমন ভাবান্তর হল কেন বল দেখি ? তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ !

শিবশেখর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তোমার কাছে গোপন করব না হরিশ। আমি বড় অশান্তি ভোগ করছি ; ভবিষ্যতের চিন্তায় একটু ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। এই টোল, দেবসেবা চলবে কি করে ?

হরিশ বলিলেন—তোমার এমন পণ্ডিত পুত্র—

বাধা দিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—এ পাণ্ডিত্যের প্রভাবে তো অন্নবস্ত্র হয় না হরিশ ! অর্থের প্রয়োজন, দিন দিন সংসার বাড়ছে ! কিন্তু শশী বাড়ি থেকে বেরোবে না। আমি তাকে বলতেও পারছি না। তুমি যদি তাকে একটু বুঝিয়ে বল হরিশ—

হরিশ কিছু বলিবার পূর্বে শশীই কাগজখানি হাতে করিয়া বহির হইয়া আসিল। প্রসঙ্গটা তখনকার মত বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু অপরাহ্নে শশী নিজেই প্রসঙ্গটা তুলিয়া বলিল—আমি এইবার বাড়ি থেকে বের হতে চাই বাবা ; উপার্জনের চেষ্টা করতে চাই আমি।

পলকের জন্য ছেলের মুখের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরাইয়া সম্মুখে নিবদ্ধ করিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—বেশ !

মাইল কয়েক দূরে মহকুমা শহরে শশিশেখর এক টোল খুলিয়া বসিল। চাকরির চেষ্টা সে করিয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অধ্যাপকটির কাছেও সে গিয়াছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর অভাবে সেখানে কোনো সম্মানজনক পদলাভ সম্ভব হয় নাই। স্কুলে চাকরির ব্যবস্থা হইতে পারিত, কিন্তু শশী নিজে তাহা প্রত্যাখ্যান করিল, আসিয়া বলিল—ষড়্‌দর্শন পড়ে অবশেষে 'কিলোৎ-পাটীব বানর'-কথা পড়াতে পারব না আমি, মাপ করবেন।

দেশে ফিরিয়া এই শহরটিতে কয়েকজন সরকারী কর্মচারীর উৎসাহে সে টোল খুলিয়া বসিল। সেই ইউরোপীয় পণ্ডিতটির লেখার কথা ইহারই মধ্যে দেশে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। সরকারী কর্মচারীরা শশিশেখর সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন—আপনি আরম্ভ করুন টোল ; সরকারী সাহায্য আমরা যেমন করে হোক করে দেব।

শশী টোল খুলিয়া প্রচার করিল, প্রাচ্য দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্য দর্শনের মর্মও সে ছাত্রদের শিক্ষা দিবে।

অকস্মাৎ সেদিন পিতৃবন্ধু হরিশ চট্টোপাধ্যায়ের বড় ছেলে অমর শশীর টোলে আসিয়া হাজির হইল। কলিকাতা হইতে বাড়ি আসিবার পথে স্টেশনে নামিয়া গাড়ি না পাইয়া শশীর শরণাপন্ন হইল। পরম সমাদরে শশী অভ্যর্থনা করিয়া তাহার পরিচর্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

অমর বলিল—তুমি ভাই, এমন খাতির করলে তো আমাকে বিদেয় নিতে হয় এখুনি।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতটি অপ্রতিভের মত হাসিল মাত্র, উত্তর দিতে পারিল না। অমর বলিল—তুমি শুধু বন্ধু নও। তুমি আমাদের গৌরব। সেদিন কাগজে কাগজে যখন ঐ লেখাটা পড়লাম শশী, তখন বলব কি তোমাকে, আনন্দে আমার চোখে জল এল। আমাদের মেসের প্রত্যেককে আমি কাগজখানা দেখিয়েছি, আর বলেছি—দেখ, আমাদের গ্রাম কেমন দেখ!

শশীর চোখ-মুখ এবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেও লজ্জিত ভাবে বৃষ্টিধারা-নমিত ফলবান বৃক্ষের মতই মাথা নত করিল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শশী বলিল—তোমাকে পত্র আমি লিখতাম অমর, তা দেখা হয়ে গেল ভালোই হল। কিছু চাঁদা তোমাকে দিতে হবে!

—তোমার টোলের জন্য?

—না না। আমাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর সুধাকৃষ্ণ মুখুজ্জে মহাশয় উদ্যোগ করে জেলাতে এবার পণ্ডিত-সভা আহ্বান করেছেন, আমায় করেছেন সম্পাদক। অবশ্য টাকাকড়ি সাহেবের ঠেলাতেই উঠবে। তবু সম্পাদক যখন হয়েছি তখন আমি দু-দশ টাকা যা পারি তোলবার চেষ্টা করছি।

অমর একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বলিল—নিশ্চয় দেব। আর কলকাতায় আমাদের জেলার যে সব লোক আছেন—তাঁদের কাছেও যাব আমি। তুমি বরং সায়েবের সই-করা কয়েকখানা চিঠি আমায় দিয়ো। জ্যেঠামশায় নিশ্চয় সভাপতি হবেন?

—না, তাঁকে অভ্যর্থনা-সভার সভাপতি করা হয়েছে। কাশীর মহামহোপাধ্যায় শ্যামাচরণ তর্করত্ন হবেন সভাপতি।

—বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে!—তারপর নীরবে কিছুক্ষণ অমর যেন কল্পনায় ভাবী সভার রূপ দেখিয়া লইয়া আবার বলিল—তোমরা বাপ-বেটায় একদিকে দাঁড়ালে যেখান থেকেই যিনি আসুন শশী, আমাদের জেলারই জয় হবে এ একেবারে নিশ্চিত।

শশী চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

পরাধীন দেশে পাণ্ডিত্যের কোনো অর্থ হয় না অমর! আর্থিক ব্যর্থতার কথাই শুধু বলছি না আমি; পরাধীনতার জন্যে এমন মনোভাব হয়েছে যে প্রাচীন পণ্ডিত ভুল বললেও তার প্রতিবাদ করাটা পর্যন্ত অন্যায়ের তালিকাভুক্ত হয়ে পড়েছে।

অমর বলিল—তার জন্যে ভাবনা কি তোমার, জ্যেঠামশায় তোমার পাশে থাকবেন, তিনি তো আর নবীন নন।

কথাটা শেষ করিয়া অকস্মাৎ সে হাসিয়া ফেলিল, বলিল—নবীন বলতে একটা কথা মনে হল। তোমার বউ কোথায়?

হাসিয়া শশী বলিল—বাড়িতে।

—এখানে নিয়ে এস। কত আর হাত পুড়িয়ে খাবে?

—তোমারও তো তাই। ঐ যে বললাম, ও স্বাধীনতা পর্যন্ত আমাদের নেই।

অমর সরবে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—কথাটা বড় ভালো বলেছ শশী!

এই বিংশ শতাব্দীতেও জেলার সদর শহরটি পণ্ডিত-সভার অধিবেশনে চঞ্চল ও উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর সুধাকৃষ্ণবাবু বয়সেও প্রাচীন এবং হিন্দুধর্মেও অনুরাগী ব্যক্তি। দীর্ঘকাল শাসনবিভাগে কাজ করিয়া মধুচক্র হইতে মধুনিষ্কাশনের কৌশলেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল প্রচুর। তিনি নিজে অধিবেশনে উপস্থিত থাকায় জেলার ধনী জমিদার, রায়সাহেব, রায়বাহাদুর, এমন কি জেলার একমাত্র রাজাসাহেব পর্যন্ত সভা অলঙ্কৃত করিয়া হাজির ছিলেন। সাহেব হাসিলে তাঁহারা হাসিতেছিলেন, গম্ভীর হইলে গম্ভীর হইতেছিলেন, আর কোনো পণ্ডিতের বক্তব্য শেষ হইলে হাততালি দিতেছিলেন—সজোরে।

অধিবেশন-প্রারম্ভে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সভার উদ্বোধন করিলেন, বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিলেন—এই জেলায় এখনও সংস্কৃত-চর্চার গৌরব অটুট আছে। বিশেষ করে পণ্ডিত শিবশেখর ন্যায়তীর্থ ও তাঁর পুত্র পণ্ডিত শশিশেখর ন্যায়-তীর্থের গৌরবে এ জেলা গৌরবান্বিত। পণ্ডিত শশিশেখরকে এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারছি না। তিনি না থাকলে এ সভা কার্যে পরিণত করা অসম্ভব হত। তিনি নবীন, এবং পাশ্চাত্য ভাষা, পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন করে প্রাচীন কালের রক্ষণশীলতার প্রভাব হতে অনেকাংশেই মুক্ত। আজ যুগধর্মকে স্বীকার করে সংস্কৃত সাহিত্য এবং শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির উপর নূতন আলোপাতের প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন। সেই জন্যই তাঁর এই আন্তরিক

প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এ প্রয়োজনের পূরণের জন্য মহামহোপাধ্যায় শ্যামাচরণ, পণ্ডিত শিবশেখর প্রমুখ মনীষিবৃন্দ এখানে মিলিত হয়েছেন। আজ তাঁদের কাছে আমাদের নিবেদন উপস্থাপিত করে আমি সবিনয়ে সভা আরম্ভ করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

পণ্ডিতদের সাধুবাদ এবং রায়বাহাদুরগণের হাততালির মধ্যে সুধাকৃষ্ণবাবু উপবেশন করিলেন। পরমুহূর্তেই সভা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ন্যায়তীর্থ শিবশেখর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গম্ভীর প্রশান্ত মুখে কঠোর দৃঢ়তা, গায়ে গরদের চাদর, পরনেও দুধের মত সাদা গরদ, অনাবৃত দক্ষিণ বাহুতে সোনার তারের তাগায় একটি প্রবাল ও রুদ্রাক্ষ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। বাঁ হাতে আপনার অভিভাষণটি ধরিয়া বলিলেন—সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করবার জন্যই আমি দণ্ডায়মান হয়েছি। আমি প্রাচীন, কিন্তু বর্তমান এই সভার রীতি-পদ্ধতি সমস্তই নবীন; সত্য বলতে কি, এ ধরনের সভা আমাদের দেশে প্রচলিতই ছিল না। এ রীতি বৈদেশিক। প্রাচীনকালে সভা আহ্বান করতেন রাজা, ধনী, জমিদার যাঁরা, তাঁরাই, এবং তারও উপলক্ষ্য ছিল সামাজিক ক্রিয়ানুষ্ঠান। এই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে, সে পার্থক্য সূক্ষ্ম হলেও শূন্যমণ্ডলের মত অনতিক্রম্য বলেই আমার মনে হয়। সামাজিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে সর্বোচ্চ, এবং সর্বাগ্রে স্থাপিত করতে হয় যজ্ঞেশ্বরকে। তাঁকে অনুভব করে অনুষ্ঠানের সর্বত্র বিরাজ করে ভক্তিসিক্ত নিষ্ঠা এবং সদাচার; সে প্রভাব এই ব্যবস্থার মধ্যে সঞ্চারিত করা অসম্ভব বলেই মনে হয়। এ হল শুষ্ক জ্ঞানপ্রকাশের ক্ষেত্র।

একদল প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত ধ্বনি তুলিলেন—সাধু সাধু!

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—সুতরাং সেই ত্রুটি পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা আমাদের করা উচিত। সেই জন্যই আপনাদের প্রতি স্বাগতসম্ভাষণ উচ্চারণ করার পূর্বে যজ্ঞেশ্বরকে এই যজ্ঞস্থলে অধিষ্ঠিত হবার প্রার্থনা আমি জানাব।

সমগ্র সভাস্থল এবার সাধুবাদে মুখর হইয়া উঠিল। শুধু শশিশেখর বিবর্ণ মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কলরব প্রশমিত হইতেই তাহার পিতার কণ্ঠস্বর আসিয়া তাহার কানে পৌঁছিল। তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, কিন্তু শশী তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না।

তাহার পর মর্মস্পর্শী ভাষায় রচিত শ্লোকে ন্যায়তীর্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া বসিলেন। অতঃপর মূল সভাপতি মহামহোপাধ্যায়ের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সভা ভরিয়া উঠিল।

পরদিন ছিল বিচার-সভা।

সভার প্রারম্ভেই শশিশেখর উঠিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে।—প্রসন্ন হাসি হাসিয়া মহামহোপাধ্যায় বলিলেন—জ্যোতিষ্কের ভগ্নাংশ থেকেই জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি, জ্যোতি হল তার জন্মগত সম্পত্তি। কোন গুহাতে সে জ্যোতি ব্যাহত হল, ছোট ন্যায়তীর্থ? বল শুনি।

—অদ্বৈত-পরমব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপে ভাসমান কিনা?

—নিশ্চয়ই।

—এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যপ্ত করেই ভাসমান?

—অবশ্য।

—চৈতন্যে যিনি সর্বদা বিরাজিত, আহ্বান করে তাঁর চৈতন্য সম্পাদন প্রচেষ্টা সুতরাং ভ্রমাত্মক?

এবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শশিশেখরের মুখের দিকে চাহিয়া মহামহোপাধ্যায় বলিলেন—স্বীকার করলাম।

ন্যায়তীর্থ সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন—আমি কিন্তু সম্পূর্ণ স্বীকার করলাম না। স্বপ্নাতুর অবস্থাতেও মানব ভ্রমাত্মক চৈতন্য অনুভব করে। সেখানে আহ্বানের প্রয়োজন আছে।

শশিশেখর বলিল—জ্ঞানযোগীর ধ্যান নিদ্রাও নয়, স্বপ্নও নয়। যদি স্বপ্ন হয় তবে সে জ্ঞানযোগী নয়, অন্যথায় আহ্বানকারীই ভ্রান্ত—সে-ই স্বপ্নাতুর, চৈতন্যের প্রয়োজন তারই।

মহামহোপাধ্যায় গম্ভীরমুখে বলিলেন—পণ্ডিত শশিশেখর, সভাপতি হিসাবে তোমাকে আমি নিবৃত্ত হতে আদেশ করছি। ন্যায়তীর্থ, আমি আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি।

উভয়েই নিরস্ত হইলেন; কিছুক্ষণ পরে ন্যায়তীর্থ বলিলেন—মহামহোপাধ্যায় যদি অনুমতি করেন তবে আমি উঠতে পারি। শরীর বড় অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে আমার।

মহামহোপাধ্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ন্যায়তীর্থ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া সভা-স্থল ত্যাগ করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই পণ্ডিত শশিশেখর যুগধর্মকে স্বীকার করিয়া বৌদ্ধ দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত সমন্বয় করিয়া দর্শনের নূতন অধ্যায় রচনার প্রস্তাব উত্থাপন করিল। তীক্ষ্ণব্যঙ্গে গণ্ডীবদ্ধ মনোভাবকে বিদ্ধ করিয়া অকাট্য যুক্তি দেখাইয়া সুললিত ভাষায় অনর্গল সে বলিয়া গেল।

মহামহোপাধ্যায় তাহাকে স্বীকার করিয়া বলিলেন—তোমার প্রস্তাব সাধু।

তোমাকে আমি সমর্থন করি। কিন্তু সে ভার নিতে হবে তোমাদেরই। আমরা প্রাচীন, আমাদের সে ভার সাধ্যাতীত।

বাসায় আসিয়া ন্যায়তীর্থ বসিয়া ছিলেন স্তম্ভিতের মত। জ্বরগ্রস্তের মত মাথার মধ্যে একটা প্রদাহ তিনি অনুভব করিতেছিলেন। পরিপূর্ণ জাগ্রত অবস্থাতেও পারিপার্শ্বিককে তিনি স্পষ্ট প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না। রাজপথে মানুষ, গাড়ি-ঘোড়া যাইতেছে আসিতেছে, কলরবের কথা কানে আসিতেছে, কিন্তু চিত্তের স্পর্শানুভূতি যেন হারাইয়া গিয়াছে।

মুখ দিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, মাথা নাড়িয়া তিনি যেন জাগিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন। হ্যাঁ—তিনিই স্বপ্নাতুর, তাঁহারই চৈতন্যের প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া তিনি বালতি হইতে জল লইয়া বার-বার মাথাটা ধুইয়া ফেলিলেন। মাথাটা ধুইয়া তিনি খানিকটা সুস্থ বোধ করিলেন। নিজেই বিছানাটা বিছাইয়া লইয়া শুইয়া পড়িলেন। প্রায় সমস্ত দিনটা আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকিয়া অপরাহ্নে তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার ছাত্র মণিভূষণ বলিল—শশীদাদা এসেছিলেন দু-বার। কিন্তু আপনি ঘুমুচ্ছেন দেখে ফিরে গেছেন।

ন্যায়তীর্থ গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইলেন, সে শব্দের উচ্চতায় এবং অস্বাভাবিকতায় ছেলেটি চমকিয়া উঠিল। ন্যায়তীর্থ বলিলেন—এবার এলে তাকে নিষেধ করে দিয়ো, কোনো প্রয়োজন নেই। বল—চৈতন্য আমার হয়েছে, আহ্বানে প্রয়োজন নেই।

খড়ম জোড়াটা পায়ে দিয়া তিনি ঘরের মধ্যেই পদচারণা আরম্ভ করিলেন, উচ্চ কঠোর শব্দ—অস্বচ্ছন্দ বা অসমচ্ছন্দ নয়, অত্যন্ত দৃঢ় এবং কঠিন।

কিছুক্ষণ পর আবার ছাত্রটি আসিয়া শঙ্কিত ভাবে দাঁড়াইয়া ন্যায়তীর্থের মুখের দিকে চাহিল। ন্যায়তীর্থ আবার তেমনি ভাবে গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন—কি?

—রায় বাহাদুর জ্ঞানরঞ্জনবাবু এসেছেন, দেখা করবেন।

ব্যস্ত হইয়া ন্যায়তীর্থ বাহিরে আসিয়া সম্ভ্রমভরেই রায় বাহাদুরকে আহ্বান করিলেন—আসুন, আসুন।

হে-হে-হে শব্দে এক বিচিত্র হাসি রায় বাহাদুর হাসিয়া থাকেন, সেই হাসি হাসিয়া বলিলেন—সাহেব পাঠালে আপনার কাছে। যেতে হবে আমার সঙ্গে। বাপ্ রে বাপ্—খাটিয়ে মেরে ফেললে মশায়, আর বলবেন না। আমার দফ

বক্ষা, সব তাতেই বেটার আমাকে না হলে চলবে না। চলুন, গাড়ি আছে আমার।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—এখুনি ?

হে-হে করিয়া আবার হাসিয়া রায় বাহাদুর বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ। খেতাব দেবে মশায়—আপনি তো নেবেন না, তাই আপনার ছেলেকে খেতাব দেবে মহামহোপাধ্যায়। তবু আপনাকে একবার জিজ্ঞেস করা তো দরকার। চলুন, চলুন।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—মণি, আমার চাদরখানা দাও তো।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুধাকৃষ্ণবাবু শশীকে সত্যই স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তিনি মানুষও ছিলেন সত্যকার গুণগ্রাহী ব্যক্তি। আজিকার এই আহ্বানের মধ্যে আরও একটু উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল। পিতা-পুত্রের এই আকস্মিক মতদ্বৈধের রূঢ়তাটুকু মুছিয়া দিয়া উভয়ের সম্বন্ধের স্বাভাবিক অবস্থার প্রতিষ্ঠাও ছিল গোপন সঙ্কল্প। শশীকেও তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন। ন্যায়তীর্থকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া বলিলেন—আপনার সঙ্গে পরিচয় লাভ করে আমি গৌরব অনুভব করছি ন্যায়তীর্থ। পরম আনন্দলাভ করলাম।

ন্যায়তীর্থ সবিনয়ে বলিলেন—আপনি জেলার রাজ-প্রতিনিধি ; আপনার সঙ্গে পরিচয় আমারও পরম সৌভাগ্য। রাজা-রাজপ্রতিনিধিরাই আমাদের রক্ষক, আপনারাই তো আমাদের ভরসা।

সুধাকৃষ্ণবাবু বলিলেন—অতি সত্য কথা। ত্রুটি আমাদেরই—আমরাই আপনাদের সন্ধান রাখি না, সম্মান করি না। সেই সায়েবের লেখার প্রতি এবার সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আপনাদের সম্মান সরকার করতে চান।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—আমাদের সৌভাগ্য।

—সম্মান অবশ্য উপাধি দিয়ে। তা সরকারের পত্র পেয়ে আমি হাসলাম। মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ন্যায়তীর্থের গৌরব আর কি বৃদ্ধি হবে! নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—অকিঞ্চিৎকর হলেও যখন রাজার দান এবং আমার প্রাপ্য তখন না নিলে উপায় কি বলুন! অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করব।

সুধাকৃষ্ণবাবু চুপ করিয়া গেলেন ; কিছুক্ষণ পর বলিলেন—খুব সুখী হলাম

আপনার কথা শুনে। সরকারকে আমি জানাব। শশিশেখরকেও আমরা দু-এক বছরের মধ্যেই উপাধি দেব। আর একটা কথা, শশী আজ বড়ই অন্যায় করেছে—তাকে আপনার মার্জনা করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে অনুতপ্ত হয়েছে।

কঠিন হাসি হাসিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—তাহলে বলছেন, অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছে; স্বপ্নাতুর বা তন্দ্রাতুর অবস্থা থেকে জাগ্রদবস্থায় অবস্থান্তর! আহ্বানের তাহলে প্রয়োজন আছে!

সুধাকৃষ্ণবাবু হাসিলেন, বলিলেন—তরুণ বয়সের ধর্মকে সহ্য করে নিতে হবে ন্যায়তীর্থ মশাই, না নিলে উপায় কি?

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—দুদিন পরে, দুদিন পরে। আজ আদেশ করবেন না, পারব না। আজ আমি যাই।

ন্যায়তীর্থের খড়ম ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ন্যায়তীর্থ চলিয়া যাইতেই সুধাকৃষ্ণবাবু পাশের ঘরের দিকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিলেন—পণ্ডিত!—শশীকে তিনি পাশের ঘরেই বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ উত্তর দিল না। সুধাকৃষ্ণবাবু উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া দেখিলেন, ওপাশের দরজা খোলা, ঘরে কেহ নাই।

শশী সমস্তই শুনিয়াছিল। সে উদ্‌ভ্রান্তের মতই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। আজ সে স্পষ্ট অনুভব করিল তাহার প্রতিষ্ঠায় তাহার পিতার ঈর্ষা; জীবনের প্রতিটি ঘটনা আজ নূতন আলোকে আলোকিত হইয়া নূতন রূপে তাহার চোখে দেখা দিল। সহসা তাহার মাকে মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার সম্মুখে সে দাঁড়াইবে কেমন করিয়া! চলিতে চলিতে সে হোঁচোট খাইল, চটিটা ছিঁড়িয়া গেল। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ধিক্কারে লজ্জায় তাহার মন ছি-ছি করিয়া সারা হইতেছে। মাথার ভিতরটা কেমন করিতেছে! মনে ইচ্ছা হইল—দুই হাতে দলিয়া পৃথিবীর সব কিছু যদি সে মুছিয়া দিতে পারিত।

চারিদিকে অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছে, সে বিভ্রান্তের মত লোকালয় ছাড়িয়া চলিল! কে যেন তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে। সে তাহার পিতা—দাম্ভিক ন্যায়তীর্থ। শহর পার হইয়া ঘন জঙ্গল—জঙ্গলের পরে রেল-লাইন। শশিশেখর সেই জঙ্গলের অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল।

শশিশেখরের আর সন্ধান মিলিল না। সন্ধান করিয়া পরদিন মিলিল রেল-লাইনের উপরে কোনো অসতর্ক পথিকের খণ্ড খণ্ড ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহের

মাংস, অস্থি, মেদ, অন্ত্র! মাথাটা পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে! চিনিবার উপায় নাই।

মাস-ছয়েক পর।

ন্যায়তীর্থ টোলের বারান্দায় অভ্যাসমত বসিয়া ছিলেন। ইহারই মধ্যে তিনি স্থবির হইয়া গিয়াছেন। পৌত্র চন্দ্রশেখর কাছেই দাওয়ার উপর বসিয়া একটা কাগজ চুষিতে ব্যস্ত ছিল। ন্যায়তীর্থ উদাস দৃষ্টিতে দিক্‌চক্রবালের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

একটি ছাত্র সহসা ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া চন্দ্রশেখরের হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া বলিল—এ-হে-হে, উপাধি-পত্রখানা নষ্ট করে ফেললে!

কাগজখানি সরকার-প্রদত্ত মহামহোপাধ্যায় উপাধি-পত্র,—আজই কিছুক্ষণ পূর্বে সেটা আসিয়াছে। চন্দ্রশেখর এমন উপাদেয় ভোজ্য বস্তুটি হইতে বঞ্চিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এতক্ষণে ন্যায়তীর্থের চমক ভাঙিল। তিনি পৌত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—কি হল, কাঁদছ কেন দাদু?

ছাত্রটি শঙ্কিত স্বরে বলিল—খোকা উপাধি-পত্রখানা মুখে পুরে নষ্ট করে ফেলছে। ওটা নেওয়াতেই ও কাঁদছে।

ন্যায়তীর্থ ছাত্রের হাত হইতে উপাধি-পত্রখানা লইয়া খোকার হাতে তুলিয়া দিলেন।

কা ম ধে নু

—ওহি যো আঁতঠো, উঠো গরুকা হ্যায়, না?—ফাঁসির আসামী নাথু প্রশ্ন করলে ওয়ার্ডারকে। বাঙালী পটুয়ার ছেলে নাথুর হিন্দী এর চেয়ে আর কত ভালো হবে?

—কেয়া?—বিস্ময়ে এবং তীব্র বিরক্তিতে দোবেজী ওয়ার্ডারের মুখের ভাব অদ্ভুত হয়ে উঠল। 'গরুকা আঁত' অর্থাৎ গরুর অন্ত্র, কথাটা শোনা মাত্র তার অন্তর থেকে দেহের সর্বাঙ্গ যেন অস্পৃশ্য বস্তুর ছোঁয়াচ অনুভব করলে।

নাথু কিন্তু গ্রাহ্য করলে না। ফাঁসির আসামী ওয়ার্ডারের বিরক্তিকে গ্রাহ্য

করবে কেন ? ওয়ার্ডার তাকে সেলে পুরে লোহার গরাদে দেওয়া দরজাটা বন্ধ করছিল। নাথু ভিতরের দিকে গরাদে ধরে ওয়ার্ডারের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কথাটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলে, ওহি যো—যেঠো হামারা গলায় পরায়কে ঝুলায় দেগা, উঠো তো আঁত হ্যায়, তা উঠো গরুকা আঁত হ্যায়, না, আর কিছুকা হ্যায় ?

অর্থাৎ ফাঁসির আসামীর গলায় যে দড়িটা পরিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়—নাথুর ধারণা সেটা কোনো জানোয়ারের অন্ত্র থেকে তৈরি। তার প্রশ্ন হল—সে অন্ত্রটা গরুর অথবা অন্য কোনো জানোয়ারের ? দোবে দীর্ঘদিন বাংলার জেলখানায় ওয়ার্ডারের কাজ করছে, এ ধরনের উদ্ভট হিন্দী বুঝতে সে অনায়াসেই পারে।

দোবেজী মুখ ঘুরিয়ে বার কয়েক থুথু ফেলে বললে, আরে না না, আঁত-টাঁত না আছে রে। ডুরি—ডুরি আছে। বহুত ফাইন ডুরি—মোম—

বাধা দিয়ে নাথু বললে, ডুরি ? দড়ি ? এই দড়ি ?

—হাঁ, হাঁ, দড়ি—দড়ি।—নাথুর মুখের দিকে চেয়ে সে থেমে গেল।

দুটো গরাদে শীর্ণ হাতের শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে নাথু আকাশের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের শিরাগুলো স্ফীত হয়ে উঠেছে, মুখের দু পাশের চোয়ালের হাড় দুটো অসম্ভব রকমের উঁচু হয়ে উঠেছে, স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, জীর্ণ শরীরের সকল শক্তি প্রয়োগ করে সে দাঁতে দাঁতে চেপে ধরেছে।

দোবে প্রবীণ লোক। ফাঁসির আসামীদের সম্পর্কে বহু বিচিত্র গল্প সে শুনেছে ; নিজেও চোখে দেখেছে এগারোটা ফাঁসির আসামী,—নাথুকে নিয়ে হবে বারোটা। এগারোটার অভিজ্ঞতাই তার যথেষ্ট, অর্থাৎ নাথু সম্বন্ধে আর তার কোনও কৌতূহল নাই।

দরজায় তালা লাগিয়ে বার কয়েক ঝাঁকি দিয়ে টেনে দেখে নাল-মারা জুতোর শব্দ তুলে সে চলে গেল।

ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পাটাতনের নীচে অন্ধকার গর্তের মধ্যে শরীরের সকল স্নায়বিক আক্ষেপ শেষ হয়ে গেলে নাথুর দেহ স্থির হয়ে যাবে, চোখে দৃষ্টি থাকবে না, আরও বিকৃতি হবে অনেক। সে দৃশ্য চোখে না দেখাই ভালো। কিন্তু এই মুহূর্তে মন-হীন অথচ জীবন্ত নাথুর চেহারা দেখে শিল্পীর লোভ হবে ছবি আঁকতে। যোগপন্থী সন্ন্যাসী বিস্মিত হয়ে ভাববে, খুনী লোকটা পেলে কোন পুণ্যে এই বস্তু! নাথুর দেহ থেকে মন বেরিয়ে চলে গিয়েছে। বাইরের প্রত্যক্ষ পারিপার্শ্বিক সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে মনোলোকের গভীরে অন্ধকার অবচেতনে

প্রবেশ করেছে—এ কথা বললে তর্ক তুলব না; কিন্তু সবিনয়ে বলব, আমার বিশ্বাস সেলের মধ্যে আবদ্ধ নাথুর মন ইট কাঠ লোহার স্থূল কঠিন নিশ্ছিদ্র অবস্থানকে অতিক্রম করে লাল-মাটির পাকা সড়ক ধরে চলে যাচ্ছে—এ আমি দেখতে পাচ্ছি।

লাল মাটির সড়কের দু পাশে ঘন সারিবদ্ধ গাছ, মধ্যে মধ্যে বড় বড় গ্রাম, বাজার, পাকাবাড়ি—দালান কোঠা, গ্রাম শেষে আছে মাঠ; মাঠের বুক চিরে মেটে রাস্তা, তেমনই একটি মেটে রাস্তা ধরে চলেছে তার মন। মেটে রাস্তার পাশে পাশে ছোট ছোট গ্রাম, খড়ো বাড়ি, বাঁশবন, ডোবা, আম-কাঁঠাল-শিরীষ-গাছের বাগান ঘেরা মরা দীঘি, মধ্যে মধ্যে আকাশ-ছোঁয়া অশ্বত্থ গাছ, বিরাট ছাতার মত বটগাছ, সারিবন্দী তালগাছ, পড়ো ভিটাতে খেজুরগাছ, বড় বড় গাছের তলায় চাপ বেঁধে বাবুরি, মানে—বনতুলসীর জঙ্গল, নয়নতারা ফুলের গাছ, কালুকাঁটার বন, ম্যালেরিয়া-গাছের জঙ্গল চলে গিয়েছে গ্রামের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত। মধ্যে বড় বড় গাছগুলোর এক-একটার মাথায় আলোকলতা, তলায় ছোট গাছের জঙ্গলের মধ্যে লতিয়ে বেড়ায় বিছুটিলতা। এ সব হল চাষী-সদ্গোপের গ্রাম। সে গ্রাম পার হয়ে ওই মেটে পথ থেকে মন তার পথ ধরে—আঁকা বাঁকা আলপথে-পথে। মাঠের মধ্যে, ছোট একটা 'বাঁদর' অর্থাৎ ছোট গেঁয়ো নদী বা বড় নালা; সে নালার দু ধারে ঘন অর্জুন-গাছের জঙ্গল; নালার উপরে বাঁশের সাঁকো। সে সাঁকো পেরিয়ে ছোট একখানি গ্রাম, কুড়ি-পঁচিশ ঘর পটুয়ার বাস। লোকে সকালে 'দুর্গা দুর্গা' 'হরি হরি' বলে ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে মুখে হাতে জল দিয়ে আল্লাতায়লাকে ডাকে, রসুল আল্লাকে স্মরণ করে। কেউ গৌরাঙ্গের নাম নিয়ে খঞ্জনি-পট নিয়ে গ্রামান্তরে বার হয়, কেউ শুধু খঞ্জনি নিয়ে শিবদুর্গার নাম নিয়ে বার হয়, কেউ গো-মাতা সুরভির নাম নিয়ে বার হয়।

"সুরভিমঙ্গল গান গোধন-মহিমা
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণে দিতে নারে সীমা।
লোমকূপে কূপে মায়ের দেবতারই বাস
যে সেবে গো-মাতা তার পূরে সর্ব আশ।"

তালে তালে হাতের মন্দিরা বাজে ঠুন-ঠুন ঠুনু-নুন; ঠুন-ঠুন ঠুনু-নুন; ঠুন-ঠুন ঠুনু-নুন; ঠুনু-ঠুনু ঠুনু-নুন।

নবলক্ষ গাভীর পাল ছিল এক গৃহস্থের। ঘরের কত্তাবুড়ো সকালে গোয়ালের দরজায় প্রণাম করে দরজা খুলত। বড় বউ করত গোয়াল পরিষ্কার। বড় ছেলে

দিত খেতে। মেজ ছেলে দুইত দুধ। ছোট ছেলে নিয়ে যেত মাঠে। নবলক্ষ গাভী খুঁটে খুঁটে কচি ঘাস খেত, সে চারিদিকে পাহারা দিয়ে ফিরত ; কোথায় আসছে সাপ, কোথায় উঁকি মারছে হুড়ার। তার হাতে থাকত লাঠি, কোমরে গোঁজা থাকত বাঁশী। সন্ধ্যায় নবলক্ষ গাভী এসে দাঁড়াত গোয়ালের সামনে। এবার সেবার পালা পড়ত বাড়ির বুড়ি-গিন্নীর—ছেলেদের মায়ের ; প্রতিটি গাইয়ের ক্ষুরে জল দিত, শিঙে তেল দিত, কপালে দিত হলুদ আর সিঁদুর। তাদের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে মা-সুরভি পাঠিয়ে দিলেন নিজের মেয়ে নন্দিনীর এক মেয়েকে। 'কামধেনু'।

দেখলেই মনে হয়, আশ্বিন মাসের আকাশের সাদা মেঘের মত নরম আর সাদা ওই বকনা বাছুরটি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় ; গায়ে হাত দিলে মনে হয়, কোনো কচি দেবকন্যার অঙ্গে বা হাত পড়ল। হাতের নীচে কামধেনুর অঙ্গখানি শিউরে শিউরে ওঠে ; পায়ের ক্ষুর পরিষ্কার করতে বসলে মাথার চুল টেনে আশীর্বাদ করে, ঘামে-ভরা পিঠ চেটে আদর করে। সাধারণ গরু পিঠ চাটে ঘামের নোনতা আস্বাদের জন্য ; কামধেনুর সম্পর্কে ও কথা বলা চলে না। নইলে সে যখন যুবতী হয়ে ওঠে, সর্বাঙ্গ ভরে ওঠে পুষ্টিতে, চিকনতর লোমে, গলার গলকম্বল প্রশস্ত হয়ে ঝুলে পড়ে মন মোহিত করে দুলতে থাকে, পিছন দিকটা ক্রমশ ভারি হয়ে উঠে থমকে থমকে চলে, অথচ সন্তান প্রসবের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। গৃহস্থ যখন বন্ধ্যা গাই বলে বিরক্ত হয়ে ওঠে, তখন একদিন বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে কামধেনুর মহিমা প্রকাশ পায়। সন্তান প্রসব করে না, অথচ প্রবালের মত রক্তিম আভায় এবং এক রাশি পদ্মফুলের মত পেলবতায় অপরূপ লাবণ্যে মণ্ডিত হয়ে তার স্তনভাণ্ড স্ফীত হয়ে ওঠে, পাকা বিল্বফলের মত পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে স্তনবৃন্তগুলি ; প্রথমে বিন্দু বিন্দু দুধ দেখা দেয় স্তনবৃন্তের মুখে ; তারপর ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে মাটিতে, কামধেনু সাড়া দেয় ডাকতে থাকে ; যেমন সন্তানবতী গাভীর স্তনে দুধ জমে উঠলে সে সন্তানকে ডাকে তেমনই ভাবে ডাকে কামধেনু, ডাকে গৃহস্থকে, বলে—আমার সুধায় তোর ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটুক, তোর সন্তান দুধে-ভাতে থাকুক, নে, পাত্র এনে আমার সুধা সংগ্রহ করে নে। এতেও যদি গৃহস্থ বুঝতে না পারে, তবে কামধেনু তখন বসে পড়ে ; স্তনের উপর দেহের চাপ দিয়ে অনর্গল সুধা ক্ষরিত করে দেখিয়ে দেয়।

বহু পুরুষের পুণ্যফল, বহু জন্মের সৎকর্মের সৌভাগ্য। পটুয়ার ঘরে কামধেনু একদিন ঠিক এই ভাবেই আত্মপ্রকাশ করলেন। পুরুষানুক্রমে তারা 'সুরভিমঙ্গল' গান গেয়ে গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে গো-মাতার মহিমা প্রচার

করে আসছে ; কত পুরুষ তার সঠিক হিসেব নাই, তবে বাপের বাপ কর্তাবাপকে বুড়ো অবস্থাতেও দেখেছিল নাথু, তারই কাছে তার গানশিক্ষার হাতেখড়ি ; বাপের সঙ্গে একসঙ্গে ভিক্ষায় বেরিয়েছে, তার গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান করেছে ; নিজেও এই গান গাইছে। বহু পুরুষের সেবার পুণ্যফলের হিসেব, জমা-খরচের মত ওর প্রমাণ-প্রয়োগ লাগে না, কিন্তু বহু জন্মের সৎকর্মের ভাগ্যের কোনো লিখিত-পঠিত দলিল নাই। আর গাছের চারা দেখে যেমন মাটির তলার অদেখা বীজটির আকার প্রকার গুণাগুণ অনুমান করতে কষ্ট হয় না, তেমনই ধারায় কামধেনুর আবির্ভাবে পূর্বজন্মের সুকৃতিকে সহজেই মেনে নিয়েছিল নাথু। এ জন্মের পুণ্যও আছে। নইলে এই বৃদ্ধ বয়সে এ ভাগ্য হল কি করে ?

নিজেদের ঘরের গাইয়ের বাছুর। সাদা ধবধবে রঙ ; অত্যন্ত শান্ত, বাড়ির লোকের গা চেটে চেটে পাশে পাশে ফিরত। সে যখন বড় হয়ে সন্তান প্রসব করলে না, তখন সকলে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। সেই সময় ঘটল এই ঘটনা। পটুয়া-পাড়ার সকলে ভিড় করে দেখতে এল। শুধু পটুয়াপাড়া নয়, গ্রাম-গ্রামান্তরের চাষী-সদগোপেরা এল, গোয়ালাপাড়ার ঘোষেরা এল, বিপ্রচক্র গ্রামের ভটচাজ এলেন। সকলে একবাক্যে স্বীকার করে গেল, হ্যাঁ, নাথুর পূর্বপুরুষের সেবা আর নাথুর জন্ম-জন্মান্তরের সৎকর্মে তিলার্ধ সন্দেহের অবকাশ নাই। এবং এতেও কোনো সংশয় নাই যে, এইবার নাথুর সংসার ধনে-ধান্যে সুখে-শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

নাথুও তাতে সন্দেহ করলে না—সে আশা করেই বসে রইল। তার লক্ষণও যেন দেখা দিল। কামধেনুর দুধের জন্য লোক আসতে আরম্ভ করলে। আগে দেশে ছিল এক আনা সের দুধ—টাকায় ষোল সের ; এখন আক্রাগণ্ডার বছরে টাকায় আট সের, এক সের দুধের দু আনা দাম। নাথু কামধেনুর দুধের দাম স্থির করলে চার আনা সের। লোকে আপত্তি করলে না। এই আপত্তি না করাটাই তার কাছে সৌভাগ্য সমাগমের প্রথম লক্ষণ বলে মনে হল। কিন্তু কামধেনু সমস্ত দিনে দুধ দেয় এক সের, প্রচুর সেবা করেও পাঁচ পোয়ার বেশি দুধ উঠল না। তখন চার আনাকে সে তুললে আট আনায়। লোকে তাতেও আপত্তি করলে না। দৈনিক দশ আনা পয়সা কামধেনুর আশীর্বাদ। তা ছাড়া মধ্যে মধ্যে আরও উপার্জন হয় আকস্মিকভাবে। নাথু যায় ভিক্ষায়। কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, এক হাতে মন্দিরা, এক হাতে সরু বাঁশের তেলে-পাকানো লাল রঙের দেড় হাত লম্বা লাঠি, মাথায় গামছার পাগড়ি, গায়ে ঢিলেঢোলা বেমানান রকমের একটা ভিক্ষেয় পাওয়া জামা।

সুরভিমঙ্গল গান করে ভিক্ষে পায় চাল। গো-চিকিৎসা করে পায় দু-আনা চার আনা বকশিশ। কোথাও কারও বাড়িতে গরুর অসুখের কথা শুনলে নিজেই গিয়ে উপস্থিত হয়। এই নিয়ম, এই ওস্তাদের আজ্ঞা, পিতৃপুরুষের এই আচার। অবোলা জীব, তার জন্যে ডাকবে কে? সাক্ষাৎ ভগবতী, তার সেবার জন্যে আহ্বানের প্রয়োজন আছে নাকি?

প্রথমেই গরুর গায়ে হাত দেয়। স্পর্শ মাত্র শরীরে তার শিহরণ খেলে যায় কি না পরীক্ষা করে। তারপর জিভ দেখে, মাড়ি দেখে, ঘা দেখা দিয়েছে কি না পরীক্ষা করে। কানের ডগা মুঠোয় চেপে ধরে পরীক্ষা করে। পায়ের ক্ষুর দেখে।

তারপর ভিক্ষার ঝুলির ভিতর থেকে বার করে ছোট একটি ঝুলি। হরেক রকম শিকড় জড়িবুটির মধ্য থেকে বেছে ওষুধ দেয়।

বাদলার অর্থাৎ জ্বরের ওষুধ, ঘুঁটুকের ওষুধ, ঘুঁড়িয়ার ওষুধ। 'গুটি' অর্থাৎ বসন্ত হলে মুখ ম্লান করে বলে, মা-শীতলার পূজা করান মা, পুষ্প বেঁধে দিন গোয়ালের চালের বাতায়, চরণামেত্ত খাইয়ে দেন সব মা-ভগবতীকে। মায়ের রোষ, এর আর ওষুধ কোথা বলুন?

ওষুধের দাম জিজ্ঞাসা করলে জিভ কেটে বলে, ও কথা বলবেন না, ওষুধের দাম নিতে নাই। তারপর হেসে বলে, দামই বা কি বলেন? নদীর ধারে খোদাতায়ালা শ্রীহরি করেছে গাছের সিরূজন, তারই শিকড় আর পাতা। কতক তো আবার ঘরের পাঁদাড়ে, তুলে নিয়ে আসি। বড়িগুলান বানাতে এক পয়সার গোলমরিচ, কি আনা-টাকের সিদ্ধি, কি দু পয়সার অন্য কিছু লাগে; তা গেরস্তর দুয়ারে গোধনমঙ্গল গান করে তো ভিক্ষে পাই। পেট ভরেও তো দু-চার আনা বাঁচে মাসে। তবে—

হাত দুটি জোড় করে বলে, তবে যদি বকশিশ করেন, দু-হাত পেতে নোব, নাম করতে করতে বাড়ি যাব।

—কি বকশিশ নেবে বল? কি হলে খুশী হও?

—গেরস্তের হাত ঝাড়লে তাই আমাদের কাছে পর্বত। যা দেবেন তাতেই খুশী। না-দেবেন তাতেও খুশী। গোমাতার সেবা করলাম, সেই পুণ্যিতে পারে যাব, আমার ছেলেপুলে ভালো থাকবে—মা-সুরভির আশীর্বাদে।

ছেলেপুলে নাই নাথুর, তবু ওই কথাগুলি গড়গড় করে বলে যায়, পিতৃ-পুরুষের কথা, নিজের ছেলেপুলে নাই বলে কি সে কথার খানিকটা বাদ দিয়ে অঙ্গহীন করতে পারে?

এক এক গৃহস্থ-বাড়িতে—বিশেষ করে ভদ্রগ্রামের গৃহস্থ-বাড়িতে—গরুর ব্যাধি লেগেই থাকে। তাদের বলে, আপনারা বাবুলোক—সদ্‌জাতি, গরুর সেবা আপনাদের রাখালের হাতে। মা-ভগবতী অবহেলা সইতে লারেন বাবু! ভালো করে যত্ন লিবেন। নিজের হাতে সেবা না করেন, নিজে দাঁড়িয়ে চোখে দেখবেন হুজুর।

—দেখি তো বাপু! নিজে দু বেলাই দাঁড়িয়ে দেখি।

—তবে?—চিন্তিত হয় নাথু। চিন্তা করে বলে, তবে গোয়ালের দোষ হয়ে থাকবে।

বাড়ির প্রৌঢ়া গৃহিণী—গৃহস্বামীর মা এবার এগিয়ে আসেন। বলেন, দোষ হয়েছে কি না তুমি বলতে পার?

—জানি বইকি মা। এ যে আমার পিতি-পুরুষের কুলকরম। গুনে বলতে পারি।

—আমার চল্লিশটা গরু। বড় বড় বলদ। দেড়শ-দুশ এক-একটার দাম।

—আহা মা, তুমি ভাগ্যবতী!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রৌঢ়া বলেন, সে সব তো পুরনো কথা বাবা। আজ পাঁচটিতে ঠেকেছে।

নাথুর মাথা ঘন ঘন নড়তে থাকে সমবেদনায়, আক্ষেপে,—আহা-হা, আহা-হা! আহা-হা মা!—সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের পিছনে জিভ টেনে টেনে আক্ষেপব্যঞ্জক শব্দ তোলে—চুক্ চুক্ চুক্ চুক্।

—একটা একটা রোগ হচ্ছে—মরছে। রোগ হলে, ভালোও তো হয়; কিন্তু আমার ঘরে রোগ হলে গরু বাঁচে না।

—আহা মা!—প্রৌঢ় নাথু হলুদ চোখ তুলে তাকায় প্রৌঢ়ার দিকে। দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে।

—দুধোল গাই একটা সেদিন আমার ধড়ফড় করে মরে গেল। দেখ তো গুনে—গোয়ালের কি দোষ হল?

—গোয়ালের আঙিনায় চলেন মা।

গোয়ালের আঙিনায় বসে ভিক্ষার ঝুলি থেকে বার করে লাল খেরুয়ার তৈরি ছোট থলিটা। থলিটি খুলে বার করে এক টুকরো খড়ি। হাত দিয়ে সামনের খানিকটা জায়গার ধুলো পরিষ্কার করে নেয়, তারপর বার বার ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে সরিয়ে দেয়, তারপর নিজের মাথার গামছা নিয়ে খুঁট দিয়ে পরিষ্কার করে। পরিষ্কার জায়গাটার উপর খড়ি দিয়ে তিনটি সমান্তরাল রেখা টানে।

তার সামনে নিজের বাঁ হাত পেতে বিড় বিড় করে কত কিছু বলে যায়। বিড়বিড় মন্ত্র শেষ করে বেশ চীৎকার করে বলে, দোহাই মা কাউরের কামিক্ষে! দোহাই তেত্রিশ কোটী দেবতার! দোহাই রসুলে আল্লার! দোহাই মুনি ঋষির! দোহাই পীর গাজীর!—

যদি কিছু থাকে বলিস।
না যদি হয় তো ডাইনে বাঁয়ে চলিস।

হাত তার চলতে থাকে মাটির উপরে। ডাইনে যায় না, বাঁয়ে যায় না— সমান্তরালরেখা তিনটির মাঝখানে গিয়ে থেমে যেন চেপে বসে যায়।

নাথু মুখ তুলে প্রৌঢ়ার দিকে চেয়ে বলে, আছে মা, দোষ আছে।

—কি দোষ?

চুপ করে থাকে নাথু।

—কি দোষ, বল?

চোখ বুজে নাথু বলে, বহুকালের পুরনো গোয়াল মা আপনার, অনেক গরুর রোগের বিষ জমে আছে মা, অনেককালের গোবর-চোনা জমে আছে। তা ছাড়া, মানুষেও দোষ করে—মদ এনে লুকিয়ে রাখে; মাংস এনে খায়। অভয় দেন তো বলি মা—ব্যভিচার হয় বলেও সন্দ হয় মা।

অভিযোগের কোনোটাই অসম্ভব নয়। গোবর-চোনা সত্যিই জমে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। আগে কৃষাণেরা চাষের আগে গোয়ালের মাটি কেটে তুলে নিত, সার হিসেবে ব্যবহার করত জমিতে, আজকাল সে কষ্ট তারা করে না। বাউরী ডোম রাখাল মাহিন্দারে বাবুদের গোয়ালের মধ্যে বেআইনি চোলাই মদ লুকিয়ে রাখে—পুলিশের ভয়ে সেখানে বসে মাছ-মাংসের সঙ্গে মদও খায়। আর ব্যভিচারও হয়। বাড়ির কর্মচারী থেকে মাহিন্দার পর্যন্ত তাতে লিপ্ত। স্বৈরিণী হরিজনকন্যার অভাব নাই; গোয়ালের মত নির্জন অন্তরালও আর নাই। অভিযোগগুলি অবহেলিত গোপন সত্য। অথচ পাপ, তাতে সন্দেহ নাই। মায়ের মুখ থমথমে হয়ে উঠে। তিনি ছেলেকে বলেন, শুনলে তো? প্রতিবিধান কর এ সবের। নইলে শেষ পর্যন্ত বাড়ির লক্ষ্মীও বিদায় নেবেন।

—আহা মা, তুমি পুণ্যাত্মা। দিব্য বুদ্ধি তোমার!—নাথু মুগ্ধ হয়ে যায় প্রৌঢ়ার কথা শুনে।

প্রৌঢ়া এবার নাথুকে বলেন, এর উপায় বলতে পার?

—পারি মা। সাতটি তুলসীপাতা, সাতটি বেলপাতা, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ, গোরক্ষনাথ শিবের আশীর্বাদ, আর সর্বজয়া—বেনের দোকানে পাবেন মা

সবজয়া, এই—একসঙ্গে করে পুঁতে দেবেন গোয়ালে। আর গোয়ালের মাটি তুলে দেন ; দেয়ালগুলি নিকিয়ে দেন। আবার মা-স্বুরভির দয়া হবে। নবলক্ষ পালে গোয়াল আপনার ভরে যাবে।

—কিন্তু গোরক্ষনাথের আশীর্বাদ কোথায় পাব ? সে তো অনেক দূর!

—আমি দিব মা। আমার কত্তাবাপ গিয়েছিল। সেই আশীর্বাদী তিন পুরুষ ধরে আমাদের আছে মা। বাবা গোরক্ষনাথের নাম নিয়ে নতুন বেলপাতা তাতে দিয়ে দিয়ে রাখি। এক ফোঁটা গঙ্গাজল পরশ করলে পাপ যায়। এক কলসী জল দিলে, সেও গঙ্গাজল হয়ে উঠে।—বলতে বলতেই সে ঝুলি খুলে একটি শুকনো বেলপাতা বার করে আলগোছে মায়ের হাতে ফেলে দেয়।

মা খুশী হয়ে নাথুকে দেন একখানা পুরানো কাপড়, একটা জামা, আট আনা পয়সা এবং আঁচল ভরে চাল, তার সঙ্গে মুড়ি আর নাড়ু।

নাথুর কৃতজ্ঞতার আর সীমা থাকে না। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, মঙ্গল হবে মা, কল্যাণ হবে মা, ধর্মের সংসার তোমার, তোমার পুণ্যে—যে পাপ বাইরে থেকে আসুক, আগুনের মুখে তুলোর মত, খড়ের মত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে মা।

মা হাসেন—পরিতৃপ্তিতে স্নিগ্ধ মিষ্ট হাসি।

নাথু বলে, আপনি গোয়ালের মাটি কাটান, দেওয়াল নিকান, তারপর একদিন আমার মা-স্বুরভিকে এনে আপনার গোয়ালে নিশ্বাস ফেলিয়ে পবিত্র করিয়ে দিব, স্বুরভির গোবরে চোনায় সব দোষ কেটে যাবে মা। আমার বাড়িতে কামধেনু আছেন মা।

—কামধেনু!—প্রৌঢ়ার বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

—হ্যাঁ মা, কামধেনু।

নাথু সগৌরবে কামধেনুর বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা করে, আশ্বিন মাসের সাদা নরম মেঘের মত বরণ, তেমনই কোমল আমার মায়ের অঙ্গ। পলা জানেন মা? জানবেন বইকি—লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—হীরা মণি মুক্তা প্রবাল, এ সবই তো মায়ের ভাণ্ডারে আছে। তেমনই বরণ আমার কামধেনুর পালানের, মাখনের মত নরম—মোলাম।

বলেই যায় নাথু, বলেই যায়। থামতে চায় না, মনে হয়, বলা হল না।

মা বলেন, তুমি ভাগ্যবান বাবা। এনো একদিন, নিয়ে এস। মায়ের পূজো করব আমি।—তারপর হঠাৎ বলেন, 'বসোয়া' নিয়ে হিন্দুস্থানীরা বেড়ায়। তুমি তোমার কামধেনু নিয়ে বেড়াও না কেন বাবা? গেরস্তের মঙ্গল হয়। তোমারও মায়ের কৃপায় রোজগার হয়।

রাজার ঘরের মেয়ে—রাজার ঘরের রানী—রাজার মা—রাজবুদ্ধি। মায়ের বুদ্ধি আর মা-স্বরভির মাহাত্ম্য। নাথুর সংসার পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কামধেনুর শিং দুটিতে সে পিতলের খাপ পরিয়ে দিলে। গলায় ঝুলিয়ে দিলে চার-পাঁচ সারি লাল সবুজ হলুদ কালো পাথরের মালা, তার সঙ্গে ঘুঙুর ঘণ্টা, পিঠে চাপিয়ে দিলে ছাপানো কাপড়ে কড়ি গেঁথে সুন্দর দোলাই। মাকে নিয়ে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরত। পরীক্ষা দেখাত কামধেনুর বাঁট টিপে দুধ বার করে। বেলা দুপহর পর্যন্ত গেরস্তের দোরে দোরে ঘুরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে মাঠের কোনো দীঘির ঘাটে এসে বসে নিজে মুড়ি চিবুত; কামধেনুর সামনে বিছিয়ে দিত একখানি গামছা, তাতে ঢেলে দিত ভিক্ষার চালের কিছু চাল, কামধেনু চালগুলি খেয়ে ঘাটে জল খেত, তারপর উঠে এসে নাথুর পিঠ চাটত, মাথার চুল চাটত।

হঠাৎ কি যে হল! জানেন খোদাতায়লা, জানেন ভগবান গোলোকপতি হরি, জানেন পয়গম্বর, জানেন মুনি ঋষিরা, সাধু মহাত্মারা। তাই বা কেন? নাথুও জানে। জানবে না কেন? পাপ। পাপে ভরে গেল দুনিয়া। পাপের ভার পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটতে লাগল। মহামারণ চলতে লাগল, তার আর বিরাম নাই। সে বছর বানে দেশ গেল ডুবে-হেজে। ফিরে বছরে শীতকালে মাঘ মাসের পয়লা পৃথিবী উঠল কেঁপে—ভূমিকম্প। নাথু গিয়েছিল মা-স্বরভিকে নিয়ে গ্রামান্তরে। দুপুরবেলা দুনিয়া টলতে লাগল—বাড়ি দুলছে, বড় বড় গাছ দুলছে, দীঘির জল এ-পার থেকে ঢেউ তুলে ও-পারে ছুটছে, ও-পার থেকে হুড়হুড় করে এ-পারে আসছে, আছাড় খেয়ে পড়ছে। মাটির ভেতর থেকে শব্দ উঠছে—যেন দশ-বিশটা রেল-ইঞ্জিন ছুটে আসছে, সে ইঞ্জিনে 'ডেরাইবর' নাই। মা-স্বরভি বসে পড়ল মাটির উপর, নাথু উলটে পড়ে গেল। বসুমতী স্থির হলেন, নাথু বাড়ি এল। বাড়িঘরের চিহ্ন নাই, পড়ে আছে শুধু ভাঙা দেওয়াল, আছাড় খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়া চাল। কোথায় স্ত্রী, কোথায় ছেলেরা, কোনও সন্ধান মিলল না। তিন দিন লাগল মাটি সরাতে; তখন মিলল সন্ধান; পচা গন্ধ বেরিয়েছে তখন।

তার পর-বছর এল আরও ভয়ঙ্কর বছর। পৃথিবীর মাটি শুকিয়ে হল কাঠ, তেতে হল আগুন, আকাশ গেল ঘন-কুয়াশায় ভরে—মেঘ গেল উড়ে, বাতাস হয়ে উঠল আবিল, নদী গেল শুকিয়ে, পুকুরে দীঘিতে জেগে উঠল পাঁক—শুকিয়ে শুকিয়ে তাও ফেটে হল চৌচির। মাটি জল বাতাস দূরের কথা, নাথুর কামধেনুর দুধ গেল শুকিয়ে। আগে একটা গ্রাম ঘুরলে চাল-কাপড়ের বোঝা নাথুর পক্ষে

ভারি হয়ে উঠত। এখন তি
খালি থাকতে আরম্ভ করল!

সেই বছর।

নাথুর পরীক্ষা। নাথুর স
যুবতী মেয়ে ফুলমণি। ভূমি
পড়ে জীয়ন্তে, যখন খোদাতাল
আর সংসার সে করবে না ব
ঋষিদের সামনে স্বর্গের অপ্সরা
হেলে যেমন ভাবে এসে দাঁড়
হাঁপানীর রোগী, তার উপর
একশ টাকা আর পাঁচ মণ
ফন্দি করছিল; কিন্তু ফন্দির
কুৎসিত কদাকার হেফাজ
চেয়ে যমদূতেরা কার্তিক।

—তার মানে?

বাঁকা চোখে চেয়ে
পাচালি গান কর, এর
ভালো।

ফুলমণির এমন কিছু
হাতে পড়ে, বিশেষ করে এই
যে দুটি ছিল অপরূপ, সে
ডবডবে চোখ আর পাতলা ঠোঁ
হয়, মেয়েটার চোখে যেন কি
ওই ঘোরের ছোঁয়াচ লেগে যা

সেলের গরাদে ধরে নিস্পন্দ
ঘাড় ফিরিয়ে এ-পাশ ও-পাশ
ভিতরটা একবার ভালো করে
এসে সে গরাদে ধরে দাঁড়াল।
—সিপাহীজী!

—কেয়া?

যাও, যাও, বইঠো, আরাম

।—ইঃ। এ—হো সিপাহীজী—

়লা ছুঁড়ে দিয়ে গেল। নাথু
াকতে আরম্ভ করলে। চোখ
করে দিন কাটালেও নাথু
থু চিত্রকর ; জাতিতে পটুয়া,
আঁকার খেয়ালটাও তার
র চোখ ছুটো মনে পড়ে বুকে
দিন বাঁচবে,—ফুলমণির চোখ
াথ !
াথু, ছড়া মঙ্গলগান অনেক
ই কথা তার জিভের ডগায়
কথা বলতে বলতে ফুলমণির
তখন আধখানা চাঁদের মত ;
র চাঁদের কালি। আর তার
যেন মুচকে হাসছে, যে হাসির
ফুলমণির চোখ দেখে যে নেশা
াজ লাগিয়ে দেয় ওই বাঁকানো

হয়, মোহিনীর মোহে শিব
ভিন্ন এ নেশার ঘোর কাটে
ই, খেদ নাই, মোহিনী মায়ায়

নাম নিচ্ছিল, দয়াময় হরিকে
—ছুনিয়া ঠাণ্ডা হোক, চাষবাস

হোক, শুকনো মাটিতে ডুব্বো গজাক, মানুষ বাঁচুক, গরু বাছুর বাঁচুক, আমার মা-সুরভি ঘাস খেয়ে বাঁচুক।

কামধেনুর পাঁজরা বেরিয়েছে, বাঁটে আর দুধ নাই। ভিক্ষেয় গিয়ে চাল যা মেলে, তার দু মুঠোতে কামধেনুর পেট ভরে না, বাকি দু মুঠোয় নাথুর পেটেরও জ্বালা ঘোচে না। না, যে দিন যায় সে সেই ভালো মায়ের বাড়ি, সেদিন সেখানে কিছু মেলে। দু আঁটি খড়, কিছু ভুষি, কিছু চালও খেতে পায় তার সুরভি, সেও আঁচল ভরে মুড়ি পায়, সের খানেক চালও মেলে। ভাগ্যবানের সংসার, রাজা-জমিদারের বাড়ি, মা-লক্ষ্মীর অচলা বাস সেখানে, দুনিয়ার অভাব সেখানে ঢুকতে পায় না। নদী শুকিয়েছে, নালা শুকিয়েছে, পুকুর শুকিয়েছে, ডোবা ফেটে কাঠ হয়েছে, তাই বলে গঙ্গায় কি জলের অভাব? না, সাগর-সমুদ্রে চড়া পড়েছে? কিন্তু এক বাড়িতে নিত্য তো যাওয়া যায় না। বসে বসেই ভাবছিল নাথু। হঠাৎ এল ওই সর্বনাশী। ফুলমণি এল—হাতে এক মুঠো কাঁচা ঘাসপাতা।

সুরভির মুখে ঘাসের মুঠোটি ধরে দিয়ে, দু হাতে তার গলা জড়িয়ে মুখের পাশে মুখ রেখে সুরভিকে বলল, মাঠে গেলাম সাঁয়ো ঘাস তুলতে, সাঁয়ো ঘাস পেলাম না, তোমার জন্যে নিয়ে এলাম খুঁটে খুঁটে এই ঘাস মুঠাটি। খাও তুমি। —মধ্যে মধ্যে চোখের পাতা যখন সে তুলছিল, তখন নাথুর চোখের উপর পড়ছিল তার দৃষ্টি; যখন চোখের পাতা নামছিল, তখন সে চোখে লাগছিল আধখানা চাঁদের নেশা।

মোহিনী মায়া।

নাথু ভুলে গেল—আল্লাতায়লা পয়গম্বর দয়াময় হরির কাছে কি বলছিল, সে সব কথা। পেটে ভুখের আগুনের দাহ যেন আর বুঝতে পারলে না। সে উঠে গিয়ে ধরলে ফুলমণির হাত।

ফুলমণি উঠে হাত ছাড়িয়ে সরে দাঁড়াল, একটু হেলে ঘাড় বেঁকিয়ে তেরচা চোখে চেয়ে বললে, ছি, ছি!—পাতলা ঠোঁটে তার সেই মিহি হাসির আমেজ।

নাথু বললে, আমাকে নিকা করবে? বল?

ফুলমণি বললে, সেই হেঁপো রুগী আসছে হেফাজদ্দিকে নিয়ে। একশ টাকা আর পাঁচ মণ চাল আমার দাম। পারবে দিতে?

বলে সে চলে গেল।

মুনির তপস্যা যায়, রাজার রাজত্ব যায়, সে কি তাদের লোকসান মনে হয়? যদি হবে, তবে তারা মাতে কেন? নাথুর আপসোস নাই। সে কামধেনুকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ভালো-মায়ের বাড়ির উঠানে।

—আমার মা-সুরভিকে কিনবেন মা।

—বেচবে তুমি ?—মা আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

—বেচব মা। মায়েব আমার দশা দেখেন। আমার পেট দেখেন, পিঠে গিয়ে ঠেকেছে।

আর বলতে লজ্জা হল নাথুব। বলতে পারলে না ফুলমণির কথা।

—আমি তো দু-একবার আগে বলেছি তোমাকে। তখন তো রাজী হও নি। তা বেশ, দিতে যদি চাও—যদি মনে কোনো দুঃখ না রেখে দিতে পার, তবেই আমি নিতে পারি।

—এই মা-সুরভির গায়ে হাত দিয়ে বলছি মা, হিয়ে খোলসায় দিব আমি। সেবার আমাকে আড়াইশ টাকা দিতে চেয়েছিলেন—সেই দাম দিবেন।

—সে বাজারে এ বাজারে তফাত আছে বাবা। দুর্ভিক্ষের বাজারে দশ টাকার জিনিসটা পাচ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে—

স্তব্ধ হয়ে রইল নাথু। একশ টাকা, পাঁচ মন চাল—দুয়ে হবে একশ পঞ্চাশ। আড়াইশ টাকার অর্ধেক কত? দুশর অর্ধেক একশ, পঞ্চাশের অর্ধেক—

মা বললেন, আচ্ছা, তাই পাবে তুমি। যখন বলেছি নিজে মুখে, তখন তাই দোব। কিন্তু দেখো বাবা, মনে কোনো দুঃখ রেখো না।

—না না না না। কুনও দুঃখ কপব না। কখনও না। ভগবানের নাম নিয়ে বলছি মা, না না না।

মায়ের ছেলে ইংরিজী-পড়া বাবু। তিনি বললেন, ক্ষেপেছ না কি? আ-ড়া-ই-শ—টাকা?

—কামধেনু টাকা-পয়সা দিয়ে পাওয়া যায় না বাবা।

—কামধেনু? সে আবার কি? ও-সব বাজে কথা।

—না না, ও-কথা বলতে নেই। জান কি সন্তান প্রসব না করে গরুটি দুগ্ধবতী হয়েছে?

হেসে বাবুটি যে কথা বলেছিলেন, সে কথা আজও কানের কাছে বাজে নাথুর—ও-রকম হয়; ওকে বলে প্রকৃতির খেয়াল বরের কাগজে পড় নি, জোয়ান ছেলে হঠাৎ মেয়ে হয়ে গেল, মেয়ে দেখতে দেখতে বেটাছেলে হয়ে গেল? কিন্তু তারা তো শিখণ্ডী নয়, অর্জুনও নয়।

মা রাগ করে নিজের বাক্স থেকে টাকা বার করে দিয়েছিলেন নাথুকে।

টাকা নিয়ে নাথু বাড়ি ফিরল।

পথে কি কেঁদেছিল ?

মনে পড়ে না।

জেলখানায় বসে নাথু ফুলমণির চোখের ছবি আঁকতে আঁকতে কখন ছবি আঁকা ছেড়ে স্থির হয়ে বসে দেওয়ালের দিকে চেয়ে ছিল। দেওয়াল ভেদ করে, শহর-পথ মাঠ-ঘাট পেরিয়ে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ সে আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। বিস্মিত হয়ে ভাবছিল সে, কই, কান্নার কথা তো মনে পড়ছে না ?

মনে পড়ে বড় বড় ডবডবে দুটি চোখ।

খুব জোরে হেঁটে বাড়ি ফিরেছিল সে।

কোনো আপসোস হয় নি তার। ফুলমণিকে নিকা করে সারারাত তাকে নিয়ে জেগে ছিল। আপসোস হল মাসখানেক পর। ফুলমণির নেশাটা যেন কমে এসেছে তখন। মাসখানেক পর সে ভালো-মায়ের বাড়িতে এসে দাঁড়াল ঠুন-ঠুন করে মন্দিরায় আওয়াজ তুললে।

—মা, সুরভিমঙ্গল করবেন মা ? বাড়ির বাছাদের দুধে ভাতে রাখবেন। ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হবে। আহা আহা, সুরভিমঙ্গল গান গোধন-মহিমা মা গো, গোধন-মহিমা—

মা বললেন, এস, ভালো আছ ?

কেঁদে ফেললে নাথু। —না মা, ভালো নাই।

—কি হল ?

—কি হবে মা ? পাতকীর জীবনে সুখ থাকে মা ?

চুপ করে থাকেন মা। একটু থেমে চোখ মুছে নাথু আরম্ভ করে গান, 'ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণে দিতে নারে সীমা।' গান শেষ করে ভিক্ষা নিয়ে নাথু বলে, একবার মা-সুরভিকে যে দেখব মা।

—দেখবে বইকি। যাও, দেখ। তুমি তো জান সব।

সুরভিকে দেখে নাথু যেন কেমন হয়ে গেল। এক মাসেই গায়ে ভরে উঠেছে সুরভি। সাদা রোঁয়াগুলি যেন চিকচিক করছে রোদের ছটা পেয়ে। কাঙালের ঘরের মেয়ে বড়লোকের ঘরে বিয়ে হয়ে যেমন রূপে জৌলুসে ফেটে পড়ে, তেমনই চেহারা হয়েছে সুরভির। সুরভি ফিরে তাকালে নাথুর দিকে।

সে চোখ দেখে নাথু ভুলে গেল ফুলমণির চোখ।

তার ইচ্ছে হল, বুক ফাটিয়ে কাঁদে।

ইচ্ছে হল, দড়িটা খুলে সুরভিকে নিয়ে ছুটে পালায়।

হঠাৎ নিজেই সে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল। জনহীন মাঠের পথে এসে সে কাঁদলে—খুব জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদলে।

বাড়ি গিয়ে সেদিন ঝগড়া হল ফুলমণির সঙ্গে।

রাত্রে ঘুম হল না। মাঝরাত্রে সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠানে দাঁড়াল।

রাত্রের অন্ধকারে গিয়ে নিঃসাড়ে গোয়ালের দরজা খুললে, কিন্তু—

ভয়ে সে ঘেমে উঠল। ফিরে গিয়ে বসল নিজের দাওয়ার উপর। শেষরাত্রে সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন আবার গেল। সেদিন রাত্রে সে মাঠের ধার পর্যন্ত এসে ফিরে গেল।

আবার গেল পরদিন। ভালো-মায়ের বাড়ির ঝি বললে, 'ওমা, এ যে এবার নিত্যি আসতে লাগল গো!

মা ধমক দিলেন। নাথু লজ্জায় মরে গেল। সেদিন সে সুরভিকে দেখে ফিরে মাঠে পুকুরপাড়ে গাছতলায় গামছার খুঁট খুলে মুড়ি বার করে বসে রইল সামনের দিকে চেয়ে। অনেকক্ষণ পরে এক মুঠো মুড়ি মুখে পুরে না চিবিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। বহুক্ষণ ধরে মুড়ি খাওয়া শেষ করে ঝোলার ভিতর থেকে লাল খেরুয়ার থলিটি বার করলে। নাড়লে চাড়লে। তারপর বাড়ি ফিরল। পথে 'কাঁদর' অর্থাৎ সেই ছোট নদীটির ধারের ঘাটে এসে থমকে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ ভেবে সে নদী পার না হয়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকল। ঘন জঙ্গল, কত রকমের গাছ কত রকমের লতা। খুঁজতে লাগল নাথু একটা কিছু।

পটুয়াদের পটের শেষ অংশে আছে ধর্মরাজের দরবার। চিত্রগুপ্ত হিসাব রাখেন পাপ-পুণ্যের। রথে চড়ে পুণ্যাত্মা যায় স্বর্গে। ফুলে ফলে ভরা বাগান, কূলে কূলে ভরা নদী, মণি-মাণিক্য সাজানো বাড়ি-ঘর। পাপীরা যায় নরকে। আবছা অন্ধকার। নানা ভয়াবহ দৃশ্য। তার মধ্যে আছে একটি জলভরা কুণ্ড। প্রথমটার জল স্থির। দ্বিতীয়টার সে জলে ঢেউ উঠছে—নীচে থেকে যেন কিছু ঠেলে উঠছে। তৃতীয়টার দেখা যায়, জলের উপরে মাথা তুলে উঠেছে সাপ, লিকলিক করছে তার জিভ। নাথুর মনে হল, ঠিক তাই, ঠিক তাই।

গো-চিকিৎসক নাথু। ওষুধও চেনে, বিষও চেনে। জঙ্গলে খুঁজছিল সে বিষ। মারাত্মক বিষ। এক পা এগোয়, থমকে দাঁড়ায়, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে খোঁজে। ওটা কি? হ্যাঁ, এই যে। জঙ্গল থেকে বেরুল সে সন্ধ্যের মুখে।

ফুলমণির ডবডবে ঢলঢলে চোখে, পাতলা বাঁকা ঠোঁটে সেদিন অনেক চুমা খেয়েছিল নাথু। কোনো আপসোস হয় নাই তার—এক বিন্দু না।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল নাথু। পাগলের মত ছুঁড়ে ফেলে দিলে কম্বলটা। আর সে স্মরণ করতে পারছে না। ভয়ঙ্কর স্মৃতি। উঠে দাঁড়িয়ে গরাদেটা ধরে গরুর মত শব্দ করতে লাগল—প্রায়শ্চিত্তরত গোহত্যাকারীর মত।

ডিগ্রীর অর্থাৎ সেলের পাশে পাশে যে ওয়ার্ডার রাউণ্ড দিচ্ছিল, সে ছুটে এল। ওদিক থেকে চীফ ওয়ার্ডার, যার চার্জে তখন জেলখানা, সেও হন্তদন্ত হয়ে এল। ক্যা হুয়া হ্যায়? কেয়া?

নাথু অকস্মাৎ হাম্বা-হাম্বা করে গরুর ডাক ডাকতে আরম্ভ করেছে, চোখ দুটো রাঙা লাল।

সেলের দরজা খুলে চীফ ওয়ার্ডার বললে, পানি লে আও—পানি। ঢাল—মাথায় ঢাল। ফাঁসির আসামী। আজই হুকুম হয়েছে, এখন দুদিন অনেক রকম করবে ও। মাথায় জল ঢাল। দরকার হলে কুয়োতলায় নিয়ে যা। জেল-হাসপাতালের ডাক্তারকে খবর দে।

মুখের কাছে মুখ এনে নাথু বললে, যে কয়েদীটি তার মাথায় জল ঢালছিল, তাকেই বললে, পঁচিশ টাকা দোব, কাল রাত্রে বাবুদের যে গাইটা মরেছে, তার চামড়াখানা ছাড়িয়ে আমাকে দিবি।

কয়েদী বিরক্ত হয়ে বললে, কি বলছ যা-তা?

—বাবুদের গাঁয়ের ভাগাড় তো তোর। ওই চামড়াটি আমার চাই।

ওয়ার্ডার এগিয়ে এল। ধমক দিলে, এই!

কম্পাউণ্ডার মেজার-গ্লাসে ওষুধ নিয়ে এসে ঢুকল।

দীর্ঘ ঘুমের পর সকালে শান্ত দৃষ্টিতে সেলের দরজার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে উঠে বসল নাথু! অ্যায়, খোদাতায়ালা, রসুলে আল্লা! লা-এলাহা ইল্লাল্লা! হে ভগবান, হে গোবিন্দ! মাফ কর। আমার সকল পাপ, সকল গোনাহ মাফির মঞ্জুর হোক। আমার ফাঁসি হোক। মা-সুরভিকে আমি বিষ দিয়ে মেরেছি। কেউ সন্দেহ করে নাই, করবার উপায় ছিল না, গভীর রাত্রে গিয়ে সুরভির ডাবায় বিষ রেখে এসেছি। নিজে দু দিন যাই নি। তার জন্যে আমার ফাঁসি হোক।—এ ছাড়া আর কোনও পাপ নাথু করে নাই।

মুচীদের কাছে সুরভির চামড়াখানি সে কিনেছিল। কিনেছিল, তার ইচ্ছা ছিল ওই চামড়াখানি নিয়ে ঘর থেকে সে চলে যাবে। ফকির সন্ন্যাসী হয়ে যাবে!

এল হেফাজদ্দি পাইকার চামড়ার কারবার করে। মুচীদের কাছে খবর পেয়ে এল।

—চামড়া কিনেছিস ?

—হ্যাঁ।

—ব্যবসা করছিস নাকি ? আমার সঙ্গে কারবার কর। কিনে রাখবি চামড়া। আমি আসব মাঝে মাঝে। আমার ঘোড়া আছে।

হেসেছিল নাথু। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে হেফাজদ্দিকে বলেছিল, শুধু মরা চামড়া কিনবে, না, হাড়-মাস চামড়ার সব- মানে জ্যান্ত কিনবে? ফুলমণিকে চাই ?

—দিবি ?

—হ্যাঁ।

—কত ?

—দুশ।

—তাই।

—রাত্রে এস গাড়ি কিংবা ডুলি নিয়ে।

ফুলমণিকে বেচে সেই টাকায় তার চামড়ার ব্যবসা। ফুলমণির পাপ। ফুলমণির জন্য সে মহাপাপ করেছে। সকল পাপের মূল ফুলমণি। কিন্তু তবু ফুলমণির জন্যে সে কাঁদে। কতদিন কেঁদেছে।

বেশ চলছিল। টাকা-পয়সা অনেক হয়েছিল তার। দেশ গ্রাম ছেড়ে বাজারে বড় রেল-জংশনে আস্তানা গেড়েছিল। ডাঁই করে রাখত চামড়া। চালান দিত এখানে ওখানে। শান্তশিষ্ট মানুষ। রোজ সকালে উঠে বলত, আমার গোনাহ মাফির মঞ্জুর হোক আল্লা। পাপ খণ্ডন কর ভগবান। ধীরে ধীরে সব সে ভুলেও আসছিল।

হঠাৎ—হঠাৎ ঘটনাটা ঘটে গেল।

একটা শীর্ণ লোক একগাছা দড়ি হাতে এসে দাঁড়িয়ে গরুর মত ডাকতে লাগল—হাম্বা—অ্যা-ম্-বা।

গরু-মারা ! গোহত্যাকারী ! লোকটা গোহত্যা করেছে, তাই ওই ভাবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। মানুষের ভাষার বদলে, গরুর ভাষায়—মানুষের কাছে নিজের পাপের স্বীকারোক্তি জানিয়ে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে ! সুরভিমঙ্গল গান ছিল নাথুর একদিনের পেশা। সে জানে, সব জানে।

লোকটা গরুর ডাক ডেকে দোরে দাঁড়াতেই নাথু চমকে উঠল।

লোকটা আবার ডাকলে, অ্যা-ম্-বা—

স্থান কাল পাত্র সব গোলমাল হয়ে গেল নাথুর। মুহূর্তে পাগল হয়ে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল লোকটার উপর। বহুকষ্টে লোকজনে মিলে নাথুকে টেনে তুললে। লোকটার বুকের উপর বসে দুই হাতে সে তার গলাটা নির্মমভাবে চেপে ধরেছিল ; লোকটার জিভ বেরিয়ে এসেছে, চোখ দুটো হয়ে উঠেছে রক্তের ডালা। মরে গিয়েছে লোকটা।

ফাঁসিতে তার দুঃখ নাই। গোহত্যাকারীকে মেরে ফাঁসি যেতে কোনও আক্ষেপ নাই তার। তবে ফাঁসিটা গরুর খাঁতে হলেই তার আর কোনো খেদ থাকত না।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লা—রসুল আল্লা মহম্মদ, হে ভগবান, মা-সুরভি, তোমাদের মরজি সব।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে এপাশ ওপাশ চেয়ে কালকের কয়লাটা তুলে নিল। কি করবে সে এ ক'দিন ? কি নিয়ে থাকবে ? কাল দুটো চোখ এঁকেছিল। সে দুটোর দিকে তাকিয়ে আজ সে চমকে উঠল। ফুলমণির চোখ তো হয় নাই। এ যে গরুর চোখ হয়েছে। সুরভির চোখ। তা বেশ হয়েছে। ওরই পাশে আজ ফুলমণির ডবডবে ঢলঢলে চোখ দুটি আঁকবে। ও-চোখের নেশা বেঁচে থাকতে ছাড়তে পারবে না নাথু।

এক রাত্রি

গ্রাম হইতে প্রায় মাইলখানেক দূরে জনহীন প্রান্তরে ছোট একটি জঙ্গলের মধ্যে দেবস্থলটি মনোরম। দেখিয়া বেশ বোঝা যায়, বহুবর্ষ পূর্বে নদীর সিকতা-ভূমির উর্বরতায় জঙ্গলটির জন্ম হইয়াছিল। এখন নদীটি প্রায় আধ মাইলের উপর সরিয়া গিয়াছে। অর্জুন, শিমুল, বন্য জামগাছের সুদীর্ঘ কাণ্ডগুলি জনতার মত ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নিচে নানা প্রকারের লতা আর গুল্মে সমাচ্ছন্ন। এই ঘন বন-সন্নিবেশের মধ্যে—প্রায় কেন্দ্রস্থলে, পরিচ্ছন্ন খানিকটা বিঘা দুয়েক জমির উপর প্রাচীন একটি মন্দির। মন্দিরটির রঙ কালো কঠিন, দেখিয়া মনে হয়, যেন অখণ্ড একটা ছোট পাহাড় হইতে খোদাই করিয়া গড়া। বিগত হইয়া যাওয়া শতাব্দীর অন্ধকারের ছায়া দিন দিন যেন ঘন গাঢ় হইয়া উঠিতেছে। মন্দিরের সম্মুখে জীর্ণ একটি নাট-মন্দির। এমনই কালো, তবে অখণ্ড বলিয়া মনে হয় না। খিলানে খিলানে ফাট ধরিয়াছে। নাট-মন্দিরের দুই পাশে দুইখানি

মাটির ঘর। একখানি ভোগ-মন্দির, অপরখানি সাধক-সন্ন্যাসী কেহ আসিলে থাকিতে দেওয়া হয়। তান্ত্রিক সাধনার বহু-বিখ্যাত সিদ্ধপীঠ। এককালে নাকি নরবলি হইত; এখন পশুবলি হয়—ছাগল, ভেড়া, মহিষ; এক এক বিশিষ্ট পর্বে শতাধিক পশুর রক্তে নাট-মন্দিরের চত্বর ভাসিয়া যায় এবং দেবী-মন্দিরের দুয়ারের সম্মুখে পশুমুণ্ডের স্তূপ গড়িয়া উঠে। মন্দিরের ডান দিকে ভৈরবতলা—প্রাচীন একটি শিমূলগাছের তলায় একটি শিবলিঙ্গ। মন্দিরের বাঁ দিকে সিন্দূরলিপ্ত কতক-গুলা নরকপাল। রাত্রে দেবী নাকি মন্দির হইতে বাহির হইয়া ভৈরবের সহিত এ নরকপাল লইয়া গেণ্ডুয়া খেলিয়া থাকেন। নিত্য প্রভাতে দেখা যায়, নরকপাল-গুলি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে; পুরোহিত নিত্য সেগুলিকে গুছাইয়া রাখে। দেবীর খলখল হাসিতে, ভৈরবের হুম হুম ধ্বনিতে, কৌতুকোচ্ছল দর্শক শিবা, পেচক, শকুনের আনন্দ-ধ্বনিতে আশেপাশের পল্লীর অধিবাসীরা সুষুপ্তির মধ্যেও শিহরিয়া উঠে; গাছে গাছে পাতাগুলি মৃদু কম্পনে থর থর করিয়া কাঁপে। রাত্রে এ দেবস্থলে কেহ বড় থাকে না। প্রাচীন কাল হইতে ভূমি-বৃত্তিভোগী পুরোহিত সকালে আসিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকিয়া সন্ধ্যারতি শেষ করিয়াই গ্রামে আপন গৃহে চলিয়া যায়। তাহার পর হইতেই আরম্ভ হয় দেবলীলা। কখনও কখনও দুই-দশজন অসমসাহসী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী থাকিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু দুই-একজন ছাড়া কেহ থাকিতে পারে নাই। বাকি সকলে অর্ধরাত্রেই পলাইয়া গিয়াছে, দুই-একজন পাগল পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। দুই-চারিজন সন্ন্যাসী আসে, প্রত্যহই, কিন্তু দিনে প্রসাদ পাইয়া সন্ধ্যার পূর্বেই গ্রামে বা স্থানান্তরে চলিয়া যায়।

পুরোহিত কন্যার মত আদর করিয়া দেবীকে বলেন, ভয়ঙ্করী আমার ক্ষেপা মেয়ে।

সেদিন শ্রাবণসন্ধ্যায় আকাশ-জোড়া ঘন মেঘ; কিন্তু বর্ষণ ছিল না। গুমট গরমে দেবস্থলের বনসমারোহের মধ্যে নিথর স্তব্ধতা থম থম করিতেছিল। নিচে লতাগুল্মের অন্তরালে গুমট-ক্লিষ্ট সরীসৃপের সঞ্চরণ আজ ইহারই মধ্যে স্পষ্ট এবং প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। পুরোহিত সন্ধ্যারতি শেষ করিলেন। অন্যদিন বরং দুই-চারিজন ভক্তিমান গ্রামবাসী আরতির সময় আসিয়া থাকে, কিন্তু আজ আর কেহ আসে নাই; কেবল ঢাক লইয়া আসিয়াছিল চাকরান-জমিভোগী ঢাকীটা। আর ছিল দুইজন আগন্তুক সন্ন্যাসী। একজন আসিয়াছে সকালে, একজন দ্বিপ্রহরে, দেবীর ভোগের পূর্বেই; ওবেলায় এইখানেই প্রসাদ পাইয়াছে। পুরোহিত ভাবিয়াছিলেন, অপরাহ্ণেই চলিয়া যাইবে। তিনি এ

দেবস্থলের ভয়ঙ্করত্বের কথা সবই বলিয়াছেন! আরতি শেষ করিয়া পুরোহিত দেখিলেন, জোয়ান সন্ন্যাসীটি আপনার জিনিসপত্র গুছাইতেছে; কিন্তু প্রৌঢ় সন্ন্যাসীটি এখনও স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। অদ্ভুত ঘুম লোকটার, ঢাকের বাজনাতেও ঘুম ভাঙ্গিল না। কিন্তু পুরোহিত কাছে আসিয়া দেখিলেন, লোকটা ঘুমায় নাই, চুপ করিয়া চোখ মেলিয়া শুইয়া আছে। পুরোহিত ডাকিল, বাবাজী! ওহে গোঁসাই!

লোকটা উঠিয়া আসিয়া আমড়ার আঁটির মত চোখ দুইটা মেলিয়া বোকার মত বলিল—আঁ?

—তুমি যাবে না নাকি? এত কথা বললাম তোমাকে—

লোকটা অত্যন্ত কৌতুকে হেঁ-হেঁ-হেঁ করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসিটা কিন্তু রূঢ় নয়, বিনীত এবং নির্বোধ। হাসিয়া সে বলিল, বেশ থাকব বাবা এইখানে। —বলিয়া আবার সে হাসিয়া উঠিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ।—তিনটি দ্রুত হেঁ শব্দে এক টুকরা বিনীত নির্বোধ হাসি।

পুরোহিত বলিলেন, এই দেখ, এ মহাভয়ঙ্কর স্থান। এখানে ওসব পাকামি কর না।

সবিনয়ে অকারণে অর্থহীনভাবে হাসিয়া লোকটা বলিল, আজ্ঞে, বেশ থাকব বাবা। কালী কালী বলে কাটিয়ে দোব—হেঁ-হে-হেঁ।—সেই নির্বোধ দ্রুত হাসি।

পুরোহিত এবার নীরবে লোকটার আপাদমস্তক ভালো করিয়া দেখিলেন। মাথায় কাঁচাপাকা একমাথা বড় বড় রুক্ষ চুল, একমুখ দাড়ি-গোঁফ, স্থূল সরল দৃষ্টিভরা বড় বড় দুইটা চোখ, দন্তহীন তোবড়ানো মুখ—লোকটার উপর মায়া হয় না, দয়া হয়। অতিথিশালার দাওয়ার উপরেই একটা ধুনি জ্বলিতেছিল—লোকটা ধুনিতে কাঠ ফেলিয়া দিয়া গাঁজা টিপিতে বসিল। পুরোহিত তাহাকে তখনও দেখিতেছিলেন; সন্ন্যাসী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আবার হাসিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ।

পুরোহিতের সহসা মনে হইল, লোকটি বোধ হয় গুপ্ত সাধক। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত উত্তাপও যেন তিনি অনুভব করিলেন। বলিলেন, তাহলে বাবা, আপনি—

হেঁ-হেঁ-হেঁ করিয়া হাসিয়া লোকটি বলিল, হ্যাঁ বাবা, যান আপনি, বেশ থাকব আমি।

অপর সন্ন্যাসীটি ততক্ষণ জিনিসপত্র বগলে করিয়াও নীরবে দাঁড়াইয়া সব

দেখিতেছিল। সেও এবার জিনিসপত্র নামাইয়া বলিল, তাহলে আমিও থাকি বাবা এইখানেই।

লোকটি ভরা জোয়ান ; একচাপ কালো রুক্ষ দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন মুখ, মাথায় তৈলহীন চুলগুলি লম্বা, কিন্তু বেশ বিন্যস্ত। পরনে গেরুয়া বহির্বাস, গায়ে একখানা গেরুয়া চাদর।

প্রৌঢ় সন্ন্যাসী বলিল, কেন বাবা, বেশ তো থাকতে গাঁয়ে!—এবার আর সে হাসিল না। কণ্ঠস্বরে বিরক্তির সুর পরিস্ফুট। কিন্তু পুরোহিত বলিলেন, থাকুন বাবা, উনিও থাকুন ; একা না বোকা। তা উনি না হয় ওদিকে রান্নাঘরের দাওয়ায় থাকবেন।

জোয়ান সন্ন্যাসী বিনাবাক্যব্যয়ে নাট মন্দিরের ওপাশে রান্নাঘরের দাওয়ার উপর গিয়া আস্তানা গাড়িয়া বসিল। পুরোহিত আর অপেক্ষা করিলেন না, আলোটি হাতে করিয়া সংকীর্ণ বনপথের মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন।

আলোটা চলিয়া যাইতেই দেবস্থান মুহূর্তে ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া গেল। সে অন্ধকার যেন পৃথিবীর দিবারাত্রির অন্ধকার নয়, কুটিল, নিথর, গম্ভীর। সন্ন্যাসী মুহূর্তের জন্য শিহরিয়া উঠিল, তারপর ফুঁ দিয়া ধুনিটা জ্বালাইয়া তুলিল। শূলবিদ্ধ অন্ধকারের বুকের উচ্ছ্বসিত রক্তধারার মত আলোকশিখা জ্বলিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী হাসিল, হে-হে-হে।- হাসিয়া সে ছোট কল্কেতে হাতের গাঁজাটুকু সাজিয়া আগুন চড়াইল। আপন মনেই বলিল, গেরামে গিয়ে ফেসাদে পড়ি আর কি। হাজার কৈফিয়ত। তার চেয়ে বাবা অরণ্য ভালো। দশ বছর অরণ্যে অরণ্যে কেটে গেল বাবা, হেঁ-হে-হেঁ।

—মহাদেবের প্রসাদ পাব বাবা?—জোয়ান সন্ন্যাসীটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রৌঢ় সন্ন্যাসী ফিরিয়া চাহিল, ধুনির আলোতে অন্ধকারের মধ্যে অদ্ভুত দেখাইতেছে তাহাকে।

—প্রসাদ পাব বাবা?

—হেঁ-হেঁ হেঁ। বস বাবা, বস।--প্রৌঢ় সন্ন্যাসী সজোরে দম দিয়া কল্কেটি বাড়াইয়া দিল ; কিছুক্ষণ পরে দমটা ছাড়িয়া সে প্রশ্ন করিল, কোথা আশ্রম বাবাজীর?

—আশ্রম?—তরুণ সন্ন্যাসী হাসিল। তারপর বলিল, দুনিয়াময়ই আশ্রম বাবা ; যেদিন যেখানে থাকি, সেইখানেই আশ্রম।

—হেঁ হেঁ-হেঁ। আমারও তাই বাবা।—প্রৌঢ় আবার সেই হাসি হাসিল,

হে-হেঁ-হেঁ। কল্কেতে আবার দম দিয়া সে নীরবে কল্কেটি বাড়াইয়া দিল। তরুণ সন্ন্যাসী দম দিয়া কল্কেটি উপুড় করিয়া দিল, আর নাই। দুইজনেই কিছুক্ষণ ভোম হইয়া বসিয়া রহিল।

লঘু দ্রুত পদশব্দ—তাহার পরই খট খট শব্দে দুই-তিনটা নরকপাল স্থানচ্যুত হইয়া গড়াইয়া পড়িল। দুইজনেই চমকিয়া উঠিল। সচকিত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ঘাড় উঁচু করিয়া চাহিল। আবার লঘু পদশব্দ, আবার দুইটা নরকপাল গড়াইয়া পড়িল।

প্রৌঢ় বলিল, শেয়াল। মড়ার মাথার ওপর দিয়ে বেটাদের পথ। হে-হেঁ।

তরুণ সন্ন্যাসীও হাসিল, সেও দেখিয়াছে। প্রৌঢ় বলিল, জমল না। আর একটু হোক, কি বল?—সে গাঁজা বাহির করিয়া বসিল।

তরুণ সন্ন্যাসী একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল। প্রৌঢ়ই বলিল, কে কে আছে বাবা, তোমার বাড়িতে?

—কেউ না। মা ছিল, মরে যেতেই আমি বেরিয়ে পড়েছি।

—কোথা বাড়ি ছিল?

—বাড়ি?

—হ্যাঁ, বাড়ি।

—সে শুনে আর কি করবে?

প্রৌঢ় হাসিয়া উঠিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। বলিল, রাত কাটানো নিয়ে কথা বাবা।

তরুণ বলিল, তোমার বাড়ি কোথা ছিল বাবা?

কল্কেতে গাঁজা সাজিতে সাজিতে প্রৌঢ় হাসিয়া উঠিল, বলিল, কে জানে? আমি সন্ন্যাসী সেই ছেলেবেলা থেকে। অঘোরপন্থীরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। কল্কেতে আগুন চড়াইতে চড়াইতে বলিল, অঘোরপন্থীরা মড়ার মাংস খায় চিমটেতে করে ধরে চিতার আগুনে ঝলসিয়ে—বেশ লাগে। হে-হেঁ-হেঁ।—সে হাসিয়া উঠিল! তারপর সে গাঁজায় দম দিল। পালা করিয়া গাঁজার কল্কে হাতে হাতে ফিরিতে আরম্ভ করিল।

গাঁজার কল্কে উপুড় করিয়া তরুণ বলিল, কঙ্কালী মহাপীঠে এক সাধু ছিল, ছেলেবেলায় আমরা দেখেছি; সে খেত।

—কঙ্কালীতলা? বীরভূম জেলা?

—হ্যাঁ। গিয়েছ সেখানে? কোপাইয়ের উপর মহাশ্মশান।

—হেঁ-হেঁ-হেঁ।—প্রৌঢ় হাসিয়া উঠিল।—নবগ্রামের রামবাবুকে জানতে?

অ্যাই দশাশয়ী পুরুষ ; এই একগুলি আফিম খেত। 'পাট-ভাণ্ডার' পড়ে থাকত কাছারির সিমেণ্ট করা দাওয়াতে। 'গ্রুক গ্রুক' গড়গড়ার নলে আর মুখে। তামাক ফুরুলেই হাঁক—লাল-রূ-প! সঙ্গে সঙ্গে কল্কে হাজির—হোজোর! প্রৌঢ় নিজেই হাত বাড়াইয়া যেন কল্কে আগাইয়া দিল।

তরুণ সন্ন্যাসীর নেশা বেশ জমিয়া আসিয়াছিল ; চোখ দুইটি অতি কষ্টে বিস্ফারিত করিয়া সে বলিল, রূপলাল ?

প্রৌঢ় বলিল, হ্যাঁ, রূপলাল, সেই ইয়া দুটো বড় বড় দাঁত! এই বড় বড় চোখ! 'বক্তিতা' করত! বলত, করকে বলি—রে কর, তুই হরি-মন্দির পরিষ্কার কর—কর আমার সে কর্ম দুষ্কর মনে করে তস্কর কর্মে প্রবৃত্ত হল। একবার সবাই হরি হরি বল।—সে হেঁ-হেঁ করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল গমকে গমকে।—হেঁ-হেঁ-হেঁ। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

তরুণ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। প্রৌঢ় আবার বলিল, নারদের বক্তিতে! বাবু শুনতে খুব ভালোবাসতেন। বাবু খুব ভালোবাসতেন রূপলালকে। আদর করে বলতেন, লালরূপ।

অকস্মাৎ কাহার ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসের শব্দে দুইজনেই চমকিয়া উঠিল। কে? ঘাড় উঁচু করিয়া দুইজনেই নাট-মন্দিরের দিকে চাহিল। প্রৌঢ় জলন্ত কাঠটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শালা! তরুণ সন্ন্যাসী চিমটা লইয়া উঠিল। একটা সাপ, আলো ও মানুষ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। প্রৌঢ় সন্ন্যাসী তরুণের হাত ধরিয়া বসাইল। মরুক বেটা, তুমি বস।

তরুণ বসিয়া এবার প্রশ্ন করিল, রূপলালকে তুমি চিনতে?—এতক্ষণে তাহার প্রশ্নটা সম্বন্ধে খেয়াল হইয়াছে।

প্রৌঢ় হাসিয়া উঠিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। বলিল, রামবাবুর কাছে আমি যেতাম যে, হরদম যেতাম! ঠাকুর-বাড়িতে থাকতাম। রূপলাল আমার কাছে থাকত। এই এতটুকু বেলা থেকে রূপলাল বাবুদের বাড়িতে থাকত। রামবাবুর কাকার কাছে শিখেছিল গাঁজা খেতে। লোকে তাকে বলত ছোটকর্তা। ছোটকর্তা গাঁজা খেতেন—ইয়া রুপোর কল্কে; আর সকাল থেকে গাঁজা ভিজানো থাকত গোলাপজলে। আতর দিয়ে সেই গাঁজা টিপে, চন্দনকাঠের কাটনিতে কেটে, সেজে দাঁত-বাঁকা বাঁড়ুজ্যে হাত করে ধরত, ছোটকর্তা মুখ লাগিয়ে টানতেন। রূপলাল তখন ছোকরা। ছোটকর্তা ডেকে বলতেন, লে বেটা, পেসাদ লে। একটান টেনে রূপলাল তিনদিন পড়ে ছিল নেশার ঘোরে। সে আবার

সকৌতুককে নির্বোধের মত হাসিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। হেঁ-হেঁ-হেঁ। যেন মনশ্চক্ষে সে দৃশ্য তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে।

হাসি থামাইয়া সহসা সে গদগদ হইয়া উঠিল, বলিল, মহাশয় লোক ছিলেন ছোটকর্ত্তাবাবু। তিনিই ছিলেন বাবুদের মেনেজার। তাঁর হাতেই ছিল সব। রূপলালের দুধের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তিনি রোজ এক পো করে, ঠাকুরদের পেসাদী দুধ। তারপর আরম্ভ করলে দুধ চুরি করে খেতে। চাষবাড়ি থেকে—

তরুণ সন্ন্যাসী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, তুমি কি জান হে বাপু?

প্রৌঢ় এবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, বলিল, জানি জানি, সব জানি। চাষবাড়ি থেকে দুধ আনবার পথে পোঁ পোঁ করে মেরে দিত আধ সের তিন পো। তারপর ঝরনার জল মিশিয়ে—। হা-হা করিয়া হাসিয়া সে আবার গড়াইয়া পড়িল। অকস্মাৎ হাসি থামাইয়া বলিল, ধরেছিলাম আমি একদিন রূপলালকে। তা— রূপলাল কি করবে বল? ছোটকর্ত্তাবাবুর বরাদ্দ বাবুরা সব বন্ধ করে দিলে। তখন আবার গাঁজার ওপর আফিম মদ, দুইই ধরেছে রূপলাল। রামবাবু ধরিয়েছিলেন আফিম, রামবাবুর ছেলে ধরিয়েছিল মদ। তা একটু দুধ না হলে—

বাধা দিয়া তরুণ সন্ন্যাসী বলিল, দুধ চুরি করে থাক, রূপলাল ভালো লোক ছিল।

প্রৌঢ় বলিল, শুধু দুধ? রূপলাল ঘোড়ার দানাও চুরি করত। তা বাবুদের বউরা কিছু বলত না, বলত নিক, দু-চারমুঠো ছোলাই তো!

তরুণ কঠিন হাসি হাসিয়া বলিল, বলবে কি? বলবে কি বউয়েরা? বউরা বলতে গেলে, বউদের কীর্তিও যে রূপলাল বলে দেবে বলে শাসাত। বউরা যে দোকান থেকে সন্দেশ আনিয়ে খেত গুবগুব করে।

প্রৌঢ় কিন্তু হাসিতেছিল। সে হাসি তাহার অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল, তরুণ সন্ন্যাসীর চোখে চোখ পড়িতেই প্রৌঢ় দেখিল, চোখ তাহার ঝকমক করিয়া যেন জ্বলিতেছে। তাহার ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে প্রশ্ন করিল, কি?

খপ করিয়া প্রৌঢ়ের হাত ধরিয়া যুবক সন্ন্যাসী বলিল, তুমি এতসব জানলে কি করে?

প্রৌঢ়ের দৃষ্টি ভয়াবহ হইয়া উঠিল, বলিল, জানিস আমি কে?

—কে?

—হেঁ-হেঁ-হেঁ। অঘোরপন্থী। আমি মড়ার মাংস খাই। আমার বয়স কত জানিস?

—কত?

—দেড়শ বছর। আমি কত্তাবাবুকে যখন দেখেছি, তখনও আমি এমনই। এখনও আমি এমনই। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

নিমেষহীন দৃষ্টিতে প্রৌঢ়ের দিকে চাহিয়া তরুণ সন্ন্যাসী বসিয়া রহিল। আপনার চামড়ার বালিশটি টানিয়া লইয়া তাহার উপর আরাম করিয়া বসিয়া প্রৌঢ় আবার হাসিতে আরম্ভ করিল, আমি সব জানি। কোথা কি হচ্ছে, তুই কি ভাবছিস, সব আমি জানতে পারি। চাষবাড়ি থেকে দুধ আনা ছাড়িয়ে দিলে রূপলাল দুধ খেত কি করে জানিস? দুধের কড়াতে সরের ভিতর লম্বা একটা খড়ের নল পুরে দিত, হেঁ-হেঁ-হেঁ। ব্যস কে ধরবে ধরুক।

তরুণ সন্ন্যাসী বলিল, রূপলালের শুধু নিন্দেই করছ তুমি! অনেক গুণও ছিল তার! ছাই জান তুমি!

—হেঁ-হেঁ-হেঁ। ছাই জানি আমি? তবে বলব, রূপলালের চাকরি কি করে গেল? শুনবি? রসগোল্লা চুষে রস খেয়ে জলে চুবিয়ে নিয়ে এসেছিল, তাতেই তো চাকরি গেল রূপলালের। সব জানি আমি।

তরুণ সন্ন্যাসী বলিল, তারপরে?

—তারপর আবার কি? রূপলাল পালিয়ে গেল।

—ছাই জান তুমি। খুঁটিতে বেঁধে জুতো পেটা করেছিল তাকে। লঘু পাপে গুরুদণ্ড। রূপলালকে খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিল আর এক পাটি জুতো সেখানে রেখেছিল। যে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকেই ডেকে বলে, মার এক জুতো।—তাহার চোখে হিংস্র দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল।

প্রৌঢ় সন্ন্যাসী কোনো উত্তর দিল না। এ লোকটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সেই নির্বোধ হাসি হাসিয়া বলিল, রূপলাল মারের দাম তুলে নিয়েছিল, তিনটে ঘড়ি ভেঙ্গে দিয়েছিল ঢুই ঢাই করে। একটা সোনার চেন—

—মাইনে দিলে না কেনে, তাই মায় সুদ সুদ্ধ উসুল করে নিলে রূপলাল। —তরুণ প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

প্রৌঢ় হাসিয়া উঠিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ।—সে খানিকটা গাঁজা বাহির করিয়া যুবক সন্ন্যাসীর হাতে দিয়া বলিল, লে তৈরি কর।

দুইজনেই স্তব্ধ; এতক্ষণে অরণ্যের রহস্যময় শব্দরূপ তাহাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া উঠিল। লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝিঁর ঝিল্লি, ছোট পেঁচার কুঁককুঁক শব্দ, বড় পেঁচার কর্কশ ধ্বনি, বাচ্চাগুলার অস্ফুট ভাষা—ঠিক শিসের শব্দ, কলহরত শৃগালের ডাক, সরীসৃপের বুকে হাঁটার পত্রমর্মর-শব্দ, দ্রুত-ধাবমান চতুষ্পদের পদধ্বনি,

সকলের উপরে সুদীর্ঘ গাছগুলির মাথার উপর পুরাতন শোকের বিলাপধ্বনির মত শকুনের ডাক, রবহীন মূকের হাসির মত বাদুড়ের পাখার শব্দসমন্বয়ে স্থানটি তন্ত্রোক্ত মায়াপুরীর মতই রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে।

গাঁজা টানিয়া প্রৌঢ় হাসিল, সেই হাসি—হেঁ-হেঁ-হেঁ। বলে, এখানে দানাদত্যি নাচে, ভৈরবনাথ ত্রিশূল হাতে ঘুরে বেড়ায়, মা কালী মড়ার মাথা নিয়ে ভাঁটা খেলে। হেঁ-হেঁ-হেঁ। মিছে কথা—সব মিছে কথা।

যুবক সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিল, বলিল, উঁহু, ভূত মিছে নয়। জেলখানায় ফাঁসির আসামী যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে—। অকস্মাৎ সে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, বাপ রে ; থর থর করিয়া সে কাঁপিতেছিল।

প্রৌঢ় তাহাকে ধরিয়া হাসিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। ভয় লাগছে ? হেঁ-হেঁ-হেঁ।

অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া যুবক বলিল, খু-ব করুণ স্বরে উঁ-উঁ করে কাঁদে। ফোঁস ফোঁস করে ফোঁপায়। ঠিক রাত্রি দুপুর থেকে রাত চারটে পর্যন্ত।

—কাঁদে ? ফোঁপায় ?

—হ্যাঁ। উঃ, সে যে কি দুঃখ তার !—যুবক আবার শিহরিয়া উঠিল।

প্রৌঢ় এবার ঝুলি-ঝাপটা হইতে একটি বোতল বাহির করিয়া বলিল, তোর পাত্তর আছে ? নিয়ে আয়।—নিজে একটা নারকেল খোলা বাহির করিল।

যুবক ধুনি হইতে একটা জ্বলন্ত কাঠ লইয়া ওদিকে অগ্রসর হইল, বলিল, সে শালা আবার কোথা আছে—

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিল, দূ-র বেটা। বাসুকির ফণার ওপর থেকে সাপের ভয় ? হেঁ-হেঁ-হেঁ।

পাত্র আনিয়া রাখিতেই প্রৌঢ় খানিকটা মদ তাহাতে ঢালিয়া দিল, নিজের পাত্র তুলিয়া লইল।

যুবক আশ্চর্য হইয়া বলিল, সাধন-ভজন করবে না ? নিবেদন করবে না ?

—ধেৎ! নিবেদন ! নিবেদন করে কি হবে রে ? খেয়ে লে। পেটে গেলেই কাজ করবে। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

যুবক বলিল, রামবাবু থাকলে কিন্তু রূপলালের এমন দুর্দশা হত না। ভারি ভালোবাসত, রামবাবু কখনও রূপলাল বলত না, বলত—লালরূপ। রূপলালও বাবুকে ভারি ভক্তি করত। বাবুর দুধে সে কখনও মুখ দিত না। বাবু ডাকত—লাল-রূ-প ! না, হোজোর ! জোড়হাত করে রূপলাল দাঁড়াত। বাবুর অসুখ হলে লালরূপকে না হলে চলত না। অহরহ লালরূপকে চাই, টেপ বেটা, পা টেপ। সমস্ত রাত বসে বসে বাতাস করত। ঝুড়ি ঝুড়ি ময়লা, মেথরের

মত রূপলাল ফেলত। বাবু বলত, তুই বেটা, আমার ছেলে ছিলি যে আর জন্মে।

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিল, জানি রে জানি, এইটুকুন অসুখ হলেই বাবুর পেট খারাপ হত যে। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

তরুণ সন্ন্যাসী উদাসকণ্ঠে বলিল, গিন্নীরা সব পড়ে পড়ে ঘুমোত, ছেলেরা ঘুমোত। রূপলাল সারারাত জেগে বসে থাকত। টাকাকড়ি, বোতাম ঘড়ি সবসুদ্ধ জামা বাবু রূপলালের হাতে দিত ; একটি আধলা কখনও যায় নাই।

প্রৌঢ় হাসিল, সেই নির্বোধের হাসি— হেঁ-হেঁ-হেঁ। তারপর বলিল, ওই দুধ মিষ্টি, ওতেই ছিল রূপলালের যত লোভ। লোভের জিনিস কিনা! হেঁ-হেঁ-হেঁ। আর বাবুদের বাড়িতে একজন ঝি ছিল, জানতে তাকে? কামিনী, কামিনী তার নাম। সে-ই রূপলালের ছিল সব। রূপলালই তাকে বাবুদের বাড়িতে এনেছিল। একটি ছেলে ছিল কামিনীর। ভারি সোন্দর ছেলে—

—কাত্তিক?—তরুণ নেশায় আড়ষ্ট চোখ বিস্ফারিত করিয়া সজাগ হইয়া বসিল।

—হ্যাঁ, কাত্তিক।

যুবক বলিল, হ্যাঁ, সেই কাত্তিককে রূপলাল দিত কিনা দুধ-সন্দেশ। লুকিয়ে লুকিয়ে দিত তাকে। কাত্তিক রামবাবুর নাতিকে কোলে নিয়ে থাকত, বাবুদের থিয়েটারে সে রাধা সাজত।—প্রৌঢ়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিয়া বলিল, আমরা সব খেলা করতাম কাত্তিকের সঙ্গে। ভারি ভাব ছিল।

প্রৌঢ় হাসিয়া বলিল, জান, কাত্তিক যখন ছোট ছিল, তখন রূপলাল তাকে আদর করত। কামিনী কাজ করত; রূপলাল তাকে ঘুম পাড়াত। তা কাত্তিক আবার বলত, বাবা, তোমাকে আদর করি! রূপলাল বলত, কর কেনে। কাত্তিক বলত, তোর চোখে খুঁচে দি!—বলিয়া প্রৌঢ় গমকে গমকে হাসিতে লাগিল। সে আবার নিজের পাত্র পূর্ণ করিয়া সঙ্গীর পাত্রও পূর্ণ করিয়া দিল।

অকস্মাৎ শৃগালের সমবেত উচ্চধ্বনিতে পেঁচার দীর্ঘ কর্কশ রবে বনভূমি মুখর চকিত হইয়া উঠিল, বাসায় বাসায় পক্ষবিধুনন ও দলে দলে উড়ন্ত বাদুড়ের পাখার শব্দে নিশীথিনী যেন উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। আকাশ হইতে দুই-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

তরুণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কিন্তু যাবার সময় রূপলাল একবার দেখাও করলে না কাত্তিকের সঙ্গে।

প্রৌঢ় বলিল, জুতো খেয়ে রূপলালের ভারি লজ্জা হয়েছিল, তাই কামিনীর সঙ্গে, কাত্তিকের সঙ্গে দেখা করতেই পারে নাই। পালিয়ে গিয়েছিল। তা নইলে—

যুবক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কাত্তিক ভারি কেঁদেছিল কিন্তু। খু—ব কেঁদেছিল।

প্রৌঢ় বলিল, তার পরেও রূপলাল একদিন গিয়েছিল, লুকিয়ে কামিনী-কাত্তিকের সঙ্গে দেখা করতে। তা ভাবলে, দেখলে তো তারা সঙ্গ ছাড়বে না। রূপলালের কি-ই বা ছিল যে, তাদের খাওয়াত, বল? তাতেই আর—

রূঢ় স্বরে যুবক বলিল, রূপলালও যা খেত তারাও তাই খেত। না হয় উপোস করেই থাকত। কাত্তিক তো বাঁচত তাহলে!

—কাত্তিক মরে গিয়েছে?

যুবক চুপ করিয়া উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

প্রৌঢ় বলিল, বাবুর নাতি যে রূপলালকে দেখে রূপলাল রূপলাল বলে চেচাতে চেঁচাতে ছুটে এল। রূপলাল ছুটে পালাল। ধরলে তো ছাড়ত না বেটা বাবুরা, ধরে পুলিশে দিত চুরির জন্যে। খানিকটা দূরে গিয়ে রূপলাল দেখলে, ছেলেটা নেই! তার পরই দেখলে, ছেলেটা পুকুরের জলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। রূপলাল ছুটে যাচ্ছিল তুলতে, কিন্তু দারোয়ানটা তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। সে কোথা কাছেই ছিল। পাছে দেখতে পায়, এই ভয়ে রূপলাল পালিয়ে গেল, দেশ-দেশান্তর কত জায়গা ঘুরে চলে গেল হিমালয়। আর দেখা হয় নি আমার সঙ্গে।

যুবক বলিল, দারোয়ান কেনে তুলবে? ছেলে মরে ভেসে উঠেছিল। কাত্তিক তখন খোকাকে ছেড়ে গাছের ছায়াতে একটা ছুঁড়ি ঝিয়ের সঙ্গে হাসি-মস্করা করছিল।

প্রৌঢ় দাঁত খিঁচাইয়া উঠিল, ভাগ বেটা, তুই কিছুই জানিস না। কাত্তিক খুব ভালো ছেলে।

তরুণ এবার হাসিয়া উঠিল, বলিল, বাপ জিন্দে বেটা, কাত্তিক তখন উড়তে শিখেছে। ছুঁড়ি ঝিটার সঙ্গে তখন খুব মজে গিয়েছে।

প্রৌঢ় শাসন করিয়া উঠিল, অ্যাই!

যুবক গ্রাহ্য করিল না, হাসিল, তুমি জান না, এখন শোন।—অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া সে বলিল, মেয়েটা চলে গেলে কাত্তিক এসে খোকাকে খুঁজে না পেয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল। বিকেলে ছেলে ভেসে উঠল জলে। গায়ে একখানি গয়না নাই। লোক বললে, কাত্তিকই জলে ডুবিয়ে মেরেছে গয়নার লোভে।

পুলিশ ধরে নিয়ে গেল কাত্তিককে। কাত্তিকের ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল। —কথা শেষ করিয়া সে মদের বোতলটি টানিয়া লইল।

প্রৌঢ় বাঘের মত ঝাঁপ দিয়া বোতলটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া আছাড় মারিয়া সেটাকে চূর্ণ করিয়া দিল। উগ্র সুরার গন্ধ ধুনির ধোঁয়ার সঙ্গে মিশিয়া বায়ুস্তর ভারি করিয়া তুলিল। যুবক অবাক হইয়া গিয়াছিল। প্রৌঢ় উঠিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে ঠেলিয়া নিচে ফেলিয়া দিল, শালা, মদ খেতে এসেছে, গাঁজা খেতে এসেছে? নিকালো শালা। বেরোও বলছি।

যুবক অকারণে অতর্কিতে মার খাইয়া ভীষণ ক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রৌঢ় তখন চিমটা লইয়া উঠিয়াছে। যুবক আর সাহস করিল না, নাট-মন্দিরের বিষ-নিঃশ্বাস স্মরণ করিয়াও সে অন্ধকারে অন্ধকারে ভোগ-মন্দিরের দাওয়ায় গিয়া বসিল।

দুইজনেই স্তব্ধ। ধুনির অগ্নিশিখা নিবিয়া গিয়াছে, আর ফুঁ দেওয়া হয় নাই। জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর ভস্মের আবরণ পড়িয়াছে। নিরন্ধ্র অন্ধকার। মৃদু ধারার বর্ষণ এখন ঘন হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ লক্ষ ঝিল্লির অবিরাম ধ্বনি—রাত্রির চরণের নূপুরধ্বনির মত বাজিতেছে, রাত্রি চলিতেছে। কেবল একটা পেঁচার অস্পষ্ট অথচ উচ্চ স্যাঁ—স - স্যাঁ—স শব্দ গুপ্ত অস্ত্রের মত অন্ধকার রাত্রির স্তব্ধতা চিরিয়া চিরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

প্রৌঢ় আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। আকাশ নাই, মেঘের অস্তিত্বও দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু অন্ধকার।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত বহিয়া চলিয়াছিল, অরণ্যের বহু এবং বিচিত্র ধ্বনি তেমনই ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। তৃতীয় প্রহর-শেষে আবার একবার ধ্বনি উচ্চ হইয়া উঠিল; কিছুক্ষণ পরেই ডাকিয়া উঠিল পাখি। ঘন মসীলিপ্ত আকাশেও আলোর দীপ্তি দেখা দিয়াছে। অরণ্যের মায়াপুরী স্তব্ধ হইয়া আসিল। এখন চারিদিক বেশ দেখা যায়।

যুবক সন্ন্যাসী দেখিল, প্রৌঢ়ের মুখে চোখে অদ্ভুত পরিবর্তন, লোকটা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে, যেন আর কখনও কথা বলিবে না।

যুবক আপনার জিনিসপত্র গুটাইয়া লইয়া উঠিয়া যাইতে যাইতে একবার দাঁড়াইল, বলিল, যাবে না?

প্রৌঢ় স্তব্ধ হইয়া যেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল; কোনও উত্তর না পাইয়া যুবক পথে পা বাড়াইল। সহসা প্রৌঢ় ধরা গলায় ডাকিল, শোন।

—কি?

—কামিনীর খবর জানিস ? কামিনী ?

—কাত্তিকের মা ?

—হ্যাঁ।

—সে—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া যুবক বলিল, ছেলের ফাঁসির হুকুম শুনে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

প্রৌঢ় অঘোরপন্থী দীর্ঘায়ু সাধু বোধ হয় সংবাদটা জানিত, সে কোনো বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কেবল বিমূঢ়ের মত বার কয়েক সম্মতি জানানোর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া বোধহয় জানাইল, হাঁ হাঁ, ঠিক-ঠিক মনে ছিল না, মনে পড়িয়া গিয়াছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, মা বেটা দুজনের ফাঁসি হয়ে গেল।—আবার সে ঘাড় নাড়িতে লাগিল। অকস্মাৎ সে হাসিয়া উঠিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। রূপলালেরও ফাঁসি হবে।

যুবক সন্ন্যাসী বলিল, তুমি খানিকটা ক্ষ্যাপাও বটে। কাত্তিকের ফাঁসি কেন হবে ? জজ কাত্তিকের ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল, কিন্তু অল্প বয়স বলে লাটসাহেব ফাঁসির বদলে দ্বীপান্তর পাঠিয়ে দিয়েছিল।

—ফাঁসি হয় নাই ?

—না।

যুবকের মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিতে থাকিতে প্রৌঢ় সেই নির্বোধ বিনীত হাসি হাসিল। তারপর সাদরে আহ্বান জানাইয়া বলিল, বস, গাঁজা খা। হেঁ-হেঁ-হেঁ। পেভাতী ভাতি শুতি, পেভাতে পেভাতী, ভাতের পর ভাতি, শোবার সময় শুতি। হেঁ হেঁ-হেঁ। পেভাতীটা হয়ে যাক।

যুবক বসিল। গাঁজা তৈয়ারি করিয়া নিজে টানিয়া যুবকের হাতে দিয়া বলিল, খা। কষিয়া টান মারিয়া যুবক দম ধরিয়া বসিল। কল্কেটি হাতে লইয়া প্রৌঢ় বলিল, দ্বীপান্তর সে কোথা বটে ?

চোখ বিস্ফারিত করিয়া যুবক বলিল, আ—ন্দা—মান। সমুদ্দুরের ভেতর দ্বীপ। জাহাজে করে যেতে হয়।

—হ্যাঁ ?

—হ্যাঁ।

প্রৌঢ় কল্কেতে টান দিল। যুবক এবার বলিল, আচ্ছা, রূপলাল হিমালয়ে আছে বলছিলে! তা—

প্রৌঢ় ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, কোন গুহাতে-মুহাতে থাকে, কে জানে! হাজার হাজার গুহা তো সেখানে।

যুবক কল্কেতে আবার টান মারিয়া কল্কেটি উপুড় করিয়া দিল। আর নাই। ঝুলির মধ্যে কল্কেটি পুরিয়া প্রৌঢ় উঠিল, সঙ্গে যুবকও উঠিল।

বিদায়সম্ভাষণ-ব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া যুবক বলিল, আচ্ছা।

প্রৌঢ়ও সেই নির্বাধ হাসি হাসিল, হেঁ-হেঁ-হেঁ। আচ্ছা।

দুইজনে দুই বিপরীত মুখে পথ ধরিল। যুবক উত্তর মুখে—উত্তর দিকে হিমালয়, প্রকাণ্ড পাহাড়, তাহাতে হাজার গুহা। দেড়শ বছর বয়সের অঘোর-পন্থী বলিয়াছেন, হাজার হাজার গুহা সেখানে। তাহার মধ্যে—কোথায় লুকাইয়া আছে একটি মানুষ!

প্রৌঢ় চলিল দক্ষিণ মুখে—দক্ষিণ দিকে নাকি সমুদ্র। সেই সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপ আন্দামান। কূলে পৌঁছিতে পারিলে দাঁড়াইয়া হয়ত দেখা যাবে। নয়-তো নৌকা-টৌকাও তো যায় আসে। অন্ততঃ এ-দিকের তীরে দাঁড়াইয়া ওপারের মানুষকেও তো দেখা যাইবে। কয়েদীর দলের মধ্যে ছোট একটি ছেলে।

ব ন্দি নী ক ম লা

রাজহাটের রায়বাড়ি প্রাচীন বনিয়াদী ঘর। কোম্পানীর আমল হইতে বহু বিস্তীর্ণ জমিদারী। সংসারটিও বিপুল।

ভাদ্র মাসের দিন, রায়বংশের সেজতরফের বড়মেয়ে বনলতা সিমেণ্ট-বাঁধানো মেঝের উপর সুবিপুল দেহখানি এলাইয়া দিয়া নিথর হইয়া পড়িয়া ছিল, স্পন্দনের মধ্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস পড়িতেছে আর মধ্যে মধ্যে গালে-টেপা পান দুই-একবার মুখের মধ্যে নাড়িতেছে। ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে চারিটা বাজিয়া গেল। বনলতা একবার চোখ মেলিয়া চাহিয়া এদিক ওদিক বেশ করিয়া দেখিয়া শ্রান্ত কণ্ঠে ডাকিল, নলে! নলে!

নলে—নলিনী সেজতরফের ঝি। নলিনীর সাড়া পাওয়া গেল না। নীচে রান্নাশালে ঠাকুর-চাকরেরা গোলমাল করিতেছে। তাহাদের খাওয়া-দাওয়া হইতেছে। রায়বাড়ির অনেক বিশেষত্বের মধ্যে এই একটি বিশেষত্ব! খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ হয় দেড়টায়—ছেলেরা খায় দেড়টায়, বাবুরা খান আড়াইটায়, মেয়েরা সাড়ে তিনটায় খাওয়া-দাওয়া সারিয়া উঠেন, তারপর চাকর-বাকরদের পালা পৌনে চারিটা, চারিটায়।

বনলতা আবার ডাকিল, নলে—ও নলে!

বড়তরফের ঝি কামিনী দরজার সম্মুখের বারান্দা দিয়া তেতলায় উঠিয়া গেল, সে সাড়া দিল না। বনলতা উদাস দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া ডাকিতেছিল, দেখিতে পাইল না, পায়ের শব্দ শুনিয়াও ফিরিয়া চাহিল না।

সে আবার ডাকিল, নলে! নলে! অ—নলে!

এবার একটি তরুণী বধূ আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া বলিল, কি বলছেন দিদি? বড়তরফের কনিষ্ঠা বধূ, সদ্য বিবাহিতা।

বনলতা ফিরিয়া না চাহিয়াই বলিল, তোমাকে নয়, নলেকে ডাকছি।

বধূটি চলিয়া গেল, বনলতা আবার ডাকিল, অ—নলে!

বধূটি তেতলায় উঠিয়া গেল, একদিকের খোলা ছাদের উপর ভাদ্রের রৌদ্র মাথায় করিয়া বড়তরফের বড়মেয়ে পান ও দোক্তা হাতে চরকির মত অবিরাম ঘুরিতেছে। সে পাগল, অমনি করিয়া ঘোরাই তাহার ব্যাধি। মধ্যে মধ্যে পান দোক্তা খায়, বিড় বিড় করিয়া বকে, ফিক ফিক করিয়া হাসে—আর অবিরাম ছাদের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ায়। তরুণী বউটি এ বাড়িতে সদ্য আগত, পাগলকে দেখিয়া তাহার প্রাণ কেমন হাঁপাইয়া ওঠে, কান্না পায়। ছাদটা অতিক্রম করিয়া তেতলার মহলে যাইতে হইবে, সে থমকিয়া দাঁড়াইল। পাগল এদিক হইতে ওদিকে পৌঁছিবামাত্র দ্রুতপদে ছাদটা অতিক্রম করিয়া গেল। নলিনী ঝি সেজগিন্নীর পা টিপিতেছিল। সেজগিন্নীর নাক ডাকিতেছে। মৃদুস্বরে বধূটি ডাকিল, নলিনী!

নলিনী কথা বলিল না, ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, কি?

—বনলতাদি ডাকছেন তোমাকে।

নলিনী সঙ্গে সঙ্গে নীচেকার ঠোঁটটি উল্টাইয়া দিল, পরক্ষণেই বিরক্তিভরা মুখে অতি সন্তর্পণে সেজগিন্নীর পাখানি কোল হইতে পাশের পা-বালিশের উপর নামাইয়া রাখিল। সেজগিন্নীর নাক ডাকিতেছিল, কিন্তু পাখানি নামাইয়া দিবামাত্র আরক্ত চোখ মেলিয়া তিনি তাকাইয়া দেখিলেন। নলিনী বলিল, বনোদি ডাকছেন, শুনে আসি।—সেজগিন্নীর চোখ বন্ধ হইল। নলিনী নীচে চলিল—সঙ্গে সঙ্গে বধূটি। বধূটির বড় মুস্কিল হইয়াছে, সে যেন মাটির জীব, সমুদ্রতলের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এ রাজ্যের নিয়মকানুন সব আলাদা! দিনে বেচারার ঘুমানো অভ্যাস নাই, কিন্তু বেলা তিনটার পর হইতে বাড়িখানা পর্যন্ত যেন ঘুমে ঝিমাইতে থাকে। জাগিয়া থাকে এক পাগল—তাহাকে তাহার বড় ভয়। দোতলার সিঁড়িতে আসিয়াই শোনা গেল, অ—নলে! নলে!—বনলতা নেই সকরুণ শ্রান্ত স্বরে ডাকিতেছে।

নলিনী বলিল, মর তুমি ! মর ! ভোঁসকুমড়ি কোথাকার !

বধূটি অবাক হইয়া গেল। কিন্তু কিছু বলিবার পূর্বেই বনলতার ঘরের সম্মুখে তাহারা পৌঁছিয়া গেল ; বনলতা তখনও চোখ বন্ধ করিয়া ডাকিতেছে, নলে !

—কি দিদিমণি ? আমি সেজমার পা টিপছিলাম।

বনলতা কোনো কৈফিয়ৎ দাবি করিল না, চোখ মেলিয়া অতিকষ্টে পাশ ফিরিয়া একটা হাত প্রসারিত করিয়া হাত দশেক দূরে মেঝের উপর নামানো একটা রুপার কৌটা দেখাইয়া বলিল, দোক্তার কৌটোটা দে—

নলিনী তাড়াতাড়ি কৌটাটা বনলতার কাছে আনিয়া নামাইয়া দিল।

বনলতা বলিল, আর একখানা পাতলা চাদর আমার গায়ে ঢেকে দে তো !

বধূটির বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না, সে বলিল, গরম লাগবে না দিদি ?

—বড় মাছি লাগছে।

নলিনী বিনা বাক্যব্যয়ে একখানা চাদর আনিয়া বনলতার সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়া চলিয়া গেল। বধূটি বলিল, একটু বাতাস করব দিদি ?

—তুমি আর জ্বালিও না ছোটবউ ! কেবল কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান ! তুমি বাতাস করবে কেন ? ঝি-চাকর থাকতে বউয়ে বাতাস করে না কি ?

ঘড়িতে ঢং করিয়া আধ ঘণ্টা বাজিল, বেলা সাড়ে চারিটা ! বাড়িটাতে যেন জনমানব নাই ; কেবল কতকগুলা অস্বাভাবিক শব্দ। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনে নাকডাকার শব্দ। নীচে কয়টা কাক উচ্ছিষ্ট বাসন লইয়া কল-কল করিতেছে। ঝি-চাকরেরা ঘুমাইতেছে।

বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া বউটি দাঁড়াইয়াছিল—সহসা তাহার হাসি পাইল ; কাহার নাক ডাকিতেছে ঘোঁ-ঘোঁ-পট-পট-ফু—ৎ ! পিছনে ঘরের মধ্যে বনলতাদিদিরও নাক ডাকিতে শুরু হইয়াছে। সহসা রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়াই বধূটি চোখ বুজিয়া নাক-ডাকাইতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নাকের ভিতর এবং তালুতে জ্বালা করিয়া উঠিতেই সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া শূন্যমনেই জনশূন্য উঠানটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর বাড়ির মধ্যে মানুষের সাড়া জাগিয়া উঠিল—কেহ যেন সুর করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছে। বাড়ির গিন্নী অর্থাৎ বাবুদের মা এতক্ষণে দেবদর্শন করিয়া ফিরিলেন, টোলের পণ্ডিত তাঁহাকে গীতা শুনাইতেছে। গীতা শুনিয়া ঠাকুমা জল খাইবেন, তারপর তাঁহার রান্না চড়িবে, ঠাকুমা ততক্ষণ তাঁহার নিজের এস্টেটের দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ শুনিবেন। খাইবেন বেলা ছয়টায়,

তারপর আরম্ভ হইবে দিবানিদ্রা ; দিবানিদ্রা সারিয়া উঠিবেন রাত্রি দশটায়। তারপর আরম্ভ হইবে মহাভারত পাঠ। রাত্রি বারোটায় সান্ধ্যকৃত্য শেষ করিলে পর তাঁহার রাত্রের খাবার তৈয়ারী হইবে। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া বাড়ির নাতি-নাতনী, ছেলে-বউ প্রত্যেকের সংবাদ লইবেন—আর বুড়ি-ঝি দামিনী তাঁহার পায়ে তেল দিবে। শুইবেন রাত্রি ছুইটার পর। বধূটি অকস্মাৎ খুক খুক করিয়া হাসিয়া উঠিল, ঠাকুমার সে-কি নাকডাকা! বাপ রে! সেদিন শেষরাত্রে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বিকট শব্দে ভয় পাইয়া স্বামীকে জাগাইয়া বলিয়াছিল, ওগো—ও কিসের শব্দ?

এক মুহূর্ত শুনিয়াই পাশ ফিরিয়া শুইয়া তাহার স্বামী বলিয়াছিল, ঠাকুমার নাক ডাকছে।

ঠা নাক ডাকিতেছে! ত বিশ্বাস হয় নাই বলিতে গিয়াছিল, না, তুমি ভালো করে শোন।—কিন্তু তখন তাহার স্বামীরও আবার নাকডাকা শুরু হইয়া গিয়াছে, তাহার ভাগ্য ভালো যে স্বামীর নাক ডাকে মৃদু শব্দে ফুরুর—ফুরুর!

সে সাহসী মেয়ে ; ভয় বড় একটা সে পায় না ; সে সন্তর্পণে উঠিয়া দরজা খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সর্বনাশ! বাড়িতে যেন নাকডাকার কোরাস আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ঘোঁ ঘোঁ। ঘড়র, ঘড়র, ঘোঁ। ঘড়র-পট-পট-ফুং। আরও কতরকম—মুখে শব্দ করিয়া তাহার অনুকরণ করা অসম্ভব। সমস্ত ধ্বনিকে ছাপাইয়া ঠাকুমার নাক ডাকিতেছে—ব্যাণ্ড বাজনার জয়ঢাকের মত।

স্মরণ করিয়া বধূটি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তরুণী কণ্ঠের হাস্যধ্বনি কিছুক্ষণ বাড়িটার খিলানে খিলানে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিল। সহসা গম্ভীর স্বরে কে প্রশ্ন করিল, কে?

বধূটি লজ্জায় মরিয়া গেল, মেজ খুড়শ্বশুরের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বনলতার ঘরে ঢুকিয়া কপট নিদ্রায় কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিল। মেজশ্বশুরের পায়ের সাড়া বারান্দাময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পদশব্দ তেতলায় উঠিয়া গেল।

পাগলী আর্ত চীৎকারে কাঁদিয়া উঠিল।

মেজশ্বশুরের রুষ্ট কণ্ঠস্বর—তুই হাসছিলি? কাকে দেখে হাসছিলি? বল! বল!

প্রচণ্ড জোরে চড় মারার শব্দ! পাগলী বোবা জানোয়ারের মত চীৎকার করিতেছে। বধূটির একবার ইচ্ছা হইল, উঠিয়া গিয়া মেজশ্বশুরকে বলে, আমি হাসিয়াছি। ও নয়। কিন্তু তাও সে পারিল না।

বনলতা যতক্ষণ না উঠিল, ততক্ষণ সে কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিল। বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় বাড়িটা আবার জাগিয়া উঠিল। সে জাগিয়া-ওঠা যেমন তেমন নয়, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গে লঙ্কায় যেমন সোরগোল উঠিত, তেমনি সোরগোল তুলিয়া জাগা। ছোট্ট ছেলেদের চীৎকার-হাসি-কান্না, বধূ ও কন্যাদের হাসি, ঝি-সম্প্রদায়ের বাসনমাজা ও ঝাঁটার শব্দ, কথা কাটাকাটি, গিন্নীদের ঝি-চাকরকে আহ্বান, বাড়িটাতে যেন তুফান উঠিয়াছে।

—বড়বাবুর দুধ নিয়ে আয়। মানদা! ঠাকুরকে বল ছেলেদের জলখাবার নিয়ে যাবে।—বড়গিন্নী হাঁকিতেছিল। বধূটি এইবার উঠিল। বনলতা তখন উঠিয়া বসিয়াছে, সে হাসিয়া বলিল, কি হে ছোটগিন্নী, তুমি যে দিনে ঘুমোও না। আমাকেও যে হার মানালে হে।

মৃদুস্বরে বধূটি বলিল, আমি ঘুমুই নি।

—ওই হল হে হল। ছিল না কথা হল গাল, আজ নয় হবে কাল। দিনে শুলে তোমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে বল, আজ শুয়েছ, কাল ঘুমোবে।—বনলতা গোটা দুয়েক পান ও খানিকটা দোক্তা মুখে পুরিয়া কথা বন্ধ করিল।

বউটি উঠিয়া শাশুড়ীর কাছে তেতলায় চলিল। একটা চাকর হন হন করিয়া বারান্দা দিয়া ওদিকের মহলে চলিয়াছিল, বনলতা তাহাকে দেখিয়া উৎসুক হইয়া উঠিল, হরে! ও-হরে, শোন!

—আমার এখন সময় নাই বাপু!—তবু হরিচরণ দাঁড়াইল।

—মেজজ্যাঠার সিদ্ধি নিয়ে যাচ্ছিস বুঝি?

—হ্যাঁ। বাবু এখুনি চেঁচামেচি করবে; কি বলছেন বলুন।

—আমাকে একটু সিদ্ধি দিয়ে যা। পেটটা বড় খারাপ হয়েছে। এই এতটুকু।

মুখ বাঁকাইয়া একটু হাসিয়া হরিচরণ বলিল, কই গেলাস বার করুন।

বধূটি যাইতে যাইতেও কথাগুলি শুনিয়া স্তম্ভিত বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। বনলতা বলিল, খাবে ভাই ছোটবউ? ভারি মজা হয়; যা হাসি পায় —সব ঘোরে, সব ঘোরে।

ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় বউটির সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল, সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল, যেন পলাইয়া গেল।

বনলতা বলিল, মেয়ে আনতে হয় সমান ঘর থেকে। এ বউটা ছোটলোকের ঘরের মেয়ে কি না—

বাধা দিয়া হরিচরণ হাসিয়া বলিল, যেতে দেন দিনকতক দিদিমণি, তারপর—

সিদ্ধি ঢালিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রুতপদে সে চলিয়া গেল। বনলতা সিদ্ধিটুকু নিঃশেষে পান করিয়া আবার পান-দোক্তা মুখে দিয়া উঠিল। নীচে হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক শব্দে বাড়িটা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চাশটা রাজহাঁস বাড়ির উঠানে আসিয়া কলরব করিতেছে। উহাদের খাবার দিতে হইবে। হাঁসগুলি বনলতার বাপের সম্পত্তি। বড়জ্যাঠার ছিল ঘোড়া, সে ঘোড়া মরিয়া গিয়াছে। এখন আছে কেবল একটা ময়না, একটা চন্দনা, একটা কাকাতুয়া; গোটা কয়েক কাঠবেড়ালী, তুইটা খরগোস! মেজজ্যাঠার আছে শ দেড়েক পায়রা। বনলতার বাপের এই হাঁস। ছোটকাকার গোটা আষ্টেক কুকুর।

পায়রা ও কুকুরের প্রতি ভীষণ ঘৃণা বনলতার। পায়রাগুলা যা ঘর নোংরা করে, আর কুকুর তো অস্পৃশ্য—ছুঁইলে স্নান করিতে হয়! রাজহাঁসগুলি যেমন দেখিতে সুন্দর, তেমনি ডিম খাইতে সুবিধা। বড়জ্যাঠার শখের জিনিসগুলিও ভালো। ময়নাটা যা চমৎকার ধমক দেয়, হারামজাদা, শালা, শূয়ার কি বাচ্চা! —চমৎকার!

বউটির নাম মণি, মণিমালা। এ বাড়িতে নাম হইয়াছে কাঞ্চনবউ। এ বাড়িতে বধূদের নামকরণ হয় প্রাচীন প্রথায়; মাণিকবউ, রানীবউ, মতিবউ, রত্নবউ, স্বর্ণবউ, আতরবউ, বেলাবউ, অর্থাৎ হীরা মণি মাণিক্য মুক্তা পান্না প্রভৃতি মহার্ঘ এবং আতর বেলা চাঁপা প্রভৃতি পরম আদরণীয় বস্তুর নামে নামকরণ করা হয়।

কাঞ্চনবউ তেতলায় উঠিতে উঠিতেই শুনিল, তাহার শাশুড়ী ঝিকে বলিতেছেন, দেখতো রে, কাঞ্চনবউমা কোথায় গেল।

কাঞ্চনবউ গতি দ্রুততর করিল। শাশুড়ী আপন মনেই বোধ করি বলিতেছিলেন, সমস্ত তুপুর মেয়ে কেবল ঘুরে বেড়াবে, সক্কলে ঘুমোবে আর কাগচিলের মত বউমা এখান-ওখান করে ফিরবে। বলে, অভ্যেস নেই। অভ্যেস থাকবে কোথা থেকে? গেরস্ত বাড়ির মেয়েদের কি ঘুমোবার সময় থাকে!

কাঞ্চনবউ নতমুখে শাশুড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। শাশুড়ী বলিলেন, এই যে, কোথায় ছিলে সমস্ত তুপুর।

কাঞ্চনবউ চুপ করিয়া রহিল, শাশুড়ী বলিলেন, যাও চুল বেঁধে কাপড়-চোপড় কেচে নাও। ঠাকরুন ডেকেছে তোমাকে, আজ থেকে তোমাকেই লক্ষ্মীর ঘরে সন্ধ্যা দেখাতে হবে। বাড়ির ছোটবউয়েই ও-কাজ চিরকাল করে।

তাড়াতাড়ি চুল বাঁধিয়া গা ধুইয়া লালপাড় গরদের একখানি শাড়ি পরিয়া কাঞ্চনবউ প্রস্তুত হইয়া শাশুড়ীর অপেক্ষা করিয়া রহিল, তিনিই তাহাকে বাড়ির গিন্নীর কাছে লইয়া যাইবেন।

নীচে খুব সোরগোল উঠিতেছে। রান্নাশালে সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যস্ততা। দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া বনলতা হাঁকিতেছে, সেই সুরে, সেই ভঙ্গিতে, নলে—অ নলে!

নলে এবার অল্পেই সাড়া দিল, যাই।

—বনলতা বলিল, আসতে হবে না। আজ এত রান্নার তাড়া কেন রে?

—ছোটকর্তা শিকারে যাবেন তাই।

—কি শিকার রে? কোথায়?

বনশূয়োর এসেছে নদীর ধারে। রেতে আউশ ধান খেতে আসে—

—বনলতা বাকীটা আর শুনিল না, বলিল, মরণ! পাখী-টাখী হলেও মানুষে খায়। শূয়োর মেরে কি হয়? অনর্থক জীবহত্যা।

রান্নাশালের পাশে বিস্তৃত সরঞ্জাম পড়িয়াছে চায়ের। মেজবাবুর কাছে সরকারী সাহেব আসিয়াছে; মেজবাবু এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার এবং আরও অনেক কিছু। তাহা ছাড়া বড়বাবুর বড়ছেলে, কাঞ্চনবউয়ের বড়ভাসুরের থিয়েটার ক্লাবের রিহারশ্যাল বসিয়াছে।

কাঞ্চনবউ অবাক বিস্ময়ে সমস্ত দেখিতেছিল। এই প্রকাণ্ড বড় বাড়ির প্রতিটি কোণে যেন তাহার জন্য বিস্ময় লুকাইয়া আছে রূপকথার মায়াপুরীর মত। ঐ বাড়ির লক্ষ্মীর ঘর সকলের চেয়ে বড় বিস্ময়। লক্ষ্মীর ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীকে নাকি বন্দিনী করিয়া রাখা হইয়াছে; সে ঘরের দরজা কখনও খোলা হয় না; বন্ধ দুয়ারের সম্মুখে ধূপ প্রদীপ রাখিয়া অর্চনা করা হয়। কাঞ্চনবউয়ের কৌতূহলের সীমা ছিল না। মণি বাঙালী গৃহস্থঘরের মেয়ে, কিন্তু জীবনের প্রথম হইতেই অভাবনীয় পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে স্বচ্ছন্দ সাহসের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তার বাপ সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী; বড়দাদা রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মী, ছোটদাদা গান্ধীসেবক, কাঞ্চনবউ সকলের ছোট; শৈশবে মাতৃহীন হইয়া মেয়েটি এই উদাসীন সংসারে আরণ্য-লতার মত জীবনের সকল প্রতিকূলতার সহিত যুদ্ধ করিয়া আপন শক্তিতে বড় হইয়াছে। তাহার রূপ দেখিয়া তাহাকে এ বাড়িতে আনা হইয়াছে। কিন্তু এ বাড়ির মৃত্তিকার সকল রস, এ বাড়ির আকাশের সকল আলো-বাতাস তাহার জীবনের ধাতু-প্রকৃতির পক্ষে

বিষ না হইলেও বিষম হইয়া উঠিয়াছে। তবু তাহার কৌতূহলের অন্ত নাই, তাহার জীবনী-শক্তি কিছুতেই পরাজয় মানিতে চায় না। বড়গিন্নী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সঙ্গে উলঙ্গ একটি বারো বৎসরের বালক। তাঁহার বড়ছেলের বড়ছেলে।

বড়গিন্নী এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন বড়ছেলের বড়ছেলেটিকে লইয়া। বারো বছরের ছেলেটিকে লইয়া বড়গিন্নীর ঝঞ্ঝাটের আর সীমা নাই। তাহার সমস্ত কিছু বড়গিন্নীকে করিতে হয়। অপটু মায়ের আট মাসের সন্তান ছেলেটি। আঁতুড়ে তাহাকে আঙুরের মত তুলায় মুড়িয়া রাখা হইয়াছিল। তারপর বহু সযত্ন পরিচর্যায় বড়গিন্নী তাহাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন। এখন সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, কিন্তু তবু তো সে আটমাসে ভূমিষ্ঠ অপরিপুষ্ট ছেলে, সেই জন্যই সকালে বড়গিন্নী বুরুশ দিয়া তাহার দাঁত মাজিয়া দেন, জিভ ছুলিয়া দেন, মুখে কুলকুচার জল তুলিয়া দেন—খাওয়াইয়া তো দেনই, বেচারা এখনও নিজে হাতে তেল পর্যন্ত মাখিতে পারে না; সেও তাঁহাকে মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিতে হয়। তাহারই পরিচর্যায় তিনি এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন; সন্ধ্যায় একটা কবিরাজী তেল মাখাইবার ব্যবস্থা আছে, সেই তেল মাখাইয়া গা মুছিয়া উলঙ্গ ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বলিলেন, এস বউমা, শ্বশুরকে প্রণাম করে নাও, তারপর চল।

বড়কর্তা সান্ধ্যকৃত্য করিতেছিলেন, কুলধর্মে রায়েরা তান্ত্রিক, কিন্তু বড়বাবু শিব-ভক্ত। ঘরের বাহির হইতেই তাঁহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল—শিব-শম্ভু, শিব-শম্ভু! শঙ্কর, শঙ্কর!

বেচারা বধূটির সর্বাঙ্গ মোচড় দিয়া উঠিল। তাহার শ্বশুর কি যে খান! মদটা সে বুঝিতে পারে, কিন্তু ছোট কল্কেতে সাজিয়া চাকরটা কি যে তাঁহাকে দেয়। দুর্গন্ধে বাড়িটা সুদ্ধ ভরিয়া উঠে! কিন্তু উপায় ছিল না।

বড়কর্তা হাসিয়া বলিলেন, কি গো আমার মা লক্ষ্মী!

কাঞ্চনবউ প্রণাম করিল।

একেবারে নীচের তলায় বাড়ির ঠিক মাঝখানে প্রশস্ত একখানি ঘর, কিন্তু অন্ধকূপের মত অন্ধকার, একটি দরজা ভিন্ন আর দরজা নাই অথবা জানালা নাই। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই মণি একটা গুমোট গরম অনুভব করিল, নাকে ঢুকিল ভ্যাপ্সা একটা গন্ধ। হাতের প্রদীপের আলোয় ঘরের গাঢ় অন্ধকার আবছায়ার মত হইয়া উঠিয়াছে। মণির সর্বাঙ্গ কেমন করিয়া উঠিল। কিন্তু

তবুও তাহার কৌতূহলের অন্ত ছিল না ; সে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল ! অন্ধকার ঘরের কোণে কোণে যেন অশরীরীর মত ছাদে মাথা ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া কতকগুলি লোহার সিন্দুক !

—এই ঘরের এই দোরের কাছ থেকে।

মণি চমকিয়া উঠিল। লাঠির উপর ভর দিয়া বার্ধক্যে অবনমিতদেহ বৃদ্ধা কর্ত্রী দন্তহীন মুখে জড়িত স্বরে বলিলেন, এই ঘরের এই দোরের কাছে পিদীম রাখ লো ভাই নাতবউ। এই হল আমাদের লক্ষ্মীর ঘর !

মণি দেখিল বিবর্ণ কালো একটি চতুষ্কোণ স্থান ; ক্রমে ধীরে ধীরে প্রতীয়মান হইল—ওটা একটা দরজা, দরজাটার শিকলের মুখে মরিচাধরা একটা তালা ঝুলিতেছে।

কর্ত্রী বলিলেন, আমার দিদিশাশুড়ী, বুঝিলি ভাই, এই ঘরে মা লক্ষ্মীকে বন্ধ করে রেখে গিয়েছেন। এই দরজা যতদিন না খুলবে, ততদিন মা লক্ষ্মী এ বাড়িতে বাঁধা থাকবে। আমার বড়শ্বশুর ছিলেন কোম্পানীর দেওয়ান—তখন নবাবের আমল—

তিনিই এ দেশের প্রথম জমিদার। কোম্পানীর দেওয়ানী করিয়াই তিনি বিস্তীর্ণ জমিদারী করিয়া গিয়াছেন। মণিমালা তাঁহার নাম শুনিয়াছে, তাঁহার নাম ছিল—গোপীবল্লভ গঙ্গোপাধ্যায় ; তিনিই প্রথম সরকার হইতে রায় উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি নাকি একেবারে অতি দরিদ্র পিতামাতার সন্তান ছিলেন !

দিদিশাশুড়ী বলিলেন, বুঝলি ভাই, ভাঙা ঘর, রাত্রে শেয়ালে এসে আগড় ঠেলে রান্না খেয়ে যেত। বাড়ির চারিদিকে ছিল কুকুরসোঙার বন, ঝরঝর করে জল পড়ত, রাত্রে ঘুমুতে না পেয়ে আমার বড়শ্বশুর কাঁদতেন, বড়শ্বশুরের মা বলতেন, এই কুকুরসোঙার বন, এই ভাঙা কুঁড়ে ভেঙে অমুক রচবে বৃন্দাবন। তাই তিনি করেছিলেন। কোম্পানীর কুঠিতে প্রথমে তিনি সর্দার হয়ে ঢুকেছিলেন।

গোপীবল্লভ প্রথমে পাইকদের সর্দার হইয়া কোম্পানীর চাকরিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তারপর ক্রমে মুন্সী, তারপর গোমস্তা, তারপর নায়েব, তারপর হইয়াছিলেন দেওয়ান।

তখন কোম্পানীর কাছে তাঁতীরা সব দাদন নিত ; কিন্তু দাদন শোধ করবার সময় সব লুকিয়ে বসে থাকত। সে দাদন আর আদায় হত না। তখন সায়েব বললে, যে এই দাদন আদায় করতে পারবে তাকেই আমি দেওয়ান করব। এই আমার বড়শ্বশুরের কপাল খুলে গেল। খুঁজে খুঁজে তাঁতীদের

সব ধরে এনে খুঁটিতে বেঁধে, দাদন একেবারে পাই-পয়সা আদায় করে দিলেন! বুঝলি ভাই নাতবউ। সাধারণ পুরুষ ছিলেন কি তিনি? তাঁর ডাকে বাঘে বলদে একঘাটে জল খেত।

সত্য কথা। সে আমলে গোপীবল্লভকে লোকে দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা বলিয়া মানিত। কোম্পানীর কর্তা সায়েবদের তিনি ছিলেন ডান হাত।

মণিমালা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দিদিশাশুড়ীর কুঞ্চিতচর্ম দন্তহীন মুখের দিকে চাহিয়া শুনিতেছিল। সে-আমলের কথা সেও অনেক জানে। তাহার বিবেকানন্দ-ভক্ত বাপ, রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মী বড়দাদা, গান্ধীপন্থী ছোটদাদার কাছে অনেক শুনিয়াছে।

দিদিশাশুড়ী অকস্মাৎ হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেন, বলিলেন, ইদিকে জাঁদরেল হলে হবে কি ভাই, বুড়ো খুব রসিক ছিল, বুঝলি, ষাট বছর বয়েসে বুড়ো তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করেছিল। প্রথম দুপক্ষের ছেলেপুলে ছিল না, তারপর ষাট বছর বয়েসে নৌকো করে যেতে গাঙের ঘাটে আমার দিদিশাশুড়ীকে দেখে বুড়োর মুণ্ডু ঘুরে গেল। বুঝলি ভাই, সে-আমলে পূজোর সময় লোকে দুগ্‌গা ঠাকরুনের পিতিমে না দেখে নাকি দেখত আমার দিদিশাশুড়ীকে। এই টানা টানা চোখ, দুধে-আলতায় রঙ, চাঁপার কলির মত আঙুল; সবচেয়ে বাহারের ছিল তাঁর চুল। ভোমরার মত কালো, আর কোঁকড়ানো। তাঁরই পেটে জন্মালেন আমার শ্বশুর। আর কি ভাগ্যি ছিল আমার দিদিশাশুড়ীর; বিয়ের পরই দুই সতীন টুক টুক করে মরে গেল। তখন এই বাড়ি হল। বুড়ো না কি বলত, এ মাণিক আমি রাখব কোথা। নাম দিয়েছিলেন মাণিকবউ। মাণিকবউয়ের আতরের ভরি ছিল আশী টাকা। ঢাকা থেকে ঢাকাই কাপড় আসত। কাশী থেকে আসত গরদ।—বলিয়া ঠোঁটের ডগায় একটা পিচ কাটিয়া বলিলেন, বুঝলি ভাই নাতবউ --বর—তোমার গিয়ে বুড়োই ভালো। নইলে ভাই আদর হয় না। জানিস তো প্রথমপক্ষ হল হেলা-ফেলা, দ্বিতীয়পক্ষ ফুলের মালা, আর তৃতীয়পক্ষ হল হরিনামের ঝোলা—ও তোর গলাতেই থাকে চব্বিশ ঘণ্টা।

কাঞ্চনবউ মুখ নত করিয়া মৃদু হাসিল।

দিদিশাশুড়ী বলিলেন—হাসছিস বুঝি? তোর ওই ছোঁড়া বর তোর আদর করবে মনে করছিস? এ বাড়ির সবারই বার-ফটকা রোগ আছে। ছোঁড়াকে খুব কষে লাগাম টেনে রাখবি, বুঝেছিস!

মণি বলিল, আপনি মা লক্ষ্মীর কথা বলুন!

—তাই বলছি লো। সে আমার দিদিশাশুড়ীর আমলে। তখন বুড়ো মারা

গিয়েছে সত্ত। আমার শ্বশুরের বয়েস তখন বছর বিশেক ; সবে বিয়ে হয়েছে। তখন আমাদের নায়েব ছিল কিত্তি ঘোষ। আমার বড়শ্বশুরের হাতে তৈরী নায়েব। শ্বশুর বলতেন, কিত্তিকাকা। দাপট কি তার! সমস্ত ছিল তার হাতে; ভারি কুটিল লোক ছিল কিত্তি ঘোষ। আমার শ্বশুর তাকে খুন করে তবে সম্পত্তি হাতে পান। সপ্তমী পূজোর দিন তাকে খুন করেছিলেন।

মণি শিহরিয়া উঠিল—খুন!

—হ্যাঁ। তা নইলে সে কি আর সম্পত্তি দিত শ্বশুরকে! আমার দিদিশাশুড়ী কিন্তু শ্বশুরকে বললেন, এ কি মহাপাপ করলি তুই! আমার বংশ কি করে থাকবে? সেই থেকে তিনি একেবারে যোগিনী সাজলেন, গেরুয়া কাপড় পরলেন, গায়ে নামাবলী নিলেন, তেল ছাড়লেন, কোঁকড়ান চুল রুখু হয়ে ফুলে চামরের মত হয়ে উঠল। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, চুল তাঁকে কাটতে দেয় নি ঘরের লোকে। আটদিন উপোস করে থাকলেন—মা, এ মহাপাপ থেকে আমার বংশকে রক্ষে কর। তারপর আঙুল গুনতে আরম্ভ করলেন, অষ্টুমী, নবুমী, দশুমী, একাদশী, দ্বাদশী, তেরোদশী, চতুরদশী, পুন্নিমে—আটদিন, সেই দিন কোজাগরী পুন্নিমে।

সেই কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে অষ্টাহ উপবাসিনী গোপীবল্লভের পরমা-সুন্দরী সহধর্মিণী ওই লক্ষ্মীর ঘরে ঘৃতদীপ জ্বলিয়া বসিয়াছিলেন, এই প্রাসাদতুল্য বাড়িটির ফটক হইতে অন্দর পর্যন্ত সারি সারি আলো জ্বলিতেছিল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্নায় যেন ভুবন ভাসিয়া যাইতেছিল। কেবল দিগন্তের এক কোণে কোন সুদূর দূরান্তে সচকিত বিদ্যুৎ-চমকের ক্ষীণ আভাস মধ্যে মধ্যে খেলিয়া যাইতেছিল। সমস্ত বাড়ি নিঝুম, দাসদাসী পুত্র-পুত্রবধূ সব ঘুমঘোরে অচেতন। কোজাগরী পূর্ণিমায় এমনি চৈতন্যহারা ঘুমই মানুষের চোখে নামিয়া আসে। আজও আসে। লক্ষ্মীদেবী এই জ্যোৎস্নাময়ী কোজাগরী নিশীথে পৃথিবী-ভ্রমণে বাহির হন। প্রশ্ন করেন সুধাক্ষরা কণ্ঠে, কোজাগরী রাত্রে—কে জাগে রে? কে জাগে?

উত্তর দেয় ভক্তিমান গৃহস্থের গৃহদ্বারের আলোকশিখা ও আলিপনা, সেই আলোকিত আলিপনারেখা ধরিয়া তিনি গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন কেহ জাগিয়া আছে কি না! জাগিয়া থাকিলে পূজাগ্রহণ করিয়া আশীর্বাদ দিয়া আবার বাহির হন। কিন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মা লক্ষ্মী রায়বাড়িতে দেখা দিলেন না; গোপীবল্লভের রূপসী বিধবার চোখের জলের আর বিরাম ছিল না। তারপর রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহরের প্রথম ভাগ, অকস্মাৎ জ্যোৎস্না কোথায়

অন্তর্হিত হইল। ঘন কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস। সে বাতাসে সমস্ত আলো নিবিয়া গেল। গোপীবল্লভের বিধবার ভক্তি ও নিষ্ঠার সীমা ছিল না, তিনি আবার প্রদীপ জ্বালাইয়া শেজ দিয়া সেগুলি ঢাকিয়া দিলেন। কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, চারিদিক অন্ধকার, সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বর্ষণ।

সেই দুর্যোগের মধ্যে পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া ডাকিল, কে জেগে রয়েছ গো? আমাকে একটুখানি বসতে দেবে? অন্ধকারে আমি পথ পাচ্ছি না।

অপূর্বপদ্মগন্ধে রায়গিন্নীর মনপ্রাণ তখন উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি মনে মনে হাসিলেন, মুখে বলিলেন, দিতে পারি মা, এক শর্তে।

—কি, বল?

—তুমি এইখানে বস। আমি একটু বাইরে যাব, যতক্ষণ না ফিরব আমি, ততক্ষণ কিন্তু তোমাকে থাকতে হবে।

—বেশ।

মেয়েটিকে ঘরে বসাইয়া গোপীবল্লভের বিধবা উঠিলেন, ঘরের দরজাটা টানিয়া শিকল দিতে দিতে বলিলেন, আমি শেকল দিয়ে যাচ্ছি, এসে খুলে দেব। তারপর দিলেন ওই তালা।

ছেলেকে ডাকিয়া তুলিয়া সমস্ত বলিয়া ছেলের হাতে চাবি দিলেন, তারপর বলিলেন—ও তালা তোমার বংশে কেউ যেন কখনও না খোলে। মা লক্ষ্মীকে বন্দিনী করে আমি চললাম।

—কোথায় মা?

মা হাসিয়া বলিলেন, কর্তাকে খবর দিতে বাবা।—বলিয়া তিনি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ছেলে গেল পিছন পিছন। মা গঙ্গার কূলে গিয়া দাঁড়াইলেন। শরতের মেঘ কাটিয়া তখন আবার চাঁদ উঠিয়াছে। কূলে কূলে ভরা গঙ্গার বুকে লাখে লাখে চাঁদমালা ভাসিয়া চলিয়াছে। পৃথিবী যেন দুধে স্নান করিয়া উঠিয়াছে। গোপীবল্লভের বিধবা গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

গল্প শেষ করিয়া বর্তমান রায়গিন্নী বলিলেন, সে চাবিও আমার শ্বশুর গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছেন।

মণিমালা বিচিত্র দৃষ্টিতে ওই তালাটার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল,

অন্ধকূপের মধ্যে মা লক্ষ্মীকে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে! চোখ ফাটিয়া তাহার জল আসিল।

বিগত শতাব্দীর স্বপ্ন-কল্পনার কাহিনী, তরুণী কিশোরীটির সমস্ত চেতনাকে মোহগ্রস্ত করিয়া তুলিল। সাধারণ তরুণীর কল্পনায় হয়ত ভাসিয়া উঠিত মণিরত্নময় এক ধন-ভাণ্ডার, যে মরকত তাহারা চোখে কখনও দেখে নাই—কল্পনায় সেই মরকত দিয়া এক পদ্ম গড়িয়া তাহার উপর কল্পনা করিত পটের অথবা মাটির লক্ষ্মীদেবীকে; কোণে ঝাঁপি, পায়ের কাছে পেঁচা। কিন্তু মণিমালা, এ বাড়ির কাঞ্চনবউ, ভিন্ন ধাতুতে গড়া মেয়ে। তাহার কল্পনায় কেবলই ভাসিয়া উঠিল, বন্ধদ্বার অন্ধকার ঘরের মধ্যে রক্তমাংসের সুকুমারী একটি মেয়ে ভীত ত্রস্ত দৃষ্টিতে নির্নিমেষ চোখ মেলিয়া বসিয়া আছে। চোখ হইতে টপ টপ করিয়া মুক্তার মত নিটোল অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, গভীর রাত্রে হয়ত গুন গুন করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে। মেয়েটির গোলাপ ফুলের দেহবর্ণ বাসি চাঁপার মত হইয়া গিয়াছে!

কাঞ্চনবউ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছিল—স্বপ্নাচ্ছন্নের মত। পায়ের তলায় সিমেণ্টের কঠিন শীতল স্পর্শ তাহার অনুভূতির অগোচর থাকিয়া গেল! সন্ধ্যা অনেকক্ষণ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, রান্নাশালে রান্নার গন্ধ উঠিতেছে, সে গন্ধও তাহার গোচরে আসিল না। তাহার ছোট খুড়শাশুড়ীর ঘরে গ্রামোফোনে একটি নাচের গান বাজিতেছে। ঝিদের কোলে কয়টি শিশু তারস্বরে চীৎকার করিতেছে, মায়ের কোলের জন্য। বনলতার ঘরে তাসের আসর বসিয়াছে। বনলতা কেবলই হাসিতেছে সিদ্ধির ঘোরে। সেজকর্তা ছাদে পায়চারী করিতেছিলেন। বধূটিকে দেখিয়া দ্রুতপদে তিনি ঘরে ঢুকিয়া গেলেন। ওই তাঁহার এক বিশেষত্ব, কাহারও সহিত কথা বলেন না, লোক দেখিলেই ঘরে ঢুকিয়া যান। ভোরবেলা হইতেই বাহির হইয়া গো-শালায়, গরু ছাগল ভেড়া ও হাঁসের পাল লইয়া থাকেন; দ্বিপ্রহরে একবার খাইয়া যান, আবার সন্ধ্যায় ফেরেন, তারপর অন্ধকারে ছাদে পায়চারী করেন; লোক দেখিলেই ঘরে ঢোকেন, লোক চলিয়া গেলেই বাহির হইয়া আসেন। বড়কর্তার ঘরে মেজকর্তা উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলিতেছেন; সঙ্গে সঙ্গে শব্দ উঠিতেছে চট-পট চট-পট, চাকরে বড়কর্তার গা-হাত-পা টিপিতেছে।

মেজকর্তা বলিতেছেন, বেটা শুয়ার কি বাচ্চার আস্পর্ধা দেখ দেখি? হাজার পাঁচেক টাকার দরকার, তাই ডেকে পাঠিয়েছিলাম, শালা বলে কিনা,

আগের দেনাটা প্রায় লাখ পাঁচেকে গিয়ে দাঁড়াল।—জানে না বেটা উল্লুক, রায়বাড়িতে লক্ষ্মী বাঁধা আছেন।

মৃদুস্বরে বড়বাবু বলিলেন, চাপরাসী দিয়ে বেটার কান মলিয়ে দিলে না কেন ?

—দেওয়া উচিত ছিল তাই। কিন্তু কালই আমার টাকার দরকার, সার্কেল অফিসার এসে বসে আছেন, চাঁদার জন্যে। বলেছি কালই দোব টাকা।

রুদ্ধদ্বার ঘরের বাহিরে যেমন বায়ুপ্রবাহ বহিয়া যায়, তেমনি করিয়াই সমস্ত বহিয়া গেল মণিমালার মনের বহির্লোকে। সে ধীরে ধীরে আসিয়া আপনার ঘরে বসিল।

বনলতার ছোটবোন বছর দশেকের মেয়েটি—নাম স্নেহলতা সে আসিয়া কাঞ্চনবউয়ের পাশে বসিল। কাঞ্চনবউ তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল।

মেয়েটি বলিল, আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে।

কাঞ্চনবউ সস্নেহে তাহার গাল টিপিয়া দিল।

সে বলিল, আমাকে একটা পয়সা দেবেন ?

—পয়সা ? পয়সা নিয়ে কি করবে ?

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল।

কাঞ্চনবউ বাক্স খুলিয়া একটি আনি তাহার হাতে দিল; মেয়েটির চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে চুপি চুপি এবার বলিল, জানেন, আমার বাবার পয়সা-কড়ি কিছু নেই। ওই যে মেজজ্যাঠা গাঁদা-মিনসে, সব ফাঁকি দিয়ে নিচ্ছে। কাউকে কিচ্ছু দেয় না।

মণিমালা অবাক হইয়া গেল! 'এমন কথা, এসব কথা বলিতে নাই' বলিতেও সে ভুলিয়া গেল।

মেয়েটি আবার বলিল, বাবা আমার মুখ্যু, গাঁজা খায়, গুলি খায়, তাই জন্যে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। লোক দেখলে ছুটে গিয়ে ঘরে ঢোকে; মেজজ্যাঠা মদ খায় কিনা, তাই ওকে খুব ভয় করে বাবা। বাবা যে গুলিখোর!—বলিয়াই সে হাসিয়া চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, জানেন, মাছি ধরে বাবা কানের মধ্যে পোরে। বন্ বন্ শব্দ করে, তাই—

বাহিরে কাহার পায়ের শব্দ উঠিতেই মেয়েটি শশব্যস্ত হইয়া কথা শেষ না করিয়াই নিমিষের মধ্যে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। পরক্ষণেই বড়গিন্নীর ঝি কামিনী উঁকি মারিয়া বলিল, স্নেহ এসেছিল বুঝি বউদিদি ?

কাঞ্চনবউয়ের কথা সরিল না, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

ঝি বলিল, দেখ দেখি সব ভালো করে, কিছু চুরি করে নিয়ে গেল কিনা! মেয়েটা চোর, খবরদার ওকে ঘরে ঢুকতে দিয়ো না।

কাঞ্চনবউয়ের এবার মনে হইল সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদে। ঝিটা চলিয়া যাইতেই সে বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল।

বাহির দিকের জানালা দিয়া রিহারশ্যালের বক্তৃতার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে।

ক্রমশ বাড়ির শব্দ-কোলাহল স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। উপরে ঘরে ঘরে মৃদু নাসিকা গর্জন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শোনা যাইতেছে কেবল ঠাকুর চাকর ও ঝিদের কথাকলহ। কাঞ্চনবউয়ের স্বামী বসিয়া সিগারেট টানিতেছিল। কাঞ্চনবউ স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, রাত্রে সে ঘুমাইবে না, জাগিয়া বসিয়া থাকিবে, মৃদু কান্নার শব্দ অথবা কঙ্কন-ঝঙ্কার শোনা যায় কি না, সে শুনিবে।

তাহার স্বামী বলিল, কলকাতায় যাচ্ছি, কিছু বরাত থাকে তো বল।

চকিত হইয়া মণি বলিল, কলকাতা?

---হ্যাঁ। 'ষোড়শী' প্লে দেখতে যাচ্ছি। আমাদের 'ষোড়শী' হচ্ছে কিনা এবার।

মণি চুপ করিয়া রহিল।

হাসিতে হাসিতে স্বামী কহিল, আর একটা মতলব আছে। আগে কাউকে বলছি না সেটা। একেবারে সব তাক লাগিয়ে দেব।

মণি এবারও কিছু বলিল না, শুধু হাসিল, মৃদু ম্লান হাসি।

বারবার ঘাড় নাড়িয়া স্বামী বলিল, হুঁ, হুঁ, অবাক হয়ে যাবে সব। কাউকে বল না যেন, মোটর কিনব একখানা, দাদা সব মতলব ঠিক করে ফেলেছে। ডি-লাক্স সেলুন বডি—ফোর্ড!

সহসা মণি চমকিয়া উঠিল। চাপা কান্নার শব্দ! কে কাঁদে? সে তাড়াতাড়ি স্বামীকে প্রশ্ন করিল, কে কাঁদছে?

কাণ পাতিয়া শুনিয়া স্বামী বলিল, বারবার বললাম দাদাকে, এত করে টেন না! নেশার ঘোরে বউদিকে ধরে ঠ্যাঙাচ্ছে। নাও শোবে এস।

স্বামী বিছানায় ধপাস করিয়া বসিয়া শরীর এলাইয়া দিল। আবার সে ডাকিল, শোও এসে।

কাঞ্চনবউ উত্তর দিল না। কয়েক মুহূর্ত পরেই স্বামীর নাক ডাকিতে লাগিল। আরও কিছুক্ষণ পরে নীচের রান্নাশালের সাড়াশব্দ স্তব্ধ হইয়া গেল। ওদিকে দিদিশাশুড়ীর মহলে কেবল মৃদু সাড়া উঠিতেছে। লুচি ভাজার গন্ধ আসিতেছে। ঠাকুমায়ের জলখাবার তৈয়ারী হইতেছে।

পাশের আমবাগানে পেঁচা ডাকিয়া উঠিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর শেষ

ড়ইয়া গেল বোধ হয়। টক্ টক্ শব্দে ওটা বোধ হয় তক্ষক ডাকিতেছে। ভ্যা যন্ত্রণায় একটা ব্যাঙ কাতরাইতেছে, অজগরে উহাকে গ্রাস করিতেছে। আরও একটু নিবিষ্ট হইয়া কাঞ্চনবউ শুনিল, আমবাগানে অসংখ্য ঝিঁ ঝিঁ াকিতেছে। কিন্তু কই পদ্মগন্ধ তো পাওয়া যাইতেছে না! মৃদু কঙ্কন-ঝঙ্কারও ও উঠিতেছে না, সন্তর্পিত কোমল চরণপাতে ক্ষীণ নূপুর-ধ্বনি কিংবা কান্না ক দীর্ঘনিশ্বাস, কিছুই তো শোনা যায় না! সন্তর্পণে সে বাহিরে বারান্দায় াসিয়া দাঁড়াইল। বাড়িখানা সুষুপ্ত; দিদিশাশুড়ীর মহলেও আর সাড়া-শব্দ উঠিতেছে না। কেবল সমবেত নাসিকা গর্জনের ধ্বনিতে বাড়িখানা মুখরিত। াকুমার নাক ডাকিতেছে—সেই অদ্ভুত বিকট শব্দে।

আজ কিন্তু কাঞ্চনের হাসি আসিল না।

ঢং-ঢং-ঢং করিয়া ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল। আবার পেঁচারা ডাকিয়া উঠিল, দূরে মাঠে ডাকিয়া উঠিল শেয়াল। কোথাও কেহ কাঁদে না; কাহারও ীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণতম আভাসও পাওয়া যায় না!

পূর্ব আকাশে শুকতারা উঠিয়াছে; রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনবউয়ের যেন মোহ কাটিল। সে অনুভব করিল, দহ তাহার ভার হইয়া পড়িয়াছে, চোখের পাতা বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সমস্ত াড়িখানা এখনও সুষুপ্ত। সে ঘরের ভিতর গিয়া বিছানায় শুইল এবং কিছু-ক্ষণের মধ্যেই গাঢ় ঘুমে অসাড় হইয়া গেল।

ন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে মোহ জাগিয়া উঠে।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া বন্ধ দুয়ারের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে চাহিয়া াকে। প্রদীপ ও ধূপদানী নামাইয়া দিয়া নতজানু হইয়া সে একাগ্র উৎকর্ণ ইয়া অপেক্ষা করে। ঘরের মধ্যে মাথার উপর চামচিকা উড়িয়া বেড়ায়, ন্ধঘরের গুমটে দর দর করিয়া ঘাম পড়ে। কিছুক্ষণ পর নিজেই সে একটা ীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। তারপর প্রণাম করিয়া উঠিয়া আসে।

এক-একদিন সে তালাটার দিকে চাহিয়া দেখে। মরিচা-ধরা তামাটে রঙের ালাটা জাম ধরিয়া একটা অখণ্ড বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। সাহস করিয়া স একদিন তালাটা নাড়িয়া দেখিল। সচেতন বুদ্ধি সত্ত্বেও তালাটার শীতল স্পর্শে সে চমকিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই ছাড়িয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া রজা বন্ধ করিয়া দিল। ঘামে তাহার সর্বাঙ্গ ভিজিয়া উঠিয়াছে। দ্রুতপদে স উপরে উঠিয়া গেল।

রান্নাশালে আজ ছোটশ্বশুরের হাঁকডাক শোনা যাইতেছে। তিনি আজ রাশীকৃত পাখী শিকার করিয়াছেন, সেই পাখী রান্নার জন্য তিনি মসলা বাটাইতেছেন। রান্না হইবে বাহিরে কাছারী বাড়িতে, বাড়ির মধ্যে বৃথা মাংস প্রবেশ করিতে পায় না।

বনলতার ঘরে তাসের আড্ডা বসিয়াছে; আজ কিন্তু আড্ডাটি নিঃশব্দ, নিঃশব্দে সকলে খেলিয়া চলিয়াছে। সমস্ত দোতলাটাই আজ কেমন শব্দহীন গতিতে চলিয়াছে। নিঃশব্দ সেজকর্তা দ্রুতপদে ছাদ হইতে ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

বড়কর্তার ঘরে মেজকর্তার কি আলোচনা হইতেছে। বৃদ্ধা রায়কর্ত্রী পর্যন্ত আসিয়াছেন।

মহাজন নালিশ করিয়াছে, দাবি হইয়াছে প্রায় ছয় লক্ষ। সেই লইয়া আলোচনা চলিতেছে।

মেজকর্তা সাহেব-সুবাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, তিনি বলিতেছেন, লক্ষ্মীর ঘর খুলিয়া দেখা যাক।—এ যুগে 'লক্ষ্মী বন্দিনী' এ প্রবাদ রূপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহার বিশ্বাস পূর্বপুরুষ গোপীবল্লভের পত্নী ওই ঘরে মহামূল্য গুপ্তধন লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

বড়কর্তা বলিলেন, না। ইস্পাতের মত কঠিন অনমনীয় তাঁহার কণ্ঠস্বর।

বৃদ্ধা কর্ত্রী বলিলেন, আমি আত্মহত্যে করব তাহলে—এই তোকে বলে রাখলাম কিন্তু।

পরদিন সন্ধ্যা দিতে গিয়া তাহার চোখে জল আসিল। নতজানু হইয়া চোখ বন্ধ করিয়া করজোড়ে সে প্রার্থনা করিল, মা, মা লক্ষ্মী! দয়া কর মা! তুমি রায়বংশকে রক্ষা কর। যে বাড়িতে তুমি অচলা হয়ে রয়েছ, সেখানে ঋণের কষ্ট কেন?

আবার তাহার চোখে জল আসিল। উঠিয়া প্রদীপটি তুলিয়া বন্ধ দুয়ারের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কালো দরজাটা পাথরের মত অনড় অচল! সহসা দরজার তালাটার দিকে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল; ব্যগ্র ঔৎসুক্যে সে তালাটার অতি নিকটে আলোটা তুলিয়া ধরিল। শতাব্দীর রসনা অবহেলিত তালাটা প্রথম দৃষ্টিতে অখণ্ড পাথরের মত মনে হইলেও, ক্ষয়িত হইয়া কখন খুলিয়া গিয়াছে, কেবল ঝুলিয়া আছে।

অত্যুগ্র উত্তেজনায় তালাটা ধরিয়া সে টানিল।

তারপর সেই পাথরের মত অনড় অচল দরজার গায়ে শরীরের সমস্ত ভার দিয়া ঠেলা দিল।

বারবার! বারবার! সে যেন পাগল হইয়া গিয়াছে

সঙ্গের ঝিটা সভয়ে ছুটিয়া গিয়া সংবাদ দিয়াছিল।

সমস্ত রায়বাড়ি ভাঙিয়া আসিল।

সর্বাগ্রে মেজকর্তা!

দুয়ার খুলিয়া গেল।

শতাব্দীরও ঊর্ধ্বকালের বদ্ধ বায়ু—তাহার স্পর্শ গন্ধ তীব্র উগ্র, অসহনীয়! মেজকর্তা দুয়ারে দাঁড়াইয়া লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিয়া দেখিলেন।

ছোট একখানি ঘর চোরকুঠরীর মত।

শূন্য—কোথাও কিছু নাই, কিন্তু মেঝের উপর ওটা কি পড়িয়া?

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কাঞ্চনবউ দেখিল—একটা নরকঙ্কাল, আর ওটা? ধূসর বিবর্ণ, ওটা কি?

ধীরে ধীরে ঘরখানার তীব্র অসহনীয় গন্ধ স্পর্শ স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছিল।

মেজকর্তা একবার অগ্রসর হইয়া ধূসর বস্তুটিকে হাতে করিয়া তুলিলেন। তিনি দেখিলেন, কাঞ্চনবউ দেখিল, সকলেই দেখিল একরাশ চুল; বিবর্ণ হইয়া গেছে, কিন্তু তবু অনুমান করা যায়—সে চুল এককালে ভ্রমরের ন্যায় কালো এবং কুঞ্চিত ছিল। মেঝের উপর আরও পড়িয়াছিল—একখানা বিবর্ণ জীর্ণ কাপড় কি চাদর, পাড়ের চিহ্ন দেখা যায় না—আর একখানা নামাবলী।

অকস্মাৎ কাঞ্চনবউয়ের চোখ দিয়া দর দর ধারে জল ঝরিতে আরম্ভ করিল।

তারিণী মাঝি

তারিণী মাঝির অভ্যাস মাথা হেঁট করিয়া চলা। অস্বাভাবিক দীর্ঘ তারিণী ঘরের দরজায়, গাছের ডালে, সাধারণ চালাঘরে, বহুবার মাথায় বহু ঘা খাইয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছে। কিন্তু নদীতে যখন সে খেয়া দেয়, তখন সে খাড়া সোজা। তালগাছের ডোঙার উপর দাঁড়াইয়া সুদীর্ঘ লগির খোঁচা মারিয়া যাত্রী-বোঝাই ডোঙাটাকে ওপার হইতে এপারে লইয়া আসিয়া সে থামে।

আষাঢ় মাস। অম্বুবাচী উপলক্ষ্যে গঙ্গাস্নানের ফেরত যাত্রীর ভিড়ে

ময়ূরাক্ষীর গনুটিয়ার ঘাটে যেন হাট বসিয়া গিয়াছিল। :পথশ্রমকাতর যাত্রীদলের সকলেই আগে পার হইয়া যাইতে চায়।

তারিণী তামাক খাইতে খাইতে হাঁক মারিয়া উঠিল, আর লয় গো ঠাকরুনরা, আর লয়। গঙ্গাচান করে পুণ্যির বোঝায় ভারি হয়ে আইছ সব।

একজন বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, আর একটি নোক বাবা, এই ছেলেটি।

ওদিক হইতে একজন ডাকিয়া উঠিল, ওলো ও সাবি, উঠে আয় লো, উঠে আয়। দোশমনের হাড়ের দাঁত মেলে আর হাসতে হবে না।

সাবি ওরফে সাবিত্রী তরুণী, সে তাহাদের পাশের গ্রামের কয়টি তরুণীর সহিত রহস্যালাপের কৌতুকে হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সে বলিল, তোরা যা, আসছে ক্ষেপে আমরা সব একসঙ্গে যাব।

তারিণী বলিয়া উঠিল, না বাপু, তুমি এই ক্ষেপেই চাপ। তোমরা সব একসঙ্গে চাপলে ডোঙা ডুববেই।

মুখরা সাবি বলিয়া উঠিল, ডোবে তো তোর ওই বুড়িদের ক্ষেপই ডুববে মাঝি। কেউ দশবার, কেউ বিশবার গঙ্গাচান করেছে ওরা। আমাদের সবে এই একবার।

তারিণী জোড়হাত করিয়া বলিল, আজ্ঞে মা, একবারেই যে আপনকারা গাঙের ঢেউ মাথায় করে আইছেন সব।

যাত্রীর দল কলরব করিয়া হাসিয়া উঠিল। মাঝি লগি হাতে ডোঙার মাথায় লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার সহকারী কালাচাঁদ পারের পয়সা সংগ্রহ করিতেছিল। সে হাঁকিয়া বলিল, পারের কড়ি ফাঁকি দাও নাই তো কেউ, দেখ, এখনও দেখ।—বলিয়া সে ডোঙাখানা ঠেলিয়া দিয়া ডোঙায় উঠিয়া পড়িল। লগির খোঁচা মারিয়া তারিণী বলিল, হরি হরি বল সব—হরিবোল।—যাত্রীদল সমস্বরে হরিবোল দিয়া উঠিল—হরিবোল।—দুই বনভূমিতে সে কলরোল প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছিল। নিম্নে খরস্রোতা ময়ূরাক্ষী নিম্নস্বরে ক্রূর হাস্য করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তারিণী এবার হাসিয়া বলিল, আমার নাম করলেও পার, আমিই তো পার করছি।

এক বৃদ্ধা বলিল, তা তো বটেই বাবা। তারিণী নইলে কে তরাবে বল?

একটা ঝাঁকি দিয়া লগিটা টানিয়া তুলিয়া তারিণী বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল, এই শালা কেলে, এঁটে ধর দাঁড়, হ্যাঁ—সেঙাত আমার ভাত খায় না গো! টান দেখছিস না?

সত্য কথা, ময়ূরাক্ষীর এই খরস্রোতই বিশেষত্ব। বারো মাসের মধ্যে সাত

আট মাস ময়ূরাক্ষী মরুভূমি, এক মাইল দেড় মাইল প্রশস্ত বালুকারাশি ধু-ধু করে। কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে সে রাক্ষসীর মত ভয়ঙ্করী। দুই পার্শ্বে চার-পাঁচ মাইল গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ জলস্রোতে পরিব্যাপ্ত করিয়া বিপুল স্রোতে সে তখন ছুটিয়া চলে। আবার কখনও কখনও আসে 'হড়পা' বান, ছয়-সাত হাত উচ্চ জলস্রোত সম্মুখের বাড়ি-ঘর ক্ষেত-খামার গ্রামের পর গ্রাম নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া দিয়া সমস্ত দেশটাকে প্লাবিত করিয়া দিয়া যায়। কিন্তু সে সচরাচর হয় না। বিশ বৎসর পূর্বে একবার হইয়াছিল।

মাথার উপর রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। একজন পুরুষ যাত্রী ছাতা খুলিয়া বসিল।

তারিণী বলিল, পাল খাটিও না ঠাকুর, পাল খাটিও না। তুমিই উড়ে যাবা।

লোকটি ছাতা বন্ধ করিয়া দিল। সহসা নদীর উপরের দিকে একটা কলরব ধ্বনিত হইয়া উঠিল—আর্ত কলরব।

ডোঙার যাত্রীরা সব সচকিত হইয়া পড়িল। তারিণী ধীরভাবে লগি চালাইয়া বলিল, এই, সব হুঁশ করে। তোমাদের কিছু হয় নাই। ডোঙা ডুবেছে ওলকুড়োর ঘাটে। এই বুড়ি মা, কাঁপছ কেনে, ধর ধর ঠাকুর, বুড়িকে ধর। ভয় কি ? এই দেখ, আমরা আড়-ঘাটে এসে গেইছি।

নদীও শেষ হইয়া আসিয়াছিল। তারিণী বলিল, কেলে!

—কি ?

নদীবক্ষের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তারিণী বলিল, লগি ধর দেখি।

কালাচাঁদ উঠিয়া পড়িল। তাহার হাতে লগি দিতে দিতে তারিণী বলিল, হুই দেখ—হুই—হুই ডুবল।—বলিতে বলিতেই সে খরস্রোতা নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ডোঙার উপর কয়টি বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিল, ও বাবা তারিণী, আমাদের কি হবে বাবা ?

কালাচাঁদ বলিয়া উঠিল, এই, বুড়িরা পেছু ডাকে দেখ দেখি। মরবি মরবি, তোরা মরবি।

পিঙ্গলবর্ণ জলস্রোতের মধ্যে শ্বেতবর্ণের কি একটা মধ্যে মধ্যে ডুবিতেছিল, আবার কিছুদূরে গিয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই তারিণী ক্ষিপ্রগতিতে স্রোতের মুখে সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছিল। সে চলার মধ্যে যেন কত স্বচ্ছন্দ গতি। বস্তুটার নিকটেই সে আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেটা ডুবিল। সঙ্গে সঙ্গে তারিণীও ডুবিল। দেখিতে দেখিতে সে কিছুদূরে গিয়া ভাসিয়া উঠিল। এক হাতে তাহার ঘন কালো রঙের কি

রহিয়াছে। তারপর সে ঈষৎ বাঁকিয়া স্রোতের মুখেই সাঁতার কাটিয়া ভাসিয়া চলিল।

দুই তীরের জনতা আশঙ্কাবিমিশ্র ঔৎসুক্যের সহিত একাগ্রদৃষ্টিতে তারিণীকে লক্ষ্য করিতেছিল। এক তীরের জনতা দেখিতে দেখিতে উচ্চরোলে চীৎকার করিয়া উঠিল, হরিবোল।

অন্য তীরের জনতা চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিতেছিল, উঠেছে? উঠেছে?

কালাচাঁদ তখন ডোঙা লইয়া ছুটিয়াছে।

তারিণীর ভাগ্য ভালো। জলমগ্ন ব্যক্তিটি স্থানীয় বর্ধিষ্ণু ঘরেরই একটি বধূ। ওলকুড়ার ঘাটে ডোঙা ডুবে নাই, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনাবৃতা বধূটি ডোঙার কিনারায় ভর দিয়া সরিয়া বসিতে গিয়া এই বিপদ ঘটাইয়া বসিয়াছিল। অবগুণ্ঠনের জন্যই হাতটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সে টলিয়া জলে পড়িয়া গিয়াছিল। মেয়েটি খানিকটা জল খাইয়াছিল, কিন্তু তেমন বেশি কিছু নয়—অল্প শুশ্রূষাতেই তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল।

নিতান্ত কচি মেয়ে—তের-চৌদ্দ বৎসরের বেশি বয়স নয়। দেখিতে বেশ সুশ্রী, দেহে অলঙ্কারও কয়খানা রহিয়াছে—কানে মাকড়ি, নাকে টানা দেওয়া নথ, হাতে রুলি, গলায় হার। সে তখনও হাঁপাইতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই মেয়েটির স্বামী ও শ্বশুর আসিয়া পৌছিলেন।

তারিণী প্রণাম করিয়া বলিল, পেনাম ঘোষ মশাই।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

তারিণী বলিল, আর সান কেড়ো না মা, দম লাও, দম লাও। সেই যে বলে—লাজে মা কুঁকুড়ি, বেপদের ধুকুড়ি।

ঘোষ মহাশয় বলিলেন, কি চাই তোর তারিণী, বল?

তারিণী মাথা চুলকাইয়া সারা হইল, কি তাহার চাই, সে ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে বলিল, এক হাঁড়ি মদের দাম—আট আনা।

জনতার মধ্য হইতেই সাবি মেয়েটি বলিয়া উঠিল, আ মরণ তোমার! দামী কিছু চেয়ে নে রে বাপু!

তারিণীর যেন এতক্ষণে খেয়াল হইল, সে হেঁট-মাথাতেই সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, ফাঁদি লত একখানা ঘোষ মশাই।

জনতার মধ্য হইতে সাবিই আবার বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ বাবা তারিণী, বউমা বুঝি খুব নাক নেড়ে কথা কয়?

প্রফুল্লচিত্ত জনতার হাস্যধ্বনিতে খেয়াঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল।

বধূটি ঘোমটা খুলে নাই, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তাহার গৌরবর্ণ কচি হাতখানি বাহির হইয়া আসিল—রাঙা করতলের উপর সোনার নথখানি রৌদ্রাভায় ঝকমক করিতেছে।

ঘোষ মহাশয় বলিলেন, দশহরার সময় পার্বণী রইল তোর কাপড় আর চাদর, বুঝলি তারিণী? আর এই নে—পাঁচটা টাকা।

তারিণী কৃতজ্ঞতায় নত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, আজ্ঞে হুজুর, চাদরের বদলে যদি শাড়ি—

হাসিয়া ঘোষ মহাশয় বলিলেন, তাই হবে রে, তাই হবে।

সাবি বলিল, তোর বউকে একবার দেখতাম তারিণী।

তারিণী বলিল, নেহাত কালো কুচ্ছিত, মা।

তারিণী সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরিল আকণ্ঠ মদ গিলিয়া। এখানে পা ফেলিতে পা পড়িতেছিল ওখানে। সে বিরক্ত হইয়া কালাচাঁদকে বলিল, রাস্তায় এত নেলা কে কাটলে রে কেলে? শুধুই নেলা—শুধুই—অ্যা—অ্যাই—একটো—

কালাচাঁদও নেশায় বিভোর, সে শুধু বলিল, হুঁ।

তারিণী বলিল, জলাম্পয়—সব জলাম্পয় হয়ে যায়, সাঁতরে বাড়ি চলে যাই। শালা খাল নাই, নেলা নাই সমান—স—ব সমান।

টলিতে টলিতেই সে শূন্যের বায়ুমণ্ডলে হাত ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া সাঁতারের অভিনয় করিয়া চলিয়াছিল।

গ্রামের প্রান্তেই বাড়ি। বাড়ির দরজায় একটি আলো জ্বালিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সুখী—তারিণীর স্ত্রী।

তারিণী গান ধরিয়া দিল, লো—তুন হয়েছে দেশে ফাঁদিলতের আমদানী—

সুখী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, খুব হয়েছে, এখন এস। ভাত কটা জুড়িয়ে কড়কড়ে হিম হয়ে গেল।

হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কোমরের কাপড় খুঁজিতে খুঁজিতে তারিণী বলিল, আগে তোকে লত পরতে হবে। লত কই—কই, কোথা গেল শালার লত?

সুখী বলিল, কোনোদিন ওই করতে গিয়ে আমার মাথা খাবে তুমি। এবার আমি গলায় দড়ি দোব কিন্তু।

তারিণী ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কেনে, কি করলাম আমি?

সুখী দৃষ্টিতে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, এই পাথার বান, আর তুমি—

তারিণীর অট্টহাসিতে বর্ষার রাত্রির সজল অন্ধকার ত্রস্ত হইয়া উঠিল। হাসি থামাইয়া সে সুখীর দিকে চাহিয়া বলিল, মায়ের বুকে ভয় থাকে? বল, তু বল, বলে যা বলছি। পেটের ভাত ওই ময়ূরাক্ষীর দৌলতে। জবাব দে কথার —অ্যাই!

সুখী তাহার সহিত আর বাক্যব্যয় না করিয়া ভাত বাড়িতে চলিয়া গেল।

তারিণী ডাকিল, সুখী, অ্যাই সুখী, অ্যাই!

সুখী কোনো উত্তর দিল না। তারিণী টলিতে টলিতে উঠিয়া ঘরের দিকে চলিল। পিছন হইতে ভাত বাড়িতে ব্যস্ত সুখীকে ধরিয়া বলিল, চল, এখুনি তোকে যেতে হবে।

সুখী বলিল, ছাড়, কাপড় ছাড়।

তারিণী বলিল, আলবৎ যেতে হবে। হাজার বার—তিনশ বার।

সুখী কাপড়টা টানিয়া বলিল, কাপড় ছাড়—যাব, চল।—তারিণী খুশী হইয়া কাপড় ছাড়িয়া দিল। সুখী ভাতের থালাটা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তারিণী বলিতেছিল, চল, তোকে পিঠে নিয়ে ঝাঁপ দোব গন্নুটের ঘাটে, উঠব পাঁচথুপীর ঘাটে।

সুখী বলিল, তাই হবে, ভাত খেয়ে লাও দেকিন।

বাহির হইয়া আসিতে গিয়া দরজার চৌকাঠে কপালে আঘাত পাইয়া তারিণীর আস্ফালনটা একটু কমিয়া আসিল।

ভাত খাইতে খাইতে সে আবার আরম্ভ করিল, তুলি নাই সেবার এক জোড়া গরু? পনের টাকা—পাঁচ টাকা কম এক কুড়ি, শালা মদন গোপ ঠকিয়ে লিলে? তোর হাতের শাঁখা-বাঁধা কি করে হল? বল, কে—তোর কোন নানা দিলে?

সুখী ঘরের মধ্যে আমানি ছাঁকিতেছিল, ঠাণ্ডা জিনিস নেশার পক্ষে ভালো।

তারিণী বলিল, শালা মদনা—লিলি ঠকিয়ে—লে। সুখীর শাঁখা-বাঁধা তো হয়েছে, ব্যস, আমাকে দিস আর না দিস। পড়ে শালা একদিন ময়ূরাক্ষীর বানে—শালাকে গোটা কতক চোবন দিয়ে তবে তুলি।

সম্মুখে আমানির বাটি ধরিয়া দিয়া সুখী তারিণীর কাপড়ের খুঁট খুলিতে আরম্ভ করিল, বাহির হইল নথখানি আর তিনটি টাকা।

সুখী প্রশ্ন করিল, আর দু টাকা কই?

তারিণী বলিল, কেলে, ওই কেলে, দিয়ে দিলাম কেলেকে—যা, লিয়ে যা।

সুখী এ কথার কোনো বাদ-প্রতিবাদ করিল না, সে তাহার অভ্যাস নয়।

তারিণী আবার বকিতে শুরু করিল, সেবার সেই তোর যখন অসুখ হল, ডাক পার হয় না, পুলিশ সায়েব ঘাটে বসে ভাপাইছে, হুঁ হুঁ বাবা—সেই বকশিশে তোর কানের ফুল। যা, তু যা, এখুনি ডাক লদীর পার থেকে, এই, উঠে আয় হারামজাদী লদী। উঠে আসবে, যা যা।

সুখী বলিল, দাঁড়াও, আয়নাটো লিয়ে আসি, লতটো পরি।

তারিণী খুশী হইয়া নীরব হইল। সুখী আয়না সম্মুখে রাখিয়া নথ পরিতে বসিল। সে হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, ভাত খাওয়া তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নথ পরা শেষ হইতেই সে উচ্ছিষ্ট হাতেই আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, দেখি দেখি।

সুখীর মুখে পুলকের আবেশ ফুটিয়া উঠিল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখখানি তাহার রাঙা হইয়া উঠিল।

তারিণী সাবি-ঠাকরুনকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। সুখী তন্বী, সুখী সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুখীর জন্য তারিণীর সুখের সীমা নাই।

তারিণী মত্ত অবস্থাতে বলিলেও মিথ্যা বলে নাই। ওই ময়ূরাক্ষীর প্রসাদেই তারিণীর অন্নবস্ত্রের অভাব হয় না। দশহরার দিন ময়ূরাক্ষীর পূজাও সে করিয়া থাকে। এবার তেরোশ বিয়াল্লিশ সালে দশহরার দিন তারিণী নিয়মমত পূজা-অর্চনা করিতেছিল। তাহার পরনে নূতন কাপড়, সুখীর পরনেও নূতন শাড়ি—ঘোষ মহাশয়ের দেওয়া পার্বণী। জলহীন ময়ূরাক্ষীর বালুকাময় গর্ভ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছিল। তখনও পর্যন্ত বৃষ্টি নামে নাই। ভোগপুরের কেষ্ট দাস নদীর ঘাটে নামিয়া একবার দাঁড়াইল। সমস্ত দেখিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, তাই ভালো করে পূজো কর তারিণী, জল-টল হোক, বান-টান আসুক, বান না এলে চাষ হবে কি করে?

ময়ূরাক্ষীর পলিতে দেশে সোনা ফলে।

তারিণী হাসিয়া বলিল, তাই বল বাপু। লোকে বলে কি জান দাস, বলে, শালা বানের লেগে পূজো দেয়। এই মায়ের কিপাতেই এ মুলুকের লক্ষ্মী। ধর রে কেলে, ওরে, পাঁঠা পালাল, ধর।

বলির পাঁঠাটা নদীগর্ভে উত্তপ্ত বালুকার উপর আর থাকিতে চাহিতেছিল না।

পূজা-অর্চনা সুশৃঙ্খলেই হইয়া গেল। তারিণী মদ খাইয়া নদীর ঘাটে বসিয়া কালাচাঁদকে বলিতেছিল, হড়হড়—কলকল—বান, লে কেনে তু দশ দিন বাদ।

কালাচাঁদ বলিল, এবার মাইরি, তু কিস্তুক ভাসা জিনিস ধরতে পাবি না। এবার কিস্তুক আমি ধরব, হাঁ।

তারিণী মত্ত হাসি হাসিয়া বলিল, বড় ঘুরন-চাকে তিনটি বুটবুটি, বুক—বুক—বুক, ব্যস—কালাচাঁদ ফরসা।

কালাচাঁদ অপমানে আগুন হইয়া উঠিল, কি বললি শালা ?

তারিণী খাড়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সুখী মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সব মিটাইয়া দিল। সে বলিল, ছোট বানের সময়—হুই পাকুড়গাছ পর্যন্ত বানে দেওর ধরবে, আর পাকুড়গাছ ছাড়ালেই তুমি।

কালাচাঁদ সুখীর পায়ের ধুলা লইয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল, বউ নইলে ই বলে কে ?

পরদিন হইতে ডোঙা মেরামত আরম্ভ হইল, দুইজনে হাতুড়ি-নেয়াই লইয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ডোঙাখানাকে প্রায় নূতন করিয়া ফেলিল।

কিন্তু সে ডোঙায় আবার ফাট ধরিল রৌদ্রের টানে। সমস্ত আষাঢ়ের মধ্যে বান হইল না। বান দূরের কথা, নদীর বালি ঢাকিয়া জলও হইল না। বৃষ্টি অতি সামান্য—দুই-চারি পসলা। সমস্ত দেশটার মধ্যে একটা মৃদু কাতর ক্রন্দন যেন সাড়া দিয়া উঠিল। প্রত্যাসন্ন বিপদের জন্য দেশ যেন মৃদুস্বরে কাঁদিতেছিল। কিংবা হয়ত বহুদূরের যে হাহাকার আসিতেছে, বায়ুস্তরবাহিত তাহারই অগ্রধ্বনি এ। তারিণীর দিন আর চলে না। সরকারী কর্মচারীদের বাইসিকল ঘাড়ে করিয়া নদী পার করিয়া দুই-চারিটা পয়সা মেলে, তাহাতেই সে মদ খায়। সরকারী কর্মচারীদের এ সময়ে আসা-যাওয়ার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে—তাঁহারা আসেন, দেশে সত্যই অভাব আছে কি না, তাহারই তদন্তে।—আরও কিছু মেলে, সে তাঁহাদের ফেলিয়া-দেওয়া সিগারেটের কুটি।

শ্রাবণের প্রথমেই প্রথম বন্যা আসিল। তারিণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বন্যার প্রথম দিন বিপুল আনন্দে সে তালগাছের মত উঁচু পাড়ের উপর হইতে ঝাঁপ দিয়া নদীর বুকে পড়িয়া বন্যার জল আরও উচ্ছল ও চঞ্চল করিয়া তুলিল।

কিন্তু তিনদিনের দিন নদীতে আবার হাঁটু-জল হইয়া গেল। গাছে বাঁধা ডোঙাটা তরঙ্গাঘাতে মৃদু মৃদু দোল খাইতেছিল। তাহারই উপর তারিণী ও কালাচাঁদ বসিয়াছিল—যদি কেহ ভদ্র যাত্রী আসে, তাহারই প্রতীক্ষায়, সে হাঁটিয়া পার হইবে না। এ অবস্থায় তাহারা দুইজনে মিলিয়া ডোঙাটা ঠেলিয়া লইয়া যায়।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। তারিণী বলিল, ই কি হল বল দেখি কেলে ?

চিন্তাকুলভাবে কালাচাঁদ বলিল, তাই তো।

তারিণী আবার বলিল, এমন তো কখনও দেখি নাই!

সেই পূর্বের মতই কালাচাঁদ উত্তর দিল, তাই তো।

আকাশের দিকে চাহিয়া তারিণী বলিল, আকাশ দেখ কেনে—ফরসা নীঁ-ল। পচি দিকেও তো ডাকে না!

কালাচাঁদ এবারও উত্তর দিল, তাই তো।

ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় কষাইয়া দিয়া তারিণী বলিল, তাই তো! তাই তো বলতেই যেন আমি ওকে বলছি। তাই তো! তাই তো! তাই তো!

কালাচাঁদ একান্ত অপ্রতিভের মত তারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কালাচাঁদের সে দৃষ্টি তারিণী সহ্য করিতে পারিল না, সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল। কিছুক্ষণ পর অকস্মাৎ যেন সচেতনের মত নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া সে বলিয়া উঠিল, বাতাস ঘুরেছে, লয় কেলে? পচি বইছে, না?—বলিতে বলিতেই সে লাফ দিয়া ডাঙায় উঠিয়া শুষ্ক বালি এক মুঠা ঝুরঝুর করিয়া মাটিতে ফেলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বায়ুপ্রবাহ অতি ক্ষীণ, পশ্চিমের কি না ঠিক বুঝা গেল না। তবুও সে বলিল, হুঁ, পচি থেকে ঠেলা বইছে—একটুকুন। আয় কেলে, মদ খাব, আয়। দু আনা পয়সা আছে আজ। বার করে লিয়েছি আজ সুখীর খুঁট খুলে।

সস্নেহ নিমন্ত্রণে কালাচাঁদ খুশী হইয়া উঠিয়াছিল। সে তারিণীর সঙ্গ ধরিয়া বলিল, তোমার বউয়ের হাতে টাকা আছে দাদা। বাড়ি গেলে তোমার ভাত ঠিক পাবেই! মলাম আমরাই।

তারিণী বলিল, সুখী বড় ভালো রে কেলে, বড় ভালো। উ না থাকলে আমার 'হাড়ির ললাট ডোমের দুগগতি' হয় ভাই। সেবার সেই ভাইয়ের বিয়েতে—

বাধা দিয়া কালাচাঁদ বলিল, দাঁড়াও দাদা, একটা তাল পড়ে রইছে, কুড়িয়ে লি।

সে ছুটিয়া পাশের মাঠে নামিয়া পড়িল।

একদল লোক গ্রামের ধারে গাছতলায় বসিয়া ছিল, তারিণী প্রশ্ন করিল, কোথা যাবা হে তোমরা, বাড়ি কোথা?

একজন উত্তর দিল, বীরচন্দ্রপুর বাড়ি ভাই আমাদের, খাটতে যাব আমরা বদ্ধমান।

কালাচাঁদ প্রশ্ন করিল, বদ্ধমানে কি জল হইছে নাকি?

—জল হয় নাই, ক্যানেল আছে কিনা।

দেখিতে দেখিতে দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। দুর্ভিক্ষ যেন দেশের মাটির তলেই আত্মগোপন করিয়া ছিল, মাটির ফাটলের মধ্য দিয়া পথ পাইয়া সে ভয়াল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল। গৃহস্থ আপনার ভাণ্ডার বন্ধ করিল। জনমজুরদের মধ্যে উপবাস শুরু হইল। দলে দলে লোক দেশ ছাড়িতে আরম্ভ করিল।

সেদিন সকালে উঠিয়া তারিণী ঘাটে আসিয়া দেখিল, কালাচাঁদ আসে নাই। প্রহর গড়াইয়া গেল, কালাচাঁদ তবুও আসিল না। তারিণী উঠিয়া কালাচাঁদের বাড়ি গিয়া ডাকিল, কেলে!

কেহ উত্তর দিল না। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘরদ্বার শূন্য—খাঁ-খাঁ করিতেছে, কেহ কোথাও নাই। পাশের বাড়িতে গিয়া দেখল, সে বাড়িও শূন্য। শুধু সে বাড়িই নয়, কালাচাঁদের পাড়াটাই জনশূন্য। পাশের চাষাপাড়ায় গিয়া শুনিল, কালাচাঁদের পাড়ার সকলেই কাল রাত্রে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

হারু মোড়ল বলিল, বললাম আমি তারিণী, যাস না সব, যাস না। তা শুনলে না, বলে, বড়নোকের গাঁয়ে ভিখ করব।

তারিণীর বুকের ভিতরটা কেমন করিতেছিল; সে ওই জনশূন্য পল্লীটার দিকে চাহিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

হারু আবার বলিল, দেশে বড়নোক কি আছে? সব তলা-ফাঁক। তাদের আবার বড় বিপদ। পেটে না খেলেও মুখে কবুল দিতে পারে না। এই তো কি বলে—গাঁয়ের নাম, ওই যে—পলাশডাঙা, পলাশডাঙার ভদ্দরনোক একজন, গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। শুধু অভাবে মরেছে।

তারিণী শিহরিয়া উঠিল।

পরদিন ঘাটে এক বীভৎস কাণ্ড! ঘাটের পাশেই এক বৃদ্ধার মৃতদেহ পড়িয়া ছিল। কতকটা তাহার শৃগাল-কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইয়াছে। তারিণী চিনিল, একটি মুচী-পরিবারের বৃদ্ধা মাতা এ হতভাগিনী। গত অপরাহ্নে চলচ্ছক্তিহীনা বৃদ্ধার মৃত্যু-কামনা বার বার তাহারা করিতেছিল। বৃদ্ধার জন্যই ঘাটের পাশে গত রাত্রে তাহারা আশ্রয় লইয়াছিল। রাত্রে ঘুমন্ত বৃদ্ধাকে ফেলিয়া তাহারা পলাইয়াছে।

সে আর সেখানে দাঁড়াইল না। বরাবর বাড়ি আসিয়া সুখীকে বলিল, লে সুখী, থান চারেক কাপড় আর গয়না কটা পেট-আঁচলে বেঁধে লে। আর ই গাঁয়ে থাকব না, শহর দিকে যাব। দিন-খাটুনি তো মিলবে।

জিনিসপত্র বাঁধিবার সময় তারিণী দেখিল, হাতের শাঁখা ছাড়া আর কোনো গহনাই সুখীর নাই। তারিণী চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিল, আর ?

সুখী ম্লান হাসিয়া বলিল, এতদিন চলল কিসে, বল ?

তারিণীও গ্রাম ছাড়িল।

দিন তিনেক পথ চলিবার পর সেদিন সন্ধ্যায় এক গ্রামের প্রান্তে তাহারা রাত্রির জন্য বিশ্রাম লইয়াছিল। গোটা দুই পাকা তাল লইয়া দুইজনে রাত্রির আহার সারিয়া লইতেছিল। তারিণী চট করিয়া উঠিয়া খোলা জায়গায় গিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে বলিল, দেখি সুখী, গামছাখানা। গামছাখানা লইয়া হাতে ঝুলাইয়া সেটাকে সে লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিল। ভোরবেলায় সুখীর ঘুম ভাঙিয়া গেল, দেখিল, তারিণী ঠায় জাগিয়া বসিয়া আছে। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, ঘুমোও নাই তুমি ?

হাসিয়া তারিণী বলিল, না, ঘুম এল না।

সুখী তাহাকে তিরস্কার আরম্ভ করিল, ব্যামো-স্যামো হ'লে কি করব বল দেখি আমি ? ই মানুষের বাইরে বেরুনো কেনে বাপু, ছি—ছি—ছি !

তারিণী পুলকিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দেখেছিস, সুখী দেখেছিস ?

সুখী বলিল, আমার মাথামুণ্ডু কি দেখব, বল ?

তারিণী বলিল, পিঁপড়েতে ডিম মুখে নিয়ে ওপরের পানে চলল। জল এইবার হবে।

সুখী দেখিল, সত্যই লক্ষ লক্ষ পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধভাবে পড়ো ঘরখানার দেওয়ালের উপরে উঠিয়া চলিয়াছে। মুখে তাহাদের সাদা সাদা ডিম।

সুখী বলিল, তোমার যেমন—

তারিণী বলিল, ওরা ঠিক জানতে পারে, নিচে থাকলে যে জলে বাসা ভেসে যাবে। ইদিকে বাতাস কেমন বইছে, দেখেছিস ? ঝাড়া পচ্চিম থেকে।

আকাশের দিকে চাহিয়া সুখী বলিল, আকাশ তো ফটফটে—চকচক করছে।

তারিণী চাহিয়াছিল অন্যদিকে, সে বলিল, মেঘ আসতে কতক্ষণ ? ওই দেখ, কাকে কুটো তুলছে—বাসার ভাঙা-ফুটো সারবে। আজ এইখানেই থাক সুখী, আর যাব না ; দেখি মেঘের গতিক।

খেয়া-মাঝির পর্যবেক্ষণ ভুল হয় নাই। অপরাহ্ণের :ক আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল, পশ্চিমের বাতাস ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিল

তারিণী বলিল, ওঠ সুখী, ফিরব।

সুখী বলিল, এই অবেলায় ?

তারিণী বলিল, ভয় কি তোর, আমি সঙ্গে রইছি। লে, মাথালি তু মাথায় দে। টিপিটিপি জল ভারি খারাপ।

সুখী বলিল, আর তুমি, তোমার শরীল বুঝি পাথরের ?

তারিণী হাসিয়া বলিল, ওরে, ই আমার জলের শরীল, রোদে টান ধরে, জল পেলেই ফোলে। চল, দে, পুঁটুলি আমাকে দে।

ধীরে ধীরে বাদল বাড়িতেছিল। উতলা বাতাসের সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ রিমিঝিমি বৃষ্টি হইয়া যায়, তারপর থামে। কিছুক্ষণ পর আবার বাতাস প্রবল হয়, সঙ্গে সঙ্গে নামে বৃষ্টি।

যে পথ গিয়াছিল তাহারা তিনদিনে, ফিরিবার সময় সেই পথ অতিক্রম করিল দুইদিনে। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়াই তারিণী বলিল, দাঁড়া, লদীর ঘাট দেখে আসি। ফিরিয়া আসিয়া পুলকিত চিত্তে তারিণী বলিল, লদী কানায় কানায়, সুখী।

প্রভাতে উঠিয়াই তারিণী ঘাটে যাইবার জন্য সাজিল। আকাশ তখন দুরন্ত দুর্যোগে আচ্ছন্ন, ঝড়ের মত বাতাস, সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি।

দ্বিপ্রহরে তারিণী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কামার-বাড়ি চললাম আমি।

সুখী ব্যস্তভাবে বলিল, খেয়ে যাও কিছু।

চিন্তিত মুখে ব্যস্ত তারিণী বলিল, না, ডোঙার একটো বড় গজাল খুলে গেইছে। সে না হলে—উহুঁ, অল্প বান হলে না হয় হত, লদী একেবারে পাথার হয়ে উঠেছে ; দেখসে আয়।

সুখীকে সে না দেখাইয়া ছাড়িল না। পালেদের পুকুরের উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া সুখী দেখিল, ময়ূরাক্ষীর পরিপূর্ণ রূপ। বিস্তৃতি যেন পারাপারহীন। রাঙা জলের মাথায় রাশি রাশি পুঞ্জিত ফেনা ভাসা ফুলের মত দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তারিণী বলিল, ডাক শুনছিস—সোঁ-সোঁ ? বান আরও বাড়বে। তু বাড়ি যা, আমি চললাম। লইলে কাল আর ডাক পার করতে পারব না।

সুখী অসন্তুষ্ট চিত্তে বলিল, এই জল ঝড়—

তারিণী সে কথা কানেই তুলিল না। দুরন্ত দুর্যোগের মধ্যেই সে বাহির হইয়া গেল।

যখন সে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দ্রুতপদে সে আসিতেছিল। কি একটা 'ভুগভুগ' শব্দ শোনা যায় না ? হ্যাঁ, ভুগভুগিই বটে। এ শব্দের অর্থ

তো সে জানে, আসন্ন বিপদ। নদীর ধারে গ্রামে গ্রামে এই সুরে ডুগডুগি যখন বাজে, তখনই বন্যার ভয় আসন্ন বুঝিতে হয়।

তারিণীর গ্রামের ও-পাশে ময়ূরাক্ষী, এ পাশে ছোট একটা কাঁতার অর্থাৎ ছোট শাখা-নদী। একটা বাঁশের পুল দিয়া গ্রামে প্রবেশের পথ। তারিণী সঠিক পথ ধরিয়া আসিয়াও বাঁশের পুল খুঁজিয়া পাইল না। তবে পথ ভুল হইল নাকি? অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ পর সে ঠাহর করিল, সে পুলের পথ এখনও অন্তত এক শত বিঘা জমির পরে। ঠিক বন্যার জলের ধারেই সে দাঁড়াইয়া ছিল, আঙুলের ডগায় ছিল জলের সীমা। দেখিতে দেখিতে গোড়ালি পর্যন্ত জলে ডুবিয়া গেল। সে কান পাতিয়া রহিল, কিন্তু বাতাস ও জলের শব্দ ছাড়া কিছু শোনা যায় না, আর একটা গর্জনের মত 'গোঁ-গোঁ শব্দ। দেখিতে দেখিতে সর্বাঙ্গ তাহার পোকায় ছাইয়া গেল। লাফ দিয়া দিয়া মাটির পোকা পলাইয়া যাইতে চাহিতেছে।

তারিণী জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

ক্ষিপ্রগতিতে মাঠের জল অতিক্রম করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া সে চমকিয়া উঠিল। গ্রামের মধ্যেও বন্যা প্রবেশ করিয়াছে। এক কোমর জলে পথঘাট ঘর-দুয়ার সব ভরিয়া গিয়াছে। পথের উপর দাঁড়াইয়া গ্রামের নরনারী আর্ত চীৎকার করিয়া এ উহাকে ডাকিতেছে। গরু ছাগল ভেড়া কুকুরের সে কি ভয়ার্ত চীৎকার! কিন্তু সে সমস্ত শব্দ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল ময়ূরাক্ষীর গর্জন, বাতাসের অট্টহাস্য আর বর্ষণের শব্দ; লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দল অট্টহাস্য ও চীৎকারে যেমন করিয়া ভয়ার্ত গৃহস্থের ক্রন্দন ঢাকিয়া দেয়, ঠিক তেমনই ভাবে।

গভীর অন্ধকারে পথও বেশ চেনা যায় না।

জলের মধ্যে কি একটা বস্তুর উপর তারিণীর পা পড়িল, জীব বলিয়াই বোধ হয়। হেঁট হইয়া তারিণী সেটাকে তুলিয়া দেখিল, ছাগলের ছানা একটা, শেষ হইয়া গিয়াছে। সেটাকে ফেলিয়া দিয়া কোনোরূপে সে বাড়ির দরজায় আসিয়া ডাকিল, সুখী—সুখী!

ঘরের মধ্য হইতে সাড়া আসিল—অপরিমেয় আশ্বস্ত কণ্ঠস্বরে সুখী সাড়া দিল, এই যে, ঘরে আমি।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তারিণী দেখিল, ঘরের উঠানে এক-কোমর জল। দাওয়ার উপর এক-হাঁটু জলে চালের বাঁশ ধরিয়া সুখী দাঁড়াইয়া আছে।

তারিণী তাহার হাত টানিয়া ধরিয়া বলিল, বেরিয়ে আয়, এখন কি ঘরে থাকে, ঘর চাপা পড়ে মরবি যে!

সুখী বলিল, তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি কোথা খুঁজে বেড়াতে বল দেখি ?

পথে নামিয়া তারিণী দাঁড়াইল, বলিল, কি করি বল দেখি সুখী ?

সুখী বলিল, এইখানেই দাঁড়াও। সবার যা দশা হবে, আমাদেরও তাই হবে।

তারিণী বলিল, বান যদি আরও বাড়ে সুখী ? গোঁ-গোঁ ডাক শুনছিস না ?

সুখী বলিল, আর কি বান বাড়ে গো ? আর বান বাড়লে দেশের কি থাকবে ? ছিষ্টি কি আর লষ্ট করবে ভগবান ?

তারিণী এ আশ্বাস গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

একটা হুড়মুড় শব্দের সঙ্গে বন্যার জল ছটকাইয়া তুলিয়া উঠিল। তারিণী বলিল, আমাদেরই ঘর পড়ল সুখী। চল, আর লয়, কোমরের ওপর উঠল, তোর তো এক-ছাতি হইছে তাহলে।

অন্ধকারে কোথায় বা কাহার কণ্ঠস্বর বোঝা গেল না, কিন্তু নারী-কণ্ঠের কাতর ক্রন্দন ধ্বনিয়া উঠিল, ওগো, খোকা পড়ে গেইছে বুক থেকে। খোকা রে !

তারিণী বলিল, এইখানেই থাকবি সুখী, ডাকলে সাড়া দিস।

সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। শুধু তাহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল, কে ? কোথা ? কার ছেলে পড়ে গেল, সাড়া দাও ওই !

ওদিক হইতে সাড়া আসিল, এই যি।

তারিণী আবার হাঁকিল, ওই !

কিছুক্ষণ ধরিয়া কণ্ঠস্বরের সঙ্কেতের আদান-প্রদান চলিয়া সে শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পরই তারিণী ডাকিল, সুখী !

সুখী সাড়া দিল, অ্যাঁ ?

শব্দ লক্ষ্য করিয়া তারিণী আসিয়া বলিল, আমার কোমর ধর সুখী। গতিক ভালো নয়।

সুখী আর প্রতিবাদ করিল না। তারিণীর কোমরের কাপড় ধরিয়া বলিল, কার ছেলে বটে ? পেলে ?

তারিণী বলিল, পেয়েছি, ভূপতে ভল্লার ছেলে।

সন্তর্পণে জল ভাঙিয়া তাহারা চলিয়াছিল। জল ক্রমশ যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। তারিণী বলিল, আমার পিঠে চাপ সুখী। কিন্তু এ কোন দিকে এলাম সুখী, ই—ই—

কথা শেষ হইবার পূর্বেই অথই জলে দুইজনে ডুবিয়া গেল। পরক্ষণেই

কিন্তু তারিণী ভাসিয়া উঠিয়া বলিল, নদীতেই বা পড়লাম সুখী। পিঠ ছেড়ে আমার কোমরের কাপড় ধরে ভেসে থাক।

স্রোতের টানে তখন তাহারা ভাসিয়া চলিয়াছে। গাঢ় গভীর অন্ধকার, কানের পাশ দিয়া বাতাস চলিয়াছে—হু-হু শব্দে, তাহারই সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে ময়ূরাক্ষীর বানের হুড়হুড় শব্দ। চোখে মুখে বৃষ্টির ছাট আসিয়া বিঁধিতেছিল তীরের মত। কুটার মত তাহারা চলিয়াছে—কতক্ষণ, তাহার অনুমান হয় না; মনে হয়, কত দিন কত মাস তাহার হিসাব নাই—নিকাশ নাই। শরীরও ক্রমশ যেন আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। মাঝে মাঝে ময়ূরাক্ষীর তরঙ্গ শ্বাসরোধ করিয়া দেয়। কিন্তু সুখীর হাতের মুঠি কেমন হইয়া আসে যে! সে যে ক্রমশ ভারি হইয়া উঠিতেছে! তারিণী ডাকিল, সুখী—সুখী!

উন্মত্তার মত সুখী উত্তর দিল, অ্যাঁ?

—ভয় কি তোর, আমি—

পর-মুহূর্তে তারিণী অনুভব করিল, অতল জলের তলে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ডুবিয়া চলিয়াছে। ঘূর্ণিতে পড়িয়াছে তাহারা। সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত করিয়া সে জল ঠেলিবার চেষ্টা করিল। কিছুক্ষণেই মনে হইল, তাহারা জলের উপরে উঠিয়াছে। কিন্তু সম্মুখের বিপদ তারিণী জানে, এইখানে আবার ডুবিতে হইবে। সে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু এ কি, সুখী যে নাগপাশের মত তাহাকে জড়াইয়া ধরিতেছে? সে ডাকিল, সুখী—সুখী!

ঘুরিতে ঘুরিতে আবার জলতলে চলিয়াছে। সুখীর কঠিন বন্ধনে তারিণীর দেহও যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে। বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড যেন ফাটিয়া গেল। তারিণী সুখীর দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিল। বাতাস—বাতাস! যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পর-মুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে কি তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ! হাতের মুঠিতেই তাহার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুল ভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, সেটা খসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল। আঃ, আঃ—বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে সে কামনা করিল, আল্লো ও মাটি।

অস্বাভাবিক মৃত্যু হলেই পুলিশ এসে লাশ নিয়ে জেলার সদরে চালান দেয়। সে লাশ যায় জেলার বড় হাসপাতালে, সেখানে সিবিল-সার্জেনের তত্ত্বাবধানে লাশ কেটে পরীক্ষা করে দেখা হয়, মৃত্যু সঠিক কিসে বা কি কারণে ঘটেছে। সাপে কাটা, জলে ডোবা, গাছ থেকে পড়া, কি গাছ চাপা পড়া—এই সব ধরনের মৃত্যুতে ইউনিয়ন-বোর্ড-প্রেসিডেণ্টরা নিঃসন্দেহ হয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে সৎকারের হুকুম দিতে পারেন, কিন্তু গলায় দড়ি থেকে খুন-খারাপি পর্যন্ত ওতে তাঁদের হাত নাই। সে লাশ চালান দিতেই হবে। কারণ কে বলতে পারে, বিষ খাইয়ে মেরে শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেয় নি! অস্ত্রাঘাতেও বোঝা যায়, আঘাতটা পরে করেছে, না নিজে করেছে অর্থাৎ খুন না আত্মহত্যা, সেটা ডাক্তারেরা অস্ত্রাঘাতের ধরন দেখে বুঝতে পারেন।

কাজেই দুটো লাশই চালান দিলেন দারোগা।

জটে পাগলা এবং কালী বা কালা গুণ্ডার লাশ।

জটে পাগলার পাঁজরায় একটা গভীর ক্ষত-চিহ্ন। কাঁধে হাতে আরও তিন-চারটে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, তবে বুকের আঘাতটাতেই তার মৃত্যু ঘটেছে এতে কারুর সন্দেহ রইল না। কালা গুণ্ডার বড় ছোরাটাও রক্তমাখা অবস্থায় তার হাতের কাছে পড়েও ছিল। সুতরাং কালা গুণ্ডাই তাকে খুন করে থাকবে। কালা গুণ্ডা একটা অসুর, কালা গুণ্ডা একটা রাক্ষস, একটা দৈত্য, যা বল সে তাই। তার পক্ষে একটা প্রৌঢ় পাগলকে খুন করা কি এমন ব্যাপার! খসখসে কালো রঙ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, তেমনি দাড়ি-গোঁফ, থ্যাবড়া নাক, ঠোঁটের উপর বেরিয়ে-পড়া দুটো বড় বড় দাঁতওয়ালা ছ ফুট লম্বা কালা গুণ্ডা—এ অঞ্চলের ত্রাস বলে পরিগণিত ছিল। মায়েরা দুষ্ট ছেলেকে ভয় দেখাত—ওই কালা গুণ্ডা আসছে! কালা গুণ্ডা না হয় জটে পাগলাকে খুন করলে; কিন্তু কালাকে কে মারলে? কালার গলায় একটা গভীর ক্ষত-চিহ্ন। এক পাশে চারটে, এক পাশে পাঁচটা আঙুল গভীরভাবে যেন ঢুকে গিয়েছিল। কেউ যেন নখ দিয়ে ওর গলাটা ছিঁড়ে দিতে চেয়েছিল। সে কি জটে পাগলা? হয়ত সে-ই। আর কে হবে? জটের আঙুলে বড় বড় নখ প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা। নখে এবং আঙুলে রক্তও লেগে রয়েছে। তবুও বিশ্বাস হয় না।

কি করে হবে?

মনে পড়ছে যে, ১৯৪৭ সালে কালা গুণ্ডা প্রথম দিন এ অঞ্চলে পা দিয়েই ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। তার হাতে সেদিন ছিল চিমটে। চিমটে ঘুরিয়ে 'চে—ৎ চ—ণ্ডী—' চীৎকার করে ভাসতোড়ের এনতাজ মিয়ার বুকের কাছে চিমটেটা নিয়ে গিয়ে বলেছিল—জিভ বের কর মা, খেয়ে নে রক্ত!—আশে-পাশের লোক অনেক কষ্টে তাকে নিরস্ত করেছিল। এনতাজ মিয়া হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে বলেছিল—আমার ভুল হয়েছে। না না, সে আপনি নয়।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এই। সেদিন হঠাৎ কালার আবির্ভাব হল। পরনে গেরুয়া বহির্বাস, ঘাড়ে ফেরতা দিয়ে বাঁধা, গলায় রুদ্রাক্ষ, তার ওপর একটা হলদে ব্যাগ, কাঁধে ঝোলা, হাতের চিমটে হাতের লোহার বালার সঙ্গে ঠুকে শব্দ তুলে এসে হাঁকলে—আরে শুনো হিন্দু, ব্রাহ্মণ আর চণ্ডাল—সব জাত শুনো, প্রভু বিশ্বনাথকে হুকুমত। লে আও চন্দা! চাঁদা আনো! চাঁদা!

—চাঁদা!

—হাঁ! চাঁ-দা—। হিন্দুকো বাঁচানেকে লিয়ে চন্দা। বাবা বিশ্বনাথকে হুকুমত। হিন্দুকো ধরম যাচ্ছে। পাচ হাজার—দশ হাজার কলকাত্তা, নোয়াখালি, হিন্দুর জেনানার ইজ্জত, ধরম বচানোকে লিয়ে চান্দা!—আঢ়াই শও রুপেয়া লে আও।

ঠিক এই সময়েই গাউগা ভাসতোড়ের এনতাজ মিয়া ওই পথ ধরেই যাচ্ছিল বায়োনপাড়া। এনতাজ চামড়ার ব্যবসা করে, দু-তিনটে জেলা ঘুরে চামড়া কিনে চালান দেয়—গতিবিধি তার সর্বত্র। সে কালাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আরে, তুমি না সেই ফকির!

—হ্যাঁ, হম সন্ন্যাসী ফকির।

—না না, মুসলমান ফকির! মুরশিদাবাদের শেখের পাড়াতে সেদিন—মুসলমানদের বাঁচাতে হবে পয়গম্বরের হুকুমত, কায়েদে আজমের ফরমন নিয়ে এসেছ তুমি—বলে চাঁদা তুলছিলে না? আর আজ এখানে এসেও হিন্দুকে বাঁচাতে হবে বলে—

সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে উঠল কালা গোঁসাই। তখনও তার গুণ্ডা খেতাব আবিষ্কৃত হয় নি। সে হুঙ্কারে আশেপাশের লোকজন চমকে উঠল।

—কেয়া রে বিধর্মী! আমি মুসলমানের জন্য চাঁদা তুলি? আমি মুসলমান?

গলার রুদ্রাক্ষের মালাটা দেখিয়ে, চিমটেটা ঘোরাতে শুরু করে দিয়েছিল।

—আ—আ! হে মহাদেব, বম্ বৈদ্যনাথ। কালী কালী মহাকালী—

ভদ্রকালী কপালিনী অসুরনাশিনী! জিভ বের কর মা—খাও রক্ত, নাচ মা দিগম্বরী—হা—

সে এনতাজের মাথায় চিমটে বসায় আর কি! লোকজন ছুটে পালিয়েছিল, এনতাজও পালিয়েছিল তাদের সঙ্গে। কিন্তু কালা গোঁসাই। তাতে মানে নি। শেষে এনতাজ বলেছিল—আমার ভুল হয়েছে গোঁসাই। না না, সে তুমি নও।

গড় গড় করে গায়ত্রী মন্ত্র বলে গিয়ে কালা গোঁসাই বলেছিল—আমি মুসলমান? ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরি নিভং। আমি মুসলমান? জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। আমি মুসলমান? খুন করব তোকে।

—আমি মাফ চাচ্ছি, আমার ভুল হয়েছে।

—হ্যাঁ। মাফ তুমকো নেহি করতা, লেকিন—একটা সত্যি কথা বলেছিস—তাতেই তোকে মাফ কর দিয়া। শুনো বেওকুফ হিন্দুলোক, গিধ্বর বুরবক ভেড়ীকে জাত, শুনো! কেয়া বোলা ইয়ে শেখ। মুসলমানরা চাঁদা তুলছে। ফকির এসে চাঁদা তুলে ঘুরছে। পল্টন তৈয়ার করেগা। হাঁ, হিন্দু ভেড়ী লোক, সমঝ লেও। সোহি বাত—বিশ্বনাথজী সেই কথা বলে আমাকে পাঠিয়েছেন। বদ্রীনাথ আস্থানের ওপারে মহাবীরজীর আশ্রম, হনুমানজী বলেছেন আমাকে—যাও, চন্দা উঠাও। পল্টন তৈয়ার করো। যে হিন্দু চন্দা নেহি দেগা, উ বরবাদ জায়েগা। ঘরে আগুন লাগবে, সাঁপে কাটবে। মাথামে বজ্রঘাত হোবে। হাঁ। লে আও চন্দা! আড়াই শও রুপেয়া—ইয়ে গাঁওকে চন্দা!

এর পর চাঁদা না দিয়ে উপায় কি? চাঁদা এসেছিল, কিন্তু আড়াইশ নয়—পঞ্চাশ টাকা কয়েক আনা! কালা গোঁসাই বলেছিল—আচ্ছা, কিস্তিতে শোধ নেব।

শুধু ওই গাঁয়েই নয়, আশপাশ সকল হিন্দু গাঁয়েই চাঁদা তুলেছিল। সঙ্গে জন কয়েক চ্যালাও জুটেছিল—ঘোঁতনা হাজরা, লাট্টু চৌধুরী, গণ্ডার ঘোষ, তাদের সঙ্গে গাইয়ে গাঁজাল জগা পর্যন্ত।

ভারতবর্ষ তখন সভ্য সভ্য ভাগ হয়েছে এবং স্বাধীন হয়েছে। নানা দিকে নানান গোলযোগ! ওদিকে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে অনাবরত লোক আসছে। হৈ-হল্লা করছে। পুলিশের প্রতাপ কমেছে। তবুও একদিন এই সব খবর পেয়ে দারোগা এসে হাজির হল।

জিজ্ঞাসা করলে—কি নাম?

—হম হ্যায় কালা গোঁসাই।

—কালা গোঁসাহী ?

—হাঁ হাঁ। ভৈরব। কালভৈরব।

—বাড়ি কোথায় ?

—বাড়ি তো কৈলাস। আস্তানা কাশী।

—এই সব কি বলে বেড়াচ্ছ ? আর লোকজনের কাছে চাঁদা আদায় করছ কেন ?

—বিশ্বনাথ প্রভু, মহাবীরজী, কালভৈরবের হুকুম।

—ও সব চলবে না। চালান দেব আমি।

হা-হা করে হেসে উঠেছিল কালা গোঁসাই।—আরে! চালান দেগা ? বাঁধে গা ? কি দিয়ে বাঁধবে ? হাতকড়ি ? হা—হা—হা—হা! থু—থু—

দারোগার আর সহ্য হয় নি। বলেছিল—লাগাও হাতকড়ি।

হাত বাড়িয়ে কালা গোঁসাই বলেছিল—লাগাও।

কনস্টেবলটা ভয়ে ভয়েই হাতকড়ি লাগিয়েছিল। লাগাবার পরেই কালা গোঁসাই 'জয় কালী' বলে চেঁচিয়ে উঠে বন্দী হাত দুটোয় একটা ঝটকা দিয়ে কী যে করলে লোকে ঠাওর পেল না ; কিন্তু পর-মুহূর্তেই দেখলে, এক হাতের একটা হাতকড়ার বাঁধন খুলে গেছে ; হাতকড়াটা ঝুলছে এক হাতে। মোট কথা, কালা গোঁসাহীকে বাঁধা যায় নি। কিন্তু হাতকড়া খুললেই পুলিশের হাত থেকে খোলা পাওয়া যায় না। পুলিশ তাকে ওখানকার সব থেকে বড় গ্রাম নবগ্রামে ধরে নিয়ে গেল। স্থির করলে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ-প্রচারের অপরাধে চালান দেবে। কিন্তু তাতে হাঙ্গামা হুজ্জুত অনেক, সাক্ষী-সাবুদ চাই, সকল লোকের সমর্থন চাই। এই সব ভেবে-চিন্তেই দারোগা তাকে ছেড়ে দিলে। তবে বলে দিলে—দেখ, এ সব কথা আর বল না। সাজা হয়ে যাবে। এবার আমি ছেড়ে দিলাম। এর পর আর ছাড়ব না।

কালা গোঁসাই বললে—ঠিক হ্যায় রে বাবা। যাও, তুমি নিদ যাও।

বলেই সে রাস্তায় নেমে এসে হাঁকলে—বোম মহাদেও টন গণেশ, ভেজো সত্তুন্নন সমেত।—চেৎচণ্ডী !

এবং নবগ্রামেই সে একটা গাছতলায় তার চিমটেটা পুঁতে তার সামনে বসে গেল। দিন দুয়েক ধ্যানস্থ হয়ে বসে থেকে হঠাৎ তিনদিনের দিন চীৎকার করে উঠল—যজ্ঞ, যজ্ঞ হবে। শান্তিযজ্ঞ। হাঁ। দেশের বিলকুল অশান্তি দূর হয়ে যাবে। শান্তিযজ্ঞ। হিংসা দূর হবে। অন্নকষ্ট দূরে যাবে। হিন্দুস্থান পাকিস্তানমে শান্তি আয়েগা। উঠাও চন্দা !

আর কিন্তু চাঁদা উঠল না। তখন কালী গোঁসাই শিব স্থাপন করলে এবং ধুনি জ্বাললে। চ্যালা জনকয়েক আগেই জুটেছিল—ঘোঁতনা হাজরা, লাট্টু চোধুরী, গণ্ডার ঘোষ ; এদের সঙ্গে নবগ্রাম থেকে জুটে গেল বাসের ক্লীনার ইস্কাপন, গাঁজাল গাইয়ে ভোলা, উদাসী গোবিন্দে, রাইস মিলের ফিটার বিলাইতিরাম এবং আরও জনকতক। তার মধ্যে ছিঁচকে চোর হাবলা ছিল এবং দুজন গুলিখোরও ছিল, তাদের মধ্যে একজন মুসলমান। আর জুটেছিল পরম বায়েন। পরম বায়েন্ গ্রামের দেবস্থলে ঢাক বাজাত, পাকী মদের ভক্ত ছিল সে। পরম সকাল-সন্ধ্যা দু বেলা কালী গোঁসাইয়ের শিবতলায় ঢাক বাজাতে শুরু করলে। দিন কয়েক পরেই বেগুনি-ফুলুরির দোকানদারনী রামদুলারী এসে গড় করে বললে—মহাদেওজীর স্বপন মিলেছে তার, সাধু মহারাজের বড় কষ্ট হচ্ছে, একটা চালা বানিয়ে দিতে হবে আর ধুলোমাটিতে বসে থাকতে মহাদেও পর্ভুর বড় গা ঘিনঘিন করছে—একটি বেদী বাঁধিয়ে দিতে হবে। এখন সাধু মহারাজের হুকুম চাই।

কালী গোঁসাই বললে—ভাগ ভাগ যা। নেহি মাংতা! তু তো পাপিনী হ্যায়।

ছোটখাটো মাথায়, মুখে বসন্তের দাগ—রামদুলারীকে লোকে পাপিনীই বলত। রামদুলারীর নাকি বাচ্চা চোরের দল আছে। দশ-বারোটা ভিখারী ছেলে—তারা ঘাট থেকে বাসন তুলে আনে, দুপুরবেলা বাড়ি ঢুকে শুকুতে-দেওয়া কাপড় নিয়ে আসে, ফাঁক পেলে ঘরে ঢুকে ফুলদানিটা, কলমটা, এটা-ওটা নিয়ে আসে। রামদুলারী সত্যই দুষ্ট লোক।

রামদুলারী গোঁসাইয়ের পা জড়িয়ে ধরলে—হুকুম দাও সাধুজী মহারাজ! রামদুলারীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।

ভক্তদের অনুরোধে গোঁসাই সম্মতি দিলে। বেশ চমৎকার একটি স্থান তৈরী হয়ে গেল, আটটি পাকা থাম গেঁথে তার উপর খড়ের চাল দিয়ে—একদিকে চার হাত লম্বা, দু হাত চওড়া, এক হাত উঁচু সিমেন্ট দিয়ে মাজা বেদীর উপর ত্রিশূল পুঁতে, তারই গায়ে লম্বাটে শিবঠাকুরকে বসানো হল। খুব ঘটা করে ঢাক বাজাল পরম বায়েন। পূজো হল। একটা পাঁঠা এনে বলি দিলে ঘোঁতনা হাজরা। লোকজন জমল অনেক। তার মধ্যে থেকে হঠাৎ টেঁপী ঠাকরুন তারস্বরে বললে—সর্ রে, সর্ রে। অ রে অ মুখপোড়ারা, সর্ না রে! দেখি! বাবা উঠলেন। দেখি!

নবগ্রামের টেঁপী বা ট্যাপা ঠাকরুন দেবভক্তি এবং পুণ্যের জন্য বিখ্যাত।

নবগ্রামের কোনো দেবতা বলতে পারে না যে, ট্যাঁপা ঠাকরুনের আগে কেউ তাকে কোনোদিন প্রণাম করেছে বা তার থেকে জোরে মাথা ঠুকে প্রণাম করেছে। ট্যাঁপা ঠাকরুন প্রণাম করলে ঠক-ঠক শব্দ ওঠে। কপালের ঠিক মাঝখানে একটা টাকার আকারের গোল কালচে রঙের আব আছে। সেটা ওই প্রণাম করে করেই সৃষ্টি হয়েছে।

সরে গেল লোকজন; ট্যাঁপা ঠাকরুন খুঁট খুলে একটা পয়সা ফেলে দিয়ে প্রণাম করে বললে—তা বেশ হল। একটি নূতন বাবা হলেন। তা বাবার নামটি কি গোঁসাই? অ্যাঁ? বাবাকে পূজোর ফলটাই বা কি?

কালা গোঁসাই বললে—আমি কালী গোঁসাই, শিব তাহলে কালিকেশ্বর।

—চমৎকার নাম। কালিকেশ্বর। বেশ নাম। তা ফলটা বল?

—ফল আবার কি? ফল পুণ্য, ফল ধর্ম।

—উঁহু। শুধু পুণ্যি ধর্ম—সে তো ঘরে বসেই হয় গো। তার লেগে এতটা পথ হাঁটলাম কেন? ওই দেখ, মনসাতলায় গরল ভালো হয়, ওই তোমার কলেরা হলে রক্ষেকালী রক্ষে করেন। তার পরেতে তোমার ষণ্ডেশ্বর বাবার পুষ্পে গো-মড়ক ভালো হয়। কি বলে, এলোকেশী মায়ের মহিমায় টাকপড়া বন্ধ হয়। তা তোমার শিবের একটা মহিমে তো চাই বাবা!

—হাঁ। উ মহিমা বাবা মহাদেও নিজসে দেখাইয়ে দিলেন গো! শুধাও তো রামদুলারীকে। চুরির পাপ খণ্ডন করে গা। কোই চোরি কিয়া—বাস সওয়া পাঁচ আনা আঁধিয়ারামে রাখ দিয়ো বাবাকে আস্তানামে—বাস্, বিলকুল পাপ খণ্ডন হোগা।

—তা বেশ, তা বেশ। তা ওর সঙ্গে আর একটি মহিমে কর বাবার। এই দেখ, এই গরমের সময় সারা গায়ে ঘামাচির জ্বালায় মরি। চুরির পাপ ক্ষয়ের দক্ষিণে সওয়া পাঁচ আনা, তা ঘামাচিতে তখন পাঁচ পয়সাই ঢের। তা পাচ পয়সা আমি দেব, বাবা যদি আমার ঘামাচি নিবারণ করে। ঘামাচি ধর সবারই হয়। তুমি তোমার শিবকে বল—ওই মহিমাটি ধরুন উনি।

কালী গোঁসাই সঙ্গে সঙ্গে একমুঠো ধুনির ছাই তুলে ট্যাঁপা ঠাকরুনের হাতে দিয়ে বলেছিল—একটু হলুদের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে গায়ে মেখ। বাস। দেখ বাবার মহিমা।

ওই ঘামাচির মহিমাতেই কালী গোঁসাইয়ের শিবস্থান জমে উঠেছিল। দিনের বেলা ঘামাচি-পীড়িত মেয়ে-পুরুষের ভিড় জমে যেত। রাত্রেও

জমত। সে ওই রামতুলারী যে শাপমোক্ষণ-ফল প্রাপ্ত হয়েছে, সেই ফলের প্রত্যাশীরা এসে জমত। সে আনাগোনা জমজমাট রাত্রিকালে অর্থাৎ অন্ধকারে লোকচক্ষুর অগোচরে। মাঝরাত্রে বা শেষরাত্রে তারা এসে ওই সওয়া পাঁচ আনা হিসাবে পয়সা রেখে যেত। এই পয়সার পরিমাণ যত বেশী হতে লাগল, ততই যে অঞ্চলটায় চুরি বাড়ল, সে কথা বলাই বাহুল্য। ওদিকে কালী গোঁসাইয়েরও চেহারা বের হতে লাগল। লোককে গালিগালাজ, অপমান, ক্রমে চড-চাপড়-ঘুষি, গলা টিপে ধরে শাসানো—নিত্যকারের ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। থানার দারোগা আবার চঞ্চল হল। একদিন এসে হাজির হল কালা গোঁসাইয়ের ওখানে। সঙ্গে আর-একটি ভদ্রলোক। লোকটিকে দেখেই গোঁসাই প্রায় ক্ষেপে লাফ দিয়ে উঠল। কিন্তু তার আগেই ভদ্রলোক এবং দারোগা তুজনেই তুটো পিস্তল বের করে ধরলেন—খবরদার!

কালা গোঁসাই কুৎসিৎ ভাষায় গাল পাড়তে লাগল। সে শোনা যায় না, কানে আঙুল দিতে হয়। কিন্তু গোঁসাইয়ের সে বাছ-বিচার নেই। গ্রাহ্যও নেই। এমন কি পুলিশের গুঁতোও তু-দশটা পড়ল, তবুও গ্রাহ্য করল না।

—আরে, আমি হলাম নেপাল গুণ্ডা। ওই গুঁতায় আমার কি হবে? শালা, দেখ রে, হামারা শিব কেতনা ডাণ্ডা খায়া—দেখ। দেখ রে পিঠ, ছোরাকে দাগ। খুলনেতে একবার শড়কি চালাইছিল—জান্তে বইসা ফিনকি মাইরা খুন ছুটল—অ্যাই এত্যানি ঠাই ই-ফোঁড় উ-ফোঁড়! দাগ রইছে। ক ঘা রুলের গুঁতায় কি অইব বে হালা!

লোকের সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু এতখানি না। ওই আগন্তুক ভদ্রলোকটি সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর। খবর পেয়ে এখানে এসেছেন। এসে দেখেন, কালা গোঁসাই—কলকাতার বিখ্যাত নেপাল গুণ্ডা, ওকে গুণ্ডা-আইনে প্রথম কলকাতা থেকে, পরে বাংলাদেশ থেকেই বের করে দেওয়া হয়। বিহারে গিয়ে নেপাল হয় কালা গুণ্ডা। সেখান থেকে যায় পূর্ববঙ্গে, সেখানে নাম নিয়েছিল—কাল্লু সর্দার। রাহাজানি, নৌকায় ডাকাতি, মেয়েছেলে চুরি—অনেক করেছে সেখানে। দেশ ভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে এসেছে। এ অঞ্চলে এসে হয়েছে কালী গোঁসাই বা কালা গোঁসাই।

দারোগার সঙ্গের ভদ্রলোকটি কলকাতার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের লোক। এখানকার দারোগা কালা গোঁসাইয়ের বিবরণ কলকাতায় পাঠিয়েছিল। লিখেছিল—এই সাধুপুরুষের আবির্ভাবে এখানে চুরি-ডাকাতি বেড়েছে, সুতরাং সাধুর অতীত সাধনার বিবরণ যদি কিছু তাঁদের জানা থাকে, তবে সেটা জানালে

তাঁর সুবিধে হয়। তাঁর আকার-প্রকার জানবার জন্যে গোঁসাইয়ের একখানা ফোটোগ্রাফও তিনি পাঠিয়েছিলেন। সেই পেয়েই ওই ভদ্রলোক হাজির হয়েছিলেন।

যাই হোক, কালা গোঁসাই গ্রেপ্তার হয়ে চালান হল। কিন্তু মাস কয়েক পরেই আবার—কালী কলকাত্তাওয়ালী—হাঁতমে ভেজালি—লড়ে হালি হালি—বম্ শঙ্কর—বম্ শঙ্কর—বলে ফিরে এসে ফের বসে গেল আপনার ঠাকুরতলায়।

বললে—কেয়া করেগা পুলিশ? আমি হলাম মা কালীর ছেলে, বাবা শিবের বেটা, আমার কি করবে? মা-বাবাতে স্বপ্ন দিলে—ছেড়ে দে। বাপ বাপ বলে ছেড়ে দিলে। আরে মুই কি আপনার লেগ্যা কিছু করছি, যা করছি ধর্মের লেগ্যা—দশের লেগ্যা করছি। কালা গোঁসাইকে পাপ ছুঁতে পারে না। হাঁ। বোম্ শঙ্কর—বো—ম্। এবং এর পর থেকে গোঁসাই শুধু গোঁসাই থাকল না; গোঁসাই বাবা হয়ে উঠল। বিক্রম-পরাক্রম শতগুণে বেড়ে গেল।

রাস্তায় ভিড় জমে আছে, গোঁসাইয়ের হাঁক উঠল—বোম্ শঙ্কর! হরণ কর পাপ! শীতল কর তাপ! ঘামাচি বিলকুল ভালো কর বাবা!

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ভিড় দু দিকে সরে গেল। রাস্তা হয়ে গেল গোঁসাইয়ের জন্য। কেউ নড়তে দেরি করলে গোঁসাই তাব মাথায় মারলে গাট্টা, বললে—কেয়া রে অধর্মী!

গোঁসাই হাটে গেল। সেখানে গিয়েই মারলে হাঁক—কালী কলকাত্তা-ওয়ালী, হাঁতমে ভোজালি—লড়ে হালি হালি। ঘামাচি-বারণ পাপ-হরণ বাবা কালিকেশ্বর শিবের জন্যে বেটী রান্না চড়িয়ে বসে আছে বাবা সব। দেও তোলা। আন সব্জী।

কারও ডালা থেকে বেগুন, কারও ডালা থেকে মূলো, কারও কাছ থেকে কুমড়ো, কারও কাছ থেকে আলু, কপি নিলে টেনে তুলে এবং সঙ্গের চেলার ঝুড়িটায় চাপিয়ে আর বার দুই হাঁক দিয়ে চলে এল।

একদিন একজন গোঁসাইয়ের হাতে ধরা লাউটা কাড়তে গিয়ে বলেছিল—না, ওটা আমি দোব না। ওরে বাবা রে—আমি মরে যাব। না—না।

বাস, সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাইয়ের হাতের চিমটে উঠে গেল। অবশ্য লোকটার মাথায় মেরে মাথা ফাটিয়ে জেল যাবার মত বেকুব গোঁসাই নয়—সে চিমটে চালালে তার লাউয়ের গাদার উপর। দুম্-দাম্।—লাউগুলি একেবারে কেটে কেটে।

এতেও বার-কয়েক ধরা পড়তে হয়েছে কালা গোঁসাইকে। কিন্তু কোনোটাতেই দণ্ড হয় নি। কালা গোঁসাইয়ের ডাণ্ডার ভয়ে কেউ সাক্ষী দিতে রাজী হয় নি। যারা পুলিশের ভয়ে আদালতে গিয়েছে, তারা সেখানে গিয়ে সব গোলমাল করে দিয়েছে।

এই হল কালা গোঁসাই।

না। হল না। কালা গোঁসাইয়ের শক্তি এবং সাহসের কথা না বললে হবে না। কালা গোঁসাই লাঠি মেরে একটা ক্ষ্যাপা মহিষের শিঙ ভেঙে দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করেছে। একটা কুকুর পাগল হয়ে দশ-বারোটা লোককে কামড়েছিল, সেটা কালা গোঁসাইকে পথে পেয়ে তাড়া করেছিল; গোঁসাইয়ের হাতে এক লোটা ছাড়া আর কিছু ছিল না। গোঁসাই সেই লোটার এক ঘায়েই পাগলা কুকুরটার মাথা ফাটিয়ে মেরে ফেলেছিল।

এই হল কালা গোঁসাই।

এই কালা গোঁসাইকে কি জটে পাগলা মেরে ফেলেছে? এ কি হতে পারে?

জটে পাগলা প্রায় জন্মপাগল। ইদানীং একেবারেই পাগল হয়ে গিয়েছিল। শিবু কর্মকারের ছেলে; শিবুর অবস্থা খুব ভালো নয়, তবে মোটা ভাত, মোটা কাপড় আছে। কিন্তু জটে বাড়িতেই থাকত না। ঘুরে বেড়াত—এখান সেখান করে। বিশ-বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত সে বাড়িতে থেকেছে, সে সময় পর্যন্ত বাপের সঙ্গে কামারশালায় খেটেছে। বড় সাঁড়াশি দিয়ে বাপ ধরত জ্বলন্ত লোহা, সে পিটত তার উপর হাতুড়ি। বড় হাতুড়ি। শেষ পর্যন্ত গোরুর গাড়ির চাকার হাল বসাতে সে ধরত সাঁড়াশি আর চাষীরা মারত হাম্বর। কাজটা সহজ বলে ওইটেই ওর বাপ ওকে ছেড়ে দিয়েছিল। সকলে বলত—পাগলা কিন্তু জোয়ান হবে ভালো। তাই হয়েওছিল। বিশ-বাইশ বছর বয়সে জটে একেবারে লোহার মানুষ হয়ে উঠল। তারপরই জটের মাথার গোলমাল বাড়ল। গোলমাল বাড়ল বাবুদের থিয়েটার দেখে। 'সীতাহরণ' পালা দেখে কেঁদে একেবারে সারা। সীতা সেজেছিল কলকাতার একটি ছেলে। যেমন তাকে মানিয়েছিল, তেমনি সে পার্ট করেছিল। রাম সেজেছিল এই গ্রামেরই শিবনাথ। সেও পার্ট করেছিল ভালো। রাত্রে অভিনয় দেখে জটে আর বাড়ি ফেরে নি, বাকি রাতটা ওই ফাঁকা আসরেই বসে কেঁদেছিল। সকালবেলাতেই বোঝা গেল, ওর মাথার গোলমাল বেড়েছে। সাহাদের উমেশকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে তার হাতখানা খপ করে চেপে ধরে বললে—পাষণ্ড মিথ্যুক কাপুরুষ!

উমেশ এবং আশপাশের লোকেরা অবাক। হল কি? উমেশ বললে—ছাড় ছাড়, লাগে—লাগে।

—লাগে? বদমাস! নির্লজ্জ! মরার ভান করে পড়ে থেকে তোর বাঁচতে লজ্জা হল না?

—কি বলছিস? যা গেল!

—কি বলছি? পাষণ্ড, তুই রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ তাহলে প্রাণ দিয়ে করিস নাই? মিছে করে মরে গিয়েছি দেখিয়ে পড়ে রইলি? আর সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেল রাবণ?

উমেশ জটায়ু সেজেছিল। জটায়ুর আত্মদান জটেকে মুগ্ধ করেছিল। উমেশকেই সে প্রণাম করেছিল বার বার! চীৎকার করে বলেছিল—বলিহারি উমেশ! বলিহারি! বাঃ ভাই, বাঃ! মহাপুণ্য তোমার—মহাপুণ্য!

তাই আজ উমেশকে জীবিত দেখে সে ক্ষেপে গিয়েছে। তাহলে ও সত্যকারের যুদ্ধ করে নি! প্রাণ বাঁচাবার জন্য মিছামিছি মরে যাবার ভান করে পড়ে গিয়েছিল—রাবণ মরা ভেবেই তাকে ছেড়ে দিয়েছে।—ওরে পাষণ্ড! ওরে কাপুরুষ! তোর প্রাণের মায়াটাই এত বড় হল রে?

লোকে হেসে সারা হল। অনেক বুঝিয়ে বললে—যাত্রা-থিয়েটারে যা হয়, তা কি সত্যি হয় রে? সব মিছে।

এর পর থেকে সে শিবনাথের বাড়ি আনাগোনা শুরু করলে। শিবনাথকে তার বড় ভালো লেগেছে। রাম! সে রাম!

শিবনাথ শুধু রাম নয়, শিবনাথ এখানকার গ্রামের মুকুটহীন রাজা। সাধারণ ঘরের ছেলে। লেখাপড়া শিখেছে—এম. এ. পাস। এখানকার সকল কল্যাণজনক অনুষ্ঠানের সে নেতা। বিয়ে করে নি। এই নিয়েই আছে। যেমন মিষ্ট কথা তেমনি সুন্দর তার চেহারা।

শিবনাথের বাড়ি গিয়ে সে ধরল—সেও থিয়েটারে পার্ট করবে।

শিবনাথ কাউকে দুঃখ দিয়ে ফিরিয়ে দেয় না! 'না' বলতে তার মুখে বাধে। সে বললে—দেব, পার্ট দেব তোকে।

জটে উৎসাহিত হল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে তার গুণপনারও পরিচয় দিলে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বক্তৃতার সুরে—কে রে? কে রে কামাতুর—পাপাচারী পিচাশ—

শিবনাথ সংশোধন করে দিল—পিচাশ নয়, পিশাচ।

—পিশাচ! আচ্ছা। কে রে কামাতুর পাপাচারী পিশাচ—নিষ্কলঙ্ক

স্বর্ণপ্রতিমা শুচিতার প্রতিমূর্তি—নবনীততনু দেবীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিস?
—কে?

তারপর হঠাৎ চমকে উঠে বললে—চিনেছি—ওরে দুরাত্মা—ওরে ব্যভিচারী—চিনেছি চিনেছি তোরে। পাপাচারী লঙ্কাপতি—রাক্ষস রাবণ। রামের ঘরনী তুই করিলি হরণ? কিন্তু রক্ষা নাই তোর। গড়ুরের ভ্রাতুষ্পুত্র আমি—জটায়ু আমার নাম। বৃদ্ধ আমি—তবু আজও নখর প্রখর মোর। নখর-আঘাতে তোর দশ মুণ্ড করিব ছেদন।

পার্ট তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এমন ক্রুদ্ধ ভঙ্গি করে রোষ-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে যে, সে যেন সত্যিই জটায়ু।

তারপর ভাঙা গলায় কাতরভাবে মুমূর্ষুর মত শিবনাথের সামনে হাত জোড় করে বললে—সম্মুখে দাঁড়াও তুমি রাম, হে বিশ্বের জীবনাভিরাম দূর্বাদলশ্যাম, ওহে মনোহর!

থরথর করে কাঁপতে লাগল তার কণ্ঠস্বর।

শিবনাথের ভারি ভালো লাগল। সত্যিই পাগলা অভিনয় করতে পারে।

কাল অভিনয়ে উমেশ যা করেছে, যেমন ভাবে বলেছে—তার থেকে সত্যই ভালো, প্রাণবন্ত। সে প্রশংসাই করলে। বললে—তাই তো রে! সত্যিই তো তুই খুব ভালো বক্তৃতা করতে পারিস! এ তো চমৎকার!

জটে বললে—তাহলে আমাকে ওই পার্টটা দাও। বেটা উম্‌শা—কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতক। ও মরে নি। দিব্যি বেঁচে আছে। সকালবেলা দেখলাম একটা কাঠি চিবিয়ে দাঁতন করছে। আজ আমি জটায়ু হব?

শিবনাথ বললে—ওরে সর্বনাশ! সত্যি সত্যি মরবি নাকি?

—তা না হলে কি করে জটায়ু হব?

—তাহলে পুলিশে রাবণকে ধরে নিয়ে যাবে যে।

—তুমি রাম, তুমি ভগবান, তুমি রাজা—তুমি বারণ করে দিয়ো। বলো, জটায়ু স্বর্গে গিয়েছে। যুদ্ধ করে মরেছে। ও পার্ট আজ আমি করবই।

—কিন্তু আজ তো আর 'সীতাহরণ' পালা হবে না জটাধর।

—হবে না?—হতাশ হয়ে গেল জটাধর।

—না! আজ 'রানা প্রতাপ' হবে।

—সে আবার কি পালা?

—খুব যুদ্ধ আছে। আমি শক্তিসিংহ সাজব।

এতে জটাধর বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করলে না। আস্তে আস্তে উঠে চলে

গেল। রাত্রে থিয়েটার দেখতে এল। কিন্তু প্রথম দৃশ্যেই রানা প্রতাপ ও শক্তিসিংহের ঝগড়া দেখে সে বিরক্ত হয়ে উঠল। বললে—একটা বুনো শুয়োর মেরেছে, তাই নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া! ব্রহ্মহত্যা হয়ে গেল! রাম! রাম! এই আবার দেখে!

বলে সেই অভিনয়ের মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে ছোট ভাই গঙ্গাধরকে ডেকে বললে—চল রে গোঙা, বাড়ি চল। রাত হয়েছে, ভাত খেয়ে শুবি চল। ই আর দেখতে হবে না।

চলে গেল সে।

শিবনাথের বাড়ির পথই সে আর মাড়াল না। মাস কয়েক পরে শিবনাথই তাকে ডাকলে। আবার অভিনয় হবে। জটাধরের অভিনয়ের শক্তি আছে, তাকে সে পার্ট দেবে। জটাধরের মাথাটা তখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ রয়েছে, এবং পার্ট সে ভালোই করলে সেবার। সকলেই তারিফ করলে জটাধরের। বললে—ওরে, এ যে ধুকুড়ির ভেতরে খাসা চাল! ক্ষ্যাপা যে বেড়ে অভিনয় করে! অ্যাঁ!

জটাধর ঘাড় নেড়ে বলল—জটায়ুর পার্ট যদি দিত দেখতে! দেখিয়ে দিতাম এক হাত!

এর পর জটাধর থিয়েটার থিয়েটার করেই পাগল হয়ে উঠল।

শিবনাথের বাড়ি নিত্য হাজিরা দেয় এবং প্রশ্ন করে—আবার কবে থিয়েটার হবে, তা বল।

মধ্যে মধ্যে বলে—এই দেখ, রাম সাজলে তোমাকে যেমন মানায় তেমন কিছুতে মানায় না। তুমি আর একবার 'সীতাহরণ' পালাটা কর। আমি একবার জটায়ু সাজি! একবার দেখিয়ে দি।

বলেই আরম্ভ করে—কে—রে? কে—রে কামাতুর পাপাচারী পিশাচ? আরে—আরে—চিনিয়াছি তোরে। পাপাচারী লঙ্কাপতি রাক্ষস রাবণ।—

শিবনাথ হাসে।

জটাধর হাসে এবং হাসতে হাসতেই শিবনাথের পাখানি টেনে নিয়ে টিপতে শুরু করে বলে—রামচন্দ্র, এবার তুমি বিয়ে কর। সীতা আন ঘরে।

শিবনাথ বলে—জটা, ওটা আর কপালে নেই। বুঝলি, হরধনু ভাঙবার ক্ষমতা নেই। অভাবের লোহাতে গড়া ধনুক, ও ভাঙতে আমার সাধ্যি নেই।

হঠাৎ কিন্তু অঘটন ঘটে গেল। অভাবের লোহায় গড়া ধনুকখানা সত্যিই

ভেঙে ফেললে শিবনাথ। নিজেও জানতে পারলে না, কেমন করে কি হল। হঠাৎ রাতারাতি বিখ্যাত লোক হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, অভাব ঘুচে টাকার বাজারে দাম বেড়ে গেল তার। সে হল ওই থিয়েটার থেকে।

শিবনাথের এক বন্ধু সিনেমায় কাজ করত; সে একখানা ছবিতে ডিরেক্টার হয়ে গেল। সেই ওকে টেনে নামালে ছোটখাটো একটা ভূমিকায়। শিবনাথের তাতেই নাম হয়ে গেল। চেহারাটা ছিল ভালো, তার উপর অভিনয় হল সবার সেরা; বাস্, তার পরেই দুটো ছবিতে আরও দুটো পার্ট করে তিনটের বেলায় হয়ে গেল হিরো।

এক বছর পর শিবনাথ যখন দেশে ফিরল, তখন সে বিখ্যাত ব্যক্তি তো বটেই, উপরন্তু অভাব তার ঘুচে গেছে। এক বছরে চারখানা ছবিতে সবসুদ্ধ পাঁচ-ছ হাজার টাকা রোজগার করেছে এবং দশ-বারো হাজার টাকার কণ্ট্রাক্ট পেয়েছে। চেহারা পর্যন্ত পালটে গেছে তার।

গ্রামের লোক প্রায় ভিড় করে তাকে দেখতে এল; জটাধরও এল। সকলেই শিবনাথকে অভিনন্দিত করে ফিরে গেল। বসে রইল জটাধর।

জটাধরের চেহারা দেখে শিবনাথ চমকে উঠল।—এ কি চেহারা হয়েছে জটাধর?

জটাধরের ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। চোখে জল এল। সে বললে—তুমি এত নিষ্ঠুর! আমাকে ফেলে তুমি চলে গেলে! এরা আমাকে আর পার্ট দেয় না। বলে—পাগল।

জটাধরের মাথা আবার খারাপ হয়েছে। শরীর শীর্ণ হয়েছে, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, ময়লা কাপড়-জামা—জামা নয়, একটা গেঞ্জি। ঘরের কাজকর্ম করে না, শুধু ঘুরেই বেড়ায়। বলে—দেখবে দেখবে। যাব কলকাতা। রামচন্দ্র এলে হয়। সিনেমায় নামব। বড্ড নাম হবে।

শিবনাথকে বললে—আমি পার্ট করতে পারি না? উমশা আমার চেয়ে ভালো পার্ট করে? তুমি বল! কই সে বলুক, আমার মত!

বলেই আরম্ভ করলে—কে রে? কে—রে কামাতুর পাপাচারী পিশাচ? আরে—আরে চিনিয়াছি—চিনিয়াছি তোরে। পাপাচারী লঙ্কাপতি রাক্ষস রাবণ।—

শিবনাথ তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বললে—পার্ট তুই সত্যিই ভালো করিস জটাধর।

—তবে আমাকে নিয়ে চল তোমার সঙ্গে।

—কলকাতায় ?

—হ্যাঁ।

এ কথার কি জবাব দেবে শিবনাথ ? মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে সঙ্কোচ হল তার। সে চুপ করে রইল। জটাধর ডাকলে—রামচন্দ্র !

—না রে, ও-সব জায়গা ভালো নয় জটাধর। সে সব জায়গা বাবুদের। বাবুরা সেখানে চাষী সাজে, মুটে সাজে। চাষী মুটে যারা সত্যিকারের, তাদের তারা নেয় না।

—তুমি একবার আমাকে একটা পার্ট দিয়ে দাও। তার পরে আমি দেখে নোব।

—আচ্ছা দেখব।

দিন কয়েক থেকেই শিবনাথ চলে গেল। জটাধর বললে—তোমার চিঠি পেলেই আমি চলে যাব। চিঠি দিয়ো।

শিবনাথ বললে—দেব।—অবশ্য নিতান্তই সান্ত্বনা-বাক্য।

জটাধর তারপর নিত্য যেত পোস্ট-অপিসে।—আমার চিঠি আছে পিওন—জটাধর কর্মকার ?

—নাই।

পরের দিন আবার।

—নাই।

আবার পরের দিন।

—নাই।

—মিছে কথা—ভালো করে দেখ। মাস্টারবাবু, তোমার পিওন নিশ্চয় আমার চিঠি মেরেছে।

মাস্টার ধমক দিয়ে বললে—ভাগ পাগলা। পাগলামির আর জায়গা পাও নি !

কে যেন একজন রসিকতা করে বললে—হায় প্রভু রামচন্দ্র—দূর্বাদলশ্যাম ! তুমিও বঞ্চনা করলে—দীন ভক্ত জটায়ু অধমে ! হায় রাম !

মুহূর্তে কি হয়ে গেল জটাধরের। একটা চীৎকার করে উঠল আহত পশুর মত এবং ছুটে পালিয়ে গেল গ্রাম থেকে !

বেরিয়েছিল সে কলকাতা যাবে বলে। কিন্তু মাস দুই-তিন পর বাড়ি ফিরল বদ্ধপাগল হয়ে। গ্রামের প্রান্তে, রাস্তার ধারে বসে থাকত। চীৎকার করে থিয়েটারের পার্ট বলত। মধ্যে মধ্যে যেত থিয়েটারের বর্তমান পাণ্ডা দেবকুমারবাবুর কাছে।

—'সীতাহরণ'টা একবার করুন। শিবনাথ রাম—আমি জটায়ু। পাঁচ টাকা দোব আমি।—ভিক্ষার টাকা থেকে সত্যিই সে পাঁচ টাকা জমিয়ে রেখেছে।—আর কলকাতার লোকদের নেমন্তন্ন করুন। তারা দেখে যাক, শিবনাথ রাম করে ভালো, না, আমি জটায়ু করি ভালো! আমাকে নিশ্চয় নিয়ে যাবে তারা! আমি যা রোজগার করব তার অর্ধেক থিয়েটার পার্টিকে দোব। করুন একবার ঐ পালাটা।

দেবকুমার বলে—বিরক্ত করিস নে বাপু। যা, এখান থেকে যা।—শেষ পর্যন্ত বলে—বেরো বলছি।

এই জটে পাগলা। শেষ পর্যন্ত নখে চুলে, দাড়িতে-গোঁফে বীভৎস হয়েছিল চেহারা। দেহ হয়েছিল শীর্ণ। জটে খেতে পেত না ভালো করে।

এই জটে পাগলা কালা গোঁসাইকে হত্যা করতে পারে, এ কি সম্ভব?

শিবনাথ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে বললে—তাই হয়েছে শ্রীযুত বোস। আমি বলছি আপনাকে।

যেদিন সকালে কালা গোঁসাই এবং জটে পাগলার লাশ চালান গেল, সেই দিন বিকেলবেলা শিবনাথ এল গ্রামে। খবর পেয়ে সে ছুটে গেল সদরে। একা নয়, সস্ত্রীক। শিবনাথ মাস কয়েক আগে বিয়ে করেছে। মাস খানেক আগে বউ নিয়ে এসেছিল গ্রামে। বউটি সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে, গান গায় ভালো। বউ নিয়ে গ্রামে এসে সে বেশ সমারোহ করে খাইয়েছে লোকদের।

জটাধরও এসেছিল।

চুপি চুপি শিবনাথকে বলেছিল—খাসা সীতা হয়েছে রামচন্দ্র। এইবার সেই পালাটা একবার কর! আমি দশ টাকা জমিয়ে রেখেছি। বুঝেছ?

শিবনাথ বলছে—হবে। তুই পেট ভরে খা।

পেট ভরে খেয়ে সে শিবনাথের বউকেও তার পার্ট শুনিয়েছিল। বলেছিল—তুমি বল রামচন্দ্রকে। বুঝেছ মা!

শিবনাথের বউ বলেছিল—বলব।—কিন্তু হেসেছিল।

জটাধর রাগ করে চলে গিয়েছিল।

শিবনাথ ম্যাজিস্ট্রেটকে বললে—আমাকে হঠাৎ যেতে হয়েছিল কলকাতা। জরুরী কাজ। এক ঘণ্টার মধ্যে রওনা হতে হল। সেই কারণে আমার স্ত্রী রইলেন। কথা রইল, কাজ সেরে ফিরে এসে ওঁকে নিয়ে যাব। ওঁর ধনুকভাঙা পণ—এখানে একখানি ছোট বাড়ির পত্তন না করে যাবেন না। গ্রামের প্রান্তে

যেখানে জটে এবং কালা গোঁসাই মরেছে, তার খানিকটা এ দিকে আমার বাড়ির জায়গা ঠিক করেছিলাম। যেদিন আমি গেলাম, সেদিন স্টেশনের পথে জটাধরের সঙ্গে দেখা হল। বললাম—হ্যাঁ রে, রাগ করেছিস ?

রাগই সে করেছিল। আমার কথার জবাব দিলে না।

বললাম—রাগ করিস নে। আমার বউয়ের ঐ স্বভাবটা মন্দ। কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে। ওই জন্যে ওকে পার্ট দেয় না।

সে বললে—রিহারশ্যাল দাও। সেরে যাবে। আমি ধমক দিয়ে সারিয়ে দেব। তুমি পালা ধর।

শিবনাথ বললে—তাড়াতাড়ি ছিল আমার, আমি বললাম, আমি ফিরে আসি, এসে তাই করব।

জটাধর বললে—কোথায় যাবে তুমি ?

—কলকাতা।

—সীতা ?

—এখানে রইল।

শিবনাথ ম্যাজিস্ট্রেটকে বললে—তারপর শুনুন আমার স্ত্রীর কাছে। বল কল্যাণী।

শিবনাথের স্ত্রী কথা বলতে গিয়ে যেন বলতে পারছে না। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে।শিবনাথ বললে—সঙ্কোচ কর না। সঙ্কোচের এতে কিছু তো নেই।

শিবনাথের স্ত্রী কল্যাণী আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললে—এখানে এসে এ গ্রাম আমার বড় ভালো লেগেছে। লাল মাটি, খোলা মাঠ আর এখানকার রাত্রের আকাশ দেখে আমার কেমন যেন মনে হয়, আমি যেন হারিয়ে যাই! তাই আমি জেদ ধরেছিলাম, এইখানে বাড়ি কর। গ্রামের ভেতর পুরনো বাড়িতে নয়—গ্রামের শেষে খোলা মাঠের ধারে। যে বাগানটায় এই কাণ্ড ঘটেছে, সেই বাগানটার ধারে ওঁর খানিকটা জমি আছে, সেইখানটাই আমার পছন্দ হল। ওঁকে টেনে আমিই নিয়ে গেলাম ইটের ঠিকাদারের কাছে, রাজমিস্ত্রীদের ডাকলাম। তা ছাড়া, ওঁকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের বহু জায়গা দেখে বেড়ালাম। ওঁর ছেলেবেলার প্রিয় জায়গাগুলি দেখালেন উনি। যে জায়গায় কালা গোঁসাই তার আস্তানা পেতেছিল, সেই জায়গায় ছিল ওঁদের ছেলেবেলার ভয়ের জায়গা। বলতেন, ফুটবল খেলে ফেরবার সময় ওই জায়গায় ওঁরা প্রায় চোখ বুজে জায়গাটা পার হতেন। ওখানে নাকি ভুত ছিল। ওখানেই দেখলাম কালা গোঁসাইকে। কালা গোঁসাই এসে

ওঁকে বললে—আরে বেটা তুমি নাকি ভারি আমীর আদমী! সিনেমার পার্ট কর? তুমার বহু? ও করে?

উনি বললেন—না।

কালা গোঁসাই বললে—আমাকে জান তুমি? আমি কালা গোঁসাই।

—নাম শুনেছি।

—তা কালিকেশ্বর শিবের পূজা তো কিছু দাও। খুব তো লোককে খাওয়ালে-দাওয়ালে।

একটা টাকা উনি দিলেন।

পরের দিন সকালে উনি বন্দুক বের করে সেটাকে পরিষ্কার করছিলেন। কথা ছিল, ওখান থেকে দু ক্রোশ দূরের বিলে শিকার করতে যাব। কালা গোঁসাই এল। বললে—বন্দুক? শিকার?

উনি হেসে বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু তোমার আবার কি খবর? কি মনে করে?

গোঁসাই বললে—একনলা বন্দুক, কিন্তু কি রকম গড়ন? এটা কি? এ রকম তো দেখি নি!

আমি বললাম—ওটাতে টোটা পোরা থাকে, একসঙ্গে পাঁচটা। বার বার টোটা পুরতে হয় না। একসঙ্গে পর পর পাঁচবার গুলি ছোঁড়া যায়।

—আ! আচ্ছা! খুব ভালো বন্দুক। তুমি ছুঁড়তে পার?

উনি বললেন—পারি, কিন্তু তোমার খবর কি গোঁসাই?

—তুমি খুব ভালো আদমী। তোমার কাছে এলাম। তুমি বাড়ি করবে শুনলাম?

—হ্যাঁ। কে বললে তোমাকে?

সে-কথার জবাব না দিয়ে গোঁসাই বললে—ওই নীরদ ঠিকাদারকে ঠিকা দিয়ো না তুমি।

—কেন?

—উঁহু। ওকে আমি বললাম, শিবের দরবারে ঢুকবার পথের মুখে দুটো থাম বানিয়ে একটা ফটক বানিয়ে দাও। উ দিলে না। ওকে ঠিকা তুমি দেবে না। আমি তোমাকে রাজমজুর দোব—কাজ দেখে দোব। ভালো কাজ সস্তায় করে দোব। তুমি শিবের দরবারে থাম ফটক বানিয়ে দেবে।

উনি বললেন—আমি ওকে কথা দিয়েছি গোঁসাই। সে হয় না।

—না না। আমার কথা শুনতে হবে তোমাকে।

—তোমার কথা শুনতে হবে?—উনি একটু চটে উঠলেন।—কেন বল তো?

—আমি কালা গোঁসাই। বাবা শিবের হুকুম।

উনি ভুরু কুঁচকে তার দিকে চেয়ে বললেন—বিরক্ত কর না গোঁসাই, যাও তুমি এখান থেকে। তুমি এখানে অনেক উপদ্রব করেছ, আমি শুনেছি। আমার নামও তুমি জান। আমি আজ সিনেমার কাজে বাইরে থাকি, কিন্তু এখানে আমি অনেক উপদ্রব বন্ধ করেছি। তুমি নিশ্চয় শুনেছ!

—আ—চ্ছা!—কালা গোঁসাই উঠে দাঁড়াল। তারপর বললে—শিব তোকে দণ্ড দিবে। আমাকে দোষ দিস নে।

উনি হেসে বললেন—কি হবে? গা-ময় ঘামাচি?

কালা গোঁসাই বললে—নন্দীর ত্রিশূলের মুখে বন্দুক তোমার বাত বলবে না। এ আমি বলে দিলাম।

একটু চুপ করে রইল শিবনাথের স্ত্রী।

তারপর বললে—ও কথাটা আমাদের কারুরই মনে ছিল না। কালা গোঁসাই মধ্যে মধ্যে বাড়ির সামনে দিয়ে যেত আসত, কিন্তু আর ঝগড়া-টগড়া করে নি।

উনি হঠাৎ সেদিন টেলিগ্রাম পেয়ে চলে গেলেন। আমাকে বললেন—একলা থাকতে পারবে তো?

বললাম—খুব পারব।

এত বড় গ্রাম—এ গ্রামে চুরি, তাও ধান চুরি, কাপড় চুরি, ঘাট থেকে বাসন চুরি ছাড়া আর কখনও কিছু হয় নি। ভয় বলতে অসুখের আর ভূতের। ওঁর ডাক্তার-বন্ধু রয়েছেন; সকলে ভালোবাসেন; আর ভূতের ভয় আমার নেই। তা ছাড়া, ওঁর বন্ধুদের উনি বলে গেলেন।

আমি একলাই বেড়ালাম দুদিন।

সেদিন ছিল বোধ হয় পূর্ণিমার পরদিন। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হয়ত বা দ্বিতীয়া পড়ে থাকবে। পূর্ণিমার দিন থেকে আমাদের বাড়ির ইঁট আসছিল এখানে। ঠিকেদার নীরদবাবু আর দেবকুমারবাবু এসে বললেন—চলুন বউদি, ইঁট গুনে দেখব। আপনাকেও গুনতে হবে।

ইঁট গোনা হল। সন্ধ্যে হয়ে গেল; পুবদিকে সোনার থালার মত চাঁদ উঠল। আমিই বললাম—বসুন একটু। চাঁদ উঠছে, দেখি।

দেববাবু বললেন—তাহলে গান শোনান।

অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না, গাইলাম। দেখতে দেখতে জ্যোৎস্নায় হেসে উঠল চারিদিক। সেই জ্যোৎস্নার মায়াতে যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। একখানার পর আর একখানা—আবার একখানা গাইলাম।

হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর মূর্তি এসে সামনে দাঁড়াল। আমি চমকে উঠলাম। দেববাবু ধমক দিয়ে বললেন—কে ?

সে বললে—আমি জটাধর, দেবুভাই।

—জটে ?

—হ্যাঁ।—বলে বসল সে। তারপর বললে—এমন সুন্দর গান গায় আমাদের সীতা, তা সে পালাটা একবার করবে না ? আমার সাধটা একবার মেটাবে না ?

দেববাবু বললেন—পাগলামি করিস নে জটে, বাড়ি যা। আজকাল শুনি বাড়ি যাস নে, যেখানে-সেখানে মাঠে-ঘাটে পড়ে থাকিস।

জটাধর বিড়বিড় করে বললে—বাড়ি ? বাড়ি ? উঁহু ! উঁহু ! বাড়ি আমার কোথা আবার ? বললাম পালাটা করতে, তা করবে না তোমরা, তা কর না।

তারপরই বক্তৃতা শুরু করলে—কে রে ? কে রে তুই কামাতুর—পাপাচারী নিষ্ঠুর পিশাচ ?—বলে চলে গেল সে বাগানের ভিতর দিয়ে।

আরও একটা গান গেয়েছিলাম। তারপর ফিরলাম বাড়ি।

আমাদের বাড়ি যাবার একটা সোজা পথ আছে। সেটা গলি-পথ। বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর দিয়ে। দরজাটা চণ্ডীমণ্ডপের দিকেই মুখ করে।

ওঁরা আমাকে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে পৌঁছে দিলেন। আমি বললাম—আর আসতে হবে না। ওঁরা চলে গেলেন। আমি চণ্ডীমণ্ডপে ঢুকলাম। আমার শ্বশুরকুলের চণ্ডীমণ্ডপ। ওঁর ঠাকুরদাদাদের পাঁচ ভাইয়ের প্রতিষ্ঠা করা পাঁচটি শিবমন্দির পাশাপাশি উঠেছে। লোক নেই, জন নেই—খাঁ-খাঁ করছে। মন্দিরের প্রদীপগুলি নিবে গিয়েছে। শরিকেরা গরীব হয়ে গিয়েছে। দেখলাম, শ্যাওলা-ধরা মন্দিরের গায়ে চাঁদের আলো পড়ে যেমন লজ্জা পাচ্ছে, তেমনি লজ্জা দিচ্ছে। উপরের কলসগুলি কালো হয়ে গিয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, বাড়ি তৈরি আরম্ভ করবার আগেই এর সংস্কার করাতে হবে। কলসগুলি মাজাব, মন্দিরে চুনকাম করাব—

হঠাৎ পিছন থেকে কে আমার মুখ চেপে ধরলে। এক মুহূর্তে আশ্চর্য-কৌশলে মুখ বেঁধে, আমাকে তুলে ঘাড়ে ফেলে, গলি-পথ ধরে ছুটল। অলিগলি তার জানা। কোন গলি-পথ বেশি অন্ধকার, কোন গলিটা ছুটো বাড়ির জলপড়া নালা। সে সব জানে। ওই নালার গলিপথ ধরে সে ছুটল। আমি চীৎকার করতে পারছিলাম না। তার শক্ত মুঠোয় দুখানা হাত যেন আমার ভেঙে যাচ্ছিল। শুধু পাচ্ছিলাম গায়ে গাঁজার উৎকট গন্ধ।

অনেকটা পথ এসে সে এক জায়গায় আমাকে ফেলে দিলে।

জায়গাটা আবছা অন্ধকার। বড় গাছের ছায়াতল। সে আমাকে ফেলে দিয়ে হি-হি করে হেসে উঠল। দেখলাম, কালা গোঁসাই।

বীভৎস হাসি, কুৎসিত দৃষ্টি। সে বললে—হাম কালা গোঁসাই। হাঁ! বন্দুক কোথা? বন্দুক? পাঁচটা গুলি পর পর চলে? হাঁ! সিনেমাওয়ালী—আজ তুমকো লেকে ভাগেগা হম! হি-হি-হি! হি-হি-হি! হি-হি-হি!—সে হাসতেই লাগল!

আমি ভয়ে বোবা হয়ে গেলাম। শরীরে বল ছিল না আমার।

সে আমার হাত ধরে ঠেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলল। এমন সময় হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার উঠল—বিকট চীৎকার করে অন্ধকার থেকে প্রেতের মত একটা মূর্তি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কালা গোঁসাইয়ের উপর—কে—রে—কে—রে?

দেখলাম, অতর্কিতে ধরলে সে কালা গোঁসাইয়ের গলার নলিটা চেপে। চীৎকার করতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম—সে জটে পাগলা। জটায়ুর বক্তৃতা করছে।

কালা গোঁসাই কথা বলতে পারছিল না। এক হাতে সে জটের হাত ছাড়াতে চেষ্টা করছিল, অন্য হাতে সে কোমর থেকে ছুরি বার করে তাকে মারবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু জটে পাগলার নিষ্ঠুর আক্রমণ, নিষ্ঠুর বজ্রের মত শক্ত হাতের মুঠি। সে যুদ্ধ, নিষ্ঠুর যুদ্ধ। আমার মনে হল, অমাবস্যার অন্ধকারে ঢেকে গেল পৃথিবী। আমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

তারপর তখন কত রাত্রি তা জানি না। বোধ হয় দু পহর পার হয়েছে। আমার জ্ঞান হল। চাঁদ তখন মাথার উপর। জ্যোৎস্নার রঙ তখন নিটোল মুক্তোর মত ঝকঝকে সাদা! ঝলমল করছে চারিদিক। গাছের ফাঁক দিয়ে বাগানের অন্ধকারের মধ্যে টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। বাগানের ভিতরের অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। তার মধ্যে দেখলাম—একদিকে পড়ে আছে কালা গোঁসাই, অন্য দিকে পড়ে আছে জটে পাগল।

হঠাৎ শিবনাথের স্ত্রীর চোখ থেকে গড়িয়ে এল দুটি জলধারা। সে বললে—পাগল নয়। সে জটায়ু।

সকলে স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। কল্যাণী বললে—আমি বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়িতে ঝি-চাকর ভয় পেয়েছে। তারা জেগে বসে ছিল। আমি বললাম—জ্যোৎস্না দেখছিলাম। উনি বাড়ি আসতে সব বললাম।

শিবনাথ বললে—সৎকারের জন্য ওর শবটা আমি চাইতে এসেছি। ওর সৎকার করব আমি।

প্র তি মা

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়। আকাশের মেঘে বর্ষার সে ঘনঘোর রূপ আর নাই। মেঘের রঙ ফিরিতে আরম্ভ হইয়াছে, রৌদ্রের রঙেও পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। গত বৎসরের অনাবৃষ্টি ও অজন্মার পর এবার বর্ষা হইয়াছে ভালো, মাঠে ধানের রঙ কষকষে কালো, আর ঝাড়ে গোছেও সুন্দর পরিপুষ্ট। দেশে একটা প্রশান্ত ভাব। গৃহস্থ-বাড়িতে পূজার কাজ পড়িয়া গিয়াছে, মাটির গোলা গুলিয়া ঘর নিকানোর কাজটাই প্রথমে আরম্ভ হইয়াছে, ওইটাই হইল মোটা কাজ এবং হাঙ্গামার কাজ। তাহার পর খড়ি ও গিরিমাটি দিয়া দুয়ারের মাথায় আলপনা দেওয়া আছে, খই-মুড়ি ভাজা আছে, মুড়কি-নাড়ুর ভিয়ান আছে। পূজায় কাজের কি অন্ত আছে!

চাটুজ্জে-বাড়ির গিন্নী বলেন, মা, ও মেয়ের হল দশ হাত, তারপর সঙ্গে আছে মেয়ে ছেলে সাঙ্গোপাঙ্গ, আমরা দুহাতে উয্যুগ করে কি কুলিয়ে উঠতে পারি?

আজ চাটুজ্জে-বাড়িতে প্রথম মাটির 'ছোপ' পড়িবে। চণ্ডীমণ্ডপে কারিগর আসিয়া গিয়াছে, প্রতিমাতে আজ প্রথম মাটি পড়িবে।

বালতিতে করিয়া রাঙা মাটি গোলা হইয়াছে। বাড়ির বউ এবং ঝিউড়ি মেয়েরা গাছকোমর বাঁধিয়া হাতে সোনার অলঙ্কারের উপর ন্যাকড়া জড়াইয়া বসিয়া আছে, প্রতিমাতে মাটি পড়িলে হয়!

গিন্নী বলিলেন, ওরে, যা তো কেউ, দেখে আয় তো দেরি কত? ছেলেগুলো সব গেল কোথায়?

একটি মেয়ে বলিল, সব গিয়ে ঠাকুর-বাড়িতে বসে আছে।

সত্যই, সব ছেলে তখন চণ্ডীমণ্ডপে ভিড় জমাইয়া বসিয়াছিল। বুড়া মিস্ত্রী কুমারীশ তখন লম্ফঝম্ফ করিয়া চৌকিদারের সঙ্গে বকাবকি করিতেছিল, বলি, তোর বিত্তিগুলো আমাকে দিবি? তোর কাজ আমি করব কেন শুনি?

চৌকিদার কালাচাঁদ বলিল, ওই দেখ, আগ কর কেন গো? উ মাটি আনতে গেলে কেউ দেয় নাকি? বলে, গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে না?

—বলি, রাত্তিরে হাঁক দিতে বেরিয়ে লুকিয়ে খানিকটে আনতে পার নাই? না, হাঁকই দাও নাই রাত্তিরে?

—ওই দেখ, কি বলে দেখ, হাঁক না দিলে হয়? একবার করে তো

বেরুতেই হয়। তা তুমি যে আজ আসবে, তা কি করে জানব বল? ভুল হয়ে গেইছে।

চাটুজ্জে-গিন্নী বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া বলিলেন, অ কুমারীশ, বলি, হল তোমার? মেয়েরা যে গোলা গুলে বসে আছে গো! আর বকাবকি—

শীর্ণ খর্বাকৃতি মানুষ কুমারীশ, হাত-পাগুলি পুতুল-নাচের পুতুলের মত সরু এবং তেমনই দ্রুত ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে নড়ে। আর চলেও সে তেমনই খরগতিতে। কুমারীশ, গিন্নীমায়ের কথা শেষ হইবার পূর্বেই, তারস্বরে চীৎকার করিয়া আরম্ভ করিল, আর বলেন কেন মা, কালাচাঁদকে নিয়ে আমি আর কাজ করতে পারব না, কোন উয্যুগ নাই, মাথা নাই, মুণ্ডু নাই, হাত নাই, পা নাই—আমি আর কি করব বলুন?

বলিতে বলিতেই সে গিন্নীমায়ের নিকটে আসিয়া গড় হইয়া একটি প্রণাম করিয়া একেবারে প্রশান্ত কণ্ঠস্বরে বলিল, তারপরে ভালো আছেন মা? ছেলে-পিলেরা সব ভালো? বাবুরা সব ভালো আছেন? দিদিরা বৌমারা, সব ভালো আছেন?

গিন্নীমা হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, সব ভালো আছে। তোমার বাড়ির সব ছেলেপিলে—

কথা কাড়িয়া বলা কুমারীশের অভ্যাস, সে আক্ষেপপূর্ণ কণ্ঠে আরম্ভ করিল, আর বলেন কেন মা, হাম, পেটের অসুখ, জর—সব 'পইলট্ট' খেলছে মা। ডাক্তার-বদ্যিতে ফকির করে দিলে।

তারপর আবার অত্যন্ত প্রশান্তভাবে সে বলিল, শুনলাম, ছোটবাবু এসেছেন ফিরে—বড় আনন্দ হল। তা এইবার বউমাকে নিয়ে আসুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। ছেলেমানুষ, বুদ্ধির দোষে একটা—তা সব ঠিক হয়ে যাবে।

গিন্নীমা সমস্ত প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া বলিলেন, তোমার আর দেরি কিসের শুনি? বউরা মেয়েরা গোলা দিয়ে চান করবেই বা কখন, খাবেই বা কখন?

কুমারীশ বলিল, আর দেরি কি! সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, কেবল এই বেশ্যের আগনের মাটি লাগে কিনা, তাই—

সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর তাহার পঞ্চমে উঠিয়া গেল, তাই শুধুন কেনে ওই বেটা বাউড়ীকে যে, মাটি কই? বাবু ভুলে গিইছেন। এ আমি কি করি বলুন দেখি, যাই, আমি আবার দেখে নিয়ে আসি। হুঁ উয্যুগ নাই, আয়োজন নাই, আমারই হয়েছে এক মরণ—বলিয়া সে অত্যন্ত দ্রুতবেগে এবং অনুরূপ দ্রুতকণ্ঠে বকিতে বকিতে ওই মাটির সন্ধানে পথ ধরিল।—আমারই হয়েছে এক দায়,

যাই, এখন কোথা পাই বেশ্যের বাড়ি, দেখি। হারামজাদা বাউড়ী বলে, গাল দেবে! আরে, গাল দেবে কেন? কই আমাকে গাল দেয় না কেন? যত সব—! দক্ষিণে তো সেই মামুলী বারো টাকা, বারো টাকায় কি মাথা কিনে নিয়েছে আমার? পারব না, জবাব দিয়ে দেব। অঃ, খাতির কিসের রে বাপু?

গণ্ডগ্রাম হইলেও পল্লীগ্রাম, এখানে শহর বাজারের মত প্রকাশ্যভাবে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কোনো রূপোপজীবিনী বাস করে না, তবে নিম্নশ্রেণীর জাতির মধ্যে কলঙ্কিনীর অভাব নাই। গ্রামের পূর্ব-উত্তর কোণাংশে ডোমপল্লী,—এই ডোমেদের পুরুষেরা করে চুরি, মেয়েরা করে দেহ লইয়া বেসাতি। মা-বাপ লইয়া সংসারের গৃহাচ্ছাদনের আবরণ দিয়া প্রকাশ্যেই তাহারা সব করিয়া থাকে। কুমারীশ এই ডোমপল্লীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, বলি, কই গো সব, দিদিরা সব কই, গেলি কোথা গো সব?

অদূরে একটা গাছতলায় চার-পাঁচটি মেয়ে জটলা করিয়া বসিয়া হি-হি করিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিল। কুমারীশের কণ্ঠস্বরে, ধ্বনিতে সকলে চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল।

একজন বলিয়া উঠিল, ওলো, সেই পোড়ারমুখো আইচে লো, সেই মিস্ত্রী. মাটি নিতে আইচে মুখপোড়া—বলিতে বলিতে সে হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলেও উচ্ছ্বসিত কৌতুকে হাসিয়া একটা মস্ত কলরোল তুলিয়া দিল।

—এই যে, এই যে সব বসে রয়েছিস। তারপর সব ভালো আছিস তো দিদিরা? রঙ নিয়ে আসিস, যাস সব, যাস। এবার ভাদু কেমন গড়ে দিয়েছিলাম, তা বল?

কুমারীশ এক মুঠা মাটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াই তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

একটা মেয়ে কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, মাটি নিতে আইচ বুঝি তুমি? কেনে, কেনে লিবে, শুনি?

—লে লে, কেড়ে লে মুখপোড়ার হাত হতে। লে, কেড়ে লে।

কুমারীশ একরূপ ছুটিয়াই পথে নামিয়া অত্যন্ত খরবেগে চলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, প্রতিমে হবে দিদি, প্রতিমে হবে। যেও, যেও সব, রঙ দেব, তুলি দেব, যেও সব, পদ্ম আঁকবে দোরে।

মেয়েরা আবার হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

একজন বলিল, ধর ধর বুড়োকে ধর।

একজন বলিল, সবাইকে রঙ দিতে হবে কিন্তুক।

কুমারীশ চলিতে চলিতেই ঘন ঘন ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই রঙ দেবার সময়, সেই—

সে একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চাটুজ্জে-বাড়িতে মেয়েরা হুলুধ্বনি দিয়া গোলা দেওয়া আরম্ভ করিল। মেয়েদের মধ্যে সে এক আনন্দের খেলা। গোলা দেওয়ার নাম করিয়া এ উহাকে কাদা মাখাইবে, নিজেও ইচ্ছা করিয়া মাখিবে। বেলা দুই প্রহর, আড়াই প্রহর পর্যন্ত কাদা-মাখামাখি করিয়া ঘাটে গিয়া মাথা ঘষিয়া জল তোলপাড় করিয়া তবে ফিরিবে। সমস্ত বৎসরের মধ্যে তাহাদের এ একটা পরম প্রত্যাশিত উৎসব।

বাড়ির বড়মেয়ে একটা টুলের উপর দাঁড়াইয়া গোলার প্রথম ছোপটা দেওয়ালে টানিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে মেজমেয়ে বড়-ভ্রাতৃজায়ার গায়ে কাদা ছিটাইয়া দিয়া বলিল, তোমার মুখে গোলা দিয়ে নিকুতে হবে আগে—তুমি বাড়ির বড়বউ।

বড়বউ কিন্তু প্রতিশোধে মেজ-ননদের গায়ে কাদা দিল না; সে বড়-ননদের গায়ে গোলা ছিটাইয়া দিয়া বলিল, তারপর বাড়ির বড়মেয়ে!

বড়মেয়ে হাতের কাদা-গোলা ন্যাকড়ার ন্যাতাটা থপ করিয়া মেজ-বউয়ের মুখের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, তারপর আমাদের মেজ-গিন্নী!

মেজবউ টুলের উপর বড়-ননদের দিকে মুখ করিয়া মুখখানি বেশ উঁচু করিয়াই ছিল, ন্যাকড়ার ন্যাতাটা থপ করিয়া আসিয়া তাহার মুখের উপর যেন আঁটিয়া বসিয়া গেল। পরম কৌতুকে সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়েই একটি সুন্দরী তরুণী আসিয়া কাদাগোলা লইয়া মেজ-ননদের গায়ে ছিটাইয়া দিয়া বলিল, তোমায় কেউ দেয় নি বুঝি?

মেয়েদের হাসি-কলরোল থামিয়া গেল, পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া সকলে যেন বিব্রত হইয়া উঠিল।

মেয়েটি বলিল, আমাকে বুঝি ডাকতে নেই বড়দি? আমি বলে কত সাধ করে বসে আছি!

বড়বউ বলিল, ছোটবউ, তুমি ভাই মাকে জিজ্ঞেস করে কাদায় হাত দাও।

মাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না; চাটুজ্জে-গিন্নী নিজেই আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ছোটবউকে সেইখানে দেখিয়া বলিলেন, তুমি কাদায় হাত দিও

না বউমা। অমূল্য দেখলে অনথ করবে মা, কেলেঙ্কারীর আর বাকী রাখবে না। তুমি সরে এস।

ছোটবউয়ের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি সরিয়া আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েদের কলরবের উচ্ছ্বাসে পূর্বেই ভাঁটা পড়িয়াছিল, তাহারা এবার কাজ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বড়মেয়ে অত্যন্ত বিরক্তিভরে বলিল, সেই থেকে একটা বই ন্যাতা দেওয়ালে উঠল না! নে নে, ন্যাতা দে না, অ বড়বউ!

ঠিক এই সময়েই কুমারীশ চিৎকার করিতে করিতে আসিয়া বলিল, টুল নাই, মোড়া নাই, আমি কি তালগাছে চড়ে মাটি দেব? কই, গিন্নীমা কই? একটা টুল চাই যে মা, একটা টুল না হলে—আমি তো এই দেড়হাত মানুষ!

বাড়ির চারিপাশ অনুসন্ধান করিয়া গিন্নীমা বলিলেন, আর একটা টুল আবার গেল কোথা? তুমি জান বড়বউমা?

কুমারীশ বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ছোটবউয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এ বউটি কে গিন্নীমা?

গিন্নীমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ছোটবউমা, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ মা? ছি, বার বার বলে তোমাকে পারলাম না। যাও, ওপরে যাও।

ছোটবউ ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল! কুমারীশ বলিল, ইনিই আমাদের ছোটবউমা? আহা-হা, এ যে সাক্ষাৎ দুগগা-ঠাকরুন গো, অ্যাঁ, এমন চেহারা তো আমি দেখি নাই? আহা-হা! অ্যাঁ, এমন লক্ষ্মী ঘরে থাকতে ছোটবাবু আমাদের, অ্যাঁ—ছি ছি ছি!

গিন্নীমা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কুমারীশ, তুমি এসেছ প্রতিমে গড়তে, তোমার ওসব কথায় কাজ কি বাপু? ও বড়বউমা, টুল আর একটা গেল কোথায়?

কুমারীশ বার বার ঘাড় নাড়িয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল, তা বটে, আপনি ঠিক বলেছেন। হ্যাঁ, তা বটে, আমাদের ও কথায় কাজ কি? হ্যাঁ, তা বটে; তা আপনি ভাববেন না—সব ঠিক হয়ে যাবে। আহা-হা, এমন মুখ তো আমি—

বাধা দিয়া গিন্নীমা বলিলেন, তুমি যাও কুমারীশ, আমি টুল পাঠিয়ে দিচ্ছি। দাঁড়িয়ে গল্প কর না, যাও, আপনার কাজ কর গে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে—আমার বলে কত কাজ পড়ে আছে, সাতাশখানা প্রতিমে নিয়েছি। আমার বলে মরবার অবসর নাই

কুমারীশ যে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছিল, আহা, এ যে সাক্ষাৎ দুগগা-ঠাকরুন গো!—সে কথাটা অতিরঞ্জন নয়। তবে উচ্ছ্বাসটা হয়ত অশোভন হইয়াছিল। চাটুজ্জে-বাড়ির ছোটবধূটি সত্যই অতি সুন্দরী মেয়ে। সকলের চেয়ে সুন্দর তাহার মুখশ্রী। বড় বড় চোখ, বাঁশীর মত নাক, নিটোল দুইটি গাল, ছোট্ট কপালখানি। কিন্তু চিবুকের গঠন-ভঙ্গিটিই সর্বোত্তম, ওই চিবুকটিই মুখখানিকে অপরূপ শোভন করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এত রূপের অন্তরালে লুকানো ছিল মেয়েটির দগ্ধ ললাট। তাহার এমন শুভ্র স্বচ্ছ রূপের অন্তরালে নির্মল জলতলের পঙ্কস্তরের মত সে ললাট যেন চোখে দেখা যাইত।

পাঁচ বৎসর পূর্বে, ছোটবধূ যমুনার বয়স তখন বারো, সে তখন সবে বাল্য-জীবনের অনাবৃত সবুজ খেলার মাঠ হইতে কৈশোরের কুঞ্জবনে প্রবেশ করিয়াছে, তখনই তাহার এ বাড়ির ছোটছেলে অমূল্যের সহিত বিবাহ হয়। অমূল্যর বয়স তখন চব্বিশ। বাড়ির অবস্থা স্বচ্ছল, খানিকটা জমিদারী আছে, তাহার উপর মায়ের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান, সুতরাং তাহার স্বেচ্ছাচারী হইবার পক্ষে কোনো বাধা ছিল না। সকাল হইতে সে কুস্তি, মগুর, লাঠি লইয়া কাটাইয়া খানদশেক রুটি অথবা পরোটা খাইয়া বাহির হইত স্নানে। পথে সাহাদের দোকানে খানিকটা খাঁটি গিলিয়া স্নানান্তে বাড়ি ফিরিত বেলা দুইটায়। তারপর আহার ও নিদ্রা। সন্ধ্যায় আবার বাহির হইয়া ফিরিত বারোটায় অথবা আরো খানিকটা পরে, তখন সে আর বাড়ির দুয়ার খুঁজিয়া পাইত না। মা তাহার জাগিয়া বসিয়া থাকিতেন। গ্রামেও তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত ছিল না, আজ ইহাকে প্রহার, কাল তাহার মাথা ফাটাইয়া দেওয়া, কোনোদিন বা কাহারও গৃহে অনধিকার-প্রবেশ প্রভৃতি নানা ধরনের বহু অভিযোগ। এই সময়েই প্রথম পক্ষ বিয়োগের পর খুঁজিয়া পাতিয়া এই সুন্দরী যমুনার সহিত তাহার বিবাহ হইল। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেই সে যমুনাকে নির্মমভাবে প্রহার করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। কয়দিন পরই গেল গঙ্গাস্নান করিতে। সেখানে এক যাত্রিনীর উপর পাশবিক অত্যাচার করার জন্য অত্যাচারীকে হত্যা করার অপরাধে তাহার কয় বৎসর জেল হইয়া যায়। তারপর এই মাসখানেক পূর্বে অমূল্য বাড়ি ফিরিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে যমুনাকেও আনা হইয়াছে। পাঁচবৎসর পূর্বে সেদিন এজন্য চাটুজ্জে-বাড়ির মাথাটা লজ্জায় মাটিতে নত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সে লজ্জা বেশ সহিয়া গিয়াছে; মাটিতে যে মাথা ঠেকিয়াছিল, সে আবার ধীরে ধীরে উঠিয়াছে। এখন অমূল্যকে লইয়া শুধু অশান্তি আর আশঙ্কা। অশান্তি সহ্য হয়, কিন্তু আশঙ্কার উদ্বেগ অসহনীয়, পাছে সে আবার

কিছু করিয়া বসে, এই আশঙ্কাতেই সকলে সারা হইয়া গেল। সকলে আশঙ্কা করিয়াই খালাস, কিন্তু সে আশঙ্কা নিবারণের দায়িত্ব ওই বধূটির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাই বধূটির প্রতি সতর্কবাণীর অন্ত নাই, অহরহ তাহাকে সকলে সে কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, যমুনা ভয়ে ঠকঠক করিয়া কাঁপে।

কুমারীশ রাত্রেও প্রতিমার গায়ে মাটি ধরাইতেছিল, তাহার ভাইপো যোগেশ হ্যারিকেনের লণ্ঠনটি উঁচু করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কুমারীশ প্রতিমার গায়ে মাটি দিতে দিতেও ভাবিতেছিল ওই বধূটির কথা। মেয়েটিকে তাহার বড় ভালো লাগিয়াছে। আহা, এমন সুন্দর মেয়ে, আর তাহার স্বামী কিনা এমন! সে এ বাড়িতে বহুদিন প্রতিমা গড়িতেছে, ওই ছোটবাবুকে সে ছোট ছেলেটি দেখিয়াছে। এইখানেই সে এমনই করিয়া প্রতিমাতে মাটি দিত, আর ছোট ছেলেটি বলিত, দেবে না, মিস্ত্রী দেবে না?

সে বলিত, দেব গো, দেব।

—কবে দেবে?

=কাল।

—না, আজই দাও, ও মিস্ত্রী!

—হ্যাঁ বাবু, এই ঠাকুর তো তোমার, আবার কাত্তিক দিয়ে কি হবে?

—না, আমায় কাত্তিক গড়ে দাও।

সে হাসিয়া বলিত, বাবু আমাদের ক্ষ্যাপা বাবু।

সেই ছেলে এমন হইয়া গেল! গেল গেল, কিন্তু এমন সুন্দর মেয়ে—! মিস্ত্রীর চোখের সম্মুখে প্রতিমার মুখখানি যেন জ্বলজ্বল করিতেছে। সে স্থির করিল, ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা হইলে হয়, সে তাহাকে বেশ করিয়া বলিবে।

যোগেশ বলিল, কাকা, রাত হল অনেক, আজ আর থাকুক।

কুমারীশ অত্যন্ত চটিয়া উঠিল, থাকুক! কালও একবেলা এইখানেই কাটুক, না কি? বলি প্রতিমে সাতাশখানা, তা মনে আছে?

যোগেশ ক্লান্তভাবে বলিল, তা হোক কেনে। ওই দেখ, চৌকিদার হাঁক দিচ্ছে।

হাতের কাদার তালটা থপ করিয়া ফেলিয়া দিয়া কুমারীশ বলিল, ওই নে, ওই নে। মরগা যেয়ে তোরা, দেখে নিগে, বুঝে নিগে সব, আমি আর কিছু পারব না।

সে উঠিয়া আসিয়া বালতির জলে হাত ডুবাইয়া খল খল করিয়া ধুইতে আরম্ভ করিল।

—অপ অপ, অ্যাও, অপ !

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শব্দ উঠিতেছিল, দৃপ্ত এবং উচ্চ কণ্ঠে শাসন-বাক্য ধ্বনিত হইতেছে। কুমারীশ অকস্মাৎ অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিল, বলিল, তাই তো রে, চৌকিদারই বটে। উঃ, খুব বলেছিস বাবা ! রাত অনেক হয়েছে রে ! হুঁ, রাত একেবারে সনসন করছে ! নে, একবার তামুক সাজ দেখি।

যোগেশ তামাক সাজিতে বসিল।

—অপ অপ কোন হ্যায় ? অ্যাও উল্লুক !

কুমারীশ চমকিয়া উঠিল। লণ্ঠনের আলোকে সভয়ে দেখিল, অসুরের মত দৃঢ় শক্তিশালী এক জোয়ান সম্মুখে দাঁড়াইয়া। চোখ দুইটা অস্থির, পা টলিতেছে, হাতের শক্ত বাঁশের লাঠিগাছটা মাটিতে ঠুকিয়া সে প্রশ্ন করিতেছে, অ্যাও উল্লুক !

মুহূর্তে সে চিনিল, চাটুজ্জে-বাড়ির ছোটবাবু। কিন্তু তাহার সে মূর্তি দেখিয়া ভয়ে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে অতি ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল, ছোটবাবু, পেনাম, ভালো আছেন ?

লণ্ঠন, প্রতিমা, মাটি এবং কুমারীশকে একসঙ্গে দেখিয়া ছোটবাবুর মনে পড়িল। সে বলিল, মিস্তিরী, তুমি মিস্তিরী ?

কৃতার্থ হইয়া কুমারীশ বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, কুমারীশ মিস্ত্রী।

লণ্ঠনের আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বেশ করিয়া কুমারীশকে দেখিয়া বলিল, A sly fox met a hen—Sly fox মানে খ্যাঁকশেয়ালী। মাটি দিচ্ছ, বেশ, মা জগদম্বা, মাগো মা !

মিস্ত্রী তাহাকে খুশী করিবার জন্যই আবার বলিল, শরীর ভালো আছে ছোটবাবু ?

—শরীর, নশ্বর শরীর। Iron man—লোহার শরীর। দেখ, দেখ। —বলিয়া সে এবার তাহার ব্যায়ামপুষ্ট দৃঢ়পেশী একখানা হাত বাহির করিয়া মুঠি বাঁধিয়া আরও শক্ত করিয়া মিস্ত্রীর সম্মুখে ধরিল।

—দেখ, টিপে দেখ।—অপ !

মিস্ত্রী সভয়ে শিহরিয়া উঠিল। অমূল্য নিজের হাতের লাঠিটা প্রসারিত হাতখানায় আঘাত করিয়া বলিল—টমটম চালা দেগা—টমটম। এই পেতে দিলাম হাত, চালিয়ে দাও টমটম।

কুমারীশ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ওদিকে পুকুরটার পাড়ে বাঁশবনে বাতাসের বেগে বাঁশগুলি দুলিয়া পরস্পরের সহিত ঘর্ষণ করিয়া শব্দ তুলিতেছিল, ক্যাঁ-ক্ক্যাঁ—ক্যাঁট-ক্যাঁট। নানাপ্রকার শব্দ।

অমূল্য লাফ দিয়া হাঁকিয়া উঠিল, অপ! কোন হ্যায়? অ্যাও!

বাঁশবনের শব্দ থামিল না, বায়ুপ্রবাহ তখনও সমানভাবে বহিতেছিল। অমূল্য হাতের লাঠিগাছটা আস্ফালন করিয়া বলিল, ভূত।

মিস্ত্রী বলিল, আজ্ঞে না, বাঁশ।

—আলবৎ ভূত, কিংবা ছেনাল লোক ইশারা করছে।

তারপর অত্যন্ত আস্তে সে বলিল, সব খারাপ হয়ে গিয়েছে। সব চরিত্র-খারাপ। ওই শালা যদো, যদো শালা বাঁশী বাজায়, শালা কেষ্টো হবে! শালা, মারে ডাণ্ডা!

বাতাসের প্রবাহটা প্রবলতর হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের শব্দও বিচিত্রতর এবং উচ্চতর হইয়া বাজিতে আরম্ভ করিল। অমূল্য ক্ষিপ্ত হইয়া লাঠিখানা লইয়া সেইদিকে চলিল, অপ অপ অপ, আমাকে ভয় দেখাও শালা? শালা ভূত, আও আও, চলা আও—অপ!

মিস্ত্রী অবাক হইয়া অমূল্যকেই দেখিতেছিল। সহসা সে এক সময় ঊর্ধ্ব-লোকে, বোধ করি, দেবতার উদ্দেশেই দৃষ্টি তুলিতে গিয়া দেখিল, শূন্যলোকের অন্ধকারের মধ্যে আলোকের দীর্ঘ ধারা ভাসিতেছে। সে দেখিল, সম্মুখেই চাটুজ্জেবাড়ির কোঠার জানালায় আলো জ্বালিয়া জানালার শিক ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছোট-বধূটি; আলোকচ্ছটায় তাহাকে যে কেহ দেখিতে পাইবে, সে খেয়াল বোধ করি তাহার নাই। সে উপরে আলোক-শিখা জ্বালিয়া নিচে অমূল্যর সন্ধান করিতেছে। কুমারীশ বিষণ্ণ অথচ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বধূটির দিকে চাহিয়া রহিল।

বাঁশের বনে তখন অমূল্য যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।—অপ অপ—আও আও আও—অপ।—বলিয়া হাঁক মারিতে মারিতে ঠকাঠক শব্দে বাঁশের উপর লাঠি দিয়া আঘাত আরম্ভ করিল।

যোগেশ আসিয়া কুমারীশের হাতে হুঁকাটি দিয়া বলিল, চল, টানতে টানতেই চল বাপু। যে মশা, বাবা, এ যেন চাক ভেঙ্গেছে! গা-হাত-পা ফুলে উঠল।

কুমারীশ চকিত হইয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ওগো বউমা, গিন্নী-মাকে ডেকে দাও বরং, ও কি !

অত্যন্ত ক্ষিপ্রবেগে আলোটা সরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে জানালাটাও বন্ধ হইয়া গেল।

কুমারীশ বলিল, ওগো, ও ছোটবাবু! ও ছোটবাবু!

ছোটবাবুর কানে সে কথার শব্দ প্রবেশই করিল না, সে তখনও সমানে বাঁশবনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

যমুনার জীবন নিজের কাছে যে কতখানি অসহনীয়—সে যমুনাই জানে, কিন্তু তাহার বহিঃপ্রকাশ দেখিয়া কিছু বোঝা যায় না। শরতের চঞ্চল চাঁদের মত তখনই তাহার মুখ মেঘে ঢাকিয়া যায়, আবার তখনই সে উজ্জ্বল চাঞ্চল্যে হাসিয়া উঠে।

কিন্তু কুমারীশ মিস্ত্রীর তাহার জন্য বেদনার সীমা রহিল না। সে মনে মনে 'হায় হায়' করিয়া সারা হইল। দিন বিশেক পরে প্রতিমাতে 'তু মৃত্তিকা' অর্থাৎ তুষ মাটির উপরে কালো মাটি ও ন্যাকড়ার প্রলেপ লাগাইয়া, মুখ বসাইয়া, হাতে পায়ে আঙুল জুড়িয়া মাটির কাজ সারিবার জন্য কুমারীশ আসিয়া হাজির হইল। চাটুজ্জে-বাড়িতে তখন পূজার কাজ লইয়া ব্যস্ততার আর সীমা ছিল না। মুড়ি-ভাজার কাজ তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পূজার কয়দিনের খরচ আছে, তাহার উপর বিজয়া-দশমীর ও একাদশীর দিনের খরচ একটা প্রকাণ্ড খরচ,—অন্ততঃ পাঁচশত লোক আসিয়া আঁচল পাতিয়া দাঁড়াইবে। বড়বউ, বড়মেয়ে, মেজবউ প্রকাণ্ড বড় বড় ধামায় মুড়ি ভরিয়া ঘরের মধ্যে তুলিতেছে। মেজমেয়ে ভাঁড়ারের হাঁড়িগুলি বাহির করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া আবার তুলিয়া রাখিতেছে, নূতন মসলাপাতি ভাণ্ডারজাত হইবে। ছোটবধূটিকে পর্যন্ত কাজে লাগানো হইয়াছে, সে বারান্দার এক কোণে বসিয়া সুপারি কাটিতেছে।

কুমারীশ প্রতিমার গায়ে লাগাইবার জন্য পুরানো কাপড়ের জন্য আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া কলরব করিতে আরম্ভ করিল, কই, গিন্নীমা গেলেন কোথায়? এ কি বিপদ দেখ দেখি! গিন্নীমা গেলেন কোথা গো? ও গিন্নীমা!

মুড়ির ধামাটা কাঁখে করিয়া যাইতে যাইতে বড়বউ বলিল, না বাপু, মিস্ত্রী দেখছি বাড়ি মাথায় করলে। তোমার কি আস্তে কথা হয় না নাকি?

বড়মেয়ে বলিল, মিস্ত্রী আমাদের পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসে কি না, ঘোড়া দাঁড়ায় না।

কুমারীশ ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, দিদি-ঠাকরুন বলেছেন বেশ। ওটা আমার অভ্যেস। আমার শাশুড়ী কি বলত জানেন? বলত, কুমারীশকে নিয়ে পরামর্শ করা বিপদ, পরামর্শ করবে তো লোকে মনে করবে, কুমারীশ আমার ঝগড়া করছে।

বড়বউ অল্প হাসিয়া বলিল, তা যেন হল। এখন কি চাই বল দেখি তোমার?

পাচিকা পাঁচুদাসী বলিল, চেঁচিয়ে গাঁ মাথায় করে কুমারীশ।

কুমারীশ অত্যন্ত চটিয়া গেল, তোমার ঠাকরুন, বড় ট্যাকটেকে কথা। না চেঁচালে এ বাড়িতে জিনিস পাওয়া যায়? পুরানো কাপড় চাই, তা ঠাকরুনরা

জানে না নাকি? আমার তো বাপু, এক জায়গায় বসে হাঁড়ি ঠেলা নয়। সাতাশখানা—

বাধা দিয়া বড়বউ বলিল, সব ঠিক করে রেখেছি বাবা, গোছানো, পাট করা সব ঠিক হয়ে আছে।

তারপর চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল, কাকেই বা বলি! ও ছোটবউ, দাও তো ভাই, ওই কাঠের সিন্দুকের ওপর ভাঁজ করা আছে এক পুঁটলি কাপড়।

কুমারীশ তাড়াতাড়ি বড়বধূর নিকট আসিয়া চুপিচুপি কহিল, বড়বউমা, ছোটবাবু এখনও তেমনিই রাত করে আসে?

বড়বধূ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিতেই অর্ধপথে সে নীরব হইয়া গেল।

বড়বধূ বলিল—কেন বল তো?

—এই—না, বলি, ঘরথাই হল নাকি, মানে ছোটবউমা আমাদের সোনার পুতুল। আহা মা, চোখে জল আসে আমার।

বড়বউ চুপিচুপি বলিল, আমাকে যা বললে বেশ করলে, কিন্তু ও কথা আর কাউকে শুধিও না মিস্ত্রী। মা শুনলে রাগ করবেন, ছোটবাবু শুনলে তো রক্ষা থাকবে না।—বলিয়াই সে খালি ধামাটা সেইখানেই নামাইয়া নিজেই কাপড় আনিতে অগ্রসর হইল। ইতোমধ্যে ছোটবউই কাপড়ের পুঁটলিটা বাহির করিয়া আনিয়া দাঁড়াইল। বড়বউ তাহার হাত হইতে পুঁটলিটা লইয়া কুমারীশের হাতে দিয়া বলিল, আর যদি লাগে তো মার কাছে এসে চাইবে, আমরা আর দিতে-টিতে পারব না।

ছোটবউ মৃদুস্বরে বলিল, আমাকে মেজদিদির মত একটা হাতি গড়ে দিতে বল না দিদি।

কুমারীশ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সে তো আমি দিয়েছি মেজদিদিমণিকে। দেব, দেব, দুটো হাতি গড়ে এনে দেব। হাতির ওপর মাহুত সুদ্ধু।

বড়বউ বলিল, ছোটবউ, তুমি ঘরের ভেতর যাও। কুমারীশ, যাও বাবা, কাপড় তো পেলে, এইবার যাও।

কুমারীশ কাপড়ের পুঁটলিটা বগলে করিয়া বাহির হইয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপে তখন ছেলের দল এমন ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছে যে, যোগেশ এবং আর একজন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। কে একজন মহিষের মুণ্ডটা তুলিয়া লইয়া পলাইয়াছে। কুমারীশ পিছন হইতে বলিল, মাটি করলে রে বাবা, মাটি করলে! কই কই, বিষকাদা কই, দে দে, সব লাগিয়ে দে! ধর ধর, যোগেশ, ধর সব।

বিষকাদাকে ছেলেদের বড় ভয়, বিষকাদা গায়ে লাগিলে নাকি ঘা হয়।

আর, আর যে বিশ্রী গন্ধ! ছেলের দল ছুটিয়া সরিয়া গেল। কুমারীশ একটা মোটা তুলিতে গোবর ও মাটির তরল গোলা তুলিয়া ছিটাইতে ছিটাইতে বলিল, পালা সব, পালা এখন। সেই হয়ে গেলে আসবি সব।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার একটি দুইটি করিয়া জমিতে আরম্ভ করিল।

কুমারীশ একজনকে বলিল, কই, তামুক আন দেখি খানিক।

রাত্রে জানালার উপর আলোটি রাখিয়া যমুনা একা বসিয়াছিল! সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। পূজার কাজে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যে যাহার ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একা ঘরে যমুনার শুইতে বড় ভয় করে। অমূল্য মদ খাইয়া ভীষণ মূর্তিতে আসিলেও সে আশ্বস্ত হয়, মানুষের সাহস পাইয়া শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়ে। অমূল্যের অত্যাচার প্রায় তাহার সহিয়া আসিয়াছে। অমূল্যের প্রহারের চেয়ে আদরকে তাহার প্রথম প্রথম বেশি ভয় হইত, সেও তাহার সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু রাত্রির প্রথম দিকের এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাহার ভয়ের আর অন্ত থাকে না। কেবল মনে হয়, যদি ভূত আসে! ঘরের দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া প্রাণপণে চোখ বুজিয়া সে পড়িয়া থাকে, ঘরের মধ্যে আলোটা দপদপ করিয়া জ্বালিয়া দেয়।

আজ চণ্ডীমণ্ডপে মিস্ত্রীরা প্রতিমা গড়িতেছে, খানিকটা দূরেও জাগ্রত মানুষের আশ্বাসে সে জানালা খুলিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। লাগিতেছেও বেশ। উহারা গুজগুজ করিয়া কথা কহিতেছে, কাজ করিতেছে; একজন ছোট মিস্ত্রী কাঠের পিঁড়ার উপর মাটির নেচি দ্রুত পাক দিয়া লম্বা লম্বা আঙুলগুলি গড়িতেছে, একজন ছাঁচে ফেলিয়া মাটির গয়না গড়িতেছে, আর কুমারীশ প্রতিমার মুখগুলি গড়িতেছে। বাঁশের পাতলা টুকরা দিয়া নিপুণ ক্ষিপ্রতার সহিত ভ্রূ চোখ মাটির তালের উপর ফুটাইয়া তুলিতেছে। ইহার পর মুখের উপর গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া মাজিবে। যমুনা ছেলেবেলায় কত দেখিয়াছে। সিমেণ্ট-করা মেঝের মত পালিশ হইবে।

—বউমা, জেগে রয়েছেন মা?

যমুনা চকিত হইয়া উঠিল। মাথার ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া সে একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। নিজেই একটু জিব কাটিল, মিস্ত্রী দেখিয়া ফেলিয়াছে।

—আমি খুব ভালো হাতি গড়ে এনে দেব একজোড়া। দুটো মাটির বেরাকেটও এনে দেব। তারই ওপর রেখে দেবেন।

যমুনা সসঙ্কোচে আবার আসিয়া জানালায় দাঁড়াইল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলিল,

ব্র্যাকেট দুটোর নীচে দুটো পরী গড়ে দিও, যেন তারাই মাথায় করে ধরে ধরে আছে।

কুমারীশ বলিল, না, দুটো পাখি করে দেব? পাখি উড়ছে, তারই পাখার ওপর বেরাকেট থাকবে।

যমুনা ভাবিতে বসিল, কোনটা ভালো হইবে!

কুমারীশও নীরবে কাজ করিতে আরম্ভ করিল, কয়েক মিনিট পরেই আবার সে বলিল, আর দুটো ঘোড়াও গড়ে এনে দেব বউমা।

যমুনা পুলকিত হইয়া বলিল, না, তার চেয়ে বরং দুটো চিংড়িমাছ গড়ে দিও।

এবার সে ঘোমটা সরাইয়া ফেলিল। যে গরম!

—চিংড়িমাছ? আচ্ছা, ঘোড়াও আনব, চিংড়িমাছও আনব। কিন্তু শিরোপা দিতে হবে মা।

যমুনার মুখ ম্লান হইয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, তুমি দুটো হাতিই এনে দিও শুধু।

—কেন মা, শিরোপার কথা শুনে ভয় পেলে নাকি? সব এনে দেব মা, একখানি তোমার পুরানো কাপড় দিও শুধু। আর কিছু লাগবে না।

অন্ধকার নিষুতি রাত্রে ধীরে ধীরে ভীত তরুণী বধূটির সহিত মিস্ত্রীর এক সহৃদয় আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিতেছিল--ওই দেবী-প্রতিমাটির মতই।

—অপ অপ, চলে আও, বাপকে বেটা হোয় তো চলে আও!

অমূল্য হাসিতেছে। ভীত হইয়া মিস্ত্রী উপরের দিকে চাহিয়া বধূটিকে সাবধান করিতে গিয়া দেখিল, অত্যন্ত সন্তর্পণে জানালাটি বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সে আপন মনে কাজ করিতে বসিল।

—অ্যাই মিস্ত্রী!

—ছোটবাবু, পেনাম।

—ওই শালা রমনা, শালা পেসিডেনবাবু হইছে, শালা। শালা, মারব এক ঘুঁষি, শালা ট্যাক্সো লিবে। শালা ফিস্টি করে খাচ্ছে পাঁঠা মাছ পোলাও, শালা। হাম দেখে লেঙ্গে।

কুমারীশ চুপ করিয়া রহিল।

আজ সটান বাড়ির দরজায় গিয়া অমূল্য বন্ধ দ্বারে লাথি মারিয়া ডাকিল, অ্যাও, কোন হ্যায়? খোল কেয়াড়ি।

কিছুক্ষণ পরই যমুনার অবরুদ্ধ ক্রন্দনধ্বনি শোনা যায়। অমূল্য মারে এবং শাসন করে, চোপ, চোপ বলছি, চোপ।

পূজার দিন চারেক পূর্বে কুমারীশ আবার আসিয়া প্রতিমায় রঙ লাগাইয়া দিয়া গেল। যমুনার আনন্দের আর সীমা রহিল না; কুমারীশ একটা প্রকাণ্ড ডালায় করিয়া ব্রাকেট, হাতি, ঘোড়া, চিংড়িমাছ, এক জোড়া টিয়াপাখি পর্যন্ত আনিয়া তাহাকে দিয়া গিয়াছে।

মা কিন্তু মুখ ভার করিয়া বলিলেন—অমূল্যকে না বলে এই সব কেন বাপু? তা এখন দাম কি নেবে বল?

কুমারীশ পুলকিত হইয়া বলিল, দাম? এর আবার দাম লাগে নাকি মা? দেখুন দেখি। আমারও তো বউমা উনি—

বড়মেয়ে হাসিয়া বলিল, সুন্দর মানুষকেই সবাই সব দেয়, আমরা কালো মানুষ—

কুমারীশ প্রচণ্ড কলরব করিয়া উঠিল, আপনাকেও এনে দেব দিদিমণি। দেখুন দেখি, দেখুন দেখি, আপনি হলেন বড়দিদি।

সে দ্রুতপদে পলাইয়া গেল।

মা আবার বলিলেন, অমূল্যকে বল না যেন বউমা, যে মানুষ!

রাত্রে সেদিনও যমুনা জানালায় বসিয়া মিস্ত্রীকে বলিল, ভারি সুন্দর হয়েছে মিস্ত্রী, ভারি সুন্দর!

উচ্ছ্বসিত কুমারীশ বলিল, পছন্দ হয়েছে মা?

যমুনা পুলকিত মুখে আবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুব, খুব পছন্দ হয়েছে। হাতি দুটো মেজদির চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে।

—তুমি একটু বস মা, আমি চক্ষুদানটা করে আসি। লক্ষ্মীর হয়েছে, সরস্বতীর হয়েছে, এইবার ঠাকরুনের চোখ মা।

যমুনা ঐ স্থানটির দিকেই চাহিয়া বসিয়া রহিল।

—অ্যাও, কোন হ্যায়? চুরি—চুরি করেগা? ছেনালি করেগা? শালা, মারেগা ডাণ্ডা। অপ অপ!

কোনো কল্পিত ব্যক্তিকে শাসন করিতে করিতে আজ একটু সকালেই অমূল্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

মা নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু যমুনা তাহাকে খেলনাগুলি না দেখাইয়া পারিল না। তাহার অন্তরও ছিল পুলকিত, তাহার উপর আজ অমূল্য আসিয়া তাহাকে আদর করিয়া বুকে টানিয়া লইল। যমুনা উচ্ছ্বসিত আনন্দে ডালার কাপড়খানা খুলিয়া তাহাকে পুতুলগুলি দেখাইয়া বলিল, কেমন বল দেখি? খুব সুন্দর নয়?

চিংড়িমাছটা তুলিয়া ধরিয়া অমূল্য বলিল, গলদা হ্যায়, মারেগা কামড় ?

যমুনা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘোড়াটা দেখিয়া অমূল্য বলিল, কেয়াবাৎ রে পক্ষিরাজ—চিঁ হিঁ হিঁ !

যমুনা বলিল, মিস্ত্রী আমাকে এনে দিয়েছে।

—মিস্তিরী—sly fox—ওই খ্যাঁকশেয়ালী ? অ্যাই মিস্তিরী !—সঙ্গে সঙ্গে সে জানালাটা খুলিয়া বলিল, গুড ম্যান, the sly fox is a good man, আচ্ছা আদমী !

সেই সঙ্গেই আবার জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া যমুনাকে কাছে টানিয়া লইল।

লজ্জায় আক্ষেপে আশঙ্কায় মায়ের অবস্থাটা হইল অবর্ণনীয়। দারুণ লজ্জায় চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত প্রতিবেশীদের সম্মুখে আর মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। কোনোরূপে দেবকার্য শেষ করিয়া পলাইয়া আসিয়া বাঁচিলেন ; কিন্তু বাড়িতেও তখন মৃদু গুঞ্জনে ওই আলোচনাই চলিতেছিল। বড়মেয়ে গালে হাত দিয়া ফিসফিস করিয়া বলিতেছিল, বড়বউ দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিল।

মা জোড়হাত করিয়া বলিলেন, তোমাদের পায়ে পড়ি মা, ও কথা আর ঘেঁটো না। ছি ছি ছি রে ! আমার কপাল !

বড়বউ বলিল, আমরা চুপ করলে আর কি হবে মা, পাড়াপড়শী তো গা-টেপাটেপি করছে !

বড়মেয়ে বলিল, মেয়েমানুষের যার রূপ থাকে, তাকে একটুকুন সাবধানে থাকতেও হয়, বাড়ির গিন্নীকেও সাবধানে রাখতে হয়। রামায়ণ পড়, মহাভারত পড়—

বাধা দিয়া মা বলিলেন, দোহাই মা, চুপ কর, তোমাদের পায়ে ধরছি। অমূল্য শুনলে আর রক্ষে থাকবে না।

ছোটবধূটি তখন উপরে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আয়নাখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভয়ে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। মিথ্যা তো নয়, দেবী-প্রতিমার মুখে যে তাহারই মুখের প্রতিবিম্ব।

মেয়ে-মহলে সেই কথারই আলোচনা চলিতেছে। প্রতিচ্ছবি এত সুস্পষ্ট যে, কাহারও চোখ এড়ায় নাই।

দেবতার কাছে অপরাধ, মানুষের কাছে অপরাধ, অপরাধের বোঝা

যমুনার মাথায় পাহাড়ের মত চাপিয়া বসিয়াছে। তাহার উপর তাহার স্বামী! ভয়ে সে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু যমুনার ভাগ্য ভালো যে, অমূল্য পূজার কয়দিন বাড়িমুখোই হইল না। গ্রামে পূজা-বাড়িগুলির বলিদানের খবরদারি করিতেই তাহার কাটিয়া গেল। হাড়িকাঠে পাঁঠা লাগাইলে সে ঘাড়টা সোজা করিয়া দেয়; খানিকটা ঘি ডলিয়া একটা থাপ্পড় মারিয়া বলে, লাগাও—অপ!

বলিদান হইলে ঢাকী ও ঢুলীদের মধ্যে লাঠি লইয়া পাঁয়তারা নাচ নাচে। রাত্রে কোনোদিন লোকজনে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া লইয়া আসে, কোনোদিন কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার ঠিকানা কেহ জানিতে পারে না।

বিজয়া-দশমীর দিন কিন্তু কথাটা তাহার কানে উঠিল। কানে উঠিল নয়, সে সেদিন স্বচক্ষেই দেখিল। গ্রামেও সেদিন এই আলোচনাটা ওই ঢাক-ঢোলের বাদ্যের মতই প্রবল হইয়া উঠিল।

চাটুজ্জে-বাড়ির বাউড়ী ঝি মাঝপথ হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো মা, দাদাবাবু আজ ক্ষেপে গেইছে! লাঠি নিয়ে সে যা করছে আর বলছে, আমার বউয়ের মত অ্যাঁ—, আর অপ অপ করছে।

বাড়িসুদ্ধ শিহরিয়া উঠিলেন। সমস্ত বাড়িতে যেন একটা আতঙ্কের ছায়া নামিয়া আসিল। অমূল্যর এই কয়দিনের অনুপস্থিতিতে ও চৈতন্যহীনতার অবকাশে যমুনা খানিকটা সুস্থ হইয়াছিল, কিন্তু আজ আবার সেই আতঙ্কের আকস্মিক আগমন-সম্ভাবনায় সে দিশেহারার মত খুঁজিতেছিল—পরিত্রাণের পথ। তাহার উপর সমস্ত গ্রামটা নাকি তাহার কথা লইয়া মুখর! এ লজ্জা সে রাখিবে কোথায়? আপনার ঘরে সে লুকাইয়া গিয়া বসিল দুইটা বাক্সের আড়ালের মধ্যে। নীচে বাড়ির মধ্যে ওই আলোচনাই চলিতেছে। পাশের বাড়িতেও ওই কথা। খোলা জানালাটা দিয়া যমুনা স্পষ্ট শুনিতে পাইল, ছি ছি ছি!

কিছুক্ষণ পরই অমূল্য ফিরিল নাচিতে নাচিতে।—অপ অপ! মা কই, মা, পেনাম করি, আচ্ছা বউ করেছ মা, ফাস্ট, চাকলার মধ্যে ফাস্ট! দুগগা-মায়ের মুখ ঠিক বউয়ের মত মা! দুগগা-প্রতিমে! অ্যাই ছোটবউ, অ্যাই? কই ছোটবউ!

কিন্তু কোথায় ছোটবউ? সমস্ত বাড়ির মধ্যে ছোটবউয়ের সন্ধান মিলিল না। সমস্ত রাত্রি অমূল্য পাগলের মত চিৎকার করিয়া ফিরিল।

পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে পূজার খরচের জন্য রাজ্যের লোক আসিয়া জমিতেছিল।

সকলে বৃত্তি পাইবে। নানা বৃত্তি—কাপড়, পিলসুজ, ঘড়া, গামছা, পূজার যত কিছু সামগ্রী, মায় নৈবেদ্য পর্যন্ত বৃত্তি বিলি হইবে। কুমারীশও এই গ্রামের মুখে আসিতেছিল, তাহার পাওনা অনেক। পরনে তাহার নতুন লালপেড়ে কোরা কাপড়, গলায় কোরা চাদর, বগলে ছাতা, হাতে একটা পুঁটলিতে বাঁধা কয়টি মাটির পুতুল ও খেলনা। সে হন হন করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল।

প্রতিমা-বাহকেরা জল হইতে দেবী-প্রতিমার খড়ের ঠাট তুলিয়া আনিয়া চণ্ডীমণ্ডপে নামাইয়া দিয়া বিদায়ের জন্য দাঁড়াইল। তাহারা চাহিল, মা, বেসজ্জনের বিদেয় আমাদের—মুড়কি-নাড়ু!

ঠিক এই সময়েই বাড়ির ঝি-টা দেখিল, বাড়ির খিড়কির ঘাটেই যমুনার দেহ ভাসিতেছে। তাড়াতাড়ি তোলা হইল—বিবর্ণ শবদেহ। অমূল্য আছাড় খাইয়া কাঁদিয়া পড়িল।

কুমারীশ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া গেল।

মে লা

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটা দীঘির চারি পাড় ঘিরিয়া মেলাটা বসিয়াছে। কোনও পর্ব উপলক্ষ্যে নয়, কোন এক সিদ্ধ মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণের তিথিই মেলাটির উপলক্ষ্য।

দোকানীরা বলে, বাবার মাহাত্ম্য আছে বাপু। যা নিয়ে আসবে ফিরে নিয়ে যেতে হয় না কাউকে।

সত্য কথা দোকানের জিনিসও ফেরে না, যাত্রীর ট্যাঁকের পয়সাও না।

সিউড়ীর এক ময়রা নাকি তিন বছর আগে এগারশ টাকা লাভ পাইয়াছিল। গত বছরের মত মন্দা বাজারেও তাহার দুশ টাকা মুনাফা দাঁড়াইয়াছে। সিউড়ীর দোকানের পাশেই লাভপুরের দুখানা মিষ্টির দোকান। একখানা হরিহরের, অপরখানা রাম সিং-এর। রাম সিং-এর দোকানের পরই পশ্চিম পাড়ের দোকানের সারি পূর্ব মুখে উত্তর পাড়ে মোড় ফিরিয়াছে।

উত্তর পাড়ে মনিহারীর দোকান সারি বাঁধিয়া চলিয়া গেছে। প্রথম দোকান ঘনশ্যাম ঘোষের। ঘনু আপনার দোকানে বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল। খরিদ্দার তখনও জুটে নাই। রাম সিং-এর দোকান তখন সাজিয়া উঠিয়াছে। মাথার

উপর সুন্দর একখানি চাঁদোয়া খাটানো হইয়াছে। নীচে তক্তপোশের উপর পাটাতনের সিঁড়ি। শুভ্র একখানি চাদরে ঢাকা সেই সিঁড়ির উপর হরেক রকম মিষ্টি বড় বড় পরাতে সুকৌশলে সাজানো। বরফিগুলি যেন পাথরের জালি ; রঙীন দরবেশের চূড়া উঠিয়াছে। বড় বড় খাজাগুলি শ্বেত পাথরের থালার মত সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। সম্মুখেই গামলায় রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন, পান্তোয়া ভাসিতেছে। তারও আগে পথের ঠিক সম্মুখেই মুড়ি-মুড়কি চূড়া দিয়া রাখা হইয়াছে।

বাজারের পথে অল্প দুই-দশটা যাত্রী এদিকে যাওয়া আসা করিতেছিল। তাহাদের উদাসীনতায় ঘনশ্যাম বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পোড়া বিড়িটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে রাম সিং-এর সহিত গল্প জুড়িয়া দিল।

—বিকিকিনি যা-কিছু কাল থেকেই শুরু হবে, কি বল সিং ?

রামদাস কহিল—সন্ধ্যে থেকেই লোক জুটবে। আনন্দ-বাজার এবার জমজমাট—দেখেছ তুমি ?

ঘনশ্যাম উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কহিল—সে আমি দেখে এসেছি। এবার একশ চৌত্রিশ ঘর এসেছে। চার দল ঝুমুর। মেয়েগুলো দেখতে শুনতে ভালো হে। চটক আছে।

সিংও সায় দিল—হঁ্যা, গোটা বিশ-পঁচিশেক এরই মধ্যে বেশ। চার-পাঁচটা খুবই খপসুরত।

ঘনশ্যাম ঘাড় নাড়িয়া কহিল—কমলি আর পটলি বলে যে দুজন আছে, বুঝেছ! ফেশান কি তাদের। টেরী-বাগানো ছোকরাদের ভিড় লেগে গেছে এরই মধ্যে।...কি চাই গো তোমাদের ?

একজন যাত্রী পথে দাঁড়াইয়াছিল। সে চলিতে শুরু করিল।

সিং কহিল—ডাইস কত টাকায় ডাক হল জান ?

অন্যমনস্ক ঘনশ্যাম কহিল—এঁ্যা ? ডাইস ? দেড় হাজার।

—কে ডাকলে ?

ঘনশ্যাম উত্তর দিল না।

একটি দশ-এগার বছরের ছেলে দোকানের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছিল! তাহার পিছনে একটি ছয়-সাত বছরের ফুট-ফুটে মেয়ে! মেয়েটি ছেলেটির হাত ধরিয়া টানিল। ছেলেটি কহিল, কি ?

ঘনশ্যামের দোকানে দড়িতে ঝুলান নাগরদোলায় মেম-পুতুল তখনও দমের জোরে বন বন শব্দে ঘুরিতেছিল। মেয়েটি আঙুল দিয়া পুতুলটা দেখাইয়া দিল। ছেলেটিও দাঁড়াইল। পকেটে হাত পুরিয়া কহিল—আয় আয়, ও ছাই।

ঘনশ্যাম তাদের দেখিয়াই গল্প বন্ধ করিয়াছিল। সে কহিল—এস খুকী এস। পুতুল নিয়ে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে সে দম দিয়া এরোপ্লেনটা দোলাইয়া দিল। দমের জোরে টিনের প্রপেলারটা ফর ফর শব্দে ঘোরে, এরোপ্লেনটা দোলে, ঠিক মনে হয় এরোপ্লেনটা উড়িতেছে। মেয়েটি আবার কহিল—দাদা?

ঘনশ্যাম ছেলেটিকে ডাকিয়া কহিল—আসুন খোকাবাবু, এরোপ্লেন নিয়ে যান। দেখুন কেমন উড়ছে।

ঘনশ্যামের কথাবার্তার ভব্যতায় ছেলেটি খুশী হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—কত দাম?

—কিসের? পুতুল, না এরোপ্লেনের?

কথার উত্তর দিতে গিয়া ছেলেটি বোনের মুখপানে তাকাইল। বোনটিও দাদার মুখপানে চাহিয়াছিল।

ঘনশ্যাম আবার প্রশ্ন করিল—কোনটা নেবেন বলুন?

—দুটোই।

—দুটোর দাম দেড় টাকা।

ছেলেটি আর একবার পকেটে হাত পুরিয়া কি ভাবিয়া লইল। পর মুহূর্তে বোনটির হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল—আয় মণি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘনশ্যাম কহিল—এরোপ্লেনটাই নিয়ে যান খোকাবাবু। দুজনেই খেলা করবেন। ওটার দাম এক টাকা।

সে হাঁটুর উপর ভর দিয়া খেলনাটার দড়িতে হাত দিয়াছিল।

ছেলেটি কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু মেয়েটি গিন্নীর মত দিব্য মিষ্টস্বরে কহিল—না মানিক, আমাদের কাছে এত পয়সা নাই।

একদল বাউল একতারা, গাব্‌গুবাগুব, খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল—'রইলাম ডুবে পাঁকাল জলে কমল তোলা হল না।'

পিছনে পিছনে—একদল সংকীর্তনের পুরোভাগে একটি শ্রীমান সন্ন্যাসী নীরবে চলিয়াছে।

ময়রারা বাতাসা ছিটাইয়া দিল। দুপাশের লোক উঠিয়া প্রণাম করিতেছিল। ঘনশ্যামও উঠিয়া দাঁড়াইল। বাতাসার লোভে সংকীর্তনের পিছনে পিছনে ছেলের দল কোলাহল করিতে করিতে চলিয়াছিল। তাহাদের পাশে পাশে কয়টা জীর্ণ মলিনবসনা নীচজাতীয়া নারী!

সংকীর্তন পার হইয়া গেল।

মেয়েটি তখনও বলিতেছিল—না বাপু, আমাদের কাছে তুটি আনি আছে শুধু।

ঘনশ্যাম কহিল—দেখ দেখ কড়াই দেখ। বড় বড় কড়াই আছে। আঃ যাও না ছোকরা, সামনে দাঁড়িয়ে ভিড় কর কেন?

পিছনে তখন কয়জন যাত্রী দাঁড়াইয়া পরস্পরকে কড়াই দেখাইতেছিল।

মেয়েটির নাম মণি। মণি দাদাকে কহিল—এস দাদাভাই চলে এস। বকছে ওরা সব।

সিং-এর দোকানে একদল মুসলমান দাঁড়াইয়া মোরব্বার দর করিতেছিল।

সিং বলিতেছিল—চোখে দেখুন আগে, ভালো না হয় দাম দেবেন না আপনি!

দোকানের ফাজিল ছোকরাটা হাঁক দিয়া কহিল—খেয়ে দাম দেবেন, খেয়ে দাম দেবেন। ক্যাওড়া-দেওয়া জল।

মণি দাদাকে কহিল—মোরব্বা থাবে না দাদা?

দাদা মণিকে টানিয়া লইয়া আর একটা দোকানের পটিতে ঢুকিয়া পড়িল।

সিং তখন বলিতেছিল—কি বলেন! বাসি? ফল কি কখনও বাসি হয় আজ্ঞে?

ছোকরাটা কহিল—চাখ্‌না মিষ্টির দাম দিয়ে যান মশায়। আপনি খারাপ বললেই খারাপ হবে নাকি?

মণি চলিতে চলিতে হাসিয়া দাদাকে কহিল—সবাই তোমাকে বলছে খোকাবাবু। তোমার নাম জানে না কেউ, অমরকেষ্ট বললেই হয়।

—চুপ কর মণি। কাউকে নিজের নাম, বাড়ি বলতে যেয়ো না। চুরি করে পালিয়ে এসেছি মনে আছে তো। খবরদার!

—দিন না বাবু, হিলটা একদম ছেড়ে গেছে, লাগিয়ে দিই।

জুতার পটীর পথের তুপাশে মুচীর সারি বসিয়াছিল। অমরের জুতাটির অবস্থা দেখিয়া একজন ওই কথা বলিল।

অমর কথা কহিল না। গোড়ালি-ছাড়া জুতাটায় সত্য সত্যই তাহার বড় কষ্ট হইতেছিল কিন্তু সম্বলের কথা স্মরণ করিয়া সাহস হইতেছিল না। সে মণির হাত ধরিয়া আগাইয়া চলিয়াছিল। মুচীর দল কিন্তু নাছোড়বান্দা। অমর যত আগাইয়া চলে, তুপাশ হইতে তত অনুরোধ আসে—আসুন না বাবু! দিন না বাবু! একদম নতুন বানিয়ে দেব বাবু।

মণি কহিল—কেন বাপু তোমরা বলছ? আমাদের পয়সা নাই—না, আমরা যে বাড়ি থেকে—

অর্ধপথে মণি নীরব হইয়া গেল। দাদার কথাটা তাহার মনে পড়িল।

মুচীটা হাসিয়া কহিল—আসুন খোকাবাবু, হিলটা আমি ঠুকে দিই। পয়সা লাগবে না আপনার।

অমরের মাথাটা যেন কাটা যাইতেছিল। সে ঠাস করিয়া একটা চড় মণির গালে বসাইয়া দিল। মণি কাঁদিয়া উঠিল। মুচীটা তাড়াতাড়ি উঠিয়া মণিকে ধরিতে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মণি কান্না থামাইয়া কহিল—না না বাপু, ছুঁয়ো না তুমি, অবেলায় চান করতে পারব না।

হঠাৎ চড়টা মারিয়া অমর লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিল না। বেশ গম্ভীর ভাবে কহিল—আয় আয় মণি, চলে আয়।

মণি ক্রোধভরে কহিল—যাবে তাই? কিছুতেই যাব না আমি, সবাইকে বলে দোব সেই কথা।

অমর এবার আগাইয়া আসিয়া মণির হাত ধরিয়া কহিল—লক্ষ্মী মেয়ে তুমি। এস, আবার বাড়ি যেতে হবে।

—মারলে কেন তুমি?

ওদিকে কোথায় ডুম ডুম শব্দে বাজির বাজনা বাজিতেছিল। অমর তাড়াতাড়ি মণিকে আকর্ষণ করিয়া কহিল—আয়, আয় বাজি দেখিগে আয়।

মণি চলিতে চলিতে সহসা থামিয়া কহিল—মখমলের চটি কেমন দেখ দাদা।

অমর কহিল—আয় আয়। ওর চেয়েও ভালো চটি তোকে কিনে দেব।

মণি কহিল—আর বছরে তো তুমি কলকাতায় পড়তে যাবে। আমাকে এনে দেবে, নয় দাদা?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ দোব।

অমর সিক্সথ ক্লাসে পড়ে।

ভিড় যেন ক্রমশ বাড়িতেছিল।

বড় বড় দোকানগুলির সম্মুখে পথের উপর ছোট ছোট দোকান বসিয়াছে। তাহারা হাঁকিতেছিল—

—শাঁকালু, পালং শীষ!

—পয়সা-বাণ্ডিল বিড়ি বাবু।

—লাঙলের কাঠ নিয়ে যাও ভাই।

একজন যাত্রী বলিল—লাঙলের কাঠ কত করে ভাই?

—দশ আনা, বারো আনা। খাঁটি বাবলা কাঠ।

লাঙলের দোকানের পাশেই ছোট একটি কাচের কেসে কেমিকেলের গয়না লইয়া একজন বসিয়াছিল। সে কয়জন নিম্নশ্রেণীর দর্শককে ডাকিয়া কহিল—তিন পাথরের আংটী একটি করে নিয়ে যেতে হবে যে দাদা! বেশী নয় চার পয়সা করে।

লোক কয়জন চলিয়া গেল না। তাহারা আংটী দেখিতেই বসিল। দোকানদার বলিল—বস দাদা, বস।

লাঠির মাথায় কার, ফিতা, গেঁজে ঝুলাইয়া একটি লোক পথে হাঁকিয়া চলিয়াছিল—চার হাত কার দুপয়সা, বড় বড় কার দুপয়সা, রকম রকম দুপয়সা—জামাই-বাঁধা কার দুপয়সা। টানলে পরে ছিঁড়বে না, চুল বাঁধলে খুলবে না, না নিলে মন ভুলবে না···দু-দু পয়সা, দু-দু পয়সা।

পটীটার মোড় ফিরিতেই নিবিড় জনতার স্রোত কলরোল করিতেছিল। অমর ও মণি সেই জনতার মধ্যে ডুবিয়া গেল। জনতার গতিবেগ দুইদিকে চলিয়াছিল। একদিকে বাজির বাজনা বাজিতেছিল। সারিবন্দী তাঁবুগুলো দেখা যাইতেছিল। অমর মণির হাত ধরিয়া তাঁবুর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল—ওই দেখ মণি বাজির ঘর সব। মণি আঙুলের উপর ভর দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

কহিল—কই দাদা?

আরও পিছনের দিকে চলিয়াছিল জনতার আর একটা প্রবাহ। সন্ধ্যার আলো তখন জ্বলিতে শুরু করিয়াছে। এই জনতা-প্রবাহের লক্ষ্যস্থানে সমচতুষ্কোণ করিয়া চারিটি বড় ডে-লাইট জ্বলিতেছিল। উজ্জ্বল আলোক কয়টির চারিপাশে সমচতুষ্কোণ করিয়া ছোট ছোট খড়ের ঘরের সারি, বেষ্টনীর মধ্যের অঙ্গনটি লোকে লোকারণ্য হইয়া আছে। দলে দলে মানুষ চঞ্চল হইয়া অঙ্গনে ছুটিয়া চলিয়াছে। স্থানটায় প্রবেশ করিতেই নানা দ্রব্যের সংমিশ্রণে সৃষ্ট একটি উৎকট গন্ধে মানুষের বুকটা কেমন করিয়া উঠে। মদ, গাঁজা, বিড়ি, সিগারেট, সস্তা এসেন্সের তীব্র গন্ধে বাতাস যেন ভারি হইয়া উঠিয়াছে।

অঙ্গনের মধ্যে জনতার স্রোত আগের মানুষের ঘাড়ের উপর মুখ তুলিয়া নিবিড়ভাবে ওই ঘরগুলির দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, বাঙালী, খোট্টা, উড়িয়া, মাড়োয়ারী, কাবুলীওয়ালা, হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল সব ইহার মধ্যে আছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী সব যেন এখানে একাকার হইয়া গিয়াছে।

এইটাই আনন্দ-বাজার অর্থাৎ বেশ্যাপটী।

প্রতি ঘরের দরজায় ছোট ছোট চারপায়ার উপর এক-একটি স্ত্রীলোক

বসিয়া আছে। আর তাহাদের লেহন করিয়া ফিরিতেছিল অন্তত পাঁচশ জোড়া ক্ষুধাতুর চোখ। সস্তা অশ্লীল রসিকতায় মুহুর্মুহু উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাসি আবর্তিত হইয়া উঠিতেছিল।

এইখানে, তারপর ওই দরজায়, আবার আর একটা দরজায়···মোট কথা বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই।

মাতালের চীৎকার, আস্ফালনে আকাশের বুকের নিস্পন্দ অন্ধকার পর্যন্ত যেন তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছিল।

সমস্ত সমবেত কোলাহল ছাপাইয়া মাঝে মাঝে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল জুয়ার আড্ডায় উন্মত্ত উল্লাসরোল। অঙ্গনটির ঠিক মধ্যস্থলে আলোটির নীচে জুয়াখেলা চলিতেছে। কোন ঘরে নারীকণ্ঠে অশ্লীল গান আরম্ভ হইয়া গেছে। বাহিরের জনতা সে অশ্লীল গান শুনিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

মানুষের বুকের ভিতরকার পশুত্ব ও বর্বরতা পঙ্কিল জলস্রোতের ঘূর্ণীর মত মুহুর্মুহু পঙ্কিলতর হইয়া এখানে আবর্তিত হইয়া উঠিতেছিল।

ওদিকে কোথায় শব্দ হইল—ওয়াক—ওয়াক!

একটি মেয়ে বমি করিতেছিল। সেই দুর্গন্ধে দাঁড়াইয়াই দর্শকের দল কৌতুক দেখিতেছিল আর দেখিতেছিল অসম্বৃত-বাসা নারীর দেহ।

বমির উপর বসিয়াই মেয়েটা গান ধরিয়া দিল—

মরিব মরিব সখি নিশ্চয়ই মরিব!

জনতা হাসিয়া উঠিল—হো-হো-হো।

একজন পানওয়ালা হাঁকিতেছিল—মনমোহিনী খিলি বাবু, মনমোহিনী খিলি। যে যে-বয়সে খাবে সে সেই বয়সে থাকবে।

প্রজাপতির মত সুবেশা একটি সুশ্রী মেয়ে অঙ্গন দিয়া যাইতে যাইতে গান ধরিয়া দিল—পান খেয়ে যাও হে বঁধু,—

একজন দর্শক সঙ্গীকে বলিল—দেখেছিস?

অপরজন কহিল—এর চেয়েও ভালো আছে। তার নাম কমলি। ফড়িং বললে আমায়।

মেয়েটি মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

প্রথমজন বলিল—কি নাম তোমার?

মেয়েটি বলিল—চেহারা দেখে নাম বুঝে নাও। কমলিনী ফুলরাণী।—বলিয়া হেলিতে দুলিতে আপন ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

—শোন-শোন। দক্ষিণে—

—সিকি আধুলিতে কমল-মালা গলায় পরা হয় না নাগর গোটা গোটা।

একজন কহিল—মদ খাবে তো!

—খাওয়ায় কে? বলি বকে বকে মুখ তেত হয়ে গেল। পান খাওয়াও দেখি নাগর!—

একটা ঘরের সম্মুখে কলরোল উঠিয়াছিল।

কোনো বন্ধুর গোপন অভিসার বন্ধুর দল ধরিয়া ফেলিয়াছে। কুৎসিত ছন্দে উলঙ্গ নৃত্যে বর্বরতার পায়ে বীভৎসতার নূপুর বাজিতেছিল।

কমলি বলিতেছিল—টাকা দিলেই নাচতে পারি। পয়সা দিয়ে হুকুম কর, আমি তোমার পায়ের দাসী।

একটা ঘর হইতে একটি প্রায়-উলঙ্গ মাতাল একটি স্ত্রীলোককে টানিতে টানিতে বাহির হইয়া পড়িল। মেয়েটিও মাতাল হইয়াছে। পুরুষটি মত্তকণ্ঠে কহিতেছিল—আমায় ভালোবাসবি না তুই। তোর নামে নালিশ করব। ডিফামেশন স্যুট!

মেয়েটি কহিল—যা যা যাঃ আমি হাইকোর্ট থেকে উকিল নিয়ে আসব।

সহসা মাতালটার কোন খেয়াল হইল কে জানে, সে মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল—আমি আর সংসারেই থাকব না। সন্নেসী হব আমি।

স্খলিত কাপড়খানাকে টানিতে টানিতে সে চলিয়া গেল। মেয়েটি নেশার তাড়নায় বসিয়া পড়িয়া তখনও আস্ফালন করিতেছিল—তোকে আমি জেলে দেব। ব্যারিস্টার আনব আমি। কই যা দেখি তুই সন্নেসী হয়ে!

বাজির ওখানে আসিয়াই মনি আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওই দেখ দাদা, ওই দেখ!

সে হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিল। ভিড়ে ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবার ভয়ে অমর তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

ব্যাপার আর কিছুই নয়। একটা বাজি-ঘরের সম্মুখে একটা লোক নাক-লম্বা মুখোশ পরিয়া নাচিতেছে। পরনের পোশাকটাও তার অদ্ভুত। হাতে এক জোড়া প্রকাণ্ড করতাল।

মনি আবার তাহার জামা ধরিয়া টানিল—ভূত, দাদা ভূত। ঐ দেখ ভূত আঁকা রয়েছে। অমর উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল সত্য সত্যই সাইনবোর্ডটায় কতকগুলো বড় বড় চামচিকার মত ভূত নৃত্য করিতেছে। ছবিগুলার নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, 'ভৌতিক বিদ্যা ও ভোজবাজি'।

অমর চুপি চুপি মণিকে কহিল—জানিস মণি, এটা ভূতের খেলা, দেখবি?

মণি ঘাড় নাড়িয়াই আছে।

অমরের কিন্তু এত সহজে মন স্থির হইল না। অল্প পয়সায় সবচেয়ে ভালো বাজিটা দেখা তাহার ইচ্ছা।

এটার পরই একটা গেরুয়া রঙের তাঁবু। সেটার বাহিরে কিছু লেখা নাই। কিন্তু তাঁবুর মধ্যে অনবরত টিং টিং করিয়া ঘণ্টা বাজিতেছে।

দুয়ারে দাঁড়াইয়া একটা লোক চীৎকার করিতেছে—এই ফুরিয়ে গেল। চলে এস ভাই। এক পয়সা।

তার পরেরটায় ইংরাজীতে লেখা 'ইণ্ডিয়ান···'। তারপর কি অমর তা'হা বানান করিল কিন্তু উচ্চারণ করিতে পারিল না—পি, ইউ, ডাবল জেড, এল, ই।

মণি তখন আবার নাচিতে শুরু করিয়াছে।

—ও দাদা ও দাদা, নারদ মুনি সায়েব সেজে নাচছে দেখ। অমর ফিরিয়া দেখিল, মণি মিথ্যা বলে নাই। সত্যই বুড়া নারদ মুনির মত দেখিতে। তেমনি দাড়ি, তেমনি গোঁফ, আবার ফোকলা মুখের সম্মুখে দুটি নড়বড়ে দাঁত। নারদ মুনি সাহেবের পোশাক পরিয়া বাজনার তালে তালে ঘাড় দোলাইতেছিল আর গোঁফ নাচাইতেছিল। মণি কহিল—চল দাদা, এইটে দেখি ভাই।

অমর তখন পাশের তাঁবুটার সাইন-বোর্ড পড়িতেছিল। 'কাটামুণ্ডু অফ বোম্বাই'। একপাশে একটা কবন্ধ, ওপাশে দুইটা মাথাওয়ালা একটা মানুষ, মধ্যে রক্তাক্ত মুণ্ড।

অমরের এই 'কাটামুণ্ডু অফ বোম্বাই' দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু আরও ওপাশে কোথায় ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। মণি অমরের হাত ধরিয়া ওই ব্যাণ্ডের দিকে টানিয়া কহিল—ওই দাদা ইংরিজী বাজনা বাজছে। আয়, আয়! ওদিকে বড় বড় বাজি আছে।

পিছন হইতে জনতা সকলকে সম্মুখের দিকে ঠেলিতেছিল। নিবিড় জনতার মধ্যে শিশু দুটি চলিতেছিল ঠিক যেন নদীর স্রোতে অর্দ্ধমগ্ন কুটার মত। বাজির তাঁবুর সম্মুখে একটি পরিসর জায়গায় তাহারা আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বাঁচিল।

প্রকাণ্ড তাঁবুর সম্মুখে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। একটা মাচার উপর দুজন ক্লাউন নমুনা হিসাবে রিঙের খেলা দেখাইতেছিল। আর একজন ক্রমাগত হাঁকিতেছিল—চল, চল, দো-দো পয়সা।

সহসা বাজনা থামিয়া গেল। বড় ক্লাউনটা বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলিতে আরম্ভ করিল—বাবু লো-ক—

—হাঁ—হাঁ।—ছোট ক্লাউনটা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল। অমর ও মণি হাঁ করিয়া ক্লাউনদের মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি ?

—কি ভাবচেন মশা ?—ঠিক সম্মুখের লোকটির নাকের কাছে ছোট ক্লাউন হাত নাড়িয়া দিল।

লোকটা চমকিয়া উঠিল। ছোট ক্লাউন কহিল—যান ভিতরে যান। ওই দেখুন খেলা শুরু হোয়ে গেল যে !

তাঁবুর সম্মুখের পর্দাটা খুলিয়া গেল। ভিতরে থিয়েটারের রঙ-চঙে স্টেজ দেখা গেল। দর্শক দল একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। অমর আঙুলের উপর ভর দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

স্টেজের উপর তখন নর্তকী-বেশী দুটি মেয়ে দেখা দিয়াছে।

ক্লাউন হাঁকিল—হরেক রকম, রকম রকম দেখবেন। ভিতরে যান, ভিতরে যান। কজন ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে পর্দাটা বন্ধ হইয়া গেল। মেয়ে দুটি ভিতরে তখন গান ধরিয়া দিয়াছে।

আবার কজন ঢুকিল।

সহসা পিছনের জনতার মধ্যে কোলাহল উঠিয়া পড়িল—সরে যাও, হাতি—হাতি !

ঠং ঠং শব্দে ঘণ্টা দোলাইয়া জমিদারের হাতী বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়াছিল। চঞ্চল জনতা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মণির কাপড় ধরিয়া অমর অনেক দূর পর্যন্ত জনতার চাপে চলিয়া আসিল। একটু খোলা জায়গায় আসিতেই কাপড়ে ঝাঁকি দিয়া কে কহিল—কাপড় ছাড় না হে ছোকরা !

অমর সবিস্ময়ে দেখিল—অপরিচিত একজনের কাপড় সে ধরিয়া আছে। সে কাপড় ছাড়িয়া দিয়া ব্যাকুল হইয়া চারিপাশে চাহিল। কিন্তু কোথায় মণি ?

শুধু মণি কোথায় নয়, এতক্ষণে অমরের হুঁস হইল দিন চলিয়া গিয়াছে। মাথার উপরে কালো আকাশ তারায় তারায় আচ্ছন্ন। চারি পাশে দোকানে দোকানে উজ্জ্বল আলোয় পণ্যসম্ভার ঝকমক করিতেছে।

অমরের কান্না পাইল। মণি ! কোথায় মণি!

অমর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। মেলাটা তখন লোকে

লোকারণ্য হইয়া গেছে। নিজের কোলটুকু ছাড়া ছোট্ট অমর আর কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। ধাক্কায় ধাক্কায় জনতার মধ্যে কোথায় সে আসিয়া পড়িল কিছুই সে বুঝিতে পারিল না।

আনন্দ-বাজারের অঙ্গনমধ্যে উচ্ছৃঙ্খল আবর্ত উচ্ছ্বাস তীব্রতম হইয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। বিপুল জনতার মধ্যে একস্থানে নাচ-গান চলিতেছিল। অমর বহু কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করিয়া অবাক হইয়া গেল।

একজন পুরুষের গলা ধরিয়া সুশ্রী একটি মেয়ে উন্মত্তার মত নাচিতেছিল। বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খাইতেই পুরুষটি মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে পড়িয়া গেল। উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাস্যে জনতা উল্লাস প্রকাশ করিল।

অমর আর একটা জনতার মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল সেখানে ডাইস খেলা চলিতেছে। পয়সা টাকা জলস্রোতের মত ঝমঝম করিয়া পড়িতেছে। খেলোয়াড় হাঁকিতেছিল—এক টাকা দিলে দুটাকা, দুটাকায় চার টাকা!

অমর ক্ষণেকের জন্য সব ভুলিয়া গেল। আপনার পকেটে হাত দিয়া নাড়িতে আরম্ভ করিল।

কে একজন তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিল—খোকা, তুমি জুয়ো খেলতে এসেছ? অমর দেখিল আঠার-উনিশ বছরের একটি খদ্দর-পরা ছেলে, মাথায় গান্ধী টুপি।

জুয়া খেলোয়াড় চটিয়া গিয়াছিল, সে কহিল—কেন মশায় আপনি এমন করছেন? আমি দেড় হাজার টাকা জমিদারকে গুনে দিয়ে তবে খেলা পেতেছি। ধর খোকা ধর, এক ঘুঁটিতে ডবল, দু ঘুঁটিতে চার গুণ, তিন ঘুঁটিতে ছগুণ পাবে, ধর ধর।

অমর ছেলেটির মুখপানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। ছেলেটি তাহার হাত ধরিয়া কহিল—এস আমার সঙ্গে এস। কি, হয়েছে কি তোমার?—পিছনে ডাইসওয়ালা তখন হাঁকিতেছিল—চোরি নেহি, ডাকাতি নেহি। নসীবকে খেলা হ্যায় ভাই। খোদা দেনেওয়ালা। ধর ভাই ধর।—ভিড়ের বাহিরে আসিয়া ছেলেটি অমরকে জিজ্ঞাসা করিল—কার সঙ্গে এসেছ তুমি? বাড়ি কোথা?

অমর ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কহিল—আমার বোন হারিয়ে গেছে।

সচকিত ভাবে ছেলেটি প্রশ্ন করিল—বোন? কত বড় সে? তোমার চেয়ে ছোট না বড়?

—আমার চেয়ে ছোট। ছ বছর বয়েস তার।

—গায়ে তার গয়না-টয়না আছে না কি ?

—হাতে তুগাছা বালা আছে শুধু।

—কি নাম তার ?

—মণি তার নাম। খুব চালাক সে। পিঠে বিনুনী বাঁধা আছে !

আনন্দ-উন্মত্ত যাত্রীর কল-কোলাহলে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিয়াছে। নিকটের কথাবার্তা তুই-চারিটা শুধু স্পষ্ট ভাবে কানে আসিয়া ধরা দেয়। তাহা ব্যতীত যে শব্দ শোনা যায়, সে যেন বিরাট একটা মধুচক্রের অগণ্য মধুমক্ষিকার গুঞ্জন।

অমর প্রাণপণ চীৎকারে ডাক দিয়া চলিয়াছিল।

বিক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে ছোট্ট মেয়েটি লোকের পায়ের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল বাজিকরের তাঁবুর মধ্যে। সেখানে এদিক ওদিক চাহিয়া মণি দেখিল তাহার দাদা নাই। মণির বড় কৌতুক বোধ হইল। দাদা ভারি ঠকিয়া গিয়াছে। সে ঢুকিতে পারে নাই ! থাক সে বাহিরে দাঁড়াইয়া ! পরক্ষণেই মনটা তাহার কেমন করিয়া উঠিল। আহা—দাদা দেখিতে পাইবে না যে !

মণি দাদাকে ডাকিতে ফিরিল। কিন্তু সে অবসর আর তাহার হইল না। ঠং ঠং শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখিল স্টেজের উপর একটা ঘোড়া পিছনের তুপায়ে দাঁড়াইয়া নাচিতেছে। মণি অবাক হইয়া গেল। বিস্ময়ের উপর বিস্ময় ! কুকুরে ডিগবাজী খায়, বাঁদরে ঘোড়ায় চড়ে, টিয়াপাখীতে বন্দুক ছোড়ে ! একটা লোক আবার সং সাজিয়া কত রঙ্গই দেখাইয়া গেল, মণির হাসি আর থামে না।

ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়া স্টেজের উপর পর্দা পড়িয়া গেল। খেলা শেষ হইল। জনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে মণি বাহিরে আসিয়া চারিদিক দেখিল, দাদা তো নাই ! কয়েক মুহূর্ত মণি হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সে জনতার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া চলিল।

ভারি তুষ্টু তাহার দাদাটা !

দূরে নাগরদোলা ঘুরিতেছিল। মণি সেই দিকে চলিল। ওইখানে সে নিশ্চয় আছে। তাহাকে ফাঁকি দিয়ে সে নিশ্চয়ই নাগরদোলায় চাপিয়াছে !

পথে একটা দোকানে দোকানী হাঁকিতেছিল—চলে এস ভাই, চলে এস। কাবাব রুটি। গোস্ পরোটা ! চিংড়ি-কাঁকড়া,—এই এই, ভিড় ছাড়, ভিড় ছাড় !

ভিড় কমিল না। লোকটা অকস্মাৎ অতি বিকট চীৎকারে বলিয়া উঠিল—এই বড় বাঘ !

মণি চমকিয়া উঠিল। আর্তস্বরে সে ডাকিয়া উঠিল—দাদা!

আবার পিছন দিক হইতে রব উঠিল—এই সরো, এই সরো।

কে কহিল—এই সরোই বটে রে বাবা—গাড়ি আসছে, গাড়ি আসছে।

জনতা দুই পাশে বিভক্ত হইয়া জমাটভাবে চলিতে আরম্ভ করিল। ভিড়ের মধ্যে যে কেমন করিয়া কোন দিকে চলিয়াছিল তাহা মণি বুঝিল না। যখন সে হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ পাইল তখন দেখিল তাহার চারিপাশে অন্ধকার আর মেলার বাহিরে একটা খোলা মাঠে সে দাঁড়াইয়া আছে।

পিছনে দোকানের পর্দায় ঢাকা আলোকোজ্জ্বল মেলাটা বিপুল কলরবে গম্-গম্ করিতেছে। উপরে নক্ষত্রখচিত অন্ধকার আকাশের নীচে মেলার উৎক্ষিপ্ত আলোকরশ্মি সাদা কুয়াসার মত জাগিয়া রহিয়াছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে চারিপাশে দূরে দূরে কাহারা চলিয়াছে। কে যেন তাহার দাদার মত হুইসিল বাঁশী বাজাইতেছে। মণি চীৎকার করিয়া উঠিল—দাদা!

দূর মাঠ হইতে কে একজন উত্তর দিল—দাদা দাদা ডাক ছাড়ি, দাদা নাইক ঘরে, দাদা গেছে বৌ আনতে ওপারের চরে।

মণি বিষম রাগে তাকে গালি দিল—মর, মর, মর তুমি।—কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার ভয় করিল। সম্মুখেই খড় দিয়া ঘেরা ছোট ছোট ঘরের সারি। ঘরগুলার অন্ধকারময় পিছন দিকটা দেখা যাইতেছিল। ওপাশে সম্মুখের দিক উজ্জ্বল আলোয় আলোকময় হইয়া আছে।

মণি আসিয়া আলোকিত জায়গাটার ভিতরে যাইবার রাস্তা খুঁজিল। রাস্তা নাই। তবে ঘরগুলির পিছন দিকে একটি করিয়া দরজা রহিয়াছে। মণি একটা ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে উঁকি মারিল।

সঙ্গে সঙ্গে কে বলিয়া উঠিল—কে? কে?

মণি তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিল। ঘরের মধ্য হইতে কে আবার বলিল—চোর, চোর নাকি?

মণি এবার কাঁদিয়া ফেলিল। ততক্ষণে ঘরের মেয়েটি বাহিরে আসিয়া মণির হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—কে রে?

মণি ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। একটা দেশলাই জ্বালিয়া সে মণির মুখের সম্মুখে ধরিল; মণির ফুটফুটে মুখখানি দেখিয়া মেয়েটির মুখচোখ কোমল হইয়া আসিল। মণিরও ভয়ার্ত ভাব যেন কাটিয়া গেল, যে তাহাকে ধরিয়াছিল সেও বড় সুন্দর।

মেয়েটি মণিকে জিজ্ঞাসা করিল—কাঁদছ কেন খুকী?

তাহার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া মণি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—আমি যে দাদাকে খুঁজে পাচ্ছি না!

গভীর স্নেহে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া মেয়েটি কহিল—ভয় কি? তুমি কেঁদ না। সকালেই তোমাকে দাদার কাছে পাঠিয়ে দেব।

—রাত হয়ে গেছে যে।

—হোক না, তুমি আমার কাছে থাকবে আজ।

মণিকে বুকে করিয়া মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকিল। ওদিকের রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে কে ডাকিতেছিল—কমলমণি, কমলমণি।

আবার একজন কহিল—এ ঘরের লোক কই গো!

মণিকে বিছানায় বসাইয়া দিয়া মেয়েটি কহিল—বস তো মা একবার।

তারপর রুদ্ধ দ্বারটা খুলিয়া দ্বার-পথে দাঁড়াইয়া কহিল—কি? চেঁচাচ্ছ কেন?

কে একজন কহিল—পূজো করব বলে।

জনতা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মেয়েটি দুয়ার টানিয়া দিল।

বাহির হইতে আবার কে কহিল—শুনচ। কমল!

কমল কহিল—অনেক নরকের দোর তো খোলা রয়েছে, যাও না। আমি পারব না।

—একবার শোনই না!

কমলি কহিল—বেশী উপদ্রব করিলে পুলিশ ডাকব আমি।

মণি আবার ভয় পাইয়া গিয়াছিল, সে চুপি চুপি কাঁদিতেছিল।

কমলি তাহার গায়ে গভীর স্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল—কেঁদ না খুকী, কেঁদ না।

মণি কান্নার মধ্যেই কহিল, আমার নাম তো খুকী নয়, আমার নাম মণি—

—মণি! তা হ্যাঁ মা মণি, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে?

—হ্যাঁ।

ঘরের কোণের একটা হাঁড়ি হইতে কচুরী-মিষ্টি বাহির করিয়া কমল মণির হাতে দিল।

তাহার মুখপানে চাহিয়া মণি কহিল—তোমাকে কি বলে ডাকব?

কমলি যেন অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিল—মা।

মণি কহিল—না, মা যে আমার ঘরে আছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মেয়েটি জল গড়াইতে বসিল। মণি কহিল—তোমায় আমি মাসী বলব, কেমন?

জল গড়ানো রাখিয়া দিয়া মেয়েটি মণিকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, মাসী মা—মাসী মা—।

মণি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—আচ্ছা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মাসীমার সহিত মণির নিবিড় পরিচয় হইয়া গেল। মায়ের কথা, বাবার কথা, দাদার কথা, বুড়ো দাদুর কথা, ছোট বোনটির কথা পর্যন্ত বলিতে সে বাকী রাখিল না। এমন কি সেই দুষ্ট দোকানীটার কথা পর্যন্ত বলিতে সে ভুলিল না। এরোপ্লেন, নাগরদোলা, পুতুল দুটি কত ভালো তাহাও সে বলিল। মখমলের চটিও কেমন, তাও অপ্রকাশ রহিল না।

কমলি মণির মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। ছোট্ট ফুটফুটে মুখখানি তাহার বড় ভালো লাগিতেছিল।

সহসা সে কহিল—তুমি একটু চুপ করে শুয়ে থাক তো মণি। আমি একটু ঘুরে আসি। কেঁদ না যেন, বেশ!

মেয়েটি চলিয়া গেল।

নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ কক্ষে বাহিরের কোলাহল প্রচণ্ড রূপে শিশুর কানে আসিয়া বাজিতেছিল। মণি ভয়ে একখানা কম্বল চাপা দিয়া শুইয়া পড়িল।

পিছনের দরজা ঠেলিয়া কমলি ফিরিয়া আসিল, মৃদুস্বরে ডাকিল—মণি।

মুখ হইতে কম্বলের আবরণটা সরাইয়া দিয়া মুখ তুলিয়া মণি সাড়া দিল—উঁ।

কমলি আঁচল হইতে কতকগুলা জিনিস বাহির করিয়া দিল। মণি সাগ্রহে একেবারে সমস্তগুলা কাছে টানিয়া লইল। এরোপ্লেনটা ঠিক তেমনি, বোধ হয় সেইটাই! নাগরদোলার পুতুলটা কিন্তু সেটার চেয়েও ভালো। মখমলের চটিটা নতুন ধরনের।

কমল জিজ্ঞাসা করিল—পছন্দ হয়েছে মণি?

মণি ঘাড় নাড়িল। কমল সাগ্রহে কহিল—একটি চুমু দাও দেখি তবে।

মণি গাল বাড়াইয়া দিল। চুমা দিয়া মণিকে বুকে ধরিয়া কমলি কহিল—তোমার মা ভালো, না আমি ভালো!

একটুক্ষণ ভাবিয়া মণি উত্তর দিল—মাও ভালো, তুমিও ভালো।

কমলি একটু হাসিল।

মণি সহসা কহিল—তুমি বিড়ি খাও কেন মাসী! মা তো খায় না।

মেয়েটির মুখ যেন কেমন হইয়া গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে মণির পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মারিয়া কহিল—ঘুমোও দেখি দুষ্টু মেয়ে।

মণি কহিল—তুমি শোও।

হাসিয়া কমলি মণিকে বুকে টানিয়া শুইয়া পড়িল।

মণির চোখের পাতা ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল। কমলি অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ তাহার চোখ দিয়া কয় ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

পিছনের দরজার বাহিরে কে তাহাকে ডাকিল—কমলি!

কমলি উঠিতে উঠিতে আহ্বানকারী আগড় ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

কমলি কহিল—মাসী!

আগন্তুক মেয়েটি কহিল—হ্যাঁ। ঘরে শুয়ে রয়েছিস যে? কি হয়েছে তোর? এর পর কিন্তু টাকা দিতে পারব না বললে আমি শুনব না। জমিদারের টাকা আমাকে গুনতে হবে।

কমলি কোনো উত্তর দিবার পূর্বেই আবার সে কহিল—ও কে লো? কার মেয়ে?

কমলির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কহিল—জানি না।

—কারুর হারানো মেয়ে বুঝি? কোথায় পেলি?

—ঘরের পেছনে।

—কেউ জানে?

বিবর্ণ মুখে ঘাড় নাড়িয়া কমলি জবাব দিল—না।

—বেশ, তবে ভোরের আগেই ওকে সরিয়ে দিতে হবে। সরকারকে বলে আসি আমি। ভালো করে আগড়টা সরিয়ে দে।

ব্যস্ত হইয়া বৃদ্ধা বাহির হইয়া গেল। কমলি আগড়টা আঁটিয়া দিতে গিয়া আগড়ে হাত রাখিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। মাসী ইঙ্গিতে যে কথার আভাস দিয়া গেল সে কথা সে ভাবিতেও পারে নাই। সে শিহরিয়া উঠিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ওদিকে বাহিরের কোলাহল ধীরে ধীরে স্তব্ধ হইয়া আসিতেছিল। দুই-একটা উচ্চ জড়িত কণ্ঠের শব্দ বা কাহারও আহ্বানের শব্দ শুধু শোনা যায়। বাজি, সার্কাসের বাজনা নীরব হইয়া গেছে।

কমলি পিছনের আগড় খুলিয়া একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার থম থম করিতেছে। পথিকের আনাগোনাও বিরল হইয়া আসিয়াছে।

কমলি আবার ঘরে ঢুকিল। তারপর একমুহূর্ত সে বিলম্ব করিল না। মণিকে সে বুকে তুলিয়া লইল। আঁচলে সেই খেলনাগুলি জড়াইয়া পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া সে মাঠের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

স না ত ন

শিবনাথ প্রশ্ন করিল, রোগটা কি ?

ননীবাবু প্রবীণ চিকিৎসক, চিকিৎসা-বিদ্যা বংশগত বিদ্যা, তিন পুরুষ ধরিয়া এ বংশের প্রত্যেকেই চিকিৎসক হিসাবে শুধু জীবিকাই নয়, খ্যাতি এবং প্রতিপত্তিও যথেষ্ট পরিমাণে অর্জন করিয়া আসিয়াছে। এই বিদ্যার সঙ্গে ইহাদের একটা যেন জন্মগত পরিচয় আছে। বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত নাড়ী দেখিতে জানে, আকস্মিক আপদে-বিপদে দুই-চারিটা টোটকার ব্যবস্থা পর্যন্ত তাহারা দিয়া থাকে। ননী ডাক্তার কবিরাজি এবং ডাক্তারি দুই-ই জানেন, ধীর গম্ভীর লোক, এ অঞ্চলে লোকে বলে—ধন্বন্তরি। অবশ্য ননী ডাক্তারের হাতে সকল রোগীই যে বাঁচে তাহা নয়, তবে ননীবাবু ভুল করেন না; ক্ষেত্রবিশেষে সসম্ভ্রমে মৃত্যুকে অভিবাদন করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়ান।

ননীবাবু হাসিয়া বলিলেন, রোগটা ? কালরোগ, আর কি !

—কালরোগ !

—হ্যাঁ। বয়স যে অনেক। পঁচাশির কম নয়। কাল—মানে বয়সই এখন ব্যাধি। ননীবাবু আবার একটু হাসিলেন।

শিবনাথদের বাড়ির চার পুরুষের চাকর।

শিবনাথের প্রপিতামহের আমলে এ বাড়িতে বহাল হইয়াছিল। দশ বছর বয়সের হাড়ীর ছেলে, মোটাসোটা চেহারা, থ্যাবড়া নাক, কুতকুতে চোখ, মাথায় একমাথা কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বলিষ্ঠ গঠন ; গরুর রাখালি করিবার জন্য বহাল হইয়াছিল। নাম সনাতন, কিন্তু মোটাসোটা চেহারার জন্য কর্তা নাম দিয়াছিলেন, কুমড়ো।

ছোট ছোট চোখে অনেকক্ষণ কর্তার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল, বাবু মশায় ! কত্তাবাবু !

—কি রে ?

কর্তার পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা কুমড়োর মনে কেমন যেন ভয়ের সঞ্চার করিতেছিল ; অদ্ভুত, বিস্ময়কর, দুর্বোধ্য ! কুমড়ো বিহ্বল করুণ ভাবে সভয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল, আমাকে মারবা না কত্তাবাবু ?

বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াও সস্নেহে হাসিয়া কর্তা বলিয়াছিলেন, না, মারব কেন ?

—ঘরের ভেতর ভরে রাখবা না ?

—না, না। বরং ভালো করে কাজ করলে বকশিশ দেব।

—বকশিশ দেবা ? কি'দেবা ?

—কি নিবি ?—কর্তা হাসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

চাপরাসীর লাল শালুর পাগড়িটা দেখাইয়া কুমড়ো বলিয়াছিল, অমুনি লাল টুপি একটো আমাকে দিও।

ঠিক সেই সময়েই বাড়ির ঝি আসিয়া কর্তাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে ঘোমটা টানিয়া মৃদুস্বরে জানাইয়াছিল, বাজার যাইবার জন্য লোকের প্রয়োজন, লবঙ্গের অভাব পড়িয়াছে, পান সাজা বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

চাকরটা কার্যান্তরে গিয়াছিল, চাপরাসীরও কার্যভার লইয়া বাহিরে যাওয়ার কথা, কর্তা কুমড়োকেই পাঠাইয়াছিলেন—লবঙ্গ নিয়ে আয় চার পয়সার, বুঝলি ?

কিছুক্ষণ পর প্রকাণ্ড একটা ঠোঙা হাতে কুমড়ো বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঠোঙাটা নামাইয়া দিয়াছিল, এই ল্যান গো।

ঠোঙায় একঠোঙা নুন !

বাড়িতে হাসির ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। গিন্নী সেবার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, খেতে ঝাল-ঝাল লাগে, লবঙ্গ, লবণ নয়, বুঝলি ? লঙ্গ, লঙ্গ।

দ্বিতীয় বারে আবারও একটা বড় ঠোঙা হাতে কুমড়ো ফিরিয়া আসিয়াছিল, এবার ঠোঙায় এক ঠোঙা লঙ্কা।

সেবার আর হাসির ধ্বনি বাড়ির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, কাছারি-বাড়ি পর্যন্ত পৌছিয়াছিল ; কুমড়ো বিব্রত এবং বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, বললা যি, ঝাল !

কর্তার খড়ম বাজিয়া উঠিয়াছিল, তিনি এত উচ্চ হাসির জন্য বিরক্ত হইয়াই আসিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত শুনিয়া উচ্চ হাসিতে তিনি গোটা পাড়াখানা সচকিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

দীর্ঘ পঁচাত্তর বৎসর পরেও সনাতনের সে কথা এ বাড়িতে সকলেই জানে ; পরিবারের ইতিহাসের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। আরও একটা কথা—সেই প্রথম দিনেরই কথা—বাঁচিয়া আছে। বাড়ির গরু-বাছুর গোয়ালে বন্ধ করিয়া, সনাতন বাড়ি যাইতে বাহির হইয়া পথে দাঁড়াইয়া সরবে কাঁদিয়াছিল, ও—মা গো ! ওগো—মা গো !

কর্তা নিজে বাহির হইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কে মেরেছে ?

হাতের মুঠায় চোখ মুছিতে মুছিতে কুমড়ো বলিয়াছিল, আঁদার হয়ে যেল যি !

—কি ?

—আঁদার।

—আঁধার ?

—হ্যাঁ। আমি কি করে বাড়ি যাব ? মোলকিনী পুকুরের পাড়ে ভূত আছে যি ! ভাগাড়ে গো-দানা আছে গো !

কর্তা হাসিয়া চাপরাসী সঙ্গে দিয়া কুমড়োকে বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সনাতনের সঙ্গে সে কথা আজও বাঁচিয়া আছে। সে তাহার দীর্ঘ জীবনে অসংখ্য ভূতের আশ্রয়স্থল আবিষ্কার করিয়াছে।

শুধু ভূত নয়, দেবস্থান এবং দেবতাকেও তাহার ভয় ছিল বিষম, সে ভয় আজও তাহার যায় নাই। আর একটা নূতন ভয় তাহার মধ্যে সংক্রামিত হইল চাকরির কয়েক দিন পরেই।

বড়বাবু অর্থাৎ কর্তাবাবুর বড় ছেলে শিবনাথের পিতামহ কাছারিতে বসিয়া একজন প্রজার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন ; মাতব্বর প্রজাটি কথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া ফেলিল। কুমড়ো কয়েক আঁটি খড় লইয়া সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা না বুঝিলেও ব্যাপারটার অন্তর্নিহিত উত্তেজনা গুপ্ত বহ্নির উত্তাপের মত তাহাকে স্পর্শ করিল। বড়বাবুর থমথমে মুখ, মোড়ল মহাশয়ের সোজা বসিবার ভঙ্গি এবং সতেজ কণ্ঠস্বর তাহাকেও উত্তেজিত এবং কৌতূহলী করিয়া তুলিল। সকল কথা মনে নাই, কিন্তু ঘটনাটার শেষ দুইটা কথা সনাতনের বার্ধক্যজনিত বধির কানে আজও বাজে—পারবে না ?

সমান তেজে প্রজাটি উত্তর দিল, না।

সঙ্গে সঙ্গে বড়বাবুর এক লাথিতে এত বড় মানুষটা উল্টাইয়া দাওয়া হইতে একেবারে নিচে আসিয়া পড়িল।

কুমড়োর সর্বাঙ্গ ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে পলাইয়া আসিল। বড়বাবুর প্রতি দুরন্ত একটা ভয় তাহার বুকে চিরদিনের মত বাসা বাঁধিয়া বসিল। দীর্ঘদিন চাকরির মধ্যে সে ভয় তাহার আর যায় নাই।

এই কয়টি ভয় বাদ দিয়া কিন্তু সনাতনের দুর্দান্ত সাহস। বাবুদের উদাসীর ডাঙায় বিস্তীর্ণ জঙ্গলাবৃত প্রান্তরে গো-চারণের মাঠ—সেখানে গোখরো, কেউটে, চন্দ্রবোড়া সাপ যথেষ্ট। গো-চারণের ছোট পাচন লাঠি ও ঢেলার সাহায্যে কত সাপ যে সে মারিয়াছে, তাহার হিসাব নাই। শুধু মারাই নয়, সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে সে নিজেই সাপকে বন্দী করার কৌশল আয়ত্ত

করিয়াছে। নেকড়েজাতীয় হিংস্র হেঁড়োলের বাসস্থান আবিষ্কার করিয়া হেঁড়োলের বাচ্চাও সে ধরিয়া আনিয়াছে। একবার বড় একটা নেকড়ে একটা বাছুর আক্রমণ করিয়াছিল; তখন অবশ্য কুমড়ো আর কুমড়ো নয়, সে তখন আঠারো-উনিশ বছরের কাঁচা জোয়ান; দৈর্ঘ্যে প্রায় সাধারণ মানুষের হাতের সওয়া চার হাত অর্থাৎ ছয় ফুটেরও বেশি। পাচনটা লইয়াই সে নেকড়েটার উপর লাফাইয়া পড়িয়াছিল। নেকড়েটার টুঁটির উপর যখন সে পা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাহার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। সে ক্ষতচিহ্ন তাহার লোলচর্ম দেহে আজও অক্ষয় হইয়া আছে।

জানোয়ারটাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া আসিল। চামড়াটা ছাড়াইয়া লইবার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু মনিব-বাড়ির চাপরাসীটা সেটাকে লইয়া গিয়া হাজির করিল কাছারিতে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাক পড়িল।

কর্তাবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন, বলিলেন, বেটা অসুর! সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন নায়েবকে, বেটাকে একটা পাগড়ি কিনে দাও তো। আমার মনে আছে, প্রথম দিনই বেটা আমার কাছে লাল পাগড়ি চেয়েছিল।

বড়বাবু গম্ভীরভাবে হুকুম দিলেন, আগে ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাক, যে রকম কেটে গেছে, আর নেকড়ে-টেকড়ের দাঁতে বিষ আছে শুনেছি।

সনাতন প্রতিবাদ করিতে পারিল না, কিন্তু একটু একটু করিয়া সরিয়া আসিয়া আড়াল পড়িতেই একেবারে সোজা দৌড় মারিল। বাপ রে! ডাক্তার ছুরি চালাইয়া দিবে, আষ্টেপৃষ্ঠে ন্যাকড়ার ফালি দিয়া বাঁধিয়া দিবে, বাপ রে! পলাইয়া আসিয়া সে একেবারে গোয়ালঘরের মাচায় উঠিয়া বসিয়া রহিল। চাপরাসীটা বার দুয়েক ডাকিয়া ফিরিয়া গেল। পাখির কলরবে সন্ধ্যা আসন্ন বুঝিয়া মাচা হইতে চুপি চুপি নামিয়া গুরুগুলাকে পুরিয়া দিয়া বাড়ি পালাইল। কিন্তু কিছুদূর আসিয়াই তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া আসিয়াছে, সম্মুখে মোলকিনী পুকুরের পাড়ের বটগাছটায় ভূত আছে। ঝাঁকড়া বটগাছটার পাশেই বাঁশের ঝাড়, ভূত বাঁশ হইয়া রাস্তার উপর পড়িয়া থাকে, কেহ সেটাকে পার হইতে গেলেই তড়াক করিয়া বাঁশটা সোজা উপরে উঠিয়া যায়; বাঁশের সঙ্গে মানুষটাও ওই উপরে উঠিয়া ঘাড় গুঁজিয়া মাটিতে পড়িয়া মরে। শতেক ছলনা ভূতের। ভাদ্র মাসে পাকা তাল হইয়া গাছ হইতে একেবারে নির্ঘাত ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। কখনও বা হঠাৎ একেবারে তালগাছের মত আকাশে মাথা ঠেকাইয়া পথের উপর দাঁড়ায়। এই তালগাছের মত মূর্তিকেই সনাতনের বেশি ভয়। কিন্তু উপায়ই বা কি?

এ পথে তো তাহাদের জাতি-জ্ঞাতি ছাড়া বড় কেহ যায় না। আবর্জনা-পরিপূর্ণ এই অংশটা পার হইয়া তবে তাহাদের পল্লী। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও সনাতন কাহারও সঙ্গ পাইল না। তাহাদের অন্য সকলে এতক্ষণে বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছে। ধর্মরাজতলার বটগাছটির নিচে ঢোল লইয়া গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বৈশাখে বোলান গান, জ্যৈষ্ঠের পাঁচালি, আষাঢ়ে পঞ্চমী হইতে নাগপঞ্চমী পর্যন্ত মনসার ভাসান, ভাদ্রে ভাদু, আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত পাঁচমিশালী, চৈত্রে ঘেঁটু। সনাতন নিজে গান গাহিতে পারে না। কর্কশ মোটা কণ্ঠস্বর, কিন্তু উৎসাহ তাহার প্রবল। কোনোরূপে সে বুক বাঁধিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ঠিক করিল, বটগাছতলাটার আগে হইতেই সে চোখ বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবে।

মোলকিনীর পাড়ে আসিয়া সে চোখ বন্ধ করিল। কিন্তু চোখ সে আপনার অজ্ঞাতসারেই বার বার খুলিয়া ফেলিতেছিল।

ও কে? বুকের ভিতরটায় যেন ঢেঁকি দিয়া কেহ হৃৎপিণ্ডটাকে কুটিতেছে! সাদা কাপড়-পরা ছোট আকারের ও কে ওখানে ঘুরিতেছে! সে অদ্ভুত একটা বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, কে? মূর্তিটা এতক্ষণ তাহাকে বোধ হয় দেখে নাই, তাহার অদ্ভুত বিকৃত স্বরের সাড়ায় এবার সে ঘুরিয়া খানিক আগাইয়া আসিয়া খিলখিল শব্দে হাসিয়া উঠিল। সনাতনের চেতনা লোপ পাইতেছিল, প্রাণপণে সে চেতনাকে জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা করিল।

মূর্তিটা আরও খানিকটা আগাইয়া আসিয়া নাকী সুরে বলিল, আমি ভূঁত। —সঙ্গে সঙ্গে আবার সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এবার সনাতনের সর্বাঙ্গে একটা অতি উত্তেজনাময় উষ্ণ চেতনার প্রবাহ ভয়ের হিমশীতল অন্ধকারের মধ্যে অগ্নিগর্ভ বিদ্যুত-চমকের মত খেলিয়া গেল।

নন্দ! ভূত নয়, নন্দরাণী—তাহাদেরই সেই ডাকাবুকো মেয়েটা—কষ্টিপাথরের মত কালো, শ্যাওলার মত নরম—সেই মেয়েটা। ভয় সনাতনের কোথায় চলিয়া গেল, সে বুঝিল না, বুঝিতেও চাহিল না; বিপুল উত্তেজনাময় উল্লাসে সেও হো-হো করিয়া হাসিয়া নন্দর দিকে ছুটিল। মুহূর্তে মেয়েটাও ছুটিল। সুদীর্ঘ সনাতন, আর নন্দ ছোটখাটো মেয়েটি, সে কতক্ষণ তাহার আগে আগে ছুটিবে। সনাতন লম্বা হাত বাড়াইল। কিন্তু অদ্ভুত কৌশল মেয়েটার—চট করিয়া পাশ কাটাইয়া এমন মোড় ফিরিল যে সনাতন শূন্য হাত বাড়াইয়া গতির আবেগে চলিয়া গেল—নন্দ অন্য দিকে সরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল। এমনই একবার নয়, বার বার। ভাদ্রমাসের অন্ধকার সে

হাসিতে যেন শিহরিয়া উঠিতেছিল। অবশেষে নন্দকে সে যখন ধরিল, তখন নন্দ এলাইয়া পড়িয়াছে। সনাতনও হাঁপাইতেছিল। তবুও সে শিশুর মত নন্দর ছোট দেহখানি দুই হাতে তাহার মাথার উপরে তুলিয়া বলিল, দি, ফেলে দি আছিড়ে?

সুকৌশলে ঈষৎ ঝুঁকিয়া নন্দ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কই, দে দেখি!

ভাদ্র সন্ধ্যায় নন্দ তালের খোঁজে আসিয়াছিল।

এই নন্দকেই সে বিবাহ করিল। সেও একটা কাণ্ড। নন্দর বাপ পণের দাবি করিল অনেক—এক কুড়ি পাঁচ টাকা।

পরের দিন নন্দকে আর পাওয়া গেল না। সে এক হৈ-চৈ ব্যাপার; সনাতন কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে মনিব-বাড়িতে কাজ করিতেছিল! ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্বে থানা-পুলিশকে লোকে এড়াইয়া চলিত, আইন-কানুনও জানিত না। নন্দর বাপ-মা বড়বাবুর কাছে আসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বড়বাবু কড়া লোক, সূক্ষ্ম বিচারক; কর্তাবাবুর সব তাতেই হাসি।

—আজ্ঞে হুজুর, ওই—ওই শালারই কাজ।

বড়বাবু হুকুম দিলেন, ডাক তো বেটাকে। কিন্তু সনাতন তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। চাপরাসীটা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ্ঞে, কোথাও পেলাম না।

সবিস্ময়ে বড়বাবু বলিলেন, আরে, এই তো ছিল!

একান্ত নিরুপায় ভঙ্গিতে চাপরাসীটা বলিল, আজ্ঞে, তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম।

ঠিক এই সময়ে কর্তাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত শুনিয়া তিনি হাসিলেন, বলিলেন, সে বেটা অসুর গেল কোথায়?

—এই ছিল, কিন্তু আর পাওয়া যাচ্ছে না।

কর্তাবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাড়ির বাগানের গাছগুলার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তারপর চলিয়া গেলেন গোয়াল-বাড়ির দিকে। সেখানে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, গোয়াল-ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন, এই ব্যাটা অসুর!

গোয়ালের মাচার উপরে খসখস শব্দ হইতেছিল, শব্দটা থামিয়া গেল।

এবার ঈষৎ কঠোর স্বরে ডাকিলেন, সনাতনে!

মাচার উপর হইতে ঝুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া সনাতন দাঁড়াইল।

কর্তা আবার একবার উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এই হারামজাদী হাড়িনী, নাম মাচা থেকে !

বিড়ালীর মত কড়িকাঠ আঁকড়াইয়া ঝুলিতে ঝুলিতে এবার নন্দ লাফাইয়া নামিল।

কর্তা বলিলেন, আয়।

নিঃশব্দে পোষা জানোয়ারের মত কর্তাবাবুর পিছনে পিছনে কাছারিতে আসিতেই নন্দর বাপ-মা দারুণ ক্রোধে উচ্চ চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। বড়বাবুর চোখ দুইটাও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। ভয়ে সনাতন যেন অসাড় পঙ্গু হইয়া গেল। কর্তাবাবু গম্ভীর স্বরে নন্দর বাপ-মাকে বলিলেন, চেঁচাস নি। —তারপর নায়েবকে বলিলেন, পঁচিশটা টাকা আমাকে দাও তো।

বড়বাবু প্রশ্ন করিলেন, আজ্ঞে ?

—পঁচিশটা টাকা।—কর্তাবাবু নায়েবের দিকে চাহিলেন। নায়েব বিনা বাক্যব্যয়ে পঁচিশটা টাকা বাহির করিয়া দিল। কর্তাবাবু নন্দর বাপকে ডাকিয়া বলিলেন, নে, গুনে নে। আজ রাত্রেই বিয়ে দিতে হবে, বুঝলি ?

বিবাহের পর সনাতন গোল বাধাইল। যে সনাতন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মনিব-বাড়িতে পড়িয়া থাকিত, সেই সনাতন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়ি পলাইতে আরম্ভ করিল। সনাতন এই আছে, এই নাই। শুধু তাই নয়, সেদিন চাপরাসীটা সনাতনকে ডাকিতে গিয়াছিল, সনাতন তাহাকে বেশ ঘা-কতক লাগাইয়া দিল। ইহার পর তিন-চারজন চাপরাসী গিয়া সনাতনকে বাঁধিয়া লইয়া আসিল। বড়বাবু তাহাকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন। কিন্তু কর্তাবাবু কি সুনজরেই তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তিনি সে দণ্ড মাপ করিয়া বলিলেন, দে, নাকে খত দে বেটা শুয়ার !

মাটির উপরে নাক ঘষিয়া সনাতন চামড়া পর্যন্ত তুলিয়া ফেলিল। রক্তাক্ত নাকটা দেখিয়া এবার বড়বাবুও হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, খবরদার, এমন কাজ আর যেন করবি না।

সনাতন কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, আমি ছেলাম না বাড়িতে, প্যায়াদা কেনে উঠোনে দাঁড়িয়ে হাসছিল মহাশয় ?

বড়বাবু এবার কঠিন দৃষ্টিতে চাপরাসীটার দিকে চাহিলেন। কর্তাবাবু বিচিত্র মানুষ, তিনি এক কথায় ব্যাপারটাকে চাপা দিয়া বলিলেন, তোর বউকেও আজ থেকে কাজ করতে হবে এখানে, বুঝলি সকালবেলা থেকে খোকাকে নিয়ে থাকবে। আর দুপুরবেলায় তুই গরু নিয়ে যাবি মাঠে, ঝুড়ি

নিয়ে বউ যাবে তোর সঙ্গে, গোবর কুড়িয়ে মাঠে জড়ো করবে। বুঝলি? দুবেলা খেতে পাবে, বছরে পূজোর সময় একখানা কাপড়।

সনাতন উল্লাসে যে কি করিবে খুঁজিয়া পাইল না। গোয়ালবাড়িতে আসিয়া বড় মহিষটার গলা ধরিয়া দশটা চুমা খাইল, খানিকটা নাচিল, ভেড়ার পালের মেড়াটার সঙ্গে ঢুঁ খেলিয়া উপর-হাতের পেশীতে কালসিটে পড়াইয়া ফেলিল। আঃ কর্তাবাবুকে কাঁধে করিয়া সে যদি নাচিতে পাইত! অথবা বাবুর পায়ের তলাটা যদি জিভ দিয়া চাটিতে পাইত! সে ছুটিয়া গিয়া নন্দকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিল।

অতর্কিত আকর্ষণে নন্দ বিব্রত এবং বিরক্ত হইয়া গালিগালাজ আরম্ভ করিল, কিন্তু সনাতন সে গ্রাহ্যই করিল না।

ইহার পর নন্দ সকাল হইতে বড়বাবুর খোকাকে—শিবনাথের বাপকে লইয়া বসিয়া থাকিত, খেলা দিত। সনাতন কাজ করিত, মধ্যে মধ্যে খোকাকে কাঁধে লইয়া নাচিত, কখনও কখনও খোকার পিঠে মৃদু মৃদু কিল চড় মারিত, কান মলিয়া দিত, বলিত, দু-চার ঘা মেরে রাখি নন্দ, বড় হলে তখন তো চোখ লাল করবে, দেবে কষে জুতোর বাড়ি।

দুপুরে নির্জনে উদাসীর প্রান্তরে সনাতন বটগাছতলায় বসিয়া থাকিত; নন্দ তাহার পাচন লাঠিটা লইয়া গরু-মহিষগুলাকে আগলাইয়া ফিরিত। লাঠি হাতে নন্দকে এমন সুন্দর মানাইত! খাটো মোটা কাপড় পরা, মাথায় খাটো নন্দর হাতে সনাতনের লাঠিগাছটা নন্দর মাথার উপরেও খানিকটা উঠিয়া থাকিত। নন্দ নির্ভয়ে প্রকাণ্ড কালো মহিষ দুইটাকে দুমদাম করিয়া পিটিত। কখনও কখনও সে সুকৌশলে উঠিয়া বসিত মহিষের পিঠে, মহিষটা চলিত, নন্দ এমন দুলিত সেই চলার সঙ্গে সঙ্গে যে, সনাতনও ছুটিয়া গিয়া চড়িয়া বসিত অন্য মহিষটার পিঠে।

মহিষের পিঠের উপর হইতেই নন্দ প্রথমদিনই চীৎকার করিয়া উঠিল, সাপ! আলান!

প্রকাণ্ড বড় এক আলান—অর্থাৎ আল কেউটে চলিয়া যাইতেছিল, নন্দর চীৎকারে সেটা অল্প মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সনাতন দেখিয়া নির্বিকার চিত্তে হাসিয়া বলিল, ওর নাম কালকুটি, কিচ্ছু বলে না বুড়ি। বুঝলি, ওকে যেন মারতে-টারতে যাস না। তারপর সে হাতে তালি দিয়া বলিল, যা যা বুড়ি, চলে যা।

সাপটা আর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সনাতন এখানকার কীট-পতঙ্গটিকেও চেনে। ওই প্রকাণ্ড বড় কেউটেটার রীতিনীতি, গতিবিধি সব তাহার সুবিদিত, এমন কি কালকুটির গর্তটাও সে চেনে। কালকুটির বহু শাবককে সে হত্যা করিয়াছে। সেগুলার স্বভাব মায়ের মত নয়। সনাতন জানে, বয়স হইলে উহারাও এমনই ধীর স্থির হইবে, কিন্তু বয়স হইতে হইতে যে কত জীবজন্তু মানুষ মারিবে তাহার কি ঠিক আছে? আষাঢ় মাসের প্রথম হইতেই সে সন্তর্পণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে গর্তটার আশেপাশে। সহসা একদিন দেখা যায়, কালো সর্পশিশুতে চারিপাশ ভরিয়া গিয়াছে। সাপের ডিম, গরম-খোলায়-দেওয়া ধান হইতে খইয়ের মত ফোটে যে! ডিম ফাটিয়া ছটকাইয়া বাহির হয় সাপের বাচ্ছা। নহিলে উহাদের মা ওই কালকুটিই যে খাইয়া ফেলিবে উহাদের। গর্তের ভিতরে উদ্যত গ্রাসে বসিয়া থাকে কালকুটি, উপরে থাকে সনাতন লাঠি লইয়া। তবুও যাহারা বাঁচিয়া যায়, তাহারা বড় হইয়াও প্রাণ দেয় সনাতনের হাতে।

নন্দ সেদিন কালকুটিকে চিনিল, ক্রমে ক্রমে আরও অনেককে চিনিল, কত নূতনকে আবিষ্কার করিল; প্রজাপতির ডিম সনাতন চিনিত না, সে জানিত সেগুলা মরা কাচপোকা, নন্দ সনাতনকে চিনাইয়া দিল। দুইজনে মিলিয়া গোবর কুড়াইয়া বানাইয়া তুলিল প্রায় একটি পাহাড়।

কর্তাবাবু খুশী হইয়া গোটা একটা টাকা বকশিশ দিলেন। সনাতন সেদিন নন্দকে আদর করিল, তু আমার আঁধার ঘরের আলো।

নন্দ অবাক হইয়া গেল।

সনাতন সেই দিনই কথাটা শিখিয়াছে বড়বাবুর কাছে। পূজার কাপড়ের প্রকাণ্ড গাঁটরি মাথায় সনাতন বড়বাবুর সঙ্গে বাড়ির ভিতর গিয়াছিল। বড়গিন্নী অন্ধকার বড় ঘরের দরজা খুলিয়া বলিয়াছিলেন, দাঁড়াও, আলো জ্বেলে দিই।

বড়বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, দরকার নেই তুমি আমার আঁধার ঘরের আলো!

কথাটা সনাতনের বড় ভালো লাগিয়াছে।

বছর দশেক পরে সেই নন্দ একদিন সনাতনকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সন্তান প্রসব করিতে গিয়া মারা পড়িল। সনাতনের সে অবস্থা বর্ণনার অতীত; কর্কশ উচ্চকণ্ঠের কুণ্ঠাহীন আর্ত চীৎকারে সমস্ত গ্রামখানাকে নিশীথরাত্রে সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কর্তাবাবু তখন মারা গিয়াছেন, বড়বাবু তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়াছিলেন,

সেই লোকের সঙ্গে শিবনাথের বাবাও গিয়াছিলেন। সনাতনকে তিনি বড় ভালো-বাসেন, সে তাঁহাকে মানুষ করিয়াছে। শবদেহের পাশে একটি কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছিল, উঠানে সে আলো বিশেষ আসিয়া পড়ে নাই, অন্ধকার উঠানে অসুরের মত প্রশস্ত প্রকাণ্ড বুকে বাঘের থাবার মত হাত চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া যাইতেছে সনাতন।

সৎকার করিয়া পরদিন সে যখন মনিব-বাড়িতে আসিল, তখন চোখ দুইটা তাহার কুঁচের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সকলে ভাবিল, সনাতন পাগল হইয়া যাইবে।

সেইদিন গভীর রাত্রে সে যখন ছুটিয়া আসিয়া কাছারির দাওয়ার চাপরাসীটার পাশে আসিয়া হাঁপাইতে আরম্ভ করিল, তখন পাগল হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া চাপরাসীটা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সনাতন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, নন্দ, প্যায়াদা, নন্দ বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াইছে!

মাস-খানেক পরেই একদিন সকালে চাপরাসীটা বলিল, সনাতন আসে নাই।

বড়বাবু বলিলেন—ডেকে নিয়ে আয়।

চাপরাসীটা বলিল, আজ্ঞে রাত্রে উঠে সে কোথা চলে গিয়েছে। এইখানে আমার কাছেই তো শোয় এখন, ভোররাত্রে উঠে গেল, তারপর আর আসে নাই।

কড়া মেজাজের মানুষ বড়বাবুও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।—নন্দর শোকে সনাতন দেশত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু পরের দিনই সনাতন ফিরিয়া আসিল।

চাপরাসীটা প্রশ্ন করিল, কোথায় গিয়েছিলি?

সনাতন জবাব দিল, গেয়েছিলাম যেখানে মন হয়েছিল।

আবার দিন দুই পরে দেখা গেল, সনাতন নাই। সেদিন সন্ধ্যা হইতেই সে নিখোঁজ। যে সনাতন নন্দর প্রেতাত্মার ভয়ে সন্ধ্যাতেই ভয়কাতর শিশুর মত অসহায় হইয়া পড়ে, সে রাত্রির অন্ধকারেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

চার দিন পরে সে ফিরিল। বড়বাবু এবার রুষ্টভাবেই বলিলেন, এমন করবি তো কাজে জবাব দে। সন্ন্যাসী হতে চাস তো সন্ন্যাসীই হয়ে যা। আর নয় তো আবার বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার কর, কাজকর্ম কর।

সনাতন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বড়বাবু বলিলেন, কি বলছিস?

নখ দিয়া দেওয়াল খুঁটিতে খুঁটিতে সনাতন বলিল, আজ্ঞে—

—বুঝলি আমার কথা?

ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া সনাতন আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। একেবারে সটান অন্দরে আসিয়া বড়গিন্নীর সম্মুখে জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

—দু কুড়ি টাকা আপনি দ্যান। নইলে বড়বাবুকে বলে দ্যান।

বড়গিন্নী সবিস্ময়ে বলিলেন, দু কুড়ি টাকা নিয়ে কি করবি তুই? তীর্থ যাবি নাকি?

সনাতন মাথা চুলকাইয়া বলিল, বড়বাবু বলছেন বিয়ে করতে।

--বিয়ে করতে!—সস্নেহে হাসিয়া বড়গিন্নী বলিলেন, ভালোই বলেছেন রে! মরণকে ঠেকিয়ে তো সংসার করা যায় না বাবা, তার জন্যে বিবাগী হলে কি চলে।

পরম আগ্রহে সম্মতি জানাইয়া সনাতন বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

খুশী হইয়াই গিন্নী বলিলেন, বেশ, কনে ঠিক কর, টাকার জন্যে বলব আমি বড়বাবুকে।

—আজ্ঞে, কনে আমি ঠিক করেছি, টাকা হলেই হয়।

বাড়ির মেয়েরা বিস্ময়ে চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া কলরব করিয়া উঠিল, ও মাগো!

—কোথায় রে, কোথায়? কবে ঠিক করলি রে এর মধ্যে?

—কেমন কনে রে? কত বড়? দেখতে কেমন?

সনাতন বসিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে পুলকিত লজ্জার সহিত সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিল।

মেয়েটির বাড়ি ক্রোশ খানেকের মধ্যেই—যুগলপুরে। অনেকদিন হইতেই সনাতন চেনে। হাটে সে নিয়মিত আসে। সনাতন বলিল, কনে আজ্ঞে ভারি সোন্দর। আর বয়েস—তা খানিক হবে বইকি।

সনাতন বর্ণনায় অতিরঞ্জন করে নাই। মেয়েটি সত্যই সুন্দর দেখিতে। বর্ণে সে গৌরী, মুখশ্রীতে লাবণ্যময়ী, কেবল চোখ দুইটি খয়রা রঙের, গঠনে সে দীর্ঘাঙ্গী, বয়সে বাইশ চব্বিশ। সনাতন বৈরাগ্যের বশে মধ্যে মধ্যে নিখোঁজ হয় নাই, মেয়েটির প্রেমের আকর্ষণেই সেখানে ছুটিয়া গিয়া পড়িতেছিল। মেয়েটি সধবা। অনেক কাণ্ডের পর তাহার স্বামী দুই কুড়ি টাকার বিনিময়ে তাহাকে ছাড়পত্র দিতে রাজী হইয়াছে। সেদিন রাত্রে তাহাদের দুইজনকে একত্র পাকড়াও করিয়া সনাতনকে তাহারা দুরন্ত প্রহার দিয়াছিল। সনাতন

সে সব গ্রাহ্য করে নাই, মার খাইয়াও স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে ছেড়ে দিস তো দে, লইলে আমি নিয়ে পালাব। শুধো কেনে ওকে—উ-ও থাকবে না তোর কাছে।

মেয়েটার লজ্জার আবরণ নিঃশেষে খসিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর মার খাইয়া সে উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সেও বলিয়াছিল, আজই যাব আমি উয়ার সঙ্গে।

শেষ পর্যন্ত কুড়ি টাকায় সনাতন রফা করিয়া আসিয়াছে।

আবার সনাতন ঘর বাঁধিল, সংসার পাতিল। নিজের ঘর ছাড়িয়া সে নূতন ঘর তৈরি করিল বাবুদের গোয়াল-বাড়ির পাশেই। পুরানো বাড়িতে নন্দ ঘুরিয়া বেড়ায়। কোনোদিন রাত্রে কড়িকাঠে বসিয়া সে যদি তালগাছের মত মোটা পা বাহির করিয়া ঘুমন্ত অবস্থায় বুকে চাপাইয়া দেয়, তবে—? ঝাঁকড়া চুল ভর্তি মাথাটা বারবার নাড়িয়া সনাতন আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠে। তাই সে নূতন করিয়া ঘর গড়িল—সে ঘরে নন্দর এতটুকু জিনিসও সে রাখিল না, আপনার সামগ্রীর লোভে নন্দ যে নিশ্চয় এখানে আসিয়া হাজির হইবে!

নূতন বউয়ের নামটিও বড় ভালো, পেরভাতী অর্থাৎ প্রভাতী। মেয়েটি কিন্তু বিলাসিনী। চলনে-বলনে, আচারে-রুচিতে, পোশাকে-প্রসাধনে সনাতনের বিপরীত। মেয়েটি চলে হেলিয়া দুলিয়া, কথা কহিতে হাসিয়া ভাঙিয়া পড়ে, পোড়ানো সামগ্রী তাহার মুখে রোচে না, সে পান খায়, দোক্তা খায়, কাপড় পরে পা ঢাকিয়া, পরিপাটি ছাঁদে চুল বাঁধে বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মত 'আল্‌বোট' কাটিয়া। অথচ সনাতন ভালোবাসে পোড়ানো জিনিস খাইতে, সে ভালোবাসে খাটো মোটা কাপড় আঁটসাঁট করিয়া পরিতে, রুক্ষ চুল টানিয়া মাথার উপর ঝুঁটি-খোঁপা তাহার সবচেয়ে ভালো লাগে। নন্দর মত গোবর প্রভাতী কুড়াইবে না। ছেলের ঝি হইতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু বাবুদের বাড়িতে শিশু ছেলেও কেহ নাই।

তবুও সনাতন অবনত মস্তকে মন্ত্রমুগ্ধের মত পেরভাতীর আনুগত্য স্বীকার করিল। প্রভাতীর মনোরঞ্জনের জন্য এখানে ওখানে ঋণ করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে মনিব-বাড়ির কাজের উপর আর একটা কাজ লইল; ও পাড়ার হীরু চাটুজ্জে বিদেশে চাকরি করে, এবার সে মেয়েছেলে লইয়া গিয়াছে, রাত্রে তাহার বাড়িতে পাহারা দিবার কাজ লইল সনাতন। প্রভাতীকে সঙ্গে লইয়া সে সন্ধ্যার পর চাটুজ্জে-বাড়ি যাইত। আবার ভোরবেলায় উঠিয়া চলিয়া আসিত।

মাস কয়েক পর—

সেদিন পেরভাতী কোনো ভদ্রলোকের বধূ বা কন্যার পরনের শাড়ি দেখিয়া বলিল, ওই শাড়ি আমার চাই।

সনাতন মাথায় হাত দিয়া বসিল। মনিব-বাড়িতে বিবাহের ঋণ জমিয়া আছে, এখানে-ওখানে ঋণ করিয়াছে সেও শোধ হয় নাই, এখন টাকা কোথায় মিলিবে? ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আসিল ছোটবাবু অর্থাৎ শিবনাথের বাপের কাছে। ছোটবাবুকে নন্দ ও সে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, আর ছোটবাবু এখনও পুরা বাবু হইয়া উঠে নাই, জুতা মারিবার বয়স হয় নাই; সনাতন ছোটবাবুর পায়ের কাছে বসিয়া পা টিপিতে টিপিতে সলজ্জভাবেই কথাটা ব্যক্ত করিল।

ছোটবাবুও একটু লজ্জিত হইলেন, টাকা তো আমার কাছে নেই সনাতন।

—গিন্নীমাকে চাও। লয়তো বউরানীর কাছে লাও। আমাকে কিন্তুক দিতে হবে ছোটবাবু। ছোটবাবুর তখন বিবাহ হইয়াছে, দশ-এগারো বছরের বধূ।

—আচ্ছা কাল বলব তোকে।

সনাতন খুশী হইয়া আসিয়া পেরভাতীকে বলিল, কাল।

পরদিন সকালেই ছোটবাবু টাকা লইয়া গিয়া অবাক হইয়া গেলেন। সনাতন বসিয়া আছে, তাহার সে মূর্তি অদ্ভুত। চোখ দুইটা রাঙা, মুখখানা ভীষণ আর প্রভাতী দাওয়ার উপর পড়িয়া আছে উপুড় হইয়া অসম্বৃত বেশে অনাবৃত গৌরবর্ণ পিঠখানায় প্রহার-চিহ্ন রক্তমুখী হইয়া ফুটিয়াছে।

ছোটবাবু প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে সনাতন?

সনাতন গর্জন করিয়া উঠিল, আজ আধ-মরা করে ছেড়েছি, একদিন কিন্তুক নিদ্দম মেরে ফেলাব ছোটবাবু।

প্রভাতীর পিঠের প্রহারচিহ্নগুলি দেখিয়া ছোটবাবু সনাতনকেই তিরস্কার করিলেন, ছিঃ, এমন করেই কি মারে রে!

প্রভাতী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, সনাতন গর্জন করিয়া বলিল, রেতের বেলায় চাটুজ্জের বাড়িতে আমাকে একখানা বস্তা দিয়ে বলে কি, বাখার থেকে ধান বার করে লে। আমি চুরি করব ছোটবাবু!

ছোটবাবুর মনে পড়িল ছেলেবেলার কথা। তাঁহাদের বাড়ির আমগাছটায় আম পাকিত সকল গাছের আগে। যতটি আম গাছ হইতে পড়িত সনাতন কুড়াইয়া বাড়িতে দিয়া আসিত, কখনও তিনি সনাতনকে আম কুড়াইয়া লইয়া

খাইতে দেখেন নাই। একবার তিনি চাহিয়াছিলেন একটা আম। সনাতন বলিয়াছিল, বাড়িতে লেবা।

ছোটবাবু কাপড়ের টাকা দিতে গেলে সনাতন লইল, বলিল, এক ছুঁচ ওকে আমি দোব না।

প্রভাতীও সহ্য করিবার মেয়ে নয়; মাস খানেক পরে সে পলাইয়া গেল বাবুদের বাড়ির চাপরাসীটার সঙ্গে—সনাতনের যথাসর্বস্ব লইয়া নিরুদ্দেশ হইল। শুধু তাই নয়, সনাতনকে পাওয়া গেল আহত রক্তাক্ত অবস্থায়। বঁটির একটা কোপ তাহার ঘাড়ে বসাইয়া দিয়াছিল। দশ দিন অচেতন অবস্থায় থাকিয়া সনাতন বাঁচিল। সে দশ দিন অচেতন সনাতনের কি চীৎকার!

নিশীথরাত্রে ঘুমন্ত মানুষ শিহরিয়া জাগিয়া উঠিয়া শুনিত, সনাতন যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে—আঁ—আঁ—আঁ—।

দশ দিন পর চেতনা পাইয়া সনাতন বড়বাবুকে সম্মুখে দেখিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ওগো বড়বাবু গো! আমি আর বাঁচব না গো!

তাহার সে কাতরতায় বড়বাবুও বিচলিত হইলেন, সনাতন তাঁহাকে বাঘের মত ভয় করে, আজ সে তাঁহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে একান্ত আপন জনের মত।

ছোটবাবুকে সে বলিল, বাঁচি তো আর উ মেয়ের মুখ দেখব না ছোটবাবু।

সনাতন বাঁচিল।

সনাতন বাঁচিল এবং মাসখানেক না যাইতেই আবার বিবাহ করিল। অত্যন্ত কুৎসিতদর্শনা একটা মেয়ে। অতুল স্বাস্থ্য এবং আকারে সে সনাতনেরই যোগ্যা। কর্তাবাবু সনাতনের নাম দিয়াছিলেন—অসুর, এবার ছোটবাবু সনাতনের নূতন বধূর নাম দিলেন—হিড়িম্বা।

সনাতন অতি সলজ্জভাবে পুলকিত হইয়া হাসিল।

নূতন বধূটিও হাসিল—হি হি করিয়া হাসিল—নির্বোধের মত হাসি দেখিয়া ছোটবাবুর গা ঘিনঘিন করিয়া উঠিল—হাসির সঙ্গে মেয়েটার মুখ দিয়া লালা গড়াইয়া পড়ে। কিন্তু হিড়িম্বা অদ্ভুত, কিছু দিনের মধ্যেই সে সনাতনকে ঠাকুর করিয়া তুলিল। সনাতনকে সে সকালবেলায় গোয়াল পরিষ্কার করিতে, গোবর ঘাঁটিতে দেয় না, নিজেই সে গোবর পরিষ্কার করে, নন্দর মত সেও ঝুড়ি লইয়া সনাতনের সঙ্গে মাঠে যায়, সেখানে সনাতন ঘুমায়—একা হিড়িম্বা গরু-মহিষ আগলায়, গোবর কুড়ায়, কুটিকাঠি সংগ্রহ করে জ্বালানী কাঠ জড়ো

করে। জ্বালানী কাঠের জন্য অবলীলাক্রমে সে তালগাছে উঠিয়া যায়। কুচি-কাঠি বিক্রি করিয়া সে পয়সা আনে। বাড়িতে ঘুঁটে দিয়া—ঘুঁটে হইতেও মাসে এক টাকা দেড় টাকা হয়।

সনাতনের অদৃষ্ট! এই হিড়িম্বাও তাহার অদৃষ্টে সহ্য হইল না; অদৃষ্টের তাড়নায় সে নিজেই একদিন দুর্দান্ত প্রহার দিয়া শেষে গলায় হাত দিয়া হিড়িম্বাকে বাহির করিয়া দিল।

হিড়িম্বার সে কি কান্না!

ছোটবাবু মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হিতে বিপরীত হইয়া গেল।

সনাতন বলিল, সন্দেশের রস রাক্ষুসী চুষে মেরে দিলে!

সনাতন কয়েকটা রসগোল্লা কিনিয়া আনিয়াছিল, হিড়িম্বা লোভের বশে গোপনে রসগোল্লাগুলি চুষিয়া খাইতেছিল, সনাতন সেটা দেখিয়া ফেলিয়াছে।

ছোটবাবু হাসিয়া ফেলিলেন।

সনাতন বলিল, ভাত-ডাল যা হয় ঘরে আগে-ভাগে চুরি করে খায়! মারের চোটে আজ নিজেই বলেছে।

ছোটবাবু বলিলেন, আচ্ছা, আর খাবে না।

তবুও সনাতন অটল। বলিল, উওর এত বড় বাড়, আমাকে 'মর' বলে! আমি মরব! আমি মরে যাব ছোটবাবু!

ছোটবাবু হাসিলেন, আবার খানিকটা বিরক্তও হইলেন।—'মর' বললেই কি মানুষ মরে সনাতন?

বার বার ঘাড় নাড়িয়া সনাতন তবুও বলিল, আজ্ঞে না। আমাকে 'মর' বললে উ!

এবার ধমক দিয়া ছোটবাবু বলিলেন, 'মর' বললে তো হল কি? তুই অমর নাকি? মরবি না তুই?

ছোটবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া সনাতন বলিল, আপুনি আমাকে 'মর' বলছ ছোটবাবু!

সে এতদিনের মনিব-বাড়ির কাজে জবাব দিয়া সেই দিনই কোথায় চলিয়া গেল।

ফিরিল সে দীর্ঘদিন পর। আজ হইতে বৎসর খানেক আগে। তখনও সে সমর্থ, এত বড় দেহ, আশির উপর বয়সেও প্রায় সোজাই আছে; অল্প একটু নমিত হইয়াছে মাত্র, আর চলিবার গতি মন্থর হইয়াছে।

এক মাথা পাকা চুল, প্রকাণ্ড বড় পাকা গোঁফ, স্থবির অসুরের মত দেহ, সনাতন একেবারে মনিব-বাড়ির অন্দরে আসিয়া ঢুকিয়াছিল। কাছারিতে যাইতে সাহস হয় নাই। এই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির কি কৈফিয়ৎ দিবে বড়বাবুর কাছে! ছোটবাবুর সম্মুখে মুখ দেখাইবে কি করিয়া!

শিবনাথের বধূ শিবনাথের ভগ্নী সকলে বিস্ময়ে চকিত হইয়া উঠিল। সনাতনও হতভম্ব হইয়া গেল। কাহাকেও সে চেনে না, ইহারা সব কে?

শিবনাথের মা আসিয়া, অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি সনাতন? বালিকা-বয়সে তিনি তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তিনি এ বাড়িতে আসিবার পর, বৎসর দুয়েক সনাতন এ বাড়িতে ছিল; কিন্তু তবু তিনি তাহাকে চিনিলেন, সনাতনের আকৃতির জন্য।

সনাতন একমুখ হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকরুন। একবার গিন্নীমাকে আর বউ-ঠাকরুনকে ডেকে দ্যান তো। বলেন—সনাতন আইচে।

শিবনাথের মা অল্প হাসিয়া বলিলেন, আমিই বউ-ঠাকরুন সনাতন। :গিন্নীমা তো নেই।

সনাতন নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই প্রৌঢ় বিধবা—তাহার ছোটবাবুর কচি বউটি! গিন্নীমা নাই! তবে কি, তবে কি—! সে দ্রুত উঠিয়া কাছারি-বাড়িতে আসিল।

শিবনাথ নূতন, নায়েব নূতন, চাপরাসী নূতন, চাকর নূতন—সকলে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কে তুমি?

সনাতন চারিদিক খুঁজিতেছিল। কোনো উত্তরই সে দিল না। উত্তর দিলেন শিবনাথের মা। তিনি তাহার পিছন পিছন আসিয়াছিলেন। সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, শিবু, এই সনাতন।—সনাতনকে বলিলেন, সনাতন, এই আমার ছেলে।

সনাতন এতক্ষণে প্রশ্ন করিল, বড়বাবু নাই? ছোটবাবু নাই?

গোয়াল-বাড়ির একখানা খালি ঘরে সনাতন আশ্রয় লইল। শিবনাথের বাড়িতেই অন্নের বরাদ্দ করিয়া দিলেন শিবনাথের মা। প্রথম দিনই পাচিকা ভাত দিয়া গালে হাত দিল। সনাতন ভাত লইল তিন বার। শিবনাথের মা হাসিলেন। সনাতনের আহার এখনও প্রায় সমানই আছে। খাইতে বসিলে শিবনাথের মা প্রশ্ন করিলেন, কোথায় ছিলে সনাতন?

প্রকাণ্ড হাতে বিপুল এক গ্রাস ভাত তুলিয়া সনাতন বলিল, দু-তিন জায়গায় মা।

—ছেলেপুলে কি ? ঘরকন্না করেছ ?

বাঁ হাতে মাথা চুলকাইয়া সনাতন বলিল, ছেলে অ্যানেকগুলান মা। তিনটে পরিবারের ছেলে।

—আরও তিনবার বিয়ে করেছিলে !

মেয়েরা সকৌতুকে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সনাতন বলিল, হ্যাঁ মা। তা সে সব চুকিয়ে দিয়েছি। ছাড়পত্র করে সব তাড়িয়ে দিয়েছি।

সনাতনের এখানকার ইতিহাস এ বাড়ির সকলেই জানে ; সনাতন এ বাড়ির কাহিনীর মানুষ। শিবনাথের বোন মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিয়া বলিল, এইবার আবার ঘর-দোর পাতাও সনাতন। আপন ভিটেতে ঘর কর, বিয়ে কর।

সনাতন নির্বোধের মত খানিক হাসিয়া বলিল, আর লয় মা।—সে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

—উদের তাড়িয়ে দিলে কেন বাবা ?

আর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সনাতন বলিল, সবাই মরণ তাকায় মা। মর, মর, মর—ছাড়া বাক্যি নাই, তিনটে বউয়েরই ওই এক রা।

সনাতন তৃতীয় বারের ভাতটা আর শেষ করিতে পারিল না।

ভাতের অপচয়ে লজ্জিত হইয়া সে বলিল, খেতে পারি না। ই ভাত কটা আমি খাই। তা আজ লারলাম।

সনাতন বাড়িতে থাকিলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত ; মধ্যে মধ্যে গ্রাম প্রান্তর ঘুরিয়া আসিত।

উদাসীর ডাঙায় দীর্ঘ দিন ঘুরিয়াও সে কালকুটিকে দেখিতে পাইল না।

মধ্যে মধ্যে ডাক্তারখানায় গিয়া ওষুধ লইয়া আসিত। তাহার ক্ষুধা হয় না।

আজ কয়েকদিন সনাতন বিছানাতেই শুইয়া আছে। খাবার পাঠাইয়া দিলে অল্প-স্বল্প খায়, না পাইলেও চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। অভাবও বোধ করে না।

শিবনাথের মা এ অঞ্চলের প্রবীণ বিচক্ষণ ডাক্তার ননীবাবুকে ডাকাইয়াছিলেন। ননীবাবু হাসিয়া বলিলেন, কালরোগ।

শিবনাথ দেখিতে গেল।

কঙ্কালসার সনাতন জীর্ণ পরিত্যক্ত ঐতিহাসিক পাষাণ-দুর্গের মত পড়িয়া আছে। মোটা মোটা হাড়গুলা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সে দিগন্তের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চাহিয়া আছে। শিবনাথের মা সেখানে ছিলেন, তিনি ডাকিতেছিলেন—সনাতন ! সনাতন !

সনাতন যেন শুনিতে পাইতেছে না।

শিবনাথ কাছে আসিয়া কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া ডাকিল, সনাতন! সনাতন!

এবার সনাতনের দৃষ্টি ফিরিল, সে দৃষ্টি যেন কিছু খুঁজিতেছে, কিন্তু খুঁজিয়া পাইতেছে না।

সনাতন!

এবার দৃষ্টি শিবনাথের দিকে রাখিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, দেখতে পেছি না। সে হাতের ক্ষীণ ইঙ্গিতে ডাকিল, আরও কাছে এস। শিবনাথ সরিয়া গেল।

—খোকাবাবু!

—হ্যাঁ। কেমন আছ?

—ভালো আছি।

—কি কষ্ট হচ্ছে তোমার?

ঘাড় নাড়িয়া সনাতন জানাইল, কিছু না। তারপর ক্ষীণস্বরে বলিল, দেখতে পেছি না ভালো, শুনতি পেছি না।

শিবনাথের মা এবার বলিলেন, ভয় নেই সনাতন। সেখানে তোমার নন্দ আছে, কর্তাবাবু আছেন, বড়বাবু আছেন, গিন্নীমা আছেন, ছোটবাবু আছেন—

সনাতন কাহারও সন্ধানে কোনো দিকে চাহিল না—শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, অন্নকার!

অর্থাৎ, অন্ধকার।

ঘাসের ফুল

রাণীগঞ্জ-টাইলে ছাওয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বাংলোটা কলিয়ারীর আপিস। আপিসের উত্তরেই পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা খড়ে-ছাওয়া বাংলোটা কলিয়ারীর বাবুদের মেস। বাংলো দুটোর কোলে প্রকাণ্ড বড় খোলা মাঠখানায় অতুল পায়চারি করিতেছিল। চারিদিক অন্ধকার। 'পিট' গুলার মুখে, বয়লারগুলোর চিমনীর মাথায় শুধু আগুনের শিখা হু হু করিতেছে। আর এখানে ওখানে কুলিদের কেরোসিনের কুপি খদ্যোতের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মেসের একটা ঘরে কুলি-রিক্রুটার চন্দ্রকান্ত হুঁকা টানিতে টানিতে সার্ভেয়ারকে বলিতেছিল—আমার ভাই ষোল আনার মধ্যে সাড়ে পনের আনা মিছে কথা—সে আমি মিছে কথা বলব না।

বড় টেবিলটার উপরে খনির ম্যাপখানায় নূতন একটা লাইন টানিতে টানিতে সার্ভেয়ার উত্তর দিল—হুঁ—তা নইলে চাকরি থাকবে কেন? আলোটা একটু বাড়িয়ে দেন তো চন্দ্রবাবু। চশমা নইলে আর চলছে না।

পাশের ঘরে লেবার-রেজিস্ট্রার সীতাপতি আপন মনে একখানা ছবি আঁকিতেছিল। সম্মুখে গম্ভীর ভাবে আর একজন বসিয়া আছে স্থাণুর মতো—চোখের পলক পর্যন্ত পড়ে না।

তার পাশের ঘরে বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার চশমা-চোখে স্ত্রীকে পত্র লিখিতেছিলেন—'এখানে ৺বৃষ্টি খুবই হইয়াছে। ওখানে ৺বৃষ্টির অবস্থা কিরূপ পত্রপাঠ জানাইবে। চাষ-আবাদের অবস্থা বুঝিয়া ধান্যগুলি ধার দিবার ব্যবস্থা করিবে।'

আর একখানা ঘরে লটারির টিকিট কেনা হইতেছিল। ম্যানেজারের নামে একখানা লটারীর টিকিট-বই আসিয়াছে—সেইখানা হেডক্লার্কবাবু লইয়া বিক্রয় করিতেছিলেন। আট আনা করিয়া টিকিটের দাম। প্রথম পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা। কালীপদ একটা ছদ্মনাম খুঁজিয়া সারা হইয়া গেল। হেডক্লার্কবাবু কলম ধরিয়া বসিয়াছিলেন—বলিলেন—কি নাম দেবে, বল হে কালীপদ?

কালীপদ বলিল—শ্রীবৎস—কি বলেন? ও নামে শনির দৃষ্টিও চলে না।...দাঁড়ান, দাঁড়ান,—মহালক্ষ্মী কেমন হবে বলুন দেখি?

একেবারে এ-পাশের ঘরে একটি সুরূপ তরুণ হারমোনিয়ম লইয়া গলা সাধিতেছিল—'কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী!' ছেলেটি কলিয়ারীর মালিকদের থিয়েটারে নায়িকা সাজে। এখানে চাকরিও তার সেই জন্য। বেতন বাইশ টাকা ছিল—এখন দুই টাকা কমিয়া হইয়াছে কুড়ি।

পাশের বারান্দায় স্টোরকিপার অমূল্য কুলিদের তেল মাপিতে মাপিতে বলিল—তুমি একটা যাত্রার দলে ঢুকে পড়, বুঝলে বিনোদ। মোটা মাইনে হবে। কেন কুড়ি টাকায় পড়ে আছ বল দেখি!—গান থামাইয়া বিনোদ বলিল—ভারি চুক হয়ে গেছে গুদোম-বাবু! সেবার বীণাপাণি অপেরা আমাকে সাধাসাধি করলে। বলে—পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনেতে তুমি ঢোক—তারপর ছ-মাস পরে পঞ্চাশ করে দেব। তিন বছরে একশ টাকা। তা যাত্রার দল বলে আর—!

অমূল্য বলিল—আমি একটা দোকান করব ভাই। বেগুনী-ফুলুরী কলাই-সেদ্ধ বুঝলে। বউ করে দেবে, একটা ছোঁড়াকে দিয়ে বিক্রী করাব। ভারি লাভ।

গুটিতিনেক ছেলেমেয়ে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বিনোদের বিছানায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। একটি মেয়ে বলিল—বাড়িতে গান করতে হবে বিনো-কাকা। চল, মা ডাকছে।

অপর মেয়েটি নাকিস্বুরে বলিল—ধরে নিয়ে যাব হঁ্যা।

ছোট ছেলেটি তখন হারমোনিয়মের রিড চাপিয়া ধরিয়া একটা বেস্থরের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। বিনোদ হাসিয়া বলিল—চল চল যাই। চিরুনীটা কোথায় রাখলেন গুদোমবাবু? আমার আবার ডিউটি আছে—তা চল, ছুখানা গান গেয়েই চলে আসব।

প্রথম মেয়েটি বলিল—বই নিয়ে যেতে বলেছে মা।

কুঠির মালিকদের কয়েকজন এখানে সপরিবারে বাস করেন। বিনোদকে মাঝে মাঝে বাসার ভিতর গান শুনাইতে হয়, রেলের বাবুদের লাইব্রেরী হইতে উপন্যাস আনিয়া যোগানোও তাহার একটা কাজ। নিজেই হারমোনিয়ামটা লইয়া বিনোদ চলিয়া গেল। গুদামবাবু বলিলেন—দেখলে হে বাবুর চুল আঁচড়ানো?

বিনুর ঘরের অংশীদার বিনোদের পরিত্যক্ত চিরুনীখানা লইয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিল—হুঁ।

তারপর আয়নাখানায় নানা ভঙ্গিতে মুখ দেখিয়া বলিল—বেশ আছে বাবা। আর থাকবে না-ই বা কেন বল? চেহারা ভালো, গলা ভালো।

স্টোরবাবু ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলেন—বই যোগায়—সেটা বল। আর মেঝেনগুলোকে দেখেছ! টাইমবাবু বলতে পাগল—

অতুল ভাবিতেছিল হেনরি ফোর্ড জীবন আরম্ভ করিয়াছিল কাঠের মিস্ত্রী রূপে—এডিসন নামে একটি ছেলে খবরের কাগজ বেচিত। অতুল এখানে আসিয়াছে দেড় শত মাইল পায়ে হাঁটিয়া পথে বর্ষার নদী—তখন ছকুল পাথার, সেই নদী সে সাঁতার দিয়া পার হইয়া আসিয়াছে। পারের পয়সা দিতে গেলে খাবারের পয়সার অভাব পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। আজ সে কলিয়ারীর ম্যানেজার হইতে চলিয়াছে। এক বৎসর পরে মাইনিং পরীক্ষা দিবে।

অদূরে একটা আলোর পিছনে ছুইজন বাবু আসিতেছিল। একজন উচ্চকণ্ঠে অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে। অতুল বুঝিল। ম্যানেজার আসিয়া বলিলেন—এই যে অতুলবাবু, আপনাকেই খুঁজছিলাম আমি। আজ খাদে বারুদ জ্বলে গেছে। ক্রমশঃই খাদ গরম হয়ে উঠছে—এখন ফায়ার না হয়।

অতুল মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—গান-পাউডার জ্বলে গেল?

ওভারম্যান খাটো মানুষ, কিন্তু শক্তিশালী দৃঢ়দেহ। সে কথা কয় যেন বক্তৃতা করে। হাত-পা নাড়িয়া অভিনয় করিয়া প্রত্যেক কথাটি বুঝাইয়া দেওয়া তাহার স্বভাব। সে বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে হঁ্যা। দক্ষিণ দিকের মেন গ্যালারীর পাশে

৫৮ নং সুঁদের মধ্যে দেওয়ালে হেই এতখানি এক চাঙড় কয়লা জমে আছে। ঠাণ্ডারাম সর্দার বললে—বাবু ওই কয়লাটা দেগে দি। টোটা তোয়ের করে ঠাণ্ডারামকে নিয়ে গেলাম দেখতে—বলি নিজের চোখে একবার দেখে দি। —হঠাৎ গুড়ি হইয়া ওভারম্যান বলিল ঠাণ্ডারাম বারুদের জায়গা নামিয়ে রেখে—আবার খাড়া হইয়া হাত তুলিয়া বলিল—আমাকে দেখাইছে—বলে বাবু—ঐ চাংটা—আর ইদিকে অমনি ফ্যাঁস করে নিয়ে নিয়েছে তখন। সঙ্গে সঙ্গে আলোয় একেবারে দিন দীপ্যমান!

একটু থামিয়া তাড়াতাড়ি হাত কয় পিছাইয়া গিয়া ওভারম্যান আবার আরম্ভ করিল—আমি তখন হঠতে লেগেছি। বুঝতে পেরেছি কিনা। ঠাণ্ডা বেটা কিন্তু হাঁ করে দাঁড়িয়ে।

হাঁ করিয়া বুদ্ধিহীনের অভিনয় করিয়া সে থামিল। তারপর আপনার বাঁ-হাতখানা খপ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল—খপ করে বেটার হাতটা ধরে হিড় হিড় করে আনলাম টেনে।

তারপর সে পাণিপথক্ষেত্রে বিজয়ী আমেদ শার মত গম্ভীর ভাবে নীরব হইল।

ম্যানেজারটি সাদাসিধা মানুষ—বুদ্ধির মত আকারেও স্থুল। ভদ্রলোক বলিলেন—কি করা যায় অতুলবাবু?

অতুল চিন্তা করিয়া বলিল—ও পিটটায় কাজ বন্ধ করে দিন।

ম্যানেজার বলিলেন—কিন্তু যদি ফায়ারই হয় ধর।

হাসিয়া অতুল বলিল—ফায়ার তো হবেই।

মহাচিন্তান্বিত ভাবে ম্যানেজার বলিলেন—তাহলে?

—সে আর আমরা কি করব? আপনি, এখানে যাঁরা মালিক আছেন তাঁদের জানান—আর হেড-আপিসেও টেলিগ্রাম করে দিন। তাহলেই খালাস।

ম্যানেজার বলিলেন—তাই তো হে—কলিয়ারীটা আমার নিজের হাতে তৈরি করা—

অতুল হাসিয়া বলিল—চললাম আমি তিন নম্বর পিটে। আমার ডিউটি আছে।

প্রকাণ্ড লোয়ার বিম—র‍্যাফটারে ছাঁদাছাঁদি করিয়া একটা অতিকায় কঙ্কালের মত গীয়ারহেডটা দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই তলে বিরাটকায় সাড়ে তিনশ ফুট গভীর একটা কুপ মাটির বুক ভেদ করিয়া নামিয়া গেছে। ওপাশে ইঞ্জিন শেড। তাহার পাশেই দুইটা বয়লারের বুকের ভিতর রাবণের চিতা

জ্বলিতেছে। ইঞ্জিন-শেডের বিপরীত দিকে আর একটি ছোট শেড। এটা পিট-ক্লার্কদের আপিস। একদিকে ছোট একখানি বেঞ্চ—মধ্যে একটি টেবিল—এপাশে একখানা চেয়ার। টেবিলের উপর একটা হ্যারিকেন চারিপাশের বিপুল অন্ধকারের মধ্যে অসহায় ভাবে জ্বলিতেছিল। শেডের বাহিরেই একটা লোহার ঠেঙোর উপরেই এক চাপ কয়লা দাউ দাউ করিয়া পুড়িতেছে।

সেই আগুনে সেঁকিয়া একটি কুলির মেয়ে তাহার ভিজা ঝুড়িটা শুকাইয়া লইতেছিল। চেয়ারে অতুল চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ও-পাশের বেঞ্চে বিনোদ, সেই ছেলেটি, একখানা খাতায় কুলিদের উঠা-নামার হিসাব করিতেছিল। ওই ওর কাজ। লেবার-রেজিস্ট্রার পদবী। বিনুর পাশে বসিয়াছিল শ্যামাপদ—দু-নম্বর ওভারম্যান। সে বলিয়া উঠিল—এই মাগী, ঝুড়িটো কি পোড়ায়ে দিবি না কি?

এদিকে পিটমাউথে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—ঘং-ঘং-ঘং। খাদের তল হইতে সঙ্কেত হইতেছে, লোক উঠিবে।

উপরের 'টালোয়ান' ঘণ্টার সঙ্কেতে উত্তর দিয়া হাঁকিল—হো—ই।—এ সঙ্কেত ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে।

বিপুল শব্দে ইঞ্জিন গতিশীল হইয়া উঠিল। ইঞ্জিনের গতির সঙ্গে গীয়ারহেডের চাকা বাহিয়া মোটা তারের দড়ায় ঝুলানো একটা লোহার খাঁচা সন সন শব্দে অন্ধকূপের গর্ভে নামিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে পাশের আর একটা দড়া উপরে উঠিয়া আসিতেছিল। সেই দড়া বাহিয়া একটা কেজ পিঠের মুখে সশব্দে আসিয়া লাগিল।

খাঁচার মধ্যে চারজন লোক।

বিনু প্রশ্ন করিল—কারা-বটিস রে?

উত্তর হইল—আমরা গো—ভক্তার দল। নারায়ণ ভক্তা।

খাঁচার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল—জলসিক্ত কয়লার কালিতে সর্বাঙ্গঢাকা বীভৎস কালো মূর্তি। জ্বলন্ত কয়লার আলোয় মনে হয় যেন প্রেত! নগ্নপ্রায়—পরনে শুধু একটা কৌপীন, কাঁধে গাঁইতি, হাতে একটা কেরোসিনের ডিবিয়া। মেয়েদের হাতে ঝুড়ি। কয়লার কালিতে কালো দেহের:মধ্যে সাদা দুইটা চোখ দেখিয়া ভয় হয়। কথা কহিলে দেখা যায় সাদা দাঁত। শেডের বাহিরে গিয়া তাহারা উপরের দিকে মুখ তুলিয়া দাঁড়ায়। অতুল ভাবিতেছিল ম্যানেজারশিপ পরীক্ষায় সে প্রথম হইবে। তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। খনি-বিজ্ঞান তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছে। এই যে আগুন—পৃথিবীর বুকের ভিতর লক্ষ লক্ষ টন কয়লার স্তরের মধ্যে যে বিরাট অগ্নিদাহ—যে আগুন

জলে নিবিবে না—সে আগুন নিবাইবার উপায় সে আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু কেন সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া পরের উপকার করিতে যাইবে! তাহার জীবনের মূল্য পঞ্চাশ টাকা নয়।

ঘং—ঘং—!

আবার সঙ্কেত হইল। একটা কেজ নামিয়া গেল, একটা উঠিয়া আসিয়া পিটের মুখে দাঁড়াইল—ঘটাং! কেজটার মধ্যে কয়লা বোঝাই টব-গাড়ি—লেবার-রেজিস্ট্রার প্রশ্ন করিল, কি বটে, কয়লা না স্লাক?

ওভারম্যান একজন কুলিকে বলিতেছিল—ওরে ইয়া—কি নাম তোর? গুরুচরণা—শুন শুন ইধারে শুন।

—হোই—হুঁসিয়ার!—ছোট লাইনের উপর কয়লাভর্তি টবগাড়িটা ঠেলিয়া দিয়া টালোয়ান হাঁকিয়া উঠিল। সশব্দে গাড়িটা লাইন বহিয়া চলিয়া গেল।

ওদিকে পিটের মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিতেছিল। কেজ ওঠে-নামে। গুরুচরণ বলিতেছিল—আমাকে খাদে নামতে বলছেন না-কি?

ওভারম্যান বিরক্তিভরে বলিল—না—বলছি গুরুপুত্তুর আমার হেঁথাকে বসেন দয়া করে—আমি পা পূজা করব।

লেবার-রেজিস্ট্রার বিনু খাতা লিখিতে লিখিতে গুনগুন করিয়া গান করিতেছিল—'ওহে সুন্দর তুমি এসেছিলে আজি প্রাতে।'

অতুল মনে মনে একটু হাসিল। সত্যই বেশ আছে ছেলেটি, বাড়িতে মায়ের ছেঁড়া কাপড়ে হয়ত চোখের জল মুছিবার স্থান নাই—আর ও পোশাক পরিয়া রানী সাজে। দুই টাকা মাইনে ওর কাটা যায়—আর ও বাড়ির ভিতর গান শুনাইয়া কৃতার্থ হইয়া যায়। কয়লার হিসাব লিখিতে ও গায়, 'সুন্দর তুমি!...'

নীচে খাদের তলদেশ হইতে অন্ধকূপ বাহিয়া অতি ক্ষীণ মানুষের সাড়া ভাসিয়া আসিল।

ওভারম্যান বলিল—হাঁকা-হাঁকা-হাঁকা!

পিটের মুখে টালোয়ান দুইজন একটু ঝুঁকিয়া সাড়া দিল—ও--ই!

অতুল একটু অন্যমস্ক হইয়া চারিপাশের অন্ধকারের দিকে চাহিল। চারিদিকের কলিয়ারীতে কয়লার চাপ গভীর অন্ধকারে রাত্রির অঙ্গে দূষিত ক্ষতের মত ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বলিতেছে।

ঘং—ঘং—ঘং।

এবার উঠিয়া আসিল আর কয়েকজন কুলি। বিলাসপুর অঞ্চলের অধিবাসী

মেয়েদের অঙ্গে মোটা মোটা রূপদস্তার গহনা—হাতে তাগা, গলায় হাঁসুলি, পায়ে বাঁক, নাকে বেসর, কব্জীতে একহাত কাঁসার চুড়ি।

আবার খানিকটা বিরাম। ইঞ্জিন স্তব্ধ, কেজটা নিথরভাবে ঝুলিতেছে। শুধু বয়লারটা স্টীমের শক্তিতে কাঁপে—সে কম্পনের আঘাত বায়ুস্তর বহিয়া শেডের খাপরার চালে আসিয়া চালের মধ্যেও কম্পন তোলে। চালের খাপরাগুলা কাঁপে—ছোট একটা জানালা—সেটাও ভূমিকম্প-বিক্ষুব্ধের মত থরথর করিয়া কাঁপে। অবসর পাইয়া কেজম্যান, টালোয়ান কড়ি গুনিয়া রেজিং-এর হিসাব করে।

যেখানে লোহার ঠেঙোটায় কয়লার চাপ জ্বলিতেছিল সেখানে কুলিরা দুই-চারিজন করিয়া আসিয়া জমিতেছিল। ইহারা এইবার খাদের নীচে নামিবে। একটা কেরোসিনের ডিবের আলোতে একটা তরুণী বিড়ি ধরাইয়া দপ করিয়া আলোটা নিবাইয়া দিল। সে বলিল—দে, নামাই দে বাবু। ক-ত বসে রইব?

অতুল চিন্তা করে, এ ওদের নেশা—না, ক্ষুধার প্রেরণা?

বিন্নু বলিল—এখন খাদে গিয়ে তো ঘুমুবি। তারপর সেই রাতে কাজে লাগবি। ঘরে ঘুমুলেই তো পারিস।

তরুণীটি হাসিয়া বলিল—তবে তু একটি গান কর বাবু।

ওভারম্যান বলিল—তু নাচবি বল!

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—মালকাটা যে মারবে বাবু ধুমাধুম—গতর ভেঙে দিবে আমার। লইলে—

তারপর অকস্মাৎ এক বুড়িকে ধরিয়া বলে—এই দেখ, ই নাচবে। ইয়ার মালকাটা মরে গেইচে।

আশপাশের তরুণীর দল হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। ওপাশে জ্বলন্ত কয়লার ধারে বসিয়া একটা আঠারো-উনিশ বৎসরের ছেলে অকারণে জলন্ত চুল্লীটায় ঢেলা মারিতেছিল। দূরে এই কুঠিরই সাইডিং লাইনের উপর লোকোমোটিভের বাঁশী তীক্ষ্ণস্বরে বাজিয়া উঠে। অতুল পিছন ফিরিয়া চাহিল। দক্ষিণে বহুদূরে রেলওয়ে জংশনের ইয়ার্ডে অগণিত বিজলী বাতি সারি সারি স্থির খদ্যোতের মত জ্বলিতেছে। এ-পাশে বয়লারের চোঙ হইতে ঊর্ধ্বমুখী আগুনের শিখা সাপের জিভের মত লক লক করিতেছে। শিখার মাথায় অন্ধকারের চেয়েও গাঢ়-কৃষ্ণ রাশি রাশি ধোঁয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শিখার মাথায় হাজারে হাজারে আগুনের ফুলকি ফুলঝুরির মত ধোঁয়ার রাশি ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিতেছে, বুদ্বুদের মত নিবিয়া যাইতেছে।

এদিকে তিন মিনিট চার মিনিট অন্তর কেজ ওঠে, নামে। একদিকে দলে দলে কুলি ওঠে, অন্যদিকে দলে দলে নামে। মানুষের দুর্দান্তপনায় বোবা রাত্রি অস্থির হইয়া ওঠে।

বিনোদ চমকিয়া উঠিল—কে তাহাকে ছোট একটা ঢেলা ছুঁড়িয়া মারিয়াছে। লোহার কেজটা সন সন শব্দে নীচে নামিয়া গেল। কূপের মধ্যে খিল খিল হাসি অতি ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল।

রাত্রি প্রগাঢ় হইয়া আসিয়াছে।

খাদের মুখে সবারই চোখে ঘুম জড়াইয়া আসে। যন্ত্রগুলারও যেন ঘুম পাইয়াছে। কেজ—ইঞ্জিন স্তব্ধ—শুধু বয়লারের স্টীমের শব্দ ফ্যাঁস—ফ্যাঁ—স। কেজম্যানটাও বেদীর উপর বসিয়া ঢুলিতেছিল। ওভারম্যান দেওয়ালে ঠেস দিয়া গাঢ় নিদ্রামগ্ন—নিশ্বাস সশব্দ হইয়া উঠিয়াছে। বিনোদ টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া তন্দ্রামগ্ন।

অতুলের মাথাও ঝিম ঝিম করিতেছিল। হেনরি ফোর্ড কি এডিসনের নাম এখন মনের মধ্যে নাই। মনে পড়ে বাড়ির কথা—মাকে মনে পড়ে। ইচ্ছা হয়, ছুটি লইয়া একবার বাড়ি যাইতে হইবে। অতুল একটা বিড়ি ধরাইল। ধোঁয়াটা ছাড়িতে ছাড়িতে বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া মনে হইল ঠোঁটে যেন মৃদু হাসি ফুটিয়াছে। হয়ত স্বপ্ন দেখিতেছে।

মেসের কোলাহল নীরব। ক্যাশিয়ার হয়ত স্বপ্নের ঘোরে ক্যাশ মিলাইতেছে। ম্যানেজার হয়ত আগুনের স্বপ্ন দেখিতেছে। কালীপদ হয়ত পাঁচ হাজার টাকার প্রাইজটার খরচের বিলি ব্যবস্থা করিতেছে।

ঘং—ঘং—ঘং। সঙ্কেতের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

কলিয়ারীর চৌকিদার এক চোখ কানা সেমরা হাঁক দিয়া চলিয়াছে—হো—হো—ও—হো।

টালোয়ান বা কেজম্যান সজাগ হইয়া পিটের মুখে গিয়া সঙ্কেত করিয়া ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে হাঁকিল। ইঞ্জিন চলিতে আরম্ভ করিল।

ওভারম্যানেরও ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল—সে তন্দ্রারক্ত চোখে বলিল—চাকরে আর কুকুরে সমান। চাকরি মানুষে করে?

বিনোদও কখন সোজা হইয়া বসিয়াছে—সে মেসের নিস্তব্ধতার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—এরা বেশ ঘুমুচ্ছে, নয়?

কেহ কোনো উত্তর দিবার পূর্বেই সশব্দে কেজটা আসিয়া পিটের মুখে আবদ্ধ হইয়া গেল। কেজ হইতে বাহির হইয়া আসিল পিটক্লার্ক বাবু।

সে বলিল—খাদের অবস্থা বড় খারাপ অতুলবাবু। বড় গরম হয়ে উঠেছে খাদ

অতুল বলিল—সে আর আমি কি করব ?

—খাদে মালকাটারা টিকতে পারছে না।

অতুল নির্বিকারভাবে বলিল—ম্যানেজারবাবুকে খবর দিচ্ছি।

—ওদিকে কটা সুঁদে তো ধোঁয়ায় ভর্তি—আর উত্তাপ কি ! ভেতরে কয়লাতে আগুন লেগেছে মনে হল।

অতুল বলিল—সেগুলো বাদ দিতে বলেছি।

—হ্যাঁ, সেগুলো বাদই আছে। কিন্তু ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে মনে হচ্ছে যে ! একবার নীচে যেতে হবে মশায়। এ সব তো আমার ডিউটি নয় !

অতুল হাসিয়া বলিল—বেশ আমি নীচে যাচ্ছি। আপনি আর ওভারম্যান-বাবু বরং ম্যানেজারকে সব জানিয়ে আসুন। টালোয়ান, ঘণ্টা দাও নীচে।

গ্যাস বাতিটা জ্বালিয়া লইয়া সে কেজের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল।

উপরের শব্দ পিছনে ফেলিয়া অতল গহ্বরের মধ্যে কেজটা সন সন শব্দে নীচে নামিয়া চলিয়াছিল। পিটের গাঁথনি দ্রুতবেগে চলিয়াছে। মাথার মধ্যে কেমন একটা অনুভূতি রন রন করিয়া উঠিল। প্রথমদিনের কথা মনে করিয়া অতুল একটু হাসিল। এখন এ অনুভূতি তাহার অভ্যাস হইয়া গেছে। প্রথম তলার খাদটা পার হইয়া গেল। যে কেজটা উপরে উঠিতেছিল সেটা পার হইয়া গেল। কোন সাঁওতালের মেয়ে ওই কেজে বসিয়াই গান গাহিতে গাহিতে উপরে উঠিয়া গেল। সে সুর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে—ইঞ্জিনের শব্দও আর শোনা যায় না। দুই পাশে পিটের গা বহিয়া জল ঝরিতেছে। নীচের জল-ঝরার শব্দ ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া আসিল।

কেজের গতি মন্দ হইয়া আসিয়া সশব্দে কেজটা এইবার থামিয়া গেল।

উপরে পিটের মুখে ও-কেজটাও সঙ্গে সঙ্গে থামিল। বিনোদ স্তব্ধ ভাবে বসিয়াছিল—সে বলিল—উঠে এলি যে তুই ?

কেজ হইতে বাহির হইয়া আসিল সেই মেয়েটি। মেয়েটির নাম চুড়কী। চুড়কী বলিল—যে ধুঁয়ো আর গরম খাদে—পালায়ে এলম।—তারপর ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল—তুর গান শুনতে এলম।

বিনোদ বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল—ভাগ এখান থেকে।

শেডের কয়লার ধুলার উপরেই আঁচল বিছাইয়া চুড়কী শুইয়া পড়িল। বলিল—তুর ভারি গুমোর হইয়েছে, লয় গো বাবু !

বিনোদ কোনো উত্তর দিল না।

চুড়কী আপন মনেই বলিল—তুর চেয়ে আমি ভালো গান জানি। শুনবি? সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া সে নিজের ভাষায় গান আরম্ভ করিয়া দিল। গান করিয়া সে নীরব হইল। কিছুক্ষণ পর আবার সে বলিল—আকাশে হুই যি তারাটি দিপ দিপ করছে—ওইটি ভুল্কো তারা লয় গো বাবু?

বিনোদ তবুও কোনো উত্তর দিল না। চুড়কী এবার উঠিয়া আসিয়া তাহার কাছে বসিল, বলিল—একটি গান তু কেনে বলবি না বাবু? সোবাই তুর গান শুনে-ছে। আমাকে আমার মাঝিন শুনতে দেয় না। বলে কি জানিস—বলে—তু বাবুকে ভালো-বেসে ফেলবি।

বিনোদের ক্রমে যেন নেশা ধরিয়া আসিতেছিল। তাহার নবজাগ্রত যৌবন অহঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া বলিল—গান তো আমি তোকে শোনাব—তুই কি দিবি আমাকে?

চুড়কী যেন চিন্তিত হইয়া পড়িল। তারপর বলিল—একটি করে রাঙা জবাফুল তুকে আমি রোজ দিব।

বিনোদ বলিল—ধেৎ জবাফুল নিয়ে কি করব আমি?

—কেনে কানে পরবি, লয়ত চুলে গুঁজবি। তু আমাকে রোজ গান বলবি, হোক।

প্রকাণ্ড একটা টানেলের মধ্য দিয়া অতুল চলিয়াছিল। দুপাশে কয়লার নিবিড় কঠিন স্তর। গ্যাসের আলোকের প্রতিচ্ছটায় কয়লার তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম কোণগুলি ছুরির মত চকচক করিয়া উঠিতেছে। হাতের আলোটা তুলিয়া অতুল তাহাতে একটা বিড়ি ধরাইতে গেল। কিন্তু নিশ্বাসের ফুৎকারে আলোটা নিবিয়া গেল। অন্ধকার! কোথাও কোনো সাড়া নাই, শব্দ নাই। ধোঁয়ার উত্তাপে শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে কষ্ট বোধ হইতেছে। অদ্ভুত—বিচিত্র! পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া অতুল আবার আলোটা জ্বালিয়া ফেলিল। টানেলটা একটু বাঁকিয়া গিয়াছে। বাঁকটা ফিরিয়া দূরে ধোঁয়ার মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত শিখাহীন কয়টা দীপ্তি দেখা গেল। মানুষের কথার আওয়াজ পাওয়া যাইতেছিল—কে আবার বাঁশীও বাজাইতেছে। টানেলের পাশে পাশে কুলিরা দিব্য শয্যা বিছাইয়া দিয়াছে। দুটি ছেলে আপন মনে বাঁশী বাজাইতেছিল। কতগুলি মেয়ে গান করিতেছে। অতুল পশ্চিমের গ্যালারীর দিকে মোড় ফিরিল। এইদিকেই আগুন। উত্তাপ—ধোঁয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। অতুল দাঁড়াইল। তাহার জীবনের অনেক

দাম। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তোরা সব পিটের মুখের কাছে গিয়ে বস, ম্যানেজার এলে কাজে লাগবি।

অবস্থা দেখিয়া মালিক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ম্যানেজার ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন।

অতুল বলিল—আমি পারি। অবশ্য যে-জায়গায় আগুন লেগেছে সেখানটা চিরদিনের মত বাদ যাবে। কিন্তু বাকী খাদ নিরাপদ হবে।

মালিক তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—তাই করুন, যত খরচ হয়, কোনো ভাবনা নাই।

অতুল দ্বিধাহীন পরিষ্কারভাবে বলিল—কিন্তু কি স্বার্থে আমার জীবনবিপন্ন করে আপনার উপকার করব? আমার পারিশ্রমিক কি দেবেন বলুন।

মালিক অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে পড়িল, কয় বৎসর পূর্বের ছিন্নবাস উপবাসক্লিষ্ট একটি ছেলের কথা। সেদিন তিনি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে একটি চাকরি দিয়াছিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—এ-কথাটা আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করি নি অতুলবাবু।

অতুল হাসিয়া বলিল—বোধ হয় আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়ে চাকরি দিয়েছিলেন সেই কথা ভাবছেন। কিন্তু এই যে এতদিন আপনার এখানে রয়েছি বিনা পরিশ্রমে কোনোদিন তো আপনার কাছে বেতন আমি নিই নি। আমি পরিশ্রম করেছি তার পারিশ্রমিক আপনি দিয়েছেন। খাঁটি বিনিময়—দান নয়। আজ পর্যন্ত আমি আমার কর্তব্যে এক বিন্দু অবহেলা করি নি।

মালিক বলিল—কি চান আপনি?

অতুল বলিল—একজন বড় মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার যা নিত, তাই নেব আমি। অবশ্য আমার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাদ দেবেন তা থেকে।

মালিক রাজী হইলেন। বলিলেন—তাই পাবেন।

অতুল বলিল—কণ্ট্রাক্টটা ঠিক বিধান মতে হওয়া দরকার। কাগজে-কলমে একখানা চিঠি দিতে হবে আমাকে।

তাও হইয়া গেল। অতুল বলিল—ফায়ার ব্রিকস্ আর ফায়ার-ক্লে দরকার। যে গ্যালারীগুলোতে আগুন হয়েছে ওগুলো বন্ধ করে দিতে চাই আমি।

মালিক প্রশ্ন করিলেন—তাতে কি হবে?

অতুল হাসিয়া বলিল—তাতেই আগুন নিববে, স্যর। নইলে জলে খাদ ভর্তি করলেও নিববে না। যেদিন জল মেরে কাজ আরম্ভ করবেন, সেইদিনই আবার গ্যাস হতে শুরু করবে।

ইঞ্জিনটা আজ নিস্তব্ধ—খাদ বন্ধ। শুধু স্টীমের শব্দের সঙ্গে পাম্পিংএর শব্দ উঠিতেছিল অলসভাবে।

লরীর শব্দে কলিয়ারীটা মুখরিত হইয়া উঠিল। লরীতে জিনিসপত্র আসিতেছিল। বিপুল উদ্যমে দ্রুতবেগে উদ্যোগ আয়োজন শেষ হইয়া গেল। কিন্তু কাজ আরম্ভ করিয়া গোল বাধিল। কুলিরা কেহ নামিতে চায় না। কুলি-রিক্রুটার কুলিদের বড় প্রিয়। সে দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আজ্ঞে কেউ নামতে চাইছে না। বলছে বিনা দম লিয়ে আমরা মরে যাব বাবু। উ আমরা লারব। কতকগুলো কুলি কাল রাত্রে ভয়ে পা'লিয়ে গিয়েছে।

হাফপ্যাণ্টের পকেটে হাত দুইটা পুরিয়া দিয়া অতুল বলিল—দু-টাকা করে হাজরী দেব—চার ঘণ্টা কাজ। ফের আপনি গিয়ে বলুন।

রিক্রুটার চলিয়া গেল। অতুল নিজেই ফায়ার-ব্রিকস বোঝাই একটা টবগাড়ি পিট দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল—ইডিয়ট কোথাকার? টাকায় দুনিয়া কেনা যায়—মানুষ কি দুনিয়ার বাইরে?

তারপর নিজেই ঘণ্টার সঙ্কেত করিয়া হাঁকিল—হো—ই!

ইঞ্জিন চলিতে লাগিল।

মেসের ঘরে ঘরে বাবুদের ব্যস্ততার সীমা নাই। কার কখন ডাক পড়িবে কে জানে! কালীপদ লটারীর টিকিটের নম্বরটা ভুলিয়া গিয়াছে। সার্ভেয়ারবাবু প্ল্যান খুলিয়া বসিয়া আছেন। কতদূর গ্যাস আগাইয়া আসিল, দাগের পর দাগ টানিতেছেন। বিনুর হারমোনিয়ামটা বন্ধ। কেরানী সীতাপতির ছবির খাতা বাক্সে বন্ধ হইয়া আছে—রঙের বাটিগুলা শুকাইয়া গেছে। স্টোরবাবু জিনিস জমা করিয়া আর খরচ লিখিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। বিনোদ খাদে নামিবার পোশাক পরিতেছিল। ঘরের উত্তর দিকে খোলা মাঠ। উত্তর দিকের জানালা হইতে কে বলিল—একটি গান কর কেনে বাবু।

বিনোদ ফিরিয়া দেখিল চুড়কী। শুধু চুড়কী নয়, আরও দুই-তিনটি মেয়ে। বিনোদ বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই কুশ্রী কালো বর্বর মেয়েগুলার অত্যাচারে তাহার গ্লানির আর পরিসীমা নাই। নানা জনে নানা কথা বলে। নিজেরও ঘৃণা বোধ হয়। সে কহিল—যা যা বিরক্ত করিস না।

আর একটি মেয়ে বলিল—রাগ করছিস কেনে বাবু? একটি গান শুনায়ে দে, আমরা চলে যাই।

একজন বলিল—চুড়কী তুর লেগে জবাফুল এনেছে। দে গে চুড়কী—বাবুকে ফুলটি দে।

চুড়কী জবাফুলটি ছুঁড়িয়া বিনোদের বিছানায় ফেলিয়া দিয়া বলিল—লে বাবু কানে উটি পর। বড়া ভালো লাগবে তুকে।

বিনোদের ইচ্ছা করিল ফুলটাকে ছিঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু তাও সে পারিল না। এইটা তাহার একটা অক্ষমতা—সে তাহা জানে। রূঢ়ভাবে কাহাকেও আঘাত করিতে সে পারে না। বিব্রত হইয়া বিনোদ অনুরোধ করিয়া বলিল—পালা বাবু তোরা এখন। জালাস নে আমায়, খাদে যাব দেখছিস না।

আশ্চর্যান্বিত হইয়া চুড়কী বলিল—খাদ তো পুড়ে গেইছে তুদের।

—তোদের মাথা হয়েছে। তোরা কাজ করবি না—আর তোদের কাজ আমাদিগে করতে হচ্ছে।

চুড়কী বলিল—সত্যি বলছিস তু? খাদে গেলে মরে যাবি না?

আপন মনেই হাসিয়া বিনোদ বলিল—আচ্ছা বোকা জাত বটে বাবু।—মরে কেন যাবি? এই তো আমি চললাম। তোদিকে দু টাকা তিন টাকা করে হাজরি দেবে। আসবি তোরা?

একটি মেয়ে বলিল—হাঁ—বাবু সত্যি—তিন টাকা করে দিবি তুরা? আর মরে যাব নাই?

—না—না—না। কতবার বলব তোদের বল!

চুড়কী বলিল—তু থাকবি তো বাবু খাদে? না—আমাদিগে ফেলে দিয়ে পালায়ে আসবি?

—ভ্যালা বিপদ বাবা। ওরে পালিয়ে আসবার যো কি? চাকরি যাবে যে।

নিজেদের ভাষায় কি সব বলাবলি করিয়া চুড়কী বলিল—মালকাটাদিগে বলি গা বাবু। তুকে কিন্তুক গান শুনার্তে হবেক।

তারপর সঙ্গীদের পানে চাহিয়া বলিল—দেলা বোঁ! অর্থাৎ—চল চল।

বর্বর কালো মেয়েগুলি নাচিতে নাচিতে, ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর কয়জন মাঝি আসিয়া প্রশ্ন করিল—সত্যি তুরা তিন টাকা করে দিবি!

অতুল বলিল—তাই পাবি।

—হাঁ বাবু—তুরা আমাদের সাথে রইবি তো?

হাসিয়া অতুল বলিল—তোদের পাশে আমি দাঁড়িয়ে থাকব। তা ছাড়া রাজমিস্ত্রী থাকবে, অন্য বাবুরা থাকবে। তোরা একা থাকবি না।

—বেশ বাবু তবে আমরা নামব।· মাঝিনদের নামতে দিবি তো?

অতুল জানিত এই মাঝিনদের ফেলিয়া ইহারা কোথাও যায় না। রাজ-সিংহাসন পাইলেও না। সে হাসিয়া বলিল—বেশ তারাও নামবে।

ম্যানেজার ক্ষীণ ভাবে প্রতিবাদ করিলেন—সে যে বে-আইনী হবে অতুলবাবু।

কেজ-ব্রেকটা খুলিতে খুলিতে অতুল বলিল—নেসেসিটি হাজ নো ল। আইন মানতে গেলে খাদ পুড়তে দিতে হবে।

তারপর হাঁকিল—হো—ই—ইঁটার গাড়ি লাও।

অন্ধকার খাদের তলে মানুষের কর্মকোলাহলের আর বিরাম ছিল না। উপরেও তাই। খাদের মুখে খাজাঞ্চী বাক্স লইয়া বসিয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে কুলিদের বেতন মিটিয়া যাইতেছে। শেডের মধ্যে বসিয়া বৃদ্ধ ডাক্তার! গীয়ার-হেডের চাকা দুইটা অবিরাম ঘুরিতেছে। ঘং—ঘং—ঘং।

নীচে হইতে সঙ্কেত আসিতেছে লোক উঠিবে।

টালোয়ান ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে সঙ্গেত করিল, হো—ই। মিনিট দুই পরেই বিপুল শব্দ করিয়া কেজটা উপরে আসিয়া লাগিল। একজন বাবু একটি কুলি ও একজন কামিনকে লইয়া নামিল। মেয়েটির বুকে ব্যথা ধরিয়া শ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। অক্সিজেন-সিলিণ্ডারের চাবি আলগা করিয়া দিয়া টিউবটা মেয়েটির নাকের কাছে ধরিয়া ডাক্তার বলিল—ভয় নাই।

নীচে হইতে আবার সঙ্কেত আসিল—ঘং—ঘং—ঘং।

আবার লোক উঠিয়া আসিয়া বলিল, মাটি—মাটির গাড়ি জলদি চালাও।

মাটির গাড়ি লইয়া কেজ নামিল।

খাজাঞ্চী হিসাব করিতেছিল—তিন দু-গুনে ছয়—এই লে মাঝি, ছ-টাকা হাজরি তোদের।

খাদের নীচে লাইন ধরিয়া মাটি-বোঝাই টব গাড়িটা চলিতেছিল ধীরে ধীরে; একজন আসিয়া ঠেলিয়া সেটার গতি দ্রুত করিবার চেষ্টা করিল। আরও ভিতরে, যেখানটায় আগুন লাগিয়াছে সেখানে গ্যালারীর মুখে মুখে গাঁথনি উঠিতেছিল। বিশ-পঁচিশ মিনিট অন্তর লোক স্থান পরিবর্তন করিতেছে। গ্যাসে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, বিবর্ণ পাংশু মানুষগুলি টলিতে টলিতে অক্সিজেন-সিলিণ্ডারের ফনেলের মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল। অতুলের পিঠে ডুবুরীদের মত ছোট একটা অক্সিজেন-সিলিণ্ডার বাঁধা, তাহার দুইটা নল নাকের কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করিতেছে। সে অনবরত ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্যালারীর মুখে মুখে ফিরিতেছিল।

সে বলিল—জলদি—জলদি—আর মাত্র তিনটে গ্যালারী। চালাও ভাই, চালাও। দেরি হলে সব নষ্ট হবে। গ্যাস-সব ঐ গ্যালারী দিয়ে বেরুতে আরম্ভ করবে।

বিনোদ একটা গ্যালারীর মুখে দাঁড়াইয়াছিল। চুড়কী বহিতেছিল কাদা, তাহার মাঝি ইঁট যোগান দিতেছিল। কাদার পাত্রটি ফেলিয়া দিয়া চুড়কী বলিল—লারব আর আমি। সে হাঁপাইতেছিল।

বিনোদ বলিল—যা-যা ঐখানে যা। বাতাস নিয়ে আয়।

—হঠ যাও—হঠ যাও। ইঁটাকা গাড়ি যাতা হ্যায়।

বিনোদ সরিয়া দাঁড়াইল, হড় হড় শব্দে গাড়িখানা চলিয়া গেল।

—কাদা—কাদা—ফায়ার-ক্লে।—অতুল হাঁকিতেছিল।

ওপাশ হইতে কে হাঁকিল, আদমী গির গিয়া হিঁয়া। জলদি লে যাও।

অতুল দ্রুতবেগে বিনোদের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল—আর দুটো—আর দুটো গ্যালারী!

ধোঁয়ার পরিমাণ যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। বিনোদের কষ্ট হইতেছিল। সে একটু সরিয়া আসিয়া ২৫ নম্বর গ্যালারীর মুখে দাঁড়াইল। স্থানটি অপেক্ষাকৃত নির্জন ওদিকে ২৮ নম্বরে কাজ চলিতেছে। ২৭ নম্বর বন্ধ হইলেই যুদ্ধের শেষ হয় ধরণীগর্ভে আগুন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যাইবে। কে তাহার চোখ চাপিয়া ধরিল। বিনোদ এক ঝটকায় তাহাকে ফেলিয়া দিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া লইল। ক্রোধের আর তাহার সীমা ছিল না। চুড়কী পড়িয়া গিয়াও খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। জুতার ডগায় চুড়কীর মুখে একটা ঠোক্কর মারিয়া বিনোদ বলিল—লাথি মেরে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব আমি।

চুড়কী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বিনোদ সেখান হইতে পলাইয়া গেল। যাইতে যাইতে সে আবার ফিরিয়া চাহিল।

ধোঁয়ায় বাষ্পে ভালো করিয়া দেখা গেল না। কিন্তু অস্ফুট কান্নার শব্দ সে তখনও শুনিতে পাইতেছিল। বিনোদ ফিরিল। ডাকিল—চুড়কী—এই চুড়কী, কাজে যা—উঠে যা।

—না—আমি যা-ব না। তু কেনে আমাকে লাঁথায় মেলি?

ওদিক হইতে হড় হড় শব্দে টব-গাড়ি আসিতেছিল, যে ঠেলিয়া আনিতেছিল—সে হাঁকিল—হো—হো,—ই—হঠ যাও।

বিনোদের আর সাহস হইল না। সে পলাইয়া আসিল। সিলিণ্ডারের মুখে অক্সিজেন লইবার অছিলায় পিটের মুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল। হুড় হুড় শব্দে টব-

গাড়িতে যন্ত্রপাতি ফিরিয়া আসিতেছে। কাজ বোধ হয় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কয়জনে কাহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া আসিল।

—ঘণ্টি মারো টালোয়ান, ঘণ্টি মারো জলদি। পাঁচ আদমি গির গিয়া।

পিছনে পিছনে আবার একজন আসিল। বিনোদ প্রশ্ন করিল—কি—ব্যাপার কি হে?

—আর কি? গ্যাস একদিক দিয়ে জোর ধরেছে। পিছিয়ে আসতে হল?

—ক নম্বর পর্যন্ত পেছুতে হল?

সন সন শব্দে কেজটা উঠিয়া গেল, উত্তর আর শোনা গেল না। বিনোদ দ্রুতপদে খাদের মধ্যে আগাইয়া গেল।

বন্ধ হইতেছিল পনেরো নম্বরের মুখ।

অতুল কাহাকে বলিতেছিল—উপায় নাই—বারোটা গ্যালারী ছেড়ে দিতে হল।

বিনোদ চীৎকার করিয়া উঠিল—গাঁথনি ভাঙো। ভেতরে লোক।

তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিয়া অতুল বলিল—গেট আউট।

বিনোদ সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আর একবার বলিল—চুড়কী—

বাধা দিয়া অতুল বলিল—ওপরে যাও তুমি।—তারপর ইংরেজীতে একটা চিরকুট লিখিয়া হাতে দিয়া বলিল—ক্যাশিয়ারকে দাও গে।

ক্যাশিয়ার কাগজখানা পড়িয়া কুড়িটি টাকা বিনোদের হাতে দিয়া বলিল—তোমার মাইনে। এক ঘণ্টার মধ্যে কলিয়ারী ছেড়ে যাও। ছট্টু সিং!

—হুজুর!—ছট্টু সিং সেখানে হাজিরই ছিল।

—এক ঘণ্টার মধ্যে বাবুকে কুঠির সীমানা থেকে বের করে দেবে।

নীচে তখন কাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে। অতুল রুমালে কপাল মুছিতে মুছিতে আপন মনেই বলিল—হি লাভস হার।—প্রকাশ করে ফেলবে। ফুল! জানে না যে-সম্পদ বাঁচল, তাতে ওই মেয়েটির মত হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষের জীবিকার সংস্থান হল।—প্যাকিং দাও—ফায়ার-ক্লের প্যাকিং দিয়ে দাও—যেন এক বিন্দু গ্যাস না আসে।

আগুন থামিয়া গেছে। আবার কলিয়ারী তেমনি চলে। কেজ ওঠে—নামে রাত্রিতে কুলি-কামিন ভিড় করিয়া আসে, বাবুরা নাম লেখে।

টালোয়ান হাঁকে—হো-ই।

ইঞ্জিন চলে—কেজটা নামিতে থাকে।

ডাইনী

কে কবে নামকরণ করিয়াছিল সে ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নামটি আজও পূর্ণগৌরবে বর্তমান ;—ছাতি-ফাটার মাঠে জলহীন ছায়াশূন্য দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরটির এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্তের দিকে চাহিলে ওপারের গ্রামচিহ্নের গাছপালাগুলিকে কালো প্রলেপের মত মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন যেন কেমন উদাস হইয়া উঠে। এপার হইতে ওপার পর্যন্ত অতিক্রম করিতে গেলে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মানুষের মৃত্যু হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়; বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে। তখন যেন ছাতি-ফাটার মাঠ নামগৌরবে মহামারীর সমকক্ষতা লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। ঘন ধূমাচ্ছন্নতার মত ধূলার একটা ধূসর আস্তরণে মাটি হইতে আকাশের কোল পর্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে; অপর প্রান্তের সুদূর গ্রামচিহ্নের মসীরেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তখন ছাতি-ফাটার মাঠের সে রূপ অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর! শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূমধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য-নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ। ফ্যাকাশে রঙের নরম ধূলার রাশি প্রায় এক হাত পুরু হইয়া জমিয়া থাকে। গাছের মধ্যে এত বড় প্রান্তরটায় এখানে ওখানে কতকগুলি খৈরী ও সেয়াকুল জাতীয় কণ্টকগুল্ম। কোনো বড় গাছ নাই—বড় গাছ এখানে জন্মায় না; কোথাও জল নাই,—গোটাকয়েক শুষ্কগর্ভ জলাশয় আছে, কিন্তু জল তাহাতে থাকে না।

মাঠখানির চারিদিকেই ছোট ছোট পল্লী—সবই নিরক্ষর চাষীদের গ্রাম; সত্য কথা তাহারা গোপন করিতে জানে না—তাহারা বলে, কোন অতীতকালে এক মহানাগ এখানে আসিয়া বসতি করিয়াছিল, তাহারই বিষের জ্বালায় মাঠখানির রসময়ী রূপ, বীজপ্রসবিনী শক্তি পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গিয়াছে। তখন নাকি আকাশলোকে সঞ্চরমাণ পতঙ্গ-পক্ষীও পঙ্গু হইয়া ঝরা-পাতার মত ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িত সেই মহানাগের গ্রাসের মধ্যে।

সে নাগ আর নাই, কিন্তু বিষজর্জরতা এখনও কমে নাই। অভিশপ্ত ছাতি-ফাটার মাঠ! তাহারই ভাগ্যদোষে ঐ বিষজর্জরতার উপরে আর এক ক্রূর দৃষ্টি তাহার উপর প্রসারিত হইয়া আছে। মাঠখানার পূর্বপ্রান্তে দলদলির জলা, অর্থাৎ অত্যন্ত গভীর পঙ্কিল ঝরনা জাতীয় জলাটার উপরেই রামনগরের সাহাদের যে আমবাগান আছে, সেই আমবাগানে আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া

বাস করিতেছে এক ডাকিনী—ভীষণ শক্তিশালিনী নিষ্ঠুর ক্রূর একটা বৃদ্ধা ডাকিনী। লোকে তাহাকে পরিহার করিয়াই চলে, তবু চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা তাহারা দিতে পারে, তাহার দৃষ্টি নাকি অপলক স্থির, আর সে দৃষ্টি নাকি আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়াই নিবদ্ধ হইয়া আছে এই মাঠখানার উপর।

দলদলির উপরেই আমবাগানের ছায়ার মধ্যে নিঃসঙ্গ একখানি মেটে ঘর; ঘরখানার মুখ ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। দুয়ারের সম্মুখেই লম্বা একখানি খড়ে-ছাওয়া বারান্দা—সেই বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া নিমেষহীন দৃষ্টিতে বৃদ্ধা চাহিয়া থাকে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে। তাহার কাজের মধ্যে সে আপন ঘরদুয়ারটি পরিষ্কার করিয়া গোবরমাটি দিয়া নিকাইয়া লয়, তাহার পর বাহির হয় ভিক্ষায়। দুই-তিনটা বাড়িতে গিয়া দাঁড়াইলেই তাহার কাজ হইয়া যায়, লোকে ভয়ে ভয়ে ভিক্ষা বেশী পরিমাণেই দিয়া থাকে; সের খানেক চাল হইলেই সে আর ভিক্ষা করে না, বাড়ি ফিরিয়া আসে। ফিরিবার পথে অর্ধেক চাল বিক্রি করিয়া দোকান হইতে একটু নুন, একটু সরিষার তেল, আর খানিকটা কেরোসিন তেল কিনিয়া আনে। বাড়ি ফিরিয়া আর একবার বাহির হয় শুকনো গোবর ও দুই-চারিটা শুকনো ডালপালার সন্ধানে। ইহার পর সমস্তটা দিন সে দাওয়ার উপর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। এমনি করিয়া চল্লিশ বৎসর সে একই ধারায় ঐ মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধার বাড়ি এখানে নয়, কোথায় যে বাড়ি সে-কথাও কেহ সঠিক জানে না। তবে একথা নাকি নিঃসন্দেহ যে, তিন-চারখানা গ্রাম একরূপ ধ্বংস করিয়া অবশেষে একদা আকাশপথে একটা গাছকে চালাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে এই ছাতি-ফাটার মাঠের নির্জনরূপে মুগ্ধ হইয়া নামিয়া আসিয়া এইখানে ঘর বাঁধিয়াছে। নির্জনতাই উহারা ভালোবাসে, মানুষের সাক্ষাৎ উহারা চায় না।

মানুষ দেখিলেই যে তাহার অনিষ্টস্পৃহা জাগিয়া উঠে! ঐ সর্বনাশী লোলুপ-শক্তিটা সাপের মত লকলকে জিভ বাহির করিয়া ফণা তুলিয়া নাচিয়া উঠে। না হইলেও সেও তো মানুষ।

আপনার দৃষ্টি দেখিয়া সে আপনিই শিহরিয়া উঠে। বহুকালের পুরানো একখানি আয়না—সেই আয়নায় আপনার চোখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার নিজের ভয় হয়—ক্ষুদ্রায়তন চোখের মধ্যে পিঙ্গল দুইটি তারা, দৃষ্টিতে ছুরির মত একটা ঝকমকে ধার! জরা-কুঞ্চিত মুখ, শণের মত সাদা চুল, দন্তহীন মুখ। আপন প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে ঠোঁট দুইটি তাহার থরথর করিয়া কাঁপিয়া

উঠিল। সে আয়নাখানি নামাইয়া রাখিয়া দিল। আয়নাখানার চারিদিকে কাঠের ঘেরটা একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে, অথচ নূতন অবস্থায় কি সুন্দর লালচে রঙ, আর কি পালিশই না ছিল। আর আয়নার কাচখানা ছিল রোদ-চকচকে পুকুরের জলের মত। কাচখানার ভিতর একখানা মুখ কি পরিষ্কারই না দেখা যাইত। ছোট কপালখানিকে ঘেরিয়া একরাশ চুল—ঘন কালো নয়, একটু লালচে আভা ছিল চুলে ; কপালের নিচেই টিকোল নাক ; চোখ দুইটি ছোটই ছিল—চোখের তারা দুইটিও খয়রা রঙেরই ছিল—লোকেও সে চোখ দেখিয়া ভয় করিত। কিন্তু তাহার বড় ভালো লাগিত, ছোট চোখ দুইটি আরও একটু ছোট করিয়া তাকাইলে মনে হইত, আকাশের কোল পর্যন্ত এ চোখ দিয়া দেখা যায়। অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল—নরুন দিয়া চেরা, ছুরির মত চোখে, বিড়ালীর মত এই দৃষ্টিতে যাহাকে তাহার ভালো লাগে তাহার আর রক্ষা থাকে না। কোথা দিয়া যে কি হইয়া যায়, কেমন করিয়া যে কি হইয়া যায়, সে বুঝিতে পারে না ; তবে হইয়া যায়!

প্রথম দিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়।

বুড়া শিবতলার সম্মুখেই দুর্গাসায়রের বাঁধাঘাটের ভাঙা রানার উপর সে দাড়াইয়া ছিল—জলের তলে তাহার ছবি উল্টা দিকে মাথা করিয়া দাঁড়াইয়া জলের ঢেউয়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া লম্বা হইয়া যাইতেছিল—জল স্থির হইলে লম্বা ছবিটি অবিকল তাহার মত দশ-এগার বৎসরের মেয়েটি হইয়া তাহারই দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। হঠাৎ বামুন-বাড়ির হারু সরকার আসিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া সান-বাঁধানো সিঁড়ির উপর তাহাকে আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার সে রূঢ় কণ্ঠস্বর সে এখনও শুনিতে পায়—হারামজাদী ডাইনী, তুমি আমার ছেলেকে নজর দিয়েছ? তোমার এত বড় বাড়? খুন করে ফেলব হারামজাদীকে।

হারু সরকারের সে ভয়ঙ্কর মূর্তি যেন স্পষ্ট চোখের উপর ভাসিতেছে।

সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিল—ওগো বাবু গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো!

—আম দিয়ে মুড়ি খেতে দেখে যদি তোর লোভই হয়েছিল, তবে সে কথা বললি নে কেন হারামজাদী?

হ্যাঁ, লোভ তো তাহার হইয়াছিল, সত্যই হইয়াছিল, মুখের ভিতরটা তো জলে ভরিয়া পরিপূর্ণ হইয়াছিল!

—হারামজাদী, আমার ছেলে যে পেট বেদনায় ছটফট করছে।

সে আজও অবাক হইয়া যায়, কেমন করিয়া এমন হইয়াছিল—কেমন করিয়া এমন হয়! কিন্তু এ যে সত্য তাহাতে তো আর সন্দেহ নাই! তাহার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, সে হারু সরকারের বাড়ি গিয়া অঝোরঝরে কাঁদিয়াছিল, আর বার বার মনে মনে বলিয়াছিল—হে ঠাকুর, ভালো করে দাও, ওকে ভালো করে দাও। কতবার সে মনে মনে বলিয়াছিল—দৃষ্টি আমার ফিরাইয়া লইতেছি, এই লইলাম। আশ্চর্যের কথা, কিছুক্ষণ পরেই বার দুই বমি করিয়া ছেলেটি সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

সরকার বলিয়াছিল, ওকে একটা আম আর দুটি মুড়ি দাও দেখি।

সরকার-গিন্নী একটা ঝাঁটা তুলিয়াছিল, বলিয়াছিল, ছাই দেব হারামজাদীর মুখে। মা-বাপ-মরা অনাথা মেয়ে বলে দয়া করি—যেদিন হারামজাদী আসে সেই দিনই আমি ওকে খেতে দি। আর ও কিনা আমার ছেলেকে নজর দেয়! আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে দেখ! ওর ঐ চোখের দৃষ্টি দেখে বরাবর আমার সন্দেহ ছিল, কখনও আমি ওর সাক্ষাতে ছেলেপুলেকে খেতে দিই নি। আজ আমি খোকাকে খেতে দিয়ে ঘাটে গিয়েছি, আর ও কখন এসে একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছে। সে কি দিষ্টি ওর!

লজ্জায় ভয়ে সে পলাইয়া গিয়াছিল। সেদিন রাত্রে সে গ্রামের মধ্যে কাহারও বাড়ির দাওয়ায় শুইতে পারে নাই; শুইয়াছিল গ্রামের প্রান্তে ঐ বুড়াশিবতলায়। অঝোরঝরে সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছিল আর বলিয়াছিল—হে ঠাকুর আমার দৃষ্টিকে ভালো করে দাও, না হয় আমাকে কানা করে দাও।

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস মাটির মূর্তির মত নিস্পন্দবৃদ্ধার অবয়বের মধ্যে এতক্ষণে ক্ষীণ একটি চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিল। ঠোঁট দুইটি থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পূর্বজন্মের পাপের যে খণ্ডন নাই—দেবতার দোষই বা কি, আর সাধ্যই বা কি? বেশ মনে আছে, গৃহস্থের বাড়িতে সে আর ঢুকিবে না ঠিক করিয়াছিল। বাহির-দুয়ার হইতেই সে ভিক্ষা চাহিত—গলা দিয়া কথা যেন বাহির হইতে চাহিত না, কোনও মতে বহুকষ্টে বলিত, দুটি ভিক্ষে পাই মা! হরিবোল!

—কে রে? তুই বুঝি? খবরদার ঘরে ঢুকবি নে। খবরদার!

—না মা, ঘরে ঢুকব না মা।

কিন্তু পরক্ষণেই মনের মধ্যে কি যেন একটা কিলবিল করিয়া উঠিত, এখনও উঠে। কি সুন্দর মাছভাজার গন্ধ, আহা-হা! বেশ খুব বড় পাকা-মাছের খানা বোধ হয়।

—এই—এই! হারামজাদী বেহায়া! উঁকি মারছে দেখ! সাপের মত।

ছি ছি ছি! সত্যিই তো সে উঁকি মারিতেছে—রান্নাশালার সমস্ত আয়োজন তাহার নরুন-চেরা ক্ষুদ্র চোখের এক দৃষ্টিতে দেখা হইয়া গিয়াছে। মুখের ভিতর জিভের তলা হইতে ঝরনার মত জল উঠিতেছে।

বহুকালের গড়া জীর্ণ বিবর্ণ মাটির মূর্তি যেন কোথায় একটা নাড়া পাইয়া দুলিয়া উঠিল; ফাট-ধরা শিথিলগ্রন্থি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শৃঙ্খলাহীন অসমগতিতে চঞ্চল হইয়া পড়িল; অস্থিরভাবে বৃদ্ধা এবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল—বাঁ হাতের শীর্ণ দীর্ঘ আঙুলগুলির নখাগ্র দাওয়ার মাটির উপর বিদ্ধ হইয়া গেল। কেন এমন হয়, কেমন করিয়া এমন হয়, সে কথা সারা জীবন ধরিয়াও যে বুঝিতে পারা গেল না। অস্থির চিন্তায় দিশাহারা চিত্তের নিকট সমস্ত পৃথিবীই যেন হারাইয়া যায়।

কিন্তু সে তার কি করিবে? কেহ কি বলিয়া দিতে পারে, তার কি করিবে, কি করিতে পারে? প্রহৃত পশু যেমন মরিয়া হইয়া অকস্মাৎ আঁ-আঁ গর্জন করিয়া উঠে, ঠিক তেমনই ইঁ-ইঁ শব্দ করিয়া অকস্মাৎ বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া শণের মত চুলগুলাকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়া খাড়া সোজা হইয়া বসিল। ফোকলা মাড়ির উপর মাড়ি চাপিয়া, ছাতি ফাটার মাঠের দিকে নরুন-চেরা চোখের চিলের মত দৃষ্টি হানিয়া হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

ছাতি-ফাটার মাঠটা যেন ধোঁয়ায় ভরিয়া ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। চৈত্র মাস, বেলা প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঠ-ভরা ধোঁয়ার মধ্যে ঝিকিমিকি ঝিলিমিলির মত কি একটা যেন ছুটিয়া চলিয়াছে। একটা ফুৎকার যদি সে দেয়, তবে মাঠের ধুলার রাশি উড়িয়া আকাশময় হইয়া যাইবে।

ঐ ধোঁয়ায় মধ্যে জমাট সাদার মত ওটা কি, নড়িতেছে যেন! মানুষ? হ্যাঁ মানুষই তো! মনের ভিতরটা তাহার কেমন করিয়া উঠে। ফুঁ দিয়া ধুলা উড়াইয়া, দিবে মানুষটাকে উড়াইয়া? হি-হি-হি করিয়া পাগলের মত হাসিয়া একটা অবোধ নিষ্ঠুর কৌতুক তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

দুই হাতের মুঠি প্রাণপণ শক্তিতে শক্ত করিয়া সে আপনার উচ্ছৃঙ্খল মনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল—না-না-না। ছাতি-ফাটার মাঠে মানুষটা ধুলার গরমে শ্বাসরোধী ঘনত্বে মরিয়া যাইবে।

নাঃ, ওদিকে আর সে চাহিবেই না। তাহার চেয়ে বরং উঠানটায় আর একবার ঝাঁটা বুলাইয়া, ছড়াইয়া-পড়া পাতা ও কাঠকুটাগুলাকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয়? বসিয়া বসিয়াই সে ভাঙ্গিয়া-পড়া দেহখানাকে টানিয়া উঠানে ঝাঁটা বুলাইতে শুরু করিল।

জড়ো করা পাতাগুলো ফর-ফর করিয়া অকস্মাৎ সর্পিল ভঙ্গিতে ঘুরপাক খাইয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। ঝাঁটার মুখে টানিয়া-আনা ধুলার রাশি তাহার সহিত মিশিয়া বুড়িকেই যেন জড়াইয়া ধরিতেছিল, মুখে-চোখে ধুলা মাখাইয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। দ্রুত আবর্তিত পাতাগুলা তাহাকে যেন সর্বাঙ্গে প্রহার করিতেছে। জরাগ্রস্ত রোমহীন আহতা মার্জারীর মত ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গি করিয়া বৃদ্ধা আপনার হাতের ঝাঁটা-গাছটা আস্ফালন করিয়া বলিয়া উঠিল—বেরো বেরো বেরো।

বার বার সে ঝাঁটা দিয়া বাতাসের ঐ আবর্তটাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিল আবর্তটা মাঠের উপর দিয়া ঘুরপাক দিতে দিতে ছুটিয়া গেল। মাঠের ধুলা হু-হু করিয়া উড়িয়া ধুলার একটা ঘুরন্ত স্তম্ভ হইয়া উঠিতেছে! শুধু কি একটা? এখানে ওখানে ছোট বড় কত ঘুরণপাক উঠিয়া পড়িয়াছে—মাঠটা যেন নাচিতেছে। একটা যেন হাজারটা হইয়া হইয়া উঠিতেছে! একটা অদ্ভুত আনন্দে বৃদ্ধার মন শিশুর মত অধীর হইয়া উঠিল; সহসা সে ন্যুব্জ দেহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁটাসুদ্ধ হাতটা প্রসারিত করিয়া সাধ্যমত গতিতে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে টলিতে টলিতে বসিয়া পড়িল। পৃথিবীর এক মাথা উঁচু হইয়া তাহাকে যেন গড়াইয়া কোন অতলের দিকে ফেলিয়া দিতে চাহিতেছে। উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তিও তাহার ছিল না। ছোট শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়া সে দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইল। দারুণ তৃষ্ণায় গলা পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে।

—কে রইছ গো ঘরে? ওগো!

জলে-পচা নরম মরা-ডালের মত বৃদ্ধা বাঁকিয়া-চুরিয়া দাওয়ার একধারে পড়িয়াছিল। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কোনোমতে মাথা তুলিয়া সে বলিল, কে? ধূলিধূসরদেহে শুষ্ক-পাণ্ডুর মুখ একটি যুবতী মেয়ে বুকের ভিতর কোনো একটা বস্তু কাপড়ের আবরণে ঢাকিয়া বহুকষ্টে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। মেয়েটি বোধ হয় ছাতি-ফাটার মাঠ পার হইয়া আসিল। কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধাকে দেখিয়া মেয়েটি সভয়ে শিহরিয়া উঠিল, এক পা করিয়া পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে বলিল, একটুকুন জল।

মাটির উপর হাতের ভর দিয়া বৃদ্ধা এবার অতিকষ্টে উঠিয়া বসিল। মেয়েটির শুষ্ক পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আহা-হা বাছা রে আয়, আয়। বস।

সভয়ে সন্তর্পণে দাওয়ার এক পাশে বসিয়া মেয়েটি বলিল, একটুকুন জল দাও গো!—মমতায় বৃদ্ধার মন গলিয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বড়

একটা ঘটি পূর্ণ করিয়া জল ঢালিয়া এক টুকরা পাটালির সন্ধানে হাঁড়িতে হাত পুরিয়া বলিল, আহা মা, এই রোদে ঐ রাক্কুসী মাঠে কি বলে বের হলি তুই ?

বাহিরে বসিয়া মেয়েটি তখনও হাঁপাইতেছিল, কম্পিত শুষ্ক কণ্ঠে সে বলিল, আমার মায়ের বড় অসুখ মা। বেরিয়েছিলাম রাত থাকতে। মাঠের মাথায় এসে আমার পথ ভুল হয়ে গেল, মাঠের ধারে ধারে আমার পথ, কিন্তু এসে পড়লাম একেবারে মধ্যিখানে।

জলের ঘটি ও পাটালির টুকরাটি নামাইয়া দিয়া বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল—মেয়েটির পাশে একটি শিশু! গরম জলে সিদ্ধ শাকের মত শিশুটি ঘর্মাক্ত দেহে ন্যাতাইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা ব্যস্ত হইয়া বলিল, দে, দে বাছা, ছেলেটার চোখে মুখে জল দে!—মেয়েটি ছেলের মুখে চোখে জল দিয়া আঁচল ভিজাইয়া সর্বাঙ্গ মুছিয়া দিল।

বৃদ্ধা দূরে বসিয়া ছেলেটির দিকে তাকাইয়া রহিল; স্বাস্থ্যবতী যুবতী মায়ের প্রথম সন্তান বোধ হয়, হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ—কচি লাউডগার মত নরম সরস। দন্তহীন মুখে কম্পিত জিহ্বার তলে ফোয়ারাটা যেন খুলিয়া গেল, নরম গরম লালায় মুখটা ভরিয়া উঠিতেছে।

এঃ ছেলেটা কি ভীষণ ঘামিতেছে! দেহের সমস্ত জল কি বাহির হইয়া আসিতেছে! চোখ দুইটা লাল হইয়া উঠিয়াছে! তবে কি—? কিন্তু সে তাহার কি করিবে? কেন সে তাহার সামনে আসিল? কেন আসিল? ঐ কোমল নধরদেহ শিশু ময়দার মত ঠাসিয়া চটকাইয়া তাহার শুষ্ক কঙ্কাল বুকে চাপিয়া নিঙড়াইয়া—। জীর্ণ জরজর ত্বকের উপর একটা রোমাঞ্চিত শিহরণ ক্ষণে ক্ষণে বহিয়া যাইতেছে, সর্বাঙ্গ তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। এ ঘামে ছেলেটার দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তাহার রসাস্বাদ! যাঃ! নিতান্ত অসহায়ের মত আর্তস্বরে সে বলিয়া উঠিল, খেয়ে ফেললাম—ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে। পালা পালা, তুই ছেলে নিয়ে পালা বলছি।

শিশুটির মা ঐ যুবতী মেয়েটি দুই হাতে ঘটি তুলিয়া ঢকঢক করিয়া জল খাইতেছিল—তাহার হাত হইতে ঘটিটা খসিয়া পড়িয়া গেল; সে আতঙ্কিত বিবর্ণ মুখে বৃদ্ধার বিস্ফারিত-দৃষ্টি ক্ষুদ্র চোখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, এটা তবে রামনগর? তুমি সেই—?—সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ছেলেটিকে ছোঁ মারিয়া কুড়াইয়া লইয়া যেন পক্ষিণীর মত ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কিন্তু সে কি করিবে? আপনার বুকখানাকে তাহার নিজের জীর্ণ আঙুলের

নখ দিয়া চিরিয়া ঐ লোভটাকে বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছা করে। জিভটাকে কাটিয়া ফেলিতে পারিলে সে পরিত্রাণ পায়। ছি ছি ছি! কাল সে গ্রামের পথে বাহির হইবে কোন মুখে? লোকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিবে না, সে তাহা জানে; কিন্তু তাহাদের মুখে চোখে যে-কথা ফুটিয়া উঠিবে তাহা সে চোখে দেখিবে কি করিয়া? ছেলেমেয়েরা এমনিই তাহাকে দেখিলে পলাইয়া যায়, কেহ কেহ কাঁদিয়াও উঠে; আজিকার ঘটনার পর তাহারা বোধ হয় আতঙ্কে জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া যাইবে। ছি ছি ছি!

এই লজ্জায় একদা সে গভীর রাত্রে আপনার গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে, তখন সে তো অনেকটা ডাগর হইয়াছে। তাহারই বয়সী তাহাদেরই স্বজাতীয়া সাবিত্রীর পূর্বদিন রাত্রে খোকা হইয়াছে। সকালেই সে দেখিতে গিয়াছিল। সাবিত্রী তখন ছেলেটিকে লইয়া বাহিরে রৌদ্রে আসিয়া বসিয়া গায়ে রোদ লইতেছিল। ছেলেটি শুইয়া ছিল কাঁথার উপর। কালো চকচকে কি সুন্দর ছেলেটি।

ঠিক এমনি ভাবেই, ঠিক আজিকার মতই সেদিনও তাহার মনে হইয়াছিল, ছেলেটিকে লইয়া আপনার বুকে চাপিয়া নরম ময়দার তালের মত ঠাসিয়া, ঠোঁট দিয়া চুমায় চুমায় চুষিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে। তখন সে বুঝিতে পরিত না, মনে হইত, এ বুঝি কোলে লইয়া আদর করিবার সাধ।

সাবিত্রীর শাশুড়ী হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সাবিত্রীকে তিরস্কার করিয়াছিল, বলি ওলো, আক্কেলখাগী হারামজাদী, খুব যে, ভাবীসাবীর সঙ্গে মস্করা জুড়েছিস। আমার বাছার যদি কিছু হয়, তবে তোকে বুঝব আমি—হ্যাঁ।

তারপর বাহিরের দিকে আঙুল বাড়াইয়া তাহাকে বলিয়াছিল, বেরো বলছি, বেরো। হারামজাদীর চোখ দেখ দেখি!

সাবিত্রী ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি বুকে ঢাকিয়া দুর্বল শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের মধ্যে পলাইয়া গিয়াছিল। মর্মান্তিক দুঃখে আহত হইয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল। বার বার সে মনে মনে বলিয়াছিল—ছি ছি! তাই নাকি সে পারে? হইলই বা সে ডাইনী, কিন্তু তাই বলিয়া কি সে সাবিত্রীর ছেলের অনিষ্ট করতে পারে? ছি ছি! ভগবানকে ডাকিয়া সে বলিয়াছিল — তুমি ইহার বিচার করিবে: একশ বৎসর পরমায়ু দিও তুমি সাবিত্রীর খোকাকে, দয়া করিয়া প্রমাণ করিয়া দিও, সাবিত্রীর খোকাকে আমি কত ভালোবাসি!

কিন্তু অপরাহ্নবেলা হইতে না-হইতেই তাহার অত্যুগ্র বিষময়ী দৃষ্টি-ক্ষুধার কলঙ্ক অতি নিষ্ঠুরভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল।

সাবিত্রীর ছেলেটি নাকি ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে আর এমন ভাবে কাতরাইতেছে যে, ঠিক যেন কেহ তাহার রক্ত চুষিয়া লইতেছে।

লজ্জায় সে পলাইয়া গিয়া গ্রামের শ্মশানের জঙ্গলের মধ্যে সন্তর্পনে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া ছিল। বার বার মুখের থুথু মাটিতে ফেলিয়া দেখিতে চাহিয়াছিল—কোথায় রক্ত! গলায় আঙুল দিয়া বমি করিয়াও দেখিতে চাহিয়াছিল, বুঝিতে চাহিয়াছিল। প্রথম বার-দুয়েক বুঝিতে পারে নাই ; কিন্তু তাহার পরই কুটি কুটি রক্তের ছিটা শেষকালে একেবারে খানিকটা তাজা রক্ত উঠিয়া আসিয়াছিল। সেই দিন সে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছে আপনার অপার নিষ্ঠুর শক্তির কথা।

গভীর রাত্রে—সেদিন বোধ হয় চতুর্দশীই ছিল, হ্যাঁ চতুর্দশীই তো—বাকুলের তারাদেবী তলায় পূজার ঢাক বাজিতেছিল। জাগ্রত মা তারাদেবী ; পূর্ণিমার আগের প্রতি চতুর্দশীতে মায়ের পূজা হয়, বলিদান হয়। কিন্তু মা-তারাও তাহাকে দয়া করেন নাই। কতবার সে মানত করিয়াছে—মা, আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক-চিরে রক্ত দেব।—কিন্তু মা মুখ তুলিয়া চাহেন নাই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধার মন দুঃখে হতাশায় উদাস হইয়া গেল। মনের সকল কথা ছিন্নসূত্র ঘুড়ির মত শিথিলভাবে দোল খাইতে খাইতে ভাসিয়া কোন নিরুদ্দেশলোকে হারাইয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের পিঙ্গল তারায় অর্থহীন দৃষ্টি জাগিয়া উঠিল। সে সেই দৃষ্টি মেলিয়া ছাতি-ফাটার মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ছাতি-ফাটার মাঠ ধুলায় ধূসর, বাতাস স্তব্ধ ; ধূসর ধূলায় গাঢ় নিস্তরঙ্গ আস্তরণের মধ্যে সমস্ত যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ঐ অপরিচিতা পথচারিণী মেয়েটির ছেলেটি এ গ্রাম হইতে খান দুই গ্রাম পার হইয়া পথেই মরিয়া গিয়াছে। যে ঘাম সে ঘামিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে ঘাম আর থামে নাই। দেহের সমস্ত রস নিঙড়াইয়া কে যেন বাহির করিয়া দিল! কে আবার? ঐ সর্বনাশী। মেয়েটি বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিয়াছে, কেন গেলাম গো—আমি ঐ ডাইনীর কাছে কেন গেলাম গো! আমি কি করলাম গো!

লোকে শিহরিয়া উঠিল, তাহার মৃত্যু-কামনা করিল। একবার জন কয়েক জোয়ান ছেলে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ঝরনাটার কাছে আসিয়াও জুটিল। বৃদ্ধা ডাইনী ক্রোধে সাপিনীর মত ফুঁসিয়া উঠিল—সে তাহার কি করিবে? সে আসিল কেন? তাহার চোখের সম্মুখে এমন সরল লাবণ্যকোমল দেহ ধরিল

কেন ?—অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রোধে সে এক সময় চিলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে। সেই চীৎকার শুনিয়া তাহারা পলাইয়া গেল। কিন্তু সে এখনও ক্রুদ্ধা অজগরীর মত ফুঁসিতেছে, তাহার অন্তরের বিষ সে যেন উদ্গার করিতেছে, আবার নিজেই গিলিতেছে। কখনও তাহার হি-হি করিয়া হাসিতে ইচ্ছা হইতেছে, কখনও বা ক্রুদ্ধ চীৎকারে ঐ ছাতি-ফাটার মাঠটা কাঁপাইয়া তুলিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিতেছে, কখনও বা ইচ্ছা হইতেছে—বুক চাপড়াইয়া মাথার চুল ছিঁড়িয়া পৃথিবী ফাটাইয়া হা-হা করিয়া সে কাঁদে। ক্ষুধাবোধ আজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, রান্নাবান্নারও আজ দরকার নাই। এঃ, সে আজ একটা গোটা শিশুদেহের রস অদৃশ্য-শোষণে পান করিয়াছে!

ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতেছিল। শুক্লা নবমীর চাঁদের জ্যোৎস্নায় ছাতি-ফাটার মাঠ একখানা সাদা ফরাশের মত পড়িয়া আছে। কোথায় একটা পাখী অশ্রান্তভাবে ডাকিয়া চলিয়াছে—চোখ গে-ল! চোখ গে-ল! আমগাছগুলির মধ্যে ঝিঁঝিপোকা ডাকিতেছে। ঘরের পিছনে ঝরনার ধারে দুইটা লোক যেন মৃদুগুঞ্জনে কথা কহিতেছে। আবার সেই ছেলেগুলা তাহার কোনো অনিষ্ট করিতে আসিয়াছে নাকি ? অতি সন্তর্পিত মৃদু পদক্ষেপে বৃদ্ধা ঘরের কোণে আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। না, তাহারা নয়। এ বাউরীদের সেই স্বামীপরিত্যক্তা উচ্ছলা মেয়েটা আর তাহারই প্রণয়মুগ্ধ বাউরী ছেলেটা।

মেয়েটা বলিতেছে, না, কে আবার আসবে এখুনি, আমি ঘর যাব।

ছেলেটা বলিল, হেঁ! এখানে আসছে নোকে ; দিনেই কেউ আসে না, তা রাতে।

—তা হোক। তোর বাবা যখন আমার সাথে তোর সাঙা দেবে না, তখন তোর সাথে এখানে কেন থাকব আমি ?

ছি ছি ছি! কি লজ্জা গো! কোথায় যাইবে সে! যদি তাই গোপনে দুইজনে দেখা করিতে আসিয়াছে, তবে মরিতে ওখানে কেন ? তাহার এই বাড়িতে আসিল না কেন ? তাহার মত বৃদ্ধাকে আবার লজ্জা কি ? কি বলিতেছে ছেলেটা ?—বাবা-মা বিয়ে না দেয়, চল, তোতে আমাতে ভিনগাঁয়ে গিয়ে বিয়ে করে সংসার পাতব। তোকে নইলে আমি বাঁচব না।

আ মরণ ছেলেটির পছন্দের! ঐ কুপোর মত মেয়েটাকে উহার এত ভালো লাগিল! তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাহাদের গ্রাম হইতে দশ ক্রোশ দূরের বোলপুর শহরের পানওয়ালার দোকানের সেই বড় আয়নাটা। আয়নাটার মধ্যে

লম্বা ছিপছিপে চৌদ্দ-পনের বছরের একটি মেয়ের ছবি। একমাথা রুক্ষ চুল, ছোট কপাল, টিকালো নাক, পাতলা ঠোঁট। চোখ দুটি ছোট, তারা দুটি খয়রা রঙের; কিন্তু সে চোখের বাহার ছিল বইকি! আয়নার দিকে তাকাইয়া সে নিজের ছবিই দেখিতেছিল। তখন আয়না তো তাহার ছিল না, আয়নাতে আপনার ছবি সে তখনও কোনোদিন দেখে নাই।—আরে, তুই আবার কে রে? কোথা থেকে এলি?—লম্বা-চওড়া এক জোয়ান পুরুষ তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল। আগের দিন সন্ধ্যায় সে সবে বোলপুর আসিয়াছে। সাবিত্রীর ছেলেটাকে খাইয়া ফেলিয়া সেই চতুর্দশীর রাত্রেই গ্রাম ছাড়িয়া বোলপুরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। লোকটাকে দেখিয়া তাহার খারাপ লাগে নাই, কিন্তু তাহার কথার ঢঙটা বড় খারাপ লাগিয়াছিল। সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল, কেনে, যেথা থেকে আসি না কেনে, তোমার কি?

—আমার কি? এক কিলে তোকে মাটির ভেতর বসিয়ে দেব। দেখেছিস কিল?

ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে ঐ লোকটির দেহের রক্ত শোষণ করিবার কামনা করিয়াছিল। কালো পাথরের মত নিটোল শরীর। জিভের নীচে ফোয়ারা হইতে জল ছুটিয়াছিল। কোনো উত্তর না দিয়া তীব্র তির্যক ভঙ্গিতে লোকটার দিকে চাহিতে চাহিতে সে চলিয়া আসিয়াছিল।

সেদিন সূর্য উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বদিকে চুনে-হলুদে রঙের প্রকাণ্ড থালার মত নিটোল গোল চাঁদ উঠিতেছিল; বোলপুরের একেবারে শেষে রেল-লাইনের ধারে বড় পুকুরটার বাঁধা ঘাটে বসিয়া আঁচল হইতে মুড়ি খাইতে খাইতে সে ঐ চাঁদের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। চাঁদের আলো তখনও দুধবরণ হইয়া উঠে নাই। ঘোলাটে আবছা আলোয় চারিদিক ঝাপসা দেখাইতেছিল। সহসা কে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই সে চমকিয়া উঠিয়াছিল। সেই লোকটা! সে হি হি করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—আজও বেশ মনে আছে—হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাহার গালে দুইটা টোল খাইয়াছিল—হাসিলে তাহার গালে টোল খাইত—সে বলিয়াছিল, কথার জবাব না দিয়ে পালিয়ে এলি যে?

সে বলিয়াছিল, এই দেখ, তুমি যাও বলছি, নইলে আমি চেঁচাব।

—চেঁচাবি? দেখছিস পুকুরের পাঁক, টুঁটি টিপে তোকে পুঁতে দোব ঐ পাঁকে।

তাহার ভয় হইয়াছিল, সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, লোকটা অকস্মাৎ মাটির উপর ভীষণ জোরে পা ঠুকিয়া চীৎকার করিয়া একটা ধমক দিয়া উঠিয়াছিল, ধে-ৎ!

সে আঁতকাইয়া উঠিয়াছিল—আঁচল-ধরা হাতের মুঠিটা খসিয়া গিয়া মুড়িগুলি ঝরঝর করিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। লোকটার হি-হি করিয়া সে কি হাসি! সে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। লোকটা অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়াছিল, দূর-রো, ফ্যাচকাঁদুনে মেয়ে কোথাকার! ভাগ।

তাহার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট স্নেহের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল!

সে কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিয়াছিল, তুমি মারবা নাকি?

—না না, মারব কেনে? তোকে শুধালাম—কুথায় বাড়ি তোর, তু একেবারে খ্যাঁক করে উঠলি। তাথেই বলি—

বলিয়া আবার সে হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

—আমার বাড়ি অ্যানেক ধুর, পাথরঘাটা।

—কি নাম বটে তোর? কি জাত?

—নাম বটে আমার সোরধনি, লোকে ডাকে সরা বলে। আমরা ডোম বটে।

লোকটা খুব খুশী হইয়া বলিয়াছিল, আমরাও ডোম।—তা ঘর থেকে পালিয়ে এলি কেনে?

তাহার চোখে আবার জল আসিয়াছিল; সে চুপ করিয়া ভাবিতেছিল, কি বলিবে?

—রাগ করে পালিয়ে এসেছিস বুঝি?

—না।

—তবে?

—আমার মা-বাবা কেউ নাই কিনা? কে খেতে পরতে দিবে? তাই খেটে খেতে এসেছি হেথাকে।

—বিয়ে করিস নাই কেনে—বিয়ে?

সে অবাক হইয়া লোকটার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহাকে—তাহার মত ডাইনীকে—কে বিবাহ করিবে? সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তারপর হঠাৎ সে কেমন লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

বৃদ্ধা আজও অকারণে নতশিরে মাটির উপর ক্রমাগত হাত বুলাইয়া ধুলা-কাঁকর জড়ো করিতে আরম্ভ করিল। সকল কথার সূত্র যেন হারাইয়া গিয়াছে,—মালা গাঁথিতে গাঁথিতে হঠাৎ সূতা হইতে সূচটা পড়িয়া গেল।

আঃ, কি মশা! মৌমাছির চাক ভাঙ্গিলে যেমন মাছিগুলা মানুষকে ছাঁকিয়া ধরে, তেমনই করিয়া সর্বাঙ্গে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। কই? মেয়েটা আর ছেলেটার কথাবার্তা তো আর শোনা যায় না! চলিয়া গিয়াছে! সন্তর্পণে ঘরের দেওয়াল

ধরিয়া ধরিয়া বৃদ্ধা আসিয়া দাওয়ার উপর বসিল। কাল আবার উহারা নিশ্চয় আসিবে। তাহার ঘরের পাশাপাশি জায়গার মত আর নিরিবিলি জায়গা কোথায়? এ চাকলার কেউ আসিতে সাহস করিবে না। তবে উহারা ঠিক আসিবে। ভালোবাসায় কি ভয় আছে!

অকস্মাৎ তাহার মনটা কিলবিল করিয়া উঠিল। আচ্ছা, ঐ ছোঁড়াটাকে সে খাইবে? শক্ত সমর্থ জোয়ান শরীর!

সঙ্গে সঙ্গে শিহরিয়া উঠিয়া বার বার সে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া উঠিল, না না।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে আপন মনে দুলিতে আরম্ভ করিল, তাহার পর উঠিয়া উঠানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতে শুরু করিয়া দিল। সে বাট বহিতেছে! আজ যে সে একটা শিশুকে খাইয়া ফেলিয়াছে, আজ তো ঘুমাইবার তাহার উপায় নাই। ইচ্ছা হয়, এই ছাতি-ফাটার মাঠটা পার হইয়া অনেক দূর চলিয়া যায়। লোকে বলে, সে গাছ চালাইতে জানে। জানিলে কিন্তু ভালো হইত। গাছের উপর বসিয়া আকাশ মেঘ চিরিয়া হু-হু করিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইত। কিন্তু ঐ মেয়েটা আর ছেলেটার কথাগুলা শোনা হইত না! উহারা ঠিক কাল আবার আসিবে।

হি হি হি! ঠিক আসিয়াছে! ছোঁড়াটা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, ঘন ঘন ঘাড় ফিরাইয়া পথের দিকে চাহিতেছে। আসিবে রে, সে আসিবে!

তাহার নিজের কথাই তো বেশ মনে আছে। সারাদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় সেই জোয়ানটি ঠিক পুকুরের ঘাটে আসিয়াছিল। তাহার আগেই আসিয়া বসিয়াছিল, পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আপন মনে পা দোলাইতেছিল। সে নিজে আসিয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল।

—এসেছিস? আমি সেই কখন থেকে বসে আছি।

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল। ঠিক সেই কথা, সে তাহাকে এই কথাটিই বলিয়াছিল। ওঃ, ঐ ছোঁড়াটাও ঠিক সেই কথাটিই বলিতেছে! মেয়েটি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; নিশ্চয় সে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

সেদিন সে একটা ঠোঙাতে করিয়া খাবার আনিয়াছিল। তাহার সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, কাল তোর মুড়ি পড়ে গিয়েছিল। লে।

সে কিন্তু হাত বাড়াইতে পারে নাই। তাহার বুকের দুর্দান্ত লোভ—সাপের মত তাহার ডাইনী মনটা বেদের বাঁশী শুনিয়া যেন কেবলই দুলিয়া দুলিয়া নাচিয়াছিল, ছোবল মারিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

তারপর সে কি করিয়াছিল? হ্যাঁ, মনে আছে। সে কি আর ইহারা জানে, না, পারে? ও মাগো! ঠিক তাই। এ ছেলেটাও যে মেয়েটার মুখে নিজে হাতে কি তুলিয়া দিতেছে। বুড়ি দুই হাতে মাটির উপর মৃদু করাঘাত করিয়া নিঃশব্দ হাসি হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িল।

কিন্তু নিতান্ত আকস্মিকভাবেই হাসি তাহার থামিয়া গেল। সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে স্তব্ধভাবে গাছে হেলান দিয়া বসিল। তাহার মনে পড়িল, ইহার পরই সে তাহাকে বলিয়াছিল—আমাকে বিয়ে করবি সরা?

সে কেমন হইয়া গিয়াছিল। কিছু বলিতে পারে নাই, কিছু ভাবিতেও পারে নাই। শুধু কানের পাশ দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, হাত-পা ঘামিয়া টসটস করিয়া জল ঝরিয়াছিল।

সে বলিয়াছিল, এই দেখ, আমি কলে কাজ করি, রোজগার করি অ্যানেক। তা জাতে পতিত বলে আমাকে বিয়ে দেয় না কেউ। তু আমাকে বিয়ে করবি?

ঝরনার ধারে প্রণয়ী যুবকটি বলিল, এই গাঁয়ে সবাই হাঁ-হাঁ করবে—আমার জ্ঞাতগুষ্টিতেও করবে, তোর জ্ঞাতগুষ্টিতেও করবে। তার চেয়ে চল আমরা পালিয়ে যাই। সেইখানে দুজনায় সাঙা করে বেশ থাকব।

মৃদুস্বরে কথা, কিন্তু এই নিস্তব্ধ স্থানটির মধ্যে কথাগুলি যেন স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে। বুড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তাহারাও পৃথিবীর লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছিল,—মাড়োয়ারী-বাবুর কলের ধারেই একখানা ঘর তৈয়ারি করিয়া তাহারা বাসা বাঁধিয়াছিল। 'বয়লা' না কি বলে—সেই প্রকাণ্ড পিপের মত কলটা—সেই কলটায় সে কয়লা ঠেলিত। তাহার মজুরি ছিল সকলের চেয়ে বেশি।

ঝরনার ধারে অভিসারিকা মেয়েটির কথা ভাসিয়া আসিল—উ হবে না। আগে আমার খুঁটে দশটি টাকা তু বেঁধে দে, তবে আমি যাব। লইলে বিদেশে পয়সা অভাবে খেতে পাব না, তা হবে না।

ছি ছি, মেয়েটার মুখে ঝাঁটা মারিতে হয়। এত বড় একটা জোয়ান মরদ যাহার আঁচল ধরিয়া থাকে, তাহার নাকি খাওয়া-পরার অভাব হয় কোনোদিন! মরণ তোমার! রূপার চুড়ি কি, একদিন সোনার শাঁখা-বাঁধা উঠিবে তোমার হাতে। ছি!

ছেলেটি কথার কোনো জবাব দিল না, মেয়েটিই আবার বলিল, কি, রা কাড়িস না যি? কি বলছিস বল? আমি আর দাঁড়াতে লারব কিন্তুক।

ছেলেটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কি বলব বল ? টাকা থাকলে আমি তোকে দিতাম, রূপোর চুড়িও দিতাম, বলতে হত না তোকে।

মেয়েটা বেশ হেলিয়া দুলিয়া রঙ্গ করিয়াই বলিল, তবে আমি চললাম।

—যা।

—আর যেন ডাকিস না।

—বেশ।

অল্প একটু দূর যাইতেই সাদা-কাপড়-পরা মেয়েটি ফুটফুটে চাঁদনীর মধ্যে যেন মিশিয়া গেল। ছেলেটা চুপ করিয়া ঝরনার ধারে বসিয়া রহিল। আহা! ছেলেটার যেমন কপাল! শেষ পর্যন্ত ছেলেটা যে কি করিবে--কে জানে! হয়ত বৈরাগী হইয়াই চলিয়া যাইবে, নয়ত গলায় দড়ি দিয়াই বসিবে। বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল। ইহার চেয়ে তাহার রূপার চুড়ি কয়গাছা দিলে হয় না ? আর টাকা ? দশ টাকা সে দিতে পারিবে না। মোটে তো তাহার এক কুড়ি টাকা আছে, তাহার মধ্য হইতে দুইটা টাকা, না হয় পাঁচটা সে দিতে পারে। তাহাতে কি হইবে ? মেয়েটা আর বোধ হয় আপত্তি করিবে না। আহা! জোয়ান বয়স, সুখের সময়, শখের সময়—আহা। ছেলেটিকে ডাকিয়া রূপার চুড়ি ও টাকা স দিবে, আর উহার সঙ্গে নাতি-ঠাকুরমার সম্বন্ধ পাতাইবে। গোটাকতক চোখা চোখা ঠাট্টা সে যা করিবে!

মাটিতে হাতের ভর দিয়া কুঁজির মত সে ছেলেটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ছেলেটা যেন ধ্যানে বসিয়াছে, লোকজন আসিলেও খেয়াল নাই। হাসিয়া সে ডাকিল, বলি, ওহে লাগর, শুনছ ?

দন্তহীন মুখের অস্পষ্ট কথার সাড়ায় ছেলেটি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল, পর-মুহূর্তেই লাফ দিয়া উঠিয়া সে প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

মুহূর্তে বৃদ্ধারও একটা অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়া গেল; ক্রুদ্ধা মার্জারীর মত ফুলিয়া উঠিয়া সে বলিয়া উঠিল, মর মর—তুই মর। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল, ক্রুদ্ধ শোষণে উহার রক্ত-মাংস মেদ-মজ্জা সব নিঃশেষে শুষিয়া খাইয়া ফেলে।

ছেলেটা একটা আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল। পরমুহূর্তেই আবার উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পলাইয়া গেল।

পরদিন দ্বিপ্রহরের পূর্বেই গ্রামখানা বিস্ময়ে শঙ্কায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সর্বনাশী ডাইনী বাউরীদের একটা ছেলেকে বাণ মারিয়াছে। ছেলেটা সন্ধ্যায় গিয়াছিল ঐ ঝরনার ধারে; মানুষের দেহরসলোলুপা রাক্ষসী গন্ধে আকৃষ্টা

বাঘিনীর মত নিঃশব্দপদসঞ্চারে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। জানিতে পারিয়া ভয়ে ছেলেটি ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাক্ষসী তাহাকে বাণ মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। অতি তীক্ষ্ণ একখানা হাড়ের টুকরা সে মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতেই সেটা আসিয়া তাহার পায়ে গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছে। টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিতেই সে কি রক্তপাত! তাহার পর প্রবল জ্বর; আর কে যেন তাহার মাথা ও পায়ে চাপ দিয়া তাহার দেহখানি ধনুকের মত বাঁকাইয়া দিয়া দেহের রস নিঙড়াইয়া লইতেছে!

কিন্তু সে তাহার কি করিবে?

কেন সে পলাইতে গেল? পলাইয়া যাইবে? তাহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া যাইবে? সেই তাহার মত শক্তিমান পুরুষ—যে আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিত—শেষ পর্যন্ত তাহারই অবস্থা হইয়া গিয়াছিল মাংসশূন্য একখানা মাছের কাঁটার মত।

কে এক গুণীন নাকি আসিয়াছে। বলিয়াছে, এই ছেলেটাকে ভালো করিয়া দিবে। তিলে তিলে শুকাইয়া ফ্যাকাসে হইয়া সে মরিয়াছিল। রোগ—ঘুসঘুসে জ্বর, কাশি। তবে রক্তবমি করিয়াছিল কেন সে?

স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে উন্মত্ত অস্থিরতায় অধীর হইয়া বৃদ্ধা আপনার উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে ছাতি-ফাটার মাঠ আগুনে পুড়িতেছে নিস্পন্দ শবদেহের মত। সমস্ত মাঠটার মধ্যে আজ আর কোথাও এতটুকু চঞ্চলতা নাই। বাতাস পর্যন্ত স্থির হইয়া আছে।

যাহাকে সে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসিত, কোনোদিন যাহার উপর এতটুকু রাগ করে নাই, সেও তাহার দৃষ্টিতে শুকাইয়া নিঃশেষে দেহের রক্ত তুলিয়া মরিয়া গিয়াছে। আর তাহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আক্রোশ, নিষ্ঠুর শোষণ হইতে বাঁচাইবে ঐ গুণীনটা!

হি-হি করিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে সে হাসিয়া উঠিল। উঃ, কি ভীষণ হাঁপ ধরিতেছে তাহার। দম যেন বন্ধ হইয়া গেল। কি যন্ত্রণা, উঃ—যন্ত্রণায় বুক ফাটাইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। ঐ গুণীনটা বোধ হয় তাহাকে মন্ত্রপ্রহারে জর্জর করিবার চেষ্টা করিতেছে। কর, তোর যথাসাধ্য তুই কর।

এখান হইতে কিন্তু পলাইতে হইবে। তাহার মৃত্যুর পর বোলপুরের লোকে যখন তাহার গোপন কথাটা জানিতে পারিয়াছিল, তখন কি দুর্দশাই না তাহার করিয়াছিল। সে নিজেই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল। কলের সেই হাড়ীদের

শঙ্করীর সহিত তাহার ভাব ছিল, তাহার কাছেই সে একদিন মনের আক্ষেপে কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল।

তাহার পর সে গ্রামের বাহিরে এক ধারে লোকের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া বাস করিতেছে। কত জায়গাই যে সে ফিরিল। আবার যে কোথায় যাইবে!

ও কি! অকস্মাৎ উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরের তন্দ্রাতুর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটি উচ্চ কান্নার রোল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধা স্তব্ধ হইয়া শুনিয়া পাগলের মত ঘরে ঢুকিয়া খিল আঁটিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সন্ধ্যার মুখে সে একটি ছোট পুঁটলি লইয়া ঐ ছাতি-ফাটার মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িল। পলাইবে—সে পলাইবে।

একটা অস্বাভাবিক গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। সমস্ত নিথর, স্তব্ধ। তাহারই মধ্যে পায়ে পায়ে ধূলা উড়াইয়া বৃদ্ধা ডাইনী পলাইয়া যাইতেছিল। কতকটা দূর আসিয়া সে বসিল, চলিবার শক্তি যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না।

অকস্মাৎ আজ বহুকাল পরে তাহার নিজেরই শোষণে মৃত স্বামীর জন্য বুক ফাটাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, ওগো, তুমি ফিরে এস গো!

উঃ, তাহার নরুন-দিয়া চেরা ছুরির মত চোখের সম্মুখে আকাশের বায়ুকোণটা তাহার চোখের তারার মতই খয়ের রঙের হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত পায়ের ধূলার আস্তরণের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া কালবৈশাখীর ঝড় নামিয়া আসিল। সেই ঝড়ের মধ্যে বৃদ্ধা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল! দুর্দান্ত ঘূর্ণি ঝড়। সঙ্গে মাত্র দুই-চারি ফোঁটা বৃষ্টি।

পরদিন সকালে ছাতি-ফাটার মাঠের প্রান্তে সেই বহুকালের কণ্টকাকীর্ণ খৈরী গুল্মের একটা ভাঙা ডালের সুচালো ডগার দিকে তাকাইয়া লোকের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না; শাখাটার তীক্ষ্ণাগ্র প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাকিনী। আকাশ-পথে যাইতে যাইতে ঐ গুণীনের মন্ত্রপ্রহারে পঙ্গুপক্ষ পাখির মত পড়িয়া ঐ গাছের ডালে বিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে। ডালটার নীচে ছাতি-ফাটার মাঠের খানিকটা ধূলা কালো কাদার মত ঢেলা বাঁধিয়া গিয়াছে। ডাকিনীর কালো রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছে।

অতীত কালের মহানাগের বিষের সহিত ডাকিনীর রক্ত মিশিয়া ছাতি-ফাটার মাঠ আজ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকের দিকচক্ররেখার চিহ্ন নাই; মাটি হইতে আকাশ পর্যন্ত একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। সেই ধূসর শূন্যলোকে কালো কতকগুলি সঞ্চরমাণ বিন্দু ক্রমশ আকারে বড় হইয়া নামিয়া আসিতেছে।

নামিয়া আসিতেছে শকুনির পাল।

তিন শূন্য

এক কঙ্কালসার মূর্তি, পাঁজরাগুলো শুধু চামড়ায় ঢাকা, ক্ষুধাতুর অগ্নিগর্ভ কোটরগত চোখ, পিঙ্গল রুক্ষ চুল, ক্রুদ্ধ কুকুরের মত মুখভঙ্গি, বিস্ফারিত ঠোঁট দুটোর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে তীক্ষ্ণ হিংস্র শ্বাদন্ত দুটো, হাতেও তেমনই হিংস্র বড় বড় নখ, গলায় হাড়ের মালা, নগ্ন দেহ, পরনে কোমরে শ্মশান থেকে কুড়িয়ে-নেওয়া রক্তচিহ্নময় এক টুকরো ন্যাকড়া, হা-হা করে হাসতে হাসতে এসে দেশটায় প্রবেশ করল।

দুর্ভিক্ষ সে। তার অট্টহাসিতে দেশটা শিউরে উঠল। তার নিশ্বাসে বাতাস হয়ে উঠল রসহীন, সে চোখের দৃষ্টিতে দেশের জল গেল শুকিয়ে, তার ক্ষুধার্ত উদর পরিপূর্ণ করতে ধরণী-জননীর প্রসাদ শস্যভাণ্ডার হয়ে গেল শূন্য; তারপর সে আরম্ভ করল মানুষের রক্ত-মাংসে আপনার উদর পরিপূর্ণ করতে।

ভয়ার্ত মানুষ উন্মত্ত পশুর মত ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল। সে হা হা করে হাসে আর চীৎকার করে, হা অন্ন, হা অন্ন! মানুষও ভয়ার্ত স্বরে কাঁদতে কাঁদতে প্রতিধ্বনি করে, হা অন্ন, হা অন্ন!

প্রকাণ্ড বড় ধনীর বাড়ি।

বাড়ির দোরে অন্নভিক্ষু কাঙালের ভিড় জমে গেছে। এক মুঠি ভাত, খানিকটা ডাল, শাকে-পাতে খানিকটা অখাদ্য, এই বরাদ্দ। সেই অপরাহ্নে, বেলা চারটের সময়!

এরা কিন্তু সকাল থেকেই বসে থাকে। পেট জ্বলে খাক হয়ে যায় তবু প্রত্যাশায় ওরা সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকে! কেউ কারও মাথার উকুন বাছে, কেউ তাকিয়ে থাকে নর্দমার দিকে—ওই দিকে ভাতের ফেন গড়িয়ে এসে পড়বে, ক্বচিৎ কেউ ব্যর্থ ভিক্ষায় গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ফিরে ফিরে বেড়ায়।

—চারটি মুড়ি দেবা মা!

—কে লা, কে, কোন হতচ্ছাড়ি? মুড়ি দেবা মা, কেতাত্ত করে দিলে!

কোনো বাড়ির একটা চাকর কুয়ো থেকে জল তুলছিল, দুটো ছোট ছেলে একটা ভাঁড় হাতে এসে দাঁড়াল।

—একটুকু জল দাও গো?

—কাদের ছেলে বটিস ?

—মুচিদের মশায়।

—কে কে আছে তোদের ?

—মা আছে শুধু বাবু, আর কেউ নাই।

—হুঁ ! কোনটো তোর মা ? সেই গালকাটা মেয়েটা বুঝি ?

—হ্যাঁ মশায়। একটুন জল দাও মশায় !

—ভাগ, হারামজাদা, ভাগ।

ছেলে দুটো ভয়ার্ত ভাবে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে।

চাকরটা ঘৃণা ভরে মাটিতে থুথু ফেলে বলে, হারামজাদীকে দেখলে গা ঘিন ঘিন করে ওঠে।—বেরো বেটার ছেলেরা !

ছেলে দুটো সভয়ে সরে আসে। চাকরটার কিন্তু মায়াও হয়, সে ডাকে, আয় আয়, নিয়ে যা !

ছেলে দুটো আবার সভয়েই এগিয়ে এসে ভাঁড়টা পেতে দাঁড়ায়। চাকরটা জল ঢেলে দেয় ! কিন্তু তৃষ্ণা তো ওদের সহজ নয়, অগস্ত্যের তৃষ্ণা, তা ছাড়া আছে ক্ষুধা, ঢক ঢক করে ভাঁড়ের পর ভাঁড় নিঃশেষিত করে শূন্য উদর পূর্ণ করে নিয়ে বলে, আঃ !

চাকরটা রসিকতা করে বলে, আয়, গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিই, কুয়োর ভেতর দিনরাত জল খাবি।

একটা ছেলে ছুটে খানিকটা এগিয়ে এসে বলে, পালিয়ে আয় রে, মারবে।

অপরটাও পালায়।

ওদিকে তখন কঙ্কালের দলের মধ্যে কলহ বেধে গেছে। নর্দমা দিয়ে গড়িয়ে-পড়া ফেনের ভাগ নিয়ে কলহ। তারস্বরে কদর্য অশ্লীল কুৎসিত বাক্য-বিনিময়ের বিরাম ছিল না।

একটা পুরুষ একটা মেয়ের টুঁটি টিপে ধরেছে। মেয়েটার তিনটি ছেলে, পুরুষটার অঙ্গে কেউ ধরেছে কামড়ে, একজন দুই হাতে তাকে খামচে ধরে আছে, আর একজন ইটভাঙা কুড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে আঘাত করছে।

এ ছেলে দুটো সে দৃশ্য দেখে হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল।

ওদিকে এক বৃদ্ধ, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, বসে বসে আপন মনে বকছে, জনমে আমি এমন ছাইপাঁশ খাই নাই, খাব না, খেতে পারব না। শালারা ভাত দিচ্ছে, পুণ্যি হচ্ছে, না ছাই হচ্ছে !

এক অন্ধ বুড়ি গালাগালি দিচ্ছে ঈশ্বরকে। একেবারে ওদিকে দুটি যুবতী

মেয়ে বটপাতার ঠোঙায় করে খাচ্ছে পাকা অশ্বত্থবীজ। সাঁওতালেরা খায়, খেতে দুর্গন্ধ তবু খাওয়া যায়। একটি মেয়ে বেশ সুশ্রী।

—এই এই, মারামারি করছ কেন? এই, ছাড় ছাড়। এই, হারামজাদা শুয়ার!—একটি ভদ্রলোক পথে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। ধমক খেয়ে পুরুষটি মেয়েটির গলা ছেড়ে দিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগল মেয়েটার দুর্বিনীত স্বার্থপর ব্যবহারের কথা।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাও চীৎকার জুড়ে দিলে।

ভদ্রলোকটির কিন্তু সেদিকে মন ছিল না, দৃষ্টি ছিল না। সে দেখছিল ওই যুবতী মেয়ে দুটিকে।

মেয়ে দুটি সঙ্কোচে পেছন ফিরে বসল।

ভদ্রলোকটি ধমকে বলে উঠল, মারামারি করবি তো দোব সব তাড়িয়ে এখান থেকে।

অন্ধ বুড়ি বলে, তাই দাও বাবা, তাই দাও। আপদরা কোথা থেকে কোথা এসেছে তাই দেখ কেনে! দাও তাড়িয়ে।

ভদ্রলোক এইবার একে একে জিজ্ঞাসা করে, কার কোথায় বাড়ি।

—তোর? তোর? তোর?

—এই, তোদের দুজনের বাড়ি কোথা?

মেয়ে দুটি পেছন ফিরে তাকালে।

—কোথায় বাড়ি?

একজন বললে, আজ্ঞে, সাউগাঁ মশায়।

—হুঁ। এঃ তোদের কাপড়ের দশা যে দেখছি কিছু নেই রে।

এবার তারা দুজনেই সকরুণ দৃষ্টিতে তাকায়। ভদ্রলোকটি ইঙ্গিতময় হাসি হেসে মৃদুস্বরে বলে, দোব, কাপড় দোব।

তারা মুখ নামায়।

ভদ্রলোক পেছন ফিরে দেখলে, সকলে কুৎসিত হাসি হাসছে। সে চলে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই তাকে আবার দেখা যায়। একটা অন্তরালময় স্থানে দাঁড়িয়ে সে ওই ওদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। হাতে তার কাপড় পুরানো, কিন্তু সৌখীন-পাড় শাড়ি। অভাবপূরণই মনকে শুধু আকর্ষণ করে না, যেন তার সৌন্দর্যও মনকে বিভ্রান্ত করে, লোলুপ করে।

মেয়ে দুটির দৃষ্টিও সেদিকে পড়েছিল। কিন্তু সঙ্কোচে ভয়ে তাদের বুক

ঘুর ঘুর করছিল। তারা মাঝে মাঝে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখেও অগ্রসর হতে পারে না। আঃ, কি কোমল মসৃণ কাপড় দুখানার জমি, আর কি সুন্দর ওর পাড়!

—এই, আয় না!

মৃদুস্বরে কথা বলে হাত নেড়ে ভদ্রলোক ডাকে।

ঝাঁ ঝাঁ করছে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন, আকাশ থেকে অবিরাম আগুন বর্ষণ হচ্ছে। পায়ের তলায় ধরিত্রী যেন উত্তাপে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। কাঙালীর দল জটলা বেঁধে এক জায়গায় বসে নেই। এখানে ওখানে সামান্য সামান্য ছায়া বেছে নিয়ে শূন্য উদরেও উত্তাপের শ্রান্তিতে ঢুলছে।

বার বার এদিক ওদিক দেখে একটি মেয়ে এগিয়ে এল। অত্যন্ত নিম্নস্বরে কি বলে, ভদ্রলোক বললে, এই নে আবার নতুন দোব, টাকা দোব, বুঝলি?

মেয়েটা কিছুই বলতে পারে না।

আবার ভদ্রলোক বলে, বুঝলি?

মেয়েটা ঘাড় নাড়ে।

ওদিকে চীৎকার ধ্বনিত হয়ে উঠল, চীৎকার নয়, কোলাহল। উচ্ছিষ্ট বিতরণের সময় হয়েছে।

মেয়েটাও তাড়াতাড়ি চলে যায়।

অন্ধকার রাত্রি।

বনে বিচরণ করে শ্বাপদের দল, গলিতে খুঁজিতে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে নিঃশব্দে এঁকে বেঁকে ঘুরে বেড়ায় সরীসৃপ, সাপ, বিছে; কেঁচোগুলোও মাটি তোলে, গায়ে ঝরে লালা।

তার মাঝে মানুষও বেড়ায়, এমন নিঃশব্দে সন্তর্পণে। অন্ধকার, কোথায় অন্ধকার? তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করে বহুদূর ঘুরে বেড়ায়। সেই ভদ্রলোকটি ঘুরে বেড়ায়, হাতে একটি ঠোঙা।

কই, কোথায়? এইখানেই তো থাকবার কথা! কই?

একটা ভাঙা ঘর, ঘরের সম্মুখে খানিকটা পরিষ্কার স্থান, তার পরই একটা বাঁধাঘাট। এই ঘাটেই তো থাকবার কথা!

ওখানে কে শুয়ে? পরিষ্কার উন্মুক্ত স্থানটায় শুয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে কে?

তীব্র দৃষ্টি হেনে চেনা গেল, সেই কানা বুড়িটা।

ঘরে কাসছে কে?

কান পেতে শুনে বোঝা গেল, পুরুষ। তবুও ঘরে ঢুকে দেখলে, একটা পুরুষই, কিন্তু কে তা বোঝা গেল না, বোঝবার দরকারও নেই !

কোথায়, কোথায় ?

উন্মত্ত লালসা বুকে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে। মাথার ওপর আকাশে অগণ্য নক্ষত্র ঝলমল করছে, মাঝে মাঝে দু-একটা খসেও যাচ্ছে।

ওই বেনেদের পড়ো বাড়িটায় নেই তো ?

আবার সন্তর্পণে এগিয়ে চলে। হ্যাঁ, মানুষের নিঃশ্বাস পাওয়া যায়।

চোখের দৃষ্টি জ্বলে ওঠে, তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে।

এই তো ! হ্যাঁ !

না, এ নয় ! এই, হ্যাঁ এই।

তারপর ?

মেয়েটা সভয়ে চীৎকার করে উঠে। কিন্তু মুহূর্তে সে চীৎকার বন্ধ হয়ে যায়, মুখের উপর হাত চাপা পড়ে।

—চুপ !

মেয়েটা প্রাণপণে বাধা দিতে চায়, কিন্তু পারে না। নিস্তেজ, অসাড় হয়ে পড়ে ক্রমে।

মেয়েটা কাঁদে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কি সকরুণ কান্না ! নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। আকাশে একটা উজ্জ্বল তারা খসে যায়।

—আঃ, কাঁদছিস কেন ? এই নে, টাকা নে।

রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেও রজতপ্রভা ঢাকা পড়ে না। কিন্তু তবুও সে কাঁদে।

—ও, দাঁড়া দাঁড়া এক ঠোঙা খাবার এনেছি নে।

অদূরে ভাঙা প্রাচীরের উপর রক্ষিত ছিল ঠোঙাটা। সেটা এনে হাতে তুলে দিলে।

মেয়েটা হাত দিয়ে কি অনুভব করে, কি বস্তু।

লোকটি চলে যায়।

মেয়েটা বসে থাকতে থাকতে একটুকরো খাবার মুখে তোলে। অপূর্ব সুস্বাদু। আবার একটুকরো মুখে তোলে, আবার ! তারপর সেই অন্ধকারে নিঃশব্দে সে নিঃশেষ করে খেয়ে ফেলে। সঙ্গী বোনটাকে পর্যন্ত জাগায় না। সে নিথর হয়ে ঘুমুচ্ছে।

সেই অন্ধকার রাত্রে সেই ভীষণ কুৎসিতমূর্তি দুর্ভিক্ষ বসে বসে মানুষের

চামড়ার খাতায় হাড়ের কলম দিয়ে জমা-খরচ করছে। কালি নেই, লাল কালি ফুরিয়ে গেছে, যেটুকু অবশিষ্ট তার রঙ হয়ে গেছে জলের মত। চামড়ার ওপর চিরে চিরে লেখে সে। বিধাতার হিসাব-নিকাশের খাতার ক-পাতা লেখবার ভার এখন তার ওপর পড়েছে। মুখে তার বীভৎস হাসি, হিংস্র আনন্দে ভীষণ দাঁতগুলি ঈষৎ বিস্ফারিত, সে বিস্ফারণের জন্য কদর্য নাকটা কুঁচকে উঠেছে।

হিসেব তার অনেক।

পরদিন প্রাতঃকালে দেখা যায়, একটা কঙ্কালসার জীর্ণ বৃদ্ধাকে জীবন্ত অবস্থাতেই টেনে নিয়ে গেছে শেয়ালে। প্রায় অর্ধেকটা তার ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। বক্ষপঞ্জরটাই আগে শেষ করেছে। বুড়ির চোখ দুটো মৃত্যুর পরও বিস্ফারিত হয়ে আছে। আতঙ্কিত বিস্ফারিত দৃষ্টি।

এদিকে সেই মেয়েটার এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

মাথার চুল রুক্ষ নয়, পরনে পরিচ্ছন্ন শৌখিন কাপড়, মুখেও তার অনাহারের ক্লেশের ছাপ আঁকা নেই, অতি সূক্ষ্ম তৃপ্তি হাসি ঠোঁটের কোণে প্রচ্ছন্নভাবে খেলা করে।

কিন্তু মাস খানেকের মধ্যেই তার শরীর কেমন অসুস্থ হয়ে উঠল। একটা জর্জর অবসাদময় ভাব, সর্বাঙ্গে বেদনা। কিছু ভালো লাগে না। আর কয়দিন পরই সর্বাঙ্গ ছেয়ে গেল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকে।

মেয়েটা শঙ্কিত বিস্ময়ে আপন অঙ্গের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে। ঝর ঝর করে অবশেষে কেঁদে ফেলে।

রাত্রে সে আপনার জীবন-দেবতার কাছে করুণভাবে সব নিবেদন করে।

সে আশ্বাস দেয়, ভয় কি, ভালো হয়ে যাবে। ওষুধ এনে দোব।

পরম আশ্বাস নিয়ে মেয়েটি বসে থাকে। রোজ ভাবে, সে আজ আসবে ওষুধ নিয়ে; যাদুমন্ত্রের মত একদিনে সমস্ত রোগ মুছে যাবে। প্রভাতে উঠে দেখবে, তার দেহ আবার পূর্বের মত মসৃণ শ্রীময়ী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কোথায় কি? সে আর আসে না। তাকে খুঁজেও পাওয়া যায় না। আর পেলেই বা কি হবে? দিনের আলোতে কেমন করে জাগ্রত পৃথিবীর দৃষ্টির সম্মুখে তার কাছে দাবি জানাবে? সে দাবি কি তার আছে? কল্পনা মাত্রেই ভয়ে তার বুক গুরু গুরু করে ওঠে।

কয়দিন পর আর তাকে গ্রামে দেখা যায় না। সে পালায়, তাদের স্বজাতীয় গ্রাম্য চিকিৎসকের উদ্দেশে চলে যায়।

বৎসর তিনেক পর আবার তাকে দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। দুর্ভিক্ষ নেই, কিন্তু তবুও তার কঙ্কালসার দেহ, সর্বাঙ্গে থকথকে ঘা। ক্ষতের দুর্গন্ধে মানুষ দূরের কথা, পশুরও বমি আসে।

মেয়েটার কোলে একটা শিশু।

দুর্ভিক্ষের বরলাভ করে এসেছে সে; তেমনই কদর্য চেহারা, তার ওপর পঙ্গু, পশুর মত হাতে পায়ে ভর দিয়ে চলে। চোখে পিচুটি, অবিরাম বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে; মুখে ভাষা নেই, রব আছে, মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে লালা।

পশুর মত চীৎকার করে সে মায়ের স্তনবৃন্ত দন্তাঘাতে রক্তাক্ত করে তাই লেহন করে। কেন, কেন সেখানে স্তন্য সঞ্চিত নেই? উদরে যে তার দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।

মাও দারুণ যন্ত্রণায় ছেলেটাকে নির্মমভাবে প্রহার করে।

—এই মাগী, এমন করে ছেলে মারছিস কেন?

মেয়েটা চমকে ওঠে, তার মুখ প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে মৃদুস্বরে বললে, বাবু!

—আঃ, সর সর সর। কি দুর্গন্ধ!

—আমাকে চিনতে লারছ বাবু? আমি—

—হারামজাদী, বেরো, বেরো বলছি।

ভদ্রলোক সত্যই তাকে চিনতে পারে না। চেনবার উপায়ও রাখে নি রোগে।

মেয়েটা শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। আর কিছু না, অভিসম্পাত দেবার মতনও মনের উগ্রতা নেই! একটা অত্যন্ত শিথিল হতাশায় জীবনের তারগুলো যেন ঝিমিয়ে নেতিয়ে পড়েছে। আঘাতের প্রতিঘাতে ধ্বনি তোলবার শক্তিও তাদের নাই!

আরও পনের বৎসর চলে গেছে।

রোগগ্রস্তা কুৎসিত মেয়েটা অনেক আগেই মরে খালাস পেয়েছে। কিন্তু বর্বর পশুর মত ছেলেটা বেঁচে আছে। সে হাতে পায়ে হেঁটে বেড়ায়, এখনও মুখ দিয়ে লালা ঝরে, চোখে ঝরে জল।

বোধ করি, মায়ের বুকের বিষ সে উদ্গার করে, আর মায়ের শেষ-করতে-না-পারা কান্না কাঁদে।

তারই মধ্যে সে হাসে। হাতে পায়ে হেঁটে সে গিয়ে উপু হয়ে গৃহস্থের দোরে বসে, 'আঁউ আঁউ' করে চীৎকার করে।

গৃহস্থেরা হাসে, আবার করুণাও করে, উপবাসী তাকে একদিনও থাকতে হয় না।

ছেলেরা তাকে ডাকে, হনুমান।

বয়স্কেরা বলে, ল্যালা।

ল্যালা ঘুরে বেড়ায় আপন খেয়ালে। তার যত কৌতুক পশুর সঙ্গে, ছাগল ভেড়ার বাচ্চা ধরে তাদের অসহ্য যন্ত্রণা দেয়, তারা চীৎকার করে, ও হাসে। জঙ্গলে জঙ্গলে সে হনুমান ধরার জন্যে ছোটে।

ক্ষুধার উদ্রেক হলেই গ্রামের মধ্যে ছুটে আসে।

গৃহস্থের মেয়েরা বলে—এসেছিস ?

সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে হাসে।

—দে রে, ল্যালা এসেছে, এঁটোকাঁটাগুলো দে।

ল্যালা তাই পরম পরিতৃপ্তি সহকারে খায়! মাঝে মাঝে কোনো খাদ্য ভালো লাগলে চেঁচায়, আঁ—আঁ—আঁ।

সেই দ্রব্যটা তুলে দেখিয়ে চেঁচায়, পুনরায় না-পাওয়া পর্যন্ত থামে না।

সে জানে না, কতখানি তার দাবি। কিম্বা হয়ত মানে না।

মেয়েরা হেসে বলে, ল্যালা নাছোড়বান্দা।

এক একদিন রাত্রে অকস্মাৎ ক্ষুধা বোধ হলে সে লোকের গোশালায় গরুর ডাবা খুঁজে বেড়ায়। সে জানে ওর মধ্যে পচা বাসি ভাত পাওয়া যায়!

অকস্মাৎ ল্যালা যেন কেমন হয়ে ওঠে। ক্ষুধার তাড়না বোধ হয় কমে গেছে। সে এখন বনে জঙ্গলেই বসে থাকে, যতক্ষণ দিবালোক থাকে ততক্ষণ সে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে পশুদের খেলা দেখে। মধ্যে মধ্যে আনন্দে করতালি দিয়ে ওঠে!

কখনও কখনও নিদারুণ অস্থিরতায় প্রচণ্ড আবেগে সে মাটির বুকে গড়াগড়ি দেয়। কখনও বা শীতল জলে আকণ্ঠ ডুবিয়ে বসে থাকে।

রাত্রির অন্ধকারে যখন আর কিছু দেখা যায় না, তখনই সে গ্রামে এসে আহারের অন্বেষণ করে—গোশালায়, গৃহস্থের বহির্দ্বারে।

সেদিন অন্ধকারে সে আহার খুঁজছিল। কোথাও এক কণাও নেই। ল্যালা বসে ভাবে। মধ্যে মধ্যে আহারের চিন্তাও তার বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়।

আবার কতক্ষণ পর তার ক্ষুধার জ্বালা অনুভূত হয়। সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। লোকের বদ্ধদ্বারে আঘাত করে, আঁ—আঁ—আঁ।

কিন্তু গভীর ঘুমে নিস্তব্ধ পুরী, সাড়া মেলে না। ল্যালা আবার চলে।

একটা নর্দমা। ল্যালা তারই সম্মুখে বসে ভাবে। তারপর সে ওই নর্দমা দিয়ে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করে। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, তবুও তার প্রচণ্ড চেষ্টা শিথিল হয় না। অবশেষে সে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে। উঠানেই রাত্রের উচ্ছিষ্ট বাসন গাদা হয়ে আছে। ল্যালা পরমানন্দে সেইগুলো চাটে।

আর ? আর কই ? সে ঘরের বারান্দায় ওঠে। সম্মুখের ঘরে মৃদু আলোক জ্বলছে ! ল্যালা দরজার সম্মুখে গিয়ে দরজাটা ঠেলে।

দরজা খোলে না।

এবার সে মাথা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে বন্ধদ্বারটা ঠেলে। ঘরের খিলটা বোধ হয় শক্ত ছিল না, সেটা এবার ভেঙে খুলে যায়। ল্যালা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

মৃদু আলোকে অস্পষ্ট দেখা যায় চোদ্দ-পনের বৎসরের একটি মেয়ে পরম নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন। পাশে তার দু-তিনটি ছোট ছেলে। নিশ্চিন্ত নিদ্রায় তার সর্বাঙ্গের আবরণ শিথিল হয়ে তার নগ্নরূপ মৃদু-আলোকচ্ছটায় অপরূপ লাবণ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ল্যালার বুকের মধ্যে ক্ষুধার আবেগ মুহূর্তে লুপ্ত হয়ে যায়। জেগে ওঠে সেই প্রচণ্ড আবেগ--অদ্ভুত—দুর্নিবার। দেহে তার অদ্ভুত পরিববর্তন ঘটে যায়।

তারপর ?

ফুলের মত নিষ্পাপ বালিকা, আর্ত চীৎকার করে ওঠে। কিন্তু ল্যালার নিষ্পেষণে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নির্বাক হয়ে যায়। ল্যালা স্তব্ধ ; তার রব পর্যন্ত নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

অদৃশ্য লোকে, বিধাতার খাতার হিসেব-নিকেশ মুহূর্তের জন্য বন্ধ নেই। সেখানে জমা-খরচের একটি হিসেবে সেদিন দুই দিকেই দাঁড়িটানা হয়ে যায়। একটা হিসেব শেষ হল।

নীচে পড়ল তিনটে শূন্য।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

বর্তমান কথা সে মহাভারতের কথা নয়, নব ভারতের কথা। একদিকে সোমনাথ মন্দিরের পুনর্গঠন আর একদিকে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন যে ভারতে হচ্ছে, সেই ভারতের কথা।—

ভূতত্ত্ববিৎ এবং মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার মুখের চুরুটটি নামিয়ে রেখে বেশ আসন-পিঁড়ি হয়ে বসলেন—চেষ্টা করলেন নৈমিষারণ্যে মহাভারতবক্তা সৌতির মতই মুখভাবকে পবিত্র এবং দৃষ্টিকে স্বপ্নপ্রবণ করে তুলতে।

এতক্ষণে আমি আশ্বস্ত হলাম। কিছুদিন থেকেই শুনছিলাম, বিদগ্ধজনদের মধ্যেও যিনি নাকি বকের মধ্যে হংসতুল্য বিদগ্ধ, যাঁর নাসা উচ্চ, ওষ্ঠ বক্র, বাকবিস্তারভঙ্গি তীর্যক এবং তীক্ষ্ণ, যাঁর দুটি চোখের একটি অহরহই কৌতুকে চঞ্চল এবং অপরটি উজ্জ্বল, মনেপ্রাণে বিজ্ঞানবাদী, বিলেতে-পাস মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার সেই অমল চৌধুরীর নাকি আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে পরিবর্তন এমন যে, দেখে পুরনো মানুষটিকে নাকি চেনবার উপায় নেই। লম্বা একটা পর্যটন সেরে এসেছে সম্প্রতি এবং সেই থেকেই এমনটা ঘটেছে। শুনেছিলাম অনেকের কাছেই, কারুর সঙ্গে নাকি দেখাও বিশেষ করে না। অবশেষে একদিন কৌতুহলী হয়ে নিজেই গেলাম। চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। শীর্ণ হয়ে গেছে অমল। দীর্ঘ পথশ্রমের চিহ্ন তো বটেই, তার উপরেও যেন কিছু আছে। পরিবর্তন বাইরে থেকে সত্যই সুস্পষ্ট। আমি সরাসরিই প্রশ্ন করলাম। অমল হাসলে। এ হাসিও তার মুখে নূতন। কিন্তু এতক্ষণে এই কথাগুলি শুনে আশ্বস্ত হলাম! বাকভঙ্গির বক্র বিস্তার-গতি এবং তীক্ষ্ণমুখিত্ব ঠিকই আছে; বসবার ভঙ্গিতে তার অভিনব প্রচেষ্টাতেও পুরনো অমল চৌধুরী ফিরে এসেছে।

পরিবর্তনের কথাসূত্রেই কথাগুলি অমল বলছিল। সে স্বীকার করলে, একটা পরিবর্তন তার হয়েছে। তার মন বুদ্ধি বিদ্যা সমস্ত কিছুর উপর একটা ঘটনার এমন প্রবল প্রভাব পড়েছে যে, এ পরিবর্তন তার অবশ্যম্ভাবী। একে অতিক্রম করার তার সাধ্য নেই। বললে, আমি ভাবছি। বসে বসে ভাবি, ধ্যান করি—বললে আশ্চর্য হয়ো না যেন। ধ্যান করি।

বললাম, বল কি? তা হলে আশ্চর্য না হয়ে উপায় কি? তুমি ধ্যান কর? কার?

অমল বললে, আগে শোন। অন্য কাউকে এ ঘটনার কথা বলি নি। তুমি সাহিত্যিক বলে বলছি, তুমি উপলব্ধি করতে পারবে। এ ধ্যান কারও ধ্যান নয়, কিছুর ধ্যান। বলেই, শুরু করলে, ভারতের ধ্যান, মহাভারতের কথা অমৃত সমান। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি আশ্বস্ত হলাম তার বাকভঙ্গি শুনে।

অমল বললে, আগে শোন। তারপর হেস। তোমার ঠোঁট দুটিতে চাপা হাসি খেলা করছে আমি দেখতে পাচ্ছি। জান বোধ হয়, দামোদর-ভ্যালি প্রজেক্টের একটা আশঙ্কা আছে। সব জিনিসেরই দুটো দিক আছে—ভালো এবং মন্দ, আশা এবং আশঙ্কা। মন্দ ফলের আশঙ্কার একটা হল দামোদর এবং তার সঙ্গে ছোট বড় নদীকে বাঁধ দিলে খনি-অঞ্চলে খনির ভিতরে জলের চাপ বাড়বে, যার ফলে, অনেক খনি হয়ত কাজের অযোগ্য হয়ে যাবে। সেই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি ঘুরছিলাম। মোটা মাইনে পাই, কাজটা মাইনের পরিবর্তে এটা ঠিক। কিন্তু এইটুকু বিশ্বাস কর যে, আমার আগ্রহ মাইনের বাটখারায় ওজন করা চলত না। যদি বল খাঁটি চাকর, তাই বল। কিন্তু প্রভুদের সর্বতোভাবে মনোরঞ্জন করবার জন্যে বললে, মারামারি করব। কারণ রিপোর্টে খনির মালিকদের সুবিধা করে দিতে কোনো মিথ্যা বা কোনো অতিরঞ্জন আমি করি নি। একটা অন্ধ সন্ধানের নেশা লেগেছিল আমার।

একখানা সর্বত্রগামী জীপ এবং তার সঙ্গে একটা ট্রেলার, তাতে জন তিনেক অনুচর ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে ওই অঞ্চলে ঘুরছিলাম। এই অবস্থায় হঠাৎ একদা বাহন অর্থাৎ জীপটি ওল্টালেন। ছিটকে পড়ে অল্প আঘাত পেয়ে ড্রাইভার, আমি এবং একজন অনুচর ঝেড়েঝুড়ে উঠলাম; কিন্তু বাকী দুজন অনুচর বেশ আঘাত পেল এবং বাহনও হল অক্ষম—চিত হয়ে উল্টে পড়া জীপ সোজা হল, কিন্তু তখন তিনি চলচ্ছক্তিহীন।

আদিবাসীদের অঞ্চল। তিন দিক ঘন অরণ্যে ঘেরা একটা পাহাড়ে জায়গা। ঠিক এই জায়গাটার অরণ্য অবশ্য ক্ষীণ, শুধু শাল, মহুয়া, পলাশ গাছ ছড়িয়ে ছড়িয়ে জন্মেছে। এক একটা পাথুরে টিলা—খানিকটা ঢাল, আবার একটা টিলা, মাঝখানে মাঝখানে ছোট একটা নালা বা কাঁদর; দু পাশের টিলার জল বেয়ে অনেকগুলোতে মিলেমিশে হয় বরাকর বা ক্ষুদে বা দামোদর মহারাজের কোনো করদ নদীতে গিয়ে পড়েছে। বন যেখানে ঘন, সেখানটা বোধহয় মাইল দশেক দূর। অনেক চিন্তা করে ঠিক করলাম, অচল বাহনটিকে ঠেলে পিছনে মাইল চারেক নিয়ে গিয়ে মেরামত করিয়ে নিক ড্রাইভার এবং ওখানেই জখম

অনুচর দুজনের চিকিৎসা হোক। আমি ইতিমধ্যে একলাই এ অঞ্চলটা যথাসাধ্য ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে ফেলি। এইভাবে পদব্রজে ঘোরার অভ্যাস আমার আগে থেকেই ছিল সে তথ্য অজানা নয় তোমার। এবং এক সময় ডিসপোজালের ডিপোয় ডিপোয় ঘুরে অন্তত পঁচিশটে পঁচিশ রকমের ঝোলাই কিনেছিলাম এমনই ভাবে ঘুরব বলে। তেমনই ঝোলা একটা পিঠে বাঁধলাম। বগলে সন্ন্যাসীদের মত ঝুলিয়ে নিলাম ছোট একটা বিছানা। জামার তলায় কোমরে বেঁধে নিলাম আত্মরক্ষার সরঞ্জামের বেল্ট—তাতে রইল একটা খোকা আগ্নেয়াস্ত্র, একটা ছোরা, কিছু বুলেট।

সুন্দর দেশ। অরণ্যে ঘেরা অঞ্চল এবং পাহাড়ে আমেজ। ঘন বন যেখানেই পাতলা হয়েছে, সেইখানেই ছোট ছোট বসতি গড়ে উঠেছে। আর্য-অভিযানের ইতিহাসের কথা ছেড়ে দাও। তবে সভ্যতা যত এগিয়ে এসেছে, আদিবাসীরা তত পিছিয়েছে। বনের আড়াল দিয়ে বাস করেছে। কিন্তু এই অঞ্চলটি যেন অন্য অঞ্চল থেকেও পৃথক। সমস্ত পৃথিবী থেকেই বিচ্ছিন্ন।

ছোট ছোট গ্রাম। ছোট ছোট ঘর। কালো মানুষ। আচারে বন্য। বেশভূষায় আহারে অনেক কিছু এমন আছে যা নাকি বর্বর এবং অস্বাস্থ্যকর আমাদের বিচারে। বসতিগুলি বড় পরিচ্ছন্ন এবং স্বল্প বেশবাস ক্ষারে কাচা পরিষ্কৃত। কিন্তু ঘরগুলি ছোট, বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা নেই, সে দিক দিয়ে অস্বাস্থ্যকর। কাঁকুরে মাটির দেওয়ালের উপর শালের রোলা ও বাঁশের কাঠামোয় খড়ের চাল মূল্যের দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু ছবির মত সুন্দর। গোবর মাটিতে নিকিয়ে দেওয়ালের প্রলেপ এমন একটি মনোরম স্নিগ্ধ লাবণ্য ফুটিয়ে তুলেছে যে, চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয়—অপরূপ! কারও কারও দেওয়ালের নীচের দিকের ভিতে সুকৌশল আঙুলের টানে ঢেউ খেলানো রেখা টেনেছে, যা দেখে ঠিক মনে হয় তরঙ্গিত নদী, তার ওপরে সারি সারি খেজুর-পাতার ঢঙে এঁকেছে গাছ—অর্থাৎ নদীর ধারে অরণ্যশোভা।

মানুষগুলি সরল সহজ এবং কণ্ট্রোলের বাজারে ও নানা রোগজর্জর কালেও স্বাস্থ্যসবল। পেশীগুলি এমন দৃঢ় যে, মনে হয়, পাথুরে ভূমি-প্রকৃতির প্রতিফলন পড়েছে। বনের কাঠ কেটে এনে বিক্রি করে, শালপাতা তৈরি করে, ময়ূর ধরে আনে, খোয়াইয়ের নীচের অংশে চাষ করে। অন্য অঞ্চলে এরা কয়লাখনিতে কয়লা কাটতে যায়, কিন্তু এ অঞ্চলে তেমন লোক চোখে পড়ল না। গায়ে একটা আরণ্য গন্ধ আছে যা কটু লাগে আমাদের। তা থাক। কিন্তু মানুষদের

মনগুলি সমতলের মত সরল এবং প্রশস্ত। কুমারী-ভূমির তৃণ-আস্তরণের মতই নরম।

এইখানেই ভয়। যে ভূমি কর্ষিত হয় নি, তার বুকের ঘাসের আস্তরণের মধ্যে চোরাবালি না হোক, চোরা পাঁক থাকে; ঘাসের ভিতরে ফাটল থাকে, অকর্ষিত ভূমির কন্দরে বিবরে সরীসৃপ বাস করে। এদের মন সম্পর্কে তাই আমি সাবধানেই ছিলাম। পা ফেলতাম অত্যন্ত সাবধানে। কোনো অন্যায় অভিপ্রায়ও আমার ছিল না। শুধু লক্ষ্য রাখতাম, ওদের জীবনের কোনো নরম জায়গায় পা না দিই। হঠাৎ কিছু বলে না ফেলি। ওদের ভাষাটাও আমি ভালো জানতাম।

তথ্য সংগ্রহ করে বেড়াতাম দিনের বেলা।

ওরা জিজ্ঞাসা করত, ক্যানে ইসব শুধাইছিস, লিখে লিছিস? কি করবি?

আমি বুঝিয়ে দিতাম। কখনও বুঝবে না বলে উপেক্ষা করতাম না।

একদিন—

অমল চৌধুরী একটু সোজা হয়ে বসল, চুরুটটা তুলে জুটো ব্যর্থ টান দিয়ে নামিয়ে রেখে বললে,—একদিন সন্ধ্যার মুখে পেলাম একখানি গ্রাম। থমকে দাঁড়ালাম।

খানিকটা দূরে একটা ছোট পাহাড় আছে। পাহাড়ের ওপাশে আমার ম্যাপে একটা পরিত্যক্ত খাদ দেখা যায়। ওই খাদের লাইন ধরেই সোজা আমি বেরিয়ে যাব। মাইল কয়েক গেলেই পাব দামোদর প্রজেক্টের খাস এলাকা। কাজ চলেছে সেখানে। সে কাজ এখান পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। আমার বাহনকে উপদেশ দিয়েছি, পাকা সড়কে মাইল তিরিশেক ঘুরপথ দিয়ে খাস এলাকায় গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। ওদিকে এই গ্রাম থেকে যেতে হলে ছোট একটা ঢিবির মত পাহাড়, পাহাড় এই অর্থে যে নিম্ন-ভূস্তরের পাথরের একটা স্তর কোন পুরাকালে কোনো ভূকম্পনের বেগে উপরের স্তর-গুলোকে ঠেলে ক্ষুদে বিন্ধ্যের মত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তার ওপাশেই সেই পরিত্যক্ত খাদটা।

পরিত্যক্ত খাদটার পরেই পাব একটি চালু খাদ। ইচ্ছা ছিল, সেখান পর্যন্তই কোনো রকমে যাব! গেলে, আহার বিহার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারব। কিন্তু পথেই অনেক রাত্রি হয়ে গেল। বন্য জন্তুরও ভয় আছে, তার উপর আছে ওই পোড়ো খানাটা। কোথাকার কোন গহ্বর, কোথায় আছে, কে জানে! অগত্যা একখানা গ্রাম পেয়ে দাঁড়ালাম।

আদিবাসীদের ছোট্ট গ্রাম। সন্ধ্যার মুখ। সঠিক এবং স্পষ্ট সব কিছু দৃষ্টিগোচর হল না। তবে মনে হল, এ গ্রামটি যেন কিছু স্বতন্ত্র, এবং বিশিষ্ট। দেওয়ালের চিত্ররেখাগুলি শিল্পরীতিতে উন্নত। কয়েকটা ঘরের উঠানে দেখলাম মাটির পুতুল, মাটির পাত্র। চাক, অর্থাৎ কুম্ভকারের চাকও দেখলাম। প্রশ্ন জাগল মনে। এরা কি আদিবাসী নয়? কিন্তু মুলতবী থাকল প্রশ্নটা। আপাতত আশ্রয়ের প্রশ্নটা বড়, এবং আমার অভিজ্ঞতায় আমি জানি যে, যারা নাকি সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে পথ চলতে না পেরে নীচের স্তরে পড়ে গিয়েছে, তাদের কোন জাতি, কি পেশা জিজ্ঞাসা করলে তারা পুরাতন ক্ষতস্থানে নূতন করে আঘাত পায়। কোনো উচ্চ স্তরের অতিথি এ প্রশ্ন করলেই তাদের মনে সংশয় জাগে, ঘৃণা বা অবজ্ঞা করছে হয়ত।

গ্রামের মোড়লের কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইলাম। মোড়ল সমাদর করে আশ্রয় দিলে। এ সমাদরও যেন বিশেষ ও স্বতন্ত্র। তার ঘরের সামনেই একটি পরিচ্ছন্ন এবং বেশ একটু সম্ভ্রান্ত ধরনের চালা। শাল কাঠের চাল, খড়দল চারিদিকে, শালকাঠের খুঁটি এবং বাঁশের তৈরি ঝাঁপে ঢাকা মেঝেটি গোবর-মাটিতে পরিচ্ছন্ন তকতকে করে নিকানো। সেইখানে থাকতে দিলে। ওইটি ওদের গ্রামের অতিথিশালা, চণ্ডীমণ্ডপ, নাটমন্দির, যা বল। মহুয়ার তেলের একটি বড় প্রদীপও জেলে দিলে। তকতকে মেঝে আবার ঝাঁটা বুলিয়ে পরিচ্ছন্নতর করে দিলে, তারপর মোড়ল সেই স্থানটির উপর হাত রেখে বললে, অতিথ মহাশয়, এইখানে তুমি ঠাঁই নিয়ে বাস কর।—অর্থাৎ উপবেশন কর। ঘন করে জ্বাল দেওয়া অনেকটা মহিষের দুধ, চিঁড়ে-গুড় এনে দিলে। হাতজোড় করে বললে, চিনি তো দেশে হয়েছে অতিথ মহাশয়, আর আমরা চিনি খাইও না। গুড় কি তুমি খেতে পারবে?

চিনি আমার সঙ্গে ছিল।

তারপর গল্প করলে। এরই মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করে বুঝলাম, আমার দৃষ্টিতে আমি ঠিকই বুঝেছিলাম। এরা অন্য গ্রামের আদিবাসী থেকে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। এদের পেশা মাটির পাত্র ও পুতুল তৈরি করা এবং কাঠের কাজ করা—কুম্ভকার ও সূত্রধর একাধারে। চাষ অবশ্য আছেই। শিল্পীর গ্রাম। আজ বলে নয়, মোড়ল বললে, সেই দেবতার কাল থেকে এরা শিল্পী।

দেবভাষায়, যাবৎ চন্দ্রার্ক মেদিনী আর কি! অন্য পেশা এদের নাকি নিষিদ্ধ।

তারপর মোড়ল জিজ্ঞাসা করলে, তুমি, অতিথ মহাশয়, ওই বনে পাহাড়ে কোথা যাবে?

আমি অভ্যাসমত বোঝাতে লাগলাম, দামোদর উপত্যকার পরিকল্পনার কথা। খ্যাপা দামোদরকে বাঁধা হবে—।

গভীর মনোনিবেশ করে তারা শুনতে লাগল। শুনে একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললে, দেবতা হে! তোমাকে নমো নম।

চমৎকার সে ভঙ্গিটা। উবু হয়ে বসেছিল, কনুই দুটি ছিল হাঁটুর উপর, হাত দুটি দুই কানের পাশ দিয়ে মাথার উপরে তুলে করতল দুটি যুক্ত করে প্রণাম জানালে। মাটির দিকেই তাকিয়ে সে এতক্ষণ বোধ হয় আমার কথা শুনে সেগুলি কল্পনা করবার চেষ্টা করছিল। প্রণাম জানাবার জন্যেই মুখ তুললে। মুখ তুলেই প্রণাম শেষে সে সামনের গ্রাম্যপথের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে, কে? উখানে এমুন করে দাঁড়ায়ে রইছিস গ?

কে একজন দাঁড়িয়ে ছিল। সে উত্তর দিলে, আমি গ।

—কে? কাঁদন? তু আলি কখন?

—এই আখুনি। ঘরকে আখুনও যাই নাই গ।

—যাস নাই? তা হোথা দাঁড়ায়ে কি করছিস গ?

—দেখছি। উ কে বেটে গ?

—অতিথ বটে। আয়, হেথাকে আয়, বস। ভালো ছিলিস গ?

—হ্যাঁ। ছিলম।

লোকটি এগিয়ে এসে দাঁড়াল। স্বল্পজ্যোতি প্রদীপের আলো, জ্যোতির মাপে একটা বাতির আলোর বেশি নয়। তাও আমার সামনে চোখে চশমা, বাতির ছটা চশমায় পড়েছে। লোকটি ভালো নজরে এল না। তবে বেশ লম্বা মানুষ—সবল, দৃঢ়।

মোড়ল বললে, অতিথ মহাশয়, এই মানুষটা আমার জামাই বটে গ। তুমি যি সব কথা বলছ, উ সি সব ভালো বুঝে। কুঠিতে কুঠিতে খেটে বেড়ায়। শহর দেখেছে, রেল চড়িছে, অনেক দেখেছে গ; কত বারণ করি, আমাদের জাতকর্ম দেবতার আদেশ অমান্য করতে নাই। তা মানে না। তা কী বলব?

কাঁদন, ওই নামেই মোড়ল ওকে ডেকেছিল, সে চলে গেল, বললে—চললাম আমি গ।

—দেখলে মহাশয়! আমার বেটীটি ভালো, ললাট মন্দ, কি করব? দেবতার কথা তো মিথ্যা লয় অতিথ। ই হবে।—সে হাসলে।

বুঝলাম, সনাতন ভারতের বাণী। কলিশেষে, বুঝেছ না?

পরদিন সকালে।

আটচল্লিশটা খোপরওয়ালা ব্যাগটা পিঠে বেঁধে, কোমরে পিস্তলের বেল্ট এঁটে বেরুবার সময় মনে হল, একদিন থেকে যাব। ওই যে চালটা, তার শালকাঠের ষড়দলে বাটালি হাতুড়ির কাজ দেখে বিস্ময় জন্মাল আমার। সবচেয়ে বিস্ময় বোধ করলাম কিসে জান? চারিদিকের ষড়দল কারুকার্যে ভরা, কিন্তু কোথাও লতা নেই, পাতা নেই, ফুল নেই, পাখী নেই, জন্তুজানোয়ার নেই, আছে শুধু মানুষের মুখ—সারি সারি মানুষের মুখ। অবশ্য সবই এক ছাঁচ। যা অবশ্যম্ভাবী আর কি! বোধ হয় ওই একটা মুখই আঁকতে শেখে শিল্পীরা। যাক। সময় নেই। মোড়ল এসে দাঁড়িয়ে ছিল, তার কাছে বিদায় নিয়ে বের হলাম। মোড়ল গ্রামের ধার পর্যন্ত এল। হাঁটু গেড়ে বসে হাত-জোড় করে বললে—অপরাধ নিয়ো না অতিথ।—দাঁড়িয়ে রইল। আমার বন্দরের কাল শেষ হয়েছে, জল-কয়লা নেওয়া হয়ে গেছে। প্রভাতালোকিত শান্ত সমুদ্রের মত সম্মুখের প্রান্তর ঝলমল করছে। বেরিয়ে পড়লাম, পেছনে তাকাবার অবকাশ ছিল না, এমন নয়, আসলে তাগিদ ছিল না। তবে মনে মনে কল্যাণ কামনা করেছিলাম। এবং ভেবেছিলাম, নতুন কালের ঋষিকুলের শ্রেষ্ঠ সভা রোটারী ক্লাবের পোশাকের খসখসানি এবং পেয়ালা-পিরিচ ও গ্লাসের টুং-টাং শব্দের পটভূমিতে সভাপতির হাতুড়ির শব্দনিয়ন্ত্রিত সমাবেশের মধ্যে এদের সম্পর্কে একটি তত্ত্বমূলক বক্তৃতা দেব। জনহিতকামী অভিজাত গুণিবর্গকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে চিন্তান্বিত করে তুলব। তাতে এদেরও কিছু হবে এবং দেশের নৃতত্ত্ববিৎ এবং সভ্যতার ইতিহাস-সন্ধানীরাও কিছু খোরাক পাবেন। তার সঙ্গে অমল চৌধুরীও কিছু পাবে। কাগজে নাম, হয়ত বা ছবিও বেরিয়ে যাবে।

একটু বক্র হাসি অমল চৌধুরীর মার্জিত মুখের পাতলা ঠোঁটে ফুটে উঠল তারপর আবার শুরু করলে, হঠাৎ—

অমল চৌধুরী যা বলতে যাচ্ছিল, সেই ছবি যেন চোখে দেখতে পেলে সে। একটা পরিবর্তন হয়ে গেল তার আকৃতিতে, কণ্ঠস্বরে, ভঙ্গিমায়—সমস্ত কিছুতে। সোজা হয়ে বসল সে। তার বসবার ভঙ্গির মধ্যে যে বিদগ্ধসম্মত ঈষৎ আলস-বিলাস ছিল, একটু ঘাড় বাঁকানো ভাব ছিল, সেটা অন্তর্হিত হল। কণ্ঠস্বরে অনাসক্তির যে ভাবটা ছিল, তাও আর রইল না। কাঁপতে লাগল কণ্ঠস্বর, চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। সোজা হয়ে বসে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রথমেই বললে, হঠাৎ আমি আক্রান্ত হলাম।

গ্রামটা পার হয়ে খানিকটা এসেই একটি পাহাড়িয়া জোড় বা কাঁদর অর্থাৎ ছোট নদী, সেই নদীর ঘাটের পাশেই একটা বড় পাথরের চাঁই, তারই আড়াল থেকে একজন দীর্ঘাকৃতি কালো মানুষ বেরিয়ে পড়ে অকস্মাৎ আমার পথ আগলে দাঁড়াল। একেবারে অতর্কিতে, অত্যন্ত অকস্মাৎ। মনে হল, ওই পাথরের চাঁইটা ফাটিয়েই সে বেরিয়ে এল!

আমি চমকে উঠলাম, থমকে দাঁড়ালাম। লম্বা লোকটার চোখে দেখলাম কুটিল আক্রোশ। সে আক্রোশ ক্রোধের অগ্নিশিখা স্পর্শে বারুদের মত বিস্ফোরণোন্মুখ।

চাপা হিংস্র গলায় সে 'আ' অথবা 'হ্যা' ধরনের একটা শব্দ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁত দু পাটি বেরিয়ে পড়ল।

আমি বেল্টে হাত দিতে গেলাম। মুহূর্তে লোকটা হাত চেপে ধরলে, বললে, উখানে তুর গুলি আছে আমি জানি।

লোকটা অনেক জানে আমার সম্পর্কে, কিন্তু আমি স্মরণ করতে পারলাম না ওকে। আমি ভীরু নই। শুধু পিঠের ব্যাগের চামড়ার বাঁধনে একটু কাবু হয়ে পড়েছি। নিজেকে সংযত করে বললাম, কি চাও তুমি? টাকাকড়ি?

সে বললে, চিনতে পারছিস না?—দাঁতগুলি তার আরও বেরিয়ে পড়ল। বলতে লাগল, আমি তুকে সন্‌জেতে দেখেই চিনলম। এক নজরে চিনে নিলম! হঁ্যা! সা-রা-রা-ত ঘুম হল না। মোড়লের ডরে বুঝাপড়াটা করতে লারলম। ভোরবেলাতে থেকে গাঁয়ের বাহিরে এসে বসে আছি। কুন পথে তু যাবি, চল, কাঁদনও যাবে, বুঝাপড়া করবে সে। হঁ্যা। এইবারে কী হয় বল? আঁ?

খুব যে ভয় পেয়েছিলাম তা নয়, তবে ভয় খানিকটা হওয়ার কথা, হয়েছিলও। কিন্তু ভাবছিলাম, বোঝাপড়াটা কিসের?

কাঁদন বললে, আখুনও চিনতে লারলি? দেখ দেখি। তার লম্বা চুল সরিয়ে কপালের একটা দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন দেখিয়ে বললে, ই দাগটো মনে পড়ছে না তুর? আঁ?—মুখে নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল তার।

এবার এক মুহূর্তে মনে পড়ে গেল। বিস্মৃতি একটা পর্দার মত সরে গেল।—চোখে অণ্ডাল রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ফুটে উঠল, প্ল্যাটফর্মের উপরে একজন লম্বা কালো জোয়ান একটা লোহার ডাণ্ডা হাতে ছুটে চলে আসছে দেখলাম। পিছনে একদল ভদ্রবেশধারী তাকে অনুসরণ করছে।—ধর—ধর।

ওই ডাণ্ডা-হাতে লোকটাই কাঁদন। আমি একটা পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মেরে ওর কপালে ওই ক্ষতটা করে দিয়েছিলাম। আঘাতে অভিভূত হয়ে

কাঁদন তার হাতের লোহার ডাণ্ডাটা ফেলে দিয়ে 'বাপ' বলে দুই হাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়েছিল। কাঁদন শহরে কলিয়ারীতে ঘুরে মানুষের অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। থার্ড ক্লাস ওয়েটিংরুমে সে একখানা বেঞ্চ দখল করে শুয়ে ছিল। টিকিট ছিল তার গেঁজলেতে ভরা। একজন বাঙালী ভদ্রলোক মেয়েছেলে নিয়ে ওয়েটিংরুমে এসে বেঞ্চখানি দাবি করেছিলেন। বলেছিলেন, তুই উঠে মেঝেতে শুগে যা।

কাঁদন বলেছিল, তু যা ক্যানে, মাটিতে শুগা!

—আরে! ব্যাটার ছেলের বাড় দেখ দেখি!

—গাল দিস না বলছি।

—আরে, গাল কি দিলাম!

—দিলি না? বুললি না বেটার ছেলে? তু আমার বাবার বাবা নাকি?

অন্যায় ভদ্রলোকের হয়েছিল! এ পর্যন্ত আমরা ওদের পিতার মতই শাসন করেছি, মানুষ করতে চেষ্টা করেছি, পিতৃত্ব দাবি করেছি। হঠাৎ পিতামহত্বের দাবিটা অন্যায় বইকি!

এই নিয়েই বিবাদ শুরু। কাঁদন ওই হলদে টিকিটের টুকরোটুকুর জোরে সমানে তর্ক করেছিল। সে একেবারে পাকা উকিলের মত তর্ক! ভদ্রলোকের পক্ষে জুটে গেলেন অনেক সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি; কাঁদনের পক্ষে দু-চারজন জোটে নি এমন নয়, কিন্তু নারীজাতির সম্মানের দাবিও সে যখন উপেক্ষা করলে, তখন তারাও তার বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করলে।

শায়িত কাঁদন উঠে বসে বলেছিল, বসুক, ওইখানে বসুক।

—তুই ওঠ, তবে তো বসবে।

—উঁহু। আমার পাশে বসুক। ওই ছোটো মেয়েটা বসুক, তার উপাশে বসুক মাটো। আমি উঠব না! উঁহু!

তখনই যে কেন ব্যাপারটা চরম নাটকীয় মুহূর্তে পৌঁছোয় নি, এইটেই বিস্ময়ের কথা। কিন্তু পৌঁছোয় নি। পৃথিবীতে বিস্ময়ের কথা কিছু নয় বা নেই।

অগত্যাই ছোট মেয়েটিকে মাঝখানে রেখে বসেছিলেন মহিলাটি। ভদ্রলোক বসেন নি। কিছুক্ষণ চায়ের স্টলে বসে, কিছুক্ষণ পায়চারি করে রাত্রি কাটাচ্ছিলেন। রাত্রি অবশ্য তখন শেষ, বাইরে ভোরের আলো ফুটেছে, কাক-কোকিল ডাকছে; কিন্তু যারা সারা রাত্রি জাগে তাদের ঘুমের ঘোরটা তখনই হয়ে উঠে প্রচণ্ড রকমের গাঢ়। ওয়েটিংরুমের আলোটাও ঢুলছিল—দপদপ করছিল। কাঁদন বসেই ঘুমুচ্ছিল, ঘুমের ঘোরে ঢলে পড়ে গিয়েছিল,

ওই ন-বছরের মেয়েটির ওপর। ভদ্রলোকের দৃষ্টি এড়ায় নি, তিনি এসেই প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেছিলেন কাঁদনের গালে। বর্বর কাঁদন, উদ্ধত কাঁদন! মুহূর্তে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে প্রচণ্ডতর চপেটাঘাত করেছিল ভদ্রলোকের গালে। হৈ-হৈ উঠে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। শুরু হয়ে গিয়েছিল কাঁদন-শাসনপর্ব, চারিদিক থেকে ছুটে এসেছিলেন ভদ্রলোকেরা। ইদানীং নীচের স্পর্ধা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে—এ সম্পর্কে মতভেদ ছিল না। পড়েছিল কিল চড় ঘুষি।

কাঁদন প্রত্যুত্তর দিতে চেষ্টা করেছিল, দিয়েছিলও কিছু কিছু। কিন্তু এত লোকের সঙ্গে সে একা কতক্ষণ লড়বে? সে ছুটে পালিয়েছিল। কিন্তু তাতে নিষ্কৃতি হয় নি, আর্যেরা উদ্ধত অনার্যের অনুসরণ করেছিলেন। অবশ্যই প্রয়োজন আছে শাসনের। কাঁদন প্ল্যাটফর্মের ওপরে কুড়িয়ে পেয়েছিল ডাণ্ডাটা। রেলিং-ভাঙা লৌহখণ্ড অথবা এমনই কিছু। সেইটে হাতে তুলে ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে পালাচ্ছিল। বন্য মানুষেরা ভয় পেয়ে এইভাবেই পালায়। আমি বিপরীত দিক থেকে ঢুকেছিলাম প্ল্যাটফর্মে। লৌহদণ্ডধারী পলায়নপর একজন লম্বা কালো মানুষের পিছনে অনুসরণরত আর্যদের 'ধর ধর' শব্দ শুনে স্বভাবতই আমি ওকে ভেবেছিলাম কোনো অপরাধী—চোরের চেয়ে বড় রকমের অপরাধী। চোরের লোহার ডাণ্ডা ঘুরোবার মত সাহস অবশিষ্ট থাকে না। বেল্টের পিস্তলটা সঙ্গেই থাকে। সেদিনও ছিল। কিন্তু ওটা বের করেও ছুঁড়ি নি। ওটাকে বাঁ হাতে ধরে একটা পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে ছুঁড়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে হাঁকও মেরেছিলাম—খবরদার।—অব্যর্থ লক্ষ্য বলে আমার অহঙ্কার কোনোদিন নেই। পিস্তলেও নেই। ওটা রাখি শব্দ করে, হাঁক মেরে কাজ হাসিলের জন্যে। ঢেলা দিয়ে লক্ষ্যভেদ বাল্যকালের পর কোনোদিন করি নি। কিন্তু সেইদিন কাঁদনের ভাগ্যে ছিল দুর্ভোগ, আর তারই জের টেনে এতদিন পরে আমাকে ভুগতে হবে কঠিনতর দুর্ভোগ, তাই বোধ হয় পাথরের টুকরোটা সোজাই গিয়ে লেগেছিল কাঁদনের কপালে। কাঁদন দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু কম আঘাত পেত; দুই বিপরীতমুখী গতিবেগ আঘাতটাকে গুরুতর করে তুলেছিল। কাঁদনের মত জোয়ান, লোহার ডাণ্ডাটা ফেলে দিয়ে 'বাপ' বলে বসে পড়েছিল। তারপর আর আমাকে কিছু করতে হয় নি। যা করবার করেছিল দলবদ্ধ জনতা। সে দেখে আমার অনুশোচনার আর সীমা ছিল না। ওকে রক্ষা করবার শক্তিও তখন আমার নেই। আমি ছুটে গেলাম জি. আর. পি-তে। সেখানে আমি ছিলাম চিহ্নিত ব্যক্তি। থানার হস্তক্ষেপে কাঁদন রক্ষা পেলে। সেখানেই শুনলাম, অবমানিতা ভদ্রকন্যাটির বয়স সবেমাত্র নয়। এবং

অবমাননা, শুনলাম, নিদ্রার মধ্যে ঢলে পড়া। অনুশোচনার আর সীমা ছিল না আমার। ঘোর কৃষ্ণ ললাটে গাঢ় লাল রক্তের ধারা, প্রহারে জর্জরিত দেহ কাঁদন উদাস দৃষ্টিতে থানার ছাদের দিকে চেয়ে ছিল; বোধ করি, দেখতে চেয়েছিল সে আকাশ। আকাশে দেবতা থাকেন। অথবা ওই নীলের মধ্যে হৃদয়স্পর্শী সান্ত্বনা আছে।

আমিই জি. আর. পি-কে বলেছিলাম ওকে হাসপাতালে পাঠাতে। ডাক্তারও আমার চেনা লোক। তাকে পত্র লিখে দিয়েছিলাম একটা সিরাম ইনজেকশন দেবার জন্যে। বিশেষ যত্ন নিতেও অনুরোধ করেছিলাম। জানি এই আরণ্য মানুষদের সহনশক্তি অপরিমেয়। তবু আমি পণ্ডিতজন, নিজের মতই দেখতে চেয়েছিলাম কাঁদনকে। যদি বল—পাণ্ডিত্যের প্রেরণায় নয়, ওই উদারতাটুকু অপরাধবোধের তাড়নাসম্ভূত, তাতে আপত্তি করব না। বলতে পার। হয়ত তাই-ই সত্য।—কারণ কাঁদন সেই লোক। অথচ আমি তাকে ভুলেই গিয়েছিলাম। সম্ভবত ওই প্রচ্ছন্ন অপরাধবোধই কাঁদনের স্মৃতির ওপর একটা আবরণ টেনে দিয়েছিল। কিন্তু ওই কপালের দাগটা দেখিয়ে ইঙ্গিত করা মাত্র সে আবরণটা সরে গেল। এক মুহূর্তে সব মনে পড়ে গেল।

যে আঘাতে দেহই শুধু আহত হয় না, মর্মও আহত হয়—সে আঘাত মর্মান্তিক। সাংঘাতিক আঘাতে মানুষ মরে, তার স্মৃতির সেইখানেই সমাপ্তি হয়, কিন্তু সাংঘাতিক আঘাত মর্মান্তিক হলে তার বেদনা জন্মান্তরেও বহন করে নিয়ে চলে বলে প্রাচীন সাহিত্য-পুরাণে নজির আছে। সেই আঘাতের প্রতিঘাতে জরা-ব্যাধের শরাঘাতে মহাভারতের নায়ক যদুপতি বিদ্ধ হয়েছিলেন। অবশ্য জন্মান্তর আজ প্রশ্নের কথা; সে আমি বৈজ্ঞানিক হয়ে বলছি না, তবে মর্মান্তিক আঘাত মানুষ জীবনে কখনও ভোলে না, ভুলতে পারে না।

কাঁদন আমার হাতখানা ধরে ছিল, তার মুঠি ক্রমশই দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠছিল, কালো লম্বা হাতের মোটা শিরাগুলি রক্তের চাপে আরও ফুলে উঠছিল। পেশীগুলি স্ফীত হচ্ছিল, চোখ দুটি যেন ধকধক করে জ্বলছিল অঙ্গারের মত, দাঁতে দাঁত ঘষছিল কাঁদন, নাকের ডগাটা ফুলছিল। কপালে ত্রিশূলচিহ্নের মত তিনটে শিরা দাঁড়িয়ে উঠেছে। এবার আমি সতর্ক হলাম, শঙ্কা অনুভব না করে পারলাম না। বর্বরজীবনে স্নেহ যেমন গাঢ়, হিংসা তেমনই ভয়ঙ্কর।

নিজের সমস্ত ব্যক্তিত্বকে সংহত করে এবার আমি বললাম, হাত ছাড়।

তখন আমার বৈদগ্ধ্যের খোলস খসে পড়েছে গাম্ভীর্য সত্ত্বেও। কণ্ঠস্বর উত্তেজিত এবং উচ্চ হয়ে উঠেছে। আত্মরক্ষার প্রেরণার সঙ্গে অগ্নির সহচর

বায়ুর মত হিংসা-প্রবৃত্তিও জেগেছে। কাঁদনের সম্মুখে আমি অন্যায়ের ভূমিতে দাঁড়িয়েও তাকে ন্যায্য শাস্তিদাতা ভাবতে পারছি না। ভাবছি, আমার শত্রু সে, তাকে আঘাত করবার অধিকার আমার আছে। কোনো রকমে পিস্তলে হাত দিতে পারলে কাঁদনকে গুলি করতে দ্বিধা করব না। উচ্চ উত্তেজিত অথচ গম্ভীর কণ্ঠেই বললাম, হাত ছাড়।

কাঁদন চীৎকার করে উঠল, না।

দেশটা বিচিত্র। অরণ্য এবং টিলার পরিবেষ্টনের মধ্যে তার 'না' উচ্চ শব্দটি উচ্চতর শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। না! এমন প্রতিধ্বনি কদাচিৎ শোনা যায়। বোধ করি, যে স্থানটিতে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, সেই স্থানটিই ছিল এমন প্রতিধ্বনি তোলবার কেন্দ্রবিন্দু।

তার পরই সে গম্ভীর ভয়ঙ্কর চাপা গলায় বললে, তুর মাথায় আমি পাথর মারব—এই পাথরটা।

একটা তীক্ষ্ণকোণ পাথর। ওজনে এক পাউণ্ডের বেশি। পাথরটা ছিল তার বাঁ হাতে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার পিছনের সেই টিলার উপর থেকে একটা শঙ্কিত উচ্চ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কাঁদন!—ব্যক্তিত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর; কাঁদন চমকে উঠল।

মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, এ কণ্ঠস্বর গ্রামের মোড়লের।

আবার সেই ডাক ভেসে এল, কাঁদন!

প্রথম ডাকেই কাঁদন চমকে উঠেছিল। এবার সে আমার মুখ থেকে চোখ তুলে আমার পিছনের দিকে—তার সম্মুখের টিলার দিকে তাকালে। এবং ঠিক এক ভাবেই সে তাকিয়ে রইল, যেন স্থির হয়ে গেছে। ভয়ে মুখে চোখে মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তন খেলে যাচ্ছিল। আগুনের অঙ্গারের ওপর ছাইয়ের আবরণ পড়া দেখেছ? ছাই পড়ে আসে, আবার বাতাসে ছাই উড়ে গিয়ে উজ্জ্বল প্রখর হয়ে ওঠে, আবার ছাই পড়ে—দেখেছ? ঠিক সেই রকম। একটা সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব।

মোড়লই বটে।

ছুটে এল প্রৌঢ়। সে হাঁপাচ্ছিল। চোখের দৃষ্টিতে তার সে কি আতঙ্ক, আর তারই সঙ্গে ব্যক্তিত্বময় শাসনের সে কি ইঙ্গিত! সে ঠিক বোঝানো যায় না। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, হাত ছাড়। অতিথের হাত ছাড়।

উদ্যত আক্রোশ অকস্মাৎ যখন নিরুপায় হয়ে পড়ে, তখন তার অবস্থা হয় বিষদাঁত-ভাঙা সাপের মত। যন্ত্রণায় ক্ষোভে সে গর্জায়, কিন্তু সে যেন কান্না, উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস!

তেমনভাবেই কাঁদন বললে, না। আমি ছাড়ব না। না।

—ছাড়।—মোড়ল বললে, হু—ই পাথরটোর দিকে তাকা।

চমকে উঠল কাঁদন।

মোড়ল তাদের নিজের ভাষায় বললে—সে যেন মন্ত্র পাঠ করলে—হুই সাদা পাথরটোর দিকে তাকা। তাকিয়ে থাক। সাদা পাথরটো কালো হয়ে যেছে, আকাশের নীলবরণ এইবারে তামার বরণ হয়ে উঠবেক; বাতাসে উঠবেক মড়া-পোড়ানোর গন্ধ; নদীর জলে পোকা হবেক, থিকথিক করবেক; হুই চারিপাশের বনে গাছগুলার পাতায় ফুলে শুঁয়াপোকা লাগবেক; পাখিগুলান ডাকবেক শকুনের ডাক; বাঁশের বাঁশী বোবা হয়ে যাবেক; তারপর সুরুয-ঠাকুরের সোনার বরণ হয়ে যাবে সীসার মতন, আঁ-ধা-র হয়ে যাবে। পৃথিবী—আঁ-ধা-র—

কাঁদন চিৎকার করে উঠল, না না। বলিস না, আর বলিস না, আর বলিস না।

আমার হাত ছেড়ে দিল সে। শুধু তাই নয়, দেখলাম, অকস্মাৎ আগুন নিবে গিয়ে সে যেন অঙ্গারের মত স্তিমিত হয়ে গেছে! স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সে দৃষ্টি শূন্য, হয় খুঁজতে চাইছে দেবতাকে অথবা তার লুটিয়ে পড়া আক্রোশকে। কিন্তু সে নিজেই পঙ্গু, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কারুর দিকেই পঙ্গু দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে পারছে না!

মোড়ল বললে, লে, এইবার অতিথের হাত ধরে বল—

কাঁদন নতজানু হয়ে হাতজোড় করে বলতে লাগল, কি বলতে হবে সে জানত, বললে—আমার মনের পাপ তোমার চরণে দিলাম, তুমি চরণ দিয়ে তাকে মার, আমাকে মুক্তি দাও; আমার বাড়ি চল, আমার মনের মধু তুমি লাও।

মোড়ল আমাকে বললে, ই দিনটি তোমাকে থাকতে হবেক অতিথি, কাঁদনের ঘরে ক্ষীর আর মধুর পায়েস খেতে হবেক। না খেলে কাঁদনের নরক হবেক। গোটা গাঁয়ের সর্বনাশ হবেক। ওই পাহাড়ের মাথায় ওই যে সাদা পাথরখানি, কালো হয়ে যাবেক। ওই পাথর কালো হলে আকাশের নীল বরণ তামার বরণ হয়ে উঠবেক। তার পর বাতাসে উঠবেক মড়া-পোড়ানোর গন্ধ।

বলতে লাগল মন্ত্রের মত সুরে—সেই পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাসের সেই বিচিত্র অবিশ্বাস্য কথাগুলি। কিন্তু আমার কাছে অবিশ্বাস্য হলেও তাদের বিশ্বাসের গাঢ়তায় মোড়লের কণ্ঠস্বরে যে আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল তাতে দিক্‌দিগন্তর যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

—নদীর জলে পোকা হবেক, থিকথিক করবেক ; হুই চারিপাশের বনে গাছগুলার পাতায় ফুলে শুঁয়োপোকা লাগবেক ; পাখিগুলান ডাকবে শকুনের ডাক ; বাঁশের বাঁশি বোবা হবেক ; তার পরে সুরুয-ঠাকুরের সোনার বরণ—

স্বর্ণদীপ্তি জ্যোতির্ময় সবিতা দেবতা পরিণত হবেন নির্বাপিতদীপ্তি মসীময় সীসকপিণ্ডে।

একটা উদ্বেগ আমাকেও আচ্ছন্ন করে ফেললে, আমার বুদ্ধিমার্গী সচেতন মনের চেতনাও যেন অবলুপ্ত হয়ে আসছিল। আমি বললাম, চল। আমি যাচ্ছি।

২

বিচিত্র পদ্ধতি।

আজ জগতে আর্য-অনার্য ভেদটা উঠে গেলেও মুখে না মানলেও ওদের আমাদের বিচারধারাটা স্বতন্ত্র হয়েই রয়েছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত, সভ্য অসভ্য, সংস্কারাচ্ছন্ন আর সংস্কারমুক্ত, বিশ্বাসবাদী আর বুদ্ধিবাদী, যা বলা যাক, দুটি স্তরভেদে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু আমার বুদ্ধিবাদী মন সেদিন আচ্ছন্ন হয়েছিল। তাই ওদের বিচার কিম্বা বিশ্লেষণ করি নি, অবাক হয়ে পদ্ধতির বিচিত্র মাধুর্য শুধু দেখে গিয়েছিলাম।

কাঁদনের বাড়ির সমস্ত দুধটুকু জ্বাল দিয়ে ক্ষীরে পরিণত করে, বন থেকে মধু সংগ্রহ করে এনে পায়স তৈরি করে আমাকে খেতে দিলে।

শান্তশ্রী কৃষ্ণাঙ্গী একটি তরুণী। কাঁদনের স্ত্রী—মোড়লের কন্যা। আয়ত চোখ, শুভ্র দৃষ্টি, সে দৃষ্টিতে সেদিন বিষণ্ণ মিনতি মিশে একটি অপরূপ মাধুরীর সৃষ্টি করেছিল।

কাঁদন সামনেই বসে ছিল। স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল সে, যা করণীয় সে-সবই করলে ওই শুচিস্মিতা মেয়েটি। আমার সম্মুখে আহার্যের পাত্র নামিয়ে দিয়ে সে স্বামীর পাশে গিয়ে বসল। হাতজোড় করে বললে, অতিথ, তুমি প্রসন্ন হয়ে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা কর। আমাদের মনের মধু এবং ক্ষীরে পরিতৃপ্ত হও। আমাদের মনের জ্বলন তাতেই দূর হোক।

কাঁদনও কথাগুলি বলছিল তার সঙ্গে, কিন্তু থেমে থেমে। ঠোঁট তার কাঁপছিল। উচ্চারণ যেন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল। বার বার মেয়েটি স্বামীর দিকে সবিস্ময়ে তাকাচ্ছিল। মোড়লও দৃষ্টিতে শাসন পরিস্ফুট করে তাকিয়ে ছিল কাঁদনের দিকে।

আমি বুঝলাম কাঁদন ক্ষোভকে জয় করতে পারে নি। অথবা প্রাচীন সংস্কারের কাছে নিঃসংশয়ে আত্মসমর্পণ করতে পারছে না।

তবু আমি বললাম, আমি প্রসন্ন হয়ে গ্রহণ করছি।

মধু এবং ক্ষীর পরিতোষের সামগ্রী, পরিতোষ সহকারে পান করলাম। না করলে ওদের সর্বনাশ হবে, কাঁদনের নরক হবে, গ্রামের সর্বনাশ হবে; ওই পাহাড়ের মাথার সাদা পাথরখানি কালো হয়ে যাবে; পাথরখানি কালো হলে আকাশের সুনীল-সুষমা কঠিন তাম্রবর্ণে রূপান্তরিত হবে; বাতাস শবগন্ধে পরিপূর্ণ হবে, এমন কি সূর্যদীপ্তিও নিবে যাবে।

ধীরে ধীরে আমার বুদ্ধি চেতনা লাভ করলে।

প্রশ্ন করলাম, অর্থ?

অর্থ তারা জানে না। তারা জানে, দেবতাকে যে জেনেছিল, যাকে ঘিরে তারা ওই গ্রাম রচনা করেছিল, এ হল তারই আদেশ। সেই মানুষটিই ওই পাহাড়ের উপর ওই সাদা পাথরখানি স্থাপন করে গিয়েছে।

মোড়ল বললে, সে শুধু পাথরখানিই রেখে যায় নাই অতিথ। ওই পাথরের উপরে দেবতাকেও বসিয়ে দিয়েছিল। সে দেবতা একদিন চলে গেল। কারা এসেছিল সব, তারা কাঠের মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দিলে, পুড়ে সব ছাই হয়ে গেল। সে দেবতা আর কেউ গড়তে লারলে। ওই দেখ।

দেখালে সে সেই চালা-ঘরের ষড়দল। ষড়দলের গায়ে জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে সারি সারি মুখ। রাত্রের অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাই নি, দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম এক মুখ। ধ্যানমগ্ন মানুষের শান্ত মুখ, কিন্তু মূর্তির মধ্যে কিছু যেন অস্পষ্ট রয়েছে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি বা কালের জীর্ণতায় অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

মোড়ল বললে, সে মুখ হয় না! দেবতাকে না জানলে হয় না। মনের হিংসা দেবতার পায়ে না দিতে পারলে হবেক ক্যানে? আমরা মাটির পুতুল গড়ি, কাঠের কাজ করি, নকশা আঁকি, কিন্তু দেবতাকে তো আমরা জানি না।

বলতে ইচ্ছা হল, দেবতা নাই। কিন্তু জিভে বেধে গেল।

মোড়ল বললে, দেবতার আদেশ আছে—এই গাঁয়ের লোকে যদি অতিথকে হিংসে করে, তার উপরে রাগ করে, তবে এমনি করে তার পায়ে হিংসে-রাগ ঢেলে দিয়ে মধু আর ক্ষীরের পায়েস রেঁধে খাওয়াতে হবে। তার কাছে হাতজোড় করতে হবে। নইলে ওই সাদা পাথরখানি কালো হয়ে যাবে! পাথর কালো হয়ে গেলে আকাশের নীল বরণ তামার বরণ হয়ে যাবেক—

সেই বিচিত্র বিশ্বাসের কথাগুলি সে আবার বলে গেল, মন্ত্রোচ্চারণের মত শেষে বললে, ওই পাথর আর বেশিদিন সাদা থাকবে না অতিথ। এই কাঁদনের মতন মানুষগুলান এখন বেশি জনম লিছে। একদিন ওই দিনমণি সব-সীসার মত হয়ে যাবেক।

কাঁদন অকস্মাৎ উঠল, উঠে চলে গেল সেখান থেকে।

শুচিস্মিতা মেয়েটি চঞ্চল হয়ে উঠল, বলল, অতিথ, আমি যাই।

পথের পাশেই পড়ে ওদের সেই পাহাড়টি। গ্রামের ঠিক পরেই।

পাহাড় নয়, একটা বড়গোছের পাথরবহুল টিলা। পূর্বেই বলেছি, কোনও দূর অতীতে কোনও ভূমিকম্পে এখানকার মাটির নীচের পাথরের স্তরটা ঊর্ধ্বে সংক্ষিপ্ত হয়ে মাথা ঠেলে উঠেছিল। কালো মরা পাথরের স্তূপটার সর্বোচ্চ স্থানটিতে ওই সাদা পাথরখানি রক্ষিত। একখানি আসন। আশ্চর্য সাদা পাথর। এই ধরনের পাথর—তবে সে পাথর নরম এবং আরও কম সাদা—উড়িষ্যার খণ্ডগিরি-উদয়গিরি অঞ্চলে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সে নয়। এ পাথর শক্ত এবং রঙ আরও সাদা। কোথাও একটু মালিন্য নেই। গ্রামের লোকের সযত্নমার্জনায় এতটুকু কলঙ্করেখা পড়তে পায় না, বর্ষার বৃষ্টিতে শ্যাওলা পর্যন্ত ধরে না। মার্জনায় মার্জনায় হাতের স্পর্শে একটি চিক্কণতা ফুটে উঠেছে পালিশের মত। পাহাড়ের মাথার পরিসরতা দেখে বোঝা যায় যে, এককালে এখানে মন্দিরের মত কিছু ছিল। এখানে আছে একটি চত্বর—তার উপরে উঁচু বেদী, তার উপরে ওই আসনখানি স্থাপিত। কালো পাথরের স্তূপের উপর সাদা পাথরখানি একটি শোভার সৃষ্টি করেছে। এর বেশী দ্রষ্টব্য আর কিছু নেই। হতাশ হয়ে নেমে আসব, দেখলাম, একজন ব্রাহ্মণ উঠে আসছে।

নগ্নগাত্র ব্যক্তিটির উপবীতটি বেশ মোটা এবং সদ্য-পরিষ্কৃত। টিয়াপাখীর মত নাক—শুকনাসা, শীর্ণকায়, তামাটে রঙ, লম্বাটে মুখ, ছোট কেশবিরল মাথাটিতে ফুল-বাঁধা একটি টিকি, বিচিত্র গোল চোখ। ব্রাহ্মণ যে ধূর্ত, তাতে আমার সন্দেহ রইল না। হাতে একটি সাজিও দেখলাম। বুঝলাম, পূজো করতে আসছে।

আমাকে দেখে ব্রাহ্মণ থমকে দাঁড়াল। গোল চোখ দুটি বহু ভাবনায় ও অনুমানে জ্বলজ্বল করে উঠল। কিন্তু বোধ হয় কোনো অনুমানে উপনীত হতে না পেরেই সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, আপুনি ?

বললাম, দেখতে এসেছি।

—দেখিতে আসিছেন? কয়লার জায়গা? তা কয়লা ঠাঁইটির নীচে আছে। এই পাহাড়টিই আমার সীমানা। কয়লা ইয়ার তলা পর্যন্ত আছে। এমুন ডাইব লেগেছে যে, উখানে : করা আর টাকা জলে ফেলা একই কথা। উ ঠাঁইগুলান ওই গেরামবাসীর নিষ্কর বটে। স্বত্ব উয়াদের। ই পাহাড়টি আমার। নিবেদন?

আমি হেসে বললাম, না, কয়লার জায়গা দেখতে আমি আসি নি। আমি এই দেবস্থান দেখতে এসেছি।

—দেবস্থান দেখিতে আসিছেন!—বিস্ময় অনুভব করলে সে। তার পরই সে অকস্মাৎ মুখর হয়ে উঠল—মহাপুণ্যস্থান আজ্ঞা। শহর লয়, ঘাট লয়, এই নিজ্জনে মহাপুরুষের সাধনপীঠ। ওই আসনখানি ছুঁয়ে আপুনি যা মানস করবেন, সিদ্ধ হবে। হুই দেখেন, হুই বনের উ-পাশে কালো মেঘের মত দেখিতে পাবেন পরেশনাথ পাহাড়—সমেতশিখর পুণ্যভূমি, ওই স্থানের উপপীঠ। মনের কালিমা কেটে যায়, অক্ষয় মুক্তি হয়, মনের বাসনা পূর্ণ হয়—

বাধা দিলাম। বললাম, ঠাকুর, মনে কালি আমার যা আছে, সে তোমার ওই কয়লার সীসের মত। মুছলে যায় না। পোড়ালে ছাই হয়। মুক্তি আমি চাই না! মনের যে বাসনা আছে, প্রণাম করেও তা পূর্ণ হবে না। তবে, এ কী ঠাকুর, কোন দেবতার স্থান, কী কাহিনী বলতে যদি পার, তবে তোমাকে কিছু দেব আমি।

—হুঁ, আজ্ঞা। বলব আজ্ঞা। এই পূজাটি আমি সেরে লিই। তিন মিনিট, রাম—দুই—তিন।—বলেই সে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে ফুল ফেলতে লাগল। সাজিতেই ছিল একটি ঘটিতে জল। তাও ঢেলে দিলে খানিকটা। ঢিপ করে একটি প্রণাম করে উঠেই বললে, ইখানেই বসবেন বাবু?

—হ্যাঁ। বস।

সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লাম আমি।

পাশে বসল ব্রাহ্মণ। বললে, দুটা টাকা কিন্তু গরিব বামুনকে দিবেন।

বক্তা বৈজ্ঞানিক সৌতির চোখে আবার স্বপ্নের ঘোর নেমে এল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে, আশ্চর্য হে! দীন ধূর্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল আর একজন মানুষ। সে-ই এ দেশের কথক—বলে গেল চমৎকার ভাষায়। সুন্দর কথকতা।

পঞ্চ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জৈনধর্ম। সদ্ধর্মেরও পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সেই সত্যযুগে আদিনাথ ঋষভদেব সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করে মহাতপস্যায় জিনত্ব অর্জন করে এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সত্যই ধর্ম, সত্য ছাড়া মিথ্যা কথনে, চিন্তনে, কল্পনায় আত্মার পতন হয়। এই ধর্মের ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ। ওই সমেতশিখর আনন্দধামে ভগবান পার্শ্বনাথ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মহাপুণ্যভূমি ওই সমেতশিখর। ওখানকার মৃত্তিকা স্পর্শে মানুষ সদ্‌ভাবনায় ভাবিত হয়, সিদ্ধির পথে খানিকটা অগ্রসর হয়। ওই সমেতশিখরে ভগবান পার্শ্বনাথের প্রথম পূজাপীঠ নির্মিত হয়। যিনি নির্মাণ করেছিলেন, তিনি মহাশিল্পী ছিলেন। সাধক সন্ন্যাসী। তাঁর এক শিষ্য ছিল। এই স্থান তাঁরই সাধনপীঠ। রাজকুলে তাঁর জন্ম। যে মুহূর্তে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, সেই মুহূর্তে—মুহূর্তের জন্য তাঁর কপালে সকলে প্রত্যক্ষ করেছিল, চন্দ্রকলার শোভা। কালো ছেলে—কপালে বাঁকা চন্দ্রকলা ভ্রম হয় নি। মুহূর্ত পরেই তা মিলিয়ে গিয়েছিল। রানী প্রসব করেই গতাসু হলেন। সেদিন নাকি সমেতশিখরে একটি শঙ্খধ্বনি হয়েছিল। লোকে বলে, ভক্তের আবির্ভাবে পার্শ্বনাথ পুলকিত হয়েছিলেন।

এই যে অরণ্যভূমি—এর নাম আজও পঞ্চকূট—এর মধ্যে চিরদিন বাস করে এই কৃষ্ণবর্ণ মানুষেরা। বিক্রমশালী, সরল। চারিদিকে দিকহস্তীর মত পর্বতবেষ্টনী, তার পাদদেশে ভীমকান্ত অরণ্য-শোভা; বুক চিরে বয়ে গিয়েছে দামোদর-বরাকর নদ; অরণ্যের ভিতরে শার্দূলেরা বিচরণ করে অমিতবিক্রমে; এরই মধ্যে বাস করত এই বীর্যবান জাতি। তাদেরই যিনি রাজা তাঁরই ঘরে জন্মালেন এই কুমার। রানী মারা গেলেন। বিষণ্ণ রাজা মাতৃহারা সদ্যোজাত শিশুটি তুলে দিলেন ধাত্রীর হাতে। এর কিছুকাল আগেই এই রাজ্যে এসেছিল একজন বিদেশী। লোকটি বিদেশী, কিন্তু যোগ্যতাসম্পন্ন তাতে সন্দেহ নাই। নিজের যোগ্যতা সে প্রমাণিত করেছিল।

ব্রাহ্মণ বললে, বাবু মশায়, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে আশ্রয় দিতে নাই, প্রশ্রয় তো দূরের কথা। শাস্ত্রে নিষেধ আছে। কিন্তু রাজা গুণগ্রাহিতার অতিশয্যে শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করেছিলেন। তাকে এক পদ থেকে উচ্চ পদে, সে পদ থেকে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করেছিলেন। রাজার যখন পত্নীবিয়োগ হল, তখন ঐ বিদেশীই প্রায় সর্বেসর্বা। বৃদ্ধ বিশ্বস্ত মন্ত্রী দেখলেন, সুকৌশলে ওই বিদেশী তাঁর কল্পনা ব্যর্থ করে দেয়। এমন যুক্তি ও বিনয়ের সঙ্গে তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে নিজের মনোমত কাজ করে যে, তাকে বলাও কিছু যায় না; উপরন্তু রাজা থেকে অন্য সকলের সমর্থন লাভ করে।

মন্ত্রী বিপদ গণনা করলেন, রাজাকে সতর্ক করেও ফল হয় না, সুতরাং তিনি সবিনয়ে অবসর নিলেন। বাকি সময়টা ইষ্টচিন্তায় কাটিয়ে দেবেন। কাজেই মন্ত্রী হল ওই বিদেশী।

—এর পর?

যা হবার তাই হল। ওই বিদেশী একদিন রাজাকে হত্যা করে রাজপদ গ্রহণ করলে। রাজ্যের মানুষ তখন উন্মত্ত রাজকর সংগ্রহের অজুহাতে সে তখন মধুকে মাধ্বীতে পরিণত করেছে, তণ্ডুল পচন-পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে সুবায়। পুরুষেরা হতচেতন, নারীরা হয়েছে নটী।

বাবু, তখন এদেশে নারীরা প্রত্যেকেই নৃত্যপটীয়সী ছিল। এই যে বনভূমি, এর মাথার উপরে যখন বর্ষায় ঘন কৃষ্ণ মেঘ নেমে আসত, তখন ওই শাল-অরণ্যে গাঢ় সবুজ পল্লবশীর্ষে সহস্র ইন্দ্রধনু ফুটে উঠত। বাবু, গিরৌ কলাপী গগনে চ মেঘঃ, ওই ঘনঘটাবিস্তৃত মেঘমালা আকাশ-পথে চলত, গাছের মাথায় মাথায় কলাপীরা কলাপ বিস্তার করে, নৃত্য করে, কেকারব তুলে তাকে সম্বর্ধনা করত। রাজার অন্তঃপুর থেকে দরিদ্রের কুটীর-অঙ্গন পর্যন্ত কুলাঙ্গনারা রঙিন কাপড় পরে মাথার খোঁপায় গুচ্ছ গুচ্ছ গিরিমল্লিকা অর্থাৎ কুচি ফুলের স্তবক পরে নৃত্য শিক্ষা করত। নাচত। বাবু, এখনও এরা বর্ষায় নাচে আর গান গায়—

এস মেঘ বস মেঘ আমার ভূয়ের শিয়রে
গলে নাম ভিজায়ে হে
টিলা খানা টিকরে
তোমার বরণ আমার কেশে—
যতন করে মাখি হে।

এই নৃত্যপরা কুলাঙ্গনারা তখন নর্তকীতে পরিণত হয়েছে। যেন দামোদরে পাহাড়-ভাঙ্গা বন্যার মত উল্লাস-উচ্ছ্বাসের ঢল নেমেছে। হায় হায়! গিরিচুড়ায় বজ্রাঘাত হয়; কিন্তু কুলভাঙা গিরিকন্যা নদীর তা দেখবার অবকাশ কোথায়? রাজা নিহত হলেন। নূতন মন্ত্রী চলল রাজপুত্রের সন্ধানে! বীজ রাখবে না। কিন্তু রক্ষা করলে তাকে ধাত্রী। সে তাকে বুকে করে ছুটে এল সেই বৃদ্ধ মন্ত্রীর কাছে। বৃদ্ধ মন্ত্রী গভীর অন্ধকারে ছেলেটিকে বুকে করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন।

এই পাহাড়ে বাস করতেন ওই সিদ্ধ শিল্পী। তিনি হলেন বিশ্বকর্মা। প্রভু পার্শ্বনাথের মন্দির-মূর্তি নির্মাণের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন স্বর্গলোক থেকে। তিনি প্রভু পার্শ্বনাথের মূর্তি ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ করবার জন্য সন্ন্যাস নিয়ে তপস্যা

করছিলেন। বৃদ্ধ এইখানে আশ্রয় নিয়ে ছেলেটিকে ওই সাধকের হাতে সমর্পণ করে সেই রাত্রেই চোখ বুজলেন।

সন্ন্যাসীবেশী বিশ্বকর্মার হাতে এই শিশু ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল। সন্ন্যাসী তপস্যা করতেন, শিশু চুপ করে বসে দেখত। তিনি স্তবগান করতেন, সে শুনত। অহিংসা অক্রোধ সত্য পরমোধর্ম! এরপর সন্ন্যাসী গেলেন সমেতশিখরে—প্রভু পার্শ্বনাথের মন্দিরপাদপদ্ম নির্মাণের জন্য, তীর্থঙ্করদের বিগ্রহ নির্মাণের জন্য। শিশু তখন বালক, সেও সঙ্গে গেল। বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেন, সে নিরীক্ষণ করে। নিরীক্ষণ মাত্রেই সে আয়ত্ত করে শিল্পকৌশল।

নির্মাণকর্ম সমাপ্ত হল, বিশ্বকর্মা স্বস্থানে প্রয়াণ করবেন, ছেলেটিকে তিনি ডাকলেন। ছেলেটি তখন যুবক। সর্বাগ্রে বললেন—তাঁর জন্মকথা, তার পরিচয়। শুনেই ছেলেটির চিত্ত মহাবিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ইচ্ছা হল, ছুটে গিয়ে তার সর্বাপেক্ষা সূচীমুখ তীক্ষ্ণধার খোদাইয়ের অস্ত্রটা দিয়ে ওই রাজার বুক বিদ্ধ করে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে আর্তযন্ত্রণায় অধীর হয়ে চীৎকার করে উঠল সে।

আরও ঘটনা ঘটল।

ছেলেটি স্পর্শ করেছিল এই সাদা পাথরখানি; ওইখানি বেঁচেছিল—ওই মন্দির নির্মাণের পর। ছেলেটির ইচ্ছা ছিল, ওই পাথরে সে একখানি মনোরম আসন তৈরী করবে এবং তার উপর তার ইষ্টদেবতার মূর্তি নির্মাণ করে স্থাপন করবে। দীক্ষা তখন তার হয়ে গিয়েছে। এই সমেতশিখরে এসে স্বপ্নে সে দেখেছে এক মনোহর জ্যোতির্ময় পুরুষকে। নিত্য রাত্রে সেই পুরুষ এসে তার সামনে দাঁড়াতেন।

এই মুহূর্তে আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। দেহে-মস্তিষ্কে সে গভীর যন্ত্রণায় অধীর হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওই যে সাদা পাথরখানি, সেখানিও যেন আগুনের মত উত্তপ্ত হয়ে উঠল এবং দগ্ধ বস্তুর মত অঙ্গারবর্ণ ধারণ করলে। কালো হয়ে গেল। ছেলেটির মনে হল, আকাশের সুনীল স্নিগ্ধ সুষমা বিলুপ্ত হয়ে গেল, তাম্রবর্ণে কঠিন হয়ে উঠল আকাশ। শ্বাস নিতে কষ্ট হল তার—শবদাহের গন্ধে বাতাস ভারি এবং কটু হয়ে উঠল! সমেতশিখর থেকে প্রবাহিত একটি স্বচ্ছতোয়া ঝরনা পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল, তার জল বিবর্ণ হয়ে গেল, লক্ষ কোটি ক্রিমিকীটে সে ধারা বিষাক্ত হয়ে উঠল। পর্বতের সানুদেশে সবুজ কোমল পত্র পুষ্পভরা অরণ্য-শোভা ঝরে গেল। দেখতে পেলে—কোটি কোটি কীটে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে অরণ্য। পাখীরা ডেকে উঠল শকুনের ডাক। তার হাতের

মূর্তিটা ফেটে গেল। আকাশের সূর্য, তার জ্যোতি স্তিমিত হয়ে আসছে মনে হল—জ্যোতির্ময় সূর্য যেন গলিত সীসকপিণ্ডে পরিণত হতে চলেছেন।

চিৎকার করে উঠল সে। মনে মনে সে স্বপ্নদৃষ্ট দেবতাকে স্মরণ করতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কোথায় তিনি? দেখলে, এক ভয়াল মূর্তি—রক্তবর্ণ গোলাকার চক্ষু, তীক্ষ্ণনখর ক্রূর দুটি শ্বাদন্ত প্রকট করে সে দাঁড়িয়ে আছে।

—রক্ষা কর!—বলে সে গুরুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

—রক্ষা করার শক্তি আমার নেই। তুমি তোমার ইষ্টদেবতাকে ডাক, যাঁকে তুমি স্বপ্নে দেখেছ।

—তাঁকে যে আমি স্মরণ করতে পারছি না। কল্পনা করতে পারছি না। দেখছি এক ভয়াল মূর্তি।

—সে হিংসা। সিংহাসনে বসলে ওকেই তোমাকে স্থান দিতে হবে তোমার দক্ষিণে। কোষে ঝুলবে অসি। সেই অসি যে দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করবে, সেই দক্ষিণ বাহুকে সে আশ্রয় করবে। তাকে বিদায় কর।

—কি করে করব? সে যে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সম্মুখে।

—তপস্যা কর।

—কোন মন্ত্র জপ করব? তুমি বলে দাও।

বিশ্বকর্মা তার হাতে তুলে দিলেন খানিকটা মাটি আর এক টুকরো কাঠ। বললেন, পাথরের কাজ করা সময়সাপেক্ষ। তুমি এই দিয়ে নিত্য একটি করে মূর্তি গঠন করবে। আর ভুলতে চেষ্টা করবে তোমার অন্তরের হিংসাকে। প্রথম তোমার মূর্তিগুলি ওই ভয়াল রূপই গ্রহণ করবে। দিনে দিনে দেখবে পরিবর্তন হচ্ছে। তার রূপ পরিবর্তিত হবে, আর এই যে পাথরখানি—এর এই অঙ্গারবর্ণ ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকবে। তারপর যেদিন তোমার সিদ্ধিলাভ হবে, হিংসা চিরদিনের মত বিদায় নেবে অন্তর থেকে, সেই দিন—সেই দিন দেবতাকে স্থাপন করবে এই আসনের উপর। তুমি ফিরে যাও সেই পাহাড়ের উপর। প্রভু পার্শ্বনাথের এই সমেতশিখর—এ হল আনন্দধাম; এখানে এখন থাকবার তোমার আর অধিকার নেই।

এই সেই পাহাড়, বাবু। এখানে আরম্ভ হল এই অভিনব বিচিত্র সাধনা। মন্ত্র নাই, শুধু কাঠের উপর বাটালি হাতুড়ির সাহায্যে মূর্তির পর মূর্তি গঠন। কোনোদিন মাটি নিয়ে মূর্তি গঠন। প্রথম মূর্তি হল ভয়ঙ্কর, ওর অন্তরের সেই হিংসার মত।

মুখের পর মুখ, মূর্তির পর মূর্তি। পাশাপাশি সাজিয়ে রাখেন। দেখেন।

নিত্য প্রভাতে উঠে প্রথমেই দেখেন এই শিলাসনখানি।

তীক্ষ্ণদৃষ্টির পর্যবেক্ষণে শিল্পী দেখলেন, হ্যাঁ পরিবর্তন শুরু হয়েছে। এই যে গ্রাম, এই গ্রামের অধিবাসীরাও এই দেশের মানুষ; ওই রাজকুমারের স্বজাতি, তারাই এসে দিয়ে যেত তাঁকে আহার্য। আর সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখত—সেই পাগল শিল্পীর কর্ম।

ক্রমে সেই ভয়াল মূর্তির চিহ্ন আর রইল না। সহজ সুন্দর মানুষের মূর্তি ফুটে উঠল তাঁর শিল্পের মধ্যে। এদিকে শিলাসনও সাদায় মিশ্রিত ধূসরবর্ণে রূপান্তরিত হল।

সেই দিনই বিচিত্র সংঘটন ঘটল আবার। মূর্তিটি শেষ করে তিনি স্মিতদৃষ্টিতে সেই মূর্তিটিকে দেখলেন। সে যেন একটি রূপবান কুমারের মূর্তি। ঠিক এই সময় এই পাহাড়ের পাদমূলে অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। একজন রাজদূত এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, এই দেশের রাজা তাঁকে স্মরণ করেছেন। তাঁর শিল্প-নৈপুণ্যের কথা তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে। রাজপুত্রের মূর্তি গড়তে হবে তাঁকে।

শিল্পী মুখ তুললেন না, বললেন, না। আমি যাব না।

—তিনি আপনাকে প্রচুর পুরস্কার দেবেন।

—না—না—না।—উষ্ণ হয়ে উঠলেন শিল্পী।

পর-মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে সবিনয়ে বললেন, আমার সাধনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, আমি যাব না।

দূত চলে গেলেন। শিল্পী তাঁর গমনপথের দিকে চেয়ে রইলেন। মনে মনে পরম তৃপ্তি অনুভব করলেন যেন। ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি দূতকে। সেই রাজার দূত!

পরদিন প্রভাতে এই শিলাসনের কাছে এসে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন। এ কি হল? ধূসরবর্ণে কৃষ্ণবর্ণের মিশ্রণ যেন গাঢ় হয়ে উঠেছে। এ কি হল? কেন হল?

তাড়াতাড়ি তিনি মাটি দিয়ে মূর্তি গড়তে বসলেন।

এ কি? মূর্তির মধ্যে আবার যেন সেই ক্রূরতার আভাস দেখা দিয়েছে!

আকাশের দিকে তাকালেন। ঈষৎ তাম্রাভা যেন সঞ্চারিত হচ্ছে সেখানে। বাতাস আবার যেন ভারি মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, দূর নদীতীরে কোথাও যেন জ্বলেছে একটা চিতা।

হে দেবতা! হে গুরু! এ কি হল? এ কি হল?

রক্ষা কর! হে দেবতা, রক্ষা কর!

আবার অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। আবার এল এক রাজপুরুষ।

—না—না—না। তোমাদের আমি করজোড়ে বলছি, আমাকে নিষ্কৃতি দাও। সাধনায় বিঘ্ন কর না। আমি যাব না। আমি যাব না।

চলে গেল দূত।

শিল্পী আশ্বস্ত হলেন। আঃ, তিনি সঙ্কল্পভ্রষ্ট হন নাই।

আবার তিনি মূর্তি গড়তে লাগলেন; এবার মূর্তি হল আরও ভয়াবহ। শিলাসন আরও কালো হয়ে উঠল।

হে ভগবান! তবে কি—?

তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। সমস্ত রাত্রি চিন্তা করলেন।

প্রভাতে উঠেই শুনলেন, বনভূমিতে কেউ যেন কাঁদছে। মনে হল, পৃথিবী কাঁদছে। পরক্ষণেই মনে হল, না, তাঁর অন্তর কাঁদছে,—সেই কান্না ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে। প্রতিধ্বনি উঠছে। না, তাও তো নয়। এ কান্না যে কোনো মানবীর বক্ষবিদীর্ণ-করা শোকবিলাপ। কে? কে কাঁদছে?

কান্না এগিয়ে আসছে।

এল। মূর্তিমতী শোকের মত একটি মধ্যবয়সী মেয়ে, কোনও মা।

—কে মা তুমি?—শিল্পী প্রশ্ন করলেন, চোখে তার জল এল।

—আমি?—শিল্পী, তুমি দয়া কর, আমার পুত্রের—। বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন, বিস্ময়ে যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন তিনি। তার পর ছুটে গিয়ে দু হাতে টেনে বুকে তুলে নিলেন সেই দারু-মূর্তিটি। যে মূর্তিটির গঠনশেষে শিলাসনের ধূসরবর্ণে ফুটেছিল শুভ্রবর্ণের বেশি আভাস, যে মূর্তিটির মুখ দেখে শিল্পী মুগ্ধ হয়েছিল; এক কিশোর কুমারের মুখ ফুটেছিল যে মূর্তিটির মধ্যে।

—এই তো! এই তো আমার কুমার!

ইনি সেই রাজার রানী। রাজার ছেলে মুমূর্ষু। তিনি রোগশয্যায় থাকতেই রাজা তাঁর মৃত্যু আশঙ্কা করে শিল্পীকে ডেকেছিলেন, ছেলের একটি মূর্তি গড়িয়ে নেবেন। শিল্পী যান নি। প্রত্যাখ্যান করে তিনি তৃপ্তি পেয়েছিলেন। আজ রানী ছুটে এসেছেন।

—কুমারের মূর্তি তুমি গড়ে দাও শিল্পী। কুমারশূন্য গৃহে আমি থাকব কি করে? কিন্তু হে শিল্পী, তুমি কি সর্বজ্ঞ? তুমি কি দেবতা? আমার কুমারের মূর্তি—সুস্থ সুন্দর কুমারের মূর্তি তুমি গড়ে রেখেছ পুত্র-শোকাতুরার জন্য? আমাকে দাও। কি নেবে তুমি বল?

শিল্পীর মনে হল, আকাশ অমৃতময় হয়ে উঠেছে, বাতাসে মধুগন্ধ প্রবাহিত হচ্ছে, পাখির গানে গানে—বাঁশির সুর ছড়িয়ে পড়ছে দিগন্তে। পুষ্প শোভায় ভরে উঠেছে সুবিস্তীর্ণ শাল অরণ্য।

চোখ দিয়ে তাঁর নেমে এল অজস্র ধারায় মহানদীর বন্যা। সেই জল পড়তে লাগল এই শিলাসনের উপর। তিনি বললেন, নিয়ে যাও মা, ওই মূর্তি। আর আমাকে মার্জনা করে যাও।

রানী সে কথায় উত্তর না দিয়ে বললেন, এ কি? শিল্পী, তুমি কি সত্যই সর্বজ্ঞ?

ভয়ঙ্কর একটি মূর্তি দেখিয়ে তিনি বললেন, এই তো আমার স্বামীর মূর্তি। চর্মরোগে বীভৎস হয়েছে তাঁর রূপ—ঠিক, ঠিক—সেই রূপ।

—ও মূর্তিও তুমি নিয়ে যাও মা। আমি দেবতার কাছে প্রার্থনা করি, তোমার পুত্র বেঁচে উঠুক! তোমার স্বামী আরোগ্য লাভ করুন। কিন্তু তুমি শ্রান্ত। কিছু আহার গ্রহণ করে যাও।

শিল্পী তাঁকে খেতে দিলেন কিছু মধু, কিছু দুধ।

রানী চলে গেলেন। শিল্পী এবার পরিপূর্ণ অন্তর নিয়ে শিলাসনের কাছে এসে দারুখণ্ড নিয়ে বসলেন।

এ কি! এ কি! শিশুর মত আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন শিল্পী।

শুভ্র নিষ্কলঙ্ক হয়ে উঠেছে শিলাসন। নিষ্কলঙ্ক শুভ্র।

তার উপর পড়েছে জ্যোতির্ময় সূর্যের স্বর্ণ-দীপ্তি! মুহূর্তে অন্তর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ, যিনি স্বপ্নে তাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনিই প্রভু পার্শ্বনাথ।

৩

অমল চোখ বন্ধ করে স্তব্ধ হল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়েই বসে রইল। আমিও স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম। কোনো প্রশ্ন করতে পারলাম না। একটা প্রগাঢ় ভাবানুভূতি আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

কিছুক্ষণ পর চোখ বন্ধ রেখেই অমল কথা বলে উঠল। একটি প্রসন্ন মাধুর্যময় হাসি তার মুখে ফুটে উঠেছে। সে আবার আরম্ভ করলে, ব্রাহ্মণ কাহিনী যখন শেষ করলে, তখন আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছি। স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলাম। সেই বিচিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে এই বিচিত্র কাহিনী শুনে আমি

সমাহিত অবস্থার আস্বাদন পেয়েছিলাম সেদিন। চারিদিকে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রালোকিত শালবন, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের মধ্যে দূরান্তে গাঢ় নীল পঙ্ককূট শৈলমালা; পাখির কলকাকলী ছাড়া শব্দ নেই, সম্মুখে সেই শুভ্রবর্ণ শিলাসন। এই আবেষ্টনীর মধ্যে কথক ব্রাহ্মণ আমাকে বলছিলেন এই বিচিত্র কাহিনী, ইতিহাস যার নাগাল পায় না, বুদ্ধি যাকে বিশ্লেষণ করেও মিথ্যা বলতে পারে না।

কি করে বলতে পারে? কে বলতে পারে? বুদ্ধির অহঙ্কার আমি রাখি। আমি তো কোনো অহঙ্কারেই একে মিথ্যা বলতে পারব না। সেই দিনই যে কাঁদনের ঘরে ওই গ্রামের সকলের সম্মুখে আমি ওই শুচিস্মিতা মেয়েটির হাতে মধু এবং ক্ষীর পান করে এসেছি। সে পরিতৃপ্তি যে আমার সর্ব অন্তর আচ্ছন্ন করে রয়েছে। কি করে পারব মিথ্যা বলতে? ওটাকে যদি পূর্ণ সত্য নাও বল, বিকৃত সত্য তো বলতেই হবে। অর্থাৎ ধ্বংসাবশেষের মত সত্য। মাটি খুঁড়ে ইটের স্তূপ পেলে অতীতকালের মহানগরীর অস্তিত্বের সত্য যেখানে প্রমাণিত হয়, সেখানে এই মধু-ক্ষীরের সত্যই বা এটাকে সত্য প্রমাণিত করবে না কেন? এক বিচিত্র সাধনাকে যে এরা অন্তরের প্রগাঢ় বিশ্বাসে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় নিজেদের মধ্যে প্রচলিত রেখেছে, পালন করে আসছে—এ তো মিথ্যা নয়। বিচিত্র সরল মানুষ, সভ্যতার বিবর্তনের বিপ্লবের মধ্যেও এই সাধনাকে এরা ছাড়ে নি। এরা তো মিথ্যাচারী নয়। এরা সেই বিচিত্র ভারতের মাটির মানুষ, যারা ভারতের সকল ধর্মের সকল সভ্যতার কিছু-না-কিছু পরিচয় বহন করে চলেছে। ভারতের আত্মার পরিচয়ের শিলালিপি এদের অন্তরেই তো আছে।

ওই ব্রাহ্মণ হল কুলধর্মে তান্ত্রিক—ঘরে ঘোরতর মাংসাশী, অথচ এই পীঠের সেবায়েত; এবং এই ভূখণ্ডের ঊর্ধ্ব অধঃ সর্বস্বত্বের মালিক। এই ব্রাহ্মণই ওদের পুরোহিত। বোঝ, যোগাযোগ—সমন্বয়।

এই ভাবনার ধ্যান ভঙ্গ করলে বক্তা ব্রাহ্মণ।

অমল এতক্ষণে চোখ খুললে। হাসলে—তার সেই অভ্যাস-করা বক্রহাসি হাসতে চেষ্টা করল। বললে, এতক্ষণে ওই বিচিত্র কথক ব্রাহ্মণ অকস্মাৎ তার সেই ধূর্ত বিষয়ীরূপে ফিরে ধ্যান ভঙ্গ করে বললে, বেলা গড়ায়ে গেল বাবু মহাশয়।—বলেই হাতখানি পেতে নিবেদন করলে, আপনকাদের হাত ঝাড়লে সে আমাদের কাছে পর্বত।

তার কথকতা অত্যন্ত ভালো লেগেছিল, একখানি পাঁচ টাকার নোট বের

করে তার হাতে দিলাম। মুখর হয়ে উঠল ব্রাহ্মণ। এই গণতন্ত্রের যুগে, যখন নিজাম থেকে কোচবিহার পর্যন্ত রাজারা সিংহাসন থেকে নেমে নীরবে সরে দাঁড়ালেন, সেই যুগে আমাকে রাজা হওয়ার আশীর্বাদ করলে বার বার। তারপর চেপে বসল। বেলা গিয়েছে বলে বিদায় নেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল যে ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি এবার চেপে বসল, আইনের পরামর্শের জন্য। টিপিটার ওপাশে যে সাহেব কোম্পানির পরিত্যক্ত খাদ, সেই খাদের জন্য এই টিপিটার সংলগ্ন খানিকটা জমি তারা ব্রাহ্মণের কাছে বন্দোবস্ত নিয়েছিল। এখন তারা পিলার কাটিং করে খাদ বন্ধ করে চলে গেছে। মিনিমাম রয়ালটিও দেয় না। এবং ব্রাহ্মণ বলে যে, কোম্পানি বিনা বন্দোবস্তে এই টিপিটার তলদেশও নাকি শূন্য করে দিয়ে গেছে। তার ক্ষতিপূরণও তার প্রাপ্য। এই নিয়ে সে মামলা করেছে বা করবে। কিন্তু কোম্পানি দেশ স্বাধীন হবার পর তল্পি গুটিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। আইন-সম্মত সবই সে করেছে—তবু আমার মত বিদগ্ধ ব্যক্তি, যার আষ্টেপৃষ্ঠে এমন আমেরিকান লটবহরের স্ট্র্যাপবন্ধন, মুখে চুরুট, তার কাছে কিছু উপদেশ সে পেতে চায়।

যথাজ্ঞান উপদেশ দিতে হল। ব্রাহ্মণ বিদায় হল। বেলা তখন প্রায় তৃতীয় প্রহর শেষ। অপরাহ্ন প্রসন্ন বার্ধক্যের মত পরিব্যাপ্ত হচ্ছে অরণ্যভূমে। রোদে হলুদ রঙের আমেজ ধরেছে।

পাখিরা কলরব করে উঠল। দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম শেষ করে আকাশে পাখা মেলে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ল। কয়েকটি কেকাধ্বনিও শুনতে পেলাম।

আমি বসেই রইলাম। খাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর উঠে চারিদিক ঘুরে দেখলাম। যদি সেই মহাশিল্পীর গড়া এক টুকরো দারুমূর্তির অবশেষ পাই! পাব না জানতাম। শুধু তো কালের ধ্বংস নয়, মানুষও একে ধ্বংস করেছিল। এক সময় এসেছিল এখানে পৌত্তলিকতা-ধ্বংসের অভিযান। অশ্বক্ষুরে এখানকার ধুলো আকাশে তুলে ভেঙে-চুরে আগুন লাগিয়ে সব নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেষ্টা করেছিল। করেও ছিল। শুধু পড়ে ছিল ওই আসনখানি। যে শেষ বিগ্রহ শিল্পী নির্মাণ করেছিল, তাকে ভেঙে মন্দিরে আগুন লাগিয়ে তারা চলে গিয়েছিল, ওই পাথরখানার দিকে তারা ফিরে তাকায় নি। শুধু সেইখানিই আছে কালো পাথরের টিপির উপর তার শুভ্র রূপ নিয়ে। কিছু পেলাম না। অনেকক্ষণ বসে ভাবলাম। মনে হল, ওই ওদের চালাঘরের ষড়দলে—সারি সারি খোদাই মুখের কথা। সেই তো ব্রাহ্মণের কথকতার ইতিহাস। ওদিকে সূর্য নামল পশ্চিম আকাশে। অপরাহ্নের

আলো শাল-মহুয়া-পলাশের মাথায় পড়ল। পূর্বে দূরে নিবিড় অরণ্যের মাথায় বিচিত্র শোভা ফুটে উঠল। পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে অরণ্য লক্ষ্য করে উড়ে গেল। বিহঙ্গেরা পাখা বন্ধ করবার জন্য ঘরে ফিরল। আমিও উঠলাম। আমাকেও যেতে হবে। ওপারে এই পোড়ো খাদটার পরেই একটা চালুকুঠিতে ডেরা ফেলব। উঠতেই নজরে পড়ল, একটি মেয়ে অত্যন্ত মন্থর গতিতে—হয় সে খুব ক্লান্ত, নয় সে খুব বিষণ্ণ—মাথা হেঁট করে দেহখানিকে যেন কোনোরকমে বহন করে নিয়ে উঠে আসছে। একা।

সম্ভবত সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালতে আসছে। ওই গ্রামের মেয়ে। পরক্ষণেই চিনলাম, এ তো সেই কাঁদনের স্ত্রী—মোড়লের কন্যা সেই শুচিস্মিতা মেয়েটি।

নামবার জন্যে পা বাড়িয়েও নড়তে পারলাম না।

মেয়েটি উঠে এসেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। বিষণ্ণ মুখে শুচিশুভ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমি বললাম, আমি তোমাদের দেবতার স্থান দেখছি।

সে তেমনি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েই রইল।

—আচ্ছা, আমি যাই। সন্ধ্যা দেবে বুঝি? প্রদীপ দেবে?

এবার সে বললে, না অতিথ, পেনাম করব! মানত করব।—একটু চুপ করে থেকে বললে, মরদ আমার পালিয়ে গেল বাবু।

—পালিয়ে গেছে? কাঁদন?

—হ্যাঁ অতিথ। সি ইসব মানে না। তুমি অতিথ, আজকে রেতে ই-পথে যেয়ো না বাবা। সি যদি লুকায়ে থাকে, তবে—

শিউরে উঠল সে।

আমার অনিষ্ট যদি সে করে, তবে এই সাদা পাথরখানি কালো হয়ে যাবে। আকাশের নীল স্নিগ্ধ সুষমা তাম্রাভ কঠিন হয়ে উঠবে। বাতাস ভরে উঠবে শ্মশানগন্ধে। সূর্য সীসকপিণ্ডে পরিণত হবে।

আমি শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। অপলক দৃষ্টিতে সেই শুচিস্মিতা মেয়েটির মুখের দিকে দ্বিধাহীন হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটিও কোনো সঙ্কোচ অনুভব করলে না।

কালো আদিবাসীর কন্যা। কিন্তু যেমন শান্ত তার মাধুর্যময় দুটি চোখ, তেমনই একটি মিনতিস্নিগ্ধ শ্রী তার মুখে। ঠোঁট দুটি পাতলা কালো, দাঁত-গুলিতেই তার সর্বোত্তম শ্রী—হাসলে মনে হয় মন জুড়িয়ে গেল, পবিত্র হল। অকস্মাৎ তার চোখ দুটি থেকে দুটি ধারা গড়িয়ে এল। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে

বললে, বাবা অতিথ, তুমি আমাদের দেবতা। তুমি আশীর্বাদ কর বাবা, যেন তার মতি ফেরে। উয়াকে আমি বিয়া করেছিলাম, বাবার কথা শুনি নাই; গোটা গাঁয়ের লোক উয়ার উপরে নারাজ, তবু আমি মানি নাই। উয়ার এ কি মতি হল বাবা? গাঁয়ের লোক বলছেক, বাবা বলছে—সর্বনাশ হবেক, সি উয়ারই লেগে হবে। হায় বাবা, সবাই বলছে—উয়ার নরক হবে। ই আমি কি করে সইব বাবা?

কথাগুলি বলতে শুরু করেছিল আমাকে। বলতে বলতে আবেগের প্রাবল্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে কখন যে সে শিলাসনের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কথাগুলি ওই শিলাসনকে উদ্দেশ করে বলতে শুরু করেছিল, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। বুঝলাম, যখন সে কথা শেষ করে নতজানু হল শিলাসনের সম্মুখে, হাত দুটি জোড় করলে, ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল, আবার তার শান্ত মাধুর্যময় শুভ্র দুটি চোখ থেকে জলের ধারা নেমে এল তখন। নতজানু যুক্তকর হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে সে প্রণত হল। শিলাসনের প্রান্তে মাথাটি রাখলে। আত্মসমর্পণ কখনও চোখে দেখি নি, মনে হল, আত্মসমর্পণ প্রত্যক্ষ করলাম। দেহখানি তার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। বুঝলাম কাঁদছে। গভীর বেদনায় মন আমার ভরে উঠল। কিন্তু আর ওখানে থাকতে পারলাম না। মনে হল, থাকা উচিত নয়, থাকার অধিকার নেই আমার।

আমি ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলাম। যখন এপারে একেবারে নেমেছি, তখন ডাক শুনলাম—অতিথ!

ফিরে তাকালাম। শুচিস্মিতা মেয়েটি গভীর উৎকণ্ঠায় উৎকন্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে ডাকছে। আমি হেঁকে বললাম, ভয় নেই। আমি ঠিক চলে যাব।

সে দাঁড়িয়ে রইল। আমি পিস্তলটা খুলে হাতে নিলাম। কি জানি? তবে কাঁদনকে আমি হত্যা করব না। দরকার হলে—হাত বা পা খোঁড়া করে দেব। মেয়েটি আমার মনের মধ্যেই চিরস্থায়ী একটি আসনে যে!

ঠিক এই জন্যেই আবার আমি ফেরার পথে এই পথই ধরলাম। দেখে যাব কাঁদন ফিরল কি না? কিছু টাকা দিয়ে কাঁদনকে শান্ত করে যাবার অভিপ্রায়ও আমার ছিল। তা ছাড়া পুলিশের হাঙ্গামা দেখেও ও-পথে যেতে ইচ্ছে হল না। যেখান পর্যন্ত যাবার, দামোদর প্রজেক্টের কাজ যেখানে চলছে, সেখানে ঢুকতেই আমাকে দেহ খানাতল্লাস করতে দিতে হল। বোঝ হাঙ্গামা! সেই আটচল্লিশ খোপ্‌ওয়ালা পিঠে-বাঁধা ব্যাগ! তার উপর পিস্তল ছোরা কার্তুজ! লাইসেন্স আছে, পরিচয়পত্র আছে, মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারের সার্টিফিকেটও আছে। কিন্তু

পুলিশ তো সহজে ছাড়বে না। চোর নই—এ প্রমাণ করতেই অন্তত চার-পাঁচখানা তার পাঠাতে হবে। ভাগ্য ভালো যে দেখা হয়ে গেল বন্ধু-পুলিশের সঙ্গে। মাখনবাবু আই-বি ইন্সপেক্টর। বিদগ্ধ জন। বাংলা সাহিত্যের এম-এ। থিয়েটার-রসিক এবং পাগল জন। তিনি ছিলেন ওই প্রথম ঘাঁটিতে ইনচার্জ। তিনি বাঁচালেন ট্র্যাপ খোলার দায় থেকে। সব শুনে বললেন, এ পথে আর হাটবেন না। ওয়েস্ট-বেঙ্গল বেহার—দুই প্রভিন্সের আই-বি জড়ো হয়েছে। পিছনে চাষ চলছে। ব্যাপার জানতে চাইবেন না। বলতে পারব না। আপনার জিপ এসে থাকলে খবর পাঠিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি। যে পথে এসেছেন সেই পথে চলে যান, এবং যথাসম্ভব শীঘ্র। কারণ এ পথে আরও এগুতে হতেও পারে আমাদের। ব্যাপারটা একটা বড় ব্যাপার।

জিপ আসতেই রওনা হলাম।

মাখনবাবু বললেন, যে পথ দিয়ে এসেছিলে তুমি সে পথ দিয়ে ফিরলে নাকো আর, ব্যাপারটা ভালো না। যে পথে আসা, সেই পথেই ফেরা ভালো। গুড লাক!

কাপড় ছিঁড়লে যেমন সেলাই করে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, যে-কোনো মুহূর্তে আর এক জায়গায় ফাটে, মোটর জাতীয় যন্ত্রগুলির প্রকৃতি ঠিক তাই। একবার জখম হলে তখন মালিশ মেরামত পালিশ যতই কর, আবার যে-কোনো মুহূর্তে বার কয়েক উঁ-উঁ শব্দ করে থেমে যাবে। তার ওপর মফস্বলে মেরামত! মাইল পঞ্চাশেক এসেছে—সেই ঢের। হঠাৎ থেমে গেল। গেল সন্ধ্যের মুখে একটা জঙ্গলের ভিতর, পিছনে ঢালু খাদটা—সামনে সেই ব্রাহ্মণের সীমানায় বদ্ধ খাদটা, তার ওপারে সেই শিলাসনের প্রস্তরস্তূপ। ইচ্ছা ছিল, ওই স্তূপটা পার হয়ে সেই গ্রামের এলাকায় ডেরা নেব। এবার আতিথ্য স্বীকারের প্রয়োজন হবে না। সঙ্গে সঙ্গী আছে, তাঁবু আছে, যা পাঁচ মিনিটে খাটানো যায়। খাদ্যদ্রব্য সব আছে। সকালে গ্রামে গিয়ে মোড়লের সঙ্গে দেখা করে কাঁদনের সংবাদ নেব। তাকে কিছু টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করব। এমন কি—

থামলেন বক্তা। একটু হেসে বললেন, আজ আমারও অশোভন মনে হচ্ছে সে চিন্তাটা, তোমাদের তো হবেই। মনে হয়েছিল, নিজের কপালে পাথর ঠুকে রক্তপাত করে কাঁদনের হিংসার উগ্রতাটা কমিয়ে দেব! তার গ্রামের জাতির অনুশাসনে যা বারণ, তা নইলে যে ক্ষেত্রে তার কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছে না, সে ক্ষেত্রে আমিই প্রকারান্তরে আদায় দিয়ে তার অবরুদ্ধ ক্ষোভ এবং ক্রোধকে শান্ত করব। অর্থাৎ খানিকটা কপালের রক্ত।

কিন্তু মাঝপথে রথ অচল হল। বন এখানে ঘন না হলেও মন্দ নয়। শাল

পলাশ মহুয়া এখানে বেশ সন্নিবদ্ধ হয়ে অরণ্যের গাম্ভীর্যই এনে দিয়েছে। তার সঙ্গে কুর্চি এবং কাঁটা ঝোপ। কোনো রকমে জিপটাকে ঠেলে পথের পাশে সরিয়ে পথের ধারে গৃহ রচনা করা গেল। কাজের চাপ বেশি ছিল না। আমার অনুসন্ধান শেষ হয়েছে। দামোদর প্রজেক্ট—জলের চাপ বাড়বে খানিকটা খনি অঞ্চলে, সে বাড়ুক, কিন্তু যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হবে জলপ্রপাত-বেগ হতে, তার সাহায্যে সে জল নিষ্কাশন করা কঠিন হবে না। এই যে অঞ্চলটা—এ অঞ্চল পর্যন্ত একটি বিস্তৃত জলাধার তৈরি হবে। এ বন তখন বোধ হয় থাকবে না। কাজেই প্রকৃতির শোভা আর ওই গল্প—শিলাসন আমার মনের মধ্যে অনায়াসে স্থান পেয়েছিল।

আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ, বোধ হয় তিথিতে ছিল একাদশী কি দ্বাদশী, আকাশ ছিল ঘন নীল। ঘনপল্লব সেই ক্ষুদ্র বনভূমির বুকে পত্রপল্লবের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না পড়েছে; সে এক অপূর্ব শোভা। সত্য বলছি, বেড়াচ্ছিলাম—হঠাৎ দূরে দূরে ওই জ্যোৎস্নার টুকরোগুলি দেখে মনে হল, যেন রত্নালঙ্কার ছড়িয়ে পড়ে আছে। রামায়ণ মনে পড়ল, সীতাকে রাবণ নিয়ে গেছেন হরণ করে—তিনি আকাশ থেকে ফেলে দিয়েছেন তাঁর রত্নালঙ্কার, তার কতক পড়েছে মাটিতে, কতক লেগে রয়েছে বনস্পতির শাখা-পল্লবে। আকাশের দিকে চাইতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু চাঁদ চোখে পড়ে তো আকাশ চোখে পড়ে না, আকাশের টুকরো চোখে পড়ে তো চাঁদ চোখে পড়ে না! অরণ্যের ভিতরটা থমথম করছে। ডাকছে শুধু অসংখ্য কোটি কীট-পতঙ্গ। সে এক সঙ্গীত। খোলা আকাশে চাঁদ দেখতে ইচ্ছা হল। ছোট বন, বনের একটা টুকরো—ঘন বন এককালে বিস্তৃত ছিল, এখন কেটে শেষ হয়েছে, এই টুকরোটা পড়ে আছে। কোথাও কাঠঠোকরায় অবিরাম গাছের কাণ্ডে ঠোকরাচ্ছিল। আমার মনে পড়ল সেই শিল্পীর স্মৃতি। মনে হল, কাঠের উপর মূর্তি রচনা করছে বোধ হয়।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম।

বেশ খানিকটা গিয়েছি—জায়গাটা প্রায় বনটার এক প্রান্তভাগে; মানুষের সাড়া পেলাম। থমকে দাঁড়ালাম। কে কোথায়—দেখবার চেষ্টা করলাম। তাদের আবিষ্কার করার পূর্বেই কিন্তু বুঝতে পারলাম, অরণ্যচারী মিথুন; দুটি কণ্ঠস্বর স্পষ্ট। মিনতিভরা মৃদু মিষ্ট নারীকণ্ঠের বাক্যগুলি কানে ঠিক এল না। পরক্ষণেই পেলাম পুরুষকণ্ঠের কথা।

—না না না। কাঁদন যাবে না, সি উসব মানে না, গাঁ থেকে এই টিলা

তাকাৎ মাটি মেপে গড়াগড়ি খাবে না। গাঁয়ের সবারই কাছে হাত জোড় সি করবে না। তুর বাবাকে আমি মানি না। না, মানব না।

—বাবাকে মানিস না, ধরমকে, দেবতাকে—

—না—না। কতবার বলব? পাথরকে আমি মানি না। আমি দেখাব, সি লোকটার লহু আমি দেখব, রক্ত লিব, দেখাব—পাথর কালো হল না, কিছু হল না। দেখাব আমি।

—না—না, বুলিস না গো, তুর পায়ে পড়ি।

—শুন, তু যদি আমাকে লিবি তো কালকে রেতে যা পারিস নিয়ে চলে আসবি। আমি তুকে নিয়ে চলে যাব। আর না আসিস তো থাক। কাঁদন ফিরবে না। মিছে বলে না কাঁদন।

কাঁদন আর তার বউ—সেই শুচিস্মিতা মেয়েটি।

কাঁদন সমাজবিধি মানে নি, তাকে গ্রামের লোকের কাছে দ্বারে দ্বারে পাপ স্বীকার করতে হবে, গ্রাম থেকে সাষ্টাঙ্গে ভূমি মেপে আসতে হবে ওই শিলাসন পর্যন্ত, সঙ্গে আসবে তার স্ত্রী জলভরা কুম্ভ মাথায় নিয়ে। তাই দিয়ে ওই শিলাসন ধুয়ে প্রণাম করে মার্জনা চেয়ে বলতে হবে—ক্ষমা কর। আমার পাপ ক্ষমা কর। তুমি শুভ্র থাক, নিষ্কলঙ্ক থাক। কাঁদন সাষ্টাঙ্গে ভূমি মেপে আসবে, সঙ্গে আসবে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। প্রতিবার চিৎকার করে সমস্বরে বলবে, পাপীকে ক্ষমা কর হে!—সে দীনতা, সে অপমান স্বীকার করবে না কাঁদন। সে চলে যাবে গ্রাম থেকে।

—কি বুলছিস? বল? আসবি কাল রেতে হেথা? থাকব দাঁড়ায়ে?

—আসব। তুর বড় আমার কে আছে বল?

আমি এগিয়ে যাব কি না ভাবছিলাম। চিত্তগ্লানির আর সীমা ছিল না। স্থির করলাম, এগিয়ে যাই। কাঁদনের কাছে মার্জনা চাই। তার হাতে একটা পাথর তুলে দিই, বলি—মার আমাকে কাঁদন। তোর হিংসা চরিতার্থ হোক। তোর পরিতৃপ্তি হোক।

কিন্তু তার আগেই মোটরের শব্দ উঠল, ভারি মোটরের শব্দ—আমার জিপের নয়, বনের গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে একটানা শক্তিশালী ইঞ্জিনের গোঙানি বিচিত্রভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। একটা নয়,—দুটো তিনটে চারটে। কি ব্যাপার? এই রাত্রে এতগুলি মোটর?

কাঁদনের গলা কানে এল—পালা তু। ঘরকে যা। পুলিশ—পুলিশ এসেছে। তু পালা।

একটা দ্রুত পদধ্বনি শুনলাম। এবার দেখতে পেলাম, একটা কুর্চি ঝোপের আড়াল থেকে দীর্ঘ কৃষ্ণকায় কাঁদন অরণ্যচারী শার্দূলের মত ছুটে পালাচ্ছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ক্ষণে ক্ষণে তাকে দেখা যাচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে আড়াল পড়ছে গাছের কাণ্ডে। সে মিলিয়ে গেল।

ঝোপের আড়াল থেকে উঠল সেই মেয়েটি। চিরবিষণ্ণ উদাসিনী কৃষ্ণ রাত্রির মত কৃষ্ণকায়া মেয়েটিও চলে গেল শ্রান্ত পদক্ষেপে গাছের ছায়ায় ছায়ায়। মধ্যে মধ্যে দাঁড়াল। দেখতে চেষ্টা করল কাঁদনকে। বুঝলাম তার উদ্বেগ।

পুলিশ! কিন্তু কাঁদন পালাল কেন?

পুলিশ! চকিতে মনে পড়ল, মাখনবাবু আই. বি. ইন্সপেক্টরের কথা—এদিকেও হয়ত যেতে হতে পারে।

ওদিকে ঘন ঘন জিপের হর্নের শব্দ উঠছে। আমি দ্রুতপদে ফিরলাম। দেখলাম, আশঙ্কাই সত্য হয়েছে। আমাদের আস্তানা ঘিরে পুলিশ। আমার সঙ্গে পিস্তল ছোরা কার্তুজ। খুলে বসলাম সব পকেটগুলি, দেখাতে লাগলাম—কাগজের পর কাগজ, পরিচয়পত্র। মাইনিং ফেডারেশন, চেম্বার অব কমার্স, মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্স, ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুমতিপত্র—মায় আমার ফটো। ইতিমধ্যে এসে পৌছুলেন মাখনবাবু, তিনি হেসে বললেন—কি হল আবার?

বললাম, জিপ অবাধ্য, দরবার অসাধ্য, ভরসা এখন আপনি।

বলতে বলতে আরও দুটো লরি এসে পৌছুল। পুলিশ বোঝাই। যিনি আমার কাগজ দেখছিলেন, তিনি এবার হেসে আমাকে রেহাই দিয়ে বললেন—আর এগুবেন না আপনি। সাবধানে থাকবেন। মাখনবাবু, আপনি এখানেই থাকুন।

বুঝলাম, বিশ্বাস করেও পাহারা রেখে গেলেন। আমার জিপ খারাপ, নড়বার উপায় ছিল না। ওদিকে ভোর হয়ে আসছে। কিন্তু কাঁদন কি ডাকাত দলের লোক? এ অঞ্চলে বড় বড় ডাকাতের দল আছে, কুঠি লুঠ করে! কিন্তু আই-বি মাখনবাবু—

হঠাৎ বন্দুকের শব্দ শুনলাম।

মাখনবাবু বললেন—রেড আরম্ভ হয়ে গেল।

ভোরবেলায় অরণ্যভূমি মুখরিত হয়ে উঠল আগ্নেয়াস্ত্রের কঠিন উচ্চশব্দে। বহু দূরে দূরে প্রতিধ্বনি উঠছে! টিলার পর টিলা—চারিদিকে অরণ্য—প্রতিধ্বনির দেশ।

মাখনবাবু বললেন—এত বড় যুদ্ধটা গেল। মারণাস্ত্র দিয়ে পাহাড় বানিয়ে গেছে আমেরিকানরা। পানাগড় ডাম্প থেকে চুরি করে প্রচুর অস্ত্র গুলিবারুদ একদল বামপন্থী এখানে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে—খাদের ভিতর। কাল সন্ধ্যায় একজন ধরা পড়েছে, সে কনফেশন করেছে—

প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ হয়ে গেল কোথায়। কানের পর্দা যেন ফেটে গেল। আমাদের যেন চেতনা হারিয়ে গেল। গাছগুলি যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। মাটি কাঁপতে লাগল। ঝরঝর শব্দে ধুলোমাটি ঝরতে লাগল গাছের পত্রপল্লবে। ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সম্মুখ ভাগ। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শক্তিতে মাটিপাথর ধুলো উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হয়ে ঝরে পড়ছে।

আমরা বসে পড়েছিলাম।

প্রথম কথা বললেন মাখনবাবু, বললেন—ধরা গেল না। এক্সপ্লোড করে দিলে। এখানকার পোড়ো খাদের তলায় একটা ডাম্প ছিল। কিন্তু আর না। এগুতে হবে। আসুন আমার সঙ্গে।

যেতে হবে!

বন্ধু মাখনবাবু বললেন—সেজন্যে নয়। আসুন। আমারও দায়িত্ব আছে। আপনিও নিরাপদে থাকবেন।

লরি গর্জে উঠল। চলল।

কিছুদূর গিয়ে অরণ্যপ্রান্ত। সামনে সেই টিলা। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে সেই শুভ্র শিলাসনখানি। টিলার ও মাথায় দেখা যাচ্ছে মানুষ, পুলিশ।

হঠাৎ আবার শব্দ উঠল।

বিস্ফোরণের নয়। একটা গোঙানি। ভূমিকম্পের সময় গোঙানি শুনেছ? অনেকটা সেই রকম। ভূমিকম্প—গাছ দুলছে, মাটি কাঁপছে। আমি চিৎকার করে উঠলাম, রোখো, রোখো।

ড্রাইভার ভয় পেয়েছিল, সে রুখলে।

বললাম, পিছিয়ে—পিছিয়ে চল।

—কেন? মাখনবাবু প্রশ্ন করলেন। ভূমিকম্প? এ কি? এ কি?

—না। সাবসাইড।

—কি?

—খাদ ধ্বসছে। ভিতরে পিলার কাটিং করে নিয়ে গেছে বণিকের দল। উপযুক্ত, কি আদৌ স্যাণ্ডপ্যাকিং করে নি। প্রচণ্ড এক্সপ্লোশনের ফলে সে ধ্বসছে। নিচে নেমে যাচ্ছে। পৃথিবীর বুক ফাটছে। ওই দেখুন।

ভাগ্যক্রমে আমরা এলাকার বাইরে ছিলাম। সামনে মাটি ফাটল, বসতে লাগল। বড় বড় বনস্পতি দুলতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম, তার বত্রিশ নাড়ী ছিঁড়ছে—বড় বড় মূল ছিঁড়ছে ঝড়ের জাহাজের কাছির মত। কাঁপতে কাঁপতে হেলতে লাগল, সশব্দে পড়ল। মাটি বসছে। ভিতর থেকে বদ্ধ বায়ু সশব্দে উঠছে ঘূর্ণাবর্তের মতো। পাথর ছুটছে। সে এক দৃশ্য! একটা যেন খণ্ডপ্রলয়। একটা মহাকালান্তর। বিরূপাক্ষ নাচছে। মাটি বসে গেল।

এ কি?

'এ কি'ই বা কেন? হাসলাম। সেই মহাসাধকের সেই টিলা ফাটছে। এই প্রচণ্ড টানে সেও ধ্বসে পড়ছে। মহাশব্দ করে সে পড়ল। এতে 'এ কি' বলে প্রশ্ন করছি কেন?

শিলাসন! শিলাসন গেল, নবযুগের সুড়ঙ্গপথে পৃথিবীর বুকে যে ফাটল ধরল, তারই মধ্যে পাতালগর্ভে চলে গেল!

ও আর কালো হবে না? ও কালো হলে আকাশ আর তামার বর্ণ ধারণ করবে না? বাতাসেও উঠবে না শবদাহের গন্ধ! হারিয়ে গেল, অতীত কালের মতই মুছে গেল!

যাক। তাতেই বা ক্ষতি কি?

আছে ক্ষতি। ওই ধ্বসে-পড়া টিলার প্রান্তে দাঁড়িয়ে দলে দলে নরনারী কাঁদছে। বুক চাপড়াচ্ছে বৃদ্ধ মোড়ল।

ও কি?

ছুটে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। কাঁদনের স্ত্রী, মোড়লের কন্যা।

—দেবতা, ফিরে এস। আমার স্বামীর পাপ ক্ষমা কর।

চিৎকার উঠল চারিদিক থেকে। কিন্তু শুচিস্মিতা শান্ত মেয়েটি আজ উন্মাদিনী। সে ব্যাধ-ভীত হরিণীর মত লাফ দিয়ে নামল ধ্বংস স্তূপের মধ্যে। কখন যে বসে যাবে সে-স্তূপ কেউ বলতে পারে না। তবু তার ভ্রূক্ষেপ নাই।

কই সে আসন? কোথায় সে আসন?

উন্মাদিনীর মত সে খুঁজতে লাগল। তার স্বামীর প্রতি সহস্র মানুষের অনুযোগ সে সহ্য করতে পারবে না। কাঁদনের অনন্ত নীরস পরিণামের কথা ভেবে সেই মহাভারতের যুগের নারী অধীর হয়ে উঠেছে। তার বাপের বুক-চাপড়ানি সে দেখতে পারছে না। ওই পাথর হারিয়ে যাবে, মাটির ভিতরে কখন কলঙ্কে কালো হবে, আকাশ তামার বর্ণ ধরবে, বাতাস শবদাহের গন্ধে ভরে উঠবে, নদীর জল দূষিত হবে, গাছের পত্রপল্লব ঝরে যাবে, কীটে আচ্ছন্ন

হবে, জ্যোতির্ময় সূর্য স্তিমিত হয়ে সীসকপিণ্ডে পরিণত হবে, এই মহাভাবনায় সে উন্মাদিনী। সে জানে, কাঁদনই এর কারণ। সে তার প্রিয়তমা। পাপ তার। সে খুঁজছে। শিলাসন—কোথায় শিলাসন? তুলতে যে তাকে হবেই।

কিন্তু প্রকৃতি কাল নিষ্ঠুর।

মাটি বসছে। ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত ধূলার রাশি আকাশ স্পর্শ করলে।

চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল অমলের। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

তারপর আবার বললে, মানুষ কিন্তু প্রকৃতির শক্তির কাছে হার মানে না। মানুষ আশ্চর্য! গোটা গ্রামের মানুষ যারা বুক চাপড়াচ্ছিল, তাদের মুখে চোখে ফুটে উঠল সে কি বিস্ময়কর দৃঢ়তা, কঠিন পবিত্র সংকল্প! পিঁপড়েরা যেমন ধ্বংস-হওয়া বাসস্থান উদ্ধার করে, তেমনই ভাবে নামল তারা সেই গভীর গহ্বরে। তারপর দীর্ঘ তিন দিন ধরে মাটি পাথর সরিয়ে তুলে আনলে সেই শিলাসন। আশ্চর্য, মেয়েটিই আঁকড়ে ধরে ছিল সেই আসনখানি।

প্রায় অক্ষতই ছিল সে আসনখানি। ছুটো একটা টুকরো কোণ থেকে ছেড়ে গিয়েছিল।

হাত বাড়িয়ে সামনের তাক থেকে এক টুকরো সাদা পাথর নামিয়ে নিয়ে তার মাথায় ঠেকালে অমল। বললে, আমি ভাবছি শুধু সেই দেবতার কথা, যে দেবতা এই আসনের উপর ছিলেন, তার কথা। আর ভাবি মূর্তিমতী নিষ্ঠার মত ওই শুচিস্মিতা মেয়েটির কথা।

না রী

ডাক্তারখানার সামনে একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। শব্দ করে ধোঁয়া ছেড়ে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

ডাক্তার প্রেসক্রপশন লিখতে লিখতে মুখ তুললেন। ওই ইঞ্জিন বন্ধ করার শব্দেই ডাক্তার বুঝলেন ডাক্তারখানাতেই কেউ এল মোটরে করে। যুদ্ধের বাজারে পেট্রোল র‍্যাশন এবং মোটরের দুষ্প্রাপ্যতায় মোটর এসে থামলে ঔৎসুক্য একটু হয় বৈ কি! বিশেষজ্ঞ বড় বড় ডাক্তার যাঁরা—বত্রিশ-চৌষট্টি-একশ যাঁদের ফি—তাঁদের দরজার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু মাঝারি খ্যাতিসম্পন্ন ডাক্তার, আট টাকা যাঁর বাড়িতে ফিস, এ বাজারে যাঁরা মোটরে চড়ে আসেন, তাঁর দরজায়

না এসে তাঁকে তো তাঁরা বাড়িতে ডাকতে পারেন। আরও একটু বিস্মিত হলেন ডাক্তার, একা একটি মেয়ে নামছে। ডাক্তার পর মুহূর্তেই আবার চোখ নামিয়ে প্রেসক্রপশন লিখতে আরম্ভ করলেন। ডাক্তারের কাছে লোকের যাওয়া আসার ভঙ্গিটা বিচিত্র। এবং রোগ, বিশেষতঃ রোগীর বিষয়ে ডাক্তারদের মন প্রায় নির্বাণের কোঠাবাড়ির সিঁড়ির মাথায় এসে পৌঁছেছে। বিস্ময়ও নাই, ঔৎসুক্যও নাই। রোগী আসে, ডাক্তার দেখেন—টেম্পারেচার, হার্ট, লাংস, জিভ, পেট ; কয়েকটা প্রশ্ন করেন, প্রেসক্রপশন লেখেন, কি খাবে বলে দেন। তারপর আর একজনকে বলেন, আপনার কি ?

আড়ষ্ট মুখে বোল টেনে লোকটি বলে, অসহ্য বেদনা।

—বেদনা তো বটে। কোথায় ?

লোকটি মুখ উঁচু করে সামনের একটি মাত্র দাঁতের কাছে আঙুল নিয়ে গিয়ে বলে—ডাঁ-ট।

গোটা 'ত' বর্গটাই উচ্চারণ করতে গেলে দাঁতের সঙ্গে জিভের স্পর্শ প্রয়োজন। তাই জিভকে তালু পর্যন্ত এনে সন্তর্পণে 'দ'কে ড এবং 'ত'কে ট বলে কাজ সারেন। ডাক্তার বলেন, ডেন্টিস্টের কাছে যান।—তারপর বলেন, নাড়ুন তো আঙুলে করে দেখি।

আঙুল দিয়ে দাঁত নাড়তে নাড়তে ভদ্রলোক 'হুঁ হুঁ' করে ওঠেন।

ডাক্তার বলেন—প্রফুল্ল, দাঁত-তোলা যন্ত্রটা দাও তো ?

শিউরে ওঠেন ভদ্রলোক—না-না।

—তবে এলেন কেন আমার কাছে ?

—একটু কোকেন।

—দিচ্ছি। হাঁ করুন। আর একটু, হ্যাঁ—। এমন করে হাত দেবেন না। হাত সরান। ব্যাস হয়ে গেছে। জল দিয়ে কুল্লু করুন। দাঁতটা ফেলে দিন। ধরুন। —এই তুমরা কেয়া ? অঁা ?

—পেটমে বহুত দরদ। পা'খানা যাচ্ছে বাবু। জরভি হইয়েছে—

—হুঁ। দেখি ? উতারো, গায়ের কাপড়া উতারো।—পেট টিপে দেখেন, হাত দেখেন।—পা'খানার সময় পেট কামড়ায় ? আম আছে ?

—হাঁ বাবু।

—রক্ত আছে ?

—হাঁ বাবু। তাজা রক্ত নিকলাচ্ছে।

—কতবার পা'খানা গিয়েছ ?

—দশ-বারো দফে।—একটু ভেবে আবার বলে—বেশি হোবে বাবু।

—হুঁ।—ডাক্তার প্রেসক্রপশন লেখেন।—খুব সাবধানে থাকবে। খারাপ বেমার। ব্যাসিলারী ডিসেণ্ট্রী! শক্ত জিনিস কিছু মৎ খাও। ছানার জল, বার্লি, ডাবের জল এই খাবে। —আপনার ?

ভদ্রলোক বলেন—সেই সে পরশু আমার মেয়েকে নিয়ে এসেছিলাম। কমলা।

—কোন মেয়েটি বলুন তো ?

—আমার মেয়ে।

—হ্যাঁ। কোন মেয়েটি ? বয়স কত ? অসুখ কি ?

—কমলা বলে মেয়েটি। পনের-ষোল বছর বয়স। বুকে বেদনা জ্বর।

—ওঃ। হুগলী থেকে অসুখ নিয়ে এসেছে ?

—হ্যাঁ।

—কি খবর ? কেমন আছে ?

—কমে নি কিছু। জ্বরটা একটু বেশি হয়েছিল বরং।

—হুঁ! কই, এনেছেন ?

—না। বলেন তো ওবেলা আনব।

—আনবেন। প্লুরিসি হয়েছে আপনার মেয়ের। ভালো চিকিৎসার দরকার। ক্যালসিয়াম ইনজেকশন দিতে হবে। না হলে ভবিষ্যতে খারাপ হতে পারে।

—খারাপ হতে পারে ?

—হ্যাঁ। টি-বি-তে দাঁড়াতে পারে।

ভদ্রলোক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

ডাক্তার আর একজনকে বলেন—আপনার ?

—আমার বাড়িতে একবার যেতে হবে।

—বারোটার পর। ঠিকানা রেখে যান কম্পাউণ্ডারের কাছে।—এই তোর কি রে ? এ্যাঁ ? তোর তো সেই সাতখানা রোগ। ওষুধ খাচ্ছিস ? কই দেখি, আয়।

এ পাড়ারই একজন দরিদ্র রুগ্ন ব্যক্তি।

—আর মদ খাচ্ছিস ?

—আজ্ঞে না।

ডাক্তার চোখের পাতা টেনে দেখলেন। লিভার টিপলেন—লাগে ?

বেশ কাতর মুখভঙ্গি করেও লোকটি বললে—আজ্ঞে, আগের চেয়ে কম।

—হুঁ! ওষুধ নিয়ে যা। মদ খেলে কিন্তু বাঁচবি না তুই।

প্রেসক্রুপশন লিখতে বসলেন ডাক্তার। ঠিক এই সময়ে ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল। ডাক্তার একবার চোখ তুলে দেখলেন। একটি মেয়ে নামল—একা। বিস্ময়ে মুহূর্তের জন্য ডাক্তারের ললাটে প্রশ্নের কটি রেখা জেগে উঠল। তার পরই তিনি আবার প্রেসক্রুপশনে মন দিলেন।

মেয়েটি এসে পরিচিতের মত সপ্রতিভভাবে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট কাঠের পার্টিশন দিয়ে ঘেরা ঘরটির মধ্যে ঢুকে বসল। অল্পবয়সী লম্বা গড়নের মেয়েটির আবির্ভাবে রোগীর দলও একটু উৎসুক, এমন কি খানিকটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল যেন। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ির রঙের প্রতিচ্ছটার আভায় তাদের চোখে যেন প্রসন্নতা এনে দিলে খানিকটা।

ডাক্তার আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার?

সে বললে—ভদ্রমহিলাটিকে দেখে নিন আগে। ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে রয়েছে

ডাক্তার বললেন—সেই ভালো।

চেম্বারে ঢুকে ডাক্তার বললেন—আপনার কি?

মেয়েটি হাসলে। ডাক্তার বিস্মিত হলেন। মেয়েটির হাসির জন্যে নয়। মুখখানা অত্যন্ত পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। মেয়েটির সুন্দর মুখে দুই গালে ঠিক এক জায়গায় দুটি প্রায় সমান আকারের তিল। অত্যন্ত চেনা।

মেয়েটি বললে—রোগী দেখা শেষ করুন। আমার খানিকটা সময় লাগবে।

ডাক্তার সবিস্ময়ে মেয়েটির দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

মেয়েটি বললে—চিনতে পারছেন আমাকে?

—ঠিক মনে হচ্ছে না। আপনি—

—আমি আপনি নয়। আমি তুমি। যান রোগীদের বিদায় করুন।

ডাক্তার অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এলেন।...কে? কে? কে?

—আমার হাতটা দেখুন ডাক্তারবাবু।

চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ডাক্তার তার দিকে চাইলেন—কি তোমার? হাতখানা ধরলেন।...কে? উঁহু। তা কি হয়!

মেয়েটি হেসে বললে—চিনতে পারলেন না আমাকে?

—আপনি—তুমি কে বল তো?

—দেখেই চিনতে যখন পারলেন না, তখন নাম বললে মনে পড়বে?

—মনে হচ্ছে একজনের কথা। কিন্তু সে কেমন করে হবে? সে তো—

মেয়েটি উঠে ডাক্তারকে প্রণাম করে বললে—বুঝতে পারছি আপনি চিনতে পেরেছেন। আমিই সেই।

—নির্মলা? তুমি—?

তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে নির্মলা হেসে বললে—তুমি বাঁচলে কি করে? —সশব্দে সে হেসে উঠল; তারপর বলল—আমি বেঁচেছি, নিউমোথোরাক্স করে বেঁচে উঠেছি। যাদবপুরে চোদ্দ মাস বিছানায় পড়ে ছিলাম। উঠতে দেয় নি। বাঁচার সে এক যন্ত্রণা।—সে আবার হেসে উঠল।

ডাক্তারের মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠল।—বাঃ। ভারি আনন্দ হল তোমাকে দেখে। চমৎকার চেহারা হয়েছে তোমার। আর কোনো কমপ্লেন নেই তোমার?

—আপনি দেখুন।

ডাক্তার সযত্নে পরীক্ষা করে দেখলেন।—নাঃ কিছু না। তবু একটা এক্সরে ফটো নিয়ো।

আঁচলের ভিতর থেকে বড় একখানা খাম বার করে মেয়েটি দিলে। —নিয়েছি, দেখুন। মাথার ঘোমটা ঈষৎ বাড়িয়ে দিয়ে সে হাসতে লাগল।

ফটোখানা দেখতে দেখতে ডাক্তার বললেন—যাদবপুরেই বেড পেয়েছিলে তাহলে?

—হ্যাঁ পেয়েছিলাম।—একটু হেসে সে আবার বললে, ফ্রি বেড নয়, পেয়িং বেড।

—পেয়িং বেড!—ডাক্তার বিস্মিত না হয়ে পারলেন না।—সে তো—

আবার সে ডাক্তারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—সে তো অনেক খরচ!—আবার হাসলে মেয়েটি। আবার বললে—ট্যাক্সি করে এসেছি দেখছেন না? আমার বেশভূষা—গয়না দেখে বুঝতে পারছেন না আমার সে-দিন আর নেই!

ডাক্তার একটু অপ্রতিভের মত বললেন—হ্যাঁ—হ্যাঁ। ভারি আনন্দ হল, ভারি খুশী হয়েছি আমি। কিন্তু—ডাক্তার একটু থামলেন। তার পর আবার বললেন—রমেন তো এখন সেই ফ্যাক্টরীতে চাকরি করছে, তাকে দেখে তো মনে হয় না টাকাকড়ি করেছে যথেষ্ট।

মেয়েটি বললে—ডাক্তারবাবু, লোকে বলে—স্ত্রীলোকের চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য দেবতাতেও বুঝতে পারে না। আমি তো স্ত্রীলোকের চরিত্রে দুর্বোধ্য কিছু দেখি না। স্ত্রীলোকের ভাগ্য বুঝাই কঠিন। পুরুষেরা কাজ করে

তার ফল পায়, আমরা ভাগ্যফলেই পুরুষের হাতে পড়ি। বুঝা কঠিন পুরুষের চরিত্র।

ডাক্তার চুপ করে রইলেন একটু। তারপর বললেন—ভারি খুশী হয়েছি তোমাকে দেখে। আচ্ছা, তাহলে আজ এস। আমার আবার বাইরে কল রয়েছে কতকগুলো।

মেয়েটি বললে—বেশ লোক আপনি। আমার রোগের চিকিৎসার কথা কিছু হল না, আর বলছেন তুমি এস!

—আবার কি রোগ তোমার?

মেয়েটি একখানা কাগজ বার করে ডাক্তারের হাতে দিলে। একটি ক্লিনিকের রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট। রোগিণী নির্মলা দেবী। রক্তে উপদংশ বিষ রয়েছে। পরিমাণ—আট-দশ।

নির্মলা বললে—আমি এখন—।—একটু থামলে। তারপর মৃদু হেসে অকম্পিত স্বরে বললে—আমি এখন—।—একটু থেমে বললে—এখন আমি বেশ্যা ডাক্তারবাবু।

অতর্কিতে অল্প-একটু ধাক্কা খাওয়ার মত একটা অনুভূতি অনুভব না করে ডাক্তার পারলেন না। নির্মলা আপনার বাঁ হাতখানি প্রসারিত করে নিজের চোখের সামনে ধরলে, ডান হাত দিয়ে এ হাতের কনুইয়ের ভিতর দিকে সুগৌর-সুডোল হাতের নীল শিরার উপর হাত বুলিয়ে বললে—ইনজেকশন নিয়ে নিয়ে শিরাগুলো সব বসে গেছে।

ডাক্তার ইনজেকশন দিয়ে থাকেন বাঁ হাতে। অবহেলা করে বা অবলীলাক্রমে দিচ্ছেন এটা প্রমাণ করার জন্য নয়, ওটাই তাঁর অভ্যাস। তবে লোকে মনে করে তাই। ইনজেকশনে এমন নিপুণ হাত খুব কম দেখা যায়। প্রায় চোখের পলকে বললে অত্যুক্তি হয় সামান্যই। ডাক্তার সিরিঞ্জের নিড্‌ল বের করে নিলেন। এক টুকরো বেনজুইন ভিজানো তুলা বসিয়ে দিলেন। হেসে বললেন—ব্যস। একটু বসে থাক।

ডাক্তার বেরিয়ে এলেন।

ভিতর থেকে নির্মলা ডাকলে—ডাক্তারবাবু!

—কি? অসুস্থ বোধ করছ?

—না।

—তবে?—ডাক্তার ভিতরে এলেন।

—আপনার ফি। মেয়েটি দুখানি নোট তুলে দিলে।

একখানি নোট ফেরত দিয়ে ডাক্তার হেসে বললেন—এতেই হবে। এইবার উঠতে পার তুমি। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তোমার।

—থাক।—মেয়েটি উঠে দাঁড়াল।—একটা কথা।

—বল।

—একটু ড্রিঙ্ক করতে পাব?

—ড্রিঙ্ক?—ডাক্তার অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন নির্মলার দিকে মুহূর্তের জন্য। পর মুহূর্তেই নিজেকে সংযত করলেন তিনি, বললেন—না।

—আমার হ্যাবিট হয়ে গেছে। তাছাড়া—সে হেসে বললে—পুরুষ-চরিত্র রহস্যময়—উনি আবার ড্রিঙ্ক না করলে খুশী হন না।

ডাক্তার একটু চুপ করে থেকে বললেন—না। ও এখন বন্ধ রাখতে হবে।

একটি নমস্কার করে নির্মলা বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন নিজের অজ্ঞাতসারেই।

নির্মলা অসঙ্কোচে বললে—আমি—। আমি এখন—। অবলীলাক্রমে বললে—ড্রিঙ্ক করা আমার হ্যাবিট হয়ে গেছে। অসঙ্কোচে—অবলীলাক্রমে। পরক্ষণেই সব ঝেড়ে ফেলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। 'কল' আছে। টি-বি পেশেণ্ট প্রভাকে ক্যালসিয়াম দিতে হবে। ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার পেশেণ্টটাকে কুইনিন। তিনটে টাইফয়েড কেস। একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

মানুষ বিচিত্র। ডাক্তার ভাবছিলেন সেই কথা সন্ধ্যার সময়।

সন্ধ্যাতেও ডাক্তারখানায় রোগী আসে, কিন্তু সংখ্যায় কম; দু-চারজন। ডাক্তার সন্ধ্যাতে কোট-পেণ্টালুন পরেন না। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে চেয়ারে বসে থাকেন; দু-একটা সিগারেট খান, কখনও শখ হলে গড়গড়ায় তামাকও খান। রোগীদের বিদায় করে বই পড়েন। মনোবিজ্ঞানে ডাক্তারের বেশী ঝোঁক। সাইকোলজীর বই বেশী পড়েন। চিকিৎসাতেও সাহায্য হয়। এক বন্ধুর স্ত্রী সম্প্রতি মধ্যে মধ্যে দুরন্ত বেদনা অনুভব করছেন বুকে, বেদনা উঠলেই ডাক্তার তাকে এ্যাকোয়া অর্থাৎ শুধু জল ইনজেকসন দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভদ্রমহিলা সুস্থ হয়ে উঠে বসেন। এক বিন্দু বেদনা থাকে না। ডাক্তারের ধারণা রোগে যারা ক্রমাগত ভোগে, তাদের শতকরা ষাটজনেরও বেশী সংখ্যক লোকের ব্যাধিই মনের ব্যাধি। একটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে এইমাত্র বিদায় হল; ছেলেটি প্রায় রোজ সন্ধ্যায় আসে, গল্প করে চলে যায়। সপ্তাহে একবারও অন্ততঃ

হৃদযন্ত্রটি পরীক্ষা করায় ; ওর ধারণা, ওর হার্টের দুর্বলতা আছে, যে কোনো মুহূর্তে তা থেকে কঠিন বিপদ হতে পারে ; সেইজন্য ভদ্রলোক বিবাহ পর্যন্ত করলেন না। এবং বুঝিয়েও ডাক্তার ওকে বিশ্বাস করাতে পারলেন না। ডাক্তারের কাছে গল্প করতে আসাটা ওর গল্পের আকর্ষণ নয়, আসল ব্যাপার হল ডাক্তারের সান্নিধ্য লাভ করে খানিকটা আশ্বাস লাভ করা। এতেই যেন তার ডাক্তার দেখান হয়ে যায়। লোকটি চলে যেতেই ডাক্তার হাতের বইখানা খুলে বসলেন। শক্তিশালী লেখকের লেখা ভালো বই। সমারসেট মমের ভক্ত তিনি, মমের বই 'রেজারস এজ'। কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তুলে রাস্তার দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইলেন। রাস্তায় লোকজন অবিরাম চলছে—জনস্রোত। এই দিকেই গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার পথ। লোকে ইলিশ মাছ হাতে নিয়ে আসছে ঘাট থেকে। পুণ্যলোভী মেয়েরা অনেকে এই রাত্রেও গঙ্গাস্নান করে আসছে। বোধ হয় কোনো পার্বণ আছে আজ। সেজে-গুজে অনেক মেয়ে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেয়েও ফিরছে। দু-চারটি চতুরা দেহ-ব্যবসায়িনীও সঞ্চরমাণ শিখার মত অনুসারী পতঙ্গ পিছনে নিয়ে আসছে, সামনেই একটা গলি, সেই গলিতে ঢুকে যাচ্ছে। ঢুকবার সময় এদের একটা বিশেষ ভঙ্গিতে পিছনে ফিরে চাওয়ার অভ্যাস আছে। যেন ঝাপটা মেরে চকিতে ফিরে পিছনের দিকে চেয়ে দেখে নেয়। বোধ হয় অনুসরণকারীকেও দেখে নেয় এবং অভয় দিয়ে আহ্বানও জানায়।

মনে পড়ে গেল নির্মলাকে। তার কথাগুলো কানের কাছে বেজে উঠল যেন।—আমি এখন—আমি এখন বেশ্যা ডাক্তারবাবু।

সেই মেয়ে। সুদীর্ঘ আটমাস ধরে তিনি তার চিকিৎসা করেছিলেন, একদিন মাত্র কথা বলেছিল। একদিন মাত্র।

এক একটা কেস ডাক্তারদের অদ্ভুত ভাবে মনে থাকে।

বিচিত্র ধরনের রোগ, বিচিত্র ধরনের রোগী—বিচিত্র ধরনের রোগীর বাড়ি—এগুলো মনে রেখাপাত করাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে তার কোনোটাই এমন কিছু বিচিত্র ছিল না। শুধু রোগিণী—ওই নির্মলা মেয়েটির মধ্যে ছিল শান্ত ভাবের এবং সহনশীলতার মাত্রাতিরিক্ততার—কি বলব ? বৈচিত্র্য, হ্যাঁ বৈচিত্র্য বলাই ভালো। ডাক্তার মধ্যে মধ্যে বিস্মিত হতেন, মনে মনে প্রশংসা করতেন।

বৎসর তিনেক হবে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থা সেটা। ১৯৪১ সাল। মনে আছে ডাক্তারের, তিন বৎসর আগে সকালে এল একজন অল্পবয়সী ভদ্রলোক।

সুদর্শন চেহারার একটি তরুণ, পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের বেশী বয়স হবে না। রোগীর ভিড় রয়েছে। সে টেবিলের ওপাশটা ধরে দাঁড়িয়ে বললে—ডাক্তারবাবু, আপনাকে একবার আমাদের বাড়ি আসতে হবে।

ডাক্তার তার মুখের দিকে তাকালেন—ভদ্রলোকের মুখে-চোখে উদ্বেগের আকুলতা দেখতে পেলেন।

ডাক্তার কিছু বলবার আগেই সে আবার বললে, এখুনি আসতে হবে একবার দয়া করে। খুব আরজেণ্ট।

—কি কেস? আরজেণ্ট বলছেন? কেসটা কি?

—একটি মেয়ের অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। মেয়েটি প্রেগনেণ্ট। ফার্স্ট প্রেগনেন্সি।

—প্রেগনেণ্ট! যন্ত্রণা কোথায় হচ্ছে?

—পেটে।

—আমি জিজ্ঞাসা করছি—যন্ত্রণাটা কি ডেলিভারি—

—না—না—ডাক্তারবাবু। সে সময় নয় এখন, তা ছাড়া সে যন্ত্রণাও নয়।

—তাহলে একটু বসুন। এঁদের কয়েক জনকে দেখে যাব।

জোড়হাত করে সে বললে—না। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। একবার এখুনি আসতে হবে আপনাকে।—চোখ তার ছল ছল করে উঠল।

ডাক্তার আর না বলতে পারলেন না। উঠলেন। সে-ই নিজে নিলে কল-বাক্সটা।

বস্তির মধ্যে দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থের বস্তি। ডাক্তার হাসলেন। বাসিন্দারাই ভদ্র এবং গৃহস্থ। বস্তি কিন্তু বস্তি। খোলার চাল, ছিটেবেড়ার দেওয়াল, সরু স্যাঁতসেঁতে গলি-পথ, মাছি-মশা-দুর্গন্ধ সবই আছে। একখানি ঘর আর সামনে একটু করে বারান্দা নিয়ে এক-একটি সংসার, ময়লা হাফ-প্যাণ্ট-পরা অপরিচ্ছন্ন ছেলের দল, কেউ কাশছে, কেউ কাঁদছে, কেউ মুড়ি খাচ্ছে, সঙ্কীর্ণ লম্বা মেটে উঠানে কাক এসে নেমেছে, একজন শৌখিন ব্যক্তির একটা লোম-ওয়ালা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে কাকগুলোকে দেখে; উঠানের একপাশে ঘেরা-দেওয়া একটা স্নান করবার এবং বাসন মাজবার জায়গা, তার মধ্যে সনাতন পাতকুয়া—কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক রোগের ইনকিউবেটার; এসে জমে ওইখানে—মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ে। ওরা ভোগে, মরে। তবু অদ্ভুত এদের জীবনের সহ্যশক্তি। বৈজ্ঞানিক মতে ওদের মরে যাওয়া উচিত—তবু ওরা বেঁচে আছে ওই সহ্যশক্তির জোরে।

তবু বস্তিটা ওরই মধ্যে ভালো। বারান্দা মেঝে সিমেণ্ট করা, সিমেণ্টের

সঙ্গে লাল রঙ মিশিয়ে বস্তি বাসিন্দাদের যাদের কিছুটা গোপন শৌখিন রুচি আছে—তাদের সেই রুচিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা আছে বস্তির মালিকের। পলকা-হালকা কাঠের সেই সনাতন দরজা, তবু তাতে সবুজ রঙ ধরানো হয়েছিল প্রথমে। জানালাগুলিও আকারে একটু বড়। দেড় ফুট লম্বা মাপে। কতক-গুলোয় শিক, কতকগুলোয় কাঠ দেওয়া, কেউ কেউ জানালায় পর্দা দিয়েছে। এর দরজাতেও একটা পর্দা ঝুলছিল। আরও দুটি অল্পবয়সী ভদ্রলোক বসেছিল।

ভিতরে একখানা তক্তপোষের উপর শুয়েছিল মেয়েটি। সাদা সায়া-ব্লাউজের উপরে একখানি পরিচ্ছন্ন ধুতি ছিল পরনে, হাতে ছিল দুগাছি রুলি, দেখলেই বুঝতে পারা যায় মেয়েটি বিধবা। মুখ ঘোমটায় ঢাকাই ছিল—তবু সে আরও একটু টেনে দিলে ঘোমটা। তার পর স্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল। সে স্তব্ধতা, সে শান্ত সহনশীলতা ডাক্তারের ভারি ভালো লেগেছিল। ধপধপে বিছানায় পরিচ্ছন্ন শুভ্র পরিচ্ছদে আবৃত মেয়েটির যন্ত্রণার মধ্যেও সেই শান্ত সম্বৃত স্তব্ধ অবস্থার কথা আজ স্মরণ করে ডাক্তারের মনে হল সে অবস্থার সঙ্গে রাত্রের নদীর রূপের অনেকটা মিল আছে—তুলনা চলে বোধ হয়। ডাক্তার অনেক দিন রাত্রে এগারটা-বারটার সময় গঙ্গার ধারে বেড়ান। নদীর যে নিজস্ব তরঙ্গক্ষুব্ধ গতিশীল রূপ, দিন-রাত্রির মধ্যে তার সত্যকার কোনো অবস্থান্তর কি রূপান্তর ঘটে না; কিন্তু মানুষের চোখে রাত্রির অস্পষ্টতার মধ্যে তার রূপের পরিবর্তন ঘটে, তখন নদীর তরঙ্গক্ষুব্ধ গতি চোখে দেখা যায় না। মনে হয় শান্ত শুভ্র সুদীর্ঘ জলধারা নিথর হয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে! মধ্যে মধ্যে মৃদু আলোড়নে আবর্ত উঠে এখানে ওখান সেখানে এক-একটা। মেয়েটির অঙ্গ সেদিন মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণার আধিক্যে এক একবার অবাধ্য আক্ষেপে জেগে উঠছিল। কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছিল মেয়েটি। আবার নিজেকে সংযত করে শান্ত স্থির হয়ে শুচ্ছিল।

—কি যন্ত্রণা হচ্ছে আপনার? কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?

মেয়েটি শান্ত হাতখানি রাখলে লিভারের কাছটায়। ডাক্তার দেখলেন। জ্বর একটু হয়েছে। ডাক্তারের মনে হল, পাকস্থলী এবং মলস্থলীর মধ্যে গণ্ডগোল কিছু হয়েছে। প্রশ্ন করলেন—কোষ্ঠ পরিষ্কারের কথা।

মেয়েটি ঘাড় নাড়লে। 'না' বললে এটা বুঝা গেল। ডাক্তার প্রশ্ন করলেন —কদিন পরিষ্কার হয় নি?

ভদ্রলোকটি এবার মেয়েটির মুখের কাছে তার কান নিয়ে গেল। মেয়েটির ঠোঁট দুটি ঈষৎ নড়ল। ভদ্রলোকটি বললে—তিন-চারদিন চলছে।

ডাক্তার বললেন—এ অবস্থায় পারগেটিভ তো চলবে না। ডুস দিতে হবে। ডুস দিন, কমে যাবে বেদনা। আর একটা ওষুধও দেব।

চিন্তিত মুখে ছেলেটি বললে—ডুস দিতে তো জানি না ডাক্তারবাবু।

হেসে ডাক্তার বললেন—কঠিন কিছু নয়, আপনি ডুসটা নিয়ে আসবেন, আমি বুঝিয়ে দেব। আপনি লেখাপড়া জানেন। দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেই পারবেন।

—না ডাক্তারবাবু, এমনিই আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছি। আমি—।—সে আর কিছু বলতে পারলে না।

ডাক্তার বুঝলেন, ভদ্রলোক অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তিনি বললেন—তা হলে আমার কমপাউণ্ডারকে আনতে পারেন; সে দিয়ে দেবে। সে এক্সপার্ট লোক। একটা টাকা দিয়ে দেবেন তাকে।

একটু চুপ করে থেকে সে বললে—মেয়েছেলে, কমপাউণ্ডারবাবু পুরুষ-মানুষ—!

অন্য যারা বসেছিল দাওয়ায় তাদের একজন এবার ভেতরে এসে বললে, একজন নার্স আনলেই তো হয়!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। কাছাকাছি নার্স কোথায় পাওয়া যাবে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার বললেন—আসুন আমি চিঠি দিয়ে দেব একখানা। এই তো বড় রাস্তার চৌমাথাটার উপরেই একটা নার্সদের আড্ডা আছে।

আজ ডাক্তার সে কথা মনে করে একটু হাসলেন। সেদিন কিন্তু হাসেন নাই। মন তাঁর খুশীতে ভরে উঠেছিল। রোগী দেখতে গিয়ে সর্ব প্রথম তাঁর চোখে পড়ে রোগীর পরিবারের মনোভাব। কোথাও দেখা যায় রোগীর প্রতি ঘরের মানুষের নিদারুণ উদাসীনতা; অবহেলিত অবজ্ঞাত রোগী পড়ে থাকে, মাথার গোড়ায় এক গ্লাস জল কোথাও থাকে, কোথাও তাও থাকে না। কোথাও কোথাও এই নিষ্করুণ অবহেলা এমন নিষ্ঠুর ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখেছেন ডাক্তার যে, আজও তা মনে অক্ষয় হয়ে আছে তাঁর; ভাবলেও শিউরে ওঠেন তিনি। চাকরদের ক্ষেত্রে অবশ্য এমন প্রায়ই ঘটে। ডাক্তার সেগুলো ধরেণই না। আত্মীয়-স্বজনেরা আপনার জনের বেলায় এই অবহেলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখায় বিধবা মেয়েদের রোগশয্যায়। আবার দেখা যায় রোগীর জন্য সমগ্র পরিবারের সে কী ব্যাকুলতা! সকল স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য প্রতিটি মানুষ ব্যগ্রতায় সস্নেহ চোখে চেয়ে আছে রোগীর মুখের দিকে। তারা যেন সকল

কষ্ট, সকল উপসর্গ, সকল রোগ আপনাদের হাত দিয়ে, বুক দিয়ে, দৃষ্টি দিয়ে মুছে নিতে চায়। অবশ্য অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের জন্য অনেক ক্ষেত্রে তারা গণ্ডগোল ঘটায়। তবুও এমন ক্ষেত্রে, তাঁর চিকিৎসকের মনও প্রসন্ন হয়ে ওঠে। বর্তমান ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাব থাকলেও এদের সে অভাব-বোধ সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল। ছেলেটির নার্স আনার প্রস্তাবে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন তিনি।

ছেলেটি তার সঙ্গে আসতে আসতে বলেছিল—কিছু কি কঠিন দেখলেন, ডাক্তারবাবু?

—না-না-না। ডুস দিলেই সেরে যাবে, সামান্য ব্যাপার।

গাঢ়কণ্ঠে ছেলেটি বলেছিল—আমি ছাড়া ওর আর কেউ নেই ডাক্তারবাবু। বিধবা মেয়ে, ওই একটা সন্তান হয়ে যদি বাঁচে তবে জীবনে হয়ত সুখী হবে।

একটি মেয়ে হয়েছিল নির্মলার।

ডাক্তারের মুখে বিচিত্র হাসি দেখা দিল।

ডাক্তারবাবু।—

ডাক্তারের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। হাতে যমের বইখানা খোলাই আছে। বইখানা রেখে তিনি একটু নড়ে চড়ে বসলেন। একটি প্রৌঢ়া মেয়ে একটি অবগুণ্ঠনবতী মেয়েকে নিয়ে এসেছে। এবার বস্তির বাসিন্দা। ডাক্তারের জীবনে ডাক্তার যত রোগী দেখলেন তার মধ্যে বস্তি-বাসিন্দাই বোধ হয় শতকরা সত্তর-পঁচাত্তর জন। এদিকটায় একটা প্রকাণ্ড অঞ্চল জুড়ে বস্তি। মেয়েদের নিয়ে যারা আসে, তারা প্রায় রাত্রেই আসে।

—কি?

—একে একবার দেখুন বাবা! বড় ভুগছে। কুচো-কাঁচা ভাঁড় খুরির মত চারটি ছেলেপুলে। এই-এই-এই একটি কোলে। তার ওপরে এই রোগ।

চেম্বারে ঢুকে ডাক্তার টেনে নামালেন ওপরের ঝোলানো জোরালো আলোটা। রক্তহীন পাংশু একখানি কচি মুখ, চোখের পাতায় অপার্থিব অবসন্নতা ঘনিয়ে রয়েছে—মেঘাচ্ছন্ন বর্ষা অপরাহ্ণের মত। ডাক্তার তাঁর ব্যবসায়সুলভ নিরাসক্তির সঙ্গে তাকে দেখতে চেষ্টা করলেন। পরীক্ষার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না, চোখের দৃষ্টিতেই তিনি দেখতে পাচ্ছেন নিষ্ঠুর নিষ্করুণ ক্রূর ক্ষয় রোগ, যক্ষ্মা। দারিদ্র্যের আচ্ছাদন তলে অবরুদ্ধ অন্ধকারে তার বাস। রোগ মাত্রেই নিষ্করুণ। তবু সকল রোগের মধ্যে এই রোগটি ক্রূর এবং নিষ্ঠুর। তিলে তিলে হত্যা করে। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাকে পরীক্ষা

করলেন। চমকে উঠলেন তিনি। রোগের ধরনটা ঠিক নির্মলার মত ড্রাই প্লুরিসি থেকে যক্ষ্মায় পরিণতি লাভ করছে। একটা দিক যেন ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে।

নির্মলার কথা মনে করতে করতে ডাক্তার খানিকটা ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন; নিজের ব্যবসায়সুলভ নিরাসক্তিকে কিছুতেই সজাগ করে তুলতে পারলেন না। চোখে তাঁর জল এসে গেল।

সঙ্গিনী প্রৌঢ়া বললে—ডাক্তারবাবু!

দ্রুত চিন্তার স্রোত বয়ে গেল ডাক্তারের মনের মধ্যে।

দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের বধূ; চারটি সন্তানের জননী। বাঁচতে হয়ত পারে নিউমোথোরাকস করলে। নির্মলা বেঁচেছে। আজকের. দু বৎসর, সওয়া দু বৎসর আগে যেদিন তিনি শেষবার নির্মলাকে দেখেছিলেন, এর অবস্থা প্রায় তেমনি, হয়ত কিছু ভালো। নির্মলা বেঁচেছে। এও বাঁচতে পারে সে চিকিৎসায়।

আজ সকালবেলায় নির্মলার মুখ মনে পড়ল—সজীব লাবণ্যে ঝলমল করছে। এক্সরের ফটোটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

ডাক্তার শিউরে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে।

কানের পাশে বেজে উঠল—আমি—। আমি এখন—। আবার বেজে উঠল—ড্রিঙ্ক—একটু—ওটা আমার হ্যাবিট হয়ে গিয়েছে।

প্রৌঢ়া মেয়েটি আবার বললে—ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার বেরিয়ে এসে বললেন—এ আমার অসাধ্য বাপু। যক্ষ্মা!

মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে বললে—সে বুঝেছি ডাক্তারবাবু। কিন্তু কোনো উপায়—

ডাক্তার বললেন—হাসপাতালে অনেক—অনেক খরচ। উপায় আমার জানা নেই বাপু!

ঠিক নির্মলার মত রোগের ধরনটা। অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। প্রথম দিন ধরতে পারেন নি ডাক্তার। মেয়েটিও যন্ত্রণার সঠিক স্থান নির্দেশ করতে পারে নাই।—রাত্রেই আবার সেই ছেলেটি এল। অপরিসীম উদ্বেগ ছিল তার মুখে। ডাক্তারবাবু।

—কি? ও, আপনার বাড়িতেই তো সকালে গিয়েছিলেম আজ। ড্রুস দেওয়া হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু যন্ত্রণা তো কমল না ডাক্তারবাবু।

—কমে নি? সে কি?—ডাক্তার একটু চিন্তিত হলেন।

—একবার চলুন আপনি। যন্ত্রণাটা উপর দিকে উঠছে, বলছে।

কেরোসিন তখনও এমন দুষ্প্রাপ্য হয় নাই। একটি বেশ শৌখিন উজ্জ্বল আলোই জ্বলছিল। দিনের আলো সত্য রূপ ধরিয়ে দেয়, রাত্রে যত উজ্জ্বল আলোই হোক, সে যেন রূপের উপর একটা উজ্জ্বল সূক্ষ্ম আস্তরণ টেনে দিয়ে তাকে বেশী সুন্দর করে দেখায়। রাত্রের নদীর উপর জ্যোৎস্না এবং পাতলা কুয়াশা পড়েছিল বলে মনে হয়। তেমনি ধপধপে পরিচ্ছন্ন মহিমায় আবৃত হয়ে তেমনি নিথর ভাবেই পড়েছিল। এখন সে দেখালে ব্যথাটা বগলের প্রায় নিচেই। জ্বর বেশ একটু হয়েছে।

ডাক্তার ধীর ভাবে পরীক্ষা করলেন, অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। প্লুরিসি ধরা পড়ল এবার।

—ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার বললেন—প্লুরিসি হয়েছে। ভালো চিকিৎসার প্রয়োজন। ক্যালসিয়াম ইনজেকশন দিতে হবে। ভালো খাদ্যের প্রয়োজন।

—যা দরকার হয়, করুন আপনি। বলুন কি পথ্য দিতে হবে। আজ থেকেই আরম্ভ করুন ইনজেকশন।

প্রায় সমারোহ করেই চিকিৎসা শুরু হল।

ডাক্তার যেতেন। মাথার গোড়ায় টেবিলে দেখতেন ফল সাজানো রয়েছে। দামী পেটেণ্ট ওষুধ। মেয়েটি স্তব্ধভাবে শুয়ে থাকত। মুখের খানিকটা দেখা যেত। একটা তিল কালো রঙের ফুলের মত ফুটে থাকত গালের উপর। দীর্ঘকাল ধরে ডাক্তারের ধারণা ছিল—গালে তিল ওর একটা। নীরবে হাতখানি বাড়িয়ে দিত। ডাক্তার রবারের নলটা টেনে বাঁধতেন বাহুর উপর। ইনজেকশন দিতেন। এতটুকু স্পন্দন কি চাঞ্চল্য দেখা যেত না।

উপকারও হল। জ্বর একেবারে কমে গেল। ব্যথাটাও আর অনুভব করত না। একদিন ছেলেটি বললে—আর কতদিন লাগবে ডাক্তারবাবু?

—চিকিৎসাটা এখন চালাতে হবে অন্ততঃ প্রসবের আগে পর্যন্ত।

ছেলেটি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

ডাক্তার বললেন—এটা একটা ট্রেচারাস ব্যাধি। বিশেষ করে—

বাধা দিয়ে ছেলেটি বললে—দেখতে তো সেরে গিয়েছে বলেই মনে হয়।

—হ্যাঁ। কিন্তু ক্যালসিয়াম ইনজেকশনের এখনও দরকার আছে।

তারপর, ইনজেকশন দিয়েছিলেন মনে হচ্ছে।
এর পর আর দিন বলেছিল—ডেলিভারীর সময় তো
এগিয়ে এসেছে হাসপাতালে হওয়াই ভালো, কি
বলেন ? আর আমি কাজে যাই।
ডাক্তার আমি বরং হাসপাতালে একখানা
চিঠি লিখে দোব
ছেলেটির সে ল চোখের দৃষ্টিতে—আজ দেবেন ?
সময়ে নিয়ে রাখ
—আসুন।
চিঠি নিয়ে া খবর ডাক্তার পান নাই।
ইনজেকশন দেবার ক্ষা করেছিলেন। প্লুরিসির পিছনে
ক্ষয়রোগের কঙ্কাল মেয়েটির দিকে প্রসারিত হয়ে
আসছিল—তাকে বাধা করেছিলেন! তিনি স্পষ্ট চোখে
দেখতে পেতেন— করে সরিয়ে নিচ্ছে সে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ের আনন্দ অনুভব করেন তিনি এমন ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়, যাকে উপলক্ষ করে এ দ্বন্দ্ব বাধে এমন জয়ের ক্ষেত্রে সেই শরণাগত জনটিকে বড় ভালো লাগে। সকল ডাক্তারেরই লাগে। যে রোগীকে বাঁচায় তাকে যেন মনে হয় পরম স্নেহাস্পদ, পরম প্রিয়জন। এ মেয়েটিকে আরও ভালো লাগত। শুভ্র পরিচ্ছদ-মহিমায় স্নিগ্ধ সহনশীল মেয়েটি জ্যোৎস্না রাত্রের নিথর নদীর মত নীরব শান্ত; ক্রূর ক্রোধী ক্ষয়ের শোষণ-গণ্ডুষ থেকে তিনিই রক্ষা করেছেন। ক্ষয়ের শোষণ-গণ্ডুষ শিথিল হয়ে গিয়েছে, সে বয়ে চলেছে নিরুদ্বেগে কোমল মৃত্তিকার বুক বেয়ে।

কয়েক দিনই মনে হয়েছিল তার কথা। একবার ভেবেছিলেন খোঁজ করবেন। কিন্তু কর্মব্যস্ত জীবন। অভিশপ্ত পরাধীন দেশের রোগজর্জরিত মানুষের মধ্যে এ অবকাশ ঘটে নাই তাঁর। ডাক্তারের একটা কথা মনে পড়ে লজ্জা হল। যেদিন তিনি খোঁজ করবেন ঠিক করেছিলেন, সে দিন প্রায় সেই সময়েই এসেছিল ইনসিওরেন্স কোম্পানির এজেণ্ট; চারটে কেস নিয়ে এসেছিল। অর্থলোলুপতা ঠিক নয়; অর্থের প্রয়োজন হয়। ইনসিওরেন্স কোম্পানির ডাক্তার তিনি। খোঁজ করা হয়ে ওঠে নি।

ক্রমে ক্রমে ভুলেই গিয়েছিলেন প্রায়। অনুরূপ দুঃখীর রোগক্লিষ্ট জীবনের সঙ্গে নিত্য পরিচয় হয়ে চলেছে। প্রত্যেকের দুঃখ দেখে মনে হয়, এর চেয়ে দুঃখ আর কারও বেশী নয়। নিরাসক্তির বর্মের মধ্যে হৃদয়কে ঢেকে চলেন ডাক্তার।

মাস দুয়েক পর—হঠাৎ একদিন এল সেই অল্পবয়সী ভদ্রলোক। ঠিক প্রথম দিনের মত টেবিলের ওপাশ ধরে দাঁড়াল। মনে হল তেমনি উদ্বেগে কাতর। ডাক্তার তাকে দেখবামাত্র চিনলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনের চোখে ভেসে উঠল—ধপধপে বিছানায় শুয়ে আছে পরিচ্ছন্ন শুভ্র পরিচ্ছদ-পরিহিত একটি শান্ত স্তব্ধ মেয়ে। ডাক্তার প্রশ্ন করলেন—কি খবর মশাই?

—একবার যেতে হবে ডাক্তারবাবু।

—কেন? মেয়েটি আছে কেমন?

—ভালো নেই। দিন বিশেক হল ডেলিভারী হয়েছে। আবার সেই কমপ্লেন। এবার জরও বেশি, ব্যথাও বেশি।

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। কারণ, কার্য, ফল—সবই তিনি বুঝতে পারলেন। বললেন—দিন বিশেক ডেলিভারী হয়েছে? তা ডেলিভারীর আগে হঠাৎ চিকিৎসাটা বন্ধ করলেন কেন?

মাথা নিচু করে ছেলেটি টেবিলের কোণটা নখ দিয়ে খুঁটতে আরম্ভ করলে। একটু পরে বললে—বেশ সেরে উঠল। দুটো তিনটে ইনজেকশনের দিন চলে গেল—দেখলাম ভালোই রয়েছে। ভাবলাম সেরে গেছে।—কথাটার মধ্যে অসমাপ্তির রেশ রয়ে গেল, সে চুপ করে গেল। অপরাধ স্বীকারের এটা একটা ভঙ্গি।

ডাক্তার বললেন—বড় অন্যায় করেছেন। আমি তো বলেছিলাম আপনাদের। বার বার করে বলেছিলাম।—একটু চুপ করে থেকে বললেন—আপনার আগ্রহ দেখে আমি খুব আশা করেছিলাম।

ছেলেটি এবার উপরের দিকে মুখ তুলে উপরের দিকে চেয়ে রইল।

ডাক্তার বললেন—চলুন দেখি।

দেখলেন ডাক্তার।

সেই মেয়ে—সেই ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। কোলের কাছে একটি শিশু-কন্যা। শীর্ণ কঙ্কালসার শিশু; মরণোন্মুখ গাছের ফুলের মত! ডাক্তার এবার দেখলেন—পারিপার্শ্বিকও পাল্টে গিয়েছে। চারিদিক মালিন্যে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। বিছানা ময়লা, মেয়েটির কাপড় জীর্ণ, ঘরে একটা গন্ধ হয়েছে।

মেয়েটির জ্বর অনেকটা। বুকের ভিতরটাও জীর্ণ হয়েছে।

ডাক্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একটা ইনজেকশনও দিলেন। তারপর বললেন—চলুন। একটা খাবার ওষুধও নিয়ে আসবেন।—ঘর থেকে বার হবার সময় একবার ফিরে চেয়ে দেখলেন। পারিপার্শ্বিক পাল্টেছে—মেয়েটিও যেন ঈষৎ পাল্টেছে। আরও শান্ত হয়ে গিয়েছে মেয়েটি। রাত্রের নদীতে মধ্যে

মধ্যে যে একটা-দুটো আবর্তের আভাস পাওয়া যায়, তেমনি ভাবে এক-আধবারও মেয়েটির দেহে যন্ত্রণার আক্ষেপ আগে দেখা যেত। এখন আর তাও দেখা যায় না।

ছেলেটির নাম ডাক্তার সেইদিন জেনেছিলেন। ছেলেটির নাম রমেন। কায়স্থ। ছেলেটি হঠাৎ পথে ডাক্তারকে বললে—ডাক্তারবাবু আমি যে বড় বিপদে পড়লাম।

—হ্যাঁ, বিপদ বৈ কি!

একটু চুপ করে থেকে সে অকস্মাৎ বললে—মেয়েটি আমার সত্যিকারের কেউ নয় ডাক্তারবাবু।

চমকে উঠলেন ডাক্তার।—কেউ নয়?

—না।

বস্তি অঞ্চলের পথ। সেই পথে চলতে চলতে সে বললে—ডাক্তার শুনে গেলেন।—একটি ভুলের জন্য আমার এই বিপদ। ও আমার কেউ নয়।

মেয়েটি পনের-ষোল বৎসর বয়সে বিধবা হয়েছিল। ছেলেটির বাপ তাকে দেশ থেকে এনেছিলেন রুগ্না স্ত্রীর সাহায্য করতে। ছেলেটির বাপ মধ্যবিত্ত অবস্থার চাকুরে। ছেলেটি চাকরি করে ফ্যাক্টরীতে, নাম রমেন। সে বিবাহ করে নি। বাড়িতে রুগ্না মা ছাড়া আর কোনো মেয়েছেলে নাই। ওই মেয়েটিই ছিল তাদের সংসারের সব। বড় ভালো মেয়ে। শান্ত-স্বভাবা, মিষ্ট কথা, স্নিগ্ধ দৃষ্টি। বড় ভালো লেগেছিল রমেনের।

তারপর—। রমেন চুপ করলে। ডাক্তার কোনো প্রশ্ন করলেন না। রাস্তাটা ছিল প্রায় জনহীন, দু-একজন লোক যারা চলছিল—তাদের খালি পা, ডাক্তার এবং রমেনের জুতোর শব্দ বেজে বেজে চলছিল।

একটু পর রমেন বললে—তারপর যা হবার হল। মেয়েটি সন্তানসম্ভবা হল। উপায়ান্তর না পেয়ে ওকে লুকিয়ে এনে এখানে রাখলাম। আমি অবশ্য বাড়িতে রইলাম—এখনও আছি। বাড়িতে জানলে—ও-ই কোথায় চলে গেছে। আমি ওকে এখানে রাখলাম, সন্ধ্যেয় আসতাম, দশটায়-এগারটায় বাড়ি যেতাম। ইচ্ছে ছিল—যখন আমা হতেই ওর এই অবস্থা, তখন আজীবন ওকে রাখব আমি। সন্তান হলে তাকেও প্রতিপালন করব। না-হয় বিয়ে-থাওয়া করব না আমি।

আবার সে চুপ করলে। আবার শুধু বাজতে লাগল জুতোর শব্দ। কিছুক্ষণ পর রমেন পুনরায় আরম্ভ করলে—কিন্তু এতটা ভাবতে পারি নি।—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—ওভার টাইম খেটেও আর পারছি না।

ডাক্তারখানায় এসে পড়েছিলেন। উজ্জ্বল আলোয় ডাক্তার দেখলেন, রমেনের চোয়াল দুটো উঁচু হয়ে উঠেছে। পরগাছা চড়ালে কাঁচা গাছ যেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়, তেমনি অবস্থা হয়েছে রমেনের।

এর পর সচরাচর যা হয়ে থাকে তাই।

রমেনের ক্লান্তি ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল। ডাক্তার বললেন, ফিস লাগবে না আপনার। করবারও বিশেষ কিছু নাই। দু-একটা গোল্ড ইনজেকশন দিয়ে দেখব। অনেক সময় এতে উপকার হয়।

কিছুই হল না তাতে। রোগ অব্যাহত গতিতে ছুটতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা—শান্ত সহনশীল মেয়েটির সহনশীলতা তবুও ভাঙল না।

রমেন যেন ক্রমশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। ডাক্তারও পীড়া বোধ করলেন। সেদিন এসে সে বললে—ডাক্তারবাবু, একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে।

চমকে উঠলেন ডাক্তার।

রমেন বললে—মেয়েটা তো মরবেই। বোধ হয় আজ রাত্রেই মরবে। সে রাত্রে আপনাকে কোথায় পাব?

মেয়েটা—অবশ্য নির্মলা নয়, শিশু-কন্যাটি। শিশুটাও শুকিয়ে আসছিল—তার উপর হয়েছিল জ্বর। বাঁচবে না এ কথা ডাক্তারই বলে এসেছেন। কিন্তু তবু তিনি চমকে উঠলেন। বিরক্ত হয়ে উঠলেন। শঙ্কিত হলেন। সন্দিগ্ধও হলেন। রমেনের চোখে মরিয়া মানুষের দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। তিনি রূঢ়স্বরে বললেন—না।

মেয়েটা মরল দুদিন পরে। দিনেই মরেছিল।

তারপর একদিন রমেন এল—তার নিজের ব্যাধি হয়েছে। যৌন ব্যাধি। নিজে ইনজেকশন নিয়ে বলে গেল—আমি তো কাজে যাব ডাক্তারবাবু। আপনি যদি দয়া করে দেখে আসেন; দুদিন থেকে আরও বেড়েছে। ছটফট করছে যেন।

ডাক্তার গেলেন।

মেয়েটি আজ কথা কইল। কিন্তু কন্যাটি যেদিন মরেছিল—সেদিনও ডাক্তার গিয়েছিলেন। মেয়েটি তেমনি ভাবে পড়েছিল। নিথর নিস্তব্ধ। মজা নদীর মত অবস্থা হয়েছে যেন তার। মালিন্যে সর্বাঙ্গ মলিন, মজা নদীর পঙ্কিল জলের মত। জীর্ণ-শীর্ণ-স্তব্ধস্রোতা শুকিয়ে আসছে।

হঠাৎ মেয়েটি উঠল। ডাক্তার শঙ্কিত হয়ে বললেন—উঠ না, উঠ না। শুনলে না। ডাক্তারের পা দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললে—ডাক্তারবাবু,

কেন আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন? আমার বেঁচে কি লাভ? আমারই লাভ, না সংসারের কোনো লাভ? বুঝতে পারছেন না ওই লোকটা কত কষ্ট পাচ্ছে? তার চেয়ে এমন কোনো ইনজেকশন থাকে তো আমায় দিন—যাতে আমি দু-একদিনে আস্তে আস্তে মরে যাই!

ডাক্তার বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। তবু তিনি আত্মসম্বরণ করে বললেন —একথা আমাকে অন্যায় বলছ তুমি। আমি ডাক্তার। রোগীকে বাঁচানো আমার ধর্ম। মারতে তো আমি পারি না। না—না, সে আমি পারি না।

তবু মেয়েটি পা ছাড়ে না।

ডাক্তার বহু কষ্টে মুক্ত করলেন নিজেকে। মেয়েটি বললে—লোকটা কি হয়ে গেছে দেখছেন না? ও বড় ভালো ছেলে ছিল ডাক্তারবাবু! আমিই ওর কাল হয়েছিলাম। একটু চুপ করে থেকে বিচিত্র হাসি হেসে বললে—বিয়ে করলে না আমার জন্যে। আমার এই অবস্থা। খারাপ ব্যারাম ধরিয়েছে—

ডাক্তার বেরিয়ে চলে এলেন।

সে বারের মত তিনি সেই দেখেছিলেন নির্মলাকে। মুখে না বললেও মনে মনে বলেছিলেন—আর বেশী দুঃখ তোমায় পেতে হবে না। আর বড় জোর দু-তিনটে মাস। হয়ত তারও কম।

তার পর—আর কেউ ডাকতে আসে নাই। খবর দেয় নাই। রমেনও আসে নাই। তিনি জানতেন মজা নদী শুকিয়ে গিয়েছে।

সেই মেয়ে হঠাৎ ফিরে এল। এসে সে বললে—আমি—। ডাক্তার শিউরে উঠলেন।

কদিন পর। ইনজেকশন নেবার নির্দিষ্ট দিনে এল না নির্মলা। ডাক্তার তাকে প্রত্যাশা করেছিলেন। না আসায় ক্ষুব্ধ হলেন। রাত্রে বসে বই হাতে সেদিনের মত ওই মেয়েটার কথাই ভাবছিলেন। মোটর এসে দাঁড়াল। ডাক্তার টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখলেন রাস্তার দিকে তাকিয়ে—নির্মলা নামছে। আজ গাড়িখানা 'প্রাইভেট কার'—ঘরের গাড়ি।

নিপুণ প্রসাধন-মার্জিত রূপে লাবণ্যে বেশভূষায় ঝলমল করে সপ্রতিভ হাসি মুখে এসে দাঁড়াল সে—উজ্জ্বল আলোর সামনে।—সকালবেলায় আসতে পারি নি। উনি আজ শিলং গেলেন—আমাকে জবরদস্তি—তোমাকেও যেতে হবে। বেলা দেড়টা পর্যন্ত। তার পর খালাস।

ডাক্তার বললেন—কিন্তু রাত্রে এলে কেন? খালি পেট ভিন্ন তো ইনজেকশন দেব না।

সে বসে পড়ল—সেই ঘরেই একটা চেয়ারে—তাই তো!

—কাল সকালেই এস—কিছু না খেয়ে আসবে। তারপর হেসে তিনি বললেন—তুমি তো জান এ কথা। অন্তত সেদিন তুমি তাই বলেছিলে।

নির্মলা বললে—ওঁর কাছে শুনেছিলাম। এ রোগে ইনজেকশন আমার তো এই প্রথম।

ডাক্তার হঠাৎ অন্যায় প্রশ্ন করে বসলেন। প্রশ্নটা করে ফেলে তাঁর মনে হল অন্যায় হয়ে গেল। বললেন—তুমি তো ইনজেকশন নিচ্ছ; কিন্তু তিনি ইনজেকশন নিচ্ছেন তো?—সঙ্গে সঙ্গে অন্যায় বোধ জেগে উঠল। বললেন—প্রশ্নটা আমি অন্যায় করলাম। কিছু মনে কর না।

হাসলে নির্মলা। বললে—আমার কাছে আপনার অন্যায় হয় নি।

ডাক্তার চুপ করে রইলেন। মেয়েটির কৃতজ্ঞতা-বোধ তাঁকে তৃপ্তি দিলে।

নির্মলাই একটু পরে হেসে বললে—তাঁর অবশ্য অনেকবারই এ রোগ হয়েছে। তবে এবার তিনি ভালোই আছেন।

ডাক্তার অস্বস্তি বোধ করলেন এবার। কথা কোন পথে চলেছে? কিন্তু সেই নির্মলা এত নির্লজ্জ হয়েছে যে, সে কি বলছে বুঝতে পারছে না।

নির্মলা বললে—কণ্ট্রাক্টার মানুষ, যুদ্ধের বাজার, দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান। মধ্যে মধ্যে আমাকেও লগেজের সামিল করে নেন। গিয়েছিলেন আসাম। সেখানে—। কথাটা অসমাপ্ত রেখে সে বললে—ডাক্তারবাবু, লোকটি শিক্ষিত লোক, অনেক শিখিয়েছে আমাকে, অনেক জানে, কিন্তু দুর্দান্ত মাতাল। সেদিন বলেছি তো আমাকে সুদ্ধ মদ খেতে শিখিয়েছে। আমি না খেলে সে রাগ করে। মদ খেলে আর তার জ্ঞান থাকে না। সেখানে—। একটু হাসলে—তারপর বললে—সেখানে মদ খেয়ে সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে এল দুজন বিদেশী। এসে আবার মদ খেলে—আমাকে খাওয়ালে। তারপর মদের নেশার উদারতায় আমাকে সেই দুজনকে উপহার দিয়ে দিলে রাত্রির মত। কয়েক দিন পর হঠাৎ ব্যাধি দেখা দিলে। বললাম, শুনে হাসলে। বললে—ও কিছু না। ইনজেকশন নিয়ে নাও।

ডাক্তারের ললাটে কুঞ্চন-রেখা ফুটে উঠল। কয়েক মুহূর্ত পরে মসৃণ হয়ে গেল আবার। মৃদু হেসে ডাক্তার বললেন—অদ্ভুত তো!

—অদ্ভুত। ডাক্তারবাবু, প্রথম দিন যেদিন তাকে দেখলাম—। নির্মলা

আজও শিউরে উঠল। বললে—সেই দিন রাত্রে, যে দিন আপনার পায়ে ধরে কেঁদেছিলাম, সেই দিনই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম আস্তে আস্তে, রমেন রাত্রেও আসে নি। বেরিয়ে পড়লাম মরব বলে। কোথায় যাব? গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হল না। ভয়ও হল। অনেক ভেবে ঠিক করেছিলাম—রাত্রি একটু বেশী হলে—গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব। মরণও হবে—আর গঙ্গায় মরব। অনেক পাপ করেছি। মরবার সময় কষ্ট যাই হোক—ঠাণ্ডা জলে শরীরের জ্বালাটাও অনেকটা জুড়োবে।—নির্মলা থামল। চোখের দৃষ্টি তার শূন্যতায় যেন স্বপ্ন দেখছে।

—উঃ সে কি রাত্রি! আর গঙ্গার তীরের সে কি জায়গা! থম-থম করছে রাত্রি।

কেউ কোথাও নাই, মধ্যে মধ্যে গঙ্গার জল কল-কল করে ঘুলিয়ে উঠছে, পাক খাচ্ছে। মরতে এসে তীরে দাঁড়িয়ে ভয় হল। সে কি ভয়, সর্বাঙ্গ থর-থর করে কেঁপে উঠল। বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর মনে হল আমার হাত-পা সব যেন অসাড় হয়ে আসছে, হয়ত গড়াতে গড়াতে কখন গঙ্গার জলে গিয়ে পড়ব।

তারপর দুরন্ত ভয়ে সে ফিরে আসতে চাইলে। উঠে দাঁড়াতে পারলে না, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করলে। পোর্ট রেলওয়ে লাইনে আঘাত খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত পড়েই রইল, তার পর মনে হল যদি রেলগাড়ি আসে, তাকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে যাবে! সে আবার উঠল। তার সর্বশরীর কাঁপছে, সে বুঝতে পারলে তার চামড়ার নিচে স্নায়ু-শিরাগুলো থর-থর করে স্পন্দিত হচ্ছে দুরন্ত ভয়ে। প্রাণপণ চেষ্টায় হামাগুড়ি দিয়েই সে রেল-লাইন পার হয়ে চিৎপুর রাস্তায় এসে পড়ল। একটু বিশ্রাম করে রাস্তা এবং পোর্ট রেলের সীমানার মধ্যে যে রেলিং দেওয়া আছে তাই ধরে উঠে দাঁড়াল। ভাবছিল—মরতে হয় রোগেই মরবে সে তিলে তিলে। এমন ভাবে মরতে সে পারবে না। তারপর মনে হল বাড়ি ফেরার কথা। কেমন করে সে বাড়ি ফিরবে? এই জনহীন কলকাতার পথ। রাস্তার বড় বড় বাড়িগুলো এই নির্জন নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে মনে হল তার। আবার মনে হল বাড়িতেও সদর দরজা বন্ধ এখন, ভিতর থেকে তালা পড়েছে। সে যেন এবার রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে এলিয়ে পড়ল। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করলে তার অজ্ঞাতসারেই।

একটা মোটর চলে গেল। খানিকটা গিয়েই থামল সেখানে। পিছিয়ে

এল—এসে থামল তার পাশে। মোটর থেকে নামল একজন ফুলপ্যাণ্ট হাফসার্ট পরা লোক। টর্চের আলো তার মুখের ওপর ফেললে। নির্মলার চোখ বন্ধ হয়ে গেল আপনি; কিন্তু মদের গন্ধ পেল সে; সঙ্গে সঙ্গে কানে এল জড়িত কণ্ঠস্বরের কথা।—হুঁ? বেশ তো! সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরে একটু ঝাঁকি দিয়ে বললে, কে রে তুই?—আবার বললে—কেয়াবাৎ রে! তুই গালে দুটো তিল! আঁকা নয় তো! নির্মলা অনুভব করলে—গালে আঙুল দিয়ে ঘষলে সে। তার পর কানে এল,—না, আঁকা নয় তো।—কে রে তুই? কে তুই? এখানে এত রাত্রে? থাকিস কোথায়?

অনেক কষ্টে নির্মলা বললে—আমি মরব বলে—

হেসে উঠল লোকটা। সেই জন্যই কথা শেষ হল না তার। তারপর সে তাকে টেনে নিয়ে বললে—আয়।

একটু বাধা যতটুকু শক্তি তার ছিল—দিয়েছিল সে। লোকটি ধমক দিয়ে বললে—এ্যাও। ধমক দিয়ে টেনে ঠেলে তুলে দিলে গাড়িতে। গাড়িটা আবার ফেরালে। খালের পোল পার হয়ে গাড়িটা ছুটল। তাকে এনে তুললে একটা বাগান-বাড়িতে। সাজানো ঘর। একটা সোফার উপর ফেলে দিলে। ঘরের সব কটা আলো জেলে দিলে। নির্মলা ঘোমটা টেনে দিয়েছিল, সেটা টেনে খুলে ফেললে। কিছুক্ষণ দেখলে। ঘরের আলমারিতেই মদ ছিল—বার করলে, নিজে খেলে। নির্মলাকে বললে—খাবি?

নির্মলা কেঁদে উঠল। সে হাসলে। তার পর—। সেই দিনের আলোর মত আলোর মধ্যেই—।

শিউরে উঠল নির্মলা। তার পর আবার হাসলে। বললে—মদ খেলে জানোয়ার ছাড়া আর কিছু নয় সে। পশু!

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ডাক্তার।

নির্মলা বললে—ওটা তার বাগান-বাড়ি। প্রচুর টাকা করেছে। সেদিন আমাকে দশটাকার একখানা নোট দিয়ে বাগান থেকে বার করে দিলে। আমার তখন নিরুপায় অবস্থা। কি করব? কেমন করে ফিরব? কোন মুখেই বা ফিরব? শরীরেও তখন অসহ্য যন্ত্রণা। নির্মলা থেমে একটু হাসলে; বললে—যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারি; কিন্তু হাঁটবার ক্ষমতা তো চাই। বাগানের মালীটাকেই দশ টাকার দুটো টাকা ভাগ দিয়ে বললাম—দুটাকা তুমি নাও, বাকী টাকা থেকে আমাকে হোটেল থেকে একমুঠো ভাত এনে দাও। আর আমাকে একটু আশ্রয় দিতে হবে, আমার জ্বর, একটু সুস্থ হলেই চলে

যাব। চলে আসতে পারি নি। রাত্রে সে আবার এল—আমি শুয়েছিলাম মালীর ঘরের বারান্দায়। হঠাৎ টর্চের আলো এসে পড়ল। সে এসে দাঁড়াল। মদের গন্ধ পেলাম। তার পর—।

হাসতে লাগল নির্মলা। বললে—মদ খেলেই সে জানোয়ার। বাঘে শুনেছি শিকারের মাংস পচিয়ে খায়।

একটু থেমে বললে—পরের দিন আর তাড়িয়ে দিলে না। সকালে বসে বসে শুনলে আমার কথা। তার পর ডাক্তার ডাকলে। আমি বলেছিলাম আপনার কথা। সে ঠোঁট বেঁকালে! তার পর ডাকলে একজন বড় ডাক্তারকে—টি-বি স্পেশালিস্টকে। ডাক্তার বললে—হাসপাতালে দিয়ে নিউমোথোরাক্স করে দেখতে পারেন। সেরে যেতে পারে, একটা লাংস ঠিক আছে এখনও। চৌদ্দ মাস রইলাম হাসপাতালে। সে কি সমারোহ ডাক্তারবাবু! তার পর এনে রেখেছে একটা খুব ভালো ফ্ল্যাট ভাড়া করে। কিন্তু এখনও সেই বাগান-বাড়ি আছে। সেখানে হৈ হৈ করতে যায় মধ্যে মধ্যে—মদ খেয়ে অনেক সময় আমাকে ভালো লাগে না। তখন খোঁজে কুৎসিত মেয়ে, দরিদ্র মেয়ে, রুগ্ন মেয়ে।

ডাক্তার শিউরে উঠলেন ; বললেন—বল কি ?

হেসে নির্মলা বললে—দেখুন না মাথার দিকে চেয়ে। চুলে তেল দেবার হুকুম নেই। চকচকে চুল তার ভালো লাগে না। বলে কি জানেন ? বলে—ভালো লাগা আর নেশা লাগা দুটো পৃথক জিনিস। চকচকে চুল ভালো লাগে—কিন্তু নেশা লাগে না। এই সে আজ গেল—কাল চুলে তেল মাখব। মদ খেলে চকচকে চুল দেখলে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

ডাক্তার হাসলেন। সে হাসি যে কিসের, এবং কেন যে হাসলেন তা তিনিও বুঝলেন না।

নির্মলা বললে—করুণা হচ্ছে আপনার ?

—তোমাকে স্নেহ করি, করুণা একটু হয় বৈকি।

—না, ডাক্তারবাবু। আর একটা দিক আছে তার। সে আমাকে পড়ার সাহায্য করে, একজন মাস্টার রেখে দিয়েছে। গান শেখাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ভালো যখন থাকে তখন আমার গালের তিল দুটো নিয়ে খেলা করে, নাড়ে। বলে—একটা তিলের জন্যে কবি বোখারা সমরখন্দ বিকিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমি দুটো তিল পেয়েছি।

ডাক্তার বললেন—এইবার খুশী হলাম। তুমি তাহলে তাকে ভালোবেসেছ ?

চুপ করে রইল নির্মলা।

—কি, উত্তর দিচ্ছ না যে?

নির্মলা বললে—ভালো লাগা আর ভালোবাসা-বোধ আলাদা জিনিস ডাক্তারবাবু। ভালো লাগে কিন্তু।—একটু চুপ করে থেকে বললে—জানি না ঠিক। আবার একটু চুপ করে থেকে বললে—সময় সময় সব তেতো মনে হয়। সব। সব। আবার মনে হয়—বেশ আছি। খুব ভালো আছি। এর চেয়ে ভালো আর কজন থাকে! অনেকের বউয়ের স্বামীও তো মদ খায়, চরিত্রহীন হয়।

মনস্তত্ত্ব-বাতিকগ্রস্ত ডাক্তার উৎসুক উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরও নেশা লেগেছে। একটু ঝুঁকে টেবিলের উপর কনুই রেখে বললেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—বলুন!—হেসেই উত্তর দিলে নির্মলা।

—রমেনকে,—রমেনের কথা মনে হয় এখনও? তাকে—

নির্মলা ডাক্তারের মুখের কথাটা নিয়েই বললে—তাকে ভালোবাসি কি না জিজ্ঞাসা করছেন?—ঠোঁটে তার মৃদু হাসি ফুটে উঠল, বললে—হ্যাঁ বললে খুশী হন বোধ হয়!

ডাক্তার হেসে বললেন—কেন?

নির্মলা যা জবাব দিলে—সে শুনে ডাক্তার অবাক হয়ে গেলেন। সে খিল-খিল করে হেসে বললে—মেয়েদের একনিষ্ঠতায় পুরুষরা সান্ত্বনা পায় ডাক্তার-বাবু! মনে হয় আমাকে ভালোবাসলে একনিষ্ঠ হয়েই ভালোবাসবে।

ডাক্তার তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—একথা তোমায় শেখালে কে?

—এই লোকটি।

অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলেন। মেয়েটি হঠাৎ বললে—রমেনের উপর কোনো আকর্ষণ সত্যিই আমার নাই। একটু থেমে আবার বললে—তার উপর কোনো ঘৃণাও নাই! বরং—। সেও আমার জন্যে অনেক করেছে—অনেক সয়েছে। রমেনের টাকা থাকলে সেও হাসপাতালে খরচ করে আমার এমনি চিকিৎসাই করাত!—

নির্মলা একটু আকস্মিক ভাবেই উঠে চলে গেল।

ডাক্তার চুপ করে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর ডাক্তারের মনে হল—মানুষের জীবনটা তরল পদার্থ।

এর পর কদিন এল নির্মলা। ইনজেকসন নিলে। তারপর আর সে এল না। ডাক্তার ভেবেছিলেন—নির্মলা এর পর তার নিজের অসুখে তাঁকেই কল

দেবে। সেই লোকটিকে দেখবার একটা প্রবল ইচ্ছা ছিল ডাক্তারের। কিন্তু আর তার খবর পেলেন না।

ডাক্তার নিজের ব্যবসায় নিয়ে চলেছেন। টাইফয়েড, কলেরা, টি-বি, ইনফ্লুয়েঞ্জা—এ ছাড়া উদ্ভট অদ্ভুত কত ব্যাধি! রোগীর পর রোগী আসে। কত মনে থাকে, কত ভুলে যান! যাদের কিছু দিন মনে থাকে কিছু দিন পরে তাদের ভোলেন। আবার কতক জন নতুন রোগী, মনে থাকে কিছু দিন। শুধু দু-একজনের কথা কিছুতেই ভোলা যায় না।

প্রভা বলে জেলেদের মেয়েটিকে টি-বি থেকে বাঁচিয়েছেন। নরেনবাবুকে কলেরা থেকে বাঁচিয়েছেন। সে বাঁচা আশ্চর্য। তাকে মনে আছে। কালী-ঠাকুরের পূজারীকে মনে আছে। সে বেঁচেছে টাইফয়েড থেকে। নির্মলাকেও মনে হয় মধ্যে মধ্যে।

বৎসর দেড়েক পর আজ—হঠাৎ ডাক্তার একটা টেলিফোন পেলেন। একটি বড় হাসপাতাল থেকে টেলিফোন করে জানালো—আপনাকে একবার আসতে হবে।

—আমাকে? কেন?

—একটি মেয়ে, আমাদের এখানকারই একটি নার্স—বিষ খেয়েছে, বাঁচবে না। আপনাকে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বিস্মিত হলেন ডাক্তার। কে? নার্সদের অনেককেই তো জানেন, কিন্তু এ কে? কে বিষ খেলে? বিষ খেয়েই বা কে নার্স তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইবে? তবুও তিনি গেলেন।

ডাক্তার অবাক হয়ে গেলেন।

ধপধপে বিছানায় শুভ্র পরিচ্ছদ-আবৃত মেয়েটি পড়ে আছে। রাত্রের নদীর মত। মধ্যে মধ্যে আক্ষেপে দেহ সঙ্কুচিত হচ্ছে। যেন রাত্রের নদীতে আবর্ত উঠছে। নির্মলা শুয়ে আছে।

হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—মাস কয়েক আগে এসে চাকরি নিয়েছিল। বললেন—অত্যন্ত হাসি-খুশী ছিল। কেন যে—। জানি না। মেয়েদের চরিত্র। কয়েক জন তরুণ ডাক্তার তো যন্ত্রাহত হয়ে গিয়েছিল ওকে নিয়ে। মেয়েটির অভ্যাস ছিল—খেলা করার। আপনি চেনেন?

—চিনি। কিন্তু ও যে নার্স হয়েছিল তা তো জানি না। এক সময় ও আমার পেশেণ্ট ছিল। টি-বি হয়েছিল।

—তাই না কি?

—হ্যাঁ।

—দেখুন কি বলতে চায়? অবশ্য—। হাসলেন ডাক্তার। এ ডাক্তারও জানেন জ্ঞান আর হবে না।

জ্ঞান আর হল না। বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি ভ্রান্ত প্রায়ই হয় না। ডাক্তার পেলেন একখানা চিঠি। তাঁকেই লিখেছিল নির্মলা। সুদীর্ঘ চিঠি। অনেক কথা। অনেক ঘটনা। হঠাৎ নির্মলার মন তিক্ত হয়ে ওঠে। সে নিষ্কৃতিই খুঁজছিল। ঠিক এমনি সময়ে কনট্রাকটার ভদ্রলোককে গভর্ণমেণ্ট এ্যারেস্ট করলেন—কয়েক লক্ষ টাকা প্রবঞ্চনা করার অভিযোগ। নির্মলা বেঁচে গেল। সে অনেক ভাবলে।

লিখেছে—আপনার সেদিনের কথা মনে হয়েছিল ডাক্তারবাবু। ভেবে দেখেছিলাম রমেনকে ভালোবাসি কি না। আমার হাতে তখন অনেক টাকা। সে ভদ্রলোক—গহনায় টাকায় অনেক দিয়েছিলেন আমাকে। আমি স্বচ্ছন্দে রমেনকে নিয়ে সুখে থাকতে পারতাম। কিন্তু ঠিক বুঝেছিলাম—তাকে ভালোবেসে আমি সুখী হতে পারব না। একবার ভেবেছিলাম—টাকা নিয়ে তীর্থ-ধর্ম করব। ভালো লাগে নি। একবার ভেবেছিলাম—সিনেমায় নামব। প্রায় ঠিকও করে ফেলেছিলাম। তার পর সেও বাদ দিলাম। তার পর নার্সিং শিখতে ইচ্ছা হল! খুব ভালো লাগল! মনে হল—এই যেন চাইছিলাম। কিছু তো চায় মানুষ জীবনে। মনে হয়েছিল—রমেনকে আশ্রয় করে প্রথম যা পাই নি, এই লোককে আশ্রয় করে টাকায়, গয়নায়, পড়ায়, গানে যা পাই নি, এইবার এই নার্সিংয়ের মধ্যে তাই পাব। প্রথম প্রথম মনেও তাই হত। পেয়েছি। নিজের পরিশ্রমে উপার্জন করে তাই থেকে দিন চালাতাম। সে ভদ্রলোকের দেওয়া টাকা ব্যাঙ্কে মজুত রেখেছিলাম। হাত দিই নি। দিতে ইচ্ছা হত না। হয়ত বলবেন—নারী চায় পুরুষকে, এ ক্ষেত্রে তুমি সেই ভুল করেছিলে। না। তরুণ ডাক্তারেরা গুঞ্জন করত চারিপাশে। প্রথম বেশ ছিলাম। মনে হয়েছিল—সব পেয়েছি। তার পর ক্রমশঃ এর রঙও ফিকে হয়ে গেল। আর ভালো লাগল না। অত্যন্ত তেতো হতে আরম্ভ হল সব। কদিন থেকে—রাত্রে ফের মদ খেতে শুরু করেছি। মদের সঙ্গেই বিষ মিশিয়ে খাব। বেঁচে কি লাভ? ভালো লাগছে না। কি চেয়েছিলাম বুঝতে পারলাম না। বোধ হয়, ডাক্তারবাবু, মানুষ তা বুঝতে পারে না। হঠাৎ পেয়ে যায়। পেলে বুঝতে পারে—কি চেয়েছিল। বিষ খাবার কল্পনায় বেশ আনন্দ পাচ্ছি ডাক্তারবাবু।

পুনশ্চ—লিখেছে সে—আমার যে টাকাগুলো আছে ব্যাঙ্কে, সেগুলোর ট্রাষ্টি করেছি আপনাকে। উকীল জানাবে আপনাকে যথাসময়ে। মেয়েদের কোনো কিছুতে দিয়ে দেবেন।

ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

কি চেয়েছিল নির্মলা? সংসার—সন্তান? কিন্তু কোনো পুরুষের আশ্রয়ই তো তার ভালো লাগে নি?

কি চেয়েছিল? অন্য কাউকে চেয়েছিল? ডাক্তার হঠাৎ অত্যন্ত বেদনা বোধ করলেন।—হয়ত—তাঁকেই—। ভক্তি থেকে বলে তো বিজ্ঞানে—।

হঠাৎ মনে হল—তাঁর কানের কাছে নির্মলা খিল-খিল করে হাসছে—বলছে—পুরুষদের মনে হয়—আমাকে ভালোবাসলেও—তো—।

লজ্জিত হলেন ডাক্তার।

কমলা বলে মেয়েটি—প্লুরিসির রোগী—তাকে নিয়ে এল তার বাপ।

ডাক্তার উঠে বসলেন—বিজয়, ক্যালসিয়াম।

—বাঃ বেশ সারছে মেয়েটি। বাঃ।

বিজয় দেরি করে বড়। ডাক্তারকে বসে থাকতে হল নিষ্ক্রিয় হয়ে।

কি চেয়েছিল নির্মলা?

ম য় দা ন ব

বিরাট কারখানা। ফায়ার ব্রিক্স তৈরি হয়, ফায়ার ক্লে সরবরাহ করা হয়। যুদ্ধের আরম্ভ হতেই কারখানাটি অকস্মাৎ বিন্ধ্যপর্বতের মত কলেবর স্ফীত করে চলেছে। আধুনিক বিন্ধ্য—কোনো দুর্বাসার কাছে নত হবে না। বরং বশিষ্ঠের কাছে নত হলেও হতে পারে, হতে পারে কেন, হবে। শান্তিরূপী বশিষ্ঠ যেদিন আবির্ভূত হবেন—সেইদিন সে মাথা নোয়াবে। অর্থাৎ যুদ্ধের শান্তি যতদিন না হবে, ততদিন কারখানাটা বেড়েই চলবে। দেশের লোহার কারখানাগুলি দাঁড়িয়ে আছে এর উৎপাদনের ভিত্তির উপর। যুদ্ধবিভাগ থেকে মাল সরবরাহের গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। টেলিগ্রামে ওয়াগনের ব্যবস্থা হয়। স্থানীয় রেল স্টেশনটার কর্মচারীরা বরাবরই কারখানার কর্তৃপক্ষকে খাতির করে; সে খাতির এখন বেড়ে গেছে। থানায় সরকারী হুকুম আছে—কারখানার উপর বিশেষ

দৃষ্টি রাখতে। কোনো অশান্তির সম্ভাবনা মাত্রেই সর্বপ্রকার সাহায্য তৎক্ষণাৎ দিতে হবে। কারখানার ম্যানেজারের মাইনে হাজার টাকা। থানায় দারোগা মাইনে পায় একশ পঁচিশ—; খাতির সেও বরাবরই করে; এখন আটশ পঁচাত্তর টাকার বেশী মাইনের ওজনের ওপর সরকারী হুকুমের গুরুভার চেপে বসেছে। আগে দেখা হলে দারোগা নমস্কার করে বলত—নমস্কার মিঃ বোস!—নমস্কার অবশ্য সম্ভ্রমভরেই করত। কিন্তু এখন সে সম্ভ্রমের সঙ্গে ভয় মিশেছে; দেখা হলে এখন চকিতভাবে সে নমস্কার করে বলে—নমস্কার Sir!—আগে নমস্কারের সঙ্গে হাসত; এখন হাসে না। আগেই যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করত, কিন্তু আজকের অভ্যর্থনার সঙ্গে তার তুলনা হয় না। আজ সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আপনি স্যার? আসুন, আসুন, আসুন!

—একটা ডায়েরী করতে এসেছি।

—ডায়েরী?

—ফণি মিস্ত্রী—আপনি নিশ্চয় তাকে জানেন—সেই বুড়ো মিস্ত্রী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব জানি। সে তো আপনাদের কারখানার গোড়া থেকেই আছে।

—হ্যাঁ। সেই লোকটা।

—দুর্দান্ত মাতাল।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু পাক্কা কাজের লোক।

ম্যানেজার হাসলেন।

দারোগা আবার বললে—ভারি হিতাকাঙ্ক্ষী লোক Sir, আমি আজ পাঁচ বছর রয়েছি এখানে। এমন faithful লোক কিন্তু হয় না।

ম্যানেজার বললেন—কাল কিন্তু লোকটা কতকগুলো যন্ত্রপাতি চুরি করে পালিয়েছে।

—ফণি মিস্ত্রী চুরি করে পালিয়েছে!—দারোগার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

—হ্যাঁ, ডায়েরীতে আপনি entry করে নিন।

ম্যানেজার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—স্টেশনে যাচ্ছিলাম—পথে ভাবলাম নিজেই inform করে যাই। অন্য লোকও আসবে। আপনি গিয়ে তদন্ত করে আসবেন।

মোটরের দরজা খুলে ম্যানেজার বললেন—You must find that devil out. আমরা Company থেকে এর জন্যে reward দেব।

ফণি মিস্ত্রী। ষাট বৎসর বয়সের প্রৌঢ় ; কিন্তু জোয়ানের চেয়ে কম কর্মঠ নয়। কেবল এখন হাঁপ ধরে একটু। বড় বড় মেশিনের দশ পনের মণ ভারি অংশগুলো হাবিসের সময় দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে তার বিরক্তি ধরে যেত। অকস্মাৎ এগিয়ে এসে হাবিসের বোলে বাধা দিয়ে ভেঙ্গিয়ে বলত—হেঁইয়ো! হেঁইয়ো! হেঁইয়ো! বেটারা সব ভাত খাবার যম। ভাগ।—সে হাবিসের ডাণ্ডায় কাঁধ লাগিয়ে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে উঠত। চোখেমুখে রক্তোচ্ছ্বাস ছুটে আসত—মনে হত—রক্ত বুঝি এখুনি ফেটে পড়বে। পিঠে বুকে হাতে গুলগুলো ফুলে ফুলে দাঁড়িয়ে উঠত পাথুরে অসমতল শক্ত কালো মাটির মত। বিস্ফারিত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যেত দু-পাটি দাঁত—পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসেছে মেশিনের খাঁজকাটা চাকার মত। প্রকাণ্ড লৌহ-কঙ্কাল, শক্তি এবং কৌশল দুইয়ের প্রচণ্ড এবং নিপুণ প্রয়োগে—এগিয়ে চলে যেত পাঁকাল মাছের মত।

ফণি মিস্ত্রী কালও ছিল। সন্ধ্যাবেলাতেও সে পুরানো ইঞ্জিন ঘরে বসে বিড়ি টেনেছে। মধ্যে মধ্যে পকেট থেকে মদের শিশি বের করে খেয়েছে। ঠিক সাড়ে আটটার সময় ক্লাব-ঘরে এসে রেডিয়োর সামনে বসে গান শুনে গেছে। অন্যে ঠিক এটা ধরতে না পারলেও ফণি ধরেছিল, সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে কোনো-না কোনো গায়িকাতে গান গায় এবং এটাও সে আবিষ্কার করেছিল—সে গানগুলি রেকর্ডের গান নয়। সুতরাং আপনার মনের তর্ক-যুক্তির অভ্রান্ত বিচারের বিশ্বাসে—রেডিয়োর সামনে গান শুনত আর অনুভব করত গায়িকার সান্নিধ্য ; মনে মনে গায়িকার একটি কাল্পনিক মূর্তিও গড়ে তুলত। তালের মাথায় বাহবা দিত। সে বাহবা সে কালও দিয়ে গেছে।

গত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ১৯১৯ কি ১৯২০ সালে এ কারখানার পত্তন হয়েছে। পলাশের জঙ্গল কেটে পাথুরে ডাঙ্গার উপর খাপরায় ছাওয়ানো তিন কুঠরি একখানা ঘর, ছোট একটা রান্নাঘর, আর প্রকাণ্ড একটা খাপরার চালা —এই নিয়ে কারখানার আরম্ভ। লোকজন বলতে জন-পাঁচেক। কালো প্রকাণ্ড দেহ, আকর্ণ বিস্তার মুখ-বিবর, বড় বড় দাঁত, ভাঁটার মত চোখ, ম্যানেজারবাবু, একজন দারোয়ান, একজন কেরানীবাবু, একজন মালবাবু, আর ওই ফণি মিস্ত্রী। আরও দুজন স্থানীয় লোককে জোটানো হয়েছিল। একজন ঠাকুর, একজন চাকর। ম্যানেজারবাবু আবার স্থায়িভাবে থাকতেন না। সপ্তাহে তিন দিন—শুক্র, শনি, রবি ; বৃহস্পতিবারে রাত্রে এসে তিনটে দিন হৈ-চৈ, হুড়ুম-দুড়ুম, তৈরি জিনিস ভেঙে, নতুন জিনিসের ফরমাশ দিয়ে, মদ পাঁঠা খেয়ে—সোমবার সকালে আবার রওনা দিতেন। তখন ফণিই ছিল এখানকার সর্বেসর্বা

লেখাপড়া যেটুকু জানত সেটুকু না-জানাই ; মোটা মোটা আঁকা বাঁকা অক্ষরে অতি প্রয়োজনে ম্যানেজারকে নিজে হাতে গোপন পত্র লিখত—'সিচরণেশু, এখানকার কাজে একটা বেপার হইয়াছে, পাশের সায়েব কোম্পানি—খুব চুলবুল লাগায়েছে। আমাদিগে ইখান থেকে ভাগাবার মতলব। আপুনি শীঘ্র আসিবেন। সাক্ষাতে সব বলিব। মালবাবুর গতিক সতিক সুবিধের লয়। আসিবার সময় হরিনারান বল্টু গণ্ডাকয়েক এবং শক্ত ফিতা আনিবেন।' নীচে নাম সই করত, কিন্তু ইংরেজীতে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লিখত, পি. মিস্তিরী। অবশ্য বোঝা যেত না, কারণ সইটা এমন টেনে করত যে, মনে হত ওটা কোনো হিজিবিজি অথবা কোনো পাকা বড় সাহেবের সই।

হরিনারান বল্টু—হোল্ডিং নাট বোল্ট। ফিতা—বেল্টিং। বাংলার যে সব জেলা এখন বেহারের মধ্যে ঢুকেছে সেই সব কারখানা-প্রধান অঞ্চলের শ্রমিকদের এগুলি নিজস্ব ভাষা। এমন কথা অজস্র—শ্যাফট—শাপ্টু, ট্রলি—টালি, ভালভ—ভালবু, গেজ কর্ক—গজ কাক, হ্যামার—হাম্বর ইত্যাদি।

এই হাম্বর পিটতেই সে প্রথম ঘর ছেড়ে এসেছিল কারখানার কাজে, কারখানা পত্তনেরও পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে। জাত কামারের পনর ষোল বৎসর বয়সেই বেশ শক্ত সমর্থ দেহে ছেলেটি এসে কাজ নিয়েছিল একটি কলিয়ারীতে। কলিয়ারীর কামারশালায় এসে ভর্তি হয়ে শুনলে—হাতুড়ির নাম হাম্বর! কলিয়ারীটা এই কোম্পানিরই কলিয়ারী। কিন্তু তখন কোম্পানি ছিল চিঠির কাগজের মাথায় ছাপানো নামে। মালিকবাবু আসতেন সদাশয়ী পুরুষ, আমীর লোক, সঙ্গে আসত ফলমূল, তরিতরকারী, কেস-বন্দী বিলিতী মদ, বেতের খুপরিওয়ালা বাক্সে সোডা; শীতকাল হলে গলদা চিংড়ি, বর্ষা হলে ইলিশ মাছ, ছোট ছেলের মাথার খুলির মত কাঁকড়া। কলিয়ারীর নাম ছিল কুঠি; কুঠিতে সমারোহ পড়ে যেত। প্রতি মালকাটার দলে পেত খাসি এবং মদের দাম, বাবুদের মেসে হত ফিস্টি; তারা মালিকবাবুর-আনা জিনিসের ভাগ পেত, আরও মঞ্জুর হত খাসির দাম। ম্যানেজারবাবুর বাংলায় মালিকবাবুর আসর পড়ত। যাবার সময় বকশিশের ছড়াছড়ি। আট আনা থেকে আরম্ভ করে পাঁচ টাকা পর্যন্ত।

চার বৎসর পরে সে মালিকবাবুর সুনজরে পড়েছিল। তখন সে আর হাম্বর পিটত না। তখন সে ছোট মিস্ত্রী। তার গুরু বড় মিস্ত্রী তখন প্রায় বসে থাকত। ফণিকে বাহবা দিত। ফণি খাটত দৈত্যের মত। গুরুকে কোনো কাজ করতে দিত না। প্রৌঢ়ও তাকে খুব ভালোবাসত। তার বিদ্যা-বুদ্ধি অকপটভাবে

সে ফণিকে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিল। শুধু তার যন্ত্রবিদ্যাই নয়—তার স্বভাব-চরিত্র জীবনদর্শন সব ফণিকে দিয়েছিল। ইঞ্জিন, বয়লার, পাম্প, শ্যাফট, পুলি প্রভৃতির নাড়ী-নক্ষত্র তাকে চিনিয়েছিল অদ্ভুতভাবে। খোলা ইঞ্জিনের অংশগুলি জুড়ে বয়লারের স্টীম পাইপের সঙ্গে যুক্ত করে, বাষ্পশক্তির পথ মুক্ত করে দিয়ে বলত—দেখ!

ইঞ্জিনের কাজ আরম্ভ হত, ঝকঝকে তৈলাক্ত লৌহদণ্ডটা চলতে আরম্ভ করত, সঙ্গে সঙ্গে বড় চাকাটার সঞ্চারিত ঘূর্ণ্যমান গতি; প্রথমে ধীরে ধীরে তারপর ক্রমে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে; চাকায় আবদ্ধ বেল্টিং-বন্ধনের টানে অন্য চাকাগুলোও ঘুরত, দেখতে দেখতে টিনের শেডের অভ্যন্তরভাগ শব্দায়মান হয়ে উঠত, যন্ত্রগুলোর গতিশীলতার শব্দে, তার বেগে মাথার উপরে টিনের চালায় কম্পন সঞ্চারিত হত, পায়ের তলায় বাঁধানো মেঝেও কাঁপত থরথর করে। আবার সে ব্রেক কষত অথবা বাষ্পশক্তির পথ বন্ধ করে দিত, ইঞ্জিনটাও ধীরে ধীরে থেমে আসত। ফণি অবাক হয়ে দেখত!

ধীরে ধীরে সব সে শিখলে। ছোট একটি বোল্ট আলগা থাকলে—কেমন কেমন শব্দ ওঠে—শব্দের সূক্ষ্ম পার্থক্যবোধ পাকা সেতারীর স্বরবোধের মত পাকা হয়ে উঠেছিল। নানা লৌহ-যন্ত্রের রূঢ় উচ্চ শব্দ-সমন্বয়—সে যেন এক বিরাট ঐকতান বাদন, অথবা বিরাট লৌহ সেতারের বহুসংখ্যক তারের ঝঙ্কার। শুনবামাত্র কোন তারটিতে বেসুরা স্বর উঠেছে, সেটিকে কতখানি টান করে বাঁধতে হবে বা আলগা করতে হবে—গুরুর শিক্ষায় ফণি সেটা বুঝতে পারত মুহূর্তে। আরবের শেখ যেমন ঘোড়া চেনে, এ-দেশের চাষীরা যেমন গরু চেনে, তেমনি চেনবার শক্তিতে গুরু তাকে মেশিন চিনতে শিখিয়েছিল। দেখবামাত্র সে বলতে পারত—কত ঘোড়ার জোরের ইঞ্জিন অথবা কত ঘোড়ার জোর ছিল, এখন ঘষে ক্ষয়ে কত ঘোড়ার জোর দিতে পারবে।

সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে শিখিয়েছিল মেশিন কেনা-বেচার কমিশন নেবার কৌশল।

আর শিখিয়েছিল—মালিক অন্নদাতা প্রভু, মা-বাপ। ম্যানেজারকে সেলাম বাজাবে, কমিশনের ভাগ দেবে ডালি দিয়ে, কিন্তু জানবে ওই হল আসল শয়তান। মালিক চাকরি দেয়—ম্যানেজার চাকরি খায়। কসুর হলেও মালিক মাফ করে; যত ভালো কাজ তুমি কর—ম্যানেজার নিজের নামে চালায়।

আর শিখিয়েছিল মদ খেতে। বলেছিল—এ হল ইস্টীম।—মদের বোতলের

ছিপি খুলে বলত—খোল এ স্টপ কাক, চালাও ইস্টীম, শা-লা—দশ ঘোড়ার ইঞ্জিন চলবে বিশ ঘোড়ার কদমে।

নিজে খেয়ে বোতলটা বাড়িয়ে দিয়ে বলত—লে ব্যাটা—ইস্টীম কর লে। —উৎসাহে সে হিন্দীতে বলত।

আর শিখিয়েছিল—নারীর চেয়ে ভোগ্য আর কিছু নাই। বলত—দেখ না, চেয়ে দেখ।

মালিক—ম্যানেজার, বাবুরা, দারোয়ান, কে বাদ আছে?

নিজে সঙ্গে করে তাকে রাণীগঞ্জে বেশ্যালয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ওই শ্রেণীর একটা বাড়িতে গিয়ে সে বাড়ির সমস্ত মেয়েগুলিকে ডেকে সামনে সারিবন্দী দাঁড় করিয়ে বলেছিল—বল তোর কাকে পছন্দ?

আর শিখিয়েছিল—ক্ষতি করতে হয়—উপর-ওয়ালার করবি। কিন্তু গরিবের ক্ষতি কখনও করবি না। কভি না। গরিব চুরি করছে দেখলে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবি। বসে থাকিস তো ফিরে বসবি। খবরদার ক্ষতি করবি না। তবে তুই আর ওই শালা ম্যানেজারে তফাত কি?

এই কারখানা সে নিজে হাতে গড়েছিল। সে আর ইট-মিস্ত্রী বুড়ো এনায়েৎ খাঁ। কারখানার যন্ত্রপাতি, শেড তৈরির বীম, র‍্যাফ্‌টার, অ্যাঙ্গেল, টি, বোল্ট-নাট এনে কাজ আরম্ভ করেই—বুড়ো এনায়েৎকে নিয়ে আসে। নিয়ে এল ঐ পাশের সায়েবদের কারখানা থেকে ছাড়িয়ে। পাকা দাড়ি, পাকা চুল, মাথায় পাগড়ী বেঁধে সায়েবদের কারখানায় বুড়ো বয়সেও এনায়েৎ ছোট মিস্ত্রী হয়ে কাল কাটাচ্ছিল। এদিকে এখানে চিনামাটির কারখানা—সে কাজ সে জানে না। রাক্ষুসে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে সেদিন এসেছিলেন মালিকবাবু। প্রকাণ্ড বড় একটা খাসি সন্ধ্যের আগেই পড়ে গিয়েছে। এক ইঞ্চি পুরু চর্বিতে ছোট গামলাটা ভরে উঠেছে। বেঁটে ছোট্ট মোটা বিলিতী হুইস্কীর বোতল খুলে বসেছেন দুজনে। ফণির ডাক পড়ল।

প্রণাম করে হাত জোড় করে বসেছিল।

এতবড় খাসিটার একটা লম্বা মোটা হাড় ম্যানেজার কশের দাঁতে ভাঙছিল মড়মড় করে। বড় বড় চোখ দুটো কুঁচের মত লাল হয়ে উঠেছে। বাবু বসেছিলেন গম্ভীরভাবে।

কেউ কিছুই বলেন নাই। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ফণিই বলেছিল —হুজুর!

মালিক মুখ ফিরিয়ে বলেছিলেন—ইট-মিস্ত্রী চাই। এক হপ্তার মধ্যে।

ফণি বলেছিল—আমি চেষ্টার কসুর করছি না হুজুর

—এক হপ্তার মধ্যে চাই।

খাসির হাড়টা ম্যানেজারের দাঁতের মধ্যে বোধ হয় গুঁড়ো হয়ে গেল সেই মুহূর্তে। তিনি বলেছিলেন—ব্যাটার মাথা চিবিয়ে খাব নইলে।

ফণি মাথা চুলকে বলেছিল—দেখি আজ্ঞা।

মালিক অভয় দিয়েছিলেন—টাকার জন্য ভাবিস নে।

—যে আজ্ঞা।—ফণি প্রণাম করে উঠে বলেছিল—কালই দেখছি আমি।

—দাঁড়া।

—আজ্ঞা।

—ওইটে নিয়ে যা। বোতলটা।

আর একটা প্রণাম করে বোতলটা নিয়ে সে বেরিয়ে এসে সেদিন মদ খেয়ে নেচেছিল। মালিক তাকে মদের প্রসাদ দিয়েছেন। বিলিতী মদ। কী তার! কী নেশা!

পরের দিনই সে সায়েবদের কারখানা থেকে নগদ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ভাঙিয়ে নিয়ে এল একটা সুন্দরী যুবতী কামিনকে। মেয়েটা এনায়েতের অনুগৃহীতা।

তারপরের দিন এনায়েৎ এল দাঙ্গা করতে।

ফণি দারোয়ানকে বসিয়ে দিলে বন্দুক নিয়ে। দাঙ্গা হল না, বচসা হল। শেষ পর্যন্ত ফণি গাঁজার কল্কে সেজে বললে—হাঙ্গামায় কাজ নেই; তুমি এইখানে এস, এখানকার বড় মিস্ত্রী হবে তুমি, ওখানকার চেয়ে দশ টাকা মাইনে বেশী পাবে। আর ও কামিনটাকে কাজ করতে হবে না,—তোমার ঘরে থাকবে, তার হাজরি পাবে।

এনায়েৎ এ কথার উত্তর দিতে পারলে না।

ফণি গাঁজার কল্কে দেখিয়ে এবার আহ্বান জানালে—এস, বস, খাও।

এনায়েৎ এল, বসল—গাঁজা খেলে। পরের দিন গভীর রাত্রে এনায়েৎ এসে হাজির হল—আরও দুই বিবি নিয়ে; এই কারখানার গাড়িতে বোঝাই হয়ে এল তার মালপত্র।

তারপর কারখানা চলতে লাগল দ্রুততম গতিতে। ভাটার পর ভাটা, তৈরি করালে এনায়েৎ। ফণি বয়লার বসালে, ইঞ্জিন বসালে, নিকটের নদীটাতে পাম্প বসালে, মাটি গুঁড়ো করবার জন্যে গ্রাইণ্ডিং মেশিন বসালে, ম্যানেজার তাকে বই থেকে ছবি দেখালেন—সে তাই দেখে তৈরি করলে কত হাত-গড়া যন্ত্র। কাঠের মিস্ত্রীকে দিয়ে বসে থেকে তৈরি করালে হরেক রকমের ছাঁচ। চালু

হল কারখানা। কালো মাটির তৈরি জিনিসগুলো পুড়ে মাখনের রঙ নিয়ে বজ্রকঠিন হয়ে বেরিয়ে আসতে আরম্ভ হল। প্রথম যেদিন ভাটা পুড়ে মাল খালাস হল, সেদিন ফণির আনন্দের আর সীমা ছিল না।

সেদিন সে মদ খেয়ে তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় মেশিন—ওই ইঞ্জিনটার উপর শুয়ে সেটাকে চুমো খেয়ে—পিঠ চাপড়ে আদরের আর বাকী রাখে নাই।

ফণি মিস্ত্রী ছিল কারখানার সর্বেসর্বা। কারখানাটার সমস্ত ছিল তার নখ-দর্পণে। বড় বড় যন্ত্রপাতি থেকে ছোট্ট স্থচটির হিসাব পর্যন্ত তার মনে ছিল। গুদামের হিসেব মিলছে না ; নতুন একটা পারালেবেল নাই, কয়েকখানা ট্রলি লাইন পাওয়া যাচ্ছে না, কতকগুলো নতুন ইঞ্জিন-পার্টস এসেছে—সেগুলো নাই, সর্বপ্রথমে যে পাম্পটা ব্যবহৃত হয়েছে সেটাও কোথায় উধাও হয়েছে। গুদামবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে গেল। ছা-পোষা মানুষ—সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলে, বুকের পাটা অত্যন্ত কম ; তার ওপর ম্যানেজার বসিয়ে দিলেন তার কোয়ার্টারের দরজায় দারোয়ান। ফণি ছিল না। সে গিয়েছিল রাণীগঞ্জ। কাজ কোম্পানির—একটা কলিয়ারীতে কিছু লোহালক্কড়ের সন্ধানে পাঠিয়েছিল তার গুরু। সে চার দিনের জায়গায় আট দিন কাটিয়ে এল! বিক্রেতার কাছে কমিশন পেয়েছিল—প্রায় একশ টাকা, সে টাকাটার আর অবশিষ্ট আছে কুড়ি টাকা কয়েক আনা। এ ছাড়া কোম্পানির কাছে রাণীগঞ্জ যাওয়া-আসার এবং থাকার বিল হয়েছে পঁচিশ টাকা। যে মেয়েটির বাড়িতে সে ছিল, তাকে সে একখানা গয়না গড়িয়ে দিয়েছে, খুব দামী অবশ্য নয়—তবু পঞ্চাশ টাকা লেগেছে।

সে এসে দেখলে কারখানায় হৈ-চৈ পড়ে গেছে। খোদ মালিকবাবু পর্যন্ত কলকাতা থেকে এসে হাজির। গুদামবাবুকে পুলিশে দেওয়া হবে কিনা তারই সমালোচনা চলছে। কলকাতা আপিসের ম্যানেজার এসেছেন, তিনিই চান পুলিশে দিতে। তিনি একেবারে সায়েব মানুষ ; দয়া-মায়া—পুরানো চাকর এ সব কথা হলেই বলেন—রাবিশ।

ম্যানেজারবাবু বলছেন—বেটাকে ঘরের মধ্যে পুরে দে দমাদম।

মালিক চুপ করেই আছেন।

ফণি এসে সব শুনে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াল। বললে—দেখি আজ্ঞা আমি একবার মিলায়ে দেখি। তবে পুরানো পাম্পুটার কথা বলছি—সিটাতে তো কিছু ছিল না।

কলকাতা আপিসের ম্যানেজার বললেন—কিছু ছিল-না-ছিল তো কথা নয়। জিনিসটা গেল কোথায় ?

—আজ্ঞা যাবে কোথা ? নতুন পাম্পু এল—সিটা তুলে এনে ওইখানে ফেলা হয়েছিল,—নতুন বাংলার ভিত কাটার সময়—মাটি তুলে ফেললে, মাটি চাপা পড়েছে। খুঁড়লেই মিলবে।

কথাটা এবার ম্যানেজারেরও মনে পড়ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটি খুঁড়ে পাম্পটা ঠিকই পাওয়া গেল।

—ইঞ্জিন পার্টস ?

—সে তো আজ্ঞা ইঞ্জিনে লাগানো হয়েছে। একেবারে ইস্টিশান থেকে ইঞ্জিন শেডে মাল খুলে আমি লাগিয়েছি।

ম্যানেজার, মালিক এবং কলকাতা আপিসের ম্যানেজারকে নিজে নিয়ে গিয়ে ইঞ্জিনে লাগানো অংশগুলো বিলিতী মার্কা মিলিয়ে দেখিয়ে দিলে।

—পুরনোগুলো ?

—সেগুলা দেখছি আজ্ঞা।

—ট্রলি লাইন ?

—সি লাগানো আছে নতুন শেডে, কখানা টি-য়ের অভাব পড়ল, কি করব, পড়ে ছিল লাগায়ে দিলাম। ম্যানেজার বাবুকে বলেছিলাম।

ম্যানেজারের মনে পড়ল এবার।—হ্যাঁ বটে, এখন ইঞ্জিনের পুরানো পার্টসগুলো আর পারালেবেল।

—দেখি আজ্ঞা খোঁজ করে।

গুদামবাবুকে সঙ্গে করে সে বেরিয়ে এল। গুদামবাবু হাত চেপে ধরে বললেন—মিস্তিরী আমাকে বাঁচাও।

—বাঁচাও! ইঞ্জিনের সেগুলা করলি কি ? আমি যে তুর গুদামে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বোঝ করে দিয়েছি।

—আমার মেয়ের বিয়ের সময়—। গুদামবাবু বলতে পারলেন না, কেঁদে ফেললে।

—হুঁ, কত টাকায় বেচেছিস ? কাকে বেচেছিস ?

—ওই মাড়োয়ারী স্টোর সাপ্লায়ার্সের কাছে—পাঁচশ টাকা ধার করেছিলাম। টাকার জন্যে তাগাদা করে—বললে, নালিশ করব। সে-ই সেগুলো নিয়ে গেছে, দাম এখনও ঠিক হয় নি।

—হুঁ। পারালেবেলটা চুরি করেছে—ইব্রাহিম রাজমিস্ত্রী—আমি জানি।

কিন্তু খবরদার বলবি না ; তাহলে তুর মাথাও খেয়ে দিব আমি। এই টাকা লে—একজনা কাউকে দে পাঠায়ে বাজারে। নিয়ে আসুক কিনে।

সন্ধ্যায় পারালেবেলটা হাতে করে হাজির হয়ে বললে—আজ্ঞা ইটা ছিল ইব্রাহিমের কাছে। তাড়াতাড়ি আমি নিয়ে গিয়েছিলাম গুদাম থেকে, তখন উদিকে ইঞ্জিন বসছে। কাজ সেরে দিলাম ইব্রাহিমকে—বেটা গাধা—নিজের কাছেই রেখেছিল।

—ইঞ্জিন পার্টস ?

মাথা চুলকিয়ে ফণি বলল—মড়ার হাড়—ইয়ের হিসেব কি মেলে ? নতুন জিনিস এল, পুরানো রদ্দিগুলা ছাড়ায়ে ফেললাম ! ইঞ্জিন ঘরের আশেপাশে পড়েছিল—অনেকদিন ; তা খুঁড়লেও মিলতে পারে, আবার কুলি কামিনে নিয়েও যেতে পারে।

মালিকের হাতে তখন গ্লাস। কলকাতা আপিসের ম্যানেজার বললেন, —তার দাম তাহলে তোমাকে লাগবে।

—তা যখন অন্যায় করেছি তখন দিতে হবে আমাকে।

মালিক গ্লাসটা শেষ করে বললেন—ম্যানেজারবাবু, ফণি মিস্ত্রীকে পঞ্চাশ টাকা বকশিশ। এখুনি দিয়ে দিন।

একটা প্রণাম করে ফণি বললে—হুজুর, গরিব গুদামবাবুর বেটীর বিয়েতে পাঁচশ টাকা ধার হয়েছে। গরিব বিনা দোষে—।

সে মাথা চুলকাতে লাগল।

মালিক বললেন—দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দাও ওর।

হঠাৎ যেন কাল পাল্টে গেল, অন্তত ফণির তাই মনে হল। ১৯৩০ সালের স্বদেশী হাঙ্গামার মতন তার মন্দ লাগে নি ! সেও খদ্দর পরেছিল, দোকানে মদ কেনা বন্ধ করে দিয়ে নদীর ধারে মদ চোলাই শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু সে সব হাঙ্গামা থেমে গিয়ে হঠাৎ কারখানায় ধর্মঘট আরম্ভ হয়ে গেল।

ফণি হতবুদ্ধি হয়ে গেল, কোন দিকে সে যোগ দেবে বুঝতে পারলে না। প্রথম যেদিন মিটিং হয় সেদিন হুলু সিংগী, হতভাগা তারই কাছে কাজ শেখে, তাকেই দিলে সভাপতি করে, প্রথমটা মন্দ লাগে নি ফণির। চেয়ারে বসে ফুলের মালা গলায় দিয়ে সে বেশ বুক ফুলিয়ে বসেছিল।

কিছুক্ষণ পরই কিন্তু ফণি চঞ্চল হয়ে উঠল। যে লোকটি মিটিং করবার জন্য এসেছে—সে এসব কি বলছে ? মালিকদের আমরা এতদিন বলে এসেছি—

মা-বাপ, হুজুর-মালিক। ভেবে এসেছি ওরাই আমাদের খেতে-পরতে দেয়। এটা এতদিন ধরে ওরাই আমাদের বলিয়ে এসেছে; পাঠশালার গুরুমশায় যেমন অ-আ মুখস্থ করায় তেমনি করে মুখস্থ করিয়েছে। মালিক মা-বাপ নয়, হুজুরও নয়, কারখানার মালিক হলেও আমার মালিক সে নয়। সে আমাকে খেতে-পরতে দেয় না। আমরা যা খাই, ছাতু-নিমক, আটা-দাল, ভাত-তরকারি—তার একটা দানাও সে আমাকে মেহেরবানি করে দেয় না। সেই-ই আমার খানার ভাগীদার;—আমার রোজগারের দানায় সে ভাগ বসায়—আমায় ভুল বুঝিয়ে—আমার মাথায় হাত বুলিয়ে। তোমরা ভেবে দেখ,—আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটি! বয়লারে কয়লা ঠেলি—ইঞ্জিন চালু রাখি—মেশিনে মেশিনে কাজ করি। ভাটার আগুন-তাতে ঝলসে যাই, পেটভর্তি ধুলো খাই—সর্বাঙ্গে কাদা মাখি; আমরাই এই কারখানায় খাটি—তবে মাল তৈরি হয়। আর সেই মাল বিক্রি করে মালিক মুনাফা করে লাখো-লাখো টাকা। সে খায় পোলাও, কালিয়া, পরে ফিনফিনে ধুতি, গলায় উড়োয় রেশমী চাদর! দামী জুতো পায়ে দিয়ে মস মস করে চলে; মোটর গাড়িতে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়, দোতলায় শোয়—দিন দিন সিন্দুকে জমায় হাজারে হাজারে টাকা। সে সমস্তই তারা করে—আমাদের দানা মেরে। অথচ আমরা কিছু বললেই ওরা আমাদের বলে বেইমান। ইমান আমাদের, ওদের কাছে কি আছে? নিমক আমরা ওদের খাই না। ভগবানের, খোদাতালার দেওয়া আমার তাগদ—সেই তাগদে আমি মেহন্নত করি, সেই মেহন্নতের রোজগার যারা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে ঠকিয়ে নেয়—তাদের কাছে আমাদের কিসের ইমান? বেইমান তারা।

সভাপতির আসনে বসে ফণি ঘেমে সারা হয়ে গেল। এমন ধারার কথা উঠবে সে ভাবে নাই। চিরকাল সে মালিককে মনিব জেনে এসেছে; তার গুরু তাকে শিখিয়ে গেছে মালিক-মনিবের ক্ষতি কখনও করবি না; মালিকের বকশিশ নিয়েছে; তার প্রসাদী মদ খেয়েছে; তার আদরের হারামজাদা গালাগাল শুনে খুশী হয়েছে—তার মধ্যে সে স্নেহের সন্ধান পেয়েছে; তাদের সম্বন্ধে লোকটি এ কি বলছে? সে আজ সভাপতি না হলে সে-ই একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলত। মালিকরা শুনলে কি বলবেন? তাছাড়া লোকটা কিছু জানে না। টাকা কার? আর বেশি চালাকি করলে মালিক যদি এঁটো ভাতের কুত্তার মত এদের তাড়িয়ে দেয়, তবে এরা যে না খেয়ে মরবে!

সভাপতির আসন থেকেই সে বললে—ই-সব কথা আপনি ভুল বলছেন মশায়!

বক্তা থেকে সভার সকলেই একটু সচকিত হয়ে উঠল।

ফণি বললে—মশাই, কারখানা গাছের মত মাটি থেকে আপনি গজায়ে উঠে নাই। টাকা লেগেছে কাঁড়ি কাঁড়ি! মালিক সে গুলান আগাম ঘর থেকে বার করেছে।

বক্তা হেসে বললে—কারখানা যেমন মাটি থেকে আপনি গজানো গাছ নয়, টাকাও তেমনি গাছের ফল নয়; মাটিতে ঝড়ে পড়ে ছিল না; মালিক কুড়িয়ে এনে ঘরে জমান নাই। ঘরে তিনি তৈরিও করেন নাই, সে টাকাও তিনি জমিয়েছেন—এমনি কোনো পুরানো কারখানার মুনাফা থেকে। গরিব মজদুরের মেহন্নতের মজুরিতে জবরদস্তি ভাগ বসিয়ে।

ফণির মনে পড়ে গেল বাবুর পুরানো কয়লাকুঠির কথা। হ্যাঁ—বাবু সেইখান থেকেই বড়লোক বটে, কিন্তু—কিন্তু—তবু তার বাবুকে—মনিবকে এমন করে খারাপ কথা বলতে পারে না।—মনিবের শক্তি—হিম্মৎ জানে না। সে বলে উঠল—ই-সব কথা বলছেন আপনি—কুলিগুলানকে ক্ষেপায় দিছেন; কুলিরাই কল চালায়—হাঁ—ই-কথা ঠিক বটে। কিন্তু মালিক যখন কাল খেদায়ে দিবে সব, তখন কি হবে?

বক্তা হাসলে, বললে—মালিকের কারখানাও তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে। মুনাফার চাকা ঘুরবে না।

ফণিও হাসলে—বললে—ইদিগে তাড়ায়ে মালিক নতুন লোক আনবে। তখন?

—নতুন লোকেরাও কুলি। আপনারাও আজ যা বলবেন—কাল তারাও এসে তাই বলবে। দুনিয়ার মজদুর যদি এককাট্টা হয়ে যায়—তখন? তখন কি করবে কারখানার মালিক? কথা তো তাই। সব এককাট্টা হো-যাও। এ কারখানার একজনকে তাড়ালে যদি সবাই চলে যায়, সবাই চলে গেলে দুনিয়ার মজদুর যদি না আসে, তবে? তবে?

ফণি হতভম্ব হয়ে গেল। সভায় উপস্থিত কুলিরা হৈ হৈ করে উঠল।—ঠিক বাত, ঠিক বাত!

বক্তা বললে—আমাদের মজুরি বাড়াতে হবে।

—আলবৎ!

—আমাদের খাটুনির সময় কমাতে হবে।

—জরুর।

—না হলে আমরা ধর্মঘট করব!

—জরুর আলবৎ!

সভার মধ্যে সেই ছোঁড়া তুলু সিংগী, যাকে সে হাতে করে মানুষ করেছে —সেই তাকে—বুড়ো—বাতিল সেকেলে লোক বলে গাল দিলে। বললে, বাঘকে বাচ্চা অবস্থায় ধরে প্রতিদিন মানুষ আদর করে আফিং খাওয়ায়— সারাটা জীবন সে ভুলেই থাকে যে, সে জঙ্গলকে আমীর—রাজা। সে শুধু আফিংয়ের নেশায় ঝিমোয় আর ভাবে আফিং যোগানে-ওয়ালাই তার ভগবান; তার হাত চাটে। আমাদের মিস্ত্রী সাহেবের সেই নেশা লেগে আছে।

লোকে হো-হো করে হেসে উঠল। ফণির মাথা হেঁট হয়ে গেল। কারখানার ভেতর হলে সে একটা লোহার ডাণ্ডা ছোঁড়াটার মাথায় বসিয়ে দিত।

ছোঁড়া কিন্তু চালাক। সে ফণিকে জানে। ফণি বেশ বুঝতে পারলে তার চালাকি! এই হাসিতে ছোঁড়া চিৎকার করে বলে উঠল—খবরদার! হেস না তোমরা। এ হাসির কথা নয়। মিস্ত্রী সাহেব আমাদের সত্যি-সত্যিই বাঘ। তার হিম্মৎ, তার কিস্মৎ কত, তোমরা জান না। ওই বাঘকে আফিংয়ের নেশা ছাড়াতে হবে; তারপর ওই বাঘকে সামনে রেখে আমরা করব লড়াই। বল ভাই—ফণি-মিস্ত্রীকি—

লোকে চিৎকার করে উঠল—জয়।

কারখানায় ধর্মঘট হল।

পুরানো মালিক মারা গেছেন। টেলিগ্রামে পুরানো ম্যানেজার বাতিল হয়ে গেল। এলেন নতুন মালিক, নতুন ম্যানেজার। কাঁচা বয়েস, খাঁটি সায়েবী মেজাজ, চোস্ত ইংরাজীতে কথাবার্তা। এসেই ডাক দিলেন কুলিদের মাতব্বর কজনকে। মাতব্বরের মাথা সেই ছোঁড়া সিংগী। ফণিকে তারা ডাকলে না। ফণি মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মালিক-ম্যানেজার মিটমাট করে ফেললেন মজুরদের সঙ্গে।

সন্ধ্যের পর ফণি গেল বাংলোয় দেখা করতে। প্রণাম করে হাত জোড় করে দাঁড়াল। নতুন মালিক বললেন—কি চাই?

ফণি বললে—আজ্ঞা আমি ফণি-মিস্ত্রী।

—জানি। কিন্তু দরকার কি তোমার?

ফণি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ম্যানেজার বললে—তুমিই তো মজুর সভার সভাপতি?

ফণি জোড় হাত করেই বললে—আজ্ঞা হাঁ।

-কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে তোমাদের ডেপুটেশনের লোকদের সঙ্গে। শুনেছ ?

—আজ্ঞা—না।

—তাদের কাছেই শুনতে পাবে। কাল থেকে কাজ আরম্ভ হওয়া চাই। যাও।

কাজ আরম্ভ হওয়ার নামে ফণি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—আজ্ঞা হাঁ। জরুর। এখুনি যাই আমি।

বেরিয়ে এসে কারখানার ধারে সে দাঁড়াল। কত আলো জ্বলে কারখানায়—সেই কারখানাটা অন্ধকার হয়ে আছে। এখানকার প্রতি ইঞ্চি জমি তার জানা, তার হাতের তৈরি এই শেড ;—প্রতিটি মেশিন সে-ই বসিয়েছে—তারও এ অন্ধকারে পা বাড়াতে ভয় হচ্ছে। কত শব্দ কারখানায়। বয়লারে স্টীমের শব্দ, ঠিক তালে তালে ইঞ্জিনের শব্দ, বেল্টিংয়ের ঘোরার শব্দ, ঘূর্ণিত শ্যাফটগুলোর শব্দ, গ্রাইণ্ডিং মেশিনের শব্দ, এই মহাধ্বনির আঘাতে শেডের টিনের কম্পন-ঝংকার—সব স্তব্ধ। এই সব বিচিত্র শব্দগুলির মধ্যে কোনো একটি শব্দ, সে বয়লারের স্টীমের শব্দ বা শ্যাফটগুলোর ঘূর্ণনের ধাতব ধ্বনি—কিংবা টিনের চালের ওই ঝংকারের মধ্যে বেজে ওঠে যে বাজনার সুর, সেই সুরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কুলিকামিনে কতজনে গান করত ; সে সব আজ চুপ-চাপ। পূজোর পর প্রথম প্রথম রাত্রে যেমন চণ্ডীমণ্ডপ খাঁ-খাঁ করে—কারখানাটাও সেই রকম খাঁ-খাঁ করছে। 'সব তার নিজের হাতের গড়া। ধর্মঘটের প্রথম দিন কারখানার এই স্তব্ধতা তাকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তুলেছিল। সে অধীর হয়ে কারখানায় যেতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু ওই ছোঁড়া তুলু সিংগীই তাকে যেতে দেয় নি। সে পা দিয়েছে কারখানার ফটকে, অমনি পিছন থেকে টান পড়ল—কে ?

তুলু বললে—আমি। আমাদের ছেড়ে যাবে তুমি মিস্ত্রী ? এতগুলো লোকের রুটি।

মিস্ত্রীর মনে হল সব গরিবের মুখ। কারখানায় ঢুকতে সে পারে নি।

পরদিন ভোরবেলায় কারখানায় ফণি এল সর্বাগ্রে। বয়লারের ফায়ার-ম্যানটা আসতেই ধমক দিয়ে বললে—এত দেরি করে ? নে, মার কয়লা। জলদি স্টীম উঠাও।

সে ব্যগ্র হয়ে চেয়ে রইল স্টীমের চাপ-নির্দেশক যন্ত্রটার দিকে। ঘড়ির কাঁটার মত কাঁটাটা থর-থর-থর করে কাঁপছে। ফণির দেহের মধ্যে রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার নিজের হাতে গড়া কারখানা। ইঞ্জিনের চালকটাকে ঠেলে দিয়ে সে নিজে বসল চালাবার জায়গায় ঐরাবতের মাহুতের মত।

স্টীম এসে ঠেলা মারছে। সিলিণ্ডারের মধ্যে বাষ্পশক্তি বর্ষার আকাশের ক্রমবিস্তৃত-কলেবর পুঞ্জিত মেঘের মত ফুলে ফুলে উঠছে। ধাক্কা খেয়ে পিস্টনের ঠেলায় প্রকাণ্ড বড় লোহার চাকাটার সঙ্গে আবদ্ধ লোহার দণ্ডটা—নিচ থেকে উপরে উঠছে—চাকারা নড়ছে। চলবে—এইবার চলবে।

সিংগী ছোঁড়া এল। হেসে বলল—সেই ভোরে উঠে এসেছ ?

ফণি কোনো উত্তর দিলে না।

ছোঁড়া বললে—আফিংয়ের নেশা !—বলে ঠাট্টা করবার জন্যেই একটা হাই তুলে তুড়ি দিলে।

ফণি ছোঁড়ার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে বোধ হয় ঘাড়টা ভেঙে দিত। কিন্তু সেই মুহূর্তেই, শেডে ঢুকল নতুন ম্যানেজার। সিংগী ছোঁড়াটা ম্যানেজারের সামনে দিয়েই গটগট করে চলে গেল,—মাথাও নোয়ালে না—শুধু হাত তুলে ছোট্ট সেলাম দিয়ে চলে গেল। ফণি মনে মনেই বললে—বড় বাড় হয়েছে তোমার। অতি বাড় বেড়ো না—ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে।

নিজে উঠে সে সসম্ভ্রমে সেলাম করলে।

ম্যানেজার বললে—তুমি না ফিটার ?

—আজ্ঞা হাঁ ; আমি ফণি মিস্তিরী।

—ইঞ্জিন ড্রাইভার কোথায় ?

—ওই যে !

—তবে তুমি ইঞ্জিনে রয়েছ ? কিছু খারাপ হয়েছে নাকি ?

—না আজ্ঞা। উ আপনার তাজী ঘোড়ার মত ঠিক আছে।

—তবে ?

হেসে ফণি বললে—আমি আজ্ঞা সবই করি।

ম্যানেজার বললে—না। যার যা কাজ সে তাই করবে। তোমার কাছে বেশি কাজ কোম্পানি চায় না।

ফণি অনুভব করলে তার প্রতিপত্তি সম্মান সব চলে গিয়েছে, উবে গিয়েছে যাদুর ভাটার মত। আপিসে তার পরামর্শ নেবার জন্যে তাকে আর ডাকে না, কুলি-মজুর-বাবু কেউ তার কাছে আসে না, বলে না—মিস্ত্রী, তুমি বাঁচাও ! হৈ-চৈ স্বভাবের ফণি-মিস্ত্রী কেমন শান্ত মানুষ হয়ে গেল ! তবে তার একটা সান্ত্বনা—প্রত্যহ গোটা কারখানাটার কোথাও-না-কোথাও তার ডাক পড়ে ; সে না হলে কারখানাটা অচল। ম্যানেজার উদ্বিগ্ন মুখে বলে—ফণি—এটাকে আজই সেরে না ফেলতে পারলে তো ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে !

ফণি সঙ্গে সঙ্গে জামাটা ছেড়ে ফেলে সবল বাহু দুখানি বের করে, যন্ত্র বাগিয়ে ধরে বসে যায়।—দেখছি আচ্ছা!

ঠুক-ঠাক ঠন-ঠন—হাতুড়ির ঘা মারে! দাঁতে দাঁতে টিপে দুই হাতে ঠেলে রেঞ্চ দিয়ে বোল্ট-নাট কষে। গা দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ে। কখনো স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মেশিনটার দিকে—ভাবে। কুলি-কামিন সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে। মধ্যে মধ্যে সভয়ে, সসংকোচে প্রশ্ন করে—মিস্তিরী!

মিস্ত্রী হেসে আশ্বাস দিয়ে বলে—থাম থাম—হচ্ছে-হচ্ছে।

ঘরে এসে ওই কথা ভাবে আর মুচকে মুচকে হাসে। বোতল নিয়ে বসে। গেলাসে ঢালে আর খায়। তার হাতে গড়া কারখানা, তাকে হঠায় কে?

এমন সময় এল যুদ্ধের বাজার। কারখানার কাজ হু-হু করে বাড়তে লাগল। ফণি খাটতে লাগল দানবের মত। একটা শেডই সে বানিয়ে ফেললে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে! তিন-চারগুণ মজুর, দিনরাত পরিশ্রম। প্রকাণ্ড উঁচু শালের খুঁটি পুঁতে মাথায় পুলি বেঁধে—সেখানে সন্ধ্যাবেলায় দড়ি টেনে উঠিয়ে দিত বড় বড় শক্তিশালী স্টোভ ল্যাম্প। নিজে সে চালের ফ্রেমে উঠে লোহার টি অ্যাঙ্গেলে ছাঁদা-ছাঁদি করে বোল্টনাট কষত।

শেডের মধ্যে বসবে বিদ্যুৎ-শক্তির যন্ত্রপাতি, নতুন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ার সরু শিখার মত তারে তারে গোটা কারখানার দেওয়াল ছেয়ে দিলে। তারপর যন্ত্রগুলোর সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র কৌশলে যোগ করলে। চালের মাথা থেকে তারের প্রান্তে ঝুলিয়ে দিলে সারি সারি আলো। পথের ধারে খুটি পুঁতে তাতেও ঝুলিয়ে দিলে আলো। তারপর একদিন সে টিপে দিলে ছোট্ট পেরেকের মাথার মত একটি যন্ত্রের মাথা। সমস্ত কারখানাটা দিনের মত আলো হয়ে গেল। শুধু শেডের ভিতরটাই নয়, কারখানাটার আশেপাশের প্রান্তর, বাংলো, মেস, এমন কি ফণির কোয়ার্টার পর্যন্ত।

ফণি উল্লসিত উচ্ছ্বাসে নেচে উঠল। ইলেকট্রিক আলো সে দেখেছে, বিজলীর ভোজবাজির কেরামতির কথা সে শুনেছে কিন্তু এমন করে হাতে-কলমে তাকে তৈরি করতে সে জানে না, কখনও দেখে নি, মনে মনে সে ওই তরুণ ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করবে স্থির করলে। তরুণটির কৃতিত্বে চাতুর্যে প্রৌঢ় যন্ত্রশিল্পী মুগ্ধ হয়ে গেল। প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে সে ইঞ্জিনীয়ারটির পিঠ চাপড়ে বলে উঠল—বহুৎ আচ্ছা! জিতা রহো ভাই!

ইঞ্জিনীয়ার দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বললে—What's that?

ফণি অপ্রস্তুত হয়ে গেল।—না—না—না! আর কিছু সে বলতে পারলে না।

কিন্তু এইখানেই ব্যাপারটা শেষ হল না। ম্যানেজারের কাছ পর্যন্ত গড়াল। ম্যানেজার তাকে ডেকে বললে—মাফ চাইতে হবে তোমাকে।

—মাফ চাইতে হবে!

—নইলে তোমাকে আমি সাসপেণ্ড করব পনের দিনের জন্যে।

ফণি মাফ চাইতে পারল না। কোনোমতে সে বুঝতে পারল না—সে কি অপরাধ করেছে। বললে—তাই করুন আজ্ঞা। মনে মনে বললে—দেখা যাক। ফণিকে সাসপেণ্ড করে কারখানা কেমন করে চলে, দেখা যাক। ইঞ্জিনে খুঁত দেখা দিয়েছে। রোজ ফণিকে এখন সেখানে হাতুড়ি ঠুকতে হয়—কোথায় কতটুকু লোহার টুকরো প্যাকিং দিতে হয়, সে হিসেব ওই ছোকরার মাথায় আসবে না।

তিন দিনের দিন কারখানা বন্ধ হল।

ফণি হাসলে মনে মনে। ওদিকে আবার কুলি-মজুররা উসখুস করছে তাদের মাগগি ভাতা চাই। কম দামে তাদের চাল-ডাল-আটা-তেল-নিমক চাই। ফণি ঠিক করলে এবার সেও লাগবে। মাতবে। থাক কারখানা বন্ধ। তাকে ডাকলে সে যাবে না। কখনও যাবে না। অচল ইঞ্জিনটা তাকে না হলে চলবে না। সে জানে। জ্বলুক শুধু আলোই জ্বলুক। নিথর নিস্তব্ধ যন্ত্রপাতি পড়ে থাক জগদ্দল পাহাড়ের মত। সে জানে যাদু। সে যতক্ষণ না বলবে ততক্ষণ পাহাড় চলবে না। কারখানা বন্ধ থাক। কুলিগুলো চিৎকার করুক মজুরির অভাবে, ম্যানেজার দিনরাত পরিশ্রম করে নিরুপায় হয়ে যাক। সে নিজে আসুক। তারপর ফণি যাবে। সে ঠেকিয়ে দেবে তার যাদুদণ্ড। অমনি চলবে কারখানা! জগদ্দল পাহাড় ঘুরতে আরম্ভ করবে, চলতে আরম্ভ করবে, ইঞ্জিন চলবে, বেল্টিং পাক খাবে চাকায় চাকায়—শ্যাফট ঘুরবে, মাটি বইবার বালতির সারি মাটি বোঝাই নিয়ে উপরে উঠবে—খালি হয়ে নামবে, গ্রাইণ্ডিং মেশিন ঘুরবে—

অকস্মাৎ শব্দ-ধ্বনিতে ফণি চকিত হয়ে উঠল। গ্রাইণ্ডিং মেশিন ঘুরছে! কারখানা চলছে! তাকে ছেড়েও কারখানা চলছে! তার হাতে গড়া কারখানা তার বিনা স্পর্শে চলছে! সে ছুটে বেরিয়ে এল, ঢুকল গিয়ে কারখানায়।

দেখলে কারখানা জনশূন্য। শুধু ইলেকট্রিক শেডে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ার। রহস্যটা এইবার সে বুঝতে পারলে। শুনেছিল—ইলেকট্রিক পাওয়ারে কারখানা চলবে। আজ চলছে। সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আর তাকে দরকার নাই। তারই হাতে গড়া কারখানা চলছে—অথচ তার হুকুম নেয় নি। কোনো দিন আর নেবে না। কেউ আর তার মুখের দিকে চেয়ে

থাকবে না। আপিসে তাকে আর কেউ ডাকবে না, মিস্ত্রী বাঁচাও বলে কুলিরা আর তার কাছে আসবে না, সিংগী প্রভৃতি ছোঁড়ার দল—তাকে দেখে হাই তুলে ঠাট্টা করবে; আর এই কারখানা—তার নিজের হাতে গড়া কারখানা—সেও তার বিনা হুকুমে চলছে; আর কোনোদিন তার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে না।···শব্দধ্বনি-মুখর শেডে ঘূর্ণ্যমান যন্ত্রপাতির মধ্য দিয়ে সে চলে যাবে। আর সে এখানে থাকবে না। কারখানাটাও আর তাকে চায় না। সে চলে যাবে।

যন্ত্রপাতির মধ্য দিয়ে সংকীর্ণ পথ। তার অত্যন্ত পরিচিত পথ। বিহ্বল মিস্ত্রীর চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল। হঠাৎ তাকে পিছন থেকে টানলে। মিস্ত্রী হাসলে।—সেই তুলু ছোঁড়া। যেতে দেবে না! না না—না—ছাড়! ছাড়! ছাড়···

বৈদ্যুতিক শক্তি-সংযোগে কারখানাটা চলার পরীক্ষা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে স্মিত-মুখে ম্যানেজার ইঞ্জিনীয়ারকে বললে—That's alright.

হঠাৎ গ্রাইণ্ডিং মেশিনের ও-দিকটায়—যেখানে স্থূল আকারের বড় বড় কয়েকটা চাকা তীক্ষ্ণ দাঁতে দাঁতে মিলে ঘুরছে—সেখানকার শ্যাফটটা ঝাঁকি খেয়ে বার-দুয়েক কেঁপে উঠল। কিন্তু সে ঝাঁকি বিরাট যন্ত্রদেহের মধ্যে বুঝবার মত স্পষ্ট নয়।

অধীরতায় অসাবধান ফণি চাকার দাঁতে ধরা পড়েছে; কারখানা তাকে ছেড়ে দেয় নি। সে তাকে গ্রাস করে নিয়েছে—তার দাঁতের দুপাশে বেয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। দাঁতের পাশে লেগে রয়েছে মাংসের টুকরো—পাশে মেঝের উপর পড়েছে হাড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরো, কিন্তু প্রচুর ফায়ারক্লের ধুলোর মধ্যে সেও মিশে গিয়েছে। নিশ্চিহ্ন করেই যেন যন্ত্রদানব ফণিকে আত্মসাৎ করেছে।

মেশিন চলছে। রক্ত শুকিয়ে গেল—চাকা থেকে চাকায় ঘুরে ঘুরে মাংস-চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেল; ফণির চর্বিতে শুধু যন্ত্রপুরীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত মসৃণ স্বচ্ছন্দগামী করে দিলে। মেশিন চলছে স্বচ্ছন্দে, শব্দের মধ্যে কান পেতে শুনলে বোধ হয় ফণির মোটা গলার গান শোনা যাচ্ছে।

ম্যানেজার বিদ্যুৎ-শক্তিতে যন্ত্রের সাবলীল গতিতে চলার ধারা দেখে বললেন—সুইচ অফ প্লিজ্!

ব্যা ধি

সূর্যোদয়ের পূর্বেই পাখীর প্রভাতী কলরবের সঙ্গে সঙ্গেই সেতারপর্ব শেষ হইয়া গিয়াছিল। তখন তানপুরায় ঝঙ্কার তুলিয়া হারাণ আচার্য সাধিতেছিল একখানি ভৈরবী। আবেশে তাহার চোখ দুটি মুদিত হইয়া আসিয়াছে। তানপুরার উপর গাল রাখিয়া সে গাহিতেছিল—চরণে চন্দন রাঙা জবা দিলে কে-রে!

রুদ্রমূর্তিতে একগাছা লাঠি হাতে ও-পাড়ার শ্যাম ঘোষাল আসিয়া বিনা ভূমিকায় হুঙ্কার ছাড়িয়া ডাকিল—হারাণে—শালা—!

তানপুরাটার স্ফীত উদরের উপর বাঁ হাতে তালি মারিয়া হারাণ তাল দিতেছিল। ফাঁকের ঘরে বাঁ হাত তুলিয়া হারাণ ইশারা করিল—সবুর।—গানটা উপভোগ্য রূপে জমিয়া উঠিয়াছিল। ঘোষাল বসিল। যথাসময়ে গান শেষ করিয়া হারাণ তানপুরাখানি সযত্নে পাশে রাখিয়া দিতে দিতে কহিল—কি?

ঘোষালের রাগের সময় বোধ করি পার হইয়া গিয়াছিল। সে কাকুতি করিয়া বলিল—হারাণ, আমার ঠাকুর?

হাতের মেজরাপটা খুলিয়া হারাণ কহিল—জানি না তো।

ঘোষাল জোড়হাত করিয়া বলিল—দে ভাই,—কোথা রেখেছিস—কি, ফেলে দিয়েছিস বল!

হারাণ বলিল—তোমার ঠাকুর তো আমি দেখেছি বাপু; আনাটেক সোনার একটা পুট-পুটে পৈতে ছিল। সে আমি হাত দিই নাই। ছুঁচো মেরে হাত-গন্ধ আমি করি না।

ঘোষাল আরও মিনতি করিয়া বলিল—তোর পায়ে ধরি ভাই, আমার তিন-পুরুষের শালগ্রাম শিলা, দে ভাই। বল—কোথায় ফেলে দিয়েছিস?

হারাণ কহিল—বিশ্বাস না কর তো কি বলি বল। সত্যিই আমি জানি না।

ঘোষাল আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না। সে রোষে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, কহিল—কুষ্ঠব্যাধি হবে, মুখ দিয়ে পোকা পড়বে। চণ্ডাল—চোর—ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে—।

হারাণ কোনো উত্তর দিল না। সে তানপুরাটা আবার কোলের উপর উঠাইল।

ঘোষাল সরোষে কহিল—দিবি না তুই? আমি পুলিশে খবর দেব—

হারাণ অবিচলিতভাবে তানপুরার তারের উপর আঙুল চালাইয়া দিল। সুর-ঝঙ্কারে যন্ত্রটা সাড়া দিয়া উঠিল।

অকস্মাৎ ঘোষাল তাহার পায়ের গোড়ায় ক্ষিপ্তের মত মাথা কুটিতে কুটিতে কহিল—মরব, আমি তোর পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

তাহার স্বর অবরুদ্ধ, চোখ দিয়া দরদর ধারে জল ঝরিতেছিল।

হারাণ বলিল—কেন মিছে আমার পায়ে মাথা খুঁড়ছ ঘোষাল? যাও না, ভালো করে সব খুঁজে পেতে দেখ না গিয়ে। গোল পাথর তো, গড়ে টড়ে পড়ে গিয়ে থাকবে। পুষ্পকুণ্ড-টুণ্ডগুলো দেখগে যাও।

ঘোষাল চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে পরম আশ্বাসের হাসি হাসিয়া প্রশ্ন করিল—পাব—পাব—, পুষ্পকুণ্ডের মধ্যেই পাব হারাণ?

—দেখই না গিয়ে।

ঘোষাল দ্রুতপদে চলিয়া গেল, হাতের লাঠিগাছটা সেইখানেই পড়িয়া রহিল। যন্ত্রটায় ঝঙ্কার তুলিয়া হারাণ এবার ধরিল একখানি বাগে-শ্রী। গান চলিতেছিল, নিশি স্বর্ণকার আসিয়া দাওয়ার উপর নীরবে বসিল। গান শেষ করিয়া হারাণ বলিল—একবার তামাক সাজ দেখি নিশি।

হারাণের ঘরদুয়ার নিশির পরিচিত, সে তামাক-টিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসিল। যন্ত্রের তারগুলি শিথিল করিয়া দিয়া কাপড়ের খোলের মধ্যে সযত্নে যন্ত্রটিকে পুরিয়া দেওয়ালে-পোঁতা পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিল।

নিশি কলিকায় ফুঁ দিতেছিল, সে কহিল—একজন খরিদ্দার এসেছে দাদা-ঠাকুর। কিছু সোনা বেচবে? দরও এখন উঠেছে—চব্বিশ দশ আনা পাকা বিকুচ্ছে।

হারাণ রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল, কোনো উত্তর দিল না।

নিশি ডাকিল—দাদাঠাকুর!

মৃদুস্বরে উত্তর হইল—না।

নিশি মৃদুস্বরে বলিল—কি করবে এত সোনা নিয়ে? আমিই তো গলিয়ে বাট তৈরি করে দিয়েছি—দেড় সের সাত পো তো হবেই। কিছু ছেড়ে দাও এই সময় বুঝলে?

—টাকা নিয়েই বা কি হবে আমার?

—জমি-টমি কেন। কিংবা দাদন-পত্র কর। এইবার একটা বিয়ে-টিয়ে কর বুঝলে। আজন্মই কি এমনি করে কাটিয়ে দেবে না কি?

হারাণ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। নিশি কলিকাটা কোলের কাছে নামাইয়া দিল, বলিল—খাও।·· আরও একটা কথা দাদাঠাকুর,—ওসব কাজ এইবার ছাড়। আর কেন? ঠাকুর-দেবতার অলঙ্কার—ও আর ছুঁয়ো না। ও হচ্ছে কাঁচা পারা—হজম কারও হয় না।

এতক্ষণে হারাণ কথা কহিল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া মৃদুস্বরেই বলিল—এই দেখ বাবা—হাত দেখ—পা দেখ, শরীর দেখ, খসেও যায় নি, রোগও হয় নি। আর নিতেই যদি হয় তবে দয়াল দেবতার নেওয়াই ভালো। ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে দেখে, ধরে না—কাউকে বলে দেয় না, চ্যাচায় না, দুঃখ করে না।···কাঠ আর পাথরের গায়ে রাজ্যের সোনাদানা—রামচন্দর!···কাল রাত্রে, বুঝলি, ওই ঘোষালদের ঠাকুরঘরে ঢুকেছিলাম। গোল একটা নুড়ি, তাকে বেড় দিয়ে একটা সোনার পৈতে! নিলাম টেনে ছাড়িয়ে, তারপর ভাবলাম, দিই ছুঁড়ে ফেলে। আবার ভাবলাম, থাক, এই পুষ্প-কুণ্ডের মধ্যেই থাক। আবারও তো পৈতে গড়িয়ে দেবে—সেইটাই হবে হাতের পাঁচ।···নে, কল্কে নে।

নিশি কহিল—আচ্ছা, এসব যে তুমি করছ—কি জন্যে করছ বল তো? না করলে সংসার, না কিনবে সম্পত্তি,—কি হবে এতে তোমার?

হারাণ বলিল—কল্কেটা পাল্টে সাজ,—ওটাতে আর কিছু নাই। তারপর গুন গুন করিয়া রাগিণী ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

নিশি আবার তামাক সাজিতে বসিল। টিকেতে আগুন ধরাইতে ধরাইতে বলিল—জিনিসগুলো যত্ন করে রেখেছ তো দাদাঠাকুর? দেখ, চোরের ধন বাটপাড়ে না নেয়!

মৃদু হাসিতে হাসিতে হারাণ বলিল—সে এক ভীষণ কেলে সাপ—ইয়া তার ফণা—আমি যে ওস্তাদ, আমাকেই বলে—দুইটি হাতের তালু পাশাপাশি যোগ করিয়া ফণার পরিধি বর্ণনা করিতে করিতে হারাণ সভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

দিন দশেক পর।

সেদিনও নিশি বসিয়া তামাক সাজিতেছিল। হারাণ কতকগুলি টুকরা টুকরা কাঠি লইয়া ছোট ছোট আঁটি বাঁধিতেছিল। নিশি কহিল,—এর মধ্যে নবগ্রহের ন-রকম শুকনো কাঠ কোথা থেকে যোগাড় করলে দাদাঠাকুর? তোমাদের দৈবজ্ঞিদের সন্ধান বটে বাপু!

হারাণ বলিল—তুইও যেমন, দেবে তো চার আনা পয়সা, তার জন্যে বনবাদাড় ভেঙে কোথায় আনন্দ-কাঠি, কোথায় এ—কোথায় তা, যোগাড় করে বেড়াই আমি। নিয়ে এলাম শুকনো ডাল একটা—তাই বেঁধে আঁটি করে দিচ্ছি। এই কি দিতাম? বছরে বছরে রায়পুরের বাবুদের বাড়ি একটা করে পার্বণী দেয়, তাই, নইলে—হ্যাঃ!

—কিন্তু দেবকার্যের জিনিস, শান্তি-স্বস্ত্যেন করবে তারা।

মৃদু হাসিয়া হারাণ বলিল—আমাকে তো সবাই জানে বাবা, জেনেশুনে সব আমার কাছেই বা আসে কেন? গ্রহের ফেরে যজ্ঞ তাদের পূর্ণ হবে না, তার আর আমি কি করব?

একটি লোক আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আজ্ঞে নব-গেরোণের কাঠ নিতে এসেছি।

হারাণ বলিল—এই যে বাবা বেঁধে বসে আছি আমি। তোমার বাড়ি রায়পুর তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পয়সা এনেছ—চার আনা পয়সা?

লোকটি একটা সিকি ফেলিয়া দিয়া কাঠ লইয়া চলিয়া গেল।

হুঁকা কলিকা হারাণের হাতে দিয়া নিশি বলিল—এ কিন্তু তোমার ভালো নয় দাদাঠাকুর, যাই বল তুমি। এতদিন বিদেশে-বিভূঁয়ে যা করেছ ধরতে পারে নাই কেউ, এবার তুমি গাঁয়েও আরম্ভ করলে? আবার এই লোক ঠকানো—

হারাণ হুঁকায় টান দিয়া বলিল—আর বুঝি জল হয় না, মেঘ ধরে গেল।—সে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। নিশি বিরক্ত হইয়া চুপ করিল। কিছুক্ষণ পর সে বলিল—ঘোষাল পুলিশে ডায়রী করেছে শুনেছ?

হারাণ বলিল—মিছে কথা। হলে এতদিন খানাতল্লাস হয়ে যেত। আর করলে তো করলে, সাক্ষী প্রমাণ তো চাই।

একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ি বাড়ির দরজায় দাঁড়াইল। ও প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া হারাণ প্রশ্ন করিল—কোথাকার গাড়ি হে?

গাড়োয়ান গাড়ি নামাইতেছিল। ছইয়ের মধ্য হইতে একটি বিধবা মুখ বাড়াইয়া কহিল—ভালো আছ দাদা?

হুঁকা-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হারাণ সবিস্ময়ে কহিল—কে রে,—হৈম? তুই হঠাৎ যে?

গাড়ি হইতে হৈম নামিয়াছিল, পিছনে তাহার বালক-পুত্র তমোরীশ। দাদার পদধূলি লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হৈম বলিল—বন্যেতে বাড়ি-ঘর সব পড়ে গিয়েছে দাদা। এমন আচ্ছাদন নাই যে মাথা গুঁজে দাঁড়াই। কোথা, কার কাছে দাঁড়াব বল? অবস্থা তো জান—ঘর যে আবার করে নিতে পারব—সে সম্বলই বা কোথা? ভগবান শেষকালে তোমারই কাছে দাঁড় করালেন আমাকে।

হারাণ কহিল—তা বেশ বেশ। তোরও তো বাপের ঘর। আয় ভাই আয়। বেশ করেছিস। তমোরীশেরই তো সব—দু-দিন আগে আর পরে।

নিশি কহিল—তা বৈকি, এ গুষ্টির অধিকারীই তো উনি।

হৈম আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে ছেলেকে ভৎর্সনার স্বরে বলিল—মামাকে প্রণাম কর তমোরীশ! ছিঃ, এত বড় ছেলে, এও বলে দিতে হবে?

কোলের কাছে ফুটফুটে ছেলেটিকে টানিয়া লইয়া হারাণ বলিল—বকিস নে হৈম, অচেনা জায়গা—আমিও অচেনা—

মৃদু অনুযোগ করিয়া হৈম বলিল—চেনা না দিলে চিনবে কি করে বল? এই তো দশ কোশের মাথায় থাকি। মলাম কি থাকলাম বোনের খোঁজও তো নিতে হয়। শেষ গিয়েছ তুমি, আমি বিধবা হলে—সে আট বছর হল। তমোরীশ তখন দু-বছরের ছেলে, কেমন করে চিনবে বল?

লজ্জিত হইয়া আচার্য কহিল, আয়, আয় ভাই, বাড়ির ভেতরে আয়।

তমোরীশকে সে কোলে তুলিয়া লইল।

গৃহিণীহীন গৃহখানিতে আবর্জনা না থাকিলেও মার্জনার পরিপাট্য নাই, অভগ্ন অবয়ব হইলেও সম্পূর্ণ নয়, গৃহের মধ্যে যে একটি শ্রীময়ী মমতা থাকে—তাহা নাই।

হৈম বলিল—মায়ের আমলে কি রূপই ছিল এই ঘরের। সেই ঘর!

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

হারাণ নিশিকে ডাকিয়া কহিল—চার পয়সার ভালো মিষ্টি এনে দে দেখি নিশি। ছেলেটা প্রথম এল—

সিকিটা হাতে লইয়া নিশি বলিল—ডাল নুন তেল কি আর কিছু যদি আনতে হয়, একেবারে আনতে দাও না।

—দৈবজ্ঞের বাড়ি রে এটা, ভুজ্যির ডাল নুন আছে। দু-পয়সার তেল আনিস বরং। আর ভাবছি—মশারি একটা চাই আবার, যে মশা এখানে। বারো আনার কমে হবে না, কি বলিস? তোর ঘরে বাড়তি নেই রে?

খিড়কী হইতে ফিরিয়া হৈম কহিল—ছি ছি দাদা, ঘাট-পাঁদাড়গুলো করে রেখেছ কি? জঙ্গলে যে মানুষ ডুবে যায়। বিয়েও করলে না—না দাদা, এবার তোমার বিয়ে দোব আমি।

আচার্য নিশিকেই বলিল—না থাকলে কি আর হবে। তা হলে আমা তাঁতীকে বলবি একটা মশারির জন্যে। নিয়েই বরং আসবি। ওর ছেলের রাশি-চক্রটা দিয়ে যেতে বলবি, কুষ্ঠী করে দেব।

নিশি বলিল—সে আমি পারব না বাবু। তুমি একটা মিথ্যে যা-তা কুষ্ঠী করে দেবে, সে পাপের ভাগী আমি হই কেন। তার চেয়ে আমি নিজে দায়ী হয়ে নিয়ে আসব। তুমি পয়সা পরে দিয়ো আমাকে।

সে চলিয়া গেল।

নিশি চলিয়া যাইতেই হৈম বলিল, একটি কাজ তুমি করতে পাবে না দাদা। তোমার পায়ে আমি হত্যে দেব। ঠাকুর-দেবতার জিনিস।

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া আচার্য কহিল—না, সে তো আর করি না।

নিশীথ-রাত্রে হ্যারিকেনটি অনুজ্জ্বল করিয়া দিয়া হারাণ খিড়কীর ঘাটে গিয়া নামিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে আলোকটিকে উজ্জ্বল করিয়া দিল। তারপর ঘাটের বাঁ পাশে ভাঙ্গিল। ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি আকন্দ গাছের তলা খুঁজিয়া বাহির করিল একটি ঘটি। সেটাকে লইয়া সে নিবিড়তর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

থানা পুলিশের সংবাদটা সত্য বলিয়াই বোধ হইল। দফাদারটা দিন দুই হইল গান শুনিবার ছলে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়া গেল।

গতরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া মানুষের চিহ্ন অনুসন্ধান করিতে গিয়া হারাণের নজরে পড়িল দুটি মানুষ।

সে চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিল—কে ?

উত্তর হইল—আমরাই গো।

আচার্য আবার প্রশ্ন করিল—আমরাই কে হে বাপু ?

—আমি রামহরি দফাদার আর সঙ্গে থানার মুহুরীবাবু! রোঁদে বেরিয়েছি।

সকালে উঠিয়া রাগিণী আলাপ তেমন জমিল না। তমোরীশ বসিয়া আছে; প্রথম দিন হইতেই যন্ত্র-ঝঙ্কার উঠিলেই সে আসিয়া বসে। নিশিও নিয়মিত আসিয়াছিল। গান শেষ করিয়া আচার্য নীরবে তামাক টানিতেছিল।

হৈম আসিয়া দাঁড়াইল। সে বোধহয় দাদার নিকট হইতে প্রথম সম্ভাষণ প্রত্যাশা করিয়াছিল। কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া শেষে সেই প্রথমে ডাকিল—দাদা!

আচার্য মুখ তুলিয়া চাহিল।

—আজ তমোরীশকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আসবে দাদা ?

হারাণ বলিল—উঁহু—আজ দিন ভালো নয়।

হৈম দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল—কাকে কি বলছ ? আমিও যে দৈবজ্ঞের ঘরের মেয়ে দাদা। দিন ভালো মন্দ—

সপ্রতিভ ভাবে হারাণ বাধা দিয়া বলিল—না,—মানে—পয়সা নেই হাতে আজ। আর ভালো দিন তো আরও আছে।

ছোট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হৈম বলিল—তাই হবে। কিন্তু বই ক-খানা কিনে দাও।

ঘাড় নাড়িয়া হারাণ বলিল—দেব।

হৈম চলিয়া গেল।

যন্ত্রগুলায় আবরণ পরাইতে পরাইতে আচার্য কহিল—তমোরীশ, ভেতরে যাও তো বাবা!

বালকের বিলীয়মান পদধ্বনির প্রতীক্ষা করিয়া হারাণ মৃদুস্বরে নিশিকে কহিল—আমার বাড়িটা কিনবি নিশি? যা হয় দাম দিস তুই। পুলিশ বড্ড আমার পিছনে লেগেছে।

নিশি চমকিয়া উঠিল। আচার্য বলিল—ভবী মিশ্রকে দিলে দুশ টাকায় সে এখুনি নেয়। কিন্তু শালা পুলিশের গুপ্তচর—ঠিক বলে দেবে। তুই নে—একশ টাকা তুই আমাকে দিস—না—একশ পাঁচ।

নিশি কহিল—দিদিঠাকরুন, তমোরীশ, এরা কোথায় যাবে?

হারাণ আর কথা কহিল না।

পরদিন সকালবেলা আর হারাণের সেতার বাজিল না। নিশি আসিয়া ফিরিয়া গেল। তমোরীশ আবিষ্কার করিল মামার যন্ত্রগুলির মধ্যে তানপুরাটা নাই।

সন্ধ্যায় নিশি আসিয়া দেখিল—হৈম বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। পাশেই ম্লানমুখে কয়খানি নূতন বই হাতে তমোরীশ বসিয়া ছিল।

নিশি শুনিল হারাণ ভবী মিশ্রকে পঁচানব্বই টাকায় বাড়ি বেচিয়া কাশী চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় কয়খানি বই তমোরীশকে দিবার জন্য দিয়া গিয়াছে।

আচার্য কিন্তু কাশী যায় নাই। সে বর্ধমান জেলা পার হইয়া মুর্শিদাবাদে গিয়া পড়িল। নিতান্ত পথে পথে যাত্রা। কাঁধে এক কম্বল, একটি পুঁটলি, হাতে তানপুরা।

একখানা গ্রামে প্রকাণ্ড দালান ঠাকুরবাড়ি দেখিয়া সে ঢুকিয়া পড়িল।

মুর্শিদাবাদ আমিরী চালের জন্মভূমি; বনিয়াদি চাল—পুরানো বন্দোবস্ত আজও এখানে নিঃশেষ হয় নাই। এ বাড়ির বন্দোবস্তও পুরানো। অতিথিকে এখানে মানুষের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে হয় না, দেবতার প্রসাদ কামনা করিয়া দাঁড়াইলেই পাওয়া যায়।

অপরাহ্ণবেলায় নজরে পড়িল বনিয়াদি চালের অভাব এখনও সেখানে নাই।

ঠাকুরবাড়ির পাশেই বাবুদের বৈঠকখানায় বড় হলে আসর পড়িতেছে, ঝাড়ে দেওয়ালগিরিতে বাতি বসানো হইতেছে।

হারাণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ছিলমচী খানসামার ঘরে ঢুকিয়া তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল। প্রকাণ্ড বড় ছিলমদানিটা কলিকায় কলিকায় ভরিয়া গেছে।

খানসামা বলিল—বড় সেতারী এসেছেন,—মজলিস বসবে আজ।

হারাণ কহিল—আমাকে শুনবার একটু সুবিধে করে দিতে হবে ভাই। —তানপুরাটা সে ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিল। সেটার দিকে লক্ষ্য করিয়া খানসামা কহিল—আপনিও কি ওস্তাদ নাকি?

আচার্য বলিল—গান-পাগলা মানুষ দাদা। ওস্তাদ-টোস্তাদ কিছু নই।

মজলিসে স্থান সে পাইল।

দুগ্ধফেননিভ ফরাসের উপর সারি সারি তাকিয়া পড়িয়াছিল। সোনা-রূপার সাত-আটটা গড়গড়া পড়িয়া আছে। রূপার পরাতে প্রচুর পানের খিলি, আতর-দানে আতর ও তুলা শোভা পাইতেছিল। দুই-তিনটা গোলাপপাশ হইতে গোলাপজল ছিটানো হইতেছিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চারিটা হাতপাখা লইয়া চারিজন খানসামা চারি কোণে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছিল। সুগন্ধি ধূপ ঘরের চারিদিকে জ্বলিতেছে। ফরাসের এক কোণে সে বসিল। প্রথমেই বিতরণ করা হইল পান ও আতর। সম্মানী-সম্ভ্রমী ব্যক্তিদের গলায় ফুলের মালা দেওয়া হইল।

তারপর আরম্ভ হইল সঙ্গীত। ওস্তাদের সুনিপুণ অঙ্গুলিস্পর্শে সেতার সত্য সত্যই গান গাহিয়া উঠিল। জোয়ারীর তারগুলির ঝঙ্কারে মানুষ, আলো, এমন কি ঘরখানার সব উপাদান পর্যন্ত যেন মোহাবিষ্ট হইয়া গেল। ঘরের জানালার গরাদেতে হারাণ হাত দিয়াছিল, সে অনুভব করিল লোহার গরাদের মধ্যেও সে-ঝঙ্কার প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সঙ্গীতের গতি দ্রুত হইতে আরম্ভ হইল, দুনে বাজনা চলিল। আঙ্গুলের ছোঁয়ায় তারের মধ্য হইতে সুরের ফুলঝুরি যেন ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

মধ্যপথেই কিন্তু সঙ্গীত শেষ করিতে হইল। যন্ত্রী তবলচীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—আপ্‌কো হাত আর নেহি চলেগা।

বাদক লজ্জিত হইয়া বলিল—আমার শিক্ষা সামান্যই।

অবসর পাইয়া খানসামা সরবত ধরিয়া দিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুরা। ফুরসি গড়গড়ার ডাকে মজলিসটা মুখরিত হইয়া উঠিল। ধুতুরা ফুলের মত লম্বা একটি

রূপার কলিকা আসিল ওস্তাদের জন্য ওস্তাদের হাত হইতে কলিকাটা ঘুরিয়া বেড়াইল।

ওস্তাদজী আবার সেতার তুলিয়া কহিলেন—আওর কোই হ্যায় সঙ্গত করনেকো লিয়ে।

মালিক মনোহর সিংহ চারিদিকে চাহিলেন, অবশেষে লজ্জিতভাবেই বলিলেন—দুসরা আদমী তো কোই নেহি হ্যায়!

হারাণ উঠিয়া পড়িল। আভূমিনত এক নমস্কার করিয়া জোড়হাতে কহিল, হুজুর—হুকুম হয় যদি, তবে আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।

গৃহস্বামী স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তারপর গম্ভীরভাবে বলিলেন,—পারবে তুমি?

ওস্তাদ কহিলেন—আইয়ে—বয়ঠিয়ে!

একজন বলিয়া উঠিল—পাগল নয় তো?

ওস্তাদ কহিলেন—কোকিল বনমে রহে বাবুজী—রঙ ভি কালা উসকা। লেকেন গানেওলাকে বাদশা ওহি।

গৃহস্বামী আতর-দানে মান্য করিয়া হারাণকে সঙ্গত করিতে অনুমতি দিলেন। সঙ্গত আরম্ভ হইল।

আচার্যের হাতে চর্মবাদ্য সেতারের সুরে সুর মিশাইল। অপূর্ব সমন্বয় সুসঙ্গত রূপে সঙ্গত শেষ হইল। ওস্তাদ যন্ত্রখানি পাশে রাখিয়া তারিফ করিয়া উঠিলেন—বহুৎ আচ্ছা। বহুত মিঠা হাত আপকা।

মালিক একগাছি মালা আচার্যের গলায় পরাইয়া দিয়া কহিলেন—ওস্তাদজীর কোথায় বাড়ি? কি নাম আপনার?

জোড়হাত করিয়া হারাণ কহিল—হুজুর আমি ভবঘুরে। গানবাজনা করেই বেড়াই। নাম আমার নারায়ণচন্দ্র রায়।

এ নামটা পথে পা দিবার সময়ই সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল।

সেতার সঙ্গতের শেষে ওস্তাদের অনুরোধে হারাণ গানও গাহিল। খুশী হইয়া মনোহরবাবু হারাণকে সুরাপাত্র আগাইয়া দিলেন।

পাত্রটি কপালে ঠেকাইয়া হারাণ সসঙ্কোচে নামাইয়া রাখিল, করজোড়ে কহিল—হুজুর, সুরের কারবারী আমি, সুরা আমার গুরুর নিষেধ।

ওস্তাদজী কহিলেন—বহুৎ আচ্ছা। সাচ্চা আদমী আপ।

মনোহরবাবু জড়িতকণ্ঠে বলিলেন—মদ না খাও, মাতলামী কিন্তু করতে হবে।

হারাণ কহিল—নাচব হুজুর? বাইজী নাচ?

চারিদিক হইতে রব উঠিল—বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা

মনোহরবাবুর আশ্রয়েই হারাণ আচার্য থাকিয়া গেল। এমনি একটি আশ্রয়ই যেন সে খুঁজিতেছিল। জীবনের চারিদিকে বিলাসের আরামে তাহার যেন ঘুম আসিল। কর্মের দায়িত্ব নাই, শুধু বাবুর মনস্তুষ্টি করিলেই হইল। বাবু ঘামিলে সে বাতাস করে, অকারণে ছিলমচী খানসামাকে ধমক দিয়া নূতন কলিকা দিতে আদেশ দেয়। মনোহরবাবু শিকারে যান, সঙ্গে হারাণ থাকে। সে অবিকল তিতিরের ডাক ডাকে, বনমধ্য হইতে তিতির সাড়া দিয়া উঠে। সন্ধ্যায় সেতার শোনায়, গান গায়, পাখীর মাংস রাঁধিয়া দেয়। রান্নাতেও হারাণের হাত বড় মিঠা। যায় না সে শুধু বাঘ শিকারের সময়। জোড়হাত করিয়া বলে—আজ্ঞে, আমার কত্তাবাবাকে বাঘে ধরে খেয়েছে। জ্যান্ত বাঘ দেখা আমাদের বংশে নিষেধ আছে।

মনোহরবাবুর জীবনে সে অপরিহার্য হইয়া উঠিল। নারায়ণ রায় ভিন্ন একদণ্ড তাঁহার চলে না। হারাণের জীবনও বড় সুখেই কাটিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে সে কেমন হইয়া উঠে। বারবার ঠাকুরবাড়িতে যায়, চারিদিকে চায়, পাথরের মন্দিরের প্রতি পাথরটি যেন মনে আঁকিয়া লয়। দ্বারের সশস্ত্র প্রহরীটাকে দেখিয়া অকারণে শিহরিয়া উঠে।

সেবার শিকারের পর্বটা প্রবলভাবে জমিয়া উঠিয়াছিল। খাঁটি আমিরী চালে সমস্ত চলিতেছে। বন্ধু, বাইজী, সঙ্গীত, সুরা, হাতিয়ার, হাতী, কিছুরই অভাব ছিল না। সন্ধ্যার পর হইতে নাচ-গানের আসর বসে। বাইজী নাচে, রায়জী সঙ্গত করে। রজনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রায়জী সঙ্গত ছাড়িয়া বাইজীর পদধূলি মাখিয়া গড়াগড়ি দেয়।

সেদিন মনোহরবাবু তারিফ করিয়া কহিলেন—বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা!

রায়জী কাঁদিয়া আকুল হইল—হুজুর আমার পরিবার বড় ভালো নাচত। আহা-হা—সে মরে গেল! দেখবেন সে নাচ হুজুর?

সাঁওতাল নাচ নাচিতে শুরু করিল সে।

সুরার অবসাদে ক্রমশ ক্রমশ উত্তেজনা কোলাহল স্তিমিত হইয়া আসিল। বাইজীর দল চলিয়া গেল। ঘুমে সব অচেতন। হারাণ উঠিয়া তাঁবুর দরজার পর্দাটা টানিয়া দিল। তারপর মনোহরবাবু পাশে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। মনোহরবাবুর নাক ডাকিতেছিল। ব্যজনের আরামে সে ধ্বনি আরও গভীর হইয়া উঠিল। পাখাখানি রাখিয়া হারাণ তাঁহার বুকে

হাত দিল। মোটা সোনার চেনটা সে খুলিতেছিল। অকস্মাৎ তন্দ্রারক্ত চোখ মেলিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে বকিতে মনোহরবাবু পাশ ফিরিয়া শুইলেন। হারাণের বুকটা গুর গুর করিয়া উঠিল।

মনোহরবাবু উঠিয়া বিরক্তিভরে কহিলেন—এগুলো রাখ তো রায়জী! এই ঘড়ি, চেন—বোতাম—বুকে লাগছে আমার।

হারাণের সর্বাঙ্গ স্বেদাপ্লুত হইয়া উঠিল।

বাবু বলিলেন—নাও না হে খুলে!

হারাণ তাঁবুর দুয়ারের দিকে তাকাইল। জাগ্রত প্রহরীর পদশব্দের বিরাম নাই। জিনিসগুলি হাতের অঞ্জলিতে আবদ্ধ করিয়া সে নির্বাকভাবে বসিয়া রহিল।

প্রভাতে মনোহরবাবু উঠিতেই সেই দুই হাতে জিনিসগুলি লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

বাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—ওগুলো তোমার বকশিক রায়জী। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে বলতে ভুলে গিয়েছি।

হারাণ ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল।

মনোহরবাবু বলিলেন—গুণী লোক তুমি রায়জী, তোমাকে এর চেয়ে ঢের বেশি দেওয়া উচিত। কিন্তু সিংহ বংশের আর সেদিন তো নেই।

হারাণ ধীরে ধীরে কহিল—আমাকে কি বিদেয় করে দিচ্ছেন বাবু?

হাসিয়া মনোহরবাবু বলিলেন—বামুনজাত কি না, দক্ষিণে পেলেই ভাবে বিদেয় করে দিল বুঝি। যাও—বলে দাও দেখি, খেয়ে দেয়েই তাঁবু ভাঙতে হবে। আজই উঠতে হবে।

গজভুক্তকপিত্থের মত সিংহবাড়ির অন্তঃসার বহুদিন হইতেই নষ্ট হইতে বসিয়াছিল। সেদিন একটা বড় মহালের নায়েব সংবাদ লইয়া আসিল—বৎসর বৎসর নিয়মিতরূপে রাজস্ব না পাইয়া জমিদার বড় রুষ্ট হইয়াছেন—অষ্টম নালিশ দায়ের করিয়াছেন। মহালের টাকা ইতিপূর্বেই আদায় হইয়া সদরে আসিয়াছে। সুতরাং এখন সদর হইতে টাকা দিয়া মহাল রক্ষা করিতে হইবে।

মনোহরবাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সদানন্দময় মুখে তাঁহার চিন্তার ঘন বিষণ্ণ ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

সদর-নায়েবকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন—ওপারের কেঁয়ে-বেটার কাছে একবার দেখে আসুন তাহলে। দশহাজার টাকা হলেই তো হবে।

নায়েব নতমুখে বসিয়া রহিল।

বাবু বলিলেন—কালই যান তাহলে। কি বলেন?

ধীরে ধীরে নায়েব কহিল—লোকটা বড় পাজী। যা তা বলে। ওর কাছে টাকাও নেওয়া হল অনেক।

মনোহরবাবু শুধু কহিলেন—হুঁ।

তারপর আবার মৃদুস্বরে বলিলেন—থাক তাহলে।

নায়েব প্রশ্ন করিল—কিন্তু অষ্টমের কি হবে?

—যাবে। কি করব—উপায় কি?

—অন্য কোথাও দেখব চেষ্টা করে?

—দেখুন। কিন্তু—।—সজাগ হইয়া তিনি নল টানিতে আরম্ভ করিলেন। নায়েব চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় মজলিস বসিল। মনোহরবাবু হুকুম করিলেন—আজ করুণ রসের গান তুমি শোনাও রায়জী। মন যাতে উদাস হয়, চোখে জল আসে।

সুরা সেদিন তিনি স্পর্শ করিলেন না।

রাত্রে মজলিস ভাঙিল। পারিষদের দল চলিয়া গেল। বাবু বাড়ির মধ্যে যাইবার জন্য উঠিলেন। হারাণ জোড়হাত করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

মনোহরবাবু হাসিয়া বলিলেন—রায়জী?

—একটা নিবেদন আছে হুজুর।

—কি বল।

—একটু নির্জন—

মনোহরবাবু আলোকধারী খানসামাটাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাহার পশ্চাতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া হারাণ কহিল—হুজুর, অভয় দিতে হবে আগে।

—কি ভয় তোমার? বল তুমি বল।

—গরীব ভিক্ষুক আমি হুজুর, আপনার অন্নে বেঁচে আছি আমি। হুজুর—আমার—আমার—

মনোহরবাবু বলিলেন—বল, ভয় কি?

হারাণের জিভটা যেন শুকাইয়া আসিতেছিল, সে কহিল—আমার কিছু টাকা আছে হুজুর—হাজার দশেক হবে বোধ হয়। হুজুরের দরকারে লাগে—

মনোহরবাবু স্থির দৃষ্টিতে হারাণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হারাণ বলিল—পরে আবার আমাকে দেবেন হুজুর।

মনোহরবাবু রুদ্ধকণ্ঠে শুধু কহিলেন—রায়।

তারপর আর তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না। অন্ধকারের মধ্যেই তিনি অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। আলোকের কথা তাঁহার আজ খেয়ালই হইল না।

হারাণের চোখ দিয়া জল আসিল। বাবুর নীরব ধন্যবাদের ভাষা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। চাকরটাকে আলো লইয়া বাবুর সঙ্গে যাইতে বলিয়া দিয়া গুনগুন স্বরে সে ধরিল একখানি বেহাগ।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে হারাণ উঠিয়া চলিল পতিত আবর্জনাভরা একটা স্থান লক্ষ্য করিয়া। নির্দিষ্ট একটা স্থান খুঁড়িয়া বাহির করিল ধাতুময় পাত্র একটা। তাহার মুখাবরণ খুলিয়া হারাণ বাহির করিল—সোনার বাট একখানি। অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণ বর্ণ ঝক ঝক করিতেছিল। সেখানা রাখিয়া তুলিল আর একখানি। সেও তেমনি উজ্জ্বল। ও-গুলি ছাড়া আরও দুইটি বস্তু ঝক ঝক করিতেছিল—সে তাহার নিজের চোখ।

সকালে উঠিয়া কিন্তু হারাণকে আর পাওয়া গেল না। তাহার তানপুরাটাও নাই।

মনোহরবাবু বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন—সে চলে গিয়েছে। আর আসবে না।

হারাণ এবার আসিয়া উঠিল কাশী।

ভাগ্যগুণে অবিলম্বে আশ্রয়ও একটু জুটিয়া গেল। পথেই সে গিরি-মাটিতে কাপড় ছোপাইয়া লইয়াছিল। গেরুয়ার উপর তানপুরা দেখিয়া লোকে তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত ভালোবাসিল। তাহার সঙ্গীত শুনিয়া ডাকিয়া তাহাকে একটা মঠে আশ্রয়ও দিল।

চারিদিকে ধর্মের সমারোহ। সেই সমারোহের আবর্তের মধ্যে পড়িয়া হারাণ যেন ডুবিয়া গেল। সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মন যেন তার পবিত্র হইয়া গেছে। দিবারাত্রি শিবনামের কলরোলের মধ্যে সে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সন্ধ্যায় যোগীরাজের স্তব করে সে ধ্রুপদ-ধামারের মধ্য দিয়া। তাহার আচারে, ব্যবহারে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গেল যেন। ইতর রসিকতা আর মুখ দিয়া বাহির করিতে কেমন লজ্জা করে। সংযত মৃদুভাবে সে কথা কয়।

এদিকে অল্পদিনের মধ্যে গানের জন্য তাহার খ্যাতি রটিয়া গেল। নানা মঠ

হইতে নিমন্ত্রণ আসিতে আরম্ভ করিল। সাধু-সন্ন্যাসীরা গানে মুগ্ধ হইয়া সাদরে কোল দিয়া বলেন—বিশ্বনাথকো কৃপা আপকো পর হো গিয়া।

হারাণের চক্ষে জল আসে। সে জোর করিয়া তাঁহাদের পায়ের ধূলি লইয়া বলে—আশিস করিয়ে মহারাজ!

কিন্তু দুটি মানুষের মুখ অহরহ তাহাকে পীড়া দেয়। তমোরীশের অসহায় কচি মুখখানি মনে পড়ে,—যখনই অনুদিত প্রাতে ঊষার-আলোয় সে সেতার লইয়া বসে তখনই মনে হয় তমোরীশ কুরঙ্গ শিশুর মত নীরবে মুগ্ধ চক্ষু দুটি মেলিয়া গান শুনিতেছে। আর মনে পড়ে মনোহরবাবুর সেই সদানন্দময় মুখ। তাঁহার সেই অবরুদ্ধ কণ্ঠের দুটি কথা—রায়, তাঁহার সেই ছল ছল চোখ—সব মনে পড়ে।

তবু সে ভগবানকে ধন্যবাদ দেয় যে তাহার অন্তরে একটা পরিবর্তন আসিয়াছে।

মঠের ফটকে বসিয়া ভিক্ষা করে এক অন্ধ। পদশব্দ শুনিলেই সে চীৎকার করে—অন্ধকে দয়া কর বাবা। বিশ্বনাথ তোমার কল্যাণ করবেন বাবা! হারাণের পদশব্দেও সে ভিক্ষা চায়। হারাণ হাসিয়া বলে—আমি রে বাবা।

ভক্তিভরে অন্ধ কহে—সাধুবাবা, প্রণাম বাবা!

হারাণ আশীর্বাদ করে।

এক এক দিন আক্ষেপ করিয়া অন্ধ বলে—আজ আর কেউ কিছু দিলে না বাবা!

—কিছু পাও নি?—একটু চিন্তা করিয়া হারাণ সেইখানে দাঁড়াইয়াই গান ধরিয়া দেয়। চারিপাশে মুগ্ধ পথিকের দল ভিড় জমাইয়া দাঁড়ায়। গান শেষ করিয়া হারাণ সকলকে অনুরোধ করে—এই অন্ধকে একটা করে পয়সা দিয়ে যান দয়া করে।

পয়সা পড়িতে থাকে। ভিড় ভাঙিয়া গেলে হাত বুলাইয়া পয়সাগুলি তুলিতে তুলিতে অন্ধ কৃতজ্ঞতাভরে বলে—বাবা—সাধুবাবা!

হারাণ অন্যমনস্কভাবে অন্ধের দিকে চাহিয়া থাকে; তারপর অকস্মাৎ দ্রুতপদে সে চলিয়া যায়।

অন্ধটা রাত্রে মাঠের মধ্যেই এক পাশে পড়িয়া থাকে। ছেঁড়া একটা কম্বল ও চামড়ার একটি বালিশ তাহার সম্বল।

সেদিন অন্ধটা বলিল—সাধুবাবা।

—কি রে?

—আমার একটি কাজ করে দেবে বাবা?

—কি ?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া অন্ধ বলিল—কাল বলব।

পর দিন চলিয়া গেল। অন্ধও কিছু বলিল না, হারাণেরও সে কথা মনে ছিল না। তাহার পরদিন অন্ধ আবার কহিল—আমার কথা শুনলে না সাধুবাবা ?

হারাণ হাসিয়া বলিল—কই, তুমিও তো কিছু বলেল না।

অন্ধ বলিল—আজ বলব।

—বল।

অন্ধ প্রশ্ন করিল—কে রয়েছে বাবা এখানে ?

চারিদিক দেখিয়া হারাণ কহিল—কই—কেউ তো নাই।

অতি মৃদুস্বরে অন্ধ বলিল—আমায় কিছু সোনা কিনে দেবে বাবা ?

হারাণ চমকিয়া উঠিল।

চামড়ার বালিশটা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া অন্ধ কহিল—তামা, রুপো বড় ভারি হয় বাবা। আগে কবার এক সাধু আমায় এনে দিয়েছিল। কিন্তু শেষকালে—

সে চুপ করিয়া গেল। হারাণের হাত পা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

অন্ধ বলিল—তার ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম বাবা।

চামড়ার বালিশটা ওপাশে সরাইয়া কনুয়ের চাপ দিয়া সে বলিল। কহিল—সাধুবাবা !

—হুঁ।

—এনে দেবে বাবা ?

হারাণ কহিল—দেব। কাল দেব।

পরদিন প্রাতে অন্ধটার কাতর ক্রন্দনে মঠের মধ্যে ভিড় জমিয়া গেল। তাহার সেই চামড়ার বালিশটা খোয়া গিয়াছে। সেই বালিশটির মধ্যেই তাহার জীবনের সঞ্চয় সঞ্চিত ছিল, কয়খান সোনার বাট, কিছু টাকা—কিছু পয়সা।

অন্ধ বার বার বলিতেছিল—সেই চোর সাধু—সেই বদমাস—

দীনতা ও হীনতার তাড়নায় গালাগালির অশ্লীলতায় স্থানটাকে কদর্য করিয়া তুলিল। বুক চাপড়াইয়া, পাথরের চত্বরে মাথা কুটিয়া নিজের অঙ্গ ও পবিত্র দেবভূমি রক্তাক্ত করিয়া তুলিল।

এর মাস চারেক পরে মনোহরবাবু একখানা পত্র পাইলেন।

বর্ধমান হাসপাতাল হইতে রায়জী পত্র লিখিয়াছে—

মৃত্যুশয্যায় শুইয়া আজ আপনাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা হইতেছে। আজ দুই মাস হইল অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া হাসপাতালে মরিতে আসিয়াছি। একবার দয়া করিয়া আসিবেন। ইতি—

আশ্রিত
নারায়ণচন্দ্র রায়

পরিশেষে হাসপাতালের চিকিৎসক জানাইয়াছেন—আসিলে সত্বর আসিবেন। এক সপ্তাহের অধিক রোগীর জীবনের আশা করা যায় না।

মনোহরবাবু রায়ের এ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার পরদিনই বর্ধমান যাত্রা করিলেন। অপরাহ্ণবেলায় তিনি হাসপাতালে হারাণের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—রায়জী!

সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া হারাণ পশ্চিমাকাশের দিকে চাহিয়াছিল। কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। বাবুকে দেখিয়া ঠোঁট দুইটি তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

বাবু কহিলেন—ভয় কি? ভালো হয়ে যাবে তোমার অসুখ।

বহুক্ষণ পর আপনাকে সংযত করিয়া হারাণ কহিল—আর না; বাঁচবার কথা আর বলবেন না। আমার জীবন যাওয়াই ভালো।

মনোহরবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

তাঁহার হাত দুটি ধরিয়া মিনতিভরে হারাণ বলিল—আমাকে মাফ করুন বাবু!

অম্লান হাসি হাসিয়া বাবু কহিলেন—সে কথা আমি কোনোদিন মনে করি নি রায়জী। তা ছাড়া তোমার আশীর্বাদে সম্পত্তি আমার রক্ষা হয়েছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হারাণ বলিল—আরও অপরাধ আমার আছে। আমি আপনাকে ঠকিয়েছি। আমি পাপী। আমার নাম নারায়ণ রায় নয়—

বাধা দিয়া মনোহরবাবু কহিলেন—জানি, তোমার নাম হারাণ আচার্য। সে থাক।

কথায় কথায় বেলা পড়িয়া আসিল। বাবু কহিলেন—একটা কথা বলব রায়জী?

জিজ্ঞাসু নেত্রে হারাণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মনোহরবাবু বলিলেন—পাপের ধনটা দিয়ে একটা ভালো কাজ তুমি করে যাও যাবার সময়।

দুই হাতে বাবুর হাত ধরিয়া ব্যগ্রভাবে হারাণ বলিল—উদ্ধার করুন বাবু,

আমায় উদ্ধার করুন। ওগুলো যেন বুকে চেপে বসে আছে আমার—প্রাণ আমার বেরুচ্ছে না।

বাবু কহিলেন—হাসপাতালেই টাকাগুলো তুমি দিয়ে যাও। এই হাসপাতালেই দিয়ে যাও।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হারাণ ধীরে ধীরে বলিল—বর্ধমান স্টেশনের ধারেই একটা ছোট বাড়ি শেষে করেছিলাম। সেই ঘরের মেঝেতে—

সে নীরব হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর আবার কহিল—এবার কটা বাঘ মারলেন?

আরও কয়টা কথা কহিয়া বাবু উঠিলেন—বলিলেন—কাল আবার আসব।

আরও একখানা পত্র গিয়াছিল তমোরীশের নামে। হৈম তমোরীশকে লইয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যার পরই তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। হৈম কাঁদিয়া কহিল—অসুখ হলে আমার কাছে গেলে না কেন?

তমোরীশকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে দুটি জলের ধারা তাহার গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ পর কহিল—তমোরীশ, আমার টাকা আছে তোকে বলে যাই।

হৈম বলিল—না দাদা, ব্যস্ত হয়ো না। ভালো হয়ে ওঠ আগে।

হৈমর মুখের দিকে হারাণ চাহিয়া রহিল।

ঔষধ দিবার সময় হইয়াছিল। একজন নার্স আসিয়া ঔষধ দিতে গিয়া রোগীর গায়ের উত্তাপ অনুভব করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। আবার সে একজন ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। অবস্থা দেখিয়া একটা ইনজেকশন দিয়া ডাক্তার কহিলেন—তোমার যদি কোনো কথা বলবার থাকে কাউকে—তবে বলে রাখাই ভালো।

হৈম কহিল—দাদা?

মুখের দিকে চাহিয়া হারাণ বলিল—নিশি কেমন আছে হৈম?

হৈম সে প্রশ্ন গ্রাহ্য করিল না, কহিল—তমোরীশকে কি বলবে বলেছিলে দাদা?

পাশ ফিরিয়া শুইয়া হারাণ কহিল—কাল—কাল বলব। ঠিক বলব।

সেই রাত্রেই হারাণ মারা গেল। হৈম, তমোরীশ কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেল।

গোটা ঘরখানা খুঁজিয়া, দেওয়াল ভাঙ্গিয়াও কিছু না পাইয়া মনোহরবাবু একটি সকরুণ হাসি হাসিলেন। সে ধনটা কিন্তু ছিল—ছিল অদূরে নিবিড় একটা জঙ্গলের মধ্যে।

গ্রামের প্রান্তে পায়রাখুপির মত ছোট ছোট ঘর, চারিদিকে আবর্জনা—কালিপড়া হাঁড়ির গাদা, ছাইয়ের রাশ, দুর্গন্ধে বাতাস বিষের মত ভারি; অধিবাসীগুলা ওই আবর্জনার মতই নোংরা, কালিমাখা হাঁড়িগুলার মতই গায়ের রঙ, দেহের কাঠামো খাপছাড়া রকমের দীর্ঘ, পায়ে মাংস নাই, মেয়েগুলাও তাই, তার উপর শ্রীহীন সাজে আরও কুৎসিত দেখায়, মাথায় খাটো চুলের যোগান দিয়া বিঁড়ের মত প্রকাণ্ড খোঁপা—তাহাতে অগুনতি বেলকুঁড়ির সারি, পরনে বাহারে পাড় শাড়ি, কিন্তু ময়লা চিট, আর পরিবার সে কি ভঙ্গি!

ছোটলোকের দল সব, সমাজে আবর্জনার সামিল, গ্রামের এক প্রান্তে আবর্জনার মতই পড়িয়া আছে।

সন্ধ্যার মুখ, কয়খানা ঘরের এজমালি আঙিনায় তাদের বৈঠক বসিয়াছে, এখানে পাঁচ-সাতজন, ওখানে চার-পাঁচজন, আর খানিকটা সরিয়া আরও দুই-তিনজন—নারী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ।

একটা দশ-এগারো বছরের ছেলে, পেটজোড়া পিলে লইয়া, বুকের হাড়-পাঁজরা একখানা করিয়া গোনা যায়, উৎকট নৃত্যের সঙ্গে মিহি গলায় ঘেঁটু গান গাহিতেছে:

সায়েব আস্তা বানালে,
ছ মাসের পথ কলের গাড়ি দণ্ডে চালালে।
সায়েব আস্তা···

একটা বিশ-বাইশ বছরের জোয়ান ছোকরা মুখে তবলা বাজাইতেছে—

গুব গুব গুবং···

আর সকলে হুঁকা টানিতেছে, গান শুনিতেছে; মেয়ের দল কিছু উচ্ছল চঞ্চল। ছেলেটা অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া গানটার শেষ কলি গাহিল—

পুল ভেঙে নদীর জলে সায়েব চিৎপটাং
ওগো তোরা, ভেসজ্জনের বাজনা বাজা,
ড্যাং ড্যানা ড্যাং ড্যাং।

মেয়েরা হাসিয়া উঠিল; পুরুষেরা মুখে বাজনা বাজাইয়া উঠিল—ড্যাটাং ড্যাটাং। তবলচীও বোল ভুলিয়া কহিয়া উঠিল, ড্যা ড্যাটাং···। গাইয়ে ছেলেটা তবলচীর মাথায় চাঁটি মারিয়া বাজনাটা শেষ করিল—ড্যাং ড্যাং—ড্যাং।

হাসির স্রোতে কৌতুকের হাওয়ায় ঢেউটা কিছু জোর উঠিল, এবার পুরুষের দলও হাসিল—কিন্তু মেয়েদের মিহি গলার তীক্ষ্ণ হাসি, মোটা গলার উচ্ছ্বসিত হাসি ছাপাইয়া উঠিল।

তবলচী ছোকরা সকলের, বিশেষ ওই নারীকণ্ঠের হাসিতে অপ্রস্তুত হইয় একটা গালি দিয়া ছেলেটার পিঠে বেশ জোরেই কিল বসাইয়া দিল, ছেলে চেঁচাইতে লাগিল, ভ্যাঁ ভ্যাঁ ভ্যাঁ···মেয়ের দল হাসিয়া এলাইয়া পড়িল।

তবলচী একজনের হাত হইতে হুঁকা টানিতে বসিল।

খানিকক্ষণ চেঁচাইয়া ছেলেটা এক হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে অপর হাতখানা বাড়াইয়া বলিল, দে হুঁকো দে, মারবি আবার তামুকও খাবি?

তবলচী বলিল, হুঁকোর ঘেটুটো বল, তবে দোব।

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আবার নৃত্য সহকারে পরমানন্দে গান জুড়িয়া দিল—

ঈশেন কোণে ম্যাঘ লেগেছে দেবতা কল্লে শুকো,
এক ছেলম তামুক দাও গো, সঙ্গে আছে হুঁকো—

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের দল মিহি মোটা, কড়া মিঠে একটা উৎকট সমাবিষ্ট স্বুরে ধুয়া ধরিয়া দিল—

ও ভাই হুঁকো পরম ধন, হুঁকো নইলে জমে না কো ভারতরামায়ণ।
ও ভাই হুঁকো······।

নিকটেরই ঙাইয়া ধরিল—

-তেরে—তাক—।

মেয়েটা মাথা সরাইয়া লইয়া মাথায় চুল বসাইতে বসাইতে গালি দিয়া উঠিল, আ মর—মর।

মেয়ের দল কৌতুকের কাতুকুতুতে হাসিয়া গড়াইয়া উঠিল।

সহসা হাসির রোল ছাপাইয়া একটা বুকফাটা আর্তস্বর ধ্বনিয়া উঠিল।

—ওরে—বাবা—আমার রে—।

দমকা হাওয়ায় আলোটা নিভিয়ে গেলে অন্ধকার যেমন প্রকট হইয়া উঠে, ঠিক তেমনি ভাবেই মজলিসের সকল উচ্ছ্বাস নিভিয়া সব যেন গুম হইয়া উঠিল—

একজন বলিল, রাখার ছেলেটা বুঝি?

আর একজন বলিল, হ্যাঁ, ওরই তো হয়েছিল। ঐ যে রাখা পড়ে আছে। রাখা, ও রাখা—। রাখা মদের নেশায় বেহুঁশ। সে গড়াইতেছিল, উত্তরে জড়িতকণ্ঠে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়া উঠিল।

ওরে শালা ওঠ, তোর ছেলেটা যে···।

রাখা জড়িতকণ্ঠে গান ধরিয়া দিল—

ছেলের তরে ভাবনা কিরে বেঁচে থাকুক ষষ্ঠী বুড়ি।

ওদিক হইতে রাখার স্ত্রীর কণ্ঠের করুণ স্বর ভাসিয়া আসিতেছিল, ওরে বাবা রে ··

ওই কান্নার সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলির মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল—মৃত্যুর কথা, গ্রামে কলেরা হইতেছে। বৈঠকের সকল চটুলতার সমাপ্তি হইয়া বিভীষিকায় লোকগুলা হাঁপাইয়া উঠিল, সকলেই যেন দিশেহারা হইয়া চুপ হইয়া গেল।

একটা মেয়ে এই নীরবতা ভাঙ্গিয়া কহিল, মা কালীর পূজো দাও, বাবা নামুনের কামাই নাই গো, রোজ দুটো তিনটে—।

আর একজন কহিল, থানাতে কলেরার ডাক্তার রইছে, তাকেই আনো না হয়।

একজন পুরুষ বিষণ্ণ বিজ্ঞতায় ঘাড নাড়িয়া কহিল, ও কিছু হবে না, ওই যা বলেছে—মা-কালী আর মনসার পূজো, আর—আর—।

চারিদিকে একটা সশঙ্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া লোকটা বিভীষিকা উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিল।

শ্রোতার দল ভাবটা বজায় রাখিয়া ফিস ফিস করিয়া কহিল, আর আর—।

লোকটা কহিল, এই—।

তবলচী ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় বলিয়া উঠিল, বল কেনে রে ছাই—।

লোকটা কহিল, এই যার বাড়িতে আগে ব্যামো হয়েচেন, তার বাড়িটো—।

সকলে আগাইয়া দিল, তার বাড়ি টো—

লোকটা ফিস ফিস করিয়া কহিল, পুড়িয়ে দিতে হবে।

তবলচী কহিল, না, তাই হয়?

একজন কহিল, কি রে মজলি নাকি, ভারি টান দেখি যে!

বক্তা কহিল, উ ছেলেমানুষের কথা ছাড়ান দাও, ও ছাই জানে। নামুনে এসে ওইখানে বাসা গেড়েচেন কিনা, ওই ইসেকপুরে কত ডাক্তোর কত বদ্যি, পূজো আচ্চা। কিছুতেই থামে না—শেষে ওই করে তবে—।

ভঙ্গি করিয়া ঘাড় নাড়িয়া সে কথাটা শেষ করিল।

একটা মেয়ে বলিয়া উঠিল, তাই দাও বাপু, ব্যামোও থামবে আর ওই হারামজাদীও জব্দ হবে, বেলের যেমন দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না।

আর একজন কহিল, বাবা মলো, ভাই মলো, দেখেছ এক ফোঁটা জল চোখে আচে? ধন্যি পরান যা হোক।—বলিয়া সে গালে হাত দিল।

আর একজন কহিল, হারামজাদী ছেনাল—

সহসা তাহার কথা ছাপাইয়া একটা নূতন সুর বৈঠকের মাঝে ধ্বনিয়া উঠিল, রাখা দাদা, রাখা দাদা!

যে কথাটা আরম্ভ করিয়াছিল সে এই ডাকটুকুর পরেই বাকীটুকু শেষ করিল, এই যে আয় দিদি, বেলে আয়, তোর কথাই বলছিলাম, আহা-হা এত মেমোতা কারু নাই বাপু, বাপ ভাই মলো তা একদিন পেট ভরে কাঁদতে পেলে না, পরকে নিয়েই সারা!

বেলে হাসিয়া কহিল, ছেনালের অমনি করণই রে বুন, আপন তেতো পর মিষ্টি, ছেনালের এই কুষ্টি।

ধরা পড়িয়া মার খাইলেও চোরের কিছু বলিবার থাকে না, সহ্য করিতে হয়; কথাটায় সব চুপ করিয়া রহিল, কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না।

তবলচী হারা কথাটার মোড় ফিরাইয়া দিল; কহিল, তোর রাখা দাদা, এখন পিতিমে ভেসজ্জন হয়ে গিয়েছে ওই দেখ—।—বলিয়া রাখাকে দেখাইয়া দিল।

হারার সহিত বেলের সদ্ভাবটা কিছু বেশি, উভয়ে বাল্যসাথী, তাই হারা কথাটা বলিতে সাহস করিল।

বেলে রাখাকে পুনরায় ডাকিল, রাখা দাদা, রাখা উঠে আয়।

রাখা তখনও পড়িয়া বিড়বিড় করিতেছিল—

ও—মা দিগম্ব—রী—না—চ—গো!
মন তুমি কি চিরজীবী—হা—হা—হা।—

জলের উপর ছায়া—সে মায়া, তার মূল্য নাই, এখনি সেখানে হাজার চাঁদের মালা, আবার তখনি মেঘের ছায়ায় থমথমে আঁধার, তা বলিয়া জল হাজার চাঁদের মালাও নয়—থমথমে আঁধারও নয়।

এই জীবগুলিও ঐ জলের মত তরল, নিজস্বহীন। রাখার গানে সকলে হাসিয়া উঠিল—পুরুষেরা নীরবে, মেয়েরা সশব্দে।

বেলে এবার রাখার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া কহিল, এ ছাই না খেলেই নয়? আয় উঠে আয়, পেঁচো তোর পেঁচো—।

একজন বিরক্তভরে কথাটা শেষ করিয়া দিল, মরেছে। তোর ছেলে মরেছে রাখা।

রাখা চোখ দুটো বিস্ফারিত করিয়া একবার কাঁদিয়া উঠিল, পেঁচো, পেঁচো —উঃ, পেঁচো আমার বড় ভালো ছেলে! তারপর ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে শুইয়া পড়িল, কয়েক মুহূর্ত পরেই নাক ডাকিতে লাগিল।

বেলে হতাশ হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, না, তোর আর ভরসা নাই। তবে না হয় চল তোমরাই কেউ ছেলেটাকে রেখে এস।—বলিয়া সে মজলিসের মুখপানে তাকাইল।

একজন প্রৌঢ়া বলিয়া উঠিল, লসো তু যেন যাস না বাবা। তোর আবার মাদুলি আছে, তোকে শ্মশানে যেতে নাই।

মুখরা বেলে হাসিয়া কহিল, তা তুও একটা মাদুলি নিলি না কেনে লসোর মা, যম এলে বলতিস—বাবা আমাকে শ্মশানে যেতে নাই, আমার মাদুলি আছে!

কথাটায় লসোর মা থ হইয়া গেল, তারপর সহসা সে চিৎকার করিয়া উঠিল, আসুক, আসুক যম, তোরও কাছে আসুক।

বেলে কহিল, যম তো আর লসোর বাবা লয় যে তু যার কাছে যেতে বলবি তারই কাছে যাবে! আর আমার কাছেই যদি আসে তাতেই বা কি? এ পথ তো সবারই আছে।

লসোর মা উগ্রচণ্ডার মত রুখিয়া উঠিয়া বেলের চৌদ্দ পুরুষকে ওই পথ ধরাইয়া দিল।

বেলে কিন্তু তবু রাগিল না, হাসিয়া কহিল, আমার চৌদ্দ পুরুষ তো ঐ পথেই গিয়েচে লসোর মা—তা নিয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়া করে করব কি বল? আর এখন ঝগড়ার সময়ও লয়। আচ্ছা, তোরা কেউ নিয়ে যেতে না পারিস, আমার সঙ্গে যেতে তো পারবি?

তবলচী হারা উঠিয়া কহিল, চল বেলে, আমি নিয়ে যাব, তু সঙ্গে যাবি চল।

বেলে পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে কহিল, না আমিই নিয়ে যাব, কাজ কি খারাপ ব্যামোর মড়া ছুঁয়ে—।

মুখরার কণ্ঠে দরদের আভাস মিলিতেছিল। হারা বলিল, স্বরটা কেমন সঙ্কোচ-জড়ানো,—মেয়েমানুষকে যে ছেলে নিয়ে যেতে নাই, আঁটকুড়ো দোষ ধরে।

বেলে হাসিয়া কহিল, শির নাই তার শিরঃপীড়ে। বেধবা মেয়ের আবার ছেলে কিরে হারা?

হারা বলিল, কোনো দিন তো সাঙা করবি।

বেলে হাসিল, কাকে রে? তোকে না কি?

হারার স্বরটা কেমন বন্ধ হইয়া গেল, তবু প্রাণপণ চেষ্টায় সে কহিল, না-না —তা তা—

বেলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিতেই সেটুকুও বন্ধ হইয়া গেল। ওই অত বড় পাথরের মত বুকখানা তীক্ষ্ণ চটুল হাস্যধ্বনিতে যেন সঙ্কুচিত হইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

বেলে চলিয়া গেল, মজলিসসুদ্ধ চুপচাপ।

পেঁচোর মা মনের ঝালটা সহসা ঝাড়িয়া ফেলিল, দেখলি দেখলি, বলি দেখলি, বোল বচন শুনলি।

যুবতী খুকী কহিল, দেখতে ভালো কি না, তাই অত—।

মেয়েটি মিথ্যা বলে নাই, এই শ্রীহীনা পল্লীর মধ্যে বেলে দেখিতে বেশ; রঙ কালোই, তবে ওই কালোর মাঝেও বেশ মেঘলা চাঁদনি রাতের মত। কালোর মধ্যে লাবণ্যের আভাস পাওয়া যায়। থাকেও সে বেশ ছিম-ছাম। হাতে এক হাত কাচের রেশমী চুড়ি, পরনে চলকো পেড়ে পরিষ্কার কাপড়, পরিবার ভঙ্গিটি ভালো; মাথায় চুলও আছে বেশ একরাশ, তাহাতে খোঁপা বেলকুঁড়ির বালাই নাই, সাদাসাপটা এলো খোঁপায় বাঁধা; সর্বোপরি তাহার ছিপছিপে দীঘল গঠনভঙ্গিটি চমৎকার, যেন পাথর কুঁদিয়া গড়া।

বেলে বিধবা, সাঙাও করে নাই। লোকে গণি-রাজমিস্ত্রীকে জড়াইয়া কত মন্দ কথা বলে। কিন্তু গোপনে, কারণ গণি রাজের তাঁবে সকলকেই খাটিতে হয়; আর সেখানে বেলের পূর্ণ অধিকার। সংসারে বেলের ছিল বাপ আর ভাই, তাহারা এ পাড়ায় মহামারী আবির্ভাবের প্রথম আক্রমণেই শেষ হইয়াছে।

খুকীর কথা শেষ হইতেই সেই পাকা ছেলেটা কোথায় ছিল, ভুঁইফোড়ের মত গজাইয়া উঠিয়া কহিল, আর হারা কেমন পীরিতে পড়েছে তা দেখলি তোরা? যা শালা যা—বেলের বাবা আর দাদা শ্মশানে খেঁটে নিয়ে বসে আছে, যাবি আর এ্যাঁ করে শালাকে ধরবে।

একটা গদগদভাবের মেয়ে ভান করিয়া আঁতকাইয়া উঠিল—ও বা—বা—রে—!

মেয়ের দল আবার হাসিয়া উঠিল।

ওদিকে পেঁচোর মা কাঁদিতেছিল, ও বাবা আমার—রে—

রাখার বৌ মরা ছেলেটার বুকে উপুড় হইয়া কাঁদিতেছিল।

সাত-আট বছরের বড় ছেলেটা বসিয়াছিল হতভম্বের মত, কোলের বছর তিনকের মেয়েটা মায়ের কান্নার সঙ্গে স্বর মিলাইয়া প্রাণপণে চিৎকার করিতেছিল। ঘরে আর জনমানব নাই, জীবন্তের মধ্যে কয়টা মুরগি ছাইগাদার উপর ঘোঁট পাকাইতেছে।

হারা ও বেলে আসিয়া রাখাদের ঘরে প্রবেশ করিল।

হারা কহিল, বেলে, আমি তো কোল থেকে নিয়ে আসতে পারব না।

বেলে ঘরের ভিতরকার ছবিটার দিকে চাহিয়াছিল, চাহিয়াই রহিল, কথা বলিল না। তাহার মনে যেন একটা ঘা লাগিল, তাহার বাপ গিয়াছে, ভাই গিয়াছে, কই তাহার প্রাণে তো এত বেদনার আকুলতা ছিল না!

এ তো কান্না নয়, এ যে প্রাণ বাহির করিবার ব্যর্থ প্রয়াস।

হারা তাহার দৃষ্টি দেখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আহা-হা মায়ের পরান—!

ঘায়ের উপর আর একটা ঘা লাগিল।

সে তো মা নয়।

বেলে মুখ বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল, কে জানে তোর মায়ের পরান! বাঁজা-সাঁজা মানুষ, ওসব বুঝিও না, তার কথাও নাই। আচ্ছা তু থাক, আমিই আনচি।

বলিয়া সে দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতর্কিত বিহ্বল মায়ের বুক হইতে ছেলেটাকে যেন ছোঁ মারিয়া ছিনাইয়া লইয়া একেবারে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। সন্তানহারা হতভাগিনী বুকখানা যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই দুই হাতে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে ছেলের জন্য ছুটিয়া আসিল। মাঝপথে হারা তাহাকে ধরিল, আর কেঁদে কি করবি বৌ ওটা তো গেলই—এখন ও দুটোকে দেখ; দেখ, দেখ, ছোটটা বুঝি ভিরমি গেল—।

হতভাগিনী ফিরিল, ছেলেটাকে তুলিয়া লইয়া তাহার সেবায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু মুখে তখনও বুকের ব্যথা ক্রন্দনের স্বরে ধ্বনিত হইতেছিল।

হারা ফিরিয়া বেলেকে কহিল, চল।

বেলের চোখ দুইটা তখনও অঙ্গারের মত জ্বলিতেছিল।

ব্যথিত হারা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার কহিল, আহা-হা মায়ের পরান।

বেলে যেন জ্বলিয়া গেল, ঝঙ্কার দিয়া বলিল, বলি আসবি, না ওই মায়ের পরান দেখবি?

দুজনে চলিয়াছিল নীরবে।

শ্মশানে প্রবেশ-মুখে বেলে মৃদুকণ্ঠে বলিল, হারা, মেয়েমানুষ এ কাজ কল্লে কি হয় বলছিলি ?

হারা বলিল, আটকুঁড়া দোষ ধরে, তা আমাকে না হয় দে।

—আমি যে এতটা লিয়ে এলাম!

—তাতে দোষ নাই, তু তো আর শ্মশানে এখনও দিস নাই!

—শ্মশানে দিলেই দোষ তা হলে ?

—হ্যাঁ, আর কাল না হয় মা-কালীর চরণন্দক খেয়ে লিস, তা হলে এটুক লিয়ে আসার দোষও খণ্ডে যাবে।—দে—আমাকে এইবার দে।

বেলে চাঁদের আলোয় ছেলেটার মুখপানে একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া হারার বুকে তুলিয়া দিল, বলিল, দেখিস, ছুঁড়ে কি আছড়ে দিস না যেন, বেশ যতন করে নামায়ে দিস।

হারা ছেলেটাকে লইয়া চলিয়া গেল, বেলে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা অশ্রুর বন্যায় বেলের বুক ভাসিয়া গেল।

বেলে মজুরি খাটে, গণি রাজমিস্ত্রীর কাছে তাহার বাঁধা খাটুনি।

রোজ প্রাতে চলকো পাড় শাড়ি পরিয়া ঝুড়ি মাথায় বেলে খাটিতে যায়, তাহার কামাই নাই; বাপ-ভাই মরিলেও সে তিনটা দিন বই কামাই করে নাই।

শ্মশান হইতে ফিরিয়া পরদিন প্রাতে বেলে কিন্তু খাটিতে গেল না।

মনটা কেমন কাঁদি-কাঁদি করিতেছিল, শরীরটাও কেমন ভার; সে সকালে উঠিয়া দাওয়ার উপর ভাম হইয়া বসিয়া রহিল।

পিসতুত বোন পরীর তিন বছরের মেয়ে রাধে একটা কাঠের পুতুল বগলে আসিয়া প্রবীণার মত বেলের পাশে বসিল।

বেলে কহিল, কি লো রাধে, মুড়ি খেয়েছিস ?

রাধে কহিল, মাছি, থেলে মুলি কাবে, আমাল থেলে বালো থেলে—বলিয়া সে ছেলেকে ঘুম পাড়াইতে বসিল—

পাকীতে দান কেলে, পাকীতে দান কেলে, খান্না দোব কিছে ?

পরী আসিয়া কহিল, এই যে মুখপুড়ী, আমি রাজ্যি খুঁজে মরি। এক কাঠের পুতুল হল ছেলে। মজা দেখবি বেলে।—বলিয়া মেয়েটার হাত হইতে কাঠের পুতুলটা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। রাধে চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া গিয়া পুতুলটা কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল, কানিন না, কানিন না, ও

মানিক ও মানিক, ও বাবা, ও বাবা, বলিয়া আদর করিয়া পুতুলটাকে দশটা চুমা খাইল।

মেয়ের বিজ্ঞতার ভাব দেখিয়া পরী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল; কিন্তু বেলের চোখ দুইটা কাল রাত্রির মত আবার জ্বলিয়া উঠিল।

মা ও মেয়ে চলিয়া গেল। বেলেও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বাড়ির বাহির হইল, পথ ধরিল গ্রামের বুড়িকালীতলার পানে।

মা-বুড়িকালী বড় জাগ্রত দেবতা। যে যাহা মানত করিয়া কালীতলার বটগাছের ঝুরিতে ঢেলা বাঁধিয়া আসে তাহাই পূরণ হয়; গাছটার ঝুরিতে বোধ হয় লাখখানেক ঢেলা ঝুলিতেছে। ঢেলার ভারে গাছটাই হয়তে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহাতে বিচিত্র কি? লক্ষগুণ মানুষের অপূর্ণ সাধের যদি ওজন থাকিত তবে সে ওই ঢেলাগুলার চেয়েও বেশি হইত।

বেলে ঝুরিতে একটা ভারি ঢেলা বাঁধিতে লাগিল।

কে পিছন হইতে বলিল, কি মানত করলি বেলে?

বেলে ঢেলা বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল, বুকের রক্ত।

উৎসুককণ্ঠে আবার প্রশ্ন হইল, কিসের তরে লো?

বেলে ঘুরিয়া দেখিল, প্রশ্নকারিণী গ্রামেরই বামুনদের মেয়ে, সে ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, বলতে নাই ঠাকরুন!

উৎসুক প্রশ্নকারিণী তাহার যুক্তি খণ্ডিয়া কহিল, সে বলতে নাই অপর জাতকে, বামুন আর দেবতা কি ভিন্ন নাকি? বরং লুকুলেই পাপ।

বেলে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ঘামিয়া উঠিল, বলিল, ছেলের তরে ঠাকরুন!

ঠাকরুন সকরুণ সহানুভূতি মাখা কণ্ঠে বলিলেন, তা বেশ বেশ, অফলা নারী আর এঁটো হাঁড়ি—দুই-ই সমান—শেষ আঁস্তাকুড়ই গতি। ছেলে নইলে আবার ঘর।—তা তোর হবে, ধর্মপথে থাকিস, সব হবে, জানিস তো, ধর্মপথে অধিক রেতে ভাত।

বেলের বুকটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। বহুকষ্টে আপনাকে সামলাইয়া সে কহিল, ঠাকরুন?

—কি লো?

বেলে বলিল, পেসাদী ফুল দুটো তুলে দাও না মা!

ঠাকরুন একটি নির্মাল্য কুড়াইয়া লইয়া বেলের হাতে তুলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তা সাঙা করলি কাকে লো?

সন্ধ্যার সময় বেলে দাওয়ার ওপর মাদুর বিছাইয়া শুইয়াছিল, কিসের অভাবের বাথায় বেলের ছলছলে জলস্রোতের মত চপল মনটা উদাস হইয়াছিল ; সে আকাশের দিকে চাহিয়া অজানা পথের কোন অনাগত পথিকের পথ চাহিয়া আছে।

গণি মিস্ত্রী আসিয়া ডাকিল, বেলে !

বঞ্চিতের মন কিঞ্চিতেও মানে, নিঃসঙ্গ বেলে গণির সঙ্গ পাইয়া যেন কিছু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, এস !

গণি বলিল, তবু ভালো, আমি বলি বা ভুলে গেলি।

বেলে কিছু ম্লান হইয়া গেল, বলিল, কাল রেতে পেঁচোকে নিয়ে শ্মশানে গিয়েছিলাম কিনা, গাটো বেশ ভালো নাই, মনটোও না ; পেঁচোর মা সারারাত সারাদিন সর্বক্ষণ কাঁদচে।

গণি বলিল, আহা-হা মায়ের পরান !

সব চুপ, কথাটা যেন হারাইয়া গেল।

শেষে গণি কথাটার থেই ধরিয়া কহিল, ওর যে ওই হবে ওতো জানা কথা, পেঁচোর মায়ের রীতি-চরিত্র তো জানিস ! অধর্মের ধন থাকবে কেনে ?

বেলে ব্যগ্র হইয়া বলিল, সত্যি থাকে না ?—তাহার মনে পড়িল ঠাকরুনের কথাটা !

গণি উত্তর দিল, তাই থাকে ? ধর্মের কল বাতাসে নড়ে—এ শাস্তোরের কথা ! তা দেখলি তো !

আবার সব চুপ।

সহসা গণি বলিল, ছাড়ান দে ও কথা। লে একটো বিড়ি খা।

বেলে কহিল, না।

আবার সব চুপ।

গণি খানিকক্ষণ একাই বিড়ি টানিয়া শেষে জমিল না দেখিয়া উঠিয়া কহিল, কাল যাস।

বেলে কহিল, না।

বিস্মিত গণি কথাটার প্রতিধ্বনি করিয়া প্রশ্ন করিল, না ? তোর হল কি বল দেখি ?—বলিয়া বেলের হাত ধরিয়া টানিল।

বেলে দৃঢ় আকর্ষণে হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, না হাত ছাড়।—বলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। ঘরের মধ্যে মেঝের উপর শুইয়া আবার আকাশ-পাতাল চিন্তা।

কিছুক্ষণ পর গণি কহিল, এই শেষ!

এতক্ষণ গণি বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। বেলে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই শান্তকণ্ঠে কহিল, বেশ।

আবার খানিকক্ষণ পর শুনিল, সেদিনের সেই খুকীর গলা, কি গো কোন দিকে?

গণির গলা পাওয়া গেল, তোকেই খুঁজছিলাম।

খুকী কহিল, ও মা—গ, কিসের নাম কি! বলে যে সেই—কালা তোর লাখ ছেনালী, রাধার ঝাঁটা খেলে তখন সুন্দরী হন চন্দ্রাবলী!

দিন কয় পরে খুকী আসিয়া কহিল, কিলো বেলে, বাড়ি থেকে বেরুস না, খাটতে যাস না, বলি বিবেগী হবি নাকি?

খুকীর পরনে আধহাত চওড়া হাতি-পাঙ্গাপেড়ে শাড়ি, হাতে একহাত সোনালী রেশমী চুড়ি, মাথায় নেবুতেল, নাকে সোনার নাকছাবি, এগুলি গণির দেওয়া নতুন উপহার। গণির কৃপা হইতে তাহার বঞ্চনার সংবাদ বহিয়া আনিলেও বেলে কিন্তু ক্ষুব্ধ হইল না।

তবু সে বাঁকা কথার উত্তর বাঁকা ভাবেই দিল—মন তো তাই বুন, আমার সিল্কের শাড়িখানা আর শাখাবাঁধাটি দেবার লোক পেছি না—তু লিবি খুকী?

খুকী ভাবিল, এ ঝাঁজ বেলের বঞ্চনার ক্ষোভের আঁচ। তাই সে ঝাঁজটা গায়ে না মাখিয়া মিষ্টি মুখেই জবাব দিল, আমারই বলে কে খায় তার ঠিক নাই, পরের নিয়ে করব কি?

বেলে হাসিল, তাহার সিল্কের শাড়িখানির উপর বহুজনের লোভের সংবাদ সে জানিত। আর এও জানিত যে, ঐ শাড়িখানির উপর লোভ হইতেই গণি পাড়ায় লোভনীয়; তাই সে কথার জবাব না দিয়া শুধু হাসিল।

কথাটা ফুরাইয়া গেল, কিন্তু খুকীর আশ মিটিল না, বেলের ঠোঁটের হাসি মিলাইল না; সহসা বেলের গলার পানে চাহিয়া সে জাঁকিয়া বসিয়া বলিল, গলায় তোর মাদুলি কিসের লো বেলে? ছেলের তরে নাকি শুনলাম?

বেলের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। সে চোরের মত চুপ হইয়া রহিল। খুকী বেশ ভঙ্গি করিয়া বলিল, তা বেশ বেশ। আহা তা হোক।

বেলে কেমন আবেশে আবিষ্ট হইয়া পড়িল; সে অনুরূপকণ্ঠে কহিল, তাই বল বুন, তাই বল। নইলে আফলা নারী আর এঁটো হাঁড়ি দুয়েরই আঁস্তাকুড় গতি।

খুকী এবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, বলিল—হবে লো হবে। তা সাঙাই আগে হোক।

বেলে স্থির দৃষ্টিতে খুকীর দিকে চাহিল, মনে পড়িল—ঠাকরুনও যে সেদিন এই কথাই বলিয়াছিলেন।

খুকী দম লইয়া হাসির গতিটা বাড়াইয়া দিয়া কহিল, আ—আমার মনের মাথা খাই—বলি সাঙাতে তোর বাত্তি কি হবে লো—ঢাক—না ঢোল!

বেলের মনে পড়িল একজনকে।

যাইতে কিন্তু বেলের পা উঠিল না, সে দাওয়ার উপর শুইয়া পড়িল; যেন মাটির বুকেই মুখ লুকাইতে চাহিল।

খানিকটা কাঁদিয়া বেলে উঠিল, আবার বসিল, আবার উঠিল; কেমন অস্থিরতায় আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু শেষে পথ ধরিল।

দাওয়া হইতে আঙিনায় নামিয়াছে এমন সময় সেদিনের সেই পাকা পাজী ছেলেটা হুঁকা টানিতে টানিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, বেলে লো।

সংকল্পের মুখে বাধা পাইয়া বেলে বড় সন্তুষ্ট হইল না; সে নীরসকণ্ঠে বলিল, কি?

ছেলেটা হুঁকা টানিতে টানিতে ভূমিকা করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল।

হঠাৎ হারা আসিয়া ডাকিল, বেলে!—সেই স্বর, সঙ্কোচ—শঙ্কায় মাখামাখি।

ছেলেটা পালাইল।

বেলের কথা ফুটিল না, শুধু যেন সে একটা রুদ্ধ কম্পনে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, চোখ দুইটা কেমন যেন চকচক করিতেছিল। কিন্তু সে দৃষ্টির দীপ্তি নয়, জলের উপরে আলোর খেলা।

হারা আবার কহিল, বেলে, সত্যি তুই সাঙা করবি?

কথাটা হারার—

তবু বেলে কথা বলিল না।

হারা কহিল, বেলে, আমি তোকে মাথায় করে রাখব।—

হারা আর বলিতে পারিল না, বলিবার সময়ও পাইল না, বেলে কাঁপিতেছিল—হারা তাহাকে আপনার বুকের কাছে টানিয়া লইল।

সহসা বাইরের দরজার আড়াল হইতে পাকা ছেলেটার মুখখানা উঁকি মারিল—সে উলু দিয়া উঠিল। বলিল, বর বড় না কনে বড়?—হারা সরোষে ছেলেটাকে তাড়া করিতে গেল কিন্তু বেলে গমনোদ্যত হারাকে বাহুপাশে বাঁধিয়া কহিল, না—না—

বেলে ও হারাতে সংসার বাঁধিল।

নতুন জীবন, বেলে ও হারার সুখেই কাটিতেছিল।

কিন্তু দীপ্ত দিনের আলোর মাঝখানে আঁধার বাস করে ছায়ার আকারে।

রথের মেলা।

বেলে হাসিয়া হাত পাতিয়া বলে, আজকে যে রথের মেলা—মেলা দেখব, পয়সা দাও।

হারা পয়সার বদলে টাকাটা গুঁজিয়া দেয়। বেলে সোহাগের সুখে ঢলিয়া পড়ে।

মেলা হইতে ফিরিয়া হারাকে বলে, কই, কি আনলে দেখি ?

হারা বলে, আগে তোমার দেখি !

বেলে দেখায়—ঝুমঝুমি, বেলফুল, কাঠের ফুল, ঝিনুক, বাটি, হারার ভাত খাইবার জন্য একখানা থাঁদা পাথর।

হারার ঠোঁটের ডগায় সুখের কৌতুক মিলাইয়া যায়—গুমোটের ছায়া দেখা দেয়।

এবার বেলে বলে, তোমার দেখি !

হারা পুঁটলিটা আগাইয়া দেয়, খুলিয়া দেখাইবার আগ্রহ তখন আর তাহার নাই; বিভোরা বেলের মনে কিন্তু এ অসন্তোষ ধরাই পড়ে না, আপনার আগ্রহে সে আপনি খুলিয়া দেখে—মাথার তেল, আয়না, চিরুনি, খোঁপার কাঁটা, চুড়ি, আরও কত কি।

সে জিনিসগুলা ঈষৎ ঠেলিয়া বলে, খোকার কই ?

হারা একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, খোকা কই ?

বেলের অসন্তোষ বাড়িয়া গেল, বলিল, হবে তো।

হারা চুপ করিয়া থাকে, একটুক্ষণ পরে উঠিয়া যায়, ভালো লাগে না। সর্বক্ষণ খোকা, খোকা, খোকা !

বেলে আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে ঝুমঝুমিটা নাড়ে, খেলাফুলটা ঘুরাইয়া দেখে, অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গুনগুন করিয়া সুর করিয়া ছড়া ধরে,—সে সুর গায়কের কণ্ঠে ফোটে না, শিল্পীর দক্ষতার সংস্থান হয় না, তাহাতে বাঙলার মাতৃকণ্ঠের চির-নিজস্ব করুণ মধুর একটানা ঘুমভরা সুর,—

আয় রে খোকন ঘর আয়,
দুধমাখা ভাত কাকে খায়;

কাজল নাতায় কাজল শুকায় মায়ের চোখে জল,
বুক ভাসিয়ে ক্ষীরের ধারা ঝরছে অবিরল।

কর্ম এক, কিন্তু কাম্য পৃথক—এমন প্রায়ই দেখা যায়, গাছ লাগাইয়া কেহ চায় তার ফুল, কেহ চায় তার ফল ; হারা ও বেলের ঠিক তাই ঘটিয়াছিল, হারা চাহিয়াছিল ফুল, আর বেলে চাহিয়াছিল তার ফল।

এমন মতান্তরে মনান্তরই ঘটিয়া থাকে, তবে মনের আগুন সহজে বাহিরে আসিতে পায় না ; কিন্তু যেদিন আসে সেদিন আগ্নেয়গিরির মতই বিপর্যয় ঘটাইয়া অগ্ন্যুদ্গার করিয়া থাকে, ঘটিলও তাই।

একদিন কৌতুকের মাত্রা দীর্ঘ করিয়া বেলে ঘাড় দুলাইয়া কহিল, তুমি বল দেখি হল কি ? দেখব তুমি কেমন ?

হারা বিরক্ত হইয়া উঠিল।

বেলে আজ হারার বিরক্তি গ্রাহ্যই করিল না। পুলকিত হইয়া বলিল, সত্যি সত্যি।

হারা জিজ্ঞাসু-নেত্রে বেলের পানে চাহিল। কোন জাদুতে যেন বেলের মুখ-চোখের কৌতুক মিলাইয়া গিয়া লজ্জার অপূর্ব এক মাধুর্য ফুটিয়া উঠিল।

হারা কিন্তু নির্বাক হইয়া রহিল। মনে হইল বেলে তাহার যেন পর হইয়া গেল।

যে অর্থ সঙ্গীতে অস্পষ্ট, ভঙ্গিতে তাহা যেমন সুস্পষ্ট হইয়া ফুটে, মনের ভাবও তেমনি কথায় ধরা যায় নাই কিন্তু সে তাহার নীরবতার মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। বেলেও গম্ভীর হইয়া গেল, কহিল, চুপ করে রইলে যে ?

—কার সঙ্গে মারামারি করব ?

বেলে বলিল, মারামারি করবে কেনে ? মারামারির কথা তো এ নয়, ছেলে হবে সুখের কথা।

এবার বাঁধ ভাঙ্গিল।

হারা কথার সুরে বিষ ঢালিয়া দিয়া কহিল, না সুখের কথা নয়, গাটা গদগদ করচে না আমার ! গরীবের আবার ছেলে কেনে রে বাপু ? এ বাজারে খোঁজ এখন দুধ রোজ ; মরতেও জায়গা পায় না সব।

এক মুহূর্তে বেলে বিজলীদীপ্তির মত দীপ্ত হইয়া উঠিয়া বাজের মতই হাঁকিয়া উঠিল, হারা, বেরো আমার বাড়ি থেকে।

বেলের কথাটা সেই মুহূর্তে হারার বড় বাজিল, সারা বুক জুড়িয়া ধিক্কারের সুরে বাজিল, হায় রে নারীর গৃহবাসী পুরুষ !

হারা মুখ তুলিয়া একবার চাহিল, কিন্তু কিছু কহিতে পারিল না ; আবার মাথাটি নত করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বেলের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না, সে মনে মনে শতবার বলিল, ষাট ষাট ! বার বার বুকের মাদুলিটা মাথায় ঠেকাইল।

হারা শুধু বেলের বাড়ি হইতেই চলিয়া গেল না, গ্রাম ছাড়িয়াই কোথায় চলিয়া গেল। একদিন, দুইদিন, ক্রমে মাস চলিয়া গেল, তবু সে ফিরিল না। বিরহের দিনে বেদনার ওজনে ধ্যানের গভীরতায় মানুষের উপলব্ধি হয় হারানো ধনের কি মূল্য, কতখানি সাধনার ধন ছিল সে।

হারাকে বেলে বুঝিল সে তাহার কে, তাহার কতখানি জুড়িয়া সে ছিল। ভাতের হাঁড়ি আধখানা খালি, বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করে, বিছানা আধখানা খালি পড়িয়া থাকে, রাত্রে ঘুম আসে না ; সে আসিবে এই লইয়া কত কল্পনার জাল বুনিয়া রাত্রি কাটিয়া যায়। অন্তর নিরন্তর বেদনায় ফাটিয়া পড়িতে চায়।

শুধু তাই নয়, সেই পাকা ছেলেটা মধ্যে মধ্যে বুক ফুলাইয়া আসে, হাসে, ছড়া কাটে—

রাঙ্গা পেড়ে শাড়ি দিব শঙ্খ দিব রাঙা,
সুন্দরী লো কর না আমায় তিন নম্বর সাঙা।

মুখরা বেলে হারার অভাবে কেমন হইয়া গিয়াছিল, নহিলে মুখরা বলিয়া বেলেকে এ পাড়ার সকলে ভয় করিত ; সে সত্যই কিছু বলিতে পারে না, সহ্য করিয়া যায়।

কতজনে পথে-ঘাটে কত কথা বলে, সব সহিতে হয়। মনে হারার অভাব প্রবল হইয়া উঠে, আপন ঘরে কাঁদিয়া সে বুক ভাসায়। খুকী, লসোর মা তাহার দুর্দশায় কত 'আহা' বলে কিন্তু সুরের ফেরে, কি বেলের মনের ফেরে, কে জানে, সেগুলি 'বাহা' বলিয়াই মনে হয়। আবার কতজন তাহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়াও বলে, আহা কি করবি বল, যারে ভাতারে করে হেলা, তারে রাখালে মারে ঢেলা।

মনের সব কথা, সে যত ব্যথারই হউক না কেন, মুখ ফুটিয়া বলা যায় না ; বেলে কাঁদিল হারার জন্য কিন্তু বিলাপের মধ্যে মরা বাপ-ভাইকে ডাকিয়া কাঁদিল, ওগো বাবা গো, ওগো দাদা গো—আমাকে সঙ্গে লাও গো।

পড়শীরা কেহ কহিল, আহা !—কেহ কহিল, দুখ কত্তেই তো আসা মা,

কেঁদে কি করবি বল !—খুকী কহিল, ঢঙ !—লসোর মা কহিল, বাপ ভাইয়ের আজ সগ্‌গ হল !

ওদিকে সম্বল শেষ হইয়াছে। অনাহার আরম্ভ হইল। এক দিন। দুই দিন। পেটের জ্বালায় ভাবিয়া চিন্তিয়া বেলে শেষে গৃহস্থের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

—ঠাকরুন, লোক রাখবে ? ঝি ?

ঠাকরুন তাহার আপাদমস্তকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাইয়া বলিলেন, না।

সে আবার অন্য দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইল ; এ ঠাকরুন এক কথায় সংক্ষেপে প্রত্যাখ্যান না করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, এই অবস্থায় তুই কাজ করবি কি করে লো ?

বেলে চুপ করিয়া রহিল।

ঠাকরুন বলিল, বসে ভাত তো কেউ দেবে না মা, আর তো কটা মাস, কোনো রকমে চালা, তারপর আসিস, দেখব। হারা ছোঁড়া বুঝি পালিয়েছে ?

বেলের চোখ দিয়া দু ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, সে কথা কহিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, হ্যাঁ।

ঠাকরুন কহিলেন, নরকে ঠাঁই হবে না ছোঁড়ার, তাও বলি আবার, ভগবানের বিচার নাই, আমি কত দেবতাই সাধলাম, তা একটা হল আমার ? তা না, যাদের আজ খেতে কাল নেই, তাদের ঘরে ছেলে বেঙাচির মত কিলবিল করছে। গরীবের আবার ছেলে কেনে রে বাপু ? কথাতেই আছে :

বড়লোকের বিটি বেটা
গরীবের ও পেটের কাঁটা !

নাই নাস্তিকের ঘর
সকাল বেলায় দুধ রে,
রোগ বলে তার ওষুদ রে।

আর রোজগার করতে শিখলেই তো মা-বাপের সঙ্গে ভিন্ন-ভাতে পাড়াপড়শী।

পুড়িবার জন্য মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, আগুনের আঁচের আভাসেই দূরে সরিয়া যায়। বেলে আর শুনিতে পারিল না, ত্রস্তপদে একরূপ ছুটিয়াই পলাইল।

অনাহারে কয়টা দিন মানুষ থাকিতে পারে ? অবশেষে বেলে সকালে পুরানো ঝুড়িটা মাথায় করিয়া বাহির হইল। কুচকাওয়াজের পায়ের আওয়াজের

মত মেয়ের দলের কোপাগুলা একসঙ্গে পড়িতেছে খট্ খট্ খট্ খট্ ঐ আওয়াজের তালে তালে সমবেত কণ্ঠেই গান চলিতেছে—

কালা বিনে হলাম কাল,
কালোর গুণ আর বলব কত!

সাথে সাথে কর্নির আওয়াজ ঠুন-ঠুন, ঠন-ঠন।

বেলে আসিয়া তাহাদের একপাশে দাঁড়াইল। সকলের আগে খুকীর নজর পড়িয়াছিল, তাহার দিকে সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাসিয়া বলিয়া উঠিল, রাজ, রাজ, রানী এসেছে গো, রানী এসেছে।

গণি মুখ ফিরাইয়া দেখিল, বেলে। হাসিয়া হাতের কাজ ফেলিয়া কানে-গোঁজা পোড়া বিড়িটা ধরাইয়া কহিল, কোন রানী রে কোন রানী, চাক, ছুতো, না মেথ?

গান ছাড়িয়া মেয়ের দল হাসিয়া উঠিল।

খুকী খোঁচা দিয়া কহিল, না গো না, রাজরানী গো, রাজরানী!

মেয়ের দল এবার হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বেলের পায়ের তলা হইতে মাটি যেন সরিয়া যাইতেছিল, মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করিতেছে।

গণি চট করিয়া ফতুয়ার পকেট হইতে একখানা ছোট টিনের আরশি বাহির করিয়া বেলের মুখের সামনে ধরিয়া বলিল, তুই বল কেনে ভাই, এই রূপে কি রানী হয়?

বেলে দেখিল তাহার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানা যেন ক্রমাগত লম্বা হইয়া যাইতেছে। সে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া ইটের গাদার উপর পড়িয়া গেল।

বেলে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল সে আপনার ঘরে।

শরীরটা কত হাল্কা, কিন্তু দুর্বল, সর্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা।

সত্থ দাই কহিল, আঃ, চেতন হয়েছে বাঁচলাম!

দাইকে দেখিয়া বেলের বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল।

দাই বলিল, ওই কাজই কি করে মা, ন মাস দশ মাসে কি খাটুনি খাটতে যায় লোকে? কি হল বল দেখি ইটের উপর পড়ে? আজ দুদিন পরে চেতন হল।

বেলের বুকের স্পন্দন বাড়িয়া গেল, হ্যাঁ—তাই তো দেহখানাও যে কত হাল্কা—, বেলে কোলের কাছে হাত বাড়াইল।

কই ? কই ? সে কাঁদেই বা কই ? আর্তস্বরে বেলে কহিল, দাই-মা, আমার ছেলে ?

দাই কহিল, পেটের কাঁটা খসেছে, তুই বাঁচলি এই ঢের, আবার হবে, ভয় কি ? খোকা তোর বেড়াতে গিয়েছে।

এই বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ বেলে জানিত, সে অস্ফুট আর্তনাদে আবার জ্ঞান হারাইল।

প্রায় মাসখানেক পর।

দুজন পথিক সন্ধ্যার মুখে গ্রামের দিকে আসিতেছিল, একজনের পিঠে একটা বোঁচকা, হাতে একটা রঙিন কাগজের বাক্স, তাহার গতিটা কিছু অস্থির, যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

অপর জন কহিল, তাহলে তো খুব ভালো বলতে হবে, মাসে পঁচিশ-ত্রিশ টাকা রোজগার !

সে বলিল, দেখ কেনে, খেয়েছি দিয়েছি, আর পাঁচ মাসে তা শ খানেক জমেছে। কলে কি পয়সার অভাব ভাই ?

অপর জন বলিল, আমিও এবার সঙ্গে যাব তোমার। কবে যাবে তুমি ?

সে বলিল, যেতে আমার দেরি আছে, একখানা ঘর তুলব, তার আগে আর যাচ্ছি না !

অপর জন বলিল, তখনি যাব না হয়, কিন্তু কি করে খবর পাব আমি ? পাঁচ কোশ তফাতে থাকি।

সে বলিল, খবর নিও।

অপর জন বলিল, তোমার তো এই গাঁয়ে বাড়ি ? কি নাম ভাই—খোঁজ নেব।

সে কহিল, হারা বাউড়ী।—এই বলিয়া সে পথ ভাঙ্গিল।

অপর জন বলিল, পথটা ভালো নয় হে, টুকচে ঘুরেই যাবে চল।

হারা কহিল, কেনে ?—সে একটু হাসিল।

অপর জন কহিল, কি জানি ! কি বলে সব ভাই এ ধারের লোক !

হারা কহিল—তা হোক, এই তো সন্ধ্যেবেলা।—বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

তাহার মন আর মানিতেছিল না। আজ পাঁচমাস পর সে ফিরিতেছে বেলেকে দেখিবে, আর—আর একখানি কচি মুখ !

দীর্ঘদিনের অদর্শনে মিলনের তৃষ্ণায় তাহার ভ্রম কাটিয়াছে, সে বুঝিয়াছে সে ও বেলের মাঝে যাহাকে কঠিন বাধা ভাবিয়াছিল সে বাধা নয়, সে

কোমল ফুলের মালা। দুটি মিলনোন্মুখ হিয়ার মধ্যস্থলে চিরদিন তার বাস।

শ্মশানের গা ঘেঁষিয়া পথ।

সন্ধ্যার আবছায়ায় স্পষ্ট না হউক তবু সব দেখা যায়—ঐ দুইটা ন্যাড়া তাল গাছ, কয়টা পোড়া কাট, ঐ কয়টা কুকুর—কি শেয়াল, ঐ একটা—ওটা কি? মানুষের মত?

হারার সর্ব শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল। তাহার গতি যেন রুদ্ধ হইয়া গেল, সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

প্রথম ভয়টা কাটিতেই হারা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আপন মনেই হাসিল। মনে পড়িল, কতদিন রাত্রে এই পথ ধরিয়া গিয়াছে, কতদিন রাত্রে শ্মশানের বুকে আসিয়াছে।

শ্মশানে আসার কথা মনে হইতেই হারার মনে পড়িল একটা রাত্রির কথা—রাধার ছেলেটা বুকে বেলে ও সে!

সহসা কথার গুঞ্জন কানে আসিল, ওরে আমার ধন ছেলে, এই পথে বসে কাঁদছিলে—

তাহা হইলে মানুষই তো!

একটা অদম্য কৌতুহলের আকর্ষণে হারা শ্মশানের বুকে চলিল,—দেখিল ছিন্নবস্ত্র রুক্ষকেশ শীর্ণ কঙ্কালাবশেষা এক যেন মেয়ে একটা সদ্যমরা ছেলেকে শত আদরে অজস্র চুম্বনে যেন তাহার অভিষেক করিতেছে আর গাহিতেছে,—

মা মা বলে ডাকছিলে, গায়ে ধুলো মাখছিলে,—

সন্ধ্যার ম্লান আলো তখনও সম্মুখে ঝিকিমিকি করিতেছিল। হারা হেঁট হইয়া মেয়েটির মুখের দিকে চাহিল।

তাহার সর্বশরীর অবশ হইয়া গেল, হাত হইতে কাগজের বাক্সটা পড়িয়া ডালা খুলিয়া গড়াইয়া পড়িল—রঙিন ছিটের কয়টা ছোট জামা, জরির টুপি, ঝুমঝুমি, বাঁশী, কয়গাছা রূপার চুড়ি, কোমরের বিছে, অমনি আরও কি কি। হারা উন্মাদের মত চিৎকার করিয়া উঠিল, বেলে বেলে।

জীবন্তের রাজ্যের আহ্বান বুঝি মরণের দ্বারপ্রান্তবাসিনী নারীটির কানে পৌছিল না, সে তখনও আপন মনেই গাহিতেছিল—

সে যদি তোমার মা হত,
ধুলো ছেড়ে তোমায় কোলে নিত—
তাহলে তো আমার বুকে আসতে না
মা মা বলে হাসতে না।

হিন্দু আমলের অক্ষয়পুণ্য-মহিমান্বিত একটি স্নানঘাট। গঙ্গা এখানে দক্ষিণ-বাহিনী। রাঢ়ের বিখ্যাত বাদশাহী সড়কটা বরাবর পূর্বমুখে আসিয়া এই ঘাটেই শেষ হইয়াছে।

সড়কটির দুই পাশে ঘাটের ঠিক উপরেই ছোট্ট একটি বাজার। বাজার মানে খান কুড়ি-বাইশ দোকান—খান কয় মিষ্টির, দুখানা মুদির, ছ-সাতখানা কুমোরের—মণিহারী, পানবিড়ি তো আছেই। ঘাটের একেবারে উপরে জন-দুই গঙ্গাফল, অর্থাৎ কলা ও ডাব বিক্রয় করে।

বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীর সমাগমে ছোট বাজারটিতে তিলধারণেরও স্থান থাকে না। চীৎকারে, গুঞ্জনে সারা বাজারটা গম গম করে, যেন একটা মেলা। অস্তায়মান সূর্যের সঙ্গে যাত্রীরা যে যাহার পথে চলিয়া যায়। অন্ধকার জনহীন বাজার খাঁ-খাঁ করে। তখন দু-দশজন আগন্তুক যাহারা আসে—তাহারা শ্রান্ত শব-বাহকের দল। শব সৎকার করিয়া ভাগ্যহীনেরা ভাড়াটে ঘরের বারান্দায় আসিয়া দেহ এলাইয়া দেয়। ক্লান্তিতে, শোকে কেহ বা ঘুমায়, কেহ বা নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়, ফোঁটাকয় জলও কাহারও চোখ হইতে হয়ত গড়াইয়া পড়ে। আকস্মিক দুই-চারিটা কথা মাঝে মাঝে উঠিয়া পড়ে, মৃত কিংবা মৃত্যুকে লইয়া। ঠিক যেন জলবুদ্বুদের মত, দুই-চারিটা পর পর উঠে, মিলাইয়া যায়, আবার নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা থম থম করে।

মোটকথা বাজারের কোলাহল তাহারা বাড়ায় না।

তখন যা-কিছু সাড়া, যা-কিছু চাঞ্চল্য, সে শুধু দোকান কয়টির। দোকানীরা আপন আপন দোকানে বসিয়া সমস্ত দিনের লাভ-লোকসান কষে, মুখে হাসি-গল্প চলে, হাতে কাজ করিয়া যায়।

শেষ কার্তিকের একটি শীতকাতর সন্ধ্যা।

বিড়ির দোকানদার ছকু বিড়ি পাকাইতেছে। কোথাকার মেলা-ফেরৎ কালীচরণ আপন দোকান সাজাইতে ব্যস্ত। পাশে কুমোর বুড়ো কি একটা গড়িতেছিল, হাতে ময়দার মত মাটির নেচী। নেচী হইয়া উঠিল ডম্বরু। নিপুণ আঙুলের চাপে দেখিতে দেখিতে সেই ডম্বরুটির প্রান্তে গড়িয়া তুলিল দুটি কান,

মধ্যে লম্বা চেপ্টা মুখ, পিছনে বাঁকানো লেজ, নিচের দিকে চারিটি পা। সমস্ত মিলিয়া হইয়া উঠিল একটি ঘোড়া। পাশের লম্বা পিঁড়িখানার উপর একটির পর একটি করিয়া পক্ষিরাজের বাহিনী সাজাইয়া তোলা হইতেছিল।

কুমোর বুড়োর দোকানের সম্মুখেই রাস্তার ওপর বামুনদের মেয়ে কুসুমের ঘর। আপন চালাঘরের বারান্দায় হ্যারিকেনের আলোয় মাদুর বুনিতে বুনিতে কুসুম গল্প করিতেছিল কুমোর বুড়োর সঙ্গে। মেয়েটি অল্পবয়সী, বেশ শ্রীমতী, কিন্তু ভাগ্য বড় মন্দ। তিনকুলে কেহ নাই, বাউণ্ডুলে স্বামী। মাদুর বোনা-ই বেচারীর জীবিকা। রোজই এমন গল্প চলে—সুখদুঃখের কথা, হাসির কথাও দুই-চারিটা হয়। এক একদিন কুমোর বুড়ো উপকথা বলে, কুসুম কাজ করিতে করিতে হুঁ-হাঁ করিয়া যায়। কুমোর বুড়ো থামিলে বলে—তারপর ?

পাল বলে—তারপর বুড়ো কর্তার বকে বকে গলা শুকোয়, তার তামাক খেতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু নাতনীর তা সহ্য হয় না।

নাতনী কৌতুকে হাসিয়া উঠে।

ও-পাশে মুদীর দোকানে একটা দাবা টাকা লইয়া সেদিন বাজনা পরীক্ষা চলিতেছিল। খরিদ্দারের ভিড়ে কে কখন ঠকাইয়া গিয়াছে। পাশের দোকানীরা কেহ বলিতেছিল চলিবে, কেহ বলিতেছিল, না। মুদী বারবার টাকাটা সজোরে আছড়াইয়া আওয়াজ বাড়াইতে চাহিতেছিল, কিন্তু সেটা ঠন করিয়া সাড়া আর দেয় না।

পাশের দোকানী বিড়িওয়ালা ছকুর বাবা দ্বিজদাস কহিল—ঠ্যাঙালে চীৎকার বেরোয়, সুর বের হয় না ভাই ; ও তুমি গঙ্গার নামে খরচ লিখে হাত ধুয়ে বস।

দ্বিজদাসের কথাটা মুদীর ভালো লাগিল না। সে আপন মনেই গালি দিল বঞ্চককে—কোন শালা গঙ্গাতীরে এমন বঞ্চনা করে গেল বল দেখি—পুণ্যি করতে এসে ?—

রসান দিয়া দ্বিজদাস কহিল—ফল হাতে হাতে পেয়েছে সে, টাকার ষোল আনাই তার লাভ।

ওদিকে কান দিতে গেলে দুঃখের বোঝা ভারি হয়। মুদী শাপ-শাপান্ত করিয়া আত্মপ্রবোধ দিল,—যা—যা গঙ্গাতীরে বঞ্চনা যেমন করলি, তেমনি নরকে যাবি, নরক হবে তোর। আমার না হয় ষোল আনাই গেল।

আবার ক্ষণপরে কহিল—তা বারো আনায় চলে যাবে, রানীমার্কা বটে, কি বল দাস ?

দাস নীরবে হাসিল, সেদিন তারও ঠিক এমনি হইয়াছিল

সম্মুখে মেঘলা আকাশের বুক হইতে মাটির কোল পর্যন্ত অখণ্ড নিবিড় অন্ধকার। নিম্নে আপনার গর্ভে মৃদুস্বরা গঙ্গা রুপার পাতের মত চকচক করিতেছে। ঘাটের উপরেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটার কোনও কোটরে বসিয়া একটা পেঁচা চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। তার তীক্ষ্ণ কর্কশ রবে সর্বাঙ্গ শিরশির করে।

গঙ্গার মৃদুধ্বনি ছাপাইয়া কখনও কখনও দাঁড় ছপছপ করিয়া নৌকা চলে কাটোয়ার বাজারের দিকে। নৌকার সঙ্গে চলে তার বুকের ক্ষীণ আলোক, গঙ্গার বুকে চলে তার তরঙ্গকল্পিত প্রতিবিম্ব। দূর শ্মশানঘাটে রোল শোনা যায়,—বল হরি, হরি বো—ল!

মুদী কহিল—আর এক নম্বর এল, দাস।

দাস গম্ভীরমুখে কহিল—খাতাটা কই রে ছকু?

ছকু খাতাখানা বাপের হাতে দিল। খাতা লইয়া দাস শ্মশানের দিকে চলিয়া গেল।

শ্মশান-ঘাট এবার দ্বিজদাস ডাকিয়া লইয়াছে। জমিদারকে বার্ষিক জমা দিতে হইবে এগারশ টাকা—সে নিজে আদায় করে প্রতি শবে শ্মশান-জমা ৫ টাকা এক আনা।

মুদী কহিল—তোদের কপাল ভালো রে ছকু। এবার আসছে খুব।

কথাটা ছকুর তত ভালো লাগিল না, সে উত্তর দিল না, বিড়ির তাড়াগুলা লইয়া অকারণে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

ওপাশে কুমোর বুড়ো ঘোড়ার লেজ পাকাইয়া দিতে দিতে বলিতেছিল—আজকাল সবই উল্টো হয়েছে গো, আজকাল হয়েছে কি জান—

নাই ধন যার হরষ বদন সুখে নিদ্দে যাচ্ছে।
আছে ধন যার বিরস বদন ভাবনায় শির ফাটছে।

গল্প হইতেছিল ডাকাতির।

টানার সুতার ফাঁকে ফাঁকে মাদুরের পাতি সুকৌশলে পরাইতে পরাইতে কসুম হাসিয়া কহিল—তাহলে পালকত্তা, বল রাত্রে ঘুমোও না।

পাল-কর্তা কোনো উত্তর দিবার আগেই ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলটা গায়ে জড়াইয়া হঠাৎ কেনারাম চাটুজ্জে পিছনের অন্ধকার হইতে দোকানের আলোর সম্মুখে যেন উদয় হইয়াই কহিল—কি রে, কার ঘুম হয় না রে বাপু?

পাল কহিল—নাতজামাই যে! এস, এস। কবে এলে?

কুসুম অবগুণ্ঠনটা বাড়াইয়া দিল। কেনারামই কুসুমের স্বামী। গ্রামে গ্রামেই বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু কেনারাম কাহারও কড়ি ধারে না, বন্ধনহীন মুক্ত পুরুষ সে। মাও নাই, বাপও নাই। বন্ধনের মধ্যে ওই কুসুম, সে বাঁধনও কেনারাম ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। আগে তবু ঘরে থাকিত, তখন সত্যকার একটি বন্ধন ছিল—তিন-চার বছরের কন্যা সন্ধ্যামণি। মাস তিনেক হইল মেয়েটির মৃত্যুর পর সে সব ছাড়িয়াছে। এ-পাড়ায় বড় একটা আসে না, কুসুমকে একটা কথাও বলে না। কোথায় যায়—দশদিন বিশদিন কোথা থাকে, আবার একদিন আসে।

পাল-কর্তার সাদর অভ্যর্থনায় চাটুজ্জে কান দিল না—কার ঘুম হয় না সে লইয়াও মাথা ঘামাইল না। ওদিকে কালীর দোকানে তখন তাহার নজর পড়িয়াছে, কালীকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল—আরে কালী যে! তুই কবে ফিরলি মেলা থেকে, এ্যাঁ?

তুপা আগাইয়া কালীর দোকানে চাপিয়া বসিয়া আবার কালীকে প্রশ্ন করিল—তারপর মেলা কেমন দেখলি—বল দেখি? কই, বিড়ি দে রে বাপু।

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সে বিড়ি-দেশলাই টানিয়া লইল।

কালী সংক্ষেপে কহিল—বেশ মেলা, খুব ভিড়, বেচা-কেনাও বেশ!

ঠাকুর তখন সদ্য বিড়িটা ধরাইয়াছে, মুখে তার একরাশ ধোঁয়া। কেরোসিনের টবের আলমারিতে খালি সিগারেটের বাক্স সাজাইতে সাজাইতে কালী কহিল—এবার ওখানে মেলাতে বেশ্যে বসতে দিলে না, দাদাঠাকুর! তুলে দিলে সব।

চাটুজ্জের মুখের ধোঁয়াটা অকস্মাৎ হুস করিয়া বাহির হইয়া গেল, সে কহিল—সে কি রে—কে তুলে দিলে?

—গবরমেণ্টার হতে সাহেব এসেছিল যে। দারোগা পুলিশ চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েন সব। তারাই দিলে। উঃ—দারোগাটা কি সাংঘাতিক মোটা মাইরি! ঠিক যেন গঙ্গার শুশুক, বুঝলি ছকু?

কেনারাম নীরবে কি যেন ভাবিতেছিল, হঠাৎ কহিল—বসতে দিলে না? কি হল তাদের, কালী?

ওপাশে পালের গলা শোনা গেল—উঠলে যে ভাই নাতনী, এত সকালেই?

কুসুমের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

ঠিক এই সময়টিতে সমস্ত বাজারটা হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য নি

হইয়া পড়িল। এমন হয়, বহু লোক, বহু কোলাহলের মধ্যেও এমন এক একটি আকস্মিক নিস্তব্ধ মুহূর্ত আসিয়া যায়।

চাটুজ্জেই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিল—তারা খুব গরিব, নয় রে কালী?

নতমুখে কালী কহিল—খু—ব।

ও পাশ হইতে ছকু ডাকিল—যাত্রা করতে হবে চাটুজ্জেমশায়—আমরা যাত্রার দল খুলছি।

চাটুজ্জে সাড়া দিল না।

ছকু আবার ডাকিল—শুনছেন দাদাঠাকুর?

বিরক্ত হইয়া চাটুজ্জে গঙ্গার ঘাটে অন্ধকারে গিয়া দাঁড়াইল।

কালী হাসিয়া কহিল—মেয়েগুলোর ভাবনা ভাবতে বসেছে।

একটা ইঙ্গিত করিয়া ছকু কহিল—এদিকে নিজের পরিবারের ভাবনা কে ভাবে তার ঠিক নাই!

মৃদুস্বরে কালী কহিল—কেন, পাল-কত্তা!

দুজনেই হাসিয়া উঠিল।

চাটুজ্জে কিন্তু আবার তখনই ফিরিল। গালে হাত দিয়া বসিয়া মহা দুশ্চিন্তার সহিত সে কহিল—মেয়েগুলোর শেষ পর্যন্ত কি হল কালী?

—আর দাদা, সেইখানে সব না খেয়ে শুকিয়ে বেচারীরা—

বাধা দিয়া ছকু কহিল—না দাদাঠাকুর, ও ফাজিলটার কথা শোনেন কেন। ওদের সব ভাড়া দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।

চাটুজ্জে মহাখুশী। কহিল—না, সে বেশ হয়েছে, এ খুব ভালো বন্দোবস্ত হয়েছে। সায়েবের মাথা রে বাপু!—তারপর একগাল হাসিয়া বলিল—তুই কি যেন বলছিলি ছকু?

—আমরা যাত্রার দল খুলছি। হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান-মিলন পালা হবে, তোমাকে কিন্তু হরিশ্চন্দ্র সাজতে হবে।

অমনি গায়ের কাপড়টা কোমরে জড়াইয়া লইয়া চাটুজ্জে কহিল—হরিশ্চন্দ্র তো আমি সেজেই আছি রে, দেখবি!—শৈব্যা শৈব্যা, রোহিতাশ্ব রোহিতাশ্ব! কিন্তু খালি গায়ে যে শীত করছে রে!

—হ্যাঁ, বামুনের আবার শীত, বলে যার মুখের ফুঁয়ে আগুন! কিন্তু ও বক্তৃতায় তো হবে না দাদাঠাকুর, বই থেকে বক্তৃতা করতে হবে। এই দেখ বই কিনেছি।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাটুজ্জে ছকুর মুখের দিকে একবার চাহিল। তারপর একটু হাসির সহিত কহিল—সত্যি বলছিস ছকু?

—কবে তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছি, বল তো?

—দে, তবে বই দে তোর। কি বক্তৃতা করতে হবে দেখি।

ছকু তাহাকে বইখানা আগাইয়া দিল। চাটুজ্জে বই লইয়া সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা জুড়িয়া দিল—রানী, রানী, তুমি যে কখনও কোমল শয্যা ভিন্ন শয়ন কর নি, ও-হো-হো। বাপ রোহিতাশ্ব রে, সোনার পুতুল আমার—(রোহিতাশ্বের গলা জড়াইয়া ধরিলেন)।

ও পাশে কালী ভ্যাঙচাইয়া উঠিল—বাপ যুধিষ্ঠির রে, (হনুমান কলা খাইতে লাগিলেন)।

এ পরিহাস চাটুজ্জে বুঝিল। বইখানা ছকুর দোকানে ফেলিয়া দিয়া সরোষে সে কহিল,—দেখ কেলে, তোর না হয় পয়সাই হয়েছে; তাই বলে লঘু-গুরু মানামানি নাই তোর?

কালী দমিল না, সে অঙ্গভঙ্গি করিয়া কহিল—ওয়ান মর্ণ আই মেট এ লেম ম্যান ইন এ লেন কোলোজ টু মাই ফারম।

ইংরেজীর কথা উঠিলেই চাটুজ্জে সদম্ভে এই লাইন কটি ঝর ঝর করিয়া আবৃত্তি করিয়া থাকে।

চাটুজ্জে আগুন হইয়া কহিল—আমি যদি বামুন হই তবে তোর—কি হবে জানিস?

—কি হবে শুনি?

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া চাটুজ্জে কহিল—জানি না, যা। আর সেখানে সে দাঁড়াইল না, হন হন করিয়া গঙ্গার ঘাটে নামিয়া গেল। কালীর পরিহাসটা তাহার বুকে বড় বাজিয়াছিল। যাইতে যাইতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপন মনেই সে যেন কহিল—যা তুই বললি বললি, আমি শাপ দেব না তোকে। ফেটে মরে যাবি শেষে!

পাল-কর্তার মজলিশে তখন উপকথা জমিয়া উঠিয়াছে। কুসুম কখন আসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়াছে কেহ লক্ষ্য করে নাই। উপকথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ তাহাকে দেখিয়া পাল কহিল—এস, এস, নাতনী এস! রাত বেশি হয় নি বস তুমি নইলে আসর জমছে না।

ভারি গলায় কুসুম উত্তর দিল—না কত্তা, দেহ বেশ ভালো নাই আমার।

তারপর অনাবশ্যক ভাবে কৈফিয়ৎ দিয়াই যেন সে কহিল—আলোটা আবার নিবে গেল, তেল নিয়ে আসি।

নির্বাপিত হ্যারিকেনটা লইয়া সে ঘাটের নিকটবর্তী মুদীর দোকানটায় গিয়া উঠিল।

চাপা গলায় ছকু কালীকে কহিল—শরীর ভালো নাই! চাটুজ্জে আজ এ পাড়ায় এসেছে কিনা!

কালী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। দোকানে হ্যারিকেনটা নামাইয়া দিয়া কুসুম কহিল—এক পয়সার তেল পুরে দাও তো।

মাপের হাতলওয়ালা বাটিতে ভরিয়া তেল পুরিতে পুরিতে দোকানী কহিল—তেল যে রয়েছে গো।

কুসুম গঙ্গার ঘাটের দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল, দাঁড়াইয়াই রহিল, কোনো উত্তর দিল না।

আলোর মুখটা লাগাইয়া দিয়া মুদী আবার কহিল—আলো জ্বেলে দেব, মা-ঠাকরুন?

সচকিত কুসুম কহিল—এঁ্যা?

—আলো জ্বেলে দেব?

—না থাক, বাড়িতে জ্বেলে নেব আমি। হ্যারিকেনটা লইয়া সে চলিয়া গেল।

পাল-কর্তার মজলিশে তখন পক্ষিরাজ ঘোড়া আকাশ-পথে উড়িয়াছে।

চাটুজ্জে ঘাট হইতে ফিরিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

ছকু তাহাকে ডাকিয়া কহিল—উঠে বসুন চাটুজ্জে মশায়। রাগ করলেন?

চাটুজ্জে কহিল—নাঃ, আর বসব না। ও পাড়ায় যাচ্ছি।

পাল তখন কহিতেছিল—পক্ষিরাজের পিঠে রাজপুত্তুর চড়লেন, আর পক্ষিরাজ শোঁ শোঁ করে আকাশে উড়ল—

চাটুজ্জের আর যাওয়া হইল না। তৎক্ষণাৎ পালের দোকানে ঢুকিয়া প্রতিবাদ করিয়া কহিল—বুড়ো বয়সে গঙ্গাতীরে বসে এত মিথ্যা কথা কেন বল, বল দেখি? শোঁ—শোঁ—করে আকাশে উড়ল! ঘোড়া আবার আকাশে ওড়ে।

ঘোড়ার কান গড়িতে গড়িতে পাল হাসিয়া কহিল—এস—এস ভাই, নাত-জামাই এস। দে-রে দে বসতে দে মোড়াটা। নাও তামাক খাও।

চাটুজ্জে মোড়ায় বসিল। ব্রাহ্মণের হুঁকায় কলিকা বসাইয়া চাটুজ্জের হাতে দিয়া পাল কহিল—তবে আর উপকথা কাকে বলেছে ভাই!

হুঁকা টানিতে টানিতে চাটুজ্জে কহিল—তাই বলে যত সব মিছে কথা বলতে হবে নাকি?

দড়ি-বাঁধা চশমার ফাঁক দিয়া চাটুজ্জের মুখের দিকে চাহিয়া বুড়া কহিল—যত সব নাতী-নাতনীতে এসে ধরে, কি করি বল?

—তবে তুমি বল, যত পার—পেট ভরে মিছে কথা বল। হুঁঃ—ঘোড়া নাকি আবার আকাশে ওড়ে!

উপকথা আগাইয়া চলিল—প্রবালদ্বীপের চিলে-কোঠা দেখা যাইতেছে, রাজকন্যার এলানো চুল বাতাসে উড়িতেছে। পদ্মফুল-ভিজানো জলে স্নান-করা তাঁর চুলে উজাড় করা পদ্মবনের গন্ধ; সেই গন্ধে মৌমাছিরা দলে দলে চারি পাশে গুন গুন করিয়া বেড়ায়। উজান বাতাসে সে গন্ধ রাজপুত্রের বুকে আসিয়া পশিল। গন্ধে মাতাল রাজপুত্র বলেন, আরও জোরে পক্ষিরাজ, আরও জোরে।

হঠাৎ বাধা পড়িল ময়রা বুড়ির হাসিতে—ও মাগো, এ-কে-গো! ই—হিঃ—হিঃ—হিঃ, কাতুকুতু কে দেয় গো!

কাতুকুতু যে দিতেছিল তাহারও সাড়া পাওয়া গেল—কেঁউ কেঁউ কুঁ-কুঁ।

একটা কুকুরছানা! কোথা হইতে আসিয়া সেটা বুড়ির পিঠ চাটিতে শুরু করিয়া দিয়াছে!

বুড়ি চটিয়া আগুন, কহিল—আ-মর, মর মুখপোড়া কুকুর! আমি বলি কে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার।

উপকথা ছাড়িয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া পাল কহিল—তাড়াও হে তাড়াও! দোকানে ঢুকলে সর্বনাশ হবে, ভেঙে ফেলবে। লাঠিগাছটা কই, লাঠিগাছটা?

বুড়ি খোঁজে ঝাঁটা, পাল খোঁজে লাঠি। চাটুজ্জে তাড়াতাড়ি হুঁকাটা নামাইয়া কুকুর-ছানাটিকে কোলে তুলিয়া লইল। তারপর আলোয় আনিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সেটাকে দেখিয়া কহিল—আরে তুই কোত্থেকে এলি? এ যে শ্মশান-ভৈরবীর বাচ্চা ন্যাদাটা! শ্মশান ছেড়ে এখানে কি করতে এলি মরতে? চল হতভাগা তোকে মায়ের কাছে দিয়ে আসি! যত সব অখাদ্য কাণ্ড, হুঁ!—চাটুজ্জে উঠিয়া পড়িল।

পাল কহিল—শোন, শোন, যেয়ো না। ডাকছে, তোমায় ডাকছে ও—।

সম্মুখে কুসুমের আলোকিত মুক্ত দ্বার, দুয়ারের কাছে মেঝেয় কুসুম দাঁড়াইয়া,

চাটুজ্জে সেদিকে ফিরিয়াও চাহিল না। কুকুরছানাটা কোলে করিয়া পথের অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

পাল কহিল—শরীর খারাপ, বেশি রাত করে না; তুমি দোর দিয়ে শোও নাতনী।

কুসুম ততক্ষণে আলো হাতে বাহিরে আসিয়াছে। আবার সে বারান্দায় মাদুর বুনিতে বসিবার উদ্যোগ করিতেছে।

পাল কহিল—শরীর খারাপ বলছিলে না নাতনী?

নতমুখে কুসুম কহিল—এটা কালই দিতে হবে কত্তা। গরিবের শরীর খারাপ হলে চলবে কেন বল? বল, তোমার উপকথা বল, কাজ করি আর শুনি।

কে একজন কহিল—কি যে করে গেল বামুন মা!

পালেদের ছি-চরণ কহিল—আহা সোনার প্রতিমা!

একজন কহিল—চাটুজ্জে তো ভালোই ছিল। মেয়েটি মরেই—

প্রসঙ্গ পাল্টাইয়া পাল উচ্চকণ্ঠে কহিল—চুপ চুপ, সব চুপ কর। উপকথা শোন, হ্যাঁ তারপর হল কি, পক্ষিরাজ এসে পড়ল আর কি, পা তার ছাদ ছোঁয় ছোঁয়—

কিন্তু একটা কলরোলের মধ্যে পালের কথাটা ঢাকা পড়িয়া গেল। দূরে শ্মশান-ঘাটে আবার রোল উঠিল—বল হরি—হরি বোল।

গঙ্গার তীরভূমির ঘন বন-সন্নিবেশের পশ্চিম পাড় ঘেঁসিয়া একটি স্বল্প-পরিসর পথ। পথটি গঙ্গার সহিত সমান্তরাল রেখায় বরাবর চলিয়া গিয়াছে। স্নান-ঘাটের উত্তরে কিছু দূরে একফালি পায়ে-চলার পথ গঙ্গার গর্ভমুখে নামিয়াছে। ইহার দুধারে বুক-ভরা উঁচু আগাছার জঙ্গল। মাথার উপরে বড় বড় গাছের শাখা-প্রশাখা আকাশ ছাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্থানটার একটা তীব্র বিকট গন্ধে বুকের ভিতরটা কেমন মোচড় খাইয়া উঠে।

দগ্ধ নরদেহের গন্ধ। এইটিই শ্মশান-ঘাট।

চাটুজ্জে উপর হইতে এই পথে নামিল।

খানিকটা আসিয়াই গঙ্গার কোলে এক টুকরা সমতল জায়গা পাওয়া যায়। একদিকে রাশীকৃত বাঁশ জড়ো হইয়া আছে; পাশেই তালপাতার চাটাই ও কতকগুলা খাটিয়ার বোঝা। এখানে-ওখানে দুই চারিটা নর-কপাল পড়িয়া আছে, হাড়ের টুকরায় মাটির বুক আচ্ছন্ন।

একটু অগ্রসর হইয়া চাটুজ্জে একখানি জীর্ণ টিনের চালায় আসিয়া উঠিল। চালাটার উত্তর দিকে রাজ্যের ছেঁড়া বিছানা গাদা হইয়া আছে। মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ধুনি। ধুনিটার কোল ঘেঁষিয়া একটা খাটিয়ায় বিছানা পাতা, চালাটার কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো লম্বা তারে বাঁধা একটা হ্যারিকেন মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। পশ্চিমে বাঁশে-চাটাইয়ে তৈয়ারী একখানা ছোট ঘর।

নিচে গঙ্গার ঢালু বালুচরের উপর কয়টা শিখাহীন জ্বলন্ত অঙ্গারস্তূপ নিশীথ-অন্ধকারের বুকে ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বলিতেছে। মানুষের দেহ নিঃশেষে আহার করিয়াও আগুনের যেন তৃপ্তি হয় নাই—এখনও সে হা-হা করিতেছে। একটা নূতন চিতায় আগুন দেওয়া হইয়াছে। অগ্নিশিখা সবে আশেপাশে উঁকি মারিতেছে। সেই শিখার প্রভায় দেখা যাইতেছিল, রাশি রাশি ধুম পাক খাইয়া-খাইয়া উপরে উঠিতেছে, নিচে নামিতেছে। চিতার বুকে অনাবৃত একটি শিশুদেহ, বুকে তাহার একখানি কাঠ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শবটির মুখ পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল—দশ-এগার বছরের কচি মেয়ে! ছোট ছোট চুলগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে—কতক তাহার পুড়িয়াছে—কতক এখনও পোড়ে নাই। শবের পায়ের দিকে একটি মানুষ একটা বাঁশের উপর ভর দিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল! পুরা জোয়ান, নিকষকালো বর্ণ, মাথায় দীর্ঘ বাবরী-চুল অগ্নিতপ্ত বায়ুতাড়নায় মৃদু মৃদু দুলিতেছে।

সে শ্মশান-প্রহরী চণ্ডাল।

চালার উপরে দাঁড়াইয়া চাটুজ্জে ডাকিল—পৈরু!

মুখ ফিরাইয়া সাগ্রহে পৈরু বলিল—পরনাম—ঠাকুর মহারাজ, আসেন আসেন। কবে আসলেন দেশে?

—এই বিকেল বেলা রে। তারপর, ভালো আছিস তো?

—আপনার কিরপা মহারাজ।

—ছেলে-পুলে তোর?

—সবহি ভালো দেওতা!

কাপড়ে ঢাকা কুকুর-ছানাটাকে বাহির করিয়া চাটুজ্জে কহিলে—আরে তোর ন্যাদা বাচ্চাটা যে বাজারে গিয়ে পড়েছিল। শেয়ালে নিত আর একটু হলেই—! গলা চড়াইয়া চাটুজ্জে হাঁকিল—ভৈরবী, ভৈরবী! কাল্লু! কাল্লু—মহাদেও!

সঙ্গে সঙ্গে পাশের সেই চালা-ঘরটা হইতে একপাল কুকুর আসিয়া চাটুজ্জেকে ঘিরিয়া লেজ নাড়িতে শুরু করিল। একটা আবার চিত হইয়া শুইয়া থাবা দিয়া চাটুজ্জের পায়ে আঁচড়াইতে লাগিল।

কোল হইতে চাটুজ্জে ন্যাদাকে নামাইয়া দিল, সেটা লেজ নাড়িতে লাগিল। খুঁজিয়া বাছিয়া চাটুজ্জে ভৈরবীর কান মলিয়া দিয়া কহিল—মা হয়ে ছেলের খোঁজ নাই হারামজাদী!

ভৈরবী কাতর মৃদু আর্তনাদ করিল, যেন অপরাধের মার্জনা চাহিতেছে!

চাটুজ্জে হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিয়া কহিল—যা, যা, সব শুগে যা—খুব আদর হয়েছে। যা—সব যা।

কুকুরের দল তবুও যায় না।

পৈরু হাসিল—হঠাৎ কুকুরের দল চীৎকার করিয়া জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া গেল। পলায়নপর জন্তুর পদধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শৃগালের কর্কশ কণ্ঠের ধ্বনি শোনা গেল—খ্যাক খ্যাক। টিনের চালায় খাটিয়াটার বিছানার ভিতরে কে যেন নড়িয়া-উঠিল। কম্বলের আচ্ছাদন ভেদ করিয়া একটি শিশু মুখ বাড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল—বাবা—এ—বাবা।

পৈরু উত্তর দিল—যাই, যাই হো মায়া,—ঘুম যাও, শো যাও— শো—যাও হো বিটিয়া।

শিশুটি বিছানায় মুখ লুকাইল।

চাটুজ্জে কহিল—তোর সেই খুকীটা,—না রে পৈরু?

—হাঁ মহারাজ, কিছুতে ছাড়ল না হামাকে আজ।

চিতাটা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পৈরু হাতমুখ ধুইয়া উপরে আসিয়া কন্যাটিকে সযত্নে কম্বল ঢাকিয়া দিল। তারপর মাথার চুলগুলি তাহার হাতে করিয়া সাজাইয়া দিতে দিতে কহিল—বেটী হামার বহুত ভালা দেওতা, হামাকে বড়া পিয়ার করে।

চাটুজ্জে চিতার দিকে চাহিয়া ছিল, কথা কহিল না। বিড়ি বাহির করিয়া পৈরু কহিল, বিড়ি পিবেন মহারাজ!

চিতার আগুনের পানে চাহিয়া চাহিয়া চাটুজ্জে কহিল—দে।—ধুনির আগুনে বিড়ি ধরাইয়া চাটুজ্জে চিতার পানেই চাহিয়া রহিল।

পৈরু কহিল—থোড়া বসবেন মহারাজ?

—তব, বসেন আপনি, হামি খাইয়ে লিই।

পৈরু একটা ঝাঁটা লইয়া ওই কুকুরের ঘরের মেঝেয় গিয়া ঢুকিল চারিটা পাশ ময়লায় ভর্তি। তারই একটা প্রান্ত ঝাঁটা বুলাইয়া জল ছিটাইয়া দিল। এবং ঐখানেই সে গামলা-ঢাকা খাবার লইয়া গিয়া বসিয়া পড়িল।

এদিকে জ্বলন্ত চিতাটা ক্রমশ ম্লান হইয়া আসিতেছিল।

চাটুজ্জে কহিল—চিতাটা যে নিবে এল পৈরু, আঙর ঝাড়তে হবে।

খাইতে খাইতে পৈরু কহিল—যাই হামি মহারাজ!

—খাবার দেরি কত তোর?

—দের থোড়া আছে। থাক, আমি যাই।

—থাক, তুই খা, আমিই দিচ্ছি ঝেড়ে।

চাটুজ্জে কাপড় সাঁটিতে সাঁটিতে চড়ায় নামিয়া পড়িল।

পৈরু তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিল—না না দেওতা, বাড়ি যাবে তুমি। শীতকা রাত, আস্নান করতে হবে—।

অর্ধদগ্ধ শবটাকে নাড়াচাড়া দিতে দিতে চাটুজ্জে কহিল—তোর ওই ধুনির পাশেই শোব না হয় আজ।

একান্ত দুঃখের সহিত পৈরু কহিল—নেহি দেওতা, ই চণ্ডালকে কাম। হামার পাপ হোবে দেওতা—

—দূর বেটা! শিব নিজে একাজ করে জানিস? তোরা হচ্ছিস নন্দীর বাচ্চা।

পৈরু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছিল। বাহিরের পথের উপর হইতে কে তাহাকে ডাকিল—পৈরু!

তাড়াতাড়ি পৈরু বাহির হইয়া আসিল এবং আহ্বানকারীকে দেখিয়া একান্ত অপরাধীর মতই কহিল—মাইজী!

রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া কুসুম।

কুসুম কহিল—একবার ডেকে দাও পৈরু।

পৈরু উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—মহারাজ, মহারাজ, এ ঠাকুরজী!

মহারাজ তখন চিতাগ্নিটাকে প্রজ্বালিত করিতে করিতে বক্তৃতা শুরু করিয়া দিয়াছে—শৈব্যা, শৈব্যা।

জোর গলায় পৈরু আবার ডাকিল—ঠাকুর-জী!

চিতাগ্নি হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহারই লেলিহান শিখার দিকে চাহিয়া পরমানন্দে চাটুজ্জে পৈরুকে ডাকিয়া কহিল—দেখে যা বেটা, দেখে যা, চিতা যার নাম, এ নইলে মানাবে কেন? জানিস পৈরু, এমনিধারা চিতা সারা দিনরাত যদি জালিয়ে রাখতে পারিস—তবে ঠিক রাত্রে শ্মশান-কালীকে আসতে হবে। এ একটা যজ্ঞ রে!

পৈরু আবার ডাকিতে যাইতেছিল, কিন্তু কুসুম বাধা দিয়া কহিল—থাক

পৈরু, আমি খাবারটা দিয়ে যাই, তুমি খাইয়ো, বল না যেন আমি দিয়ে গেছি।

চালার একটা প্রান্ত কুসুম এক হাতে পরিষ্কার করিয়া লইল। তার পর অঞ্চলতলে ঢাকা খাবার, জলের ঘটি রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। পিছন হইতে পৈরু কহিল—সাথমে যাই হামি মাইজী।

কুসুম একটু হাসিল, কহিল—না বাবা, তুমি যাও, খাবারটা হয়ত কিছুতে খেয়ে দেবে। আমি একাই যেতে পারব।

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কুসুম ডুবিয়া গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পৈরু ফিরিল।

চিতাটা নাড়িতে নাড়িতে চাটুজ্জে কহিল—কি ?

—হাতমুখ ধুয়ে আসেন। বেশ জ্বলেছে উ।

—তোর হল ?

—হাঁ, আপনি শিগ্রি আসেন। ফেলেন, বাঁশ ফেলেন।

পৈরুর কণ্ঠস্বরে একটা দৃঢ়তা ছিল, চাটুজ্জে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না, উঠিয়া আসিল।

অঙ্গুলিনির্দেশে খাবার দেখাইয়া দিয়া পৈরু কহিল—ভোজন করেন।—হামি আনাইলাম গো ওহি চাষাদের ছোকরাকে দিয়ে।

পৈরুর মুখপানে চাটুজ্জে তাকাইয়া কহিল—কুসুম দিয়ে গেল, নয় পৈরু ?

—হাঁ, এতনা রাতমে মাইজী আসবে হিঁয়া !

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চাটুজ্জে খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে সে কহিল—সত্যি বড় ক্ষিদে পেয়েছিল পৈরু, এই জন্যেই তোকে এত ভালোবাসি।

পৈরু উত্তর দিল না, সে ভাবিতেছিল মাইজীর কথা। শ্মশানের চণ্ডাল সে, দুঃখের উচ্ছ্বাস সে অনেক দেখিয়াছে, বুক-ফাটা কান্না সে অনেক শুনিয়াছে, কিন্তু দুঃখের এমন নীরব প্রকাশ সে আর দেখে নাই।

চাটুজ্জে আপন মনেই কহিতেছিল—আমাকে আর কেউ ভালোবাসে পৈরু, তুই ছাড়া ?

পৈরুর মনে হইল, মাইজী যেদিন চিতায় চড়িবে সেদিন হয়ত বুকের জমা-করা কান্নায় চিতার আগুন জ্বলিবে না, নিবিয়া যাইবে। চাটুজ্জে আবার কহিল—কুসুমও আমায় ভালোবাসে পৈরু। কিন্তু—

কথাটা তাহার অসমাপ্তই রহিয়া গেল।

পৈরু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কি বলছিলেন মহারাজ-জী ?

চাটুজ্জে উত্তর দিল না।

পৈরু ডাকিল—দেওতা !

চাটুজ্জে মুখ তুলিয়া চাহিল। চিতার দীপ্ত আলোকে পৈরু দেখিল চাটুজ্জের চোখ বাহিয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। অপ্রস্তুতের মত চাটুজ্জে কহিল—মেয়েটাকে মনে পড়ে গেল পৈরু। কুসুমের কথা হলেই তাকে আমার মনে পড়ে যায়। জানিস পৈরু, কুসুমের মুখের দিকে চাইলে আমার কান্না পায়। মা-মণির, আমার সন্ধ্যামণির মুখ যেন ওর মুখের মধ্যে জ্বল জ্বল করে ভাসে।

পৈরুর চোখ দিয়াও এবার জলধারা গড়াইয়া পড়িল :

চাটুজ্জে আবার কহিল কিন্তু জানিস পৈরু, খুকুমণির জন্যে ওর একটুও দুঃখ হয় নি ; ও তার জন্যে কাঁদে না।

বাধা দিয়া পৈরু কহিল—মৎ বোল-না, ই বাত মৎ বোল-না, ঠাকুর-জী ! মাইজীর আঁখের পানিতে দরিয়া বেড়ে গেল দেওতা। তুমহার আঁখ নেহি ; তুমি দেখলে না।

সচকিত ভাবে চাটুজ্জে পৈরুর মুখপানে চাহিয়া কহিল—সত্যি পৈরু ?

দৃঢ়কণ্ঠে পৈরু কহিল—সামনা মে গঙ্গাজী যেমন সাচ মহারাজ, ই বাত হামার তেমনি। ঝুট হোয় তো শিরমে হামার বাঁজ গিরবে দেওতা।

কতক্ষণ পর চাটুজ্জে ধীরে ধীরে কহিল—লোকে কত কি বলে ওই বুড়ো পালকে নিয়ে, কিন্তু সে মিথ্যে, আমি জানি। কিন্তু কুসুম কাঁদে খুকুমণির জন্যে ? সারাদিনই যে মাদুর বোনে ও, দিনরাতই যে ওর পয়সা-পয়সা !

পৈরু এ কথার কোনো জবাব দিল না।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রোল উঠিল—বল হরি হরি বো—ল। নূতন কে মহাপথ-যাত্রী আসিল।

সে রোলের প্রতিধ্বনি বনে বনে, গঙ্গার বাঁকে বাঁকে ধ্বনিয়া দূর দূরান্তে মিলাইয়া গেল। চকিত শৃগালের দল কলরব করিয়া উঠিল। গাছের মাথায় শকুনিরা পাখা ঝটপট করিয়া নড়িয়া বসিল।

টিনের চালায় মানুষ দুটি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। হাতমুখ ধুইয়া চাটুজ্জে বিড়ি ধরায়, পৈরু শবের লকড়ি সংগ্রহ করিতে নিচে নামিয়া যায়।

নূতন কাঠ বহিয়া আনিয়া পৈরু আবার চিতা সাজাইল।

শববাহকের দল চিতায় শব তুলিয়া দিতে গেল।

পৈরু ডাকিল—ঠাকুর-জী !

কেহ উত্তর দিল না, চাটুজ্জে কখন চলিয়া গিয়াছে।

শবের কাপড় বিছানা ভাঁজ করিয়া সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া পৈরু শবের পদপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। অভ্যাসমত বাঁশে ভর দিয়া পৈরু গঙ্গার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

—পৈরু!—চাটুজ্জে ফিরিয়া আসিল।

—মহারাজ!

—এ কেমন মড়া রে?

—ই যানেওলা হ্যায় মহারাজ,—সাদা মাথা।

চিতাটা জ্বলিয়া উঠিতেই পৈরু উপরে আসিয়া বসিল।

চাটুজ্জে চুপি চুপি কহিল—পৈরু!

—মহারাজ!

—কুসুম কাঁদছে। আমি শুনে এলাম চুপি চুপি গিয়ে।

চিতার আগুনে পৈরুর মুখখানি বেশ দেখা যাইতেছিল; সে মুখ তাহার হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে কহিল—গঙ্গাজী সাচ হ্যায় দেওতা; ঝুটা তো নেহি। ধুনির পাশে একখানা কম্বল বিছাইয়া চাটুজ্জে শুইয়া পড়িল; চিতাটার নির্বাণ অপেক্ষায় শ্মশানের বুকে চণ্ডাল জাগিয়া রহিল।

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে স্নান-ঘাটের রূপ একেবারে পাল্টাইয়া গেছে। ঘাটে বাজারে লোক আর ধরে না। স্তব-গানের রোলে পাখীর কলরবও ঢাকা পড়িয়াছে। গঙ্গার বুকে নৌকার মেলা; মহাজনী নৌকাগুলো উজানে গুনের টানে চলিয়াছে; জেলে-ডিঙিগুলা মোচার খোলার মত হেলিয়া দুলিয়া একটি নির্দিষ্ট সীমা-রেখা পর্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ওপারের খেয়াঘাটে যাত্রীর দল, মাল-বোঝাই গাড়ির সারি, গরু-মহিষের পাল আবার ভিড় করিয়াছে। পথের পাশে কানা-খোঁড়ার সারি বসিয়া গিয়াছে।

—অন্ধজনে দয়া কর রানী-মা!

—খোড়াকে একটা পয়সা দিয়ে যান না।

একদল বাউল দুটি ছেলেকে রাধাকৃষ্ণ সাজাইয়া ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। বাঁধা-ঘাটের পাশে পল্লীবাসিনীরা স্নান করিতেছে। কুসুমকেও তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। ও-পাড়ার বিশ্বাস-গিন্নি, কুসুমের সই-মা, কুসুমকে দেখিয়া কহিলেন —তাই তো মা কুসুম, কাল বাড়ি এসে সব শুনলাম; এখানে তো ছিলাম না। কি করবি বল মা—গাছের সব ফুল কটি কি থাকে? মনে কর ও তোর নয়।

কুসুমের চোখ দিয়া দর দর ধারে জল গড়াইয়া পড়িল। চোখের জল মুছিয়া সে কহিল—ও কথা বল না সই-মা, সে আমার—সে আমার ছাড়া আর কারও নয়। সে আমার আবার ফিরে আসবে, দেখো তুমি, সেই মুখ, সেই চোখ, সেই কথা, সেই সব।

—তাই হোক মা, তাই হোক, আশীর্বাদ করি তাই হোক। সে তোর খেলতে গিয়েছে, আবার ফিরে তোর কোলে আসুক।

স্নান-ঘাটের মাথায় বসিয়া চাটুজ্জে ওপারের দিকে চাহিয়া ছিল। গত বছরে ওপারের সেই ভাঙনটা নামিয়া আসায় সেখানে নতুন চর জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারই মধ্যে লাঙলের কল্যাণে শ্যামল ফসলে ভরিয়া গিয়াছে। কোনো একটা ফসলে ফুলও দেখা দিয়াছে।

চাটুজ্জে উঠিয়া বাড়ির দিকে চলিল।

দ্বিজদাসের দোকানে তখন অনেক ভিড়, সেখানে রাত্রের পাওনা-গণ্ডার হিসাব চলিয়াছে। মুদীর দোকানে কলাই না কিসের একটা ওজন হইতেছে—রামে-রাম—রামে রাম—রামে-দুই—দুই রাম।

পাল-কর্তার দোকানে রঙ-বেরঙের পুতুলের সারি।

চাটুজ্জে কুসুমের দাওয়ায় গিয়া উঠিল। কিন্তু থমকিয়া সে দাঁড়াইল। দাওয়ার নিচে সন্ধ্যামণির একটা কচি-গাছ, সেটা ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

কুসুম বোধ হয় দূর হইতেই তাহাকে দেখিয়াছিল, ঘর হইতে ডাকিল—এস।

চাটুজ্জে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া ছিল।

কুসুম আবার ডাকিল—এস।

সঙ্কোচভরে চাটুজ্জে কহিল—তেল দাও তো, আগে স্নান করে আসি রাত্রে শ্মশানে—।

হাসিয়া কুসুম কহিল—তা হোক।

চাটুজ্জে বলিল—সন্ধ্যামণি ফুল ফুটেছে—খুকু গাছ পুঁতেছিল।

দোকানে দোকানে তখন হাঁক উঠিয়াছে—

—তুফানী বিড়ি, মিঠা পান—

—গঙ্গাফল নিয়ে যান মা।

—পুতুল মা, পুতুল।

কুসুম সজল চক্ষে প্রত্যাশার হাসি হাসিয়া বলিল—সে আবার আসবে।

চৈতে কুয়া, ভাদরে বান, নরমুণ্ড গড়াগড়ি যান।—খনার বচনে আছে। তেরশ পঞ্চাশ সালের কার্তিক মাস, লোকে ওই কথাটা নিয়েই আলোচনা করে প্রায় সারাদিন। গত চৈত্র মাসে কুয়াশা হয়েছিল কি না—এ কথায় কেউ বলে, ওরেঃ বাপ রে! একেবারে কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার মত চারিদিকে ঢেকে গিয়েছিল; মনে নাই?—কেউ বলে, হাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে।—কেউ ভুরু কুঁচকে গভীর চিন্তা করে মনে করতে চেষ্টা করে। কেউ ঘাড় নাড়ে, যার অর্থ—হ্যাঁ অথবা না দুইই হতে পারে। কেউ বলে, উঁহু, নাঃ।—তা ছাড়া চৈত্রে কুয়াশার সঙ্গে নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাওয়ার সম্বন্ধটা যে কোথায়, তা ঠিক ধরাও যায় না।

মিহির মুখুজ্জের কাঁচা বয়েস, তাজা রক্ত, তার উপর ডাক্তার মানুষ, সে ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলে, যে দেশে আকাশে অমাবস্যে লাগলে পায়ে বাত টাটায়, সেই দেশেই চৈতে কুয়াশা হলে আট মাস পরে নরমুণ্ড গড়াগড়ি যায়। মধ্যে মধ্যে চটেও ওঠে, বলে, মা চণ্ডী আছেন, শনি-সত্যনারায়ণ আছেন, বিপত্তারিণী আছেন তোমাদের, তাঁদের কাছে যাও না। রাত-দুপুরে আমায় জ্বালাতে এস কেন? চরণোদক খাওয়াওগে রুগীকে, ওষুধ দেব না আমি। যা তোদের ওই চণ্ডীমায়ের পাণ্ডা ভটচাযের কাছে; যা, ভাগ, ভাগ এখান থেকে।

মিহির ডাক্তারের ভয়ানক রাগ ওই ভট্টাচার্যের উপর। ত্রিপুরা ভট্টাচার্য—চণ্ডীমায়ের পূজক, প্রবীণ মানুষ, অকৃত্রিম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আচারে আচরণে এতটুকু ফাঁকি নাই, চণ্ডীমায়ের সেবা করেন প্রাণ ঢেলে, চোখ বুজে ধ্যান করতে বসে চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে, মায়ের নাম করতে আবেগে প্রৌঢ়ের ঠোঁট দুটি কাঁপে। লোকে বলে, গভীর রাত্রে নির্জনে মায়ের সঙ্গে ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের কথাবার্তা হয়। পাথরের মূর্তি থেকে মা নাকি বেরিয়ে এসে ভট্টাচার্যের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। অদ্ভুত স্বাস্থ্য তাঁর—আজও পর্যন্ত কখনও ওষুধ খান নাই। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা—গায়ে কখনও জামা কি চাদর কিংবা আলোয়ান কিছু দেন না, মাথায় ছাতা নেন না, পায়ের জুতোর কথা এর পর বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এ গাঁয়ের লোক—যারা অপর জায়গায় গিয়ে ভট্টাচার্যের গল্প করে—তারা অন্তত প্রয়োজন বোধ করে না। ভট্টাচার্য হাসেন ডাক্তারের কথা শুনে। বলেন, উইপোকার পক্ষোদ্গমের আস্ফালন।...দুজনের মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা লড়াই চলে আসছে।

এই ঝগড়া চলে আসছে নেপথ্য-দ্বন্দ্বের মত। দু-চারবার মুখোমুখি ঝগড়াও হয়েছে। সেবার হঠাৎ একদিন মিহির ডাক্তারকে ডাকতে এল ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের ছেলে। তার ছেলের অর্থাৎ ভট্টাচার্যের নাতির জ্বর হয়েছে; সাত দিন কেটে গেছে, কিন্তু জ্বর কোনোক্রমেই বাগ মানে নাই, দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে—পেটে বেদনা, মাথার যন্ত্রণা, জ্বর একবারের জায়গায় দিনে দুবার বাড়ছে, প্রবল জ্বরের সময় দু-চারটে ভুলও বকছে রোগী। ভট্টাচার্যের ছেলে ডাক্তারের হাত দুটি চেপে ধরে বলেছিল, ডাক্তারবাবু, খোকাকে আপনি বাঁচান।

ডাক্তার মনে মনে ভাবছিল, ত্রিপুরা ভট্টাচার্যকে নিয়ে একটু রহস্য করবে কি না; কিন্তু অকস্মাৎ ভট্টাচার্যের ছেলের কাকুতিতে সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, তার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার চমকে গেল। ভদ্রলোকের দু চোখের কোণ থেকে জলের দুটি ধারা গড়িয়ে পড়ছে। ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে দরদী পরমাত্মীয়ের মত বললে, এ কি! তার জন্যে আপনি কাঁদছেন কেন? জ্বর আর কার না হয়! চলুন, এখুনি আমি যাচ্ছি, ভয় কি? আমি বলছি, ছেলে ভালো হয়ে যাবে।

ভট্টাচার্যের ছেলের নাম গিরিজা; গিরিজা চোখের জল মুছে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বাবা বলছেন ডাক্তারবাবু—। আর সে বলতে পারলে না, বুকের ভিতর থেকে কান্না ঠেলে উঠে তার গলার ভিতরটা যেন চেপে ধরলে, শুধু ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপতে লাগল, ঝড়ো হাওয়ার তাড়নায় অশ্বত্থের পাতার মত।

—কি বলছেন আপনার বাবা?—রাগে বিরক্তিতে ডাক্তারের কপালের মসৃণ চামড়া কুঁচকে উঠল, গলার স্বর রূঢ় হয়ে উঠল।

অনেক কষ্টে গিরিজা আত্মসম্বরণ করে বললে, বাবা বলছেন, ডাক্তার ডাকবি ডাক, কিন্তু মায়ের ইচ্ছের ওপর কারু হাত নাই।

ডাক্তার আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, বললে, মা তো পাথরের, তার আবার ইচ্ছে-অনিচ্ছে কি?

গিরিজা শিউরে উঠল, কিন্তু প্রতিবাদ করে ডাক্তারকে চটাতে সে সাহস করলে না।

মায়ের ইচ্ছার কথা ত্রিপুরা ভট্টাচার্য নিজেই বললেন ডাক্তারকে।

অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে ছেলেটিকে দেখে ডাক্তার চিন্তিত মুখেই বাইরে এসে কল-বক্স থেকে ওষুধ বের করে নিজে হাতে মিকশ্চার তৈরি করে দিলে।

ইনজেকশন দিলে, একখানা কাগজে যথাসম্ভব সরল ভাষায় কখন কি করতে হবে লিখে দিলে। এতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা ভট্টাচার্য একটি কথাও বলেন নাই। এবার অদ্ভুত একটু হাসি হেসে বললেন, দেখলেন?

—দেখলাম। টাইফয়েড। দেখাতে একটু দেরি হয়ে গেছে।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য নীরবে আবার একটু হাসলেন।

ডাক্তার বলল, রোগ অনেকটা বেড়ে গেছে। তা যাক। ভয় নেই, সেরে যাবে।

ভট্টাচার্য ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়লেন। অর্থ তার সুস্পষ্ট।

ডাক্তার এবার ফেটে পড়ল। বললে, আপনি কি মানুষ?

ভট্টাচার্য বললেন, মানুষ বড় অসহায় ডাক্তারবাবু, তার কোনো হাত নাই।

—কি বলছেন আপনি!

—ও ছেলে বাঁচবে না।

ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ভট্টাচার্য বললেন, সে কথা গিরিজাকে আমি বলেছি। তবে বাপের মন, যা করতে চায় করুক, আমি বাধা দেব না। কিন্তু—। কথা অসমাপ্ত রেখে ত্রিপুরা ভট্টাচার্য আবার হাসলেন।

ডাক্তার অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় কঠিন কণ্ঠে বললে, আপনি এসব বলবেন না ওঁদের কাছে। ওঁরা নার্ভাস হলে সেবা-যত্ন ঠিকমত হবে না, রোগীকে বাঁচানো সত্যিই কঠিন হবে।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য বললেন, মা আমাকে স্বপ্নে বলেছেন ডাক্তারবাবু, ও রোগ সহজও নয়, কঠিনও নয়, ও রোগ মৃত্যু-রোগ।

শুধু একদিন নয়, আটাশ দিন পর্যন্ত ছেলেটিকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলল; এই আটাশ দিনের প্রথম সাত দিন বাদ দিয়ে একুশ দিনই ত্রিপুরা ভট্টাচার্য ওই একই কথা বলেছেন, একই হাসি হেসেছেন, একই স্থির শান্ত ভাবে বাইরের দাওয়াটির উপর বসে ডাক্তারের রোগী দেখে বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করেছেন। ডাক্তারেরও যেন জেদ চেপে গিয়েছিল, সে ফীয়ের কথা বলে নাই, ওষুধের দামের হিসাব রাখে নাই, নিজে থেকে প্রত্যহ দুবার করে নিয়মিত রোগী দেখেছে, দরকার বুঝলে রাত্রে পর্যন্ত থেকেছে; আঠারো দিনের রাত্রে, একুশ দিনের রাত্রে, আটাশ দিনের রাত্রে—সে সমস্ত রাত্রি রোগীর

বিছানার পাশে ঠায় জেগে বসে থেকেছে। আটাশ দিনের রাত্রে, তিনটার পর মিহির বেরিয়ে এল রোগীর ঘর থেকে।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য দাওয়ার উপর বসে ছিলেন, ডাক্তারকে বেরিয়ে আসতে দেখেই বললেন, তারা মা!—তারপর সুস্পষ্ট একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

ডাক্তার রূঢ় স্বরে বললে, না। আপনার ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। আজকের ক্রাইসিস কেটে গেছে।

ভট্টাচার্য আজ চমকে উঠলেন।

ডাক্তার বললে, কাল থেকে রোগীর অবস্থা ভালোর দিকেই চলবে মনে হচ্ছে।

সবিস্ময়ে ভট্টাচার্য ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ডাক্তারের অনুমান মিথ্যা হল না, ছেলেটি এর পর ধীরে ধীরে সেরেই উঠল পঁয়তাল্লিশ দিনের পর সে অন্নপথ্য করলে।

আরও একবার হয়েছিল এমনই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ।

গ্রামের ধনী জমিদারের মাতৃহীন দৌহিত্র মাতামহ-মাতামহীর যাকে বলে চক্ষের মণি; দুরন্ত ছেলে চুরি করে একটা সন্দেশ মুখে দিয়ে মেঝের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ল; তারপর ক্রমশ প্রচণ্ড আক্ষেপের সঙ্গে ধনুকের মত বেঁকতে আরম্ভ করলে। মিহির ডাক্তার লক্ষণ দেখে অনেক অনুসন্ধানে আবিষ্কার করলে, ঘোড়ার আস্তাবলে খেলতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে, পায়ের একটা আঙুলের নখ উঠেছে। কথাটা অনেকদিনের। তখন গত মহাযুদ্ধের আমল, ওষুধ এ দেশে তখন তেমন তৈরি হত না, ভারত মহাসাগরে 'এমডেনে'র দৌরাত্ম্যে বিদেশ থেকেও মাল আসত না, মিহির ডাক্তারের যে ওষুধটির দরকার ছিল, সে ওষুধ কোনোক্রমেই পাওয়া গেল না। বড়লোকের বাড়ি, মিহির ডাক্তার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে না রেখে স্পষ্টই বললে, ওষুধ নেই, আমার কোনো হাত নেই।

ওষুধের অভাবে কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এলেন; দেবমন্দিরে পূজা গেল, স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হল। কলকাতার ডাক্তার মিহির ডাক্তারের কথাই সমর্থন করেন, কোনো আশা নেই।

মাতামহী মার্বেল পাথরের মেঝের উপর মাথা কুটতে আরম্ভ করলেন; তাঁর সে বুকফাটা কান্নায় বাড়িটা ভরে গেল শ্বাসরোধী শোকের আবেগে। ছেলেটি বিছানার উপর পড়ে আছে—নিথর, নিস্তব্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে বলে পাঁজরের উপরটা শুধু নড়ছে; মধ্যে মধ্যে এক-একটা আক্ষেপ আসছে,

আর সমস্ত লোক শ্বাসরুদ্ধ করে স্থিরদৃষ্টিতে রোগীর দিকে তাকিয়ে থাকছে—হয়ত হঠাৎ এখুনি সব স্থির হয়ে যাবে।

বাইরের ঘরে শেষকৃত্যের সমস্ত আয়োজন সংগৃহীত হল। হাঁড়ি, কুঁচি, কড়ি, সোনা, রুপো, শববহনের খাট এবং আরও অনেক জিনিস। জনচারেক মজুর সন্ধ্যার পর শবদাহের কাঠ কাটতে আরম্ভ করলে।

এই সময় ত্রিপুরা ভট্টাচার্য এলেন। তিনি এসেছিলেন চণ্ডীমায়ের স্থানে ছেলের কল্যাণ-কামনায় যে পূজা করেছিলেন, সেই পূজার নির্মাল্য এবং দেবীর চরণোদক নিয়ে। ছেলের মাতামহী তাঁকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, মা আমার এই করলেন ?

পরিবারটির সত্যই প্রগাঢ় দেবভক্তি, বিশেষ করে ওই মাতামহীটির।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য নির্মাল্য এবং চরণোদক নিয়ে এগিয়ে গেলেন, বললেন, ভয় কি মা ? ছেলে বাঁচবে, মা আমাকে বলেছেন।

মিহির ডাক্তার বাইরে বসে ছিল, সে একটু হাসলে। হেসে, সে উঠল। বললে, থেকে কোনো লাভ নেই। শরীরও খারাপ হয়েছে আমার। আমি বাড়ি যাই।

বাড়ির কর্তা তবু ছাড়লেন না। বাইরে নিরিবিলি বিছানার ব্যবস্থা করে দিলেন, বললেন, বাড়িতেও ঘুমুবেন, এখানেও ঘুমুবেন। আমি ডবল ফী দেব।

মিহির ডাক্তার একটু ভেবে বললে, আমি থাকছি, কিন্তু আজ কোনো ফী দিলে আমি নেব না—এই শর্তে থাকছি আমি।

রাত্রি তিনটের সময় তাঁর ঘরে ঘা দিয়ে কম্পাউণ্ডার ডাকলেন, ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার বিরক্ত হয়েই উঠল। কি করবে সে ? কি করবার আছে ?

কম্পাউণ্ডার বললে, আসুন একবার। রোগীর জ্ঞান হয়েছে, চোখ মেলে তাকাচ্ছে, কথা বলছে, চোয়াল ছেড়ে গেছে।

—জ্ঞান হয়েছে ? চোখ মেলে তাকাচ্ছে ? চোয়াল ছেড়ে গেছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই চরণামৃত দিচ্ছিলাম মধ্যে মধ্যে।

—চরণামৃত ? সিঁদুর-তেল-বাতাসা-গোলা জল।

কম্পাউণ্ডার আমতা আমতা করে বললে, আজ্ঞে, রানীমা বললেন, ওষুধ যখন যাচ্ছে না, ডাক্তারেরা যখন হাল ছেড়েছে, তখন মধ্যে মধ্যে মায়ের চরণামৃত ছাড়া আর কিছু দিও না, তাই—। সে অপরাধীর মতই চুপ করে গেল।

অসহিষ্ণু ডাক্তার বললে, তারপর ?

—সবই কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল, একবার বিরক্ত হয়েই মশাই, সত্য বলছি আপনাকে, একটু বেশি করে চরণামৃত দিলাম কশ ফাঁক করে। গলা দিয়ে খানিকটা গেল। একটা হেঁচকি উঠল। আমি ভাবলাম, হল এইবার, বুকে লাগল জল। ঠিক তারপরেই ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠল, দিদিমা !

ডাক্তার এসে রোগীর পাশে বসল। সত্যই রোগী চোখ মেলে চেয়েছে ! ডাক্তার সর্বাগ্রে তাকে একটু গরম দুধ দেবার ব্যবস্থা করলে। দুধ খেয়ে ছেলেটা কাঁদতে শুরু করে দিলে, আমার সন্দেশ ? আমার সন্দেশ কি হল ? আমি সন্দেশ খাব। চেতনা হারাবার পূর্বমুহূর্তে সে যে সন্দেশ চুরি করেছিল সেই সন্দেশের কথা মনে পড়েছে তার। সমস্ত বাড়ির লোক হেসে উঠল।

প্রায় সেই মুহূর্তেই বাইরে শোনা গেল ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের কণ্ঠস্বর। —সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। তুমি যা করাও মা, তাই করি, লোকে বলে করি আমি।—ঘরে ঢুকে সমস্ত শুনে তিনি বললেন, দাও, ওকে সন্দেশই খেতে দাও, মায়ের পূজোর থালায় প্রসাদী মিষ্টি আছে দেখ, তাই এনে দাও।

ডাক্তার উঠে পড়ল। স্টেথোস্কোপটা গুটিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কিন্তু কেউ বললে না, ডাক্তারবাবু যাবেন না।

মিহির ডাক্তার অবিশ্বাস করলেও ত্রিপুরা ভট্টাচার্য চৈতে কুয়াশার ফলে নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাওয়ার প্রবচনে অবিশ্বাস করেন না। বলেন, ক্রোধের পুবে কালের ভ্রূকুটি ওটা। কিন্তু তিনিও ঠিক স্মরণ করতে পারেন না, সেই ঘন কুয়াশাটা চৈত্র মাসে হয়েছিল কি না। তবে নরমুণ্ড যখন গড়াগড়ি যাচ্ছে, তখন হয়ত—। ভট্টাচার্য ভাবেন, চৈত্রে কুয়াশা হলে তো সেই সময়েই তিনি এই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের চেষ্টা করতেন; মায়ের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করতেন অসহায় মানুষের জন্য। মা যে মহাকালী, ভ্রূকুটিকুটিল মহাকালের সম্মুখে তিনি যদি মোহিনী বেশে দাঁড়াতেন, তবে মহাকালের ভ্রূকুটি যে মিলিয়ে যেত, প্রসন্নতায় তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত বৃষভবাহন বরবেশী শিবের মত।

চৈত্রে কুয়াশা নিয়ে মতদ্বৈধ যতই থাক, ভাদ্রে বন্যার কথা—কথা নয়, কাহিনী নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব। দামোদর, অজয়, কোপাই, বক্রেশ্বর, ময়ুরাক্ষী, গঙ্গায়

যে ভীষণ বন্যা হয়ে গেল, শ্রাবণে আরম্ভ হয়ে ভাদ্র পর্যন্ত চারদিকে যে জলপ্লাবন হয়ে গেল, তার স্মৃতি এখনও মানুষের চোখের উপর ভাসছে। দামোদর-অজয়ের বাঁধ এখনও ভেঙে রয়েছে। ভাঙন দিয়ে এখনও জলস্রোত বইছে নদীর মত। সুজলা সুফলা 'আউয়ল' জমি দহ হয়ে গেছে; তার দু পাশে হাজার হাজার বিঘা জমির উপর বালি চেপে বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি ধু-ধু করছে। বালি এখন ভিজে রয়েছে, যখন জল শুকিয়ে যাবে তখন বাতাসে বালি উড়বে হু-হু করে; খাঁ-খাঁ করবে মরুভূমির মত। লক্ষ্মীর আসনকে বন্যার স্রোত বোধ হয় চিরদিনের মত ভাসিয়ে নিয়ে গেল; ধানের চাষ আর কোনোদিন বোধ হয় হবে না এসব জমিতে। অন্তত দু পুরুষের কালে আর নয়। বালি-চাপা জমিগুলোর মধ্যে মধ্যে গর্ত, গর্তগুলোয় জল জমে আছে। যত জল শুকিয়ে আসছে, তত সেখান থেকে পচা দুর্গন্ধ উঠছে। সকাল-সন্ধ্যেতে মানুষ গরু ও-পথে হাঁটলে পাগল হয়ে যায়; মৌমাছির চাকে খোঁচা দিলে ঝাঁক বেঁধে যেমন মৌমাছির দল যাকে পায় তাকেই আক্রমণ করে, তেমনই ভাবে মশা এবং মাছির ঝাঁক মানুষ গরুকে ছেঁকে ধরে মাথার চারপাশে ঝাঁক বেঁধে ওড়ে। মাঠের মধ্য দিয়ে যে রাস্তাগুলো ছিল, তার চিহ্ন পর্যন্ত নাই। এত বড় বড় রাস্তা, বাদশাহী সড়ক গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, সে রাস্তা পর্যন্ত ভেঙে-চুরে খোয়া ইট পাটকেল পাথর সমস্ত উপড়ে দিয়ে কালভার্ট ভেঙে একেবারে 'জাওন গাড়ি' অর্থাৎ পঙ্কক্ষেত্র করে দিয়ে গেছে। রাস্তা ছোট কথা, রেল-কোম্পানির এমন মজবুত লাইনের বাঁধ, সে পর্যন্ত ভেঙে ধুয়ে নিয়ে গেছে; বোল্ট-নাটে আঁটা লোহার লাইন বেঁকে কোথাও ভেঙে গেছে, কোথাও ঝুলছে ত্রিশঙ্কুর মত। একটা ব্র্যাঞ্চ লাইনের মাঝারি আকারের একটা ব্রিজের দশটা পিলারের মধ্যে তিনটে পিলারের গোড়ায় মাটি এমন খুলে গেছে যে, সেখানে জলের গভীরতা পঁচিশ থেকে ত্রিশ ফুট, একটা পিলার মুচড়ে ভেঙে দুখানা হয়ে গেছে। এখনও অবশ্য উপরের রেললাইনের ভারে এবং লাইনের বাঁধনের টানে কোনোমতে ত্রিভঙ্গ-মুরারির মত দাঁড়িয়ে আছে সেটা, এবং রেলকোম্পানি মোটা রশা ও তারের রশি দিয়ে বেঁধেছে চারপাশে, বড় বড় মজবুত শালের ঠেকাও দিয়েছে। সেটার উপর দিয়েই পিঁপড়ের মত সুড়সুড় করে এখন ট্রেন পার হয়। প্যাসেঞ্জারদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে; হঠাৎ কেউ হয়ত ভয়ে আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠে, হরিবোল! সঙ্গে সঙ্গে হরিধ্বনির রোল উঠে যায়। মুসলমানেরা এসব অঞ্চলে সংখ্যায় কম। তাদের কখনও ধ্বনি তুলতে শোনা যায় না, কিন্তু উৎকণ্ঠায় সমান স্থির হয়ে বসে থাকে। মিহির ডাক্তারও

মধ্যে মধ্যে যায় আসে এই পথে। সে জানে, বহুদর্শী বিচক্ষণ ইঞ্জিনীয়ার বিশেষভাবে পরীক্ষা করে অনেক বিবেচনার পর নিরাপত্তার বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হয়ে তবে ট্রেন চলাচল করতে দিয়েছে, তবুও তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায় এই সময়টায়। সেও অপরাপর যাত্রীদের মত স্থির আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে। ত্রিপুরা ভট্টাচার্যও মধ্যে মধ্যে যান এই পথে গঙ্গাস্নানে; নিয়তিরহস্যকে যিনি—রসসাহিত্যকে রসিকজনের গ্রহণ করার মত—নির্বিকারভাবে গ্রহণ করেছেন বা গ্রহণ করতে চেষ্টা করেন, তিনি পর্যন্ত এই সময়ে স্থির শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চেয়ে নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকেন, হৃৎস্পন্দন তাঁরও বাড়ে।

এই সমস্ত প্রত্যক্ষ ধ্বংসলীলা বাদেও যে কোনো স্থানের মাটিতে পা দিলেই মনে পড়ে ভাদ্রের বন্যার কথা। মাটি এখনও ভিজে, রাত্রি একটু গাঢ় হলেই মাটিতে পা দিলে মনে হয়, স্যাঁতসেঁতে নদীকূল দিয়ে চলেছি। মিহির ডাক্তার এবং ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের গ্রাম ফুল্লরাপুর যে এমন শুকনো খটখটে গ্রাম, যে গ্রাম সম্বন্ধে লোকে চিরকাল বলে আসছে, 'দুনিয়া ডুবলে এক হাঁটু জল', সে গ্রামে পর্যন্ত এবার বানের জলের ঠেলা এসে পৌঁছেছিল। গ্রামের মাটি পর্যন্ত এখনও শুকোয় নাই। কার্তিক মাসে সন্ধ্যার পর ঠাণ্ডা অবশ্য চিরকালই পড়ে, কোনো কোনো বার ভোর-রাত্রে গায়ে কাপড়ও দিতে হয়, এবার কিন্তু কার্তিকের প্রথমেই লেপ পাড়তে হয়েছে, সন্ধ্যার পর থেকেই মেঝেতে পর্যন্ত যেন হিম ওঠে। ভাদ্রের বন্যাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না এবং সেই বন্যার ফলে যে নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাবে বা যাচ্ছে তাতেও কারও কোনো মতদ্বৈধ নাই। ত্রিপুরা ভট্টাচার্যেরও না, মিহির ডাক্তারেরও না। তবু কিন্তু দুজনের মনের বিরোধ মেটে নাই। ভট্টাচার্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, সকলই তোমারই ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

মিহির ডাক্তার নিষ্ঠুর অবজ্ঞায় হেসে বলে, অতএব তোমরা মায়ের রুষ্ট ইচ্ছাকে তুষ্ট করবার জন্যে পূজো দাও, মানত কর, প্রণামী দাও।—বলে বক্রহাসি হেসে স্পিরিটে ভেজানো তুলো দিয়ে ইঞ্জেকটিং সিরিঞ্জের স্থচটা মুছে নেয়, তারপর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জেলে সামান্য এক টুকরো ওই তুলো জ্বালিয়ে স্থচটাকে পরিশোধন করে নেয়।

ডাক্তারখানার বাইরের দাওয়ায় বসে শশী ডোম বলে, ডাক্তারবাবু!

—কে? শশী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি? কুইনিন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—রোগীতে কুইনিন পাচ্ছে না, তোকে কোত্থেকে দেব রে ?

শশী বললে, আজ্ঞে, তাহলে যে আমি মরে যাব বাবু, রোগ ধরলে—। শশী চুপ করে যায়।

ডাক্তার একটু হাসে। বলে, কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবে। এই ধান-চালের বাজার, তার ওপর তোর আবার রাত্রের কাজ! কি রে? —ডাক্তার এবার হা-হা করে হাসে।

শশী মাটির দিকে মুখ নামিয়ে চুপ করে থাকে। সেও মুচকে মুচকে হাসে, এবং সে হাসিটুকু অপরের কাছে লুকোবার জন্যই সে মুখ নামায়।

২

শশী ডোম এ অঞ্চলে সর্বজনপরিচিত ব্যক্তি। সরকারী মহল থেকে ভিখিরী-নিকিরি, এমন কি এখানকার কুকুরগুলো পর্যন্ত তাকে চেনে। সে হিসেবে শশীর খ্যাতিকে অস্বীকার করা চলে না; তবে বিখ্যাত নয়, কুখ্যাত শশী এখানকার পাকা দাগী চোর। শশী ম্যালেরিয়ার সময়টায় কুইনিন খায়! শুধু এবার এই নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাবার বছরেই নয়, বরাবরই সে খায়। 'কার্তিকের সাত অঘ্রানের আট, ভাতার পুতকে যতনে রাখ, হাঁড়ি তুলে শুধাবি ভাত।' এ সময়টায় পেট পুরে খেতে দিতে পর্যন্ত বারণ আছে। শশী সেও পালন করে। কুইনিন খাওয়ার উপকারিতা সে বুঝে এসেছে জেলে। সে অনেকদিন আগে, শশীর তখন কাঁচা বয়েস, জেল বোধ হয় দ্বিতীয় বারের জেল, বর্ধমান জেলে কয়েদীদের মধ্যে কম্পজ্বর দেখা দিয়েছিল। সেই সময় সপ্তাহে দুদিন কি তিন দিন কয়েদীদের ফাইলবন্দী অর্থাৎ সারিবন্দী দাঁড় করিয়ে জেল-ডাক্তার প্রত্যেকের হাতে দিত এক-একটা কুইনিনের বড়ি; তারপর জমাদার হাঁকত, স—র—কা—র—

কয়েদীরা সেলাম দিয়ে টপাটপ মুখে ফেলে দিত কুইনিনের বড়ি। এর ফলে শশী ওই কম্পজ্বরের লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যেও মহাবীরের মত অকম্পিত শরীরে দিন দিন উত্তরোত্তর শক্তি-সামর্থ্য লাভ করেছিল; সঙ্গে সঙ্গে সে উপলব্ধি করেছিল 'কুনিয়ানে'র উপকারিতা। অবশ্য আরও একটা বল তার ছিল, ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের দেওয়া মা চণ্ডীর আশীর্বাদী দিয়ে তৈরী করা মাদুলি। 'কুনিয়ান' খাওয়ার সঙ্গে মাদুলিটা ধুয়েও সে নিয়মিত জল খেত। ডাক্তারেরা বলেন, ব্র্যাণ্ডি সহযোগে কুইনিনের কার্যকরী শক্তি বেড়ে যায়; শশীর ধারণা,

ভট্টাচার্যের মা-চণ্ডীর মাতুলী-ধোয়া জল সহযোগে ডাক্তারী 'কুনিয়ান' অব্যর্থ। ম্যালেরিয়ার বাবারও সাধ্যি নেই যে, কাছে আসে। শশী তার সহচর-অনুচরদের বহুবার এ কথা বলেছে। কিন্তু তারা তেতো বলে আর কান ভোঁ-ভোঁ করে বলে 'কুনিয়ান' কিছুতেই বরদাস্ত করে উঠতে পারে না।

শশী, মিহির ডাক্তারের দোকান থেকে ম্যালেরিয়ার সময় নিয়মিত কুইনিন কিনে খায়; চণ্ডীতলায় যায়, কোনোদিন দুটো কলা, কোনোদিন দুটো শশা, কোনোদিন বা গণ্ডাখানেক উচ্ছে মায়ের উঠনে ঢেলে দিয়ে প্রণাম করে, ভট্টাচার্য মশাইকে বলে, একটুকুন চন্নামেত্য দেবেন বাবা।

ভট্টাচার্য প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিতে পারেন না, শশীর হাতে চরণামৃত দিয়ে বলেন, তোর ভক্তি তো অগাধ রে শশী, কিন্তু মা তোকে সুমতি কেন দেন না, সেইটে বুঝি না।

শশী চরণামৃতটুকু সুপ করে মুখে টেনে নিয়ে হাতখানি মাথায় বুলোতে বুলোতে দাঁত মেলে হাসে!

মিহির ডাক্তারের কুইনিন এবং ভট্টাচার্য মশাইয়ের চরণামৃতের বলে বলীয়ান হয়ে সে গভীর রাত্রে বর্ষার ঝিপিঝিপি জলে ভিজে, হিমেল বাতাস গায়ে লাগিয়ে চুরি করে বেড়ায়।

মিহির ডাক্তার এবং ত্রিপুরা ভট্টাচার্য দুজনেরই উপর সমান ভক্তিমান শশী। ডাক্তার এবং ভট্টাচার্য দুজনেই এই নিষ্ঠার জন্য চোর শশীকে না ভালোবেসে পারেন না।

ডাক্তারের কথা শুনে শশী একটু চিন্তিত হল। ডাক্তার বললেন, সত্যিই কুইনিন আজ পাবি না।

শশীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। 'কুনিয়ান' পাওয়া যাবে না?

দূরে আকাশে কোথায় গোঁ-গোঁ শব্দ উঠেছে। রাস্তার লোকজন মধ্যে মধ্যে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। ছোট ছেলেগুলোর হাড়-পাঁজরাসার অবস্থা; কেউ দুদিন, কেউবা চার দিন মাত্র জ্বর থেকে উঠেছে, এই অবস্থাতেও সব ছুটে বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে। উড়ো-জাহাজ! উড়ো-জাহাজ!

শশী একবার আকাশের দিকে তাকালে, উড়ো-জাহাজটা এখনও নজরে পড়ার মত কাছে আসে নাই; দেখা যাচ্ছে না। দেখতেও ইচ্ছে হয় না। এক তো দেখে দেখে অরুচি ধরেছে প্রায়। সকাল থেকে রাত্রি দু পহর তিন পহর পর্যন্ত ওগুলোর যাওয়া-আসার বিরাম নাই; গোঙাতে গোঙাতে যাচ্ছে আসছে, আসছে যাচ্ছে। কখনও একখানা, কখনও দুখানা চারখানা একসঙ্গে, মধ্যে

মধ্যে আবার দশ-বিশখানা—পাখীর দলের মত ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়। তার উপর, ওগুলোর উপর শশীর ভয়ানক রাগ। তার ধারণা, ওইগুলোর ধাক্কা লাগাতেই এবার বর্ষার মেঘ ছিরকুটে গিয়ে এমন ধারার সর্বনাশা জল ঢেলেছে, তাতেই ভাদ্রে এমন প্রলয়-বান হয়েছিল।

ওগুলো নাকি যুদ্ধ করতে যায়। যুদ্ধ! —কথাটা মনে করে শশী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। এখানকার লোকে বলে, কাল-যুদ্ধ! ত্রিশ টাকা, পঁয়ত্রিশ টাকা মণ চাল! দশ টাকা বিশ টাকা জোড়া কাপড়, চিনি নাই, কেরোসিন তেল আনতে হয় ইউনিয়ন বোর্ডের টিকিট দেখিয়ে, সাগুর সের চার টাকা; ওসব দূরের কথা, ভাঙা দরজা মেরামত করবার জন্য একটা পেরেকের দরকার হয়েছিল শশীর, একটা পেরেকের দাম নিয়েছে চার পয়সা!

শশী দোকানীর উপর ভয়ানক চটে গিয়েছিল, একটা পেরেকের দাম চার পয়সা?

দোকানী হেসে বলেছিল, এর পরে চার আনা দিলেও আর পাবি না।

—পেরেকটা নিয়ে আমার বুকে ঠুকে বসিয়ে দাও আরও চারটে পয়সা দেব। —বলে রাগ করে শশী একটা আনি ফেলে দিয়ে পেরেকটা নিয়ে এসেছিল, এবং সেই দিন রাত্রে দোকানীর গোলা থেকে দুটি বস্তা ধান চুরি করে এর শোধ নিয়েছিল। শোধ বলা চলে না, সাজা দিয়েছিল বলতে হয়; কারণ দুটো বস্তায় অন্তত এক মণ হিসেবে দু মণ ধানের দাম আঠারো টাকা দরে ছত্রিশ টাকা। শশী অবশ্য পেয়েছে পনের টাকা। চার পয়সার বদলে পনের টাকা—নরুনের বদলে নাকের চেয়েও বেশি।

ধান-চালের দরের দিক দিয়ে হিসাব করলে শশীর এখন চরম সুসময়, এবং সত্যিই শশীর আর্থিক অবস্থা এখন ভালো। মধ্যে তার স্ত্রী একদিন একখানা পাঁচ টাকার নোট, এক টাকার নোট ভ্রম করে হাটে বাজার করতে বের করেছিল, খোদ দারোগা হাটে ছিল, সে পর্যন্ত দেখেছে। কিন্তু তবু শশী ধান-চালের এই বাজারের জন্য হায়-হায় করে। বৈশাখের শেষ থেকে ধান-চালের অভাবে মানুষের সে হাহাকার, না খেতে পেয়ে মানুষের মরণের কথা মনে হলে আজও শশী মদের মুখে বলে, ভগমান, কানে কালা করে দাও, চোখে কানা করে দাও। না হয়ত একেবারে জানে মেরে দাও বাবা।

নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাবার সেই গৌরচন্দ্রিকা, অর্থাৎ আরম্ভ। আষাঢ় শ্রাবণে লোকে খেতে পেলে না, তারপর ভাদ্রে হল বান!

অকালের পর বান, বানের পর মড়ক। নরমুণ্ড গড়াগড়ি কথার কথা নয়,

প্রত্যক্ষ বাস্তব, সত্য সত্যই গড়াগড়ি যাচ্ছে। গ্রামে কাক নাই, কুকুর নাই, অন্নহীন গ্রাম ছেড়ে নরমাংস-লোভে তারা শ্মশানে গিয়ে পড়েছে। গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শ্মশান, ও-দিকটার আকাশে প্রায় অহরহই শকুনের পাল পাক খেয়ে উড়ছে দেখা যায়। শরীর শিউরে ওঠে। শ্মশানের মড়া পোড়াতে গেলে পাঁচটা দশটা মড়ার মাথা বাঁশ দিয়ে গড়িয়ে নদীতে না ফেলে চিতা সাজানো যায় না।

শশী সেদিন তার জ্ঞাতি-ভাইকে পোড়াতে শ্মশানে গিয়েছিল। কাঁচা বয়েস, শূর বীরের মত চেহারা, বুকের ছাতিখানা দেখে মনে হত যেন পাকা তালগাছের গোড়া। আকালের বাজারে খেতে না পেয়ে হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে হয়েছিল যেন শুকনো খেজুরগাছ। তারপর ধরল জ্বরে; জ্বরের পরেই হাত-পা ফুলতে শুরু হল। দিন পনের পর ঘরের চালের ফুটোয় তালপাতা দিয়ে ঢাকতে উঠে হঠাৎ 'কি হল' বলে চাল থেকে নেমে মাটিতে পা দিয়েই কাটা গাছের মত মাটির উপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। তাকে পোড়াতে গিয়ে শশী খানিকটা দূরে বসল। শরীর তার শিউরে উঠেছিল। চারিদিকে মড়ার মাথা আর হাড় ভাইপোর চিতা সাজাতে চার-চারটে মড়ার মাথা ছুঁড়ে ফেলতে হল নদীর জলে। হরন্দ অর্থাৎ হরেন্দ্র চিতা সাজাচ্ছিল, সে-ই বললে, উটা তাঁতী-বউয়ের মাথা, উইটা হল ঘোষেদের ছোটকার, আর উইটা লাগছে যেন মিচ্ছিরীদের ঝিউড়ী মেয়েটার।

হবে। তার আর আশ্চর্য কি। হরেন্দ্র এ বাজারে মড়া পোড়াবার কাঠ কেটে দেওয়ার কাজ করতে আরম্ভ করেছে। প্রায় প্রতি মড়ার সঙ্গেই সে শ্মশানে আসে।

একজন বলেছিল, বাকিগুলান ?

হরেন্দ্র এবার চুপ করে গিয়েছিল। চারদিকেই মড়ার মাথা, চোখ-নাকে শূন্য গহ্বর, দু পাটি প্রকট দাঁত বের করে সমস্ত মাথাগুলো একই রকম বীভৎস চেহারা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে; জোর বাতাস দিলে গড়িয়ে কোনটা কার জায়গায় গিয়ে ঠেকে, কে তার হিসাব রাখে। মড়ার মাথায় আশ্চর্য কিছু নাই, কেবল মরণ হয়েছে আশ্চর্যের। প্রথমে জ্বর, তারপর পা মুখ ফোলা, তারপর হঠাৎ কারও কারও হচ্ছে কলেরার মত ভেদবমি, তাতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে; কারও আর একটা পাল্টা জ্বর; অধিকাংশ লোকের কিন্তু মরণ আচম্বিতে, ভেদ-বমি জ্বর ওসব কিছুই না, আচম্বিতে মরছে। যে মরছে, সেও জানতে পারছে না, অন্য লোকেও বুঝতে পারছে না, কখন কি হল!

শশী সেদিন অনেক ভেবে-চিন্তে বলেছিল, ভাদর মাসে পাকা তাল পড়ছে যেন! —শশীর উপমাটি হাস্যকর অথবা গ্রাম্য হলেও যারা ভাদ্র মাসে পাকা তাল পড়া দেখেছে, তাদের কাছে ওর মূল্য আছে।

তাঁতী-বউয়ের মাথার কথা হরেন্দ্র বলছিল। তাঁতী-বউয়ের জ্বর হয়ে হাত পা ফুলেছিল সামান্য, বেশি নয়। সেদিন সে সকালে উঠেছে, ঘরের কাজকর্ম করেছে, হাট-বার ছিল, স্বামীকে হাটে পাঠিয়েছে, বিশেষ করে বলে দিয়েছে, হিন্দুস্থানী আমসত্ত্ব-আচারওয়ালারা যদি আসে, তবে একটুকুন আমসত্ত্ব নিয়ে এস।

দাস অর্থাৎ তন্তুবায় মশাই হাট থেকে ফিরে এসে দেখে, দাওয়ার উপর আয়না চিরুনি, সিঁদুরকৌটো তেলের বাটি রেখে বউ শুয়ে আছে পাশেই। শুয়ে নয়, মরে পড়ে আছে।

দত্তদের সেজ দত্ত রাত্রে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে, সকালে আর উঠল না। দিব্যি ঘুমন্তের মতই শুয়ে আছে, দেহ কাঠের মত শক্ত, বরফের মত ঠাণ্ডা, মুখের পাশে খানিকটা গেঁজলা জমে আছে, আর তারই চারিপাশে লেগেছে অজস্র কাঠপিঁপড়ে।

মিছরী মানে মিশ্র-বাড়ির আট-দশজন লোকের মধ্যে থাকল শুধু দেড়জন—একটা বউ, আর ছোট একটা ছেলে, সেটাকে ধরতে হলে আধখানার বেশি ধরা চলে না। আট-দশজনের মরণ ঠিক ওই ভাদ্র মাসের পাকা তাল পড়ার মত। মাস খানেকের মধ্যে বাড়িটা ফাঁকা হয়ে গেল। তিন ভাইয়ের বড় ভাই গাঁজা খেয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ফিকফিক করে হাসছিল, একেবারে হঠাৎ একবার আঁ শব্দ করেই চুপ করে পড়ল মাটিতে মুখ গুঁজে। মেজ জন গিয়েছিল কুটুম্ব-বাড়ি কালীপূজার দিন, বেচারা কুটুম্ব-বাড়ির পূজার মাংস খাবার লোভে যাচ্ছিল। কি যে হয়েছিল, কেমন ভাবে যে মরল, সে কেউ দেখে নাই; তবে দেখা গেল, পথের ধারে একটা গাছতলায় গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে মরে পড়ে আছে। ছোট জন অবশ্য মাসখানেক ভুগে মরেছে। ছোট জনকে পুড়িয়ে এসে শ্মশান-বন্ধুরা হাঁকলে, মুড়ি কই, নিমপাতা কই? এটুকুও ঠিক করে রাখতে পার নি বাপু।

সামনের ঘরের দরজার সামনে একপাটি কপাটে মাথা রেখে মিশ্রগিন্নী তিন সন্তানের শোকে কাতর হয়ে বসেছিল। উত্তর দিতে পারলে না সে।

রূঢ়স্বরে শ্মশান-বন্ধুদের একজন বললে, আমরা তোমাদের চাকর নই। আমাদেরও মরণের ভয় আছে। ছেলে মরেছে, শোক হয়েছে জানি, সইতে

না পার, আমাদের মুড়ি-নিমপাতা দাও, দিয়ে বরং পার তো গলায় দড়ি দিও, জল আছে ডুবে মর, যা খুশি কর।

মিশ্রগিন্নী তবু নড়ল না। এবার একজন এগিয়ে এসে গা ঠেলে বললে, শুনছ গো! অ—! —তার মুখের কথা সে শেষ করতে পারলে না, চোখ বিস্ফারিত করে বললে, এ কি, এ যে—এ যে—! ততক্ষণে তার হাতের নাড়া যেটুকু পেয়েছিল, তারই ফলে মিশ্রগিন্নীর দেহখানা শক্ত কাঠের মত গড়িয়ে পড়ে গেল।

কদিন পরেই মরল মিশ্রদের ঝিউড়ী মেয়েটা। সেও মরে পড়ে ছিল, হাতের কাছে তেঁতুলের আচারের একটা পাতা, হাতে মুখে আচারের দাগ, বোধ হয় খেতে খেতেই মরেছে।

রজনী সরকারের বউ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছিল, একটু তাড়াতাড়িই উঠছিল, হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় বুকে হাত দিয়ে বসে পড়ল, তারপর গড়াতে গড়াতে এসে পড়ল একেবারে নীচে।

মানুষের মরণের বৃত্তান্ত মনে করতে করতে শশীর হাত-পা যেন হিম হয়ে আসে। শরীর আনচান করে ওঠে। শশী অস্থির হয়ে নিজেকে নাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল! কুইনিন না হলে তার চলবে কি করে? জ্বর যদি হয়? তারপর যদি হাত-পা ফোলে? রাত্রে ধান-বোঝাই বস্তা মাথায় করে চলবার সময় কি পথের উপর পড়ে মরে থাকবে?

—কুনিয়ান আমায় চাই ডাক্তারবাবু। দাম যা লেন, দোব আমি। কুনিয়ান আমার চাই।

শশীর রূঢ় কণ্ঠস্বর ও কথার ভঙ্গিতে ডাক্তার চমকে উঠল।

মিহির ডাক্তারও বড় রোখা লোক। সে অন্যায় চোখরাঙানি কারও সহ্য করে না, সে রাজা-রাজড়াই হোক আর শেঠ-মহাজনই হোক কিংবা দারোগা-জমাদারই হোক। ডাক্তার ভ্রূ কুঁচকে ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে বললে, না।—তারপর আপনার কাজ করতে আরম্ভ করলে। একটু পর আবার বললে, যারা রোগে ভুগছে, তাদের না দিয়ে ও ওষুধ তোকে দিতে পারব না। আর বেশি দাম নিয়ে ওষুধ আমি বেচি না।

শশী দমে গেল। আস্তে আস্তে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আর একটা উপায় আছে। ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার। সে দিতে পারে। বেশি দাম নেয় বলেই শশী আজও তার কাছে কুইনিন কেনে নাই। এইবার তাকেই ধরতে হবে। শশী রাস্তার উপর নেমে এসে দাঁড়াল। ডাক্তারের

সামনে কম্পাউণ্ডারকে কুইনিনের জন্য বলা যে উচিত নয়, এ জ্ঞান শশীর টনটনে। ডাক্তারের পাশের ঘরে কম্পাউণ্ডার চিনেমাটির সাদা খলটায় খটখট করে ওষুধ মাড়ছে। এদিকে তাকালেই শশী স্থট করে তাকে দুটি আঙুলের নাড়া দিয়ে ডাকবে।

কম্পাউণ্ডার তাকিয়েছে; শশী হাত তুললে, কিন্তু ডাকা হল না। সে, কম্পাউণ্ডার, ডাক্তার, অন্য রোগী যারা ছিল, তারা সবাই চকিত হয়ে উঠল। থানার সামনে রাস্তাটা যেখানে পশ্চিম মুখ থেকে বেঁকে একেবারে দক্ষিণ মুখে ফিরেছে, সেইখান থেকে রোল উঠল—বল—হ—রি—, হরি—বো—ল!

কেউ গেল আর কি!

কে? ডাক্তার ভেবে দেখছিল, কে হতে পারে। কিন্তু ডাক্তারও ভেবে ঠিক করতে পারে না। চণ্ডীদাস দত্ত? হাফিজ সেখ? নিশি ময়রার পরিবার? মহাদেবের মা? আরও অনেক নাম মনে পড়ল। যে কেউ হতে পারে—যে কেউ। হঠাৎ মনে হল, হতে পারে না কেবল হাফিজ সেখ। ওটা তার ভুল হয়েছে। হরিবোল তুলে হাফিজের যাবার কথা নয়।

মরণের আশ্চর্য কিছু নাই, এ বাজারে বাঁচাই আশ্চর্য, কিন্তু তবুও সবাই রাস্তার ওইদিকটায় চেয়ে রইল। শশীও চেয়ে রইল। চারটে লোক অতি-কষ্টে মড়া বয়ে আনছে; মধ্যে মধ্যে দাঁড়াচ্ছে। সঙ্গে দুটি মেয়ে—একটি বউমানুষ বলে মনে হচ্ছে। এতখানি ঘোমটা।

—বল—হ—রি—

—কে? কে মারা গেল? —ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাওয়ার উপর দাঁড়াল।

—আনু—আনু—আনু ঠাকুর। ওই যে কেষ্টদীঘির পাড়ে থাকত।

—আমার অনিরুদ্ধ, ডাক্তারবাবু, আমার সোনার অনিরুদ্ধ বাবা।—চীৎকার করে উঠল একটি প্রৌঢ় বিধবা, অনিরুদ্ধের মা।—ওরে বাবা আনু রে—! বলে সে সেই পথের ধুলার উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। পিছনে একটি অবগুণ্ঠনবতী মেয়ে। কোলে একটি বছর দুয়েকের ছেলে। ছেলেটিকে জড়িয়ে বেরিয়ে আছে দুখানি হাত, আর মাটির উপর দেখা যাচ্ছে দুখানি পায়ের পাতা; সমস্ত লোকের দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ হল আপনা থেকে; কাঁচা সোনার মত রঙ; কোমল লাবণ্য যেন ঝরে পড়ছে ওই হাত দুখানি থেকে। দুগাছি রঙ-চটা সাদা শাখা ছাড়া কোনো গয়না ছিল না। কিন্তু ওতেই কি শোভা হয়েছে সে হাতের! আহা-হা!

শশীও চেয়ে দেখছিল ওই হাত তুখানি। আন্নুর মা বুক ফাটিয়ে আর্তনাদ করছিল, কিন্তু সমস্ত লোকগুলি সকরুণ অন্তরে আক্ষেপ করে ভাবছিল ওই সোনার প্রতিমার মত মেয়েটির তুর্ভাগ্যের কথা।

ডাক্তার রুমাল দিয়ে চোখ মুছলে।

—আঃ! হায়—হায়—হায়! মা! এ কি করলি মা। —বক্তার কণ্ঠস্বর শুনে সকলে কিন্তু এবার সোনার প্রতিমার দিক থেকেও চকিত হয়ে দৃষ্টি ফেরালে। পূজার ফুলের সাজি হাতে নিয়ে কখন সকলের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ত্রিপুরা ভট্টাচার্য। তাঁর ঠোঁট তুটি কাঁপছে; চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে আসছে; বেদনাকাতর নিষ্পলক দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন ওই বধূটির দিকে।

ভট্টাচার্যের চোখের জল দেখে অকস্মাৎ শশীর চোখ তুটিও করকর করে উঠল। শশীও কেঁদে ফেললে। —আঃ! হায়—হায়—হায়! হে ভগমান!—কয়েক মুহূর্ত পরেই সে কিন্তু নিজেই অবাক হয়ে গেল। আন্নু ঠাকুর মরেছে, তাতে তো তার কাঁদবার কথা নয়! শবটা বহন করে তখন বাহকেরা খানিকটা এগিয়ে গেছে। শশী চোখের জল মুছে ফেললে। তার অন্তরের মধ্যে প্রতিশোধমূলক আক্রোশ জেগে উঠল। আন্নু ঠাকুর পুলিশের গুপ্তচর, সাক্ষাৎ শয়তান, বদমাস, পাজীর একশেষ ছিল আন্নু ঠাকুর। কিন্তু আন্নুর বউ এত সুন্দর! শশী আশ্চর্য হয়ে যায়।

৩

আন্নু ঠাকুর সত্যিই পুলিশের চর ছিল। এখানকার লোক সে নয়, পুলিশের দারোগাই তাকে এনে এখানে রেখেছিল। আন্নুর গ্রাম থেকে আন্নুর সমবয়সী জনকয়েক ছেলে ধরা পড়েছিল—একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মামলায়। আন্নুর সমবয়সী হলেও আন্নুর বন্ধু কোনোকালেই তারা ছিল না। তারা ছিল কলেজের ছাত্র, আন্নু ছিল গ্রাম্য ঠাকুর, অর্থাৎ ভুল সংস্কৃত মন্ত্র আউড়ে পূজা করে বেড়াত। সেই মামলায় সে নির্জলা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে পুলিশের সুনজরে পড়ে। সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আন্নু নিজের গ্রামে সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য এমন ক্রিয়াকলাপ অনেক করেছিল, যার ফলে গ্রামে বাস করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। সর্বশেষে আন্নু নিজের একখানা গোয়াল-ঘরে নিজে আগুন দিয়ে পুলিশকে জানালে, গ্রামের লোকে তাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। পুলিশ সমস্ত বুঝে আন্নুকে গোপনে শাসিয়ে দিয়ে

স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে গেল যে, আন্নুর এ ভাবের অন্যায়কে তারা সমর্থন করতে পারবে না, ভবিষ্যতে বাধ্য হয়ে তাকে সাজা দিতে হবে; এবং সৎপরামর্শ হিসাবে দারোগা তাকে জানালে, এ গ্রাম ছেড়ে ফুল্লরাপুরে গিয়ে বাস করাই তার উচিত। বাজারপ্রধান জায়গা। কাজকর্ম জুটবে। থানার গোপন কাজকর্ম করলে তাতেও কিছু কিছু উপার্জন হবে। আর এখানে থাকলে আন্নুর বিপদ অনিবার্য। আন্নু সেই থেকে এসে এখানে বাস করছিল। আন্নুর মা লোকের বাড়িতে দেবসেবার ভোগ রান্না করত, আন্নু পূজা করত। অন্য সময়ে আন্নু এখানে ওখানে ঘুরে যে সব খবর সংগ্রহ করত, জানিয়ে আসত থানায়। আন্নুর জন্যই শশী ধরা পড়েছে তিনবার। আন্নুর জন্যই ডাক্তারের ফেরারী এক খুড়তুতো ভাই ধরা পড়ল সেদিন। গত আগস্ট মুভমেণ্টের সময় থেকে ডাক্তারের ভাইকে পুলিশ খুঁজছিল।

শুধু শশীই নয়, ডাক্তারই নয়, ত্রিপুরা ভট্টাচার্যও আন্নুর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। চণ্ডীমায়ের ওই পূজক পদটির প্রতি আন্নুর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল। ভট্টাচার্যের পূজাপদ্ধতির ভুল অবহেলা প্রভৃতির প্রতি চতুর চরসুলভ দৃষ্টি সজাগ রেখে ঘোরাফেরা সে অনেক করেছে; না পেরে, ভট্টাচার্যের নামে রটনা আরম্ভ করেছিল—ত্রিপুরা ভট্টাচার্য চণ্ডীতলা লুটে খাচ্ছে। হাতে-নাতে প্রমাণ বাবা, সন্ধ্যের সময় ভটচায্যি যখন বাড়ি যায়, তখন তার পোঁটলাটা দেখো।

চণ্ডীমাকে যে যা পূজা দেয়, তার একটা অংশ ভট্টাচার্যের বিধিমত পাওনা। দেবস্থানের অংশটা ভট্টাচার্য মশায়ই ভাগ করে দেবভাণ্ডারে জমা রাখেন। আন্নু বলত, বেড়ালে মাছ ভাগ করলে গেরস্থতে কি পায়? এখানকার লোকেরা কানা—কানা—কানা।

তাতেও যখন কিছু হল না, তখন আন্নু দারোগাকে বলেছিল, চণ্ডীতলায় ফেরারী আসামীরা সন্ন্যেসী সেজে আসে। আমি নিজে দেখেছি, অল্প বয়েস, গাঁজা খায় না, ইংরেজী বই পড়ে।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়, একজন অল্পবয়সী লেখাপড়া-জানা সন্ন্যাসী এসে-ছিলেন চণ্ডীতলায়; বৃদ্ধ ভট্টাচার্যের ভারি ভালো লেগেছিল সন্ন্যাসীটিকে। যত্ন করে তিনি খাওয়াতেন, যেতে চাইলে আরও দুদিন থেকে যেতে অনুরোধ করতেন। দারোগা একদিন এসে সন্ন্যাসীকে জেরা আরম্ভ করলেন, আপনার নাম কি? বাড়ি কোথায়?

সন্ন্যাসী হেসে বলেছিলেন, সে বলব না, বলবার নিয়ম নয়।

দারোগা তল্লাস করলে সন্ন্যাসীর জিনিসপত্র। কয়েকখানা চিঠিপত্র পড়েই

দারোগা থতমত খেয়ে গেল। রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর কেদার গাঙুলীর চিঠি—প্রাণাধিকেষু, মাই ডিয়ার সান বলে পাঠ, ঘরে ফিরে সংসারী হবার জন্য অনুরোধ মিনতি! দারোগার বুদ্ধি যতই বাঁকা হোক, এ ক্ষেত্রে সোজা জিনিসটা বুঝতে তার বিলম্ব হল না। সে ক্ষমা চেয়ে বললে, যখন যা অসুবিধা হবে আমাকে জানাবেন। মানে, যা দরকার হবে আপনার। মানে, প্রয়োজন হলেই জানাবেন আপনি।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চারিপাশ ঘুরে দেখে, কাকে বললেন জানি না, হারামজাদা বামুনটা কোথায় গেল? আন্নু, সেই আন্নুটা?

সেই আন্নু ভট্টাচার্য আজ মরল।

যারা আন্নুর শবযাত্রা দেখে নাই, তাদের প্রতিটি জন বললে, একটা আপদ গেল। আন্নুর উপর কেউই সন্তুষ্ট ছিল না।

শশী এসে আপনার দাওয়ার উপর বসল, বার বার ভাবতে চেষ্টা করলে, আন্নু মরেছে, বেশ হয়েছে। কিন্তু বার বারই তার মনে হল, নরম সোনায় গড়া সুডৌল দুখানি হাতের কথা। রঙ-উঠে-যাওয়া সাদা দুগাছি শাঁখায় সে হাত দুখানি কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল! সেই হাত দুখানিকে নিরাভরণ কল্পনা করতে গিয়ে বার বারই তার চোখে জল এল।

শশীর স্ত্রী ঘরের ভিতর কাজ করছিল। শশীর পায়ের শব্দ সে চেনে। গভীর রাত্রে শশী যখন দ্রুত এবং প্রায়-শব্দহান পদক্ষেপে বাড়ি ফেরে, তখন সে জেগে কান পেতে বসে থাকে এবং শশীর পদক্ষেপ প্রায়-শব্দহীন হলেও ওই অতিক্ষীণ শব্দের মধ্য থেকে বুঝতে পারে যে, শশী ফিরেছে। সে দরজা খুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার পাশে। শশীর পায়ের শব্দ শুনেই সে জল-পরিপূর্ণ ঝকঝকে তকতকে একটি কাঁসার বাটি এনে তার পাশে নামিয়ে দিলে। শশী কুনিয়ান খেয়েছে, এইবার মাদুলিধোয়া জল খাবে। বাটিটার দিকে একবার চেয়ে দেখে শশী চোখ ফিরিয়ে নিলে।

বউ বললে, খাও।

শশী তার দিকে চেয়ে ফিরে চেয়ে বললে, উ?

—মায়ের মাদুলি ধুয়ে জল খাও। ওই দেখ, জল দিয়েছি।

—হুঁ।

বউ চলে যাচ্ছিল। শশী ডেকে বললে, বোতলটা দে তো।

—বোতল?—শশীর বউ আশ্চর্য হয়ে গেল।

—হ্যাঁ।—আবার শশী বউয়ের দিকে ফিরে চাইলে। বউ আতঙ্কিত হয়ে উঠল;

এই ফিরে চাওয়ার মানেই হল, শশী এইবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে এসে তার চুলের মুঠি ধরে মাটির উপর আছড়ে ফেলে ছুটি লাথি মেরে বলবে, হ্যাঁ, বোতল। শুনতে পাও না হারামজাদী ?···শশী উঠল। বউটা ভয়ে চোখ বুজে ঘাড় পিঠ সংকুচিত করে হাত ছুটি মাথার উপরে তুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। শশী কিন্তু বউকে মারলে না, সে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে বোতলটা বার করে খানিকটা নির্জলা মদ খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মনে হল, বুকের ভিতরটা যেন হু-হু করছে, মাথার তালু থেকে সমস্ত কপালটা কেমন ঝিমঝিম করছে। গায়ে যেন বল নাই, পা যেন টলছে। এতটুকু মদে এতখানি নেশা শশীর কখনও হয় না।

ঘুরতে ঘুরতে সে এসে দাঁড়াল লা-ঘাটার ঘাটে। সামনে নদী দেখে তার খেয়াল হল। ঘাটের পূব দিকে শ্মশান। সে নিজেই চমকে উঠল। শ্মশানে তিনটে চিতা জ্বলছে। শশীর দেহ থেকে বল যেন নিঃশেষে চলে গিয়েছে, তার হাত-পা নাড়বারও যেন ক্ষমতা নাই, তার মুখটা পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেল, হাঁ করে সে চেয়ে রইল ওই তিনটে জ্বলন্ত চিতার দিকে। মরণকে শশীর বড় ভয়।

ও-পার থেকে খেয়া-ডোঙাটা এসে এ-পারে লাগল। যাত্রী নাই। অকারণেই ডোঙাটা নিয়ে এসে এ-পারে লাগালে নোটন মুচি—ডোঙার খেয়া-মাঝি। চারিদিকে রোগ আর রোগ, লোকের পথ হাঁটবার উৎসাহ কোথায় ? তবু নোটন বসে থাকে ডোঙা নিয়ে ; পেটের দায়, বিশ টাকা মন চাল, সে চাল আসবে কোথা থেকে ? যে ছু-চারজন কি দশজন আসে, তাদের পার করলেও কুড়ি পয়সা হবে। সে ডোঙার উপর বসে থাকে আর শ্মশানের চিতার সংখ্যা গণনা করে যায়। ওতে নোটনের সময় কাটে। শশী নোটনের একজন বড় মক্কেল। বন্যার সময় ছু-একদিন রাত্রে শশী নোটনকে ডাকে। নোটন তাকে পার করে দেয়। তার জন্য শশী যা দেয়, আজকালকার রোজগারের অনুপাতে সে নোটনের দশ-বিশ দিনের রোজকার !

—শশী !

—অ্যাঁ ?—নিতান্ত বোকার মত শশী উত্তর দিলে।

—কিছু বলছিস নাকি ?—মৃদুস্বরে নোটন প্রশ্ন করলে, আজ রাত্রে ডোঙা চাই নাকি ?

শশী উদাস কণ্ঠে বললে, আন্থু ঠাকুর আজ মলো।

নোটন অবাক হয়ে গেল। আন্থু মরেছে, তাতে শশী এমন মনমরা হয়ে গেল কেন ? শশী বললে, পোড়াতে এসেছে আন্থুকে।

নোটন কথাটা জানে, সে এই ঘাটেই বসে আছে,—ডোঙার উপর বসে চোখ মিটমিট করে দেখছে, কে কে এল শ্মশানে। এই তো এখন তার একমাত্র কাজ হয়েছে। আজ সকাল থেকে এসেছে আটজন। ভোরবেলায় একদল তার আসবার আগেই চলে গেছে। তারপর সকাল থেকে আটজনের মধ্যে আকুনিয়া গ্রামের দুজন, কৃষ্ণপুরের একজন, ফুল্লরাপুরের পাঁচজন—ছিদেম বাউড়ীর বউ, হরিশের নাতি, কণ্ঠর মা, গোকুল ডোম, সব শেষে এসেছে আন্নু ঠাকুর।

নোটন বললে, হ্যাঁ। ওই সব চান করে উঠছে ঘাট থেকে।

শশী ব্যগ্র দৃষ্টিতে শ্মশানের ঘাটের দিকে তাকাল। নোটন নদীর বুকে ডোঙার উপর বসে আছে, সে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে শশী কিছু দেখতে পেলে না। নদীর খাড়া উঁচু পাড় এবং পাড়ের উপরে কালো-জামের ঝাঁকড়া গাছগুলাতে ঘাট আড়াল পড়েছে।

শশী এক-পা এক-পা করে এগিয়ে চলল।

নোটন আশ্চর্য হয়ে গেল। মরণকে শশীর বড় ভয়, নেহাত দায়ে না পড়লে সে শ্মশানে আসে না। সে ডাকলে, শশী!

শশী এগিয়ে গেল, কথার উত্তর দিলে না।

—আহা, মেয়েটি তো নয়, সত্যিই ননীর পুতুল!

স্নান করে উঠে গা-মোছা হয় নি, কাপড় নিঙড়ে ফেলতে পারে নি, ভিজে কাপড় সর্বাঙ্গে লেপ্টে লেগে গেছে। ভিজে ময়লা কাপড়খানার উপরেও গায়ের চাঁপাফুলের মত রঙ ফুটে বেরিয়েছে। কালো চামরের মত কসকসে কালো রুখু চুলের রাশির প্রান্তভাগটা কাপড়ের প্রসার ছাড়িয়ে ঝুলে পড়েছে। চুলের ডগাগুলি বেয়ে জল পড়ছে, রোদের ছটায় টলমলে মুক্তোর মত টোপা টোপা জলবিন্দু। শশী দেখতে চেয়েছিল সেই সুন্দর হাত দুখানি। শাঁখা দুগাছা ভেঙে দিয়েছে, লোহা খুলে ফেলে দিয়েছে—ননীতে গড়া সেই সুন্দর হাত দুখানিকে খালি নিরাভরণ দেখে মনে সে দুঃখ পেতে চেয়েছিল। কিন্তু তার হাত দুখানি কাপড়ের মধ্যে ঢাকা পড়েছে। সে তাকালে পায়ের দিকে। ইটে ঘষে আলতার দাগ তুলে দিয়েছে, পা দুখানি দেখে শশীর কান্না পেল। আঃ—আঃ—হায়—হায় রে!

ঠিক সেই মুহূর্তেই বের হল বউটির হাত দুখানি। আন্নুর মায়ের কোলে ছিল দু বছরের খোকা। নিরাভরণ হাত দুখানি বের করে বউটি ছেলেটিকে নিজের কোলে নিতে চাইলে।

আন্নুর মা বলে উঠল, থাক, থাক, আমার কোলেই থাক। কিন্তু মেয়েটি শুনলে না, মানলে না, জোর করে টেনে ছেলেটিকে নিয়ে আপনার বুকে ফেলে জড়িয়ে ধরলে।

শশী দেখছিল সেই শূন্য দুখানি হাত।

ননী দিয়ে গড়া চাঁপার বরণ হাত দুখানিকে আগের চেয়ে লম্বা দেখাচ্ছে; খাঁ-খাঁ করছে হাত দুখানি, ওই হাত দুখানির দিকে চেয়ে শশীর মন খাঁ-খাঁ করছে। বউটির আশপাশ, চারিদিকের মাঠ-ঘাট সমস্ত খাঁ-খাঁ করছে, যেন বউটি তার ওই খাঁ-খাঁ করা খালি হাত বুলিয়ে দিয়েছে সমস্ত কিছুর উপর।

ব—ল—হ্—রি হরি—বো—ল! শ্মশানবন্ধুরা ধ্বনি দিয়ে উঠল।

সামনেই চণ্ডীতলা। সকলে গিয়ে উঠল চণ্ডীতলায়। এখানকার নিয়ম এই। শ্মশান থেকে ফিরবার পথে চণ্ডীতলায় প্রণাম করে তবে গ্রামে প্রবেশ করে। মায়ের আশীর্বাদী পুষ্প নেয়, চরণোদক খায়, চণ্ডীতলার মৃত্তিকা গায়ে মাখে। শ্মশানের অকল্যাণ দূরে যায়। শশীও গিয়ে ঢুকল চণ্ডীতলায়।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আন্নুর মা কেঁদে উঠল, চণ্ডীমায়ের উঠানে সে মাথা কুটতে আরম্ভ করলে, কি করলে মা গো? কি দোষ করেছিলাম গো?

ভট্টাচার্য বললেন, কেঁদো না, কেঁদো না। ওঠ, ওঠ।—ভট্টাচার্যের কথা বলার ভঙ্গি সেই চিরকেলে আশ্চর্য ভঙ্গি। সুখও নাই, দুঃখও নাই, অদ্ভুত! বললেন, নাও, চরণোদক নাও। পুষ্প নাও।

আন্নুর মা উঠল। ভট্টাচার্যের কথা বলার এই ভঙ্গির এমনিই গুণ। শুধু আন্নুর মা নয়, সব মানুষকেই উঠতে হয়, চোখ মুছতে মুছতে চরণোদক-পুষ্প নিতে হয়। যতক্ষণ এখানে থাকে, ততক্ষণ সে আর কাঁদতে পারে না। ভট্টাচার্য হাসেন, যে হাসি তিনি পৌত্রের অসুখে হেসেছিলেন, বাবুর দৌহিত্রের শিয়রে বসে হেসেছিলেন; বলেন, মাকে নিষ্ঠুর বল না মা। সংসারে কত দুঃখ, কত কষ্ট, কত পাপ। তা থেকে মুক্তি দিয়ে ধুলো ঝেড়ে তিনি তাকে আপন বুকে তুলে নিয়েছেন। এ তো মুক্তি! নিজের মুক্তি কামনা কর।—যারা শোনে তারা উদাস হয়ে চেয়ে থাকে, চোখের জল যেন থমকে যায়।

আন্নুর মা চোখ মুছে চারিদিকে চেয়ে বললে, বউমা কোথায় গেল? বউমা! অ বউমা! আঃ কি বিপদেই আমি পড়েছি মা!

বউটি দাঁড়িয়ে ছিল নাটমন্দিরের একটি থামের আড়ালে। এদিক ওদিক

দেখে আন্নুর মা তাকে টেনে নিয়ে এল।—দিন বাবা, খোকাকে চরণোদক-পুষ্প দিন। ওই খুদকুঁড়োটুকুই আমার সম্বল—আমার আন্নুর—

কণ্ঠস্বর তার রুদ্ধ হয়ে এল। আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে আন্নুর মা বউয়ের ঘোমটার ফাঁকে মুখ রেখে বললে, হাত পাত, চরণোদক নাও, পুষ্প নাও, খোকাকে দাও, নিজে খাও। হাত পাত।

বউটি মুখ তুললে, মুখের ঘোমটা একটু সরিয়ে সে চাইলে শাশুড়ীর দিকে।

আন্নুর মা বললে, বিরক্ত হয়েই উচ্চকণ্ঠে বললে, আমার মাথা খেয়ে হাত পাত। চরণোদক নাও। খোকাকে দাও, নিজে খাও। হাত পা—ত।

এবার সে হাত বাড়ালে। তারুণ্যের অপরূপ লাবণ্যে ভরা সুগৌর সুডৌল দুখানি হাত বৈধব্যের নিরাভরণ দীনতায় কাঙাল হয়ে গেছে। আন্নুর দেহ যখন নিয়ে যায়, তখনও হাত দুখানিতে রঙ চটা পুরানো সাদা শাঁখা দুগাছিতে যে শোভা ছিল, সে শোভা ত্রিপুরা ভট্টাচার্য দেখেছিলেন। চরণোদক দিতে দিতে তিনি বলে উঠলেন, তারা—তারা—মা!

তারা-নাম ভট্টাচার্য প্রায়ই উচ্চারণ করেন। নাম উচ্চারণের জন্য নয়, তাঁর কণ্ঠস্বরের জন্য সকলেই ঈষৎ চকিত হয়ে উঠল। সকলেই তাঁর মুখের দিকে তাকালে। তাকালে না শুধু মেয়েটি। ছেলেটিকে এক হাতে কোলে চেপে ধরে একটি হাত বাড়িয়ে সে তেমন ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

ভট্টাচার্যের চোয়ালের হাড় দুটি অস্বাভাবিক চাপে উঁচু হয়ে উঠেছে, নীচের ঠোঁট উপরের ঠোঁটের উপর ঠেলে উঠেছে; যেন মৃদু দ্রুত কম্পনে কাঁপছে মনে হয়।

ভট্টাচার্যের বুকের ভিতর সত্যই একটা আবেগ জেগে উঠেছিল। বহুকাল, বোধ হয় ত্রিশ বৎসর পূর্বে তাঁর একমাত্র কন্যা চোদ্দ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল, তাঁর মনে পড়ে গেল সেই স্মৃতি। কিন্তু তাঁর কন্যার নিরাভরণ হাত দুখানিতে এমন কাঙাল ভাব ফুটে ওঠে নাই। প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করে ভট্টাচার্য বললেন, আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার ছেলে শতায়ু হবে, মানুষের মত মানুষ হবে। ও-ই তোমার দুঃখ ঘোচাবে।

আন্নুর মা আবার হাউ হাউ করে উঠল। শুধু আন্নুর মা নয়, শ্মশানবন্ধুরা সকলেই চোখ মুছলে। কিন্তু অবগুণ্ঠনাবৃতা ওই মেয়েটির কোনো স্পন্দন-চিহ্ন বুঝা গেল না। ভিজে কাপড় তখনও প্রায় গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে লেগে ছিল, তবুও কিছু বুঝা গেল না।

চরণোদক দিয়ে ভট্টাচার্য তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে চলে গেলেন। ঘাটে কে

বসে রয়েছে! উবু হয়ে বসে হাতের ছাঁদের মধ্যে মাথা গুঁজে বসে ছিল শশী। ভট্টাচার্য বিরক্ত হয়েই বললেন, কে?

শশী মুখ তুললে। সে বসে বসে কাঁদছিল।

—কি রে শশী, কাঁদছিস কেন?

শশী হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। বললে, আঃ, বাবাঠাকুর, আমার মরণ কেনে হয় না?

—কি হল তোর?

—আঃ, ওই সব কচি কচি মেয়ে বিধবা হচ্ছে বাবাঠাকুর, কত লোক মরে গেছে, এ যে আর দেখতে লারছি বাবা!

আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল! ভট্টাচার্য অকস্মাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন!

আনুর মা পৃথিবীতে অনেক কাল এসেছে। কোপার ঘা খেয়ে ছাদ যখন জমে যায়, তখন মুষলধারার বর্ষণেও যেমন গলে না, তেমন ভাবেই আনুর মায়ের বুকের ভিতরটা জমে গেছে। সংসারের নিষ্ঠুর অভাব-অনটনের বর্ষণের মধ্যে মাঝে মাঝে এক-একটা বজ্রাঘাত হয়, তাতে ছাদের মত জমাট বুকটায় এক-একটা চিড় খায়, সে ফাটল দিয়ে অল্পস্বল্প জল ভিতরে যায়; কিন্তু অধিকাংশই পিছলে বেরিয়ে যায়। সে চণ্ডীতলাতেই বসে ছিল চারটি প্রসাদের জন্য। ভট্টাচার্যের ঠোঁটের কম্পন তার চোখ এড়ায় নাই। সে সেই সুযোগ আঁকড়ে ধরেছে। একটা থামে ঠেস দিয়ে বসে সে ঢুলছিল।

হঠাৎ বউটি তার হাত ধরে টানলে।

—আঃ, ছাড়। কি?

উত্তর না দিয়ে বউটি তবু টানছে। আনুর মা অভ্যাসমত বিরক্তিপূর্ণ উচ্চকণ্ঠে বললে, কি? আমার মাথা খাও তুমি। কি, হল কি?

বউ তার হাতখানা টেনে কোলের ঘুমন্ত ছেলেটির কপালের উপর রাখলে।

আনুর মা এবার ঈষৎ চঞ্চল হল, ভালো করে নিজে ছেলেটির কপালের উপর হাত দিয়ে দেখে বললে, ছ্যাকছ্যাক করছে যেন মনে হচ্ছে। হুঁ। তারপর সে বললে, ও তোমার কিছু নয়। রোদ লেগেছে। রোদ থেকে সরে বস। কথাটা বলে যেন তার তৃপ্তি হল না, বউয়ের হাত ধরে টেনে সরিয়ে এনে বললে, সরে বস।

শশী উবু হয়ে বসে ছিল, তার আর সহ্য হল না, সে রূঢ়স্বরে বললে, কি রকম মানুষ তুমি ঠাকরুন? যেমন বেটা ছিল তোমার, তেমনই তুমি? এইখানেই তুমি নড়া ধরে হিঁচড়ে টানছ, ঘরে গিয়ে তাহলে তো মারবা তুমি ধরে!

শশী জাতিতে ডোম, ও অঞ্চলে ছোটলোক বলে, কিন্তু সে দাগী চোর, সেই কারণে লোকে তাকে ভয় করে। আন্নুর মা তার ক্রুদ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে আত্মসম্বরণ করে বললে, ছেলেটার গা ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে বাবা, তাই বলছি, রোদ্দুর থেকে সরে বস। তা কানের মাথা খেয়ে কথা কানে নেয় না আবাগী, তাই সরিয়ে দিলাম টেনে। আমারও তো বাবা মানুষের শরীর।

শশী এত সব কথা শুনছিল না, সে দেখছিল, বউটি ওই ননীর মত হাত দুখানি দিয়ে ছেলেটির গলা জড়িয়ে ধরেছে। ছেলের কপাল নিজের গালে ঠেকিয়ে গায়ের উত্তাপ অনুভব করছে।

শশী বললে, জর হয়েছে? ঠাকরুন, দেরি করো না। ডাক্তার দেখাও

—ডাক্তার?

—হ্যাঁ। আর বাবাঠাকুর যে পুষ্প দিলেন, গলায় বেঁধে দাও।

আন্নুর মা হাসলে; বললে, ডাক্তার দেখাবার পয়সা কোথা পাব বল?

—যাও কেনে ডাক্তারবাবুর কাছে। ডাক্তারবাবু তো মানুষ বটে, না পাথর? ওই কচি মেয়ের একটি ছেলে, মায়া হবে না ডাক্তারের?

আন্নুর মা শশীর মুখের দিকে চেয়ে নীরবে বসে রইল। সে চাউনির সম্মুখে শশী যেন কেমন অস্বস্তি অনুভব করলে। তাকিয়ে আছে দেখ দেখি! ঠায় একদৃষ্টে, পলক পড়ে না!

আন্নুর মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সকরুণ কণ্ঠে বললে, ওই কচি বউ, কোলে দুধের ছেলে, আমি ওদের মুখে কি দেব বাবা শশী? আমার পোড়া পেটের কথা ছেড়েই দিলাম, ওদের আমি বাঁচাব কি করে? আঃ, আমার সোনার পুতুল বউ!

শশীর চোখ দিয়েও জল পড়তে আরম্ভ হল।

পরদিন সকালবেলা। ডাক্তারের ডাক্তারখানায় রোগীরা এসে বসে আছে। সংখ্যায় ষাটজনের কম হবে না—কঙ্কালসার শরীর, ফুলো ফুলো মুখ, হাত-পাও ফুলেছে, হলুদ চোখ, রুগ্‌ণ গায়ের কাপড়-চোপড়ের গন্ধে বাতাস পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। ঘরের মধ্যে কম্পাউণ্ডার চিনেমাটির বড় খলটায় খটখট শব্দে ওষুধ মাড়ছে। ডাক্তার নাই, কলে বেরিয়েছে। টাকা দিয়ে যারা ডাক্তারকে ডাকে, ডাক্তার তাদের বাড়িগুলো প্রথমেই সেরে আসে।

রোগে যারা বেশি কাতর, তারা কাতরাচ্ছে।

যারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ তারা আলোচনা করছে, কে কে মরেছে গত রাত্রে। বদি দত্তর বউ, মহাদেবের সত্যোবিবাহিত কন্যা ঘোষেদের মেয়ে সরলা। সত্যরাম বাউড়ী মরেছে মাঠে; আউশ ধান কাটতে গিয়েছিল জ্বর নিয়ে। বিকেল পর্যন্ত ফিরল না দেখে খোঁজ করে সত্যরামকে ধানের উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখতে পেয়েছে।

ডাক্তারের ডিসপেন্সারির পাশেই ধ্বজু সিংয়ের দোকান। ধ্বজুর আড়তের সঙ্গে কনট্রোলের দোকান আছে—কেরোসিন তেল, চিনি বিক্রি হয়। তার সঙ্গে আছে সরকারী ভিক্ষে দেওয়ার ব্যবস্থা। ওখানে একটা জনতা জমে গেছে। চাল ফুরিয়ে গেছে, বিলি হচ্ছে ঘাসের বীজের মত এক রকম জিনিস, নাম বলছে—বাজরা। তাই নিতেই ভিড়ের অন্ত নাই। নিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগও করছে।

আন্নুর মাও এসে দাঁড়িয়েছে ওদের মধ্যে। বাজরা নিয়ে সেগুলি নেড়ে চেড়ে বললে, এ কি করে খাবে মানুষে?

ধ্বজু বললে, এও আর বড় জোর আসছে সপ্তা। তার পরই ফুরুবে আর নাই।

একটি লোক হেসে বললে, আজ্ঞে, তা চলবে।

—চলবে! ওই দেখ, কটা বস্তা আর পুঁজি? আর লোক দেখছিস তো?

—আজ্ঞে, এ খেলে সাতদিনেই লোক অনেক পাতলা পড়ে যাবে।

আন্নুর মা ভাবছিল, নাতিকে আর বউটাকে এই একটু বেশি করে খেতে দেবে। তাহলেই সে খালাস। ঝাড়া হাত-পা। পরক্ষণেই সে শিউরে উঠল। বউটাই তো ভরসা। কালই সে কথা আন্নুর মা খুব ভালোভাবে বুঝে নিয়েছে। ভট্টাচার্য কেঁদেছে সে দেখেছে, এবং সে যে ওই বউটার প্রতি মমতায়, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শুধু কান্নাই নয়, কাল ভট্টাচার্য তাদের যে পরিমাণে প্রসাদ দিয়েছে, সে আন্নুর মা আশাই করে নাই। শশীর কান্নাও তার মনে পড়ল, সেও ওই বউটার উপর মমতায়। শশীই তাকে কথাটা বুঝিয়ে দিয়েছে। সে যে বলেছিল, ওই কচি মেয়ের একটি ছেলে, ডাক্তারের মায়া হবে না!

চণ্ডীতলা থেকে বাড়ি ফিরবার পথে শশীর কথাটা আন্নুর মা পরখ করেও দেখেছে। শশীর কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ডাক্তারের মায়া হয়েছিল। দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে ডাক্তার কারও নয়, ওই সময়টায় সে খানিকটা বিশ্রাম করে, লাখ টাকা দিলেও ওঠে না! ডাক্তার শুয়ে ছিল। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আন্নুর মা ভাবছিল, ডাক্তারকে ডাকবে কি না! ছেলেটার জ্বর সত্যিই

বেশি। বোশেখ মাসের দুপুরের কচি লতার মত নেতিয়ে পড়েছিল। জানালাটা খানিকটা ফাঁক হয়ে ছিল, সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে আন্নুর মা বার দুয়েক চেয়ে দেখে হতাশ হয়ে ফিরেই যাচ্ছিল। হঠাৎ জানালাটা সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে ডাক্তার দেখা দিলে, কে? কি?

আন্নুর মা সভয়ে বলেছিল, আজ্ঞে ডাক্তারবাবু, বউমার খোকাটির বড় জ্বর। হতভাগী আজই হাতের শাঁখা ভাঙলে, সিঁথের সিঁদুর মুছলে, আবার ওই ছেলেটুকু, তার—। আন্নুর মায়ের চোখ ফেটে হু-হু করে জল বেরিয়ে আসছিল—তার আন্নু, আঃ, তার সোনার আন্নু! কিন্তু তার জন্যে সে কাঁদলে লোকে তাকে মায়া করবে না। আন্নুর মা দাঁতে দাঁত টিপে বার বার আঁচল দিয়ে চোখ মুছেছিল।

ডাক্তার বেরিয়ে এসে ছেলেটির কপালে হাত দিয়ে গম্ভীরভাবে বলেছিল, হুঁ। এ যে অনেকখানি জ্বর। কখন জ্বর এল?

—শ্মশান থেকেই বোধ হয়।

ডাক্তার যত্ন করে দেখে ওষুধ দিয়েছে। পয়সার কথা মুখেও আনে নাই। বরং বাড়ির ভিতর থেকে একটা পুরিয়া করে খানিকটা সাগুদানা এনে দিয়ে বলেছিল, এই সাগু করে দিও। সাগুদানা বাজারে নাই, থাকলেও চার টাকা সের।

আন্নুর মা সাগুর পুরিয়াটা নিজে হাতে নেয় নাই। অবগুণ্ঠনবতী বউয়ের কানের কাছে ডেকে বলেছিল, নাও বউমা, সাগুর পুরিয়াটা নাও। ওগো, হাত পাত! আঃ, কি আবাং মেয়ে গো তুমি! হাত—হাত—হাত পা—ত।

ডাক্তার বলেছিল, বকবেন না ওঁকে। ছেলেমানুষ, তার ওপর এত বড় একটা আঘাত—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল ডাক্তার।

আন্নুর মায়ের মুখে ফুটে উঠেছিল অতি ক্ষীণ—কিন্তু অতি বক্র একটি হাসির রেখা। কিন্তু তার শীর্ণ রেখাঙ্কিত মুখের অজস্র রেখার মধ্যে সে হাসি চোখে পড়বার মত নয়।

ধ্বজু সিংয়ের দোকানে সরকারী ভিক্ষা আড়াই সের বাজরা আঁচলে নিয়ে আন্নুর মা এসে দাঁড়াল ডাক্তারের ডিসপেন্সারির সামনে। ছেলেটার আবার ওষুধ চাই। সমস্ত রাত ছেলেটা জ্বরে ধুঁকেছে। ডাক্তার সাগুদানা দিয়েছিল, সে সাগুদানা তেমনিই আছে। মায়ের দুধই খেতে চায় নাই, তো সাগুর জল।

ডিসপেন্সারির দিকে পা বাড়াতে কিন্তু আন্নুর মায়ের দ্বিধা হচ্ছিল। ভাবছিল, ডাক্তারের সামনে সে গিয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু ডাক্তার যদি বলে, ওষুধের

দাম এনেছ? তার চেয়ে বাগদী বুড়িকে সঙ্গে দিয়ে বউটাকে পাঠিয়ে দিলে ওই ফ্যাসাদের মধ্যে আর আন্নুর মাকে পড়তে হবে না। আজ সে বলে দেবে বউটাকে, যাকে বলে—কানে কিল মেরে বলে দেবে, এতখানি ঘোমটার আদিখ্যেতায় কাজ নাই। ঘোমটাটা একটুখানি কম কর। মুখের দিকে চাইলে মানুষের মায়া হবে—মনে মনে এত সব ভেবেও কিন্তু আন্নুর মা গলা বাড়িয়ে ডিসপেন্সারির ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলে। নাঃ, ডাক্তার নাই।

রতন হাড়ী বললে, দশটার পরে ঠাকরুন, দশটার পরে। কম্পানডারবাবু বলছে, দশ বাড়িতে ডাক আছে। তা ছাড়া আমরা সব আগাম এসে বসে আছি।

আগাম এসেছিস, তোরা সব আগাম মর।—মনে মনে এই অভিসম্পাত দিয়ে আন্নুর মা খুশী হয়ে বাড়ির পথ ধরলে। শুধু গাল দিয়ে নয়, ডাক্তারের সামনে ভিক্ষার জন্য হাত পাতার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছে বলেই সে খুশী হয়েছে বেশি।

প্রতিদিনের মত আকাশে উড়ো-জাহাজের দল আসছে। গোঙানি শোনা যাচ্ছে। আন্নুর মা আকাশের দিকে চেয়ে পথ চলছিল। শুধু সে নয়, সব লোক, সবাই চেয়ে আছে।

—এই যে আপনি!

আন্নুর মা চমকে উঠল। ডাক্তার! ডাক্তার তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

—এই যে, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

আন্নুর মা ঘোমটাটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আঁচলের বাজরা হাত দিয়ে নেড়ে বলতে গেল, পোড়া পেটের—

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললে, চলুন আপনার নাতিকে দেখে যাই।

আন্নুর মা অবাক হল না। ডাক্তার নিজেই কৈফিয়ত দিয়ে বললে, এই এদের বাড়িতে ডাক ছিল, আপনার বাড়ির পাশে এসে মনে হল ছেলেটির কথা। তা বাড়িতে কেউ নাই। বউ ছেলেমানুষ, ঘোমটা টেনে বসে আছে, কথা বলে না—

আন্নুর মা হাউমাউ করে উঠল, কপাল, আমার পোড়া কপাল বাবা, কি বলব লজ্জার কথা, বল! ও মানুষ নয় বাবা, ও মানুষ নয়, গরু-ভেড়ার সঙ্গে কোনো তফাত নাই। শুধু ওই চেহারা!—বলতে বলতেই আন্নুর মা প্রায় ছুটছিল, ডাক্তারের অনুগ্রহে সে যে কৃতকৃতার্থ হয়ে গেছে, তাই প্রকাশের জন্য আপনার অজ্ঞাতসারেই সে আকুল হয়ে উঠেছিল। সে কৃতকৃতার্থতা এতখানি

যে, তার ঘা-খাওয়া শক্ত মনের অতি-বাস্তবসচেতনতাও এই সময়টিতে সাময়িক ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

ডাক্তার পর্যন্ত একটু ব্যস্ত এবং লজ্জিত হয়ে পড়ল আন্নুর মায়ের আচরণে। সে বললে, থাক, থাক, এতখানি ব্যস্ত হবেন না, এতখানি—। আর ডাক্তারের মুখ দিয়ে কথা বের হল না, এই মুহূর্তে আন্নুর মা যা করলে, তাতে ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে গেল। আন্নুর মা পুত্রবধূর মাথার ঘোমটা খুলে দিয়ে বললে, দেখ বাবা, দেখ, এই হতভাগীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি, আর আমার বুক হু হু করে জ্বলে ওঠে। এর পর যদি ছেলেটার কিছু হয়—! আন্নুর মা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

ডাক্তারের চোখ ফেটে জল এল।

অপূর্ব সুন্দর মুখ। রুক্ষ ঘন চুল। অদ্ভুত বড় বড় দুটি চোখ—হ্যাঁ, অদ্ভুত, এতবড় চোখে একটি ছাড়া কোনো ভাষা নাই; ডাক্তার বুঝতে পারলে না তার অর্থ—বিস্ময় অথবা ভয়! ফ্যালফ্যাল করে সে চেয়ে আছে ডাক্তারের দিকে! নারীসুলভ লজ্জাতেও সে দৃষ্টি নত হয় না। ডাক্তারের স্নায়ুমণ্ডলীতে একটা প্রবাহ বয়ে গেল, মনের মধ্যে জেগে উঠল প্রবল মমতার আবেগ। আহা, এমন সুন্দর মেয়ে, এর ওই শিশুটির যদি কিছু হয় তবে সত্যই মেয়েটির অবস্থা কি যে হবে, সে কল্পনা করা যায় না। মেয়েটির যা হবে হবে, ডাক্তারেরই যে আক্ষেপের সীমা থাকবে না।

মিহিরবাবু তবুও ডাক্তার। আত্মসম্বরণ করে সে বললে, ভয় কি? কিছু ভয় করবেন না, ছেলে সেরে যাবে।

মেয়েটিরও এতক্ষণে সম্বিত হয়েছে। সে ধীরে ধীরে ঘোমটা টেনে দিলে।

পিছনে কে বলে উঠল, তারা! তারা!

ডাক্তার, আন্নুর মা মুখ ফিরিয়ে দেখলে, কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ত্রিপুরা ভট্টাচার্য, হাতে আঁকশি আর ফুলের সাজি। মিহির ডাক্তার মনে মনে অত্যন্ত রূঢ় হয়ে উঠল। ভট্টাচার্যকে সে জানে। মনে পড়ল, ভট্টাচার্যের নিজের পৌত্রের অসুখের কথা; নিষ্ঠুরতম কথা বলতে ভট্টাচার্যের বাধে না। ভ্রূ কুঞ্চিত করে ডাক্তার ভট্টাচার্যের দিকে চাইলে। কিন্তু ভট্টাচার্য চেয়ে ছিলেন রুগ্‌ণ শিশু এবং তার মায়ের দিকে। অত্যন্ত করুণ দৃষ্টি ভট্টাচার্যের চোখে। ডাক্তারের ভয় হল। ভট্টাচার্যের করুণার অর্থ অতি বিচিত্র।

ভট্টাচার্য কিন্তু বললেন, কোনো ভয় নেই। ডাক্তার ঠিক বলেছেন; কোনো ভয় নেই।

আন্নুর মা বললে, বলুন বাবা, তাই বলুন, আশীর্বাদ করুন।

ভট্টাচার্য বললেন, আশীর্বাদ তো কালই করেছি মা। তোমরা চলে এলে, দেখলাম খোকার জ্বর এল, মন খারাপ হয়ে গেল আমার। সমস্ত দিন মনের মধ্যে ওই কথাই ঘুরল আর ফিরল। সন্ধ্যেতে জপে বসলাম, মনে মনে বললাম, মা, আমার এ কথা যদি মিথ্যে হয়, তবে বল, তার আগে আমি মরি, মরে লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই। আর আমার হাতের পুজো যদি নিস, তবে বল, আশীর্বাদী দে, যাতে দুঃখিনীর ধনের কল্যাণ হয়, রোগ ভালো হয়, দীর্ঘজীবী হয়ে সে বেঁচে থাকে। বলব কি মা, ঠিক সেই মুহূর্তে মায়ের মাথা থেকে খসে পড়ল এই জবাফুল!

ডাক্তারের শরীর পর্যন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। আন্নুর মা অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। চোখ দিয়ে অনর্গল জল ঝরে পড়ছিল। কিন্তু অদ্ভুত ওই তরুণী মা-টি, স্থির হয়ে বসে আছে পাথরের মত।

ভট্টাচার্য বলছিলেন, কাল রাত্রেই ভাবলাম, যাই, দিয়ে আসি মায়ের আশীর্বাদী, তা বুড়ো মানুষ, চোখের নজর তো আর ভালো নাই। আর বেরুতে পারলাম না। নাও, ধর আশীর্বাদী।

আশীর্বাদী দিয়েও ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে রইলেন। ডাক্তার অত্যন্ত ধীরভাবে ছেলেটিকে পরীক্ষা করে দেখছিল। পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার ইনজেকশনের সরঞ্জাম বের করলেন। আন্নুর মা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে উঠল, ডাক্তারবাবু!

ব্যাগ থেকে দেখে দেখে একটি ইনজেকশনের ওষুধের অ্যাম্পিউল বার করে ডাক্তার বললে, ভয় নেই। ম্যালেরিয়া জ্বর।

—তবে ইনজেকশন দেবেন কেন? রোগ কঠিন না হলে?

—কঠিনে যাতে না দাঁড়ায় তারই ব্যবস্থা করছি। কুইনিন ইনজেকশন দেব। —অ্যাম্পিউলটির মাথায় তুলো জড়িয়ে সুকৌশলে আঙুলের চাপে মুট করে মাথার দিকটা ভেঙে ফেলে ডাক্তার সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে নিলে ওষুধটাকে। তারপর আন্নুর মায়ের দিকে চেয়ে হেসে বললে, এই দেখুন, আপনি মুখে দিয়ে দেখুন না এক ফোঁটা—কুইনিন, কি আর কিছু!—বলে সে অ্যাম্পিউলটি উপুড় করে ধরলে আন্নুর মায়ের হাতের উপর। ফোঁটাখানেক ওষুধ ঝরে পড়ল। ডাক্তার হেসে বললে, দেখুন না!

আন্নুর মা জিভ দিয়ে চেটে বিস্মিতভাবে মুখ নেড়ে কয়েকবার আস্বাদন অনুভব করবার চেষ্টা করে বললে, কুনিয়ান তো তেতো ডাক্তারবাবু।

চকিতে বিস্ময় ফুটে উঠল ডাক্তারের দৃষ্টিতে। আন্নুর মায়ের দিকে চেয়ে সে বললে, হ্যাঁ, তেতোই তো।

—তেতো নয়!—ডাক্তার ভাঙা অ্যাম্পিউলটা তুলে ধরে দেখলে, তারপর সিরিঞ্জ থেকে এক ফোঁটা নিজের হাতে নিয়ে চেটে দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। শুধু স্পিরিটের গন্ধযুক্ত খানিকটা জল। ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর সিরিঞ্জের ওষুধটুকু পিস্টন ঠেলে মাটির উপর ফেলে দিয়ে বললে, যাক, ও-বেলা এসে আমি ইনজেকশন দিয়ে যাব। এ-বেলা ওষুধ দেব একটা। কেউ গিয়ে—

আন্থর মা বললে, আমি যাব বাবা।

ডাক্তার উঠে আবার বললে, কোনো ভয় নাই। দরকার হবে না, তবে দরকার হলে তখনই খবর দেবেন আমাকে।

ভট্টাচার্য দাঁড়িয়েই ছিলেন। তিনি বললেন, শুনলে মা, ডাক্তার বললেন, কোনো ভয় নাই। বলছি যে, আমার মা বলেছেন।

প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

ডাক্তারের সঙ্গেই তিনি বেরিয়ে এলেন। পথে দুজনে একসঙ্গেই চলেছিলেন। ঘটনাটা নূতন। কিছুক্ষণ পর ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো ভয় নাই বলেই মনে হয়, কি বলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার বললেন, আপাতত ভয় তো কিছু দেখলাম না। ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া যদি হয়—। ডাক্তার চুপ করলে। ভট্টাচার্য তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ডাক্তার নীরবেই পথ চলতে লাগল। ডাক্তারের নীরবতায় উৎকণ্ঠিত হয়ে ভট্টাচার্য উদাস কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন, তারা, তারা মা!

ডাক্তার ডিসপেন্সারিতে এসে কুইনিনের অ্যাম্পিউলগুলি প্রত্যেকটি ভেঙে নিজে আস্বাদ করে দেখে ফেলে দিলে। নিজের মনেই বললে, স্কাউণ্ড্রেল!

আন্থর মা অ্যাম্পিউলের ভিতরের তরল পদার্থের আস্বাদ নিয়ে বলেছিল, তেতো নয়। সে তার ভ্রম নয়, অ্যাম্পিউলের ভিতরে কুইনিন নাই। শুধু জল।

শশী এসে দাঁড়াল। ডাক্তারের বিরক্তির আর সীমা রইল না। রূঢ়স্বরেই সে বললে, তোকে না আমি কাল বলে দিয়েছি শশী, কুইনিন রোগীতে পাচ্ছে না, তোকে দিতে আমি পারব না। শিউলীর পাতা ছেঁচে খেগে, বেলপাতা ছেঁচে খেগে, ছাতিমের ছাল সেদ্ধ করে খেগে যা।

—আজ্ঞে না। সে জন্যে নয়; ওই—ওই আন্থ ঠাকুরের—

অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার বললে, কি? কি? আন্নু ঠাকুরের ছেলে কেমন আছে? এই তো দেখে আসছি আমি।

—আজ্ঞে, তেমুনি আছে ছেলে। আমি ওষুধ নিতে এসেছি।

ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে গেল। আন্নুর জন্য শশী তিনবার ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে, আর সেই শশী এসেছে—

ডাক্তারের বিস্মিত দৃষ্টি অত্যন্ত স্পষ্ট। শশী মাথা নীচু করে ঈষৎ লজ্জিত ভাবেই বললে, ওই পানে আসছিলাম, তা আন্নু ঠাকুরের মা বললে, আমার নাতির ওষুধটা যদি এনে দাও বাবা শশী।

কথাটা বলেও তার মনে হল, বলাটা তার সম্পূর্ণ হয় নাই, ডাক্তারের সবিস্ময়ের প্রশ্নের জবাবও নয়। তাই সে আবার বললে, কাল শ্মশান থেকে এল মশায়, ওই কচি বউটিকে দেখে বড় মায়া হল। আ-হা-হা—মশায়—ভগমানের—। শশীর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। সে চুপ করে গেল।

ডাক্তারও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বস, দিচ্ছি ওষুধ। ডাক্তার নিজেই উঠল ওষুধ তৈরি করতে। কম্পাউণ্ডারটি তাঁর পাকা, গুঁড়ো কুইনিনের সঙ্গে ময়দা মিশিয়ে সে কুইনিন সরিয়ে ফেলে।

শশী আপন মনেই বললে, কাল সারারাত ঘুমুই নাই ডাক্তারবাবু। এক-একবার মনে হচ্ছিল, আন্নু ঠাকুর মরেছে, বেশ হয়েছে। কিন্তুক ওই বউটির কথা মনে হয়েছে, আর হায়-হায় করেছি।—শশী চুপ করলে।

নিবিষ্ট মনে ডাক্তার নিক্তির দিকে তাকিয়ে ওষুধ ওজন করছিল, সেও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। শশীর কথাগুলির সঙ্গে তার মনের তার এক সুরে বাজছে। সে এর মধ্যে এতটুকু কিছু অসঙ্গত দেখতে পেলে না।

বাইরে রোগীরা কাতরাচ্ছে।

কম্পাউণ্ডার একটা বড় বোতল থেকে শিশিতে ওষুধ ঢেলে দিচ্ছে।

শশীর প্রাণ যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠছে এদের মধ্যে বসে। মানুষের মরণ দেখে তার বড় ভয় হয়। কিন্তু জীর্ণশীর্ণ রোগা মানুষকে দেখে তার মন নাড়া খেত না। এক-একজনের কাতরানি দেখে তার হাসি পেত। মড়াকান্না শুনে তার রাগ হত। আপন মনেই সে বলত, আদিখ্যেতা! তোর কি একা মরেছে রে বাপু? কিন্তু কাল সন্ধ্যাবেলা থেকে তার সব যেন ওলটপালট হয়ে গেছে। বউটির বৈধব্য দেখে তার মন সেই যে হায়-হায় করতে শুরু করেছে, সে হায়-হায়-এর আর বিরাম নাই। রোগা মানুষের কাতরানি শুনে তার বুকটা কেমন করে উঠেছে, শোকাতুর মানুষের কান্না শুনে সে মনে মনে হায়-

হায় করে সারা হয়েছে। এমন কি কাল রাত্রে চুরি করতে বেরিয়ে ঘোষেদের কানাচের গলি দিয়ে যাবার সময় ঘোষ-বুড়ির গুনগুন স্বরে কান্না শুনে তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। মাথার বস্তাটা পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ঘোষ-বুড়ির মেয়ে সরলা কাল মরেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে সবাই ঘুমিয়েছে, বুড়ি কেঁদে চলেছে। আগের দিন হলেও শশীর মনে হত, ওই বস্তাটা বুড়ির দিকে চাপিয়ে দেয়; বুড়ির ওই বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না চিরদিনের মত বন্ধ করে দেয়; যে পথে গিয়েছে তার সরলা, সেই পথেই বুড়িকে রওনা করে দেয়। কিন্তু আর তা মনে হয় নাই। দাঁতে দাঁত টিপে সে কোনোমতে গলি থেকে বেরিয়ে যখন আন্নুর মায়ের বাড়ির কানাচে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন তার বুকটা যেন ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছিল। পরিশ্রমের হাঁপানির সঙ্গে একটা শোকাতুর আবেগে তার ফুসফুস ফেটে যেতে চাচ্ছিল যেন। আন্নুর মায়ের ভাঙা খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে বাড়ির একটা নিরালা কোণে কুমড়োলতার জঙ্গলের মধ্যে বস্তাটা নামিয়ে দিয়ে সেইখানেই সে বুকে হাত দিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে ছিল।

চণ্ডীতলায় আন্নুর মা যে তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল, ওই কচি বউ, কোলে দুধের ছেলে, আমি ওদের মুখে কি দেব বাবা শশী?—সে কথাটা শশী ভুলতে পারে নাই। আন্নুর মায়ের দুঃখের জন্য নয়। ওই কচি বউ আর তার কোলের দুধের ছেলেটার জন্য সেও ভেবে সারা হয়েছে সমস্ত দিন। সত্যই তো, কি খাবে ওরা?

না খেতে পেয়ে শুকিয়ে ছেলেটা প্যাঁকাটির মত হয়ে যাবে, পাখী ছানার মত চিঁ-চিঁ করে চেঁচাবে। বউটির ওই সোনার মত রঙের উঁপর ময়লার ছাপ পড়বে, ছেঁড়া কাপড়ে তার মাথার রুখু চুলের অর্ধেকটা বেরিয়ে পড়বে, পিঠের গোটাটাই হয়ত দেখা যাবে; একটা মাটির খোলা হাতে করে ফিরবে।—শশীর বুকের ভিতরটা অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে বেরিয়ে পড়েছিল খন্তা হাতে। তার স্ত্রী বলেছিল, আজ আবার কি করতে যাবা? এই তো পরশু—

বাধা দিয়ে শশী হিংস্রভাবে তর্জন করে উঠেছিল।

শশীর স্ত্রী আর কিছু বলতে সাহস করে নাই।

সমস্ত সকালটা শশী আন্নুর মায়ের খিড়কির ধারে ঘুরেছে। আন্নুর মা যখন বাজরা আনতে এসেছিল, তখন থেকে ঘুরেছে। কিন্তু বউটি অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে বসে ছিল মাটির পুতুলের মত, তার ওই মুখের দিকে চেয়ে বাড়িতে সে কিছুতেই ঢুকতে পারে নাই। সে একটা ঝোপের আড়ালে বসে ঘাসের ডাঁটা

তুলে তার নরম দিকটা চিবিয়েছে আর বউটির মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে। তারপর এল আন্নুর মা, সঙ্গে ডাক্তার, একটু পরেই এল ভট্টাচার্য মশায়।

ভট্টাচার্য, ডাক্তার বেরিয়ে যাবার পর শশী বাড়ি ঢুকেছিল। ধানের বস্তাটা দেখিয়ে দিতেই আন্নুর মা কৃতকৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। বউটি কিন্তু একটি কথাও বলে নাই। সেই তেমনই ভাবে বসে ছিল। আন্নুর মা বলেছিল, তুমি একটু বসবে বাবা শশী, আমি তাহলে দশ সের ধান বেচে তুটি চাল-ডাল নিয়ে আসি।

শশী আপত্তি করে নাই। কিন্তু আন্নুর মা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই সে দারুণ অস্বস্তি অনুভব করতে আরম্ভ করেছিল। ঘোমটা দিয়ে বউটি বসে আছে একভাবে সেই পুতুলের মত ; খালি হাত তুখানি বেরিয়ে আছে, কোলের কাছে ছেলেটা শুয়ে আছে নিস্তেজ হয়ে। চুপ করে বসে বসে শশীর মনে হয়েছিল, তার গা যেন কে চেপে ধরেছে, বুকের উপর একটা পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। জীবনে অনেকবার পুলিশে তাকে হাজতে পুরে রেখেছে, অন্ধকার রাত্রে ছোট ঘরটায় সে একা বসে থেকেছে, শিক-ঘেরা দরজার ওপাশে কনস্টেবল ঘুরেছে, তার চলন্ত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে শশীর রাত কাটাতে এতটুকু কষ্ট হয় নাই। কিন্তু আজকের এই বসে থাকার উদ্বেগজনক কষ্টকর অনুভূতি কখনও সে ভোগ করে নাই। তাই দোকান থেকে ফিরে এসে আন্নুর মা যখন তাকে বলেছিল, আর একটু যদি কষ্ট করে বস বাবা শশী, তবে আমি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ওষুধটা নিয়ে আসি, শশী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, তুমি বস ঠাকরুন, তুমি বস। আমি যেছি।

ডাক্তারের এখানে এই রোগা লোকগুলির মধ্যে বসে তাদের কাতরানি শুনে তার প্রাণ আবার হাঁপিয়ে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছে, উঠে ছুটে পালিয়ে যায় সে, কিন্তু সেই হাতখানি তাকে যেন ডাকছে, কই, আমার খোকার ওষুধ ?

আট দিন পর।

ডাক্তার চুপ করে বসেছিল তার ডিসপেন্সারির সামনের খোলা দাওয়ার উপর। রাত্রি আটটা বাজে। কার্তিক মাসের শেষ, এবার এরই মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। ভাদ্রের বন্যার জলের ঠাণ্ডা উঠছে মাটি থেকে। গ্রামখানার এই দিকটাকেই বলে—বাজারপাড়া। এ পাড়ায় মানুষের সাড়া সাড়ে দশটা এগারোটার কমে কখনও স্তব্ধ হয় না। দোকানে দোকানে আলো

জ্বলে। লটকোনের দোকানে খাতা মেলায়, তহবিলের টাকা গুনতি হয়। ময়রাদের দোকানে ভিয়েন চলে, বাতাসা কাটে, বদমা কাটে, রসের সন্দেশ পাক করে—সারা রাত রসে ভিজতে পায়। কাটা কাপড়ের দোকানে খটো-খটো শব্দ করে কল চলে। কাপড়ের দোকানে কাপড়ের নম্বর দেখে থাকে থাকে সাজানো চলতে থাকে। দুপাশের দোকানের মাঝখান দিয়ে যে পাকা রাস্তাটা চলে গেছে একদিকে মুর্শিদাবাদ, অন্যদিকে বিহার, সেই পথে ক্যাঁ-ক্যাঁ শব্দ তুলে গরুর গাড়ি যায়, আসে;—বিহারের দিক থেকে আসে শালকাঠ, শালপাতা, মুর্শিদাবাদের দিক থেকে আসে কলাই, কুমড়ো, পেঁয়াজ লঙ্কা; নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে আসে ধান। ওদিক থেকে সাঁওতালেরা আসে মজুরির সন্ধানে, এদিক থেকে আসে স্থানীয় লোকজন, পূর্বের অঞ্চলের সাত-আট ক্রোশের মধ্যে গ্রামগুলির এইটিই নিকটস্থ রেল-স্টেশন। এবার কিন্তু এরই মধ্যে সব স্তব্ধ অন্ধকার। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, রাস্তাটা খাঁ খাঁ করছে। ডাক্তার পথের দিকে চেয়ে বসেছিল।

ডাক্তারের মেয়ে ডেকে বললে, বাবা, ঘরে এসে বসুন, মা বলছেন, হিম পড়ছে যে।

—যাচ্ছি।

—খাবার করবেন ?—মা জিজ্ঞাসা করলেন।

—না। শশী ফিরবে, মতিপুর গেছে। তারপর ইনজেকশন দিয়ে এসে খাব।

শশী গেছে মতিপুরের বাজার। মতিপুরের বাজার এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বাজার, বিশেষ করে ওষুধের এমন স্টক জেলার সদর-শহরেও নাই। 'প্রন্টোসিল' আর কয়েকটা ইনজেকশন আনতে গেছে শশী। ইনজেকশনের চেয়েও জরুরি দরকার প্রন্টোসিল পিলের। পাওয়া না গেলে—সে কথা ভাবতে ডাক্তার অধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে। আনু ঠাকুরের ছেলেটির ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয় নাই, হয়েছে মেনিনজাইটিস। ম্যালেরিয়া, বেরিবেরি, টাইফয়েড —এগুলোর আনুষঙ্গিক হিসেবে এতদিন ছিল শুধু নিউমোনিয়া, এবার মেনিনজাইটিসও এসে জুটল। কলেরাও চলছে এখানে ওখানে। কোনটা কলেরা, কোনটা ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, কোনটা বেরিবেরি সব সময় বুঝতে পারা যায় না। মানুষ মরছে।

আকাশের নৈঋত কোণে গোঁ-গোঁ শব্দ উঠছে। ডাক্তার সেই দিকে তাকালে। লাল নীল সাদা তিনটে আলোকবিন্দু—উল্কার মত দ্রুতবেগে চলেছে। প্লেন যাচ্ছে। দিন রাত্রি—কোনো সময়েই বিরাম নাই। আকাশে

প্লেন চলছে, পথের উপর আজকাল দিনের বেলা যায় মিলিটারি লরি; গ্রামের পায়ে-চলা পথ ধরে চলছে মড়া-কাঁধে রোগা মানুষ। আট দিনে ডাক্তারের হাতের রোগীর মধ্যে সাঁইত্রিশটা রোগী মরেছে। আজ রাত্রেই বোধ হয় আরও

মিহির ডাক্তার বরাবরই ধীর চিকিৎসক; ধীরতার চিকিৎসা করে, ভালো-মন্দ দুই-ই সে গ্রহণও করে ধীরতার সঙ্গে। মৃত রোগীর হাতখানি ধীরে ধীরে তার বুকের উপর অথবা পাশে নামিয়ে দিয়ে শান্ত ধীর পদক্ষেপে উঠে আসে। বুঝতে পারলে, আগে থেকেই রোগীর আত্মীয়স্বজনকে শান্তভাবে সহৃদয়তার সঙ্গে বলেও দেয় সে কথা। এবার তার শান্ত ধীরতা —এই হিমানীশীতল মৃত্যু-ঝড়ের স্পর্শে জলের মত জমে কঠিন হয়ে উঠেছে।

চারটে হয়ত আজই যাবে, তাছাড়া আজ হোক কাল হোক, দুদিন চার দিন পরে হোক, যাবেই, মৃত্যু নিশ্চিত, এমন রোগী—নস্থরামের স্ত্রী, ব্যোমকেশ মুখুজ্জে, হরিধনের কন্যা, চণ্ডীর মা, রামচরণের ভাই, পাঁচজন। পাঁচজন কেন, প্রণ্টোসিল আর ইনজেকশনগুলো না পেলে—শীতপ্রধান দেশের নদীর উপরের কঠিন বরফের স্তরের তলদেশের জল চঞ্চল হয়ে উঠল যেন; ডাক্তারের মন ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল সেই অদ্ভুত মেয়েটির কথা। অচঞ্চল স্তব্ধ মেয়েটিকে সেই প্রথমদিন থেকেই একভাবেই দেখে আসছে। অবগুণ্ঠনে সর্বাঙ্গ ঢেকে এক পাশে বসে থাকে, দেখা যায় শুধু দুখানি নিরাভরণতায় সকরুণ সুকোমল লাবণ্যভরা হাত, এই হাত দুখানি দেখলেই মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীই যেন কাঙাল হয়ে গিয়েছে। আর দেখা যায় অতি শুভ্র দুখানি পা; মধ্যে মধ্যে কদাচিৎ চোখে পড়ে তার মুখ, তাতে সেই একই অভিব্যক্তি, যার অর্থ ডাক্তার আজও বুঝতে পারে নাই। মধ্যে মধ্যে ডাক্তারের সন্দেহ হয়, মেয়েটি বোধ হয় পাগল অথবা—। ডাক্তারের মন অকস্মাৎ অন্য দিকে ফিরল, একটা সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণাগ্র কিছু তার মনকে অতর্কিতে স্পর্শ করেছে।

কান্নার রোল উঠেছে। বেশি দূরে নয়। নস্থরামের বাড়ি থেকে উঠছে। নস্থর স্ত্রীই মারা গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তার একটু হাসলে। আজই মরবে এমন কথা ডাক্তার ভাবে নাই। মরেছে, তাতেও সে বিস্মিত হয় নাই। হঠাৎ হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হয়ে গেল।

—ডাক্তারবাবু!

—কে?

—আমি।

ডাক্তার টর্চটা জ্বাললে। ত্রিপুরা ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ডাক্তার উঠে এগিয়ে এল।—আপনি কি ওখান থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ। একবার চলুন আপনি।

ডাক্তারের পায়ের নখের ডগা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা উৎকণ্ঠিত অনুভূতি বিদ্যুৎবেগে খেলে গেল। গিয়ে কি করবে সে? কি করতে পারে? মিনিটখানেক সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

—ডাক্তারবাবু!

দৃঢ়সঙ্কল্পের একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলে ডাক্তার সোজা হয়ে দাঁড়াল। হ্যাঁ, তাই-ই করবে সে। লাম্বার পাংচারই করবে। তার বিদ্যার দুঃসাহসিক চেষ্টাই সে করবে। লাম্বার পাংচার পল্লীগ্রামে দুঃসাহসিক চেষ্টা। কলেজে সে দেখেছে, সেখানে বোধ হয় চার-পাঁচটা কেস নিজে হাতে করেছে, কিন্তু তারপর আর করে নাই। তা হোক। এ ছাড়া উপায় নাই।

সে সযত্নে পরীক্ষা করে দেখে সূচ বেছে নিয়ে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়ল।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য আর আন্নুর মা স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখছিল ডাক্তারের কার্যকলাপ। থরথর করে কাঁপছিল তারা।

মেরুদণ্ডের ভিতর থেকে ডাক্তার সূচটা সযত্নে বার করে নিয়ে নিশ্বাস ফেললে। এতক্ষণে তার অন্যদিকে তাকাবার অবকাশ হল। সামনেই লণ্ঠন জ্বলছে। উপরে মেয়েটি বসে আছে। তার মুখের অবগুণ্ঠন খসে গেছে। সেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ডাক্তারের সূচটির দিকে। ডাক্তারের হাত থেকে সিরিঞ্জটা খসে পড়ে গেল। সে কেঁপে উঠেছে।

চকিত হয়ে ভট্টাচার্য প্রশ্ন করলেন, ডাক্তারবাবু?

আন্নুর মা ঝুঁকে পড়ল রুগ্ণ নাতির উপর, অনুভব করে দেখছে সে।

ডাক্তার শান্তস্বরে বললে, রোগী ঘুমুচ্ছে।

ভট্টাচার্য বললেন, মায়ের চরণোদক একটু—

ডাক্তার বললে, দিন।

ও-পাশে বাইরের দরজার মুখে দীর্ঘাকৃতি কে এসে দাঁড়িয়েছে।

ডাক্তার বললে, কে শশী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ছেলে কেমন আছে?—কণ্ঠস্বরে তার অপরিসীম উদ্বেগ।

—এখন একটু ভালো। কিন্তু তুই ওষুধ পেয়েছিস?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বার বার ঘাড় নেড়ে শশী বললে, আজ্ঞে না।

ডাক্তার সযত্নে ভাঙা সিরিঞ্জের কাচগুলি কুড়িয়ে নিয়ে উঠল। আন্নুর মাকে ডেকে বললে, দেখুন—

আন্নুর মা কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে, ডাক্তারবাবু!

ভট্টাচার্য এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। শশীও এগিয়ে এল। ডাক্তার বললে—দেখুন, আমার—। বলেই সে ওই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল।

আন্নুর মা ডাক্তারের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখে বলে উঠল, আপনি বলুন ডাক্তারবাবু, আপনি বলুন। ও হতভাগী কালা—বোবা।

সকলের মুখে ফুটে উঠল অদ্ভুত অভিব্যক্তি, বিস্ময়, করুণা, হয়ত কিছুটা তাচ্ছিল্যও আছে তার মধ্যে। ডাক্তারের মুখে তার প্রকাশ সবচেয়ে কম। এ সন্দেহ তার হয়েছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তার বললে, আমার শেষ চেষ্টা আমি করলাম। যদি ভালো থাকে, কাল সকালে খবর দেবেন।

ডাক্তার মাথা নত করে অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হল আপনার বাড়ির দিকে।

ভট্টাচার্যও ডাক্তারের পিছনে পিছনে বেরিয়ে গেলেন। উদাস দৃষ্টিতে অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে পথ চলছিলেন ভট্টাচার্য।

শশী এখনও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই দিকে চেয়ে; লণ্ঠনের আলোর ও-পাশে মেয়েটির দিকে চেয়ে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে—কাঁপছে। আন্নুর মায়ের কথা কয়টির মধ্যে সে যেন গভীর আতঙ্ককর কিছুর সন্ধান পেয়েছে।

বোবা মেয়েটি কাঁদছিল। রাত্রি প্রায় তিনটে। ছেলেটি মারা গেছে। শশী আর থাকতে পারলে না। সে ছুটে বেরিয়ে গেল আন্নুর বাড়ি থেকে।

কালা বোবা বউটি, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আন্নুর মা নাতির মুখের দিকে চেয়ে বসেছিল। মধ্যরাত্রি থেকে আবার তার আক্ষেপ শুরু হয়েছিল; চীৎকার করে উঠছিল সে আগের মত। কালা বউটির সেসব কিছুই কিন্তু কানে যায় নাই। ছেলেকে ঘুমুতে দেখে সেও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। একে কালা, তার উপর ঘুমন্ত অবস্থা, চীৎকার তাকে স্পর্শই করে নাই।

শশী কিন্তু সেই সন্ধ্যা থেকেই ছিল, যায় নাই। কেউ অনুরোধ করে নাই, তবু সে গভীর উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে বসেছিল। গলার ভিতর কিছু

যেন মধ্যে মধ্যে আটকে যাচ্ছে; মনে হয়েছে, কাঁধের উপর থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত একটা মৃদু অথচ অত্যন্ত অস্বস্তিকর যন্ত্রণা, অনুভব করেছে বুকের ভিতরে ঢেঁকির আঘাত পড়ছে, এমনই ভাবে হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে, তবু সে যেতে পারে নাই। ভগবানকে ডাকে নাই। ডাক্তারের ওই সূচ ফুটিয়ে চিকিৎসায় ভালো হবে এমন আশা করে নাই, বসেছিল কখন ছেলেটার হয়ে যাবে এই প্রতীক্ষা করে। এক-একবার ছেলেটা নড়েছে, আর শশী চমকে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে, তার টুঁটিটা কে চেপে ধরলে যেন। যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে তার জল পড়েছে বহুবার।

আন্নুর মা ব্যস্ত হয়ে উঠল, ঝুঁকে পড়ল নাতির উপর। শশী উপুড় হয়েই জানোয়ারের মত এগিয়ে গেল খানিকটা।

চীৎকার করে কেঁদে আন্নুর মা শিশুটির বুকের উপর আছড়ে পড়ল। শশী কাঁপতে আরম্ভ করলে, মনে হল, তার দম বুঝি বন্ধ হয়ে গেল। বউটি অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মুখের ঘোমটা খসে গেছে। শশী অকস্মাৎ চীৎকার করে কেঁদে উঠল, ওঃ—ওঃ—ওঃ!—ওই চীৎকারে জাগল বউটি। তার বধির কানের নিদ্রাস্তব্ধ স্নায়ুতন্ত্রীতেও ঘা দিয়েছে শশীর চীৎকার। বউটি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলে, শাশুড়ী শিশুর উপর উপুড় হয়ে পড়েছে। কুৎসিত শশীর কান্নায়-ভাঙা বিকৃত মুখ তার চোখে পড়ল; কানেও যাচ্ছিল এই চীৎকারের স্পর্শ, অন্ধকার গভীর গুহার মধ্যে গুহা-মুখের শব্দধ্বনির মত। সেও উপুড় হয়ে পড়ল ছেলের উপর, হাত দিয়ে নেড়ে স্পর্শের মাধ্যমে বুঝলে, স্থিরদৃষ্টিতে ছেলের নিস্পন্দ দেহের দিকে মুখের দিকে চেয়ে বুঝলে, তারপর—ছেলের দেহটা ছিনিয়ে নিলে একটা চীৎকার করে। বোবার শোকার্ত চীৎকার; তার মধ্যে কথা নাই, শুধু একটানা লম্বা বেদনায় তরঙ্গায়িত একখানি, হ্যাঁ, একখানি কণ্ঠস্বর। কার্তিক মাসের আকাশে উল্কাপাত হয় বেশি; শশীর মনে পড়ল সেই তারা খসে পড়ার কথা, হঠাৎ আকাশ চিরে ছুটে যায় নীল আলো, কিছুদূর গিয়ে নিবে যায়। চোখ সইতে পারে না, মন-প্রাণ কেমন করে ওঠে, কিন্তু এমন আলোর ছটা আর হয় না। ঠিক তেমনই। এমন কান্না আর হয় না। সে কখনও শোনে নাই।

শশীর আর সহ্য হল না। সে ছুটে বেরিয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে সে ছুটে চলেছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। অমাবস্যার কাছাকাছি বোধ হয়। রাস্তার দুপাশে ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে নিরেট মাটির ঢিবির মত। হঠাৎ

চোখে পড়ল সরু লম্বা এক টুকরো আলো। জানালার মুখের ফাঁক দিয়ে ঘরের আলো বেরিয়ে আসছে। শশী দাঁড়াল। ডাকলে, ডাক্তারবাবু!

ডাক্তারেরই বাড়ি ; শশীর ভুল হয় নাই। জানালা খুলে গেল।—কে? শশী? ডাক্তারেরও চিনতে ভুল হয় নাই। অনেক রোগীরই মরবার আশঙ্কা আছে, তাদেরও আপন জনেরা আসতে পারে, কিন্তু ডাক্তার এই ডাকটিরই প্রতীক্ষা করে বিনিদ্র বসে ছিল। আরও সে জানত, শশীই আসবে ডাকতে।

—একবার আসুন।—মরে গেছে জেনেও শশী ডাকলে।

ডাক্তার বেরিয়ে এল। শশীকে প্রশ্ন করলে না, কেমন অবস্থা!

শশী বললে, আপুনি যান, আমি ভট্টাচার্য মাশায়ের কাছ থেকে মায়ের পুষ্প নিয়ে আসি।

ডাক্তার বললে, যা, ছুটে যা।

শশী আবার ছুটল।

ভট্টাচার্য বাড়িতে নাই। মায়ের মন্দির থেকে ফেরেন নাই আজ। শশী আবার ছুটল। চারপাশে ঘন জঙ্গল, থমথমে করছে চারদিক, চিঁ-চিঁ ঝিঁ-ঝিঁ করে ডাকছে ঝিঁঝিঁপোকা আর কত কীটপতঙ্গ, চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দে ডাকছে প্যাচা। রাত্রি তিন পহর হয়ে গেল। শশী ঢুকল চণ্ডীতলায়। মন্দিরের অন্ধকার বারান্দায় ভট্টাচার্য বসে আছেন স্থির হয়ে। শশী ডাকলে, ভট্টাচার্য মাশায়! ঠাকুর মাশায়!

—তারা, তারা মা!—ভট্টাচার্য চঞ্চল হয়ে উঠলেন, কে? শশী?

—আজ্ঞে, মায়ের পুষ্প নিয়ে চলুন একবার।

ভট্টাচার্য উঠলেন, পুষ্প নিলেন। তাঁর বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। জীবনে বোধ হয় এমন কষ্ট কখনও হয় নাই। তবু বলতে চাইলেন, ভয় কি? কোনো ভয় নাই। কিন্তু মুখ দিয়ে সে কথা বের হল না। অন্ধকার ঘুমন্ত পল্লীর মধ্য দিয়ে চারখানি পায়ের শব্দ দ্রুততালে বেজে এগিয়ে চলল। আরও একটি করে শব্দ দুজনেরই কানে আসছিল, বুকের ভিতরে ধকধক শব্দ উঠছে।

বোবা মেয়েটি কাঁদছে।

ডাক্তার বেরিয়ে এল। ভট্টাচার্য বেরিয়ে এলেন। শশীও বেরিয়ে এল। আন্নুর মা ডাক্তারকে কিছু বললে না, ভট্টাচার্যকে ডাকলে না, ডাকলে, বাবা শশী!

তিনজনেই দাঁড়াল।

আন্নুর মা বললে, খোকার গতির কি হবে? তুমি—

শশী পাথরের মত দাঁড়িয়ে গেল।

ডাক্তার বললে, তুই যা শশী, তা ভিন্ন—

ভট্টাচার্যের গলা দিয়ে বের হল—অদ্ভুত একটা স্বর।

এদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুকে দাহ করে না, মাটির মধ্যে পুঁতে দেয়।

আন্নুর মা বললে—নিয়ে আমি যাব। কিন্তু গর্ত করতে আমি তো পারব না।

ভট্টাচার্য দাঁড়ালেন, এগিয়ে চললেন দ্রুতপদে। ঘাড় হেঁট করে যেতে যেতে হাতের মুঠার মধ্যে তিনি কচলে পিষ্ট করছিলেন একটা জবাফুল, দু-তিনটে বেলপাতা।

ডাক্তার ডাকলে, দাঁড়ান ভট্টাচার্য মশায়।—সেও দ্রুতপদে এগিয়ে চলল।

ভট্টাচার্য দাঁড়ালেন না। ডাক্তার গতি দ্রুততর করলে।

রাত্রিশেষে হিমতীক্ষ্ণ বাতাস বইতে শুরু হয়েছে। পাশেই একটা বাড়িতে কেউ বিনিয়ে বিনিয়ে মৃদুস্বরে কাঁদছে। ঘুম ভেঙে গেছে, সুপ্তিমগ্ন অন্ধকারের মধ্যে মনে পড়েছে মৃত প্রিয়জনকে। দূরে কোথায় কতকগুলা কুকুর একসঙ্গে চীৎকার করে কাঁদছে। হ্যাঁ, কাঁদছে। কুকুর কাঁদে। ডাক্তার আরও দ্রুত চলতে চেষ্টা করলে। এগুলা তাকে তত পীড়িত করছে না, কিন্তু এখনও শোনা যাচ্ছে ওই বোবা মেয়ের কান্না!

ভট্টাচার্য পিছন থেকে ডাকলে, দাঁড়ান ডাক্তারবাবু। যুবক ডাক্তার, ভট্টাচার্যকে অতিক্রম করে গেছে। ডাক্তার দাঁড়ালে না।

সে অস্থিরভাবে টানছিল স্টেথোস্কোপের রবারের নল দুটো। একটা নল ছিঁড়ে গেল। বেশ হয়েছে! কি হবে ডাক্তারি করে? বোবা মেয়ের কান্না এখনও শোনা যাচ্ছে। সমস্ত পৃথিবীময় যেন ছড়িয়ে পড়েছে ওর কান্না। ডাক্তারের মনে হল, ও কান্না যেন কখনও থামবে না। চারদিকে কান্না। মানুষ মরছে। মরবে। আর বোধ হয় তাদের নিষ্কৃতি নাই। এই তেরোশ পঞ্চাশেই সব ধুয়ে মুছে যাবে। চীৎকার করতে ইচ্ছে হল ডাক্তারের—ভুয়ো, ভুয়ো, সব ভুয়ো। সে ছুটে গিয়ে উঠল আপনার ডিসপেন্সারির দাওয়ায়।

ঘরের মধ্যে ঢুকে অন্ধকারের মধ্যেই সে চেয়ারে বসে পড়ল।

চমকে উঠল ডাক্তার। বোবা মেয়ের কান্না শোনা যাচ্ছে। দেওয়ালের কোণ চিরে আসছে সে কান্না।

কান্না না, ঝিঁঝিঁর ডাক।

ডাক্তার টর্চ জ্বাললে ; পোকাটা দেখা যায় না। আলোর ছটাও গিয়ে দেওয়ালে পড়ছে না, পড়েছে আলমারির উপর। পয়জন! বিষ! সাবধান!

ডাক্তার অগ্রসর হল আলমারির দিকে।

—ডাক্তারবাবু!

ভট্টাচার্য ডাকছেন রাস্তা থেকে। ডাক্তার উত্তর দিলে না। টর্চটা নিবিয়ে দিলে।

ভট্টাচার্য আবার ডাকলেন। কিন্তু উত্তর এল না। ভট্টাচার্য একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে এগিয়ে চললেন। এগিয়ে চললেন চণ্ডীতলার পথে।

দরজা খুলে দেবীর সম্মুখে দাঁড়ালেন। ভিতরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ ভেবে, নেড়ে দেখলেন দেবীপ্রতিমা। শীতার্ত শেষরাত্রিতে মূর্তি থেকে হিম বের হচ্ছে। কঠিন। কঠিন, মানুষের শবও এত কঠিন হয় না।

ভট্টাচার্য যেন পাগল হয়ে গেলেন।

হঠাৎ ইচ্ছে হল, বলির খাঁড়াখানা নিয়ে—। শিউরে উঠলেন ভট্টাচার্য। তারপর দাঁতে দাঁত টিপে খাঁড়াখানা আরও শক্ত করে ধরলেন, নিজের গলাতেই—

আন্নুর মা বললে, শশী!

শশী নির্বাক হয়ে বোবা মেয়ের কান্না শুনছিল, বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিল মেয়েটির শোকার্ত অসম্বৃত রূপ। সে কোনো উত্তর দিলে না।

আন্নুর মা বললে, চল বাবা।

শশী শুধু বললে, হুঁ।

আন্নুর মা অদ্ভুত, শশীর ওই 'হুঁ' শোনবামাত্র ঘর থেকে একখানা কোদাল বের করে দিলে, এগিয়ে গিয়ে টেনে ছিনিয়ে নিলে মরা ছেলেটাকে মায়ের কোল থেকে। এবার যে চীৎকার করলে বোবা মেয়েটা, তাতে শশীর মনে হল, তার মাথার ভিতরে কে যেন একটা গরম লোহার স্চ ফুটিয়ে দিলে। সে যেন পাগল হয়ে গেল। মনে হল, নিজের কণ্ঠনালীটাই তার লোহার মত হাতের মুঠোয় চেপে ধরে, তাহলে ওই চীৎকার আর তাকে শুনতে হবে না।

আন্নুর মা হনহন করে চলেছে নাতির দেহটা নিয়ে। তার অনন্ত দুঃখ। তবু তার অনন্ত ভাবনা। বাঁচবে কি করে? খাবে কি? বেচবে? বোবা বউটাকে বেচবে?

শশী পিছনে চলতে চলতে ভাবছিল। কি ভাবছিল ঠিক বুঝতে পারছিল না। একবার মনে হল, পিছন থেকে এগিয়ে গিয়ে এই কোদলখানা বসিয়ে দেয় আন্নুর মায়ের মাথায়।

আবার মনে হল, ফিরে গিয়ে ওই বোবা মেয়েটার গলায় এক কোপ মেরে ওকে চুপ করিয়ে দেয়।

আবার মনে হল, নিজের মাথায় মারে কোদালখানা।

হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল। সাপ! লাফ দিয়ে সরে গিয়ে সে কোদালখানা তুললে, মারবে সাপটাকে এক কোপ। পরমুহূর্তে কি খেয়াল হল, আবার লাফ দিয়ে পড়ল সাপটার উপর।—নে, দে কামড়ে, দে।

মরা সাপ! না। দড়ি একগাছা।

আন্নুর মা হঠাৎ অনুভব করেছিল, শশী পিছনে নাই। সে ফিরে দাঁড়িয়ে ডাকলে, শশী!

—শশী দাঁতে দাঁতে ঘষছিল।

পিছন থেকে এখনও ভেসে আসছে বোবা মেয়ের কান্না। শশীর ইচ্ছে হচ্ছে, দুনিয়াসুদ্ধ লোককে খুন করতে—ডাক্তারকে, ত্রিপুরা ভট্টাচার্যকে, আন্নুর মাকে, বোবা মেয়েকে।

—শশী! ও বাবা!

—হুঁ।

পরদিন সকালবেলা। ডাক্তার ধীরে ধীরে এসে চেয়ারে বসলে। উঃ, কি রাত্রিই গেছে কাল! এখনও বিষের আলমারির দরজাটা খোলা রয়েছে। মাথায় হাত দিয়ে বসল সে। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।

রোগী অনেকে এসে বসে আছে। অনেকে আসছে। প্রতিদিনের মত আজও গত রাত্রে কে কে মরেছে, তারই হিসেব হচ্ছে। তিনজন মরেছে গত রাত্রে। নসুরামের স্ত্রী, পঞ্চ বাউড়ী, গোবিন্দ বৈরাগী।

—আন্নু ঠাকুরের ছেলেটিও মরেছে কাল।—একজন বললে।

ডাক্তার আবার অস্থির হয়ে উঠল। রাত্রি-জাগরণের অবসাদে অবসন্ন ডাক্তারের কানের স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্যে এখনও যেন মধ্যে মধ্যে বেজে উঠছে বোবা মেয়ের কান্না। সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন দৃষ্টির সম্মুখে মনের উদাসীনতার সুযোগে ভেসে উঠছে সেই ছবি।

—ডাক্তারবাবু!

ব্যোমকেশবাবুর ভাইপো। কুড়িটি টাকা টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে সে বললে, ওষুধের দাম। আর—

ডাক্তার অবসন্ন দৃষ্টি তুলে চাইলে তার দিকে।

—এ বেলা যাবেন বারোটার পর।

—বারোটার পর?

—হ্যাঁ। আজ স্বস্ত্যয়ন করাচ্ছি। হয়ে যাক স্বস্ত্যয়নটা।

ডাক্তার চুপ করে বসে রইল।

ব্যোমকেশবাবুর ভাইপো মৃদুস্বরে বললে, চণ্ডীতলায় পূজো দিলাম, বলি দিলাম, খানিকটা প্রসাদী মাংস আছে। বাড়ির ভেতর পাঠিয়ে দিই?

ব্যোমকেশের ভাইপো আবার বললে, কেমন গণ্ডগোল দেখুন না; ভট্চার্য মশায়, মানে ত্রিপুরা ভট্টাচার্য মশায় আজ থেকে পূজো ছেড়ে দিলেন।

—ছেড়ে দিলেন!

—হ্যাঁ। আজ থেকে ওঁর ছেলে পূজো করবে।

ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, চোখে জল এল। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে চোখ বুজল। চোখের পাতার চাপে কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল ছুটি জলধারা। ব্যোমকেশের ভাই অবাক হয়ে গেল।

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তার রুমাল বের করে চোখের জল মুছে ফেললে। তারও ইচ্ছা হল, ওই ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের মত সেও তার কাজ ছেড়ে দেয়। তার ওষুধপত্র যন্ত্রপাতি সব ভেঙে চুরমার করে দেয়, তার বই-খাতা সব ছিঁড়ে আগুনে গুঁজে দেয়।

তার কানের পাশে এখনও বাজছে সেই বোবা মেয়ের কান্না। ওই কান্নার মধ্যে থেকে সে শুনতে পাচ্ছে পৃথিবী-মায়ের কান্না। তার চিকিৎসক-জীবনে অনেক মায়ের অনেক শিশুকে সে মরতে দেখেছে, তাদের কান্নাও সে শুনেছে, কিন্তু এমন কান্না সে কখনও শোনে নাই; কোনো কান্না এমনভাবে পৃথিবীর বুক থেকে আকাশলোক পর্যন্ত পূর্ণ করে দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক সুদূর অতীতকাল থেকে প্রবহমান শোক-প্রবাহের অবিচ্ছিন্ন ফল্গুধারার সন্ধান তাকে দেয় নাই। ডাক্তারি পড়বার সময় হাসপাতালে অনেক মৃত্যু সে দেখেছে, স্বাভাবিক অস্বাভাবিক মৃত্যু, বিচিত্র রোগে মৃত্যু। মৃত্যুর সঙ্গে বিরোধিতা করেছে চিকিৎসক হিসেবে। কিন্তু আজ মৃত্যুর একটা অদ্ভুত রূপ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

—ডাক্তারবাবু!—ব্যোমকেশের ভাইপো ডাকলে।

ডাক্তার উত্তর দিলে না। তার চোয়ালের হাড় ছুটা উঁচু হয়ে উঠল। ডাক্তার দাঁতে দাঁতে চেপে ধরেছে—ক্ষুব্ধ আক্রোশে।

এ মৃত্যু সে মৃত্যু নয়। মৃত্যুকে মানুষ আপনার স্বার্থের জন্য ব্যবহার করছে। যেমন ভাবে চিতাবাঘ পুষে, মানুষ তাকে হরিণের পালের উপর লেলিয়ে দেয়,

তেমনই ভাবে লেলিয়ে দিচ্ছে। যুদ্ধ সৃষ্টি করলে, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করলে, দলে দলে মানুষ মরল ; মহামারী এল, মহামারীতে দেশ শ্মশান হয়ে গেল। প্রতিকারের পথ রুদ্ধ। বিজ্ঞান পঙ্গু।

কি করবে? এ অবস্থায় সে কি করবে?—ও কি! বোবা মেয়ের কান্না, এমন উচ্চ হয়ে উঠল যে! ডাক্তার অস্থির হয়ে উঠল।

কান্না নয়, আকাশে গোঁ-গোঁ শব্দ উঠছে।

ছেলেরা চীৎকার করে উঠল, ওরে বাবা রে, কত রে! কত রে!

ব্যোমকেশের ভাইপোর স্তব্ধতা আর সহ্য হল না। সে উঠল, বললে, ও বেলাতেই দেখে ওষুধ দেবেন।

কান্না নয়, এরোপ্লেনের শব্দ! ডাক্তার আশ্বস্ত হল।

ব্যোমকেশের ভাইপো যাবার সময় বললে, টাকাটা দেখে নিন ডাক্তারবাবু। কুড়ি টাকা।

ডাক্তার সচেতন হল। সে টাকা কয়টা গুনে নিলে। বাইরে রোগী প্রায় কাতারে কাতারে বললেও চলে। ওদের দেখতে হবে। প্রেসক্রিপশন লিখবার জন্য সে কলম তুলে নিলে।

এরোপ্লেনের ঝাঁক এগিয়ে আসছে। গর্জন বাড়ছে। সেই শব্দ ছাপিয়ে উঠল কান্নার শব্দ—তারস্বরে কাঁদছে, স্ত্রীলোকের কণ্ঠের কান্না।

—কে? কে রে? কে গেল?—বাইরে রোগীরা গবেষণা করছে।

ডাক্তার লিখেই চলেছে। ও কান্না তাকে বিচলিত করে না। যে কান্না কাল রাত্রে শুনেছে, তার পর।

কান্না এগিয়ে আসছে।

—কে? কে? শশীর বউ? শশী ডোমের বউ? কি হল রে? অ ডোম-বউ?

—ওগো, আমার মরদ।

—কে, শশী?

—হ্যাঁ গো। গাঁয়ের বাইরে গাছের ডালে গলায় দড়ি লাগিয়ে। থানায় খবর দিতে গেছি গো।

শশীর স্ত্রীও থেমে গেল, আকাশের দিকে চেয়ে দেখছে। একদল—বিশ-পঁচিশখানা উড়ো-জাহাজ চলেছে।

ডাক্তারের কলম থেমে গেছে।

শশী আত্মহত্যা করেছে? এরোপ্লেনের শব্দের মধ্যে বোবা মেয়ের কান্না শুনতে পাচ্ছে ডাক্তার।

পঞ্চাশ বৎসর আগের কথা হইলে কি হয়, সেকালেও বটে, একালেও বটে, বংশের ধারাকে অতিক্রম করিলেই লোকে কহে—প্রহ্লাদ।

সেতাব আর মহাতাপ, দু ভাইকেও লোকে কহিত—জোড়া-প্রহ্লাদ।

সরকার গোষ্ঠী বনিয়াদী বংশ, পুরুষানুক্রমিক জমিদার, মস্ত নাম-ডাক; প্রবল প্রতাপ।

সেতাবের পিতামহ দুর্দান্ত উগ্রক্ষত্রিয়-প্রধান একটা মৌজা খরিদ করায় বন্ধুবান্ধব হিতৈষী পাঁচজনে বলিয়াছিল—বাবু, মহালটা কেনা কি ভালো হল? ও মহাল নিলামে নিলামেই ফিরছে, যে কিনেছে সে ঘর থেকে কিছু দিয়ে তবে ছেড়েছে।

বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন—জানো?—

শমনদমন রাবণরাজা রাবণদমন রাম
কংসদমন কৃষ্ণচন্দ্রং আগুরীদমন হাম।

কথাটা বলা তাঁহার মিথ্যা হয় নাই; মহালখানা তিনি শাসন করিয়াছিলেন। সে মহাল এখন আর সরকারদের নাই, তবে কথাটা আজও আছে।

শুধু প্রবল প্রতাপই নয়, দয়াল দাতা বলিয়াও চাকলাটায় সরকারদের বিপুল খ্যাতি ছিল। গণিয়া দান কখনও সরকারদের কোষ্ঠীতে লেখে নাই, মুঠায় যাহা উঠিয়াছে তাহাই দান করিয়াছে। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে অতিথি আসিলেও কখনও বিমুখ হয় নাই; প্রত্যহ খিচুড়ির আয়োজন পাকশালায় মজুত রাখিয়া ভাণ্ডারী পাচকের ছুটি হইত। গৃহহীনের গৃহের জন্য সরকারদের বিশাল তালপুকুর ন্যাড়া হইয়া গিয়াছে। গ্রামের মধ্যে কড়া হুকুম ছিল, অরন্ধনে কাহারও দিন যাইবে না; অভাব হইলে ভাণ্ডার হইতে লইয়া যাইবে। প্রত্যহ একজন পাইক গ্রাম ঘুরিয়া দেখিত কার বাড়িতে ধোঁয়া নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কৈফিয়ত তলব হইত, কেন তার বাড়িতে উনান জ্বলে নাই? সঙ্গত কারণের অভাবে তাহার শাস্তি হইত, সাহায্য মিলিত, শেষে আবার বাবুর নিজ নামে খরচ লিখিয়া জরিমানার টাকা বাজে আদায়ের ঘরে জমা হইত।

উৎসব-আড়ম্বর—তাও অক্লান্ত অবিরাম ধারায় চলিত। পালে-পার্বণে সে তো রীতিমত বরাদ্দই ছিল, তাহার উপর এলাকায় যাত্রা, খেমটা, কবি, ঝুমুর

যে কোনো দল আসিলে সরকার-বাড়িতে গান না শুনাইয়া চলিয়া যাইবার হুকুম কাহারও ছিল না। একবার একদল ভালো খেমটা পঁচিশ দিন বাবুদের বাড়িতে আটক ছিল; শেষে বাড়ির গিন্নী যুদ্ধ ঘোষণা করায় তবে তাহারা ছুটি পায়। এদিকে বাবুদের বাগানবাড়ির প্রতি ছোট তালগাছের খেঙোর ভিতরে একটি করিয়া গাঁজার কলিকা থাকিত, গিরিমামার খাতা কখনও তিন শূন্য হয় নাই। গিরিমামা হইতেছেন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভেণ্ডার, বাবুদের দৌলতে জমি-পুকুর তাঁহার বাড়িয়াই চলিয়াছে, কিন্তু বাকী কম পড়ে নাই।

সেই বংশের পিণ্ডদাতা সেতাব শুধু পূর্বপুরুষগণকেই পিণ্ড দিল না, তাহাদের চালচলন ধারা-ধরন সমস্তকেই পিণ্ডদান করিল। গিরিমামার দেনা বাড়া তো দূরের কথা, বিনা পয়সাতেই তিনশূন্য হইল; সে স্পষ্ট বলিয়া দিল, টাকা নাও তো সম্পত্তি ফিরে দাও, সম্পত্তি নাও তো খাতার উশুল দাও; যদি চালাকি কর, টাকা তো দেবই না, সম্পত্তিও কেড়ে নেব।

ছোট ভাই মহাতাপের গাঁজা ভিন্ন চলে না বটে, কিন্তু সে এক-পয়সা নগদ বিদায়। গিরিমামা আর সরকারবাবুদের নাম খাতায় ছকিতে পায় না। প্রজার ঘাড়ে সমানে যাত্রার জন্য বৃত্তি আদায় চলিল বটে, কিন্তু খাতায় খরচ বন্ধ হইয়া গেল। যাত্রা-খেমটা তো দূরের কথা, বাবুদের দুয়ারে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর খঞ্জনী-বাদ্যও নিষিদ্ধ হইয়া গেল। এস, হরি বল, ভিক্ষে মাগ; গীতবাদ্য কিসের?

দান-খয়রাত ও সব তো নিছক বরবাদ, সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল। মুঠি তো মুঠি, আঙুলের আগাতেও একটা পয়সা উঠিত না; লোকে খায় না খায়, তাহাতে কাহার কি যায় আসে?

একটা বড় কথা বলিতে ভুলিয়াছি, সরকার-বংশের সব চেয়ে মহৎ খ্যাতি ছিল—সত্যবাদিতার। একবার মিথ্যা এজাহার দিবার ভয়ে একটা সম্পত্তিই তাঁহারা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সেতাব কিন্তু সে পথই মাড়াইল না, সে স্বার্থের জন্য দিনকে রাত্রি বলিতেও দ্বিধাবোধ করিত না, আর সে পারিতও। লোকে বলে, সেতাব নাকি ঘুমন্ত লোকের হাতের টিপ লইয়া আসিয়া খত তৈয়ারী করে। জালেও তাহার অরুচি নাই।

ক্রমে লোকে বলিতে আরম্ভ করিল—হাড়ে পাশা হয় বাবা, চামড়ায় ডুগডুগি, গোটা দেশের ভিটেয় ঘুঘু না চরিয়ে ছাড়বে না!

ছোট প্রহ্লাদ মহাতাপ সে ছিল পাগল, পুরাতন বাগানে তাহার বাসা, নিয়মিত গাঁজা আর সের দুই দুধ, এই হইলেই হইল: সংসার খুব সুখের স্থান, কোথাও কোনো অভাব নাই, দুঃখ নাই!

তাহার অভাবও বড় হইত না, কারণ শীর্ণদেহ সেতাব মহাতাপের দীর্ঘ দেহের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিত ; ওই দেহ আর কাণ্ডজ্ঞানহীনের ক্রোধ, ও তো সভ্য ভাবে ঝগড়া করিবে না, হয়ত তুলিয়া আছাড় মারিয়াই বসিবে !

তবে ভরসার মধ্যে পত্নী কাদু। তাহার কথা মহাতাপের বেদবাক্য। কাদু আর মহাতাপ একবয়সী, বাল্যসাথী ন বছরের কাদু যখন এ বাড়িতে আসে, মহাতাপ তখন আট বছরের। কাদু নিশ্চয়ই স্বামীর লাঞ্ছনা দেখিতে পারিবে না।

বন্ধুর জীবনপথে সংসারটি গোলাকার পৃথিবীর মতই বেশ গড়াইয়া গড়াইয়াই চলিতেছিল। মাঝে মাঝে ছোট-বৌ মানদার ফোঁসফোঁসানি অসন্তোষ উপলখণ্ডের মত পথরোধ করিলেও গতিরোধ হইত না, একটু-আধটু ঝাঁকানি মাত্র বোধ হইত।

ছোট বধূটির সংসারজ্ঞান খুব টনটনে। ভাগাভাগির ঘরের মেয়ে সে, ভাগটা খুব বুঝিত, কিন্তু খোদ ভাগী না বুঝিলে পরের বুঝিয়া লাভ কি ?

রাত্রিতে আরক্ত নেত্রে মহাতাপ যখন শিবনাম করিতে করিতে বিছানায় এলাইয়া পড়িত, তখন মানদার ফোঁসফোঁসানি বাড়িয়া যাইত, সে বেশ গম্ভীর ভাবে আরম্ভ করিত—বলি, কি হচ্ছে না হচ্ছে খোঁজ রাখ কিছু ?

মহাতাপ চমকিয়া লাল চক্ষু যথাসম্ভব মেলিয়া কহিত—কি, বড়-বৌ খায় নি বুঝি কিছু ?

মানদার আর কথা সরিত না, ক্রোধে লজ্জায় একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া মুখ বাঁকাইয়া বসিয়া থাকিত।

মহাতাপ কহিত—কার সঙ্গে ঝগড়া হল, তোমার সঙ্গে বুঝি ?

মানদা নীরব। মহাতাপ অসহিষ্ণু হইয়া উষ্ণকণ্ঠে কহিত—বলি, কথা কও না যে ?

মহাতাপের বিরাশী সিক্কা ওজনের কিলকে মানদার বড় ভয় ; সে এবার উত্তর দেয়, কিন্তু ঝাঁজ যায় না—আমার কি সাধ্যি ? রানীর সঙ্গে কাঠ-কুড়োনীর ঝগড়া করবার সাধ্যি কি ?

—তবে দাদার সঙ্গে বুঝি—

অতি তীব্র ঝঙ্কার দিয়া মানদা এবার কহিল—জানি না আমি

মহাতাপ অতি রোষে উঠিয়া বসে—আজ চামারের নেতার মেরে দে একেবারে, বৌটাকে মেরে ফেলবে কোনদিন।

মানদা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া তাহাকে ধরিয়া বলে—লোকে যে তোমাকে পাগল বলে তা মিথ্যে নয়।

মহাতাপও বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া বলে—কেন?

মানদা বলে—নইলে তুমি বড় ভাইয়ের নেতার মারতেই বা যাবে কেন, বড়-বৌরানী উপোস করতেই বা যাবে কেন, তাদের ঝগড়াই বা হবে কেন?

বিছানার উপর মহাতাপ বসিয়া বলে—তবে তুমি বলছ কি? হলই বা কি?

মানদার কান্না পায়, সে কহে—বলি, তুমিও তো বিষয়ের অর্ধেক মালিক, তা দানপত্র তোমার নামে হয় না কেন, তোমার দাদার নামেই বা হয় কেন? আর বিষয়ে—

মহাতাপ এই পর্যন্ত শুনিয়া আর শোনে না, পরম নিশ্চিন্তের মত বিছানায় শুইয়া বলে—শিব! শিব! এতক্ষণ ব্যার-ব্যার করে শেষ হল কিনা—বিষয়!

মানদাও আর শুনিতে পারে না, সে হড়াম করিয়া দরজাটা খুলিয়া বারান্দায় ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়—বোধ হয় কাঁদে।

ঘরে মহাতাপ শুইয়া গান ধরে—

মন বল রে শিব শিব
বিষয় বিষ তার নাম কর না।

বোধ হয়, মানদাকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতেই চেষ্টা করে।

সরকারবাড়ির সংসারের মধ্যে দুটি বৌ, আর ছোট ভাইয়ের এক ছেলে বছর দেড়েকের। বড়-বৌ কাদুর বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। সারা দেহে বন্ধ্যানারীর একটা সতেজ স্বাস্থ্য ও লাবণ্য। শুধু তাই নয়, গ্রামে বড়-বৌর একটা রূপের খ্যাতিও আছে। সে এ ঘরে আসিয়াছিল ন বছর বয়সে। ছোট-বৌ আসিয়াছিল আরও কম বয়সে, সরকারবাড়িতে ন বছরের বেশী বয়সের বৌ আসা নিষেধ। মানদা একটু মোটাসোটা, গোলগাল দেহ, তাই মহাতাপ তাহাকে বলিত ধুমসী, আর তাহার পিঠে কিল মারিতে মহাতাপের বড় মজা লাগিত—কারণে অকারণে; কারণেরও বড় অভাব হইত না। মহাতাপ তাহাকে দেখিতে পারিত না, তাহার ঐ ধুমসী গতরের জন্য। ধুমসীও মহাতাপের হিংসা ছাড়া থাকিত না, ঠিক ছোট বড় ভাই-বোনের মত। শুধু মহাতাপের নয়, বড়-বৌর হিংসাতেও সে জর্জর। তার একটা কারণও ছিল। সে কারণ হইতেছে বড়-বৌ আর তার ছোট দেওরটার পরস্পরের নিবিড়তা। বড়-বৌর জ্বালাতে

খেলাঘরে কখনও মানদা মহাতাপের বৌ সাজিতে পায় নাই। আজও তাই, মহাতাপের ও বড়-বৌর নিবিড় বন্ধন যেন আরও নিবিড়—কত হাসি, কত ঠাট্টা, কত পরামর্শ। মহাতাপের উঠিতে বড়-বৌ, বসিতে বড়-বৌ, বড়-বৌ যেন সব—তাহার জপের মালা, ইষ্টকবচ ; আর মানদা যেন কাঠ-কুড়ানী, পথের কণ্টক, তাহার কান যেন মহাতাপের কটু কথা শুনিতে, তাহার পিঠ যেন বিরাশী সিক্কা ওজনের কিল খাইতে সৃষ্ট হইয়াছে। সেতাবেরও এটা ভালো লাগে না,—না লাগিবারই কথা, সৌন্দর্যের ধনে দেউলিয়া সে। সুস্থ সবল পুরুষত্বভরা মহাতাপের সঙ্গে সুন্দরী বড়-বৌর পরম নিবিড় ভাব তাহার সহ্য হয় না। সকল জিনিসেরই একটা সীমা আছে, এ যে সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। বাহিরের পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে, তাহার মনও তাহাতে সায় দেয়, কিন্তু এ যে ঘরের কেলেঙ্কারি, আর তেজস্বিনী বড়-বৌর জবাবগুলিতেও যেন ক্ষুরের ধার, বলিতেও কিছু সাহস হয় না।

তবু সে কখনও কখনও বলে—জান, সব জিনিসেরই মাত্রা আছে, সবই হিসেব করেও—

বড়-বৌ বলে—পাটোয়ারী জালিয়াতি বুদ্ধিতে এ হিসেব করা যায় না, বুঝলে ? তুমি অতি ইতর, অতি অধম।

একেবারে 'প্রথম ভাগে' নামাইয়া তাহাকে 'অচল' করিয়া দেয়, সেতাবের আর বাক্য সরে না, অগত্যা সে 'ধারাপাতে' সরিয়া পড়ে। সদরে গিয়া সুদ কষে। সে হিসাবও তাহার ভুল হইয়া যায়। অন্দর হইতে বড়-বৌর খিল খিল হাসি, মহাতাপের উচ্চ হাস্য, আর মানদার অসন্তোষভরা ঝঙ্কারে তাহার সব গোলমাল হইয়া যায়। সে হিসাবের খাতা বন্ধ করিয়া ভাবে, ভিন্ন হওয়াই ভালো। কিন্তু এতবড় বিষয়, তাহার বুকের রক্তের চেয়েও প্রিয়, এ বিষয় সে বহু কষ্টে রক্ষা করিয়া দাঁড় করাইয়াছে, তাহাই দুই ভাগ হইবে! তার চেয়ে ওরা যা করে তাই ভালো। আক্রোশটা পড়ে ষোল আনা ওই বড়-বৌর উপর। সে আপন মনেই ভাবে, তার চেয়ে দুষ্টা নারী ত্যাগ করাই ভালো। কত সময় মুখ ফুটিয়া বাহির হইয়াও যায়—বিয়ে করব ফের, দুষ্টা ভার্যা—

কিন্তু তাও করা যায় না। ছোট এতটুকু একটা চারাগাছ টানিলে তলার মাটি ফাটিয়া যায়, তা দীর্ঘ ষোল বছর ধরিয়া যে বুকের মাঝে আছে, তাহাকে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া তো সোজা নয় ; বড়-বৌ আসিয়াছে ন-বছরেরটি, আর আজ তার বয়স পঁচিশ।

সেতাব উন্মাদ হইয়া উঠে।

তাহার সময়ে সময়ে ইচ্ছা করে, ঘরে আগুন দিয়া, বড়-বৌ আর মহাতাপকে খুন করিয়া পলাইয়া যায়।

এ ভারতে নারীর অধিকার লইয়া লঙ্কাকাণ্ড, কুরুক্ষেত্র ঘটিয়া গিয়াছে, সরকারগোষ্ঠী তো তাসের ঘর!

সেদিন মহাতাপের ছাতু খাইতে সাধ হইয়াছিল।

সকালেই বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় বড়-বৌকে হুকুম হইল—বৌ, আজ ছাতু খেতে হবে ভাই, নোতুন গুড় দিয়ে না হলে—

বড়-বৌ হাসিয়া বলিল—না হলে মেরে ছাতু করে দেবে?

মারধোরের কথায় কথাটা জমিয়া উঠিল। মহাতাপের ভালো লাগিল, সে বসিয়া প্রবল উৎসাহে কহিল—মাইরি বলচি বৌ, মনে হয় এক-একবার দিই ওই ধুমসো গতর ভেঙে, ছাতু মাখার মত চটকে দিতে ইচ্ছে করে—একটি ছাড়া গাঁজার পয়সা আর মেলবার জো নেই!

ছোট-বৌ মানদা ও-ঘরে যাইতে যাইতে কুট কাটিয়া যায়—এর পর আর তাও জুটবে না, চোখ থাকতে কানার ওই হয়।

ওই এক কথাতেই আগুন ধরিয়া যায়, মহাতাপ ডাক ছাড়িয়া লাফ দিয়া ওঠে, কি বললি, আমি কানা? ধুমসীর নেতার আজ—

বড়-বৌ হাতের কাজ ফেলিয়া চট করিয়া মহাতাপকে ধরিয়া বলে—ছিঃ, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা কি, বস, বস—

ছোট-বৌ কিন্তু থামে না, বড়-বৌর করুণায় তাহার বাঁচিতে সাধ হয় না। সে ঝঙ্কার দিয়া বলে—না-না, বসবে কেন, দাও না তোমার পোষা কুকুর ছেড়ে—

দুর্দান্ত মহাতাপ বড়-বৌর হাত ছাড়াইয়া গিয়া মানদার ঘাড় চাপিয়া ধরে, বড়-বৌও পিছন পিছন গিয়া মহাতাপকে কহে—ছাড় বলচি, ছাড়—

কণ্ঠে বেশ প্রভুত্বের সুর। সে প্রভুত্ব খর্ব হয় না। মহাতাপ মানদার ঘাড় ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া আসে, যেন যাদুকরীর মায়ামুগ্ধ হিংস্র পশু; কিন্তু শাসাইয়া আসে—আচ্ছা, থাক তুই, তোকে বিদেয় আমি করবই, তোর সঙ্গে ঘর করা আমার পোষাবে না।

বড়-বৌ মানদাকে সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিয়া আসিয়া বলে—কি বল তুমি তার ঠিক নেই, ছেলের মা, বিদেয় করবে কি!

মহাতাপ বলে—দেখ্ তুমি, সে আমি ঠিক করে রেখেছি!

বড়-বৌ বলে—কি করবে শুনি ?

মহাতাপ খুব বিজ্ঞভাবে একগাল হাসিয়া বলে—সে বলচি না আমি, সে আমার মনেই আছে।

বড়-বৌ হাসিয়া বলে—আমাকে বলবে না ভাই ?

মহাতাপ ঘাড় নাড়িয়া হাসে, বলে—না, সে দেখ তুমি, আমি তাক লাগিয়ে দেব।

বড়-বৌ বলে—ভালো ভাগ্যি আমার, তুমি যে মনের কথা মনে রাখতে শিখেচ, এও আমার ভাগ্যি !

মহাতাপ বলে—বৌ, আজ ভাই আমাকে আট আনা পয়সা দিতে হবে।

বড়-বৌ বলে—আমি মেয়েমানুষ; পয়সা কোথা পাব ভাই ?

মহাতাপ সবিস্ময়ে কহে—তুমি বাড়ির লক্ষ্মী, তোমার পয়সা নেই বৌ !

বড়-বৌ হাসিয়া কহে—মেয়েমানুষ, পয়সা কোথা পাবে বল, তোমরা দেবে তবে তো ; তোমার দাদা—

মহাতাপ পরম ভক্তিভরে বলে—রাম রাম, সকাল বেলা চামারের কথা ছাড়ান দাও তো।

বড়-বৌ বলে—তাই তো বলছি, তাকে তো জান, সে কি !

মহাতাপ বলে—এত খাতির কিসের বল তো, চামার বলচ না যে, সে—তাকে, ইঃ যেন গুরুঠাকুর !

বড়-বৌ হাসিয়া বলে—তাই না হয় বললাম, সে তো একটা পয়সাও কখনও দেয় না, আর তোমার তো—

মহাতাপ জাগ্রত হইয়া বলে—দাঁড়াও, এবার আমি মহালে যাব, নিশ্চয় যাব, পালকি চেপে।

বড়-বৌ বলে—সে সুবুদ্ধি হলে যে আমি বাঁচি, খেয়ে মেখে বাঁচি, গাছের আমড়া দেখে ভাত খেতে হয় না !

মহাতাপ বড়-বৌর মুখপানে তাকাইয়া থাকে।

বড়-বৌ বলে—জানো না বুঝি, তোমার দাদা মেয়েদের কি ব্যবস্থা করেচে ? মেয়েদের গাছের আমড়া দেখে দেখে ভাত খেতে হবে !—বলিয়া খিল খিল করিয়া হাসে।

মহাতাপ বলে—বৌ, আজ থেকে আমার খাবার দুজনে ভাগ করে খাব।

—দূর পাগল, আমায় না, মানুকে দিতে হয়।

—ওই ধূমসীকে, কভি না !—মহাতাপ রাগ করিয়া চলিয়া যায়।

ধুমসী কিন্তু আড়ালেই ছিল, সে ডাকে। মহাতাপ কহে—কি ?

—পয়সা চাইছিলে না ?

—হ্যাঁ, আট আনা।

—পেলে ?

—না, বৌ কোথা পাবে ?

—তা বটে, জ্ঞাতির কাছে লক্ষ্মীও গরীব সেজে ছিলেন ; এই নাও !

—জিতা রহো, জিতা রহো।—বলিয়া মহাতাপ আধুলিটি তাহার হাত হইতে লইয়া পকেটে রাখিতে রাখিতে কহে, আচ্ছা পেলে কোথায় বল দেখি, হুঁ, সেই চামড়া-চোকো দেয় বুঝি, হুঁ, বুঝেচি, বৌ আমাকে ভালোবাসে কিনা তাই তোমাকে টাকা এনে দেয়। আচ্ছা আমিও দেখচি।

মানদা হাসিবে না কাঁদিবে বুঝিতে পারে না, শেষে কাঁদেই, আর আপনার বাপকে গালি পাড়ে, আর পাড়ে ভগবানকে।

ওদিক হইতে বড়-বৌ হাঁকে, ছোট-বৌ, ও ছোট-বৌ !

মানদার অঙ্গ জ্বলিয়া যায়, কেমন করিয়া সে যে শোধ তুলিবে ভাবিয়া পায় না।

বড়-বৌ সাড়া না পাইয়া কহে—বলি, করচিস কি ছোট-বৌ, আমার পিণ্ডি দিচ্ছিস নাকি ?

মানদা ঝঙ্কার দিয়া বলে—তোমার দিতে যাব কেন বল, দিচ্চি যে আমার অদেষ্ট তৈরি করেচে সেই মুখপোড়ার, দেখা পাই তো দেখি আমি একবার।

বড়-বৌ ওইখান হইতে বলে—মুখপোড়া বড় ভীতু লো, সে কিছুতেই দেখা দেবে না, মিছে ঘরে বসে আছিস, আয় দেখি, আমার কাজটা একটু এগিয়ে দিবি।

মানদার ইচ্ছা করে, তাহা হইলে মুখপোড়ার পাওনা-গণ্ডাটুকু ওই মুখপুড়ীর পিঠেই ঝাড়িয়া দেয়, কিন্তু আর-এক মুখপোড়ার ভয়ে তাও পারে না।

সেদিন মহাতাপ বাড়ি ফিরিল বেশ একটু রঙের মাথায়। বড় বড় চোখ দুটো লাল, আর ঢল ঢল সারা দেহখানাই যেন টলে, মুখখানা রাঙা অথচ থমথমে। সে আসিয়াই গম্ভীর গলায় হাঁকিল—বড়-বৌ, হামারা ছাতু লে আও !

বড়-বৌ বাহিরে আসিয়াই চমকিয়া উঠিল, সে মহাতাপকে কোনো কথা কহিল না, গম্ভীর কণ্ঠে হাঁক দিল—ছোট-বৌ !

সে কণ্ঠস্বরে এবার মহাতাপও চমকিল, তাহার হিন্দী বাত কোথায় উড়িয়া

গেল। সে বলিল—ছোট-বৌ তো পয়সা দেয় নি, আট আনা পয়সা সে কোথা পাবে? মাইরি বলচি তোমার গা ছুঁয়ে।—বলিতে বলিতে সে সরিয়া পড়ে।

গায়ে হাত দিয়া মিথ্যা শপথ করিলে অঙ্গস্পৃষ্ট প্রিয়জন যে বাঁচে না, সে মহাতাপ জানিত। আপন ঘরে ঢুকিয়া মহাতাপ দেখে, পরিপাটি করিয়া আসনটি পাতা, পাশেই এক গ্লাস জল, এদিক-ওদিক চাহিতেই দেখে কোণে বাটিতে কি ঢাকা রহিয়াছে, ঢাকা খুলিয়া সে বসিয়া গেল।

ওদিকে বড়-বৌ আরও গম্ভীরকণ্ঠে ডাকে—ছোট-বৌ, বলি কানে সোনা পরেচ ক-ভরি?

এবার ছোট-বৌ ফোঁস করিয়া ওঠে, সে পান সাজা ফেলিয়া সম্মুখে আসিয়া বলে—সোনা কোথায় পাব বল, সরকার-বাড়ির সুয়োরানীরই সোনা জোটে না, তা কোথাকার ঘুঁটেকুড়ুনী—

বড়-বৌ কথার বাঁকা গতির মোড় ফিরাইয়া সোজা কহে—তাই বলি, চালে আমার হিসেব মত চলে না কেন, চাল বিক্রী করে করে—

মানদা ঝঙ্কার দিয়া বলে—করেচি বেশ করেচি। সরকার-বাড়ির চাল-চুলো তো কারও বাপের বাড়ি থেকে আসে নি।

দোতলা হইতে তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে একটা কথা আসিয়া পড়ে—সেই কথাটাই মনে রাখতে বল বড়-বৌ, সরকার-বাড়ির চাল-চুলো কারও বাপের বাড়ি থেকে আসে নি!

কণ্ঠস্বর বড়-কর্তা সেতাবের।

কথাটার উত্তর মানদার খর-জিহ্বাগ্রে আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া মরে, কিন্তু নেহাত লোকলজ্জায় বাহিরে আসিতে পারে না, সে ঘোমটার ভিতর গর্জায়।

উপর হইতে বড়-কর্তা আবার বলে—যত সব ছোটলোকের ঘরের মেয়ে!

এবার বড়-বৌ উত্তর দেয়—বাড়ির মেয়েদের কথা-কাটাকাটির ভেতর পুরুষমানুষের কথা কইবার দরকার কি শুনি, আর আমাদের বাপ তোলবারই বা তোমার কি অধিকার শুনি?

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ক্রুদ্ধ মত্ত কণ্ঠ শোনা যায়—খবরদার, শুকুনি চামার কিপটে, মেয়েদের কুছ বোলেগা তো ছাতু চটকে দেগা। ওঃ, বিয়ে করেচে তো মানুষ কিন লিয়া!

বড়-বৌ উপরে ছুটিয়া আসে, ভয় হয় বা সুন্দ-উপসুন্দের দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায়। আসিয়া দেখে, সুন্দ তখন ঘরে ঢুকিয়া খিল দিয়াছে, আর উপসুন্দ তখনও দরদালানে দাঁড়াইয়া আস্ফালন করিতেছে—চামারকে সাথ হাম নেহি রহে গা,

কাল হাম ভিন্ন হোগা!—হাতে-মুখে কালো কালো কি মাখা, তাই চাটিয়া চাটিয়া খাইতেছে।

বড়-বৌ তার হাতখানা ধরিয়া শুঁকিয়া কহে—এ কি ছাতু না খইল?

মহাতাপ দিব্য হাত চাটিতে চাটিতে বলে—কোণে ভেজানো ছিল, গুড় দিয়ে দিব্যি লাগচে। হুঁ, ছাতুই বটে!—বলিয়া আর একবার চাটে।

বড়-বৌ বলে—আমার আর ছুটকির মুণ্ডু, সে মাথা ঘষবার জন্যে খইল ভিজিয়ে রেখেছিল বুঝি—

বড়-বৌ তাহার হাত ধরিয়া কহে—এস, হাত ধোবে এস। যাইতে যাইতে সিঁড়ির পথে আবার কহে—বলি, নেশা কি এমনি করেই করে যে স্বাদ-আস্বাদ—

মহাতাপের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, সে বড়-বৌর হাত ছাড়িয়া সেই সিঁড়িতে হেঁট হইয়া বসিয়া বড়-বৌর পায়ের বদলে মাটিতে হাত ঘষিতে ঘষিতে কহে—গুরুর দিব্যি, তোমার পা ছুঁয়ে বলচি, কোন চণ্ডাল মিছে কথা বলে, মিথ্যে বলি তো—

বড়-বৌ শশব্যস্ত হইয়া কহে—আচ্ছা, আচ্ছা, ওঠ, ওঠ!—বলিয়া হাতখানা বাড়াইয়া দেয়।

—বিশ্বাস হল না, ধরে তুলতে চাচ্ছ, আচ্ছা দেখ।—বলিতে বলিতে উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির মোড়ের মুখে গড়াইয়া পড়ে, তবু সে বলে—মিথ্যে বলি তো ধুমসীর মাথা খাই, বলিয়া পড়িয়া পড়িয়াই গান ধরিয়া দেয়ঃ

মূর্খে বলে সুরা, মায়ের প্রসাদ কারণ বারি···

বড়-বৌ পরম যত্নে তাহাকে দুই হাত ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, মহাতাপও এবার তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া উঠিতে উঠিতে কহে—যার বড়-বৌ নেই, তার আর কেউ নেই!

বড় বৌ অতি কষ্টে সোজা হইয়া দাঁড়াইতেই দেখে উপরে সিঁড়ির মাথায় সেতাব, সাপের মত নিমেষহীন হিংস্র দৃষ্টি তাহার চোখে; চোখাচোখি হইতেই সেতাব বলে—বটে, এই জন্যে এত! লোকে দেখি মিথ্যে বলে না।

বড়-বৌ ঘৃণায় মুখ ফেরায়, এ পাশেও ঠিক এমনি দুটি চোখের দৃষ্টি তাহার সর্বাঙ্গে যেন আগুন ধরাইতে চায়—নীচে ঠিক সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া ছোট-বৌ মানদা।

মানদা বলে—যা ঘটে তাই রটে, আর তা সত্যিই বটে, কথাটা দেখি মিথ্যে নয়। লোকে মিথ্যে বলে না।—বলিয়াই চলিয়া যায়।

বড়-বৌ গম্ভীর কণ্ঠে বলে—কি বললি ছোট-বৌ ?

নেপথ্য হইতে উত্তর আসে—বলছিলাম আজ মাসের ক-দিন হল, জান গো বড়-গিন্নী ?

বড়-বৌ মহাতাপকে ছাড়িয়া দিয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল, মহাতাপ আবার সিঁড়িতে পড়িয়া গিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল।

ক্ষণেক পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বড়-বৌ বহু কষ্টে মহাতাপকে তাহার ঘরে শোয়াইয়া দিল। তারপর নীচে আসিয়া দাওয়ার উপর নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। এই অকল্পিত অসম্ভব আঘাতে তাহার স্নায়ু, শোণিত-প্রবাহ, হৃৎপিণ্ড, সব যেন নিশ্চল অসাড় হইয়া গিয়াছে।

কতক্ষণ কাটিয়া যায়, উপর হইতে শব্দ উঠে, ওয়াক ওয়াক! মহাতাপ বমি করে।

মানদা তাড়াতাড়ি উপরে যায়; ক্ষণপরেই মত্ত কণ্ঠে শোনা যায়—নেহি মাংতা হ্যায়, ভাগো তুম, ভাগো ধুমসী, গিধ্বড়-বদনী, ভাগো!

মানদার তীব্র কণ্ঠ শোনা যায়—কে তোমার চাঁদবদনী আছে শুনি, নরক সাফ কে করে দিয়ে যাবে শুনি ?

মহাতাপ হাঁকে—বড়-বৌ, বড়-বৌ!

মানদাকে পিছন হইতে আকর্ষণ করিয়া বড়-বৌ বলে—পাগলের কথায় রেগে কি হবে, সরে আয়, আমি পরিষ্কার করে দিই।

মানদা একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না। সেতাব বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সে বাহিরে যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—একগাছা দড়ি নিয়ে গলায় দিও।

তাহার বুকের পুঞ্জিত ঈর্ষা ফাটিয়া পড়িতে চায়।

এই ছাতুপর্বের ফলেই, সরকার-বাড়িতে সত্য সত্যই কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল।

সেতাবের মনে মহাতাপ ও বড়-বৌর নিবিড় আকর্ষণের ফলে যে স্বাভাবিক সন্দেহ ছিল, সে আজ ভীষণাকার ধারণ করিল। সেতাবের আর সহ্য হইল না, ঠিক পরের দিনই সে প্রাতঃকালে সদরে বসিয়া মহাতাপকে ডাকিয়া বলিল—তোমার সম্পত্তি তুমি বুঝে নাও, এক জায়গায় থাকা আর পোষাবে না।

মহাতাপ প্রবল উৎসাহে বলিল—বহুত আচ্ছা, আমিও তাই চাই। আর বড়-বৌ বলছিল, গাছের আমড়া দেখে সে আর ভাত খেতে পারচে না।

পাগলের প্রলাপ সব সময় বোঝা যায় না, তবুও সেতাব তার মুখে বড়-বৌর দুঃখের কথা শুনিয়া জলিয়া গেল। সে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া আপন মনেই কহিল—হ্যাঁ, বাপের বাড়ি গিয়ে দুধে-ভাতে খাবে।

মহাতাপ কিন্তু কথাটা শুনিল না, তৎপূর্বেই উঠিয়া বাড়ির দিকে চলিল সু-সংবাদটা দিতে; সেতাব আবার তাহাকে ডাকিল—শোন!

—কি?

আজই সব ভাগ হবে, আমি মাতব্বর-মুরুব্বিদের খবর দিয়েচি, আমাদের পাড়ার রামবাবু, তারু জ্যেঠা, ইন্দির-দাদা, ও-পাড়ার ফকির মোড়ল, কালাচাঁদ-বাবু। দেখ, এ ছাড়া, আর কাউকে ডাকব?

মহাতাপ বলে—আবার কে? ওই হবে।

বেশি কথা বলিতে আর তাহার বিলম্ব সহিতে ছিল না, সে সায় দিয়া বাড়ি ফিরিল!

সেতাব হাঁকিল—সরকার মশায়!

সরকার আসিয়া সবিনয়ে ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া হাত কচলায়।

সেতাব বলে—পালকি বেহারা বলে রাখুন, বড়-বৌ কাল বাপের বাড়ি যাবে। আর একটি কনে, আচ্ছা, সে পরে হবে।

বাড়ির বাহির হইতেই মহাতাপ হাঁকে—বড়-বৌ, বড়-বৌ! রান্নাশালে বড়-বৌ বসিয়া বাটনা বাটিতেছিল; সে তাহার ডাকে আজ আর হাসিয়া সাড়া দিল না, শুধু মুখ তুলিয়া চাহিল; দারুণ বিষণ্ণ মুখ।

সে মুখ কিন্তু আজ মহাতাপের চোখে পড়িল না; উৎসাহে বলিল—কি দেবে বল?

বড়-বৌ চুপ করিয়া থাকে, মহাতাপের তা ভালো লাগে না; সে প্রবল ধমক দিয়া বলে—বলি কথা কইচ না যে?

বড়-বৌ ম্লান হাসি হাসিয়া কহে—কি বলব বল?

কথার জবাব পাইয়া মহাতাপ বড় খুশী, সে বলে—এখন দুটো যোয়ান-মৌরি দাও দেখি, ছাতুর অম্বল আজও মরে নি।

বড়-বৌ বলে—যোয়ান-মৌরি তোমাদের বাড়িতে কখনও আসে, যে পাবে!

—কেন ওই যে রান্নার পাটায় রয়েছে, ওই যে!

বড়-বৌর অতি বিষণ্ণ মুখও কৌতুকে ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সে বলে—আমার পোড়াকপাল, ও-যে ধনে আর সম্বর!

মহাতাপ দিব্য বলে—বেশ, ওই তো রোজ নিয়ে খাই আমি, ওতেই তো আমার বেশ অম্বল মরে।

বলিয়া নিজেই দুইটা ধনে তুলিয়া মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলে—হ্যাঁ, তার পর শোন, আর আমড়া দেখে ভাত খেতে হবে না। আজ ঠিক হয়েছে, আজই ভিন্ন হব, বিষয় ভাগ হচ্ছে।

ওপাশ হইতে মানদা বক্র-হাসি হাসিয়া বলিল—তবে তো বড়-বৌর মাছের মুড়োর বরাদ্দ হবে।

আনন্দে বিভোর মহাতাপ আজ আর রাগে না, সেও ব্যঙ্গ করিয়া কহে—না, তুই খাবি! বুঝলে বড়-বৌ, চিমড়ের হাত আর ধুমসীর ব্যাড়র-ব্যাড়র আজ থেকে ঘুচবে, আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচব।

বড়-বৌ তাহাকে বাধা দিয়া হাসিয়া ছোট-বৌকে বলে—কি করব বল ছোট-বৌ, ভাসুর তোর আমাকে নেবে না, আমার আমড়া দেখে দেখে ভাত খাওয়া সত্যই ঘুচেছে।

মহাতাপ মাটিতে একটা চাপড় মারিয়া বলিয়া উঠে—নি—শ্চ—য়! নইলে আমার নামই মিছে, দেখ তুমি। আর ধুমসী, বুঝলি কিনা, এমন ভাগ করব যে তোর ও ব্যাড়র-ব্যাড়র জন্মের মত ঘুচাব, তবে আমার নাম!

বড়-বৌ ম্লান হাসি হাসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মানদা খুশী হইয়া দেড় বছরের ছেলেটাকে লইয়া বুকে চাপিয়া আদর করে।

পাচ পঞ্চায়েৎ মিলিয়া বিষয় ভাগ করিল, মহাল, জমি, পুকুর, বাগানবাড়ি, বাসন, আসবাব—সমস্ত।

সেতাব কহিল—আজই তাহলে বাড়ির সীমানা নির্দিষ্ট করে পাঁচিল গাঁথতে লাগানো হোক—ইট, মসলা, রাজ-মজুর সবই মজুত।

একজন পঞ্চায়েৎ বলে—তাড়াতাড়ি কি?

সেতাব বলে—জানেন না, এরপর সীমানা সহরদ্দ নিয়ে কত গোলমাল হয়!

তাহাই হইল, বাড়ির পাঁচিল উঠিতে আরম্ভ করিল।

'বড়-বৌ' 'বড়-বৌ' বলিয়া হাঁকিতে হাঁকিতে মহাতাপ পরম আনন্দে আপন ঘরের দাওয়ায় গিয়া উঠিল। মানদা কাপড় সাঁটিয়া বাসন-আসবাব ঘরে তুলিতেছিল।

বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহার কার্যের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকাতেও যখন তাহার ওই দৃষ্টির সূচিকায় মানদার চৈতন্য হইল না, তখন সে বলিল—বলি, হচ্ছে কি?

মানদা একগোছা বাসন তুলিয়া তাহার পানে না তাকাইয়া চলিতে চলিতে বলে—চোখের মাথা খেয়েচ নাকি ?

মহাতাপ চটিয়া কহে—চোখের মাথা খাই নি, তোর মাথা খাব। বলিয়া গিয়া তাহার কাঁধে একটা কর্কশ ঝাঁকানি দিয়া বলে—তুই এখানে কেন ?

মানদা এবার আর কিছু বলিতে পারে না, সে পরম বিস্ময়ে হতবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

মহাতাপ আবার কহে—যা তুই নিজের ভাগে যা, ওই বড় তরফ, বড়-বৌ এখানে আসবে।

মানদার হাত হইতে বাসনের গোছাটা ঝন ঝন করিয়া পড়িয়া যায়, ঘৃণা-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকে, তারপর সব ফেলিয়া দিয়া ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া, মেঝেতে লুটাইয়া কাঁদে।

মহাতাপ অতি রোষে পঞ্চায়েতের সম্মুখে গিয়া হাজির হইয়া বলে—বাঃ, এ কি রকম হল ! বড়-বৌ নিজে আমাকে বলেচে দাদা তাকে নেবে না, তাই আমি কিছু বলি নি, এখন ছোট-বৌ কেন আমার ঘরে গিয়ে জ্বালাচ্ছে ?

পঞ্চায়েতের পঞ্চ বিজ্ঞ মস্তিষ্ক এ কথার মাথামুণ্ডু কিছুই ঠাওর পায় না, তাহারা অবাক হইয়া তাহার পানে তাকাইয়া থাকে।

সে আবার বলে—এখন আপনারাই ভাগ করে দেন ; ভাগের সময় একটি কথাও আমি বলি নি। আমি বলছি বড়-বৌ আমার ভাগে—

সর্বাপেক্ষা প্রবীণ ফকির মণ্ডল অবাক হইয়া কহে—বৌ ভাগ !

অসহিষ্ণু মহাতাপ বলে—হ্যাঁ, ছোট-বৌ দাদার ভাগে।

কথাটায় পঞ্চায়েৎ পঞ্চমুখে রাম নাম স্মরণ করে।

সেতাব কানে আঙুল দেয়, চক্ষু তাহার জ্বলে।

মহাতাপ ছাড়ে না, সে আপনার মনেই বলিয়া যায়—ছোট-বৌ তাকে দেখতে পারে না, ছোট থেকে ওর সঙ্গে তার ঝগড়া ; আর দাদা নিজে বড়-বৌকে নেবে না বলেচে—

পঞ্চায়েৎ সেতাবের মুখপানে চায়, সম্মতির জন্য নয়, শেষের কথাটার সত্যতা নির্ধারণের জন্য।

সেতাব দৃষ্টির প্রশ্ন বুঝিয়া বলে—নিঃসন্তান, বংশ তো চাই ; জানেন তো, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।—পাঁচ পঞ্চায়েৎ একবাক্যে কেরামৎ করিয়া উঠে।

মহাতাপ বলে—তাহলে ?

ওপাড়ার রামবাবু বলে—এত গাঁজা খেও না মহাতাপ, এত গাঁজা খেও না! একে পাগল আরও পাগল হবে।

—কেন ?

—নইলে বৌ ভাগ করতে বল, বৌ কি ভাগ হয় ?

প্রবল প্রতিবাদে হাত চাপড়াইয়া মহাতাপ বলে—আলবত হয়, কেন হবে না শুনি ? ওই তো সতীশবাবুদের বাড়ির পদ্ম-বৌ আর কাঞ্চন-বৌ।

—আঃ, ওদের একজন হল মা, আর একজন হল নিঃসন্তান খুড়ী।

মহাতাপ আর দাঁড়াইয়া শোনে না, সে আপন মনেই বকিতে বকিতে চলিয়া যায়—যত সব কাজীর বিচার, পঞ্চায়েৎ না আমার ইয়ে—

ঘটনার দিন রাত্রেই সেতাব বড়-বৌকে শাসাইয়াছিল—এ সবে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, তোমাতে তার বেশ পরিচয় পাচ্চি।

আনন্দময়ী বড়-বৌ সেদিন সেই অকল্পিত অসম্ভব আঘাতে যেন মূক হইয়া গিয়াছিল, আর জঘন্য কথার উত্তর দিতে প্রবৃত্তি হইল না ; সে শুধু তাহার পানে একবার চাহিয়া মুখ ফিরাইল। সেতাবের রাগ তাহাতে বাড়িয়া যায়, মেয়ে-মানুষের এত তেজ ; দোষ করিয়া আবার চোখ রাঙায়। সে কহিল—মনে হচ্ছে, গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলে দি।

বড়-বৌ শান্ত কণ্ঠে বলে—তাই দাও।—তাই দাও !

সেতাব এদিক-ওদিক অল্পক্ষণ ঘুরিয়া শেষে বিছানায় শুইয়া বলিল—নাঃ, দুষ্টা স্ত্রী আর সাপ দুই সমান ; খুনের দায়েই বা পড়ি কেন! তুমি মা-বাপের ছেলে, মা-বাপের কাছে যাও, আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। খোরপোশ দেব আমি। —বলিয়া শুইয়া পড়ে। বড়-বৌ মেঝেয় আঁচল বিছাইয়া শোয়।

তাই বড়-বৌ ভাগের দিন ছোট-বৌকে ও কথাটা বলিয়াছিল।

আজ সন্ধ্যায় সেতাব আসিয়া খট খট করিয়া উপরে উঠিয়া গেল, বড়-বৌ সম্বন্ধে তাহার যদি বা কোনো দ্বিধা ছিল, তা আর এখন নাই ; মহাতাপের বৌ-ভাগের কথায় সকল দ্বিধা ঘুচিয়া গেছে।

ছি, ছি, ছি! পঞ্চায়েতে মনে করিল কি ? পাঁচজনের যে আর সন্দেহ রহিল না! আর, পাঁচজনেরই বা দোষ কি, অতি আকর্ষণ ভিন্ন কি মহাতাপ ও কথাটা বলিতে পারিত ?

উপরে খাবারের ঠাঁই তৈয়ারী ছিল, বড়-বৌ ভাতের থালাটা লইয়া গিয়া নামাইয়া দিল। সেতাব অতি রোষে পায়ে করিয়া থালাটা সরাইয়া দিল।

বড়-বৌ একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল—আমার ছোঁওয়া খাবে না?

সেতাব তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কেমন হইয়া গেল। এমন সংযত দৃপ্ত মহিমা সে কখনও দেখে নাই, সে চোখ নামাইল।

বড়-বৌ ধীরে ধীরে থালাখানি তুলিয়া লইয়া যাইতেছিল, সেতাব পিছন হইতে বলিল—কাল তোমায় যেতে হবে।

বড়-বৌ পিছন ফিরিয়াই ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দেয়—বেশ।

সেতাব আবার বলে—গহনাগাঁটি কিছু পাবে না তুমি।

দৃঢ় পদক্ষেপে, অকম্পিত শিখার মত দৃপ্ত মূর্তিটি তখন চলিয়া গিয়াছে। সেতাব আপন মনেই দাঁতে দাঁত ঘষে।

বড়-বৌ কিন্তু আর আসে না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেতাবের উৎকণ্ঠা ও উগ্রতার সীমা থাকে না।—গলায় দড়ি দিল নাকি?

সেই মুখখানির চোখ বড় হইয়া আসিতেছে, জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেতাবের বুকখানা ফাটিয়া যায়, সে তাড়াতাড়ি ডাকে—বড়-বৌ, বড়-বৌ! উত্তর নাই।

সেতাবের মনে বিদ্যুতের মত একটা কথা জাগিয়া উঠে।—হয়ত মহাতাপের কাছে···

সে দেওয়ালে ঝুলানো মরিচা-ধরা তলোয়ারখানা লইয়া বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হইতে হয় না; সামনের খোলা বারান্দায় বড়-বৌ নিস্পন্দ পড়িয়া। ডাকিতে তার ভরসা হয় না, অপরাধীর মত সে ঘরে আসিয়া শোয়।

ভোর বেলা তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কে যেন ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। সেতাবও তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে।

—হ্যাঁ বড়-বৌই বটে। পা টিপিয়া টিপিয়া যাওয়ার ভঙ্গিতে সেতাবের সন্দেহ জাগে। সেও পিছন ধরিয়া চলে।

বড়-বৌ গিয়া মহাতাপের ঘরে উঠে।

তখন পূর্ণ প্রভাত হয় নাই, মহাতাপ গালে হাত দিয়া আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতেছে, পঞ্চায়েতের পক্ক-প্রবীণ-মস্তিষ্ক-দত্ত জ্ঞানে তাহার আক্কেল জন্মাইয়া গেছে। মানদা ঘরে শুইয়াই আছে, বাসন-আসবাব সব এখনও বাহিরে পড়িয়া।

বড়-বৌ চুপি চুপি আসিয়া মহাতাপের সম্মুখে দাঁড়াইল।

মহাতাপ সানন্দে বলিয়া উঠিল—বড়-বৌ!

ঘরের মধ্যে মানদার বুকে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠে, সে উঠিয়া বসে, উদ্‌গ্রীব হইয়া শোনে

বড়-বৌ মৃদুস্বরে বলে—চুপ কর, আস্তে কথা কও, এইটে নিয়ে রাখ।

বলিয়া কাপড়ের ভিতর হইতে একটা ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া সম্মুখে ধরে।

মহাতাপ বলে—কি এ?

মৃদুস্বরে বড়-বৌ বলে—টাকা, তোমার দাদা তোমাকে নগদ টাকায় ফাঁকি দিয়েচে, যা পেরেচি এনেচি, নাও।

মহাতাপের বুদ্ধি মহাতাপকেই ভালো, সে বলে—না, নিয়ে কি করব আমি?

এ প্রশ্নের উত্তর বড়-বৌও দিতে পারে না, শেষে সে বলে—তোমার না দরকার থাকে, মানু, খোকা—

উদাসভাবে মহাতাপ বলে—দাও গে তবে সেই ধুমসীকে, আমি আর ঘরেই থাকব না।

অতি ম্লান হাসি হাসিয়া বড়-বৌ তাহার মাথায় হাত দিয়া বলে—ছিঃ, পাগলামি কি করে, ঘরে থাকবে না কি?

মহাতাপের কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া পড়ে। সে বলে—কার কাছে থাকব বৌদিদি, মা নেই, বোন নেই—

বড়-বৌর চোখে জল আসে, প্রাণপণে অশ্রুরোধ করিয়া সে হাসিয়া তরল ভাবে কহিতে চাহিয়া বলে—কেন বৌর কাছে, মানুর কাছে।

—ধ্যেৎ বৌই বুঝি সব? মা-বোন নইলে কি ঘর বৌদিদি?

বড়-বৌ কথাটা তরল করিবার চেষ্টাতেই পরিহাস করিতে চায়—তা আমিও তো মা-বোন নই—

মহাতাপ বলে—না, কিন্তু তুমি যে বড়-বৌ, তুমি থাকলে মা-বোনের কষ্ট যে বুঝতে পারি না আমি। দাদা তো কথাই কয় না, আমি যে ভিখিরী, বলে মুখ্যু ডাং, বৌ আড়ালে বলে মুখপোড়া, তুমিই শুধু ভালো কথা বল।

বড়-বৌ আর অশ্রুরোধ করিতে পারে না

পিছন হইতে মানদা গায়ে হাত দিয়া বলে—দিদি, ওটা তোমার কাছেই রাখ না, ওকে তো জানো, আর আমি তো বড় উড়ন-চণ্ডে!

মহাতাপ বলে—শুনচ বড়-বৌ, শুনচ মার না খেলে—

বড়-বৌ ম্লান হাসি হাসিয়া বলে—তুমি একটু থাম ভাই। এটা তুইই রাখ মানু, কাল তো বলেচি, আমার এ বাড়ির ভাত উঠেচে। সব বলি নি, শোন,

আজ পালকি আসচে, আমার বনবাস। তোর ভাসুর আবার বিয়ে করবে।

মহাতাপ আর চুপ করিয়া থাকে না, সে স্বভাবসিদ্ধ উচ্চকণ্ঠে বলে—কি! বিয়ে করবে?

বড়-বৌ জোড়হাত করিয়া বলে—চুপ কর ভাই, চুপ কর, রাজ-মজুর আসতে শুরু করেছে।

মহাতাপ চুপ করিয়া যায়। ওদিকে ঘরের মাঝে খোকাটা জাগিয়া কাঁদিয়া উঠে। বড়-বৌ বলে—খোকা উঠেচে ছোট-বৌ, ওকে আন তো, যার ধন তাকেই আমি দিয়ে যাব।

ছোট-বৌ খোকাকে লইয়া আসে, বড়-বৌ তাহাকে কোলে লইয়া বলে—নাও তো বাবা।—বলিয়া টাকার পুঁটুলিটা তার হাতে দেয়।

কথা শুনিতে শুনিতে সেতাবের সর্বাঙ্গ হিম হইয়া যায়, চোখ দিয়া জল আসে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বুকটা হাল্কা হইয়া উঠে।

সে ডাকে—বড়-বৌ!

সকলে সেতাবকে দেখে।

মহাতাপ বলে—শুকুনি সব শুনছিল বড়-বৌ, আমি বলি দরজার আড়ালে ওটা কাপড় বুঝি।

সেতাব ফট ফট করিয়া চটিটা টানিতে টানিতে আসিয়া কহে—টাকাটা দাও তো, ছেলেমানুষ কোথা ফেলবে!

বলিয়া টাকাটা লইয়া বলে—দাও তো একবার খোকামণিকে কোলে করি।

বলিয়াই নিজেই বড়-বৌর কোল হইতে তাকে টানিয়া লইয়া চুমু খাইয়া বলে—আমি সব শুনেচি বড়-বৌ!

বড়-বৌ চুপ করিয়া থাকে।

সেতাব আবার বলে—এতে খোকার এক-গা গহনা হবে, কি বল?—বলিয়া টাকার পুঁটুলিটা নাড়িয়া ওজন দেখিল।

আবার বলে—বংশের মানিক ও, খালি গায়ে ভালো লাগে না। খোকার হয়েও তোমার আর ছোট-বৌমার দুখানা করে হবে, কি বল? আঃ, কি যে তোরা ঠন ঠন করিস বাবু, যা, যা, এখানে পাঁচিল গাঁথতে হবে না, সদরের পাঁচিল যেটা ভেঙে গেছে গাঁথগে যা। আর বল গে যা, পালকি চাই নে।

বড়-বৌ স্বামীর মুখপানে তাকায়।

সেতাব অতি মিষ্ট হাসিয়া কহে—কত ভুল মানুষের হয়।—বলিয়া খোকাকে আড়াল দিয়া হাতজোড় করে।

রাজ-মজুর চলিয়া যায়. বড়-বৌ কাঁদে, মানদা হাসে, মহাতাপ অবাক !

খোকামণিকে আদর করিতে করিতে সেতাব বলে—গ্রহের ফের আর কি, কতগুলো টাকা নষ্ট, পাঁচিলটা গাঁথা, ক-টাকা গেল, আবার ভাঙতে—

মহাতাপ এতক্ষণে লাফাইয়া উঠিয়া বলে—হ্যাঁ, তোমার মত চাঁমদড়ির পয়সা লাগে, ও পাঁচিল আমি তিন লাথিতে—

বড়-বৌ মহাতাপের হাত ধরিয়া বলে—থাক, শেষটা আমাকে পদসেবা করিয়ে ছাড়বে। সেঁক করতে আমি পারব না।

সেতাব হা হা করিয়া হাসে।

এটা তাহার নূতন।

পৌ ষ-ল ক্ষ্মী

১৩৫০ সালের পৌষ মাস। পঞ্চাশ হল শয়ের অর্ধেক। শয়ে শূন্য। শয়ের অর্ধেক পঞ্চাশেও গাঁয়ের অর্ধেক লোক ঝেড়ে মুছে নিয়ে গেছে, বাকী অর্ধেক যারা আছে তারাও আধমরা, হিসাব ঠিক আছে। গাঁয়ের প্রবীণেরা এবং বিচক্ষণেরা পালপাড়ায় কালী-ঘরের সামনে অশ্বত্থতলায় বসে তামাক খেতে খেতে সেই কথারই আলোচনা করে। এক ছিলিম তামাকেই গোটা মজলিসের এখন পরিতৃপ্তি হয়, কলকে আজকাল আর দুটো লাগে না ; যে তামাক এক-একজনে পুরো এক ছিলিম খেয়েও তৃপ্তি পেত না, সেই তামাক দুটান টেনেই লোকে এখন কাশতে শুরু করে, বুকে শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় করে উঠে। এবারের বানের ঠাণ্ডা ক্রমে শ্লেষ্মা হয়ে মানুষের ম্যালেরিয়াজীর্ণ বুকে জমে বসেছে গাঁয়ের খিড়কি-ডোবার পচা জলে থকথকে দলাশের মত।

সবচেয়ে বয়স বেশি মুকুন্দ পালের—ষাট-পঁয়ষট্টি হবে। ভারিক্কি লোক। কালো কষকষে রঙ পালের, এককালে জোয়ানও ছিল খুব ভারি, তখন নাকি মাথায় ছিল বাবরিচুলের বাহার। এখন পাল বুড়ো হয়েছে, তার ওপর এবারকার ম্যালেরিয়ায় ভুগে বার কয়েক ধোপার পাটায় আছাড়-খাওয়া পুরানো কাপড়ের মতই এতবড় দেহখানা তার জ্যালজ্যাল করছে। মাথার চুলগুলি একেবারে কদমফুলি ছাঁটে ছাঁটা এখন পেকে সাদা ধপধপ করছে ; পাল প্রায়ই এখন মাথায় হাত বুলায়, খুঁটিয়ে ছাঁটা চুলগুলির কড়া ডগার উজানের টানে হাতের তালুতে বেশ সুড়সুড়ি লাগে।

পাল হুঁকাটা ঘোষের হাতে দিয়ে বলে, একবার যদি কেউ পুরো এক ছিলিম তামাক খেতে পারে ঘোষ—। বলেই সে কাশতে আরম্ভ করে, কেশে, কাশির ধমক সামলে কথাটা শেষ করে—তবে আর বুকে মালিশ লাগে না। বেবাক শ্লেষ্মা, বুঝেছ? আবার এক ধমক কাশি আসে, এবার মোটা এক চাকা শ্লেষ্মাও উঠে যায়, পাল আরাম পায়। ঘোষ তখন কাশতে শুরু করেছে। তারপর আরম্ভ হয় শয়ের অর্ধেক পঞ্চাশের আলোচনা। হিসাব-নিকাশ ঠিক আছে। চিত্রগুপ্তের কলম। ভুল কি হয়?

ঘোষ কয়েকবার ঘাড় নেড়ে বললে, তা হয়। মুনি-ঋষিদেরই মতি-বেভ্রম হয়, তা চিত্রগুপ্ত। হাজার হলেও চিত্রগুপ্ত তো বামুন নয়, কায়স্থ—এবারেই ভুল হয়েছে।

সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়। কি ভুল হল? এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

নদীর ধার পর্যন্ত খোলা পূর্বদিকের পানে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে ঘোষ বলে, ধান।

পূর্বদিকে নদীর ধার পর্যন্ত গাঁয়ের মাঠ, তিন ভাগে ভাগ করা—ষাঁড়া জোল, মাঝের জোল, বেনো কূল। নামেই তিন ভাগে ভাগ করা, নইলে মাঠ একটাই। গ্রামের কোল থেকে নদীর ধার পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র। গোটা মাঠখানি এবার ধানে থইথই করছে, সোনার বরণ রঙ ধরে এসেছে। ওই ধানই জীবনকাঠি, মরণকাঠি; এবারের ধান ঘরে উঠলে জীবন থাকবে, নইলে মরণ —অবধারিত মরণ, তাতে আর কোনোও সন্দেহ নাই। ভরসার মধ্যে বাগদী-কাহার-মুচিরা যারা ঘর ছেড়ে পালিয়েছে, তারা যদি ফিরে আসে। আর যদি আসে ডুমকা থেকে সাঁওতালের দল।

গাঁয়ের বাগদী-কাহার-মুচি এদের যারা দিনমজুরি খাটে, চাষ করে না, তারা প্রতি বছরই বর্ষার সময় গাঁ ছেড়ে চলে যায়। বিশেষ করে অজন্মা আকাড়া হলে সেবার দল বেঁধে চলে যায়, অজন্মা না হলেও দু ঘর এক ঘর যায়, আবার ফেরে এই ধান কাটার সময়। কেউ কেউ সেই বছরই ফেরে, কেউ কেউ ফেরে পাঁচ বছর পর, কেউ বা ফেরে এক পুরুষ পর। দল বেঁধে ফেরে এমনই বাহান্ন পউটির বছরে, ধানে ধানে ছয়লাপের পোষে। ওরা এমনই ধারা সুখের পায়রা চিরকাল, দুঃখের ঘরে থাকা ওদের স্বভাবের বাইরে। সকল সুখের মূল যখন লক্ষ্মী, তখন এবার ওরা আসবে—এই ভরসা নিয়ে খানিকটা শান্তি পায় পাল মশায়েরা। সকালে বিকালে ঠুকঠুক করে যায় ওদের পরিত্যক্ত পাড়াটার

দিকে। পড়ো ভাঙা বাড়িগুলো খোঁজ করে, পাড়ার বাইরে বটবাগানের বটগাছগুলোর তলার দিকে চায়। এখানে খোঁজ করে, নূতন আগন্তুক কেউ এল কি না! এ গ্রাম থেকে পালিয়ে যেমন এখানকার ওরা অন্য গ্রামে যায়, তেমন অন্য গ্রামের তারাও তো এ গ্রামে আসতে পারে! তেমন যারা আসে, তারা প্রথম বাসা পত্তন করে এই বটবাগানে কোনো গাছের তলায়। কিন্তু কেউ আসে নাই আজও পর্যন্ত। পাল মশায়দের উৎকণ্ঠার সীমা নাই। থই-থই-করা মাঠ-ভরা ধান, এ তারা তুলবে কি করে? রাত্রে ঘুম পর্যন্ত হয় না।

তবুও মাঠে ধান কাটা চলছে। রুগ্ন দুর্বল শরীর নিয়েও মানুষ ভোরবেলায় কাঁথা গায়ে দিয়ে কাস্তে হাতে মাঠে যায়। মাথায় গামছা বাঁধে কম্ফর্টারের মত। নাক দিয়ে টপ টপ করে জল ঝরে, পৌষের ভোরের শীতে হাতের আঙুল বেঁকে যায়, তবুও সেই আড়ষ্ট হাতের মুঠায় কোনোমতে ধানের ঝাড়ের গোড়া চেপে ধরে ডান হাতের কাস্তে টানে।

মুকুন্দ পালের কৃষাণ কাল থেকে জ্বরে পড়েছে। পালকে আজ নিজেকেই আসতে হয়েছে মাঠে। কিন্তু কাস্তে যেন চলছে না। হেঁট হয়ে কাস্তে টানতে কোমরে টান ধরে অসহ্য বেদনায় টনটন করে উঠছে। যেন কোমরের দড়ির মত শিরাগুলো শুকিয়ে কাঠির মত শক্ত হয়ে গেছে; হাড়ের গাঁটে গাঁটে জমে গেছে বালিতে মাটিতে জমাট-বাঁধা পাথরের চাঁইয়ের মত। পাল কোমরে হাত দুটি রেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। হেঁট হয়ে থাকা যত কঠিন, হেঁট হয়ে কিছুক্ষণ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানও তেমনই কঠিন। শাঁখের করাত যেতেও কাটে, আসতেও কাটে, কোমরের ভিতরে যেন শাঁখের করাত চলছে মনে হচ্ছে!

—হায় ভগবান!—পাল উঠে দাঁড়িয়ে নিজের কাজটুকুর দিকে চেয়ে দেখে আপনার মনেই বললে, হায় ভগবান! শুধু আক্ষেপই নয়, নিদারুণ লজ্জায় তার মাথাও হেঁট হয়ে আসছে। আপনার কাছেই মাথা হেঁট হচ্ছে। কতটুকু কেটেছে সে। তালপাতায় বোনা চ্যাটাই, লম্বায় পাঁচ হাত, চওড়ায় আড়াই হাত, এখানে বলে 'তালাই'; এক তালাই-ভর জমির ধানও কাটা হয় নাই।

হঠাৎ তার চোখ ফেটে জল এল। তার পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। ছেলেবেলায় তার সঙ্গীরা তাকে বলত—গাঁদা। যৌবনে মুরুব্বিরা তার নাম দিয়েছিল—ভীম। প্রৌঢ়ত্বে লোকে বলত—মোটা মোড়ল, এখনও বলে। মনে পড়ে গেল পুরনো আমলের ধান কাটার কথা। সে সব আজ কাহিনী

মনে হচ্ছে। এমন মাঠ থই-থই-করা ধান এবারেই নতুন নয়। কতবার হয়েছে। ভোরের আকাশে শুকতারা তখন জ্বলজ্বল করত আঁধার ঘরের মানিকের মত। উত্তর দিক থেকে সিরসির করে বয়ে যেত হাড়-কনকনানি ঠাণ্ডা বাতাস। গাছপালার পাতা থেকে গাছতলার শুকনো পাতার উপর সত্যি সত্যি টপটপ শব্দে শিশির ঝরত ; ঘাসের উপর পা দিলে গোড়ালি পর্যন্ত ভিজে যেত। পথের ধুলার উপর পাটালির মত এক পুরু ধুলা শিশিরে ভিজে জমে থাকত, পা দিলে ভেঙে যেত। ধানের মাঠে এলে, শিশিরে-ভেজা নরম ধানের গাছে সে গন্ধ বেলায় এসে আজ পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু সে গন্ধ মনে আছে তার। সেই ভোর থেকে আরম্ভ হত ধান-কাটা।

পাল তার হাতখানা মেলে ধরলে চোখের সামনে ; এ হাতের গ্রাসে, লোকে বলে, এক পো চালের ভাত ওঠে। এক পো কি আর ওঠে? লোকে বাড়িয়ে বলে। তবে তার হাতখানা প্রকাণ্ড। এই হাতের এক মুঠায় সে থপথপ করে ধরত ধানের গোড়া আর ডান হাতে কাস্তের এক টানে কেটে চলত ঘাস-কাটার মত ; তার এই মুঠার তিন মুঠা ধানে বাঁধা ধানের আঁটি অন্য লোকের বাঁধা আঁটির দ্বিগুণ না হোক, দেড়া মোটা হত। বেলা এক প্রহর যেতে না যেতে, রোদের আঁচে ধানগাছ শুকিয়ে খড়খড়ে হবার আগেই ক্ষেতের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত শেষ করে ফেলত।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তি কমে আসারই কথা। তবুও গত বছর পর্যন্ত সে এক পহর বেলা পর্যন্ত আধখানা ক্ষেতের ধানও কেটেছে। কিন্তু এই কটা মাসে এ কি হল তার?

—কি কত্তা, ডাঁরিয়ে রইচ যে? কি হল?

আপনার ভাবনার মধ্যেই ডুবে গিয়েছিল পাল, তার মন উদাস হয়ে সেকালের সেই আমলে চলে গিয়েছিল, মধ্যে মধ্যে এই জমিখানাই যেন দেখাচ্ছিল সমস্তটা কাটা হয়ে গেছে, এ-ধার থেকে ও-ধার পর্যন্ত আঁটি আঁটি করে সাজানো রয়েছে কাটা ধান, ক্ষেতের লালচে মাটি দেখা যাচ্ছে, লালচে মাটির উপর কাটা ধানের গোড়া জেগে রয়েছে লাল রঙের দাবার ছকের উপর সাদা রঙের ঘুঁটির মত।

পিছন থেকে কে ডেকে কথা বললে! পাল ঘুরে দাঁড়াল। দৃষ্টিও কমে এসেছে। গেল বছর পর্যন্তও পাল বিনা চশমায় চট-সেলাই-করা সুচে শণের সুতলির দড়ি পরিয়েছে, বস্তার মুখ সেলাই করেছে। কিন্তু এই বছরের এক ধাক্কাতেই বেলা কাবার করে দিলে, চারিদিক ঝাপসা! তুলসীতলায় পিদিম

জ্বালার সময় হয়ে এল! আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাল লোকটির দিকে তাকিয়ে বললে, কে?

—আমি গো; চিনতে পারছ না, না কি?

পালের এবার খেয়াল হল, ছোকরা-মানুষের গলা; মুহূর্তে সে চিনতে পারলে ছোকরাকে। মন তার বিষিয়ে উঠল।

—নজর গেল তাহলে কত্তা! আমি গো চিকেষ্ট।

—চেকা?

—হ্যাঁ গো। বলি ডাঁরিয়ে রইচ যে?

—তুই কোথা যাবি? মাঠ থেকে পালিয়ে এলি নাকি? জ্বর এল?

—জ্বর?—চিকেষ্ট হি-হি করে হাসতে লাগল।—জ্বর-ফর আমার কাছে ঘেঁষে না। সেই তোমার আশ্বিন মাসে একবার। তার পরে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি।

পালের বুক থেকে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল, সাপের গজরানির মত, নিশ্বাসের সঙ্গেই সে বললে, হুঁ!

—মদ আর মাস ও হল জ্বরের যম। বুয়েচ?—হি-হি করে আবার হাসতে লাগল চেকা।

—তা যাবি কোথা, যা না কেনে? ফ্যাকফ্যাক করে হাসতে বুঝি মজা লাগছে আমার ছামনে ডাঁরিয়ে?

চেকা আবার হাসতে আরম্ভ করে দিলে। বললে, যাচ্ছি তোমার ওই মাঝের জোলে পাঁচ কিত্তে তিন বিঘের চকে—তোমার দরুণ গো। এখান সারা হয়ে গেল।

পাল হঠাৎ হেঁট হয়ে ঘষঘষ শব্দে আবার ধান কাটতে আরম্ভ করে দিলে। চেকার কথার ওই পাঁচ কিত্তে তিন বিঘে তোমার দরুণ কথাটা তপ্ত লোহার শলার মত পালের বুকে যেন বিঁধে গিয়েছে। ওই জমিটা চেকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পালের কাছ থেকে কিনেছে এই বৎসরই বর্ষার ঠিক আগে। ধানের দর আঠারো টাকা, চাল তিরিশ, পালকে বাধ্য হয়ে বেচতে হয়েছে। চেকা বোধ হয় খোঁচা মারবার জন্যেই কথাটা বলেছে। খোঁচাটা লেগেছেও পালের বুকে।

চেকা তবু গেল না। দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। বললে, সেই সকাল থেকে এই এক তালাই কাটলে না কি?

পাল এ কথারও কোনো উত্তর দিলে না। সে ধান কেটেই চলল। চেকার এ কথার মধ্যেও হুল আছে।

—কত্তা!

পালের কোমর আবার কনকন করে উঠেছে; মনের জ্বালার উপর শরীরের যন্ত্রণায় পাল এবার আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না। সে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল দেহের উপর একটা হ্যাঁচকা টান মেরে, মট করে শব্দ হল হাড়ে। পাল রাগে অধীর হয়ে বলে উঠল, কেনে রে শালা, কেনে? কি, বলছিস কি?

চেকার হাসি বেড়ে গেল, সে চটপট শব্দে বার কয়েক বাই ঠুকে বললে, হবে না কি, এক হাত হবে না কি এই ধানের গদির ওপর?

বলেই সে আর দাঁড়াল না, নিতান্ত অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে একটা গান ধরে সে চলে গেল। পাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কোমরে হাত দিয়ে। চোখ দিয়ে এবার তার জল গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল।

মুকুন্দ পাল—এককালের ভীম, প্রৌঢ় বয়সের মোটা মোড়ল, তাকে ঠাট্টা করে গেল ওই শ্রীকৃষ্ণ—চেকা! সম্বন্ধে সে অবশ্য মুকুন্দের নাতি, সম্বন্ধটা ঠাট্টারই বটে; কিন্তু এ ঠাট্টা মুকুন্দের পক্ষে মর্মান্তিক।

শ্রীকৃষ্ণ এখন গ্রামের মধ্যে সকলের চেয়ে অবস্থাপন্ন চাষী। উঠানে গোলায় গোলায় ধান আছে, ঘরে টাকা আছে। মহামহিম শ্রীশ্রীকৃষ্ণ পাল বরাবরেষু বয়ানে লেখা এ গাঁয়ের লোকের সই-করা খত আছে ওর ঘরে। 'পাঁচ কিত্তে তিন বিঘের চক' বলে সেই কথাটা চেকা ঠাট্টা করে বলে গেল। ওতে পাল ব্যথা পেয়েছে, দুঃখ পেয়েছে; কিন্তু ওর উপর হাত নাই। ও দুঃখ মনে মনেই চেপে রেখেছে মুকুন্দ। কিন্তু ও যে ওই বাই ঠুকে বলে গেল—হবে নাকি এক হাত?—ওর অর্থ হল, মুকুন্দের শরীরের এ অবস্থা দেখে সে তার সঙ্গে একদফা কুস্তি লড়তে চেয়ে গেল।

একালের ছোকরাদের মধ্যে চেকাই হল সকলের চেয়ে বড় জোয়ান। পালের মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল। মনে পড়ল, বছর আষ্টেক আগে আমুতির লড়াইয়ের আখড়ায় যখন শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আছাড় দিয়ে আখড়ার মাটির উপর বাই ঠুকে পড়ে ছিল, তখন হাসতে হাসতে মুকুন্দ গিয়ে বলেছিল, কই আয় দেখি, আমার সঙ্গে আয় এক হাত।

অন্য পাঁচজনে, বিশেষ করে যগন্দ ঘোষ, তার হাত ধরে টেনে বলেছিল, ছি ছি ছি! তোমাকে না কি লড়তে হয় ওই বালকের সঙ্গে! ছি!

শঙ্কিত হয়ে বারণ করেছিল সবাই, পালের শরীরের যা ওজন, তাতে সে যদি

চেকার উপর কোনোমতে চেপে পড়ে, তাহলেই ছোঁড়াটা ঘায়েল হয়ে যাবে। শঙ্কিত হয় নাই শুধু ছিকেষ্ট, সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, এই, হট যাও সব, লড়ব আমি।—চেকার স্পর্ধা চিরকালের। পায়তারায় ঘুরতে ঘুরতে আবার সে বলেছিল, মোটাকে সাথ আঁটা লড়েগা, হট যাও।—পালের দেহখানা প্রকাণ্ড বলে এবং লোকে তাকে মোটা মোড়ল বলে বলে, সেই দশের সামনেই সে নিজের নামকরণ করেছিল—আঁটা, অর্থাৎ আঁটসাঁট-দেহ তরুণ। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সে গরম জল হয়ে গিয়েছিল। মুকুন্দ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরে গোটা আখড়াটার চারিধার ঘুরে আখড়ার উপর ফেলে দিয়েছিল—বেশ একটু জোরেই ফেলে দিয়েছিল।

তাই আজ চেকা মোড়ল তাকে ঠাট্টা করে গেল। বাই ঠুকে আস্ফালন করে লড়াই করবার জন্যে প্রায় হাঁক মেরে ডাক দিয়ে গেল।

হায় ভগবান! কি কাল জ্বর তুমি দুনিয়ায় পাঠালে। রক্ত জল করে দিলে, মাংস সব যেন চিবিয়ে খোল করে দিলে, হাড়ে পর্যন্ত ঘুন ধরিয়ে দিলে! চোখের দৃষ্টি গেল। উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘোরে। দু-পা জোরে হাঁটলে হাঁপাতে হয়। নইলে সে তো বুড়ো নয়। ষাট বছর বয়স কি এমন বয়স? তার বাপ পঁয়ষট্টি বছর বয়সে পাঁচসেরী কোদাল চালিয়েছে জোয়ান-কৃষাণের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে। সে নিজে? নিজেই তো সে এই বর্ষাতেও কোদাল চালিয়েছে, লাঙলের মুঠো ধরেছে। হঠাৎ এ কি হল? হায় ভগবান! বুড়ো করে দিলে?

—কি? চলছে না হাত? দাঁড়িয়ে আছ?

—কে?

—আমি।—সকরুণ কণ্ঠে বললে যগন্দ ঘোষ, আমিও পারলাম না। ফিরে এলাম।

—যগন্দ! এ কি হল ভাই যগন্দ?

যগন্দ বললে, লা এসে ঘাটে নেগেছে। আর দেরি নাই।—যগন্দর গলা কাঁপছে, স্পষ্ট বুঝতে পারলে মুকুন্দ। সঙ্গে সঙ্গে তারও চোয়ালের নীচের সমস্ত মাংসটা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

যগন্দ এগিয়ে এসে বললে, তামাক খাও।

আলের উপর দুজনে বসল। মুকুন্দর হাতে হুঁকো ধরাই রইল। সে যেন কিছুই ভাবছে।

যগন্দ তাকে হুঁকোর কথা মনে পড়িয়ে দিল, খাও।

—হুঁ।—হুঁকোয় সে শুধু মুখই দিলে, টানলে না। তারপর হঠাৎ বললে, লায়ে পার হতে তো ভয় নেই যগন্দ, হরি বলে নাপিয়ে লায়ে চড়তে পারতাম, তবে তো! কিন্তু এ কি পাপের ভোগ বল তো? হ্যাঁ হে, তিন-চার মাসের কটা জ্বরে এ কি হল বল তো?

—বুড়ো হয়ে গেলাম ভাই।

মুকুন্দ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, চেকা আমাকে বাই ঠুকে বলে গেল যগন্দ, এক হাত হবে না কি! আমাকে ঠাট্টা করে গেল!

রোদ উঠেছে। শীত কেটে এসেছে। হাত-পা কোমরের আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গিয়েছে অনেকটা। হঠাৎ মুকুন্দ গায়ের র‍্যাপারখানা খুলে ফেললে।

যগন্দ বললে, করছ কি? ঠাণ্ডা লাগবে।

—উঁহু। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। গা ঘামছে। দেখ তুমি।

যগন্দর কিন্তু ততখানি উৎসাহ হল না। সে বললে, মাঠে বসে আর কি করবে? চল, বাড়ি যাই।

—তুমি যাও যগন্দ। আমার ভাই, ভুঁইখানা না সারলে চলবে না। কিষেণ ছোঁড়ার জ্বর।

যগন্দ অবাক হয়ে গেল। বললে, সকাল থেকে তো দেখলে, আবারও সাধ হচ্ছে তোমার?

—যাও, যাও হে, তুমি যাও।

মুকুন্দ আবার নেমে পড়ল মাঠে। যগন্দ চলে গেল। রোদের তাপ এসেছে, বেদনা-ভরা সর্বাঙ্গে যেন মিঠা মিঠা সেক লাগছে। আরাম পাচ্ছে মুকুন্দ। আ-হা-হা, হে দেবতা, তোমার মত এমন মহিমা আর কারও নাই। তোমার রোদে পাঁশুটে ধানগাছে সবুজ রঙ ধরে, তোমার যত রোদ তত জল, তোমার তাপে আড়ষ্ট দেহে জোর ফিরে আসছে, গাঁঠে গাঁঠে বুড়ো বয়সের পুরু চর্বি গলছে। মুকুন্দ হাত দুটা উপরে তুললে, বার কয়েক ভাঁজলে, কব্জি থেকে হাতের মুঠাটা ভাঁজলে, বার কয়েক বসল উঠল। কিন্তু হাঁপ ধরছে। ধরুক। তবু তার মনে হল, সে যেন অনেকখানি ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে—হ্যাঁ, অনেকখানি।

হেঁট হয়ে সে আবার ধানের গোড়া মুঠোয় চেপে ধরলে। কাস্তে চলতে আরম্ভ করল।

-ওরে বাস রে! এ যে ভীমের মত ধান কাটতে লাগছে!—বছর বাইশের একটি মেয়ে, এক হাতে জলখাবার, অন্য হাতে ঘটি

মুকুন্দ ধান কেটে চলেছিল প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে। কিন্তু তাতে ধান কাটার চেয়ে তার দেহখানাই যেন বেশি চলছিল। ভাঙা কল চলে, তাতে যেমন কাজের চেয়ে কলটা ঝাঁকুনি খেয়ে নড়ে বেশি, শব্দ হয় জোর, তেমনিধারা ধান কাটার বেগের চেয়ে মুকুন্দের মনের আবেগটা শরীরে প্রকাশ পাচ্ছিল বেশি। সে কিন্তু মুকুন্দ বুঝতে পারছিল না। সে কাজ করেই চলেছিল। হঠাৎ মেয়ের গলায় ওই কথাটা শুনে, সে সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে হা-হা করে হেসে উঠল। সমস্ত মাঠখানায় ঐ নদীর ধার পর্যন্ত তবকে তবকে যেন সে হাসির প্রতিধ্বনি বিছিয়ে গেল। মোটা গলায় সে ছড়া কাটলে—

সিঁদুর-মুখী ধানে ধানে
ভরিবে গোলা
আমার সোনামুখীর হবে
সোনার কাঠির মালা।

—ওই! তোমার হল কি আজ বুড়ো বয়সে?—মেয়েটি বললে। সে সত্যিই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল।

মুকুন্দ চমকে উঠল। মুহূর্তে তার হাসি থেমে গেল। মুখখানা হয়ে গেল পাথরের মত। তার অকস্মাৎ ভুল হয়ে গিয়েছিল। বহুকাল আগে তখন তার বয়স ত্রিশ। ঊনত্রিশ বছর বয়সে তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী মারা যায়। একুশ বছরে গিয়েছিল প্রথম স্ত্রী, পঁচিশ বছরে দ্বিতীয় জনা—একটি দু-বছরের মেয়ে রেখে গিয়েছিল; ঊনত্রিশ বছর বয়সে তৃতীয় জনা। লোকে বলত, মুকুন্দ পাল অজগর-পুরুষ; বিয়ে হলেই নির্ঘাত খাবে। মুকুন্দও এটা বিশ্বাস করেছিল। গণৎকারেও তাই বলেছিল, রাক্ষসগণ, পত্নীস্থানে শনি মঙ্গল রাহু; শিবের সাধ্যি নাই তোমার পরিবার রক্ষা করতে।—মুকুন্দ নিজের হাতের তালুর কড়ে-আঙুলটার নীচে স্পষ্ট দেখেছে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ। তাই সে আর বিয়ে না করে ঘরে এনেছিল পাশের গ্রাম চণ্ডীপুরের বাবুদের বাড়ির একটি বিধবা তরুণী ঝিকে। ব্রাহ্মণ বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত, জলচল জাতের মেয়ে, তাতে আর ভুল নাই; তবুও অধিকন্তু ন দোষায়—মুকুন্দ তাকে বৈরাগীদের আখড়ায় কণ্ঠি পরিয়ে বৈষ্ণবী করে পেড়ে-শাড়ি, হাতে চুড়ি পরিয়ে ধরে এনেছিল। ত্রিশ বছর আগে, এমনই করে সে আসত তার জলখাবার নিয়ে। তেরোশ বিশ সালও ছিল একটা শূন্যের বছর, সেবারও হয়েছিল এমনই বান, এমনই ধান।

হয় নি শুধু চালের মণ তিরিশ টাকা, আর হয় নি এমন কাল জ্বর। সেবার সে ধান কাটছিল মাঠে। সে এসে বলেছিল ঠিক ওই কথাটি, ঠিক ওই কটি কথা। মুকুন্দ এমনই করে হেসেছিল আর ওই ছড়াটি কেটেছিল। আজও সেই রকম মাঠ-ভরা ধান। আজও সে যেন ঠিক তেমনই হুসহুস করে ধান কেটে চলেছে, এমন সময় তেমনই ভাবে এসে দাঁড়িয়ে সেই কথা কয়টি বলায় মুকুন্দের ভুল হয়ে গেছে। বৈষ্ণবীও অনেককাল আগে মরে গেছে। মুকুন্দ বলে, গত হয়েছে।

এ মেয়েটি মুকুন্দের নাতনী—মেয়ের মেয়ে। সম্বন্ধ ঠাট্টার। কিন্তু মুকুন্দ কখনও ঠাট্টা করে না। একটি ছেলে কোলে নিয়ে মেয়েটি পনরো বছরে বিধবা হয়েছে। মেয়ে বিধবা হয়েছিল ওই মেয়েকে কোলে নিয়ে। মুকুন্দ জীবনে দুটি শিশুকে কোলে করে মানুষ করেছে, প্রথম তার নিজের মেয়ে, তারপর এই নাতনীকে। নাতনীর ছেলেকে সে কোলে করে না। না, কাজ নাই।

২

মুকুন্দ বাড়ি এসে বসে হাঁপাচ্ছিল। কিন্তু তাতে তার মেজাজ খারাপ হয় নি। শরীর এলে মেরে গিয়েছে, কিন্তু তাতে কোনো অসুখ বোধ করছে না। কাজ সে অনেকটা করেছে, অনেকটা। সে খুশী হয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে সে, সে বুড়ো হয় নাই। আসল দরকার ওষুধ আর খাওয়া-দাওয়ার, আর দরকার কাজের অভ্যাসের।

মেয়ে লক্ষ্মী এসে বাপকে দেখে কিন্তু শিউরে উঠল, বললে, বাবা, তোমার কি শরীরের ওপর এতটুকুন মায়া-মমতা নাই? মুখের চেহারা কি হয়েছে দেখ দেখি! সরস্বতী বলছিল—

—কি বলছিল সরস্বতী?

লক্ষ্মীর মেয়ে সরস্বতী। পাল মশায়ের সেই নাতনীটি। লক্ষ্মী বললে, বলছিল—কত্তাদাদা ধান কাটছে, বাবা রে বাবা, একটা জোয়ানের সাধ্যি নাই এমন হাঁই হাঁই করে কাটতে।

পাল হা-হা করে হেসে উঠল। মাঠে আজ যে হাসি হেসেছিল, সে হাসি সে জোয়ান বয়সে হাসত; যে হাসি সে সরস্বতী বিধবা হবার পর আজকের আগে আর হাসে নাই, সেই হাসি। হাসির আওয়াজের ধাক্কায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা কাঁসার বড় খোরাটায় মৃদু প্রতিধ্বনির রেশ বেজে উঠল।

লক্ষ্মী চমকে উঠল। বাবার হল কি?

—তোর বেটী বলে কি লক্ষ্মী, আমাকে বলে বুড়ো! তাই—। সে আবার

হা-হা করে হেসে উঠে বললে, তাই তোর বেটীকে শুনিয়ে দিলাম সেই ছড়াটা, যে ছড়া বলতাম তোর মাকে।

লক্ষ্মী হাসলে।

পাল বললে, জানিস মা, এবার ধান যা হয়েছে! আ-হা-হা। ধান নয় মা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এবার খামারে বোধ হয় ধান বাঁধতে জায়গাই হবে না। তা ছাড়া গরু দুটোর যা হাল হয়ে আছে, তাতে—

পাল অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল।

—কেলের জন্যে ভাবি না। ও আমার ঠিক আছে! ও আমার ক্ষ্যাণজন্মা। ভাবনা বাছুরটার জন্যে। হাজার হলেও কাঁচা হাড়।

কেলে, পাল মশায়ের প্রিয়তম হেলে বলদ। একেবারে শৈশব থেকে তাকে পালন করেছে। এখন বুড়ো হয়েছে, কিন্তু ভরা বয়সে কেলে ছিল এখানকার বিখ্যাত হেলে। পাল একা নয়, এখানকার সকল চাষীতেই একবাক্যে বলে, কেলে ক্ষণজন্মা গরু। একা কেলের সঙ্গে কাঁধ দিয়ে একে একে চারটা বলদ অকালে ঘায়েল হয়ে গিয়েছে। গতবার আবার একটা বাছুর অর্থাৎ সদ্য জোয়ান বলদ কেনা হয়েছে। কিন্তু আজও সে কেলের ডাইনে বইতে পারে না। এবার দুটা বলদেরই খুঁড়িয়া হয়েছিল গো-মড়কের সময়। দুটাই ভাগ্যক্রমে বেঁচেছে, কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছে। পাল কেলের জন্য ভাবে না। ভাবনা তার ওই নতুন সদ্য জোয়ান হেলেটার জন্য।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে পাল বললে, চেকা আমাকে আজ বাই ঠুকে ঠাট্টা করলে মা।

কেউ উত্তর দিলে না। পাল পিছনে তাকিয়ে দেখলে, লক্ষ্মী নাই, সে চলে গিয়েছে।

পাল উঠে গিয়ে দাঁড়াল কেলের কাছে। কেলে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে পালের দিকে চাইলে, তার গা শুঁকলে, তারপর ঘাড়টা লম্বা টান করে মুখটা এগিয়ে দিলে মুকুন্দের বুকের কাছে। এর অর্থ হল, গলকম্বলে সুড়সুড়ি দিয়ে দাও। পাল হেসে তার গলায় হাত বুলিয়ে পিঠে দুটা চাপড় মেরে বললে, দেখব বেটা এবার, কেমন ক্ষ্যামতা তোমার! হ্যাঁ!

তারপর আবার বললে, দাঁড়া না, তাজা করে দিচ্ছি! রশির মেয়ার ব্যবস্থা করছি আজ থেকে।—রশি হল ধেনো মদের সব চেয়ে কড়া তেজী অংশ। মেয়া হল তারই পচানো জিনিসের ছিবড়ে। ভারি উপকারী আর পোষ্টাই গরুর পক্ষে। চেকা মোড়ল নিজে খায় গৃহজাত অর্থাৎ ঘরে চোলাই-করা মদ।

গরুদের খাওয়ায় রশি-মেয়া। একেবারে তাগড়া হয়ে আছে চেকার গরুগুলা; চেকা খায় মদের সঙ্গে মাংস। হাঁস আছে একপাল, হাঁসের বাচ্চা খায়।

—কি করছ কত্তা?—সরস্বতী দাঁড়াল এসে দাওয়ার উপর।—খেতে দিয়েছি তোমার কেলেকে, উপোষ করিয়ে রাখি নাই।

—কি?

—এস, ত্যাল মাখো। চান কর। খেতে-দেতে হবে না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

পাল এসে বসল। তেলের বাটিটা এগিয়ে দিলে নাতনী। পাল বললে, এক কাজ কর দিকিনি। ত্যালটা গরম করে নিয়ে আয় দিকিন।

গরম তেল সর্বাঙ্গে মালিশ করতে বসে সে আবার ডাকলে, সরস্বতী!

—কি?

—এই পিঠে খানিক ত্যাল মালিশ করে দে তো বুন। খুব করে, আচ্ছা করে। উঁহু, উ তোর হচ্ছে না। আরও জোরে।

—আর আমার জোর নাই বাপু।

পাল হা-হা করে হেসে উঠল। বললে, আচ্ছা, তবে গোটাকতক কিল মার দিকিনি। যত জোর আছে তোর।—আচ্ছা! আচ্ছা! আচ্ছা!

—আমার হাতে লাগছে বাপু, আর আমি পারব না।—সরস্বতী সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

পাল আবার হা-হা করে হেসে উঠল। বললে, আমার কিন্তু তোর নরম হাতের কিল ভারি মিষ্টি লাগছে।

সরস্বতী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। কর্তার মুখে এই ধারার কথাবার্তা কখনও শোনে নাই। হল কি কর্তার!

মাকে বললে সরস্বতী, কত্তার গতিক ভালো নয় মা।

লক্ষ্মী চমকে উঠল। কথাটা তারও মনে হয়েছে, বাপের সেই হাসি শুনে। এ হাসি সে শুনেছে ছেলেবেলায়। বাপকে তখন লোকে বলত—ভীম। সন্ধ্যার পর বাইরের দাওয়ায় পাঁচজনের সঙ্গে বসে তার বাবা এমনই ভাবে হাসত; সে তখন ছোট মেয়ে, বাড়ির ভিতরের দাওয়ায় শুয়ে ঘুমাত, বাবার হাসিতে তার ঘুম ভেঙে যেত।

বৈষ্ণবী মা বকত বাবাকে, কি এমন করে হাস, মেয়েটার ঘুম ভেঙে যায়, চমকিয়ে ওঠে!

বাবা আবার হাসত হা-হা করে। কাঁসার বাসনে খনখনে আওয়াজের রেশ বেজে উঠত, দরজায় কি জানালায় হাত দিয়ে থাকলে মনে হত, কি যেন একটা শিউরে উঠছে তার ভিতরে। সে হাসির প্রথম পর্দা ছিঁড়েছিল বৈষ্ণবী মা যাবার পর। তারপর খাদে নেমেছিল লক্ষ্মী নিজে বিধবা হবার পর, সরস্বতী বিধবা হবার পর সে হাসি আর হাসে নাই তার বাবা। আজ সেই হাসি হাসতে শুনে কথাটা তারও মনে হয়েছে।

সরস্বতী বললে, কত্তা হয়ত আর বাঁচবে না, নয়ত কত্তার মাথা খারাপ হয়েছে।

লক্ষ্মী শিউরে উঠে বললে, ও-কথা বলিস না সরস্বতী। তাহলে আমাদের দশা কি হবে, ভাব দেখি।

সরস্বতী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই চলে গেল সেখান থেকে।

লক্ষ্মী চুপ করে বসে ভাবছিল। যতই অশুভ হোক, সরস্বতী কথাটা মিথ্যা বলে নাই। আজ সন্ধ্যেবেলায় বলদ দুটাকে রশি আর মেয়া খাওয়াবার ঝোঁক উঠেছে। নিজে বৈষ্ণব মানুষ, মদকে যার এত ঘেন্না সেই লোক নিজে হাতে ওই সব জিনিস ঘেঁটেছে। বলদকে মেয়া-রশি অনেকবারই খাওয়ানো হয়েছে, কিন্তু সেসব করত রাখালে। বাবা নাকে কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত দূরে। সেই লোক নিজে হাতে এই বুড়ো বয়সে—! চোখে জল এল লক্ষ্মীর। রাখাল নাই, কিন্তু কাহারপাড়ার কাউকে ডাকলেই হত! এ কি মতিভ্রম!

একটু বসে থেকে সে উঠল। উৎকণ্ঠা এবং কৌতূহলও হল বাবা কি করেছে দেখবার জন্যে; সে চুপিচুপি বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে গেল কোঠার উপরে ধুপধাপ শব্দ শুনে। যেন দুরমুশ দিয়ে কাঠের তক্তার উপর মাটি বিছানো মেঝেটা পিঠছে। সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে আড়াল থেকে উঁকি মেরে সে অবাক হয়ে গেল। তার বাবা কুস্তিগীরের মত কাপড় সেঁটে রীতিমত বৈঠক দিচ্ছে, হাঁপাচ্ছে। ধীরে ধীরে লক্ষ্মী নেমে এল। হায় রে! এই বয়সে বাবা শেষে পাগল হয়ে গেল।

৩

শুধু মেয়ে আর নাতনীই নয়, গোটা গাঁয়ের লোকেরই কেমন যেন একটু খটকা লেগেছে। পালের হল কি? তার ওই হা-হা করে হাসি শুনে তারা পরস্পরের মুখের দিকে চায়। ভোর থেকে আরম্ভ করে জলখাবার বেলা পর্যন্ত পাল মাঠে ধান কাটে। তাতে অবশ্য কেউ কিছু মনে করে না। পালের কৃষাণটার জ্বরের সঙ্গে বুকের দোষ হয়েছে, আধা-ডাক্তার আধা-কবরেজ ভাগবতচরণ বলেছে,

মারে হরি রাখে কে?—লোকটা মরবে। আজও পর্যন্ত বাগদী-কাহার যারা বর্ষার সময় চলে গিয়েছে, তারা কেউ ফিরে নাই। দুমকার ওদিক থেকে একটি দল সাঁওতালও আজ পর্যন্ত এ অঞ্চলে আসে নাই। বর্ধমানে দামোদরের বাঁধ তৈরি হচ্ছে, রেলের সাঁকো তৈরি হচ্ছে, সারি সারি ক্রোশ বরাবর লম্বা এক-একটা সাঁকো; উড়ো জাহাজের আস্তানা তৈরি হচ্ছে এখানে-ওখানে-সেখানে—কোনোটা দু ক্রোশ, কোনোটা পাঁচ ক্রোশ লম্বা; লাখে লাখে মজুর খাটছে, টাকাটার কমে মজুরি নাই, পাকা-মেঝের ঘরে দিচ্ছে নাকি থাকতে, ডাক্তার-ওষুধের পয়সা লাগে না, এই ঢাউস বড় বড় মোটরে চড়িয়ে নিয়ে যায়, আবার মোটরে দিয়ে যায়। সাহেবেরা সেখানে সন্ধ্যার পর নাচ গান হল্লা করে। মোটা মোটা বকশিশ দেয়। ভালো ভালো বিলাতী মদের বোতল নাকি গড়াগড়ি যাচ্ছে; টিনে-বন্ধ খাবার। এসবেরও প্রসাদ কি আর কিছু কিছু না পায় তারা? সব—সব মজুর গিয়ে সেখানে জুটেছে। কিসের জন্য এখানে আসবে!

নিজের নিজের ধান নিজে না কেটে উপায় কি? কাটেও তো তারা চিরকাল। এবার না হয় রোগ ধরেছে—কাল রোগ। তবু তো ধান তুলতে হবে। মাঠ-ভরা ধান, গোটা বছর রত্নাকর মুনির মত উইকে একপিঠ ভুঁইকে একপিঠ দিয়ে তপস্যার ফসল—লক্ষ্মীর আটনের দেবতা, গোটা বছরের মুখের ভাত, চালের খড়, গরুর আহার—এ তো তুলতেই হবে। ঘরের খামার খাঁ-খাঁ করছে, লক্ষ্মীর আটন খালি পড়ে আছে; গোলার মধ্যে চামচিকেতে বাসা বেঁধেছে, মাকড়সায় জাল বুনেছে; গোলার মধ্যে নিকিয়ে পরিষ্কার করে সব পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। তুলবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেও সবাই। কিন্তু পালের ধান কাটা দেখে লোকে অবাক হয়েছে। পাল ধান কাটে আর আপন মনেই বলে, হেঁই-হেঁই-হেঁই। পা ফেলে যেন রোখা মাতালের মত। পাল কিছুদিন আগেও উঠত ধীরে ধীরে, বলত, আর কি সেদিন আছে? তাড়াহুড়ো করে উঠতে গেলে মাথা ঘোরে।—বলে হাসত। সেই পালের হঠাৎ যেন নবযৌবন হয়েছে। এ তো ভালো নয়। এমন করে খাটতে গেলে কোনদিন বুক ধড়ফড় করে মাঠেই মুখ গুঁজে পড়বে, আর উঠবে না। না হয় তো খাটুনির ধমকে পালটে পড়বে জরে। এর উপর জরহলে মেরে দিয়ে যাবে। নাও যদি মরে, তবুও উঠে আর হেঁটে বেড়াতে দেবে না সহজে।

তার উপর এসব কথা বললে, ওই হাসি।

যোগেন্দ্র বললে, কি, হল কি তোমার, বল দেখি?

পাল সেই হাসি হাসতে আরম্ভ করলে। তারপর হাসি থামিয়ে বললে, সন্ধ্যাবেলায় বলব।

—ওরে বাপ রে! এত হাসি কিসের গো কত্তা?

গলার আওয়াজেই চিনতে পেরেছিল পাল চেকা মোড়লকে। পিছন ফিরে দেখলে, চেকা পালই বটে। পাল ভুরু নাচিয়ে মাথা দুলিয়ে বললে, পারিস? বলি, তুই পারিস?

—কি?

—এমনই হাসতে? মরদ তো বটিস। জোয়ান বয়সও বটে, পয়সাও ঢের আছে। পারিস?—কয়েক মুহূর্ত সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেকার দিকে চেয়ে থেকে আবার বললে, ফুসফুসি ফেটে যাবে কোলা-ব্যাঙের পেটের মত।—বলেই সে আবার হাসতে আরম্ভ করলে সেই হাসি।

যোগেন্দ্র অবাক হয়ে গেল। তার আর কোনো রকম সংশয় রইল না, পালের মাথার সত্যিই গোলমাল হয়েছে। চেকাও প্রথমটা চুপ করে ছিল। একটু পর সে বললে, পালকে কোনো কথা না বলে যোগেন্দ্রকে বললে—ঘোষ-কত্তা, পাল-কত্তার নাকটা দেখেছ?

যোগেন্দ্র একটু বিরক্ত হয়েই তার মুখের দিকে চাইলে। পালের ভুরুও কুঁচকে উঠল। চেকা যে এবার বাঁকা বঁড়শির মত কথা বলবে, তাতে তাদের সন্দেহ ছিল না। চেকাকে তারা চেনে। টাকার গরমে মাটিতে ওর পা পড়তে চায় না। ওর কথায় জলের মাছ গায়ের জ্বালায় ডাঙায় মাথা ঠুকে আছাড় খেয়ে পড়ে।

চেকা বললে, দেখ, ভালো করে দেখ। হুঁ, হুঁ, ঠিক।

—কি?

—বেঁকেছে। কত্তার নাকটা বেঁকে গিয়েছে।

নাক বেঁকে গেলে মানুষের ছ মাসের মধ্যে অবধারিত মৃত্যু। নীল তারা দেখতে পায় না চোখ টিপে, আকাশের অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখতে পায় না। এমনই নাকি অনেক কিছু হয়। চেকার কথা শুনে যোগেন্দ্র শিউরে উঠল। সে তার ঘোলাটে চোখের নিস্তেজ দৃষ্টি যথাসাধ্য তীক্ষ্ণ করে চাইলে পালের মুখের দিকে। পালও চমকে উঠল, তার ডান হাতে ছিল কাস্তে, বাঁ হাতটা আপনি যেন উঠে গিয়ে পড়ল নাকের উপর।

চেকা হি-হি করে হেসে উঠল। শুধু হাসি নয়, তার সঙ্গে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি। হাসির ধমকে তার মাথাটা মাটিতে ঠেকে গেল প্রথমটা, হাসির ধমকেই আবার যেন সোজা হয়ে উঠে পিছনের দিকে উলটে পড়ে যাবার উপক্রম করলে।

চেকা বললে, ছ মাস—আর ছ মাস।—বলেই সে চলতে আরম্ভ করলে।

কিছু দূরে গিয়েই সে আবার দাঁড়াল, বললে, মরণের ছ মাস আগে, বুঝলে কত্তা, মানুষের এমনই লব-যৌবন হয়। বুঝলে ?

পাল আবার উৎকটভাবে হেসে উঠল, নিজের বাই দুটোতে চাপড় মেরে বললে, হবে নাকি ?

চেকা কিন্তু আর দাঁড়াল না। চলে গেল। পাল তার দিকেই চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, যগন্দ !

কেউ সাড়া দিলে না। যোগেন্দ্র চলে গিয়েছে।

পাল কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আপনার নাকে হাত দিলে।

—কত্তা, আজ যে ডাঁড়িয়ে রইচ ?

সরস্বতী। সরস্বতী এসেছে জল খাবার নিয়ে।

—হুঁ।

—হুঁ কি ? শরীর ভালো আছে তো ?

—দেখ তো সরস্বতী, নাকটায় কি হল ?

—কি হল ? কই, কিছুই তো হয় নাই। যেমন ছিল তেমনই আছে ?

সরস্বতী খুব কাছে এসে খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখলে, হ্যাঁ, কই কিছুই তো—। উঃ, কত্তা, কি খেয়েছ তুমি কত্তা ?—সরস্বতী শিউরে উঠে পিছিয়ে গেল।

লক্ষ্মী বললে মেয়েকে, চুপ কর, এ কথা কাউকে যেন বলিস না।

পাল কিন্তু নিজেই জানালে যোগেন্দ্রকে। সন্ধ্যাবেলায় তাকে ডাকলে, শোন, এস।

—কোথা ?

—এস না আমার সঙ্গে।

গাঁয়ের বাইরে বট-বাগানে একটা গাছতলায় বসল পাল, যোগেন্দ্রকে বললে, বস।

যোগেন্দ্র অবাক হয়ে গিয়েছিলই, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও করছিল। মাথা খারাপ লোক, কখন কি করে বসবে হয়ত !

পাল তার গায়ের আলোয়ানের ভিতর থেকে বের করলে একটি বোতল, তার মুখেই পরানো ছিল কাচের ছোট ওষুধ-খাওয়ার গেলাস একটি।

—কি ?—যোগেন্দ্রর চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

পাল কিন্তু অত্যন্ত সহজভাবে বললে, গৃহজাত। খাও।

—সে কি ?

গৃহজাত মানে—লুকিয়ে ঘরে চোলাই করা মদ। সাওড়াপুরের ভল্লা-বাগদীরা তৈরি করে নদীর ধারে। এখানকার অনেকে গোপনে কিনে খায়! এ গাঁয়েরও দু-চারজন খায়; চেকা মোড়লই খায়। কিন্তু তা বলে যোগেন্দ্র খাবে কি বলে? পালই বা খায় কি বলে? বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা তাদের, বয়স হয়েছে, যাকে বলে এক পা ডোঙায় এক পা ডাঙায়। আজ পালের এ কি আচরণ?

ততক্ষণে ছোট গেলাসে খানিকটা ঢেলে ঢুক করে ওযুধ খাওয়ার মত খেয়ে ফেলে পাল বললে, জ্বর পালাতে পথ পাবে না, তিন দিনে গায়ে তাগদ পাবে; আমার মতন খাটতে পারবে।

গেলাসটায় যোগেন্দ্রের জন্যই খানিকটা ঢালতে ঢালতে সে বললে, ওই শালা চেকা, চেকা শালা একদিন আমাকে বলেছিল। বুঝলে, আমার খানিক আশ্চর্যও লাগত, সবাই জ্বরে ওলটপালট খেলে, ওই শালার একবার বই জ্বর হল না কেনে? তা শালাই আমাকে বললে, সেই হে, যেদিন বাই ঠুকে আমাকে ঠাট্টা করেছিল, সেই দিন। বলেছিল—মদ-মাস খাই, জ্বর আমার কাছে ঘেঁষতে পারে না। তা দেখলাম, হ্যাঁ, দব্যিটা উপকারী বটে। তাগদ আমি পেয়েছি। নাও, খাও।

যোগেন্দ্র সভয়ে সরে বসল। বললে, না।

—না লয়, খাও।

—ছি ছি, ছি পাল, ছি! এই বুড়ো বয়সে—

—ধেৎ তেরি!—পাল ধমক দিয়ে উঠল—কিসের বুড়ো বয়স হে? বুড়ো বয়স কিসের? বুড়ো বয়স! কই ডেকে আন তোমার কে ছোকরা আছে, ডেকে আন আমার কাছে। বুড়ো বয়স!

যোগেন্দ্রের জন্য ঢালা গেলাসটি নিজেই সে খেয়ে নিলে।

—আশী বছর। আশী বছরে তো সোজা হয়ে বেড়াব হে যগন্দ।

যোগেন্দ্র বললে, কিন্তু ধর্ম আছে তো!

—হ্যাঁ, আছে বইকি। আলবত আছে। এ তো ওষুধ। ধম্মতে ওষুধ খেতে বারণ করে নাকি? ধম্মতে বলে নাকি, ঔষুধ না খেয়ে রোগে ভুগে খকখক করে কেশে কুঁজো হয়ে মর তুমি? যদি বলে তো বলে। ধম্ম আমার ধান তুলে দেবে? ধম্ম!—হঠাৎ সে নিজের হাতখানা শক্ত করে যোগেন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিলে। দেখ, শরীরটা কদিনেই কেমন বেঁধেছে দেখ। বুড়ো! বুড়ো বয়স!

যোগেন্দ্র হাতখানা নেড়ে দেখতে বাধ্য হল, কারণ পাল একরকম হাতখানা তার ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়েছিল। অবাক হয়ে গেল যোগেন্দ্র। সত্যই আর

সে রকম তলতলে ঝলঝলে নয় চামড়া। অনেকটা শক্ত হয়েছে। সে স্বীকার করতে বাধ্য হল।

—হুঁ। তা হয়েছে।

পাল আবার খানিকটা গেলাসে ঢেলে বললে, তবে খা, খা রে খা, যৈবন ফিরে আসবে।—বলে হা-হা করে হেসে উঠল।

যোগেন্দ্র এবার হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু হাসিতে চমকে উঠে বললে, না মাইরি, কি যে হাসছ! এখুনি কে এসে পড়বে! তা হলে আমি খাব না ভাই।—পালের হাসি যেন শাঁখের আওয়াজ। কাছাকাছি শাঁখ বাজলে তার শব্দ যেমন কানের ভিতর থেকে মাথার ভিতরে, বুকের ভিতরে, কাঁধ থেকে হাতের শিরায় ধ্বনির রেশ তুলে টান হয়ে উঠে, পালের হাসির গমকগুলো তেমনই ভাবে যোগেন্দ্রের দেহের মধ্যে সুর তুললে। ভয়ও জাগল, আবার চঞ্চলও হল মন; কত কথা মনে পড়ে গেল। যোগেন্দ্র মুখের কাছে নিয়ে গিয়েও ভাবছিল। এঁ, কি গন্ধ!

—নাক টিপে ধর বাঁ হাতে। হ্যাঁ হ্যাঁ। বাস, দে ঢেলে মুখে। বাস।—বলেই সে আবার হেসে উঠল হা-হা করে।

—এই, এই, না এমন করে হাসলে হবে না—না, না।

তবু থামল না পালের হাসি।

কিছুক্ষণ পর যোগেন্দ্রও হাসছিল পালের সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে। কথাটা অবশ্য হাসির কথা। পাল বলছে, এবার পৌষ-লক্ষ্মীর দিনে ভাসান-গান করতে হবে, আগে যেমন হত। আমাদের যে দল ছিল, সেই দলের ভাসান-গান। সেকালে পাল চন্দ্রচূড় সাজত, আবার পায়ে কালিমাখা ন্যাকড়া জড়িয়ে গোদা মালোও সাজত। পাল এখন সেই দুটোই সাজতে চায়। আর যোগেন্দ্রকে বলছে, তুই বেউলো সাজতিস, তুই বেউলোই সাজবি।

এই বুড়ো বয়স, ভাঙা মুখ, ফোকলা দাঁত, এই চেহারায় বেউলো? যোগেন্দ্র হাসতে আরম্ভ করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে পাল।

হাসিটা থেমে এল ধীরে ধীরে। দুজনেই চুপ করে বসে রইল, ক্লান্ত হয়েছে দুজনেই; যোগেন্দ্রের বুকে তো ফিক-ব্যাথার মত ধরে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই নীরবতার অবসরে তাদের মনের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে পুরানো দিনের কথাগুলি। নিজেদের সেই যৌবন-কালের চেহারা মনে পড়ছে। সেকালের সঙ্গীদের যারা আজ নাই, তাদের মনে পড়েছে। শূরবীরের মত চেহারা সব, কত হৈ-হৈ সে দিন! ভাবনা-চিন্তা ছিল না।

হবে না কেন ? খামারে সব গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা দুধালো গাই, কেঁড়ে-ভর্তি দুধ, জালায় জালায় গুড়, পুকুর-ভরা মাছ, পৌষ-লক্ষ্মীতে সে কত সমারোহ,—গামলা-ভর্তি করে সরু চাকলি, আসকে পিঠে, ক্ষীরের পিঠে, গুড়তিলের পিঠে ! কুড়ি গণ্ডায় এক পণ, সেই পণ দরুনে পিঠে খেত এক-একজন। মাঘ মাসে মূলো খেতে নাই, লক্ষ্মীর রাত্রে মূলোমচ্ছি, মূলোতে মাছে অম্বল হত। তারপর পড়ত ভাসানের আসর।

পাল চন্দ্রচূড় সাজত, রঙিন পাটের কাপড় পরে পাটের চাদরখানা পৈতের মত বেঁধে আসরে ঢুকত। আসরে জ্বলত সরকারী চল্লিশ-বাতির আলো। শিব শম্ভো ! শিব শম্ভো ! শঙ্কর ! শঙ্কর ! আসরখানা গমগম করে উঠত। উঠবার কথা যে। কালো কষ্টিপাথরে খোদাই-করা ভৈরবমূর্তির মত দশাশয়ী চেহারা, সেই বাঘা গলায় আওয়াজ, লোকের বুকের ভিতর যেন গুরগুর করে উঠত। মেয়েরা বসত এক দিকে, পুরুষেরা বসত তিন দিকে, সব হাঁ করে চেয়ে থাকত চন্দ্রচূড়ের মুখের দিকে। মেয়েদের মাথার ঘোমটা খসে যেত। পুরুষদের হুঁকোর টান বন্ধ হত। ধীরে ধীরে তাজা কলকে নিবে আসত।

যোগেন্দ্রের ছিল ছিপছিপে মিষ্টি চেহারা, চোখ দুটি ছিল ডাগর ; সে সাজত বেহুলা। গোঁফ-দাড়ি কোনোকালেই যোগেন্দ্রের বেশি নয়, তাও কামিয়ে পরচুলো পরে স্ত্রীর বিয়ের বেগুনি রঙের পাটের শাড়িখানা পরে আসরে এসে নামত, সঙ্গে সখী থাকত। মেয়েরা পরস্পরের গা টিপে মুচকে হাসত। পুরুষের চোখে পলক পড়ত না। লখীন্দরের দেহ নিয়ে কলার মাঞ্জাসে সে নদীর জলে ভাসত। বেহুলা বলত শাশুড়ীকে, বাসরে আমার রান্না করা ভাত আছে, সে ভাত আমার মাটিতে পুঁতে রেখো। কাককে ডেকে বলত, কাক, তুমি আমার বাপের বাড়ি গিয়ে মাকে বল, বেউলা জলে ভেসে যাচ্ছে। গান ধরত, জলে ভেসে যায় রে সোনার কমল !—গোটা আসর হাপুস-নয়নে কাঁদত।

এমন সময় ঠোঁটের কোণে চুন মেখে, গালে কপালে চুনের দাগ এঁকে, পায়ে ন্যাকড়া জড়িয়ে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে, ভুঁড়ি দুলিয়ে খুঁড়িয়ে নেচে আসরে ঢুকত গোদা মালো। পোশাক পালটে পালই সাজত গোদা মালো ; দেখে কার সাধ্য যে বলে, এই লোকই সেই পাথরের মত মানুষ চাঁদ সদাগর। পালের ভুঁড়ি নাচানোর কায়দাটি ছিল অদ্ভুত। সত্যই যেন নাচত ভুঁড়িটি ; দেখে আসরসুদ্ধ লোক হেসে গড়িয়ে পড়ত। মেয়েরা বাঁকা দৃষ্টি হেনে বলত, মরণ ! পৌষ মাস চলে যেত, মাঘ মাসের অন্তত পনরোটা দিন ছেলেমেয়েরা তাকে দেখলেই বলত, ওরে, গোদা মালো আসছে। তরুণীর দল পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ফিকফিক করে হাসত।

সে দিন আর এ দিন! আজকের দিনকালগুলো যেন ভাসান-গান ভাঙার পর শেষ রাত্রের আসর। চল্লিশ-বাতির চিমনিটা কালো হয়ে যেত কালি পড়ে। পৌষের শেষরাত্রিতে হিম ঝরত চারিদিকে, চট-তালাইগুলো ধুলোয় ধূলাকার হয়ে বিশৃঙ্খলভাবে পড়ে থাকত; আসর আগলে তারা জনকয়েক শুধু প্রায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বেঁকে চুরে শুয়ে থাকত; দু-চারটে কুকুরও এসে গা ঘেঁষে শুত, খাঁ খাঁ করত চারিদিক। ঠিক তাই। ঠিক তাই। তারাই কজন ভাঙা আসর আগলে বেঁকে চুরে কোনোমতে পড়ে আছে। চারিদিক খাঁ-খাঁ করছে।

যোগেন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, চল, বাড়ি চল।

—চল। পালও উঠল।

বাগান থেকে বেরিয়ে এসে কিন্তু দুজনেই দাঁড়িয়ে গেল থমকে। চাঁদের আলোয় আর কুয়াশায় যেন একখানা বকের পাখার মত ধবধবে সাদা মলমলের চাদর দিয়ে ঘুমন্ত মা-বসুমতীকে কে ঢেকে দিয়েছে। মদ অতি সামান্য খেয়েছে তারা। তবু অনভ্যস্ত মস্তিষ্কে তাই চনচন করছে। পাল বললে, চল, মাঠের ধার দিয়ে ঘুরে আসি একটু।

দুজনে এসে দাঁড়াল মাঠের ধারে। দুধ-বরণ জ্যোৎস্নার মধ্যে সোনার বরণ মেয়ে গা এলিয়ে ঘুমুচ্ছে। দুচোখ ভরে দেখেও আশ মেটে না।

পাল বললে, যগন্দ!

—আ-হা-হা পাল, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী শুয়ে আছেন, তুমি দেখ।

—তাই বলছি যগন্দ, এইবার দিন ফিরল, তুমিও দেখ।

যোগেন্দ্র কথাটার ঠিক কি মানে তা বুঝতে পারলে না। পালের মুখের দিকে সে তাকিয়ে রইল।

পাল বললে, এটা পঞ্চাশ সাল। গেল পঞ্চাশ বছর দুখের কাল গিয়েছে যগন্দ, আসছে পঞ্চাশ বছর, দেখ তুমি, সুখের কাল হবে, দেখ, আমি বললাম। এই তিরিশ টাকা মণ চাল, এই মড়ক—এই গেল দুর্ভোগের শেষ। এইবার, দেখ তুমি মাঠের দিকে তাকিয়ে, মা-লক্ষ্মী আবার এলেন।

যোগেন্দ্র অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

পাল বললে, দেখ তুমি, আবার আগেকার মত কাল আসবে। বছর বছর জল হবে। মাঠ ভরে ধান হবে। আবার সব তেমনই হবে। বস।

দুজনে বসল সেই শিশিরে-ভেজা মাঠের আলের ঘাসের উপর।

পাল বললে, সাধে বলছিলাম যগন্দ, লক্ষ্মীর রেতে এবারে ভাসানের গান করব। এবার মা-লক্ষ্মী পায়ে হেঁটে এসেছেন। অনেকদিন পরে সত্যি পৌষ-লক্ষ্মী হবে।

—তা বটে।

—আর একটুকুন লেবে নাকি ?—পাল আবার বের করলে বোতলটা, আর গেলাসটা মুখে লাগানোই আছে।

—দাও। কিন্তু—

—কিন্তু কি ?

মা-লক্ষ্মী আবার গন্ধ সইতে পারেন না। হাজার হলেও নারায়ণের লক্ষ্মী, বষ্টুমের ঘরের বউ।

—হুঁ।—একটু ভেবে পাল বললে, তা বটে। তা—

যোগেন্দ্র বললে, বুঝে দেখ তুমি।

—ধান কাটা হয়ে যাক, তারপর আর ছোঁব না। বুঝলে ? দেখছ তো ধান। এর জোর তো বুঝতে পারছ। নইলে তুলব কি করে ? নাও।—নিজে খেয়ে পাল গেলাস বাড়িয়ে দিলে যোগেন্দ্রের দিকে।

—তা বটে।—যোগেন্দ্র হাত বাড়িয়ে নিলে গেলাসটি। জোর অনুভব করছে সে। পাল মিছে বলে নাই, ভোরে একটু খেয়ে মাঠে বের হলে সেও পালের মত ধান কাটতে পারবে। গোটা মাঠখানা ধানে থইথই করছে। এ ধান নইলে তুলবে কি করে ?

—আর একটি মনের কথা বলি তোমাকে।

এ গেলাসটা খেয়ে যোগেন্দ্রের গায়ের জোর আর একটু বেড়েছে মনে হল। সে গলাটা সশব্দে বেশ সবল জোয়ানের মত ঝেড়ে নিয়ে মদের স্বাদভরা থুতু ফেলে বললে, কি ?

—ওই চেকা—

যোগেন্দ্র তার মুখের দিকে তাকালে।

—ওই চেকার ধান কেটে ঘরে তোলার আগে আমাকে কেটে ঘরে তুলতে হবে। আমাকে বাই ঠুকে যায় হে! ওঃ।

—তা বটে।

—দাঁড়াও না। সকলেরই সুসময় আসছে এই পঞ্চাশ সাল থেকে। ওর ভিরকুটি, টাকার গরম, ধানের গরম এইবার ভাঙবে। মা এসেছেন, তুমি দেখ যগন্দ। এইবারেই দেখ, দেনা-ভুনি শোধ করব আমি। খাজনা-দেনা এক পয়সা বাকি রাখব না। যা থাকবে, থাকবে তোমার অনেক—বিঘে ভুঁই চার বিশ তো ফলবেই, কি বল ?

—তা খুব।

—তাহলেই, আমি হিসেব করেছি, সব দিয়ে-থুয়ে পৌটি তিনেক থাকবে। তিন ভাগ করব—বুঝলে? তিনটি গোলা। একটি সরস্বতীর, একটি লক্ষ্মীর, একটি আমার। এই আমার বরাবর চলবে। এখনও বছর বিশেক বাঁচব আমি, খুব বাঁচব। দুটো গোলা নির্দিষ্ট রেখে দেব আমার কম্মের জন্যে। বাকি যা থাকবে, ওরা যা খুশি তাই করবে।

যোগেন্দ্র বললে, ভালো যুক্তি, ভালো যুক্তি। আমাকেও এমনই বন্দোবস্ত করতে হবে।

—করতে হবে নয়, করে ফেলাও।

—কাল ভোরে যখন যাবে মাঠে, ডেক আমাকে। আর বোতলটা বরং নিয়ে এস, এক ঢোক না খেয়ে তো যেতে পারব না মাঠে!

পাল বললে, আসব।—তারপর হঠাৎ যেন তার কথাটা মনে পড়ল, বললে, হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি।

—কি?

—এর ওপর দুধ ভালো নয়। দুধ খাও তো বিকেলে খেও। এর পর ভালো হল মাংস। তা ভাই, সে তো উপায় নাই। মাছটা বেশি খেও।

—মাছ?—যোগেন্দ্র হাসলে।—পাব কোথা?

—আঃ! জাল-টাল সব গিয়েছে হে। নইলে—। নইলে বাবুদের সায়রপুকুরে সে-কালের ফিস্টির রাত্রের মত জাল ফেলে মাছ ধরা কিছু বিচিত্র ছিল না মুকুন্দের পক্ষে। শরীরে তার যথেষ্ট জোর আছে। ওই চেকার চেয়ে জোরে ঘুরিয়ে জাল সে ফেলতে পারে—একথা সে বাজি রেখে বলতে পারে। বাবুদের পুকুর কেন? জাল থাকলে আজ চেকার পুকুরেই ফেলত জাল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

যোগেন্দ্র বললে, ভোরে ডেকো যেন।

৪

মাঠ-থইথই-করা ধান মুকুন্দ কেটে চলে জোয়ানের মত। হা-হা করে হাসছে। যোগেন্দ্রও কাটছে। সেও যেন তাগদ অনেকটা ফিরে পেয়েছে। অন্য সকলেও কাটছে। মুকুন্দ-যোগেন্দ্রের মৃতসঞ্জীবনীর নেশার জোর তাদের নাই, কিন্তু ধানের নেশা তাদের পেয়েছে।

মাঠে মাঠে থাকবন্দী ধান ছোট ছোট ঘরের মত আকারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেন মেলা বসে গেছে বলে মনে হচ্ছে দূর থেকে। গাড়িতে গাড়িতে

সেই ধান ক্রমে ক্রমে ঘরে নিয়ে চলেছে সব। মুকুন্দের কেলে সত্যিই সাবাস জোয়ান, মুকুন্দ এবার তার ওই নাম দিয়েছে। সমানে টেনে চলেছে জোয়ান বলদটার ডাইনে থেকে। মুকুন্দ গাড়িতে ধান বোঝাই করছিল। দুখানা জমির ওপারের খানার উপর দিয়েই পড়েছে জমি বরাবর গাড়ির রাস্তা। একখানা গাড়ি চলেছে, হৈ-হৈ করে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। কোঠা-ঘরের মত ধান বোঝাই করেছে গাড়িতে। ধুলো উড়ছে। চেকার গাড়ি চলেছে। নইলে এমন গরু আর কার হবে! হ্যাঁ, চেকাই বটে। ওই যে গাড়িতে বোঝাই ধানের মাথায় বসে আছে, চালের মটকায় হনুমানের মত।

—হ কত্তা!

মুকুন্দ দাঁতে দাঁত টিপে ধরে তার দিকে চাইলে শুধু।

—হবে নাকি?—বাই ঠুকছে চেকা, হি-হি করে হাসছে।

পাল একটা মাটির ঢেলা নিয়ে ছুঁড়লে, অবশ্য অন্যদিকে ছুঁড়লে, ছুঁড়ে বলে উঠল, উ-লে-লে-লে।—অর্থাৎ হনুমান তাড়াচ্ছে সে। সঙ্গে সঙ্গে হা-হা করে হেসে উঠল। সেই হাসি। তারপর সে দুই হাতের মুঠোতে ধরে টেনে তুলতে লাগল ধানের আঁটি। এবারকার ধানে তার আড়াই মুঠোয় বাঁধা আঁটি। আড়াই হাত তিন হাত লম্বা খড়। ধান তুলছিল আর হাসছিল।

—যাঃ শালা!—পাল হাতের আঁটিগুলো ফেলে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। হাঁপ ধরে গেছে হেসে।—শালাঃ। শালা চেকা। শালা আবার লক্ষ্মীতে অন্নপূর্ণাপূজা করবে এবার। হিংসুটে বদমাস। রক্তের তেজ, জোয়ানীর দেমাক, আর টাকার গরমে ধরাকে শরার মত দেখছে। এবার লক্ষ্মীপূজায় বারোয়ারি থেকে ভাসান গান হবে ঠিক হয়েছে। ও অমনই অন্নপূর্ণাপূজার ধুয়ো তুলেছে। তুলুক। দশের লাঠি একের বোঝা। দশজনের চাঁদায় হবে বারোয়ারি। ওর একার পূজো। দশও এবার লক্ষ্মীছাড়া নয়। উনো লক্ষ্মী এবার দুনো হয়েছেন। মাঠ-ভরা ধানে খামার গোলা ছয়লাপ হয়ে যাবে। দশ টাকা মণ ধানের। পঞ্চাশের পর থেকে মা দুনো হয়েই আসবেন বছর বছর।

'এস পৌষ, বস পৌষ, জন্ম-জন্ম থাক; গেরস্থ ভরিয়ে থাক, দুধে-ভাতে রাখ।' এবার সেই দুধে-ভাতে রাখার পৌষ এসেছে। পঞ্চাশ বছর দুঃখের পর পঞ্চাশ বছর সুখ। এতদিন পৌষ এসে বাউনির বাঁধন মানে নাই, মাঘ মাস যেতে না যেতে গোলা খালি হয়েছে, খাজনায় মহাজনের পাওনায় সব কর্পূরের মত যেন উবে গিয়েছে। আসছে বছরের খোরাকির জন্য আবার

মহাজন ঠিক করতে হয়েছে। এ গাঁয়ের মহাজন ওই চেকা। ওই ওরই দোরে যেতে হয়েছে মানুষকে। এবার যা নমুনা তাতে ওর দোরে আর যেতে হবে না। বছর বছর যদি এমনই পৌষ আসে, মাঠ-থইথই-করা ধান, খামার-ভর্তি গোলা-ভর্তি ঘর-ভর্তি করা পৌষ, তবে সে পৌষ আর যাবে না। সে জন্ম-জন্মই থাকবে, গেরস্থকে দুধে ভাতেই রাখবে। ছেলেপুলে খোরা-পাথর ভরে ভাত খাবে। আবার হবে এই জোয়ান, মোল্যানীরাও হবে আবার দলমলে মেয়ে, তাদের এক ফুঁয়ে শাঁখ বেজে উঠবে শিঙের মত, এক দুপুর ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কুটে তুলবে বিশ দরুনে ধান। গোটা বাড়িটা নিত্য নিকিয়ে তুলবে গোবর আর রাঙা মাটির গোলায়, ঘরে খামারের চতুঃসীমায় কোথাও থাকবে না এতটুকু ঝুল, কি পাতা, কি কুটো, কি ময়লা। পৌষ-সংক্রান্তির ভোররাত্রে তারা যখন প্রদীপ জ্বেলে, ধুপ দিয়ে, রঙ-করা চালগুঁড়োর আলপনা একে, শুদ্ধ কাপড়ে, শুদ্ধ মনে পৌষকে বলবে—পৌষ পৌষ পৌষ বড়ঘরের মেঝেয় উঠে বস—পৌষ তখন কি যেতে পারবে? পঞ্চাশ সাল, শয়ে শূন্যের অর্ধেক হল পঞ্চাশ—এটা হল সর্বনাশের বছর। হয়েছেও সর্বনাশ, কাল যুদ্ধে নাকি লাখে লাখে মানুষ মরছে, তিরিশ টাকা মণ চাল, দশ-পনরো টাকা জোড়া কাপড়, নুন নাই, চিনি নাই, ওষুধ নাই, দেশ-ভাসানো বান, রোগ-মড়ক, সর্বনাশের আর বাকি কি? কিন্তু অতিমন্দর পরেই নাকি ভালো আসে, শুকনো গাছে ফুল ফোটার মত এবার সেই ভালোর নমুনা দেখা দিয়েছে মাঠ-ভরা ধানে। পালের অকাট্য ধারণা তাই। ভালো বছর এইবার থেকে আরম্ভ হল। নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়। এই চৈত্র নাগাদ যুদ্ধ মিটে যাবে, রোগ এই বসন্তের বাতাস বইলেই দূর হবে। সুবাতাসের মুখে রোগ কতক্ষণ? সুসময় এলে, দুঃখ অভাব সব পালায়, আলো ফুটলে দুঃস্বপ্নের মত।

পাল আবার তুলতে আরম্ভ করলে ধানের আঁটি। হাঁপটা এইবার গিয়েছে। ধান-পান তুলে সে একেবারে যাবে পারুলের কবরেজের কাছে। চিকিৎসা করাবে। শরীরটাকে তাজা করতে হবে! বয়স অবশ্য হয়েছে, তবে ষাট বছর কি এমন বয়স? তার বাবার জ্যাঠা ষাঠ বছর বয়সে ফের বিয়ে করেছিল; সেই স্ত্রীর তিন কন্যে হয়। শুধু তাই নয়, সে স্ত্রী যখন মরে, তখনও বুড়া বেঁচে ছিল, তারপরও সে মাঠে যেত। বাঁচতে তাকে হবে। সমর্থও থাকতে হবে। সরস্বতীর ছেলেটাকে মানুষ না করে সে মরতে পারবে না। তা হলে ওই চেকাই সর্বনাশ করে দেবে। সরস্বতীর উপর নজরও যে সে না দিতে পারে, এমনও নয়। হুসহুস করে সে ধান তুলতে লাগল।

আবার হৈ-হৈ উঠছে। কার গাড়ি আসছে! কিন্তু গাড়ি কই? কোথায়? তবে? কি হল? কার কি হল? কান খাড়া করে পাল শুনলে, কোন দিক থেকে আসছে হৈ-হৈ শব্দটা? গ্রামের দিক থেকে মনে হচ্ছে। কার কি হল? বুকটা তার ধড়াস করে উঠল। সরস্বতীর ছেলেটা—পাল দ্রুতপদে চলতে আরম্ভ করলে।

-কে? কে হে? ওহে!—একটা লোক গাঁয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে জোর হাঁটনে চলেছে কোথায়।—কে হে?

—আমি শশী।

—গাঁয়ে গোল কিসের?

—রমণকাকা—

—কি, কি হল?

—রমণকাকা মারা গেল। ধানের পালুই বাঁধতে বাঁধতে, বুকে কি হল বলে, বাস। আমি চললাম কাকার জামাইকে ডাকতে।

রমণ পাল মরে গেল! মুকুন্দদের দলের লোক সে। একবয়সী। ভালো লোক, ভালো লোক—বন্ধু লোক। ভাসানের দলে সাজত নারদ মুনি। দিন রাত্রি হরি হরি করেই সারা হত রমণ। পালের চোখে জল এল রমণকে মনে করে। কিন্তু এইটুকু জোরে হেঁটেই আবার হাঁপ ধরেছে। একটু মৃতসঞ্জীবনী হলে হত। ভালো ওষুধ। বার বার—বার বার মুকুন্দ রমণকে বলেছিল, রমণ, ওষুধটা ভালো ওষুধ, খাও। নইলে পারবে না। রমণ বলেছিল, ছি! না। নারায়ণ নারায়ণ। আমার গোবিন্দ আছেন।—মূর্খ—মূর্খ! গোবিন্দ ওষুধ খেতে বারণ করেন না, আর যদিও করেন, তবে যাও ধর্ম নিয়েই স্বর্গে যাও।

পাল ফিরল মাঠের দিকে। ধান পড়ে আছে, গরু বাঁধা আছে। আজ এ ক্ষেতের ধানটা তুলতেই হবে। শুধু তোলা নয়, আজ কতকটা ধান পিটে, কিছু ধানও বিক্রি করতে হবে। পৌষের আজ হল চব্বিশে। জমিদারের লাটবন্দী যাবে আটাশে। তার আগে খাজনা কিছুটা দিতেই হবে। সে না দেওয়াটা দারুণ অন্যায়। চিরকাল দিয়ে এসেছে। তা ছাড়া লক্ষ্মীর আয়োজন আছে। রস্বতীর কাপড় ছিঁড়েছে, লক্ষ্মীরও কাপড় ;, নিজেরও চাই, সরস্বতীর ছেলের একটা দোলাই চাই। পূজা থেকে কাপড় হয় নাই। সে আবার মাঠে এসে ধান বোঝাই করতে লাগল। হুসহুস করে বোঝাই করে চলল ধান! বাপ রে, বাপ রে, ধান আর শেষ হবে না যেন! এ গাড়িতে আর ধরবে না। বোধ হয় এ-ই বেশি হয়ে গেল। বোঝাই ধানের উপরে বাঁশটা দিয়ে শণের রশি

টেনে কষে বাঁধতে বাঁধতে একবার ভাবলে পাল। বেশি হয়েছে কিছু। তা হোক। পরক্ষণেই সে হাসলে। বেশি? হায় রে কলিকাল! সে আমল হলে—হায়, হায়, হায়! সে কাল কি আর আছে? সে আমলে পালের একবার একটা বলদ হঠাৎ মরে গিয়েছিল, এমনই ভর্তি ধান তোলার সময়। গরুর জন্য ধান তোলা বন্ধ ছিল না পালের। এক দিকে গরু জুড়ে, আর এক দিকে নিজে দুই হাতের খাঁজে জোয়াল ধরে বুক দিয়ে টেনে তুলেছিল ধান। আর আজ? এ ধান কটা না হলে চলবে না যে, বরং আরও চারিটি হলে ভালো হত। খাজনা, লক্ষ্মীর উদ্‌যুগ, কাপড়। বাঁশটা কষে পাল নিজে গাড়ির মুখটা একবার তুলে দেখলে। হুঁ, বেশি হয়েছে।—কি রে কেলে? পারবি না বেটা?

কেলে নিজের নাম বেশ বুঝতে পারে। পালের দিকে চেয়ে সে ফোঁস করে উঠল। পাল হাসলে, হ্যাঁ, পারবি। তোর জন্যে তো ভাবি না রে। ভাবনা —ওই মর্কট জোয়ানটার জন্যে। বেটা আমার জোয়ান! পারে কেবল শিং নাড়াতে। নে, চল দেখি। আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। আপন মনেই পাল গরু দুটোর সঙ্গে বকতে বকতে গাড়ি জুতলে। ধানের গাদায় লুকানো ছিল সঞ্জীবনী বোতলটা। এক ঢোক খেয়ে, শরীরটা চাড়া দিয়ে নিজের শক্তিটা অনুভব করে নিয়ে বললে, চল, চল, বেটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ।

গাড়ির জোয়ালটা গরু দুটার কাঁধে চেপে বসেছে; কেলের পিঠ ধনুকের মত বেঁকেছে, পিছনের পা দুটোর ঠেলা দিয়ে তীরের মত সোজা করতে চাইছে সে। ঘাড়টা টানের চোটে লম্বা হয়ে উঠেছে। নড়েছে। সাবাস বেটা! আচ্ছা। জোয়ানটাও টানছে।—বলিহারি, বলিহারি রে ব্যাটা! বাপ রে—ধন রে—মানিক রে! হ্যাঁয়—হ্যাঁয়—হ্যাঁয়! গাড়ি চলেছে—গাড়ির উপর কোঠা ঘরের মত বোঝাই করা ধান দুলছে—মা-লক্ষ্মী হেলে দুলে চলেছেন তার ঘরে।

গাড়িটা থেমে গেল, শব্দ হল একটা ঘ্যাঁচ করে। একটা আলের কাটে চাকা আটকে গেল। বাঁ দিকে জোয়ান গরুটাকে তাড়া দিয়ে পাল বললে, শালা, ভাত খাবার যম তুমি!—সে কষে দিলে এক পাঁচন-লাঠির বাড়ি। গরুটা টানলে। চাকাটা নড়ল। কিন্তু ওদিকের চাকাটা নড়ল না। কেলে টানছে; মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে তার, কিন্তু চাকা নড়ছে না।

—কেলে, লে বেটা, লে। হ্যাঁয়—হ্যাঁয়! কেলে!

চাকা নড়ছে না। কেলে পারছে না টেনে তুলতে।—কেলে! কেলে! পাল খেয়ে নিলে আর এক ঢোক। শরীরটাকে আর একবার চাড়া দিলে। তারপর চাকার কাঠ দুই হাতে ধরে বুক দিয়ে ঠেলতে আরম্ভ করলে—দাঁতে

দাঁতে কষে টিপে। পাকা শাল-খুঁটির মত পালের সর্বাঙ্গ শক্ত হয়ে উঠল। উঠছে, হাঁ, উঠেছে। বহুত আচ্ছা। উঠে গেছে গাড়িখানা। আবার চলছে। পালের বুকে, হাতে, মুখেও লেগেছে চাকার ধূলা। শরীরটা যেন সেকালের শরীরের মত ফুলে উঠেছে। হ্যাঁ, ঠিক হ্যায়। সে জোয়ানই আছে। শুধু হাঁপ ধরেছে খানিকটা। বুকের ভিতরটা ধড়ধড় করেছে একটু বেশি। হ্যাঁ, একটু বেশি। পাল একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। গাড়ির উপরে ধানের বোঝাই ঠিক আছে। হেলছে দুলছে। উঃ! বুকটা নিয়ে সোজা হওয়া যাচ্ছে না। এ কি! এ কি হল? আঃ, নাক দিয়ে কি গড়াচ্ছে গরম? আঃ, বুকের ভিতরটা! এক হাত বুকে দিয়ে, আর এক হাতে পাল নাকটা মুছলে। এ কি! এ যে রক্ত! এ কি! থরথর করে কেঁপে উঠল পাল। বুকের ভিতর কেমন করছে! চারিদিক কেমন হয়ে আসছে! চাঁদনী রাতের বকের পালকের মত রঙের মলমলে ঢাকা মা-বসুমতী—! এ কি! তার এ কি হল? সরস্বতী, তার ছেলে, লক্ষ্মী, মাঠ-ভরা ধান, এ ফেলে—। সে দুই হাতে আঁকড়ে ধরলে তার গাড়িতে বোঝাই ধানের আঁটির ডগা। আঁটির ডগায় ফলন্ত ধান। জোরে, সজোরে চেপে ধরলে। নইলে পড়ে যাবে সে। গাড়ি চলছিল। পালের দুই হাতের মুঠোর মধ্যে ছিঁড়ে এল মুঠো-ভর্তি ধান। গাড়ি চলে গেল। পাল মাটিতে পড়ে গেল মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের মত। বারকতক পা দুটো ছুঁড়লে --নাকটা মুখটা ঘষলে ক্ষেতের ধূলার উপর, এক মুখ ধূলা কামড়ে ধরলে বাঁচবার ব্যগ্রতায়। রক্তে মাটিতে মিশে একাকার হয়ে গেল। ধান-ভরা মুঠো-বাঁধা হাত দুখানা প্রসারিত করে দিয়ে সমস্ত আক্ষেপ তার স্তব্ধ হয়ে গেল পর-মুহূর্তে।

সংক্রান্তির শেষরাত্রে পালের বাড়িতে পৌষ আগলাতে উঠে সরস্বতী লক্ষ্মী শুধু কাঁদলে। কাঁদতে কাঁদতেই কোন রকমে পৌষ পূজার ছড়া বললে। শাঁখটা বাজাতে গিয়ে বাজাতেই পারলে না।

যোগেন্দ্র উঠে বসে ছিল ঘরে চুপ করে। রমণ মরেছে, মুকুন্দ মরেছে, এইবার —সে হড়াম করে খোলা জানালাটা বন্ধ করে দিলে।

মা লা কা র

শারদীয়া পঞ্চমীর সন্ধ্যা।

রায় বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপ ধোয়া-মোছার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর ঘড়া কয়েক জল ঢালিয়া একবার ঝাঁটা বুলাইলেই সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা হইয়া যাইবে। ভোলাই কৈবর্ত হাতের নারিকেলের ছোবড়াটা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, নাঃ, একবার তামুক না খেয়ে আর নয় বাবা।

রমণ গোপও ছোবড়া দিয়া চণ্ডীমণ্ডপের বাঁধানো মেঝে মাজিতেছিল, সে একটা ঢেকুর তুলিয়া বলিল, তাই বটে মাইরি। উঃ, কণ্ঠায় কণ্ঠায় অম্বল হয়ে গেল। তামুক না খেলে হেঁটাবে না।

আলোর সম্মুখে হাত দুইখানি ধরিয়া দেখিতে দেখিতে ভোলাই বলিল, এঃ, একেবারে সাদা ফেঙা-শ হয়ে গিয়েছে! একদিনেই যেন হাজা ধরে গেল। চুনের দাগ বটে বাবা, উঠতেই চায় না।

রমণ তামাক সাজিতে বসিয়াছিল, সে বলিল, বিঘে খানেক ধানের জমি ভেসে যেত, যে জল ঢালা হয়েছে।

কথাটা সত্য, এবং এই সত্যটা প্রমাণিত করিবার জন্যই যেন ঠাকুরবাড়ির প্রবেশদ্বারে ঠিক এই মুহূর্তটিতেই কে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যাঃ গেল! এ যে একবারে জাওনগাড়া করে তুলেছে রে বাবা! কাদায় কাদায় নন্দোচ্ছব।

ভোলাই উৎসাহিত হইয়া উঠিল—এই ঠিক হয়েছে। আসুন মালাকার মশায়, আসুন তো দাদা। জলে জলে জমে গেলাম ভাই, লাগান তো একবার জুত করে।

জলসিক্ত উঠানে সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করিল রজনী মালাকার। তাহার পিছনে দুইটা প্রকাণ্ড চাঙারি মাথায় করিয়া দুইজন মজুর—চাঙারি দুইটা সযত্নে কাপড় দিয়া ঢাকা। রজনী চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিয়াই চণ্ডীমণ্ডপের দিকে তাকাইয়া মুগ্ধকণ্ঠে বলিয়া কঠিল, বা-বা-বা, চণ্ডীমণ্ডপ যে এবার ঝলমল করছে রে! চুনকাম হল বুঝি?

ভোলাই বলিল, হ্যাঁ। চুনকাম তো নয়, আমাদের মরণ,—চুনের দাগ মাজতে মাজতে হাতে পায়ে হাজা ধরে গেল। জলে বসে বসে হালুনি ধরেছে। তাই তো বলছি, একবার লাগান তো ভাই।

রজনী ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, দাদা আমার রসিক সুজন। নাও, পাত

হাত। বলি, আছ কজন ? সবাই খদ্দের নাকি ? এক—দু—তিন—চার—পাঁচ—ছয়ে ঋতু—আমাকে নিয়ে সাতে সমুদ্র। লে বাবা—সমুদ্দেরে পাদ্য-অর্ঘ্য—লে পাদ্য-অর্ঘ্য করেই সেরে লে।

সে কোঁচড় হইতে একটি পুরিয়া বাহির করিয়া খানিকটা গাঁজা ভোলাইয়ের হাতে দিল। পরিমাণ দেখিয়া ভোলাই সানন্দে বলিল, মেলাই মেলাই, এতেই মেলাই হবে মালাকারমশায়। নেন, বসুন জুত করে। বার করুন আপনার সরঞ্জাম।

রজনী সন্তর্পণে চাঙারি দুইটি মজুরদের মাথা হইতে নামাইয়া লইয়া পূজা-বেদীর প্রতিমার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, ওরে, একজন যা বাবুদের বাড়িতে গিয়ে ময়দা, মালসা, কাঠ নিয়ে আয়। এনে আঠা চড়িয়ে দে। আর একজন যা তো আমার সেঙাতের কাছে—কালী সিং—কালী সিং মশায়ের কাছে। বলবি, মালাকার আসছে, সেঙাতের কাছেই খাব। খানকতক পরটা করতে বলবি। এ রাতে আর বাবুদের বাড়ির ভাত চলবে না বাবা।

ভোলাই হাসিয়া বলিল, মালাকারদাদা আমার আছেন বেশ। বলি, সেঙাতিনী আছে কেমন আপনার ? সে খবরটা নেন, নইলে রাগ করবে যে সেঙাতিনী।

ইঙ্গিতটা কদর্য। সেঙাতিনী অর্থে সেঙাত কালী সিংয়ের গৃহকর্ত্রী—একটি নিম্নজাতীয়া স্ত্রীলোক। পশ্চিমদেশীয় ছত্রীর সন্তান কালী সিং বাংলা দেশে আসিয়া ওই মেয়েটিকে লইয়া বেশ সপ্রতিভভাবেই সংসার পাতিয়া বসিয়াছে। লোকে বলে, রজনীর এই মিত্রতার সূত্রপাত ওই মিত্রাণীর মোহে, মিত্রটি নিতান্তই গৌণ। লতা হইতে ফুল সংগ্রহ করিতে গেলে, লতার অবলম্বন বৃক্ষে যেমন আরোহণ না করিলে চলে না, তেমনই আর কি।

রজনী কিন্তু রাগিল না, সে হাসিমুখেই বলিল, চাষা বলতে কত বড় দুটো হাঁ করতে হয় জানিস ? ঐ হাঁ দিয়েই সব বুদ্ধি তোদের বেরিয়ে যায়, বুঝলি ! রোকায় প্রণাম কি সবাইকে চলে রে বাবা, তা চলে না। নে, কই কি করলি দেখি ? দে, আমাকে দে।

ভোলাই বেশ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল, জাতি তুলিয়া রহস্য করায় রাগও তাহার একটু হইয়াছিল ; কিন্তু হাতের ঐ সামান্য খানিকটা বস্তুর খাতিরে তাহার আর কিছু বলিবার উপায় ছিল না। সে নীরবেই হাতের গাঁজাটুকু রজনীর হাতে ঢালিয়া দিল। সরঞ্জামাদি বাহির করিয়া রজনী গাঁজা তৈয়ারী করিয়া বলিল, নে, টিকেতে আগুন দে।

অতঃপর গঞ্জিকাপর্ব। ছোট কল্কেটি হাতের পর হাত ফিরিয়া ঘুরিয়া

চলিল। আসরটা নীরব নিস্তব্ধ, প্রত্যেকেই প্রাণপণে টান মারিয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া ধোঁয়া বুকের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, কথা বলিবার অবসর নাই। কল্কেটা নিঃশেষ হইয়া গেলেও কিছুক্ষণ সকলে বুঁদ হইয়া বসিয়া রহিল, বাহ্যলোকের সহিত সম্বন্ধ যেন ধীরে ধীরে ঢুকিয়া আসিতেছে।

কিছুক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল ঐ মজুরটা। সে বলিল, আঠা হয়ে গিয়েছে গো। লেগে পড়েন এইবার, শেষ হতে রাত কত হবে ভাবেন একবার।

রজনীর চমক ভাঙ্গিল, সে সজাগ হইয়া বলিল, তুমি বেটা আমার পক্ষীরাজ ঘোড়া, চোখ বুজতে বুজতে সাত সমুদ্দুর তের নদী পার, হয়ে গিয়েছে আঠা এর মধ্যে!

ভোলাই অকস্মাৎ রজনীর হাত দুইটি ধরিয়া বলিল, মাজ্জনা—মাজ্জনা করতে হবে দাদা।

—মার্জনা? কিসের কর্জনা?—রজনী আশ্চর্য হইয়া গেল।

—মুখ ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছে দাদা।

—কি?

—ওই ঠাট্টা—সেঙাতিনী নিয়ে।

রজনী হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর বলিল, তার চেয়ে বরং নাটমন্দিরটা মার্জনা শেষ করে ফেল দাদা, যাও বাড়ি যাও। বউমা আমার বসে আছে পথ চেয়ে।

ভোলাই পরিতৃপ্ত হইয়া গেল। সে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া অপ্রতিভের মত কেবলই হাসিতে লাগিল। রমণ গোপ অকারণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বলি, দাঁত মেলে শুধু হাসবি, না কাজ শেষ করে বাড়ি যাবি, তা বল।

ভোলাই আর বাক্যব্যয় না করিয়া ঘস ঘস শব্দে মেঝে মাজিতে বসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে রমণও। জলবাহকেরা হুড় হুড় শব্দে জল ঢালিয়া দিল। রজনীও আসিয়া প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হ্যারিকেনটি তুলিয়া ধরিয়া বেশ নিবিষ্টচিত্তে প্রতিমাখানি একবার দেখিয়া লইল। তারপর চাঙারির কাপড় খুলিয়া বাহির করিল সোনালী রূপালী লাল সবুজ রাঙতার আভরণগুলি। একখানা কাপড় মাটির উপর বিছাইয়া তাহার উপর আভরণগুলি থাকে থাকে সাজাইয়া ফেলিয়া আঠার মালসাটা টানিয়া লইয়া আঠা মাখাইতে মাখাইতে গুন গুন করিয়া গান ধরিল—

হাতে দিব বাজুবন্ধ গলাতে সাতনর
চরণে বাজিবে মল ঝমর ঝমর।

বাহিরে তখন ছেলেরা দুই-একজন করিয়া জমিতে শুরু করিয়াছে। মালাকারের আগমন-সংবাদ এই রাত্রেও তাহারা কেমন করিয়া পাইয়া গিয়াছে। মণ্ডপের সিঁড়ির দুই ধারে নোটন চৌকিদার কলাগাছ পুঁতিতে আসিয়াছে। সে বলিল, এই দেখ, কলাগাছের পাতায় যদি হাত দেবা, তবে বুঝতে পারবা, হ্যাঁ। বাবুদের ছেলে বলে মানব না।

একটি ছোট মেয়ে পূজার ঘরের দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আপন মনেই মৃদুস্বরে বলিতেছিল, ডাকসাজ দাও, ও মালাকার!

শুনিয়া শুনিয়া বিরক্ত হইয়া রজনী এক সময় প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া বলিল, ভাগ এখান থেকে বলছি, ভাগ। বাঁজার ঘরে ষাঠের উপদ্রব রে বাবা! মর কেনে তোরা, মরে যা সব।

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। রজনী, বন্ধু কালী সিংয়ের ঘরে আসর জমাইয়া বসিয়াছে। কালী সিং নিজে কি একটা তরকারি রান্না করিতেছিল, তাহার গৃহকর্ত্রী রজনীর সেঙাতিনী শ্যামা ও আর একটি মেয়ে রজনীর সম্মুখে বসিয়া কাপড় দেখিতেছে। রজনী মাদুরের উপর খানকয়েক কাপড় লইয়া বসিয়া আছে।

রজনী বলিল, এই জরদা রঙের থানাই তোমাকে মানাবে ভালো মিতেনী। তোমার কালো রঙের উপর খুলবে ভালো।

শ্যামার রঙ নিকষের মত কালো, কিন্তু কালোর মালিন্যকে জয় করিয়া তাহার অপরূপ মুখশ্রী এবং দেহসৌষ্ঠব তাহাকে সুন্দর একটি শ্রীতে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। শ্যামা কাপড়খানার ভাঁজ খুলিয়া গায়ে জড়াইয়া হাসিতে হাসিতে অপর মেয়েটিকে বলিল, কেমন লাগছে দেখ ভাই, বল।

অপর মেয়েটির রঙ ফরসা। সে শ্যামার বান্ধবী, শুধু শ্যামার নয়, রজনীরও বান্ধবী। সে যেন একটু বিস্ময়ের সহিতই বলিল, হ্যাঁ ভাই, খুব ভালো লাগছে তোকে। মালাকারের চোখ আছে ভাই।

রজনী হাসিয়া একখানা নীলাম্বরী সেই মেয়েটির কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, এইবার তোমাকে কেমন লাগে দেখ।

কালী সিং তরকারিটা নামাইয়া ফেলিয়া বলিল, এবার কখানা কাপড় বেশি লাগল মিতা?

হাসিয়া রজনী বলিল, বেশি বাড়ে নাই, তিনখানা বেড়েছে এবার।—অর্থাৎ এবার নূতন বান্ধবী বাড়িয়াছে তিনটি। কালী সিং হাসিল। নীরবে হাসিতে হাসিতেই সে পরটা তরকারি দুটি পাত্রে সাজাইয়া বলিল, উটা শেষ করিয়ে ফেল।

রজনী বিনাবাক্যব্যয়ে মদের বোতল ও একটা নারিকেলের মালা তক্তাপোষের আড়াল হইতে বাহির করিয়া বসিল। কালী সিং শ্যামাকে বলিল, তুরা যা, খাইয়ে লে। সব দিয়ে দিয়েছি উ ঘরে।

একখানা মাছ-ভাজা মুখে পুরিয়াই রজনী মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, আরে বাপ রে!

—কি হইল? কাঁটা লাগল?

—যে মিহি কাঁটা! নেহাত কচি মাছ।

কালী সিং আক্ষেপ করিয়া বলিল, আরে ভাই, পাকা মাছ-ই দেশে নাই। মিলছে না। ই কি দেশ রে ভাই!

রজনী মুখের কাঁটাটা আঙুল দিয়া ছাড়াইয়া ফেলিয়া বলিল, আহা একটা মাছ যে ই জানলে নিয়েই আসতাম।

—তুমার পুকুরে বড়া মাছ আছে নাকি?

হঠাৎ রজনীর অভিমান হইয়া গেল, সে বলিল, নাঃ, তোমার বাড়ি আমি আর আসব না ভাই মিতে। এই শেষ।

কালী সিং সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, কাহে ভাই? কি দোষ হামার হইল মিতা।

—আজ পর্যন্ত তুমি আমার বাড়ি একবার গিয়েছ? বল, ওই কারণ ছুঁয়ে বল।

কালী সিং সাগ্রহে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, যাব, জরুর যাব। তুমি সাদি কর, জরুর যাব।

রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটা বিস্ফারিত করিয়া রজনী বলিল, সাদি? বিয়ে?—তারপরই সে অকস্মাৎ হি হি করিয়া হাসিয়া আকুল হইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

কালী সিং গম্ভীর মুখে আবার তাহার হাত ধরিয়া বলিল, হাসির কথা না মিতা, হামি বলছি তুমি সাদি কর। ইসমে সুখ নাই ভাই মিতা।

রজনীর কিন্তু হাসি থামিল না, কালী সিংয়ের আবেগ শেষ হয় নাই, সে আবার বলিল, হাসির না মিতা। হামার কথার জবাব দাও তুমি, না তো হামি আর কারণ ছোঁবে না।

রজনী গম্ভীর হইয়া বলিল, বল।

—কত রোজগার তুমি কর, বল ভাই, সচ বাত বল।

—তা তোমার—। ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া মনে মনে হিসাব করিয়া রজনী বলিল, তা তিনশ টাকা হবে; তা খুব। আতসবাজি, ডাকসাজ—দুয়ে বরং বেশি হবে তো কম নয়।

—জমি তুমার কত ছিল ভাই?

এবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রজনী বলিল, ছিল তো ভাই ভালোই, বিঘে পঁচিশেক ছিল। জমিদারই সব নীলেম করিয়ে নিলে।

—তুমি একা লোক, এই রোজগার; কেনো ভাই খাজনা দিলে না, বল?

রজনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর সহসা উঠিয়া পড়িয়া বলিল, চললাম আমি মিতে।

আশ্চর্য হইয়া কালী সিং বলিল, কাঁহা যাবে ভাই?

—নাঃ উসব ব্যাড়র ব্যাড়র আমার ভালো লাগে না।—বলিয়া সে অস্বাভাবিক চীৎকার করিয়া উঠিল, নেহি মাংতা হ্যায়, এমন মিতে নেহি মাংতা হ্যায়।

সে চীৎকার শুনিয়া পাশের ঘর হইতে শ্যামা ও তাহার সঙ্গিনী ব্যস্ত ও ত্রস্ত হইয়া দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কালী সিং অপ্রতিভ এবং লজ্জিত হইয়া বসিয়া রহিল। শ্যামা বলিল, বস বস। রাগ হল কেন মিতে?

রজনী একটা চরম অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ভঙ্গিতে দর্পিতকণ্ঠে কহিল, দেখ দেখি, হিসেব চাইছে আমার কাছে? বলছে কিনা বিয়ে কর।

কালী সিং অত্যন্ত বিনয়ের সহিত এবার কহিল, দোষ হইয়েছে হামার, হাঁ, দোষ হইয়েছে। মাফ কর ভাই মিতা।

শ্যামার সঙ্গিনী এবার বলিল, বস বস, বন্ধুলোকের কথায় রাগ করে না, বস।

সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাও বলিল, বস বস মিতে, বস।

রজনী দর্পের সহিত বসিয়া বলিল, আমার খরচ? বছরে কাপড় লাগে কত? দোব সে আমার খুশি।

কালী সিং সুরাপূর্ণ পাত্র আগাইয়া ধরিয়া বলিল, লেও পিয়।—পাত্রটা হাতে লইয়া রজনী আবার আরম্ভ করিল, কাপড় না কাপড়—পাচসিকে থানা, সে নয় বাবা। হিসেব করে কিনতে হয়, কাকে কোন রঙের কাপড় দিতে হবে। আড়াই টাকা তিন টাকা—

বাধা দিয়া শ্যামা বলিল, নাঃ, সে বলতেই হবে, তোমার মত পছন্দ কারু নাই।

রজনীর মনের উত্তাপ মুহূর্তে শীতল হইয়া গেল।

অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারের উন্মত্ত আনন্দের আস্বাদ রজনী যে কেমন করিয়া পাইয়াছিল, তাহার নির্দিষ্ট কোনো ইতিকথা নাই। তবে সে পাইয়াছিল। দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে—কারিগরের পাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আছে, নাই কেবল ভাত। অর্থাৎ পঞ্চাশ ব্যঞ্জনেই তাহাদের সর্বস্ব ব্যয়িত হইয়া গিয়া অন্নের

বেলাতেই অভাব ঘটিয়া যায়। অপব্যয়টা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। রজনীরাও বংশানুক্রমে ডাকসাজ ও আতস-বাজির কারিগর। এ উচ্ছৃঙ্খলতাটাও বংশানুক্রমিক। নিয়মের সূত্র ধরিয়া কল্পনা করা ইতিহাস নয়, ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়াই নিয়মের সূত্রটা লোকে উপলব্ধি করিয়াছে। রজনীর পিতামহ পিতা সকলেই ছিল নেশায় এবং নারীতে আসক্ত, রজনীও তাই। তাহার উপর নিতান্ত অল্পবয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া অবাধ জীবনে সে এই ধারাতেই চলিয়াছে, বিবাহ করে নাই, সে প্রবৃত্তিও নাই। উপার্জন আছে, সঞ্চয় নাই; পৈত্রিক সম্পত্তিগুলিও একে একে নামমাত্র ঋণ বা খাজনা বাকির দায়ে নিঃশেষিত হইতে বসিয়াছে। রজনীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। হাতে অর্থ আসিলেই উন্মত্ত অভিসারে বাহির হইয়া পড়ে। সে অর্থ নিঃশেষিত করিয়া নিঃসম্বল হইয়া ফিরিয়া সে আবার কাজে লাগে। তবে কাজ তাহার খুব ভালো। তাহার হাতের ডাকসাজের মত এমন ডাকসাজ কাহারও হাতে বাহির হয় না। আতস-বাজিতেও সে অপরাজেয়। তাহার ফানুস আজও জ্বলিয়া যাইতে কেহ দেখে নাই, রাত্রির আকাশের অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে সেগুলি মিলাইয়া যায়। হাউই-বাজির আকাশ-কুসুমের রঙ এত বিচিত্র কাহারও হয় না।

রজনী অহঙ্কার করিয়া বলে, হাত আর চোখ—এ থাকতে তোয়াক্কা কারু করি না। মা ভৈ!

কিন্তু অকস্মাৎ রজনীর সে দম্ভ একদা চূর্ণ হইয়া গেল। হাত চোখ এমন কি সমস্ত দেহ সুস্থ নীরোগ থাকা সত্ত্বেও তাহার ব্যবসা-উপার্জন সব বন্ধ হইয়া গেল। স্বরাজ স্বরাজ করিয়া সমস্ত দেশটা যেন পাগল হইয়া উঠিল। ছেলেরা দলে দলে জেলে যাইতেছে; পুলিশ আসিয়া ঘরবাড়ি তছনছ করিয়া দেয়, ছেলেদের মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়ে, তবু তাহারা বন্দেমাতরম বলিতে ছাড়ে না; শুধু বন্দেমাতরমই নয়, আরও কত বলে, রজনী সে বুঝিতে পারে না। রজনীর রক্তও টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠে। মন উত্তেজনায় সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠে।

কিন্তু সহসা সে একদিন উপলব্ধি করিল, এই সমস্তের ফলে সর্বনাশ হইয়া গেছে তাহারই। ভাদ্র মাসে শারদীয়া পূজার ডাকসাজ এবং আতস-বাজির বায়না আনিতে রামনগরের বাবুদের বাড়িতে গিয়া শুনিল, এবার বায়না হইবে না, ডাকসাজ আতসবাজি দুই-ই বন্ধ।

বাবু বলিলেন, ও বিলিতী রাঙতা চুমকির কাজ চলবে না। আমরা খদ্দর দিয়ে প্রতিমা সাজাব। ও আতসবাজিও চলবে না।

রজনী আকাশ হইতে পড়িল। তারপর একে একে সে সমস্ত খরিদ্দারের

বাড়ি হইতে ওই একই জবাব লইয়া বাড়ি আসিয়া একেবারে হতাশায় যেন ভাঙিয়া পড়িল। বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্যন্ত দোকানে ধার জমিয়া আছে। এই আশ্বিনের কাজ করিয়া সে সমস্ত শোধ করিতে হইবে। তাহার পর ভবিষ্যৎ। তাহার চরিত্রে চিন্তা করার অভ্যাস নাই, আজ এই আকস্মিক দুশ্চিন্তায় সে যেন পাগল হইয়া উঠিল। বারবার সে এই আন্দোলনকে অভিসম্পাত দিল!

হাতে তীক্ষ্ণধার ছুরিটা লইয়া আপন মনেই এক টুকরা সোলা বিনা কারণে চাঁচিয়া ছুলিয়া কাটিয়া ফেলিতেছিল আর ভাবিতেছিল ওই কথা। থাকিতে থাকিতে সহসা চোখ দুইটা তাহার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। একি! বাঃ, এ যে শুধু সোলা হইতেই সুন্দর একখানি আভরণ গড়িয়া উঠিয়াছে! দেখিতে তো রাংতা-মোড়া সাজ হইতে খারাপ লাগে না! হাতীর দাঁতের গহনার মত সুন্দর শুভ্র। ইহাকে যদি আরও ভালো করিয়া পালিশ করা যায়, তবে তো চমৎকার হয়। কল্পনানেত্রে আপাদ-মস্তক শুভ্র আভরণে সজ্জিতা একখানি দশভুজা প্রতিমা ভাসিয়া উঠিল। রঙিন বিদেশী কাপড়ের পরিবর্তে দেশী খদ্দর! চমৎকার! শিল্পীর দৃষ্টি লইয়া সেই কল্পনার প্রতিমাখানির বারবার সে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, এমন সুন্দর মূর্তি কখনও কেহ দেখে নাই। লাল নীল খদ্দরের প্রান্তে সাদা সোলার পাড়, সর্বাঙ্গে শুভ্র আলোর মত আভরণ। রজনী লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল। পরদিন প্রাতঃকালেই সে আবার রামনগরে আসিয়া বাবুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বাবু বলিলেন, কি?

হাতজোড় করিয়া রজনী বলিল, হুজুর দেশী ডাকসাজেই আমি প্রতিমা সাজিয়ে দেব। পছন্দ না হয় দাম নেব না, সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেব।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বাবু বলিলেন, বুঝতে পারলাম না তোমার কথা। দেশী ডাকসাজ কি করে হবে?

—হুজুর শুধু সোলার কাজ, হাতীর দাঁতের মত সাদা সাজ।—বলিয়া সে সেই আভরণের নমুনাটি বাবুর সম্মুখে ধরিল। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বাবু বলিলেন, দেখে তো ভালোই লাগছে।

—হুজুর, দেশী কাজই একটা হোক, দেখুন পরখ করে।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বাবু বলিলেন, বেশ। কিন্তু যে কথা তুমি বলেছ, সেই কথাই রইল। কাজ দেখব, পছন্দ না হলে খুলে ফেলে দেব। পছন্দ হয়, দাম তো পাবেই, বকশিশও পাবে। বায়না এক পয়সাও পাবে না।

রজনী উৎসাহভরে বলিল, তাই হবে হুজুর। কিন্তু ঐ কথা একখানা চিঠিতে লিখে দেন হুজুর, তাহলে ঐ দেখিয়ে, ঐ সর্তেই আমি অন্য বাড়িতে সাজ দেবার কথা কয়ে আসব।

বাবু আপত্তি করিলেন না, সানন্দেই পত্র লিখিয়া বলিলেন, পঞ্চমীর দিন এলে এবার হবে না। চতুর্থীর দিন প্রতিমা সাজানো শেষ করতে হবে। কারণ, পছন্দ না হলে অন্য রকমে প্রতিমা সাজাব আমরা।

রজনী সানন্দে সম্মতি দিয়া পত্র লইয়া গ্রাম গ্রামান্তরে পূজাবাড়ির সাজ সরবরাহের বরাত লইতে বাহির হইল। ফিরিল সে আশাতীত আনন্দ লইয়া, এবার কাজ পাইয়াছে অনেক বেশি ; কিন্তু ঐ সর্তে!

বাড়িতে আসিয়া আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাসটা কাটিয়া যাইবামাত্র সে মাথায় হাত দিয়া বসিল। সে করিয়াছে কি? বরাত তো লইয়াছে, কিন্তু বায়না যে একটা পয়সাও পায় নাই। দেড়শত দুইশত টাকার কাজ করিতে অন্তত পক্ষে পঁচিশ ত্রিশ টাকার জিনিস চাই। না, আরও বেশি, রঙিন কাপড়ই যে চাই অনেকটা। কাপড় না হয় দোকানে ধারে মিলিবে, কাপড়ের দোকানের একজন মোটা খরিদ্দার সে, দোকানী তাহাকে কাপড় ছাড়িয়া দিতে আপত্তি করিবে না। কিন্তু সোলা এবং অন্য জিনিসগুলির কি হইবে? সম্মুখেই শ্রীপুরে নাগপঞ্চমী মেলা, সোলার আমদানি ঐখানেই। সোলার টাকার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সহসা আজ তাহার মনে হইল, ঘরে মা ভগ্নী কি স্ত্রী থাকিলে আর তাহাকে ভাবিতে হইত না। গায়ের গহনা তাহারা হাসিমুখেই খুলিয়া দিত। অবশেষে অনেক চিন্তা করিয়া সে মিতা কালী সিংয়ের কাছে আসিয়া সমস্ত বলিয়া বলিল, তিরিশটি টাকা তোমাকে ধার দিতেই হবে ভাই মিতে। এ পূজোতেই তোমাকে শোধ দোব!

কালী সিং বিনা আপত্তিতে টাকা কয়টি তাহার হাতে দিয়া বলিল, আমি দিলাম চুপসে, তুমি দিবে হামাকে চুপসে। কইকে বলিয়ো না মিতা, শ্যামাকে কভি বলিয় না।

রজনী হাসিয়া বলিল, কেন কেড়ে নেবে নাকি?

—জরুর লিবে ভাই। আওর যদি জানে ভাই, টাকা হামি লুকইয়ে রাখি, তবে কৌন জানে ভাই, এক রোজ খুন করিয়ে দিবে না!

রজনী আশ্চর্য হইয়া গেল—বল কি মিতে?

—ঠিক বলি ভাই। তুমার কারবার ই লোকের সাথ দু-চার রোজকে, তুমি জানো না, উ জাতই এমন আছে।

—ছেড়ে দাও না কেন ? ঝাঁটা মেরে দূর কর।

—পারি না মিতা, পারি না।—কালী সিং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

রজনী গৌরবভরেই বলিল, দেখ ভাই, আমার তাহলে বাহাদুরি আছে, ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

কালী সিং চুপ করিয়া তাহার সম্মুখের রাস্তাটার দিকে চাহিয়া রহিল, কোনো উত্তর দিল না।

মেলাতে আসিয়া সে একটি একটি করিয়া বাছিয়া আপনার মনোমত সোলা দিয়া প্রকাণ্ড একটা আঁটি বাঁধিয়া ফেলিল। সোলা এবার বিক্রি নাই বলিলেই চলে, কাজেই দোকানদারও আপত্তি করিল না। দাম দর শেষ করিয়া সে দুইটা টাকা বায়না দিয়া বলিল, আমার মাল আঁটি বাঁধাই রইল ভাই দোকানে। কাল সকালে বাকি মিটিয়ে নিয়ে যাব।

এখনও অনেক জিনিস কিনিতে বাকি, সেগুলি কিনিতে হইবে। রঙ, মিহি সুতা, গোটা দুয়েক ধারাল ছুরি, কাঁচি—মনে মনে বাকি জিনিসগুলির হিসাব করিতে করিতেই সে বাহির হইয়া পড়িল। দুই পাশে সারি সারি দোকান, পথে আনন্দোন্মত্ত জনতা, হাসি, চীৎকার, কলরব। রজনী জনতার মধ্যে মিশিয়া গেল।

—গুর—গুর—গুর—ঠনাঠন ঠনাঠন। চলে আও, চলে আও। এক রূপেয়ামে দো রূপেয়া—নসীবকা খেল। চলে আও।

জুয়ার আড্ডা। জুয়ার আসর ঘিরিয়া লোকের কি ভিড়! খেলাটা রজনীর দেখিতে ভালো লাগে! রজনী ভিড়ের মধ্যে ঠেলিয়া ঢুকিয়া গেল।

বলিহারি বলিহারি, লোকটা খেলোয়াড় বটে! হাতখানা জুয়ার ঘুঁটি লইয়া খেলিতেছে কেউটের লেজের মত ক্ষিপ্র বঙ্কিম গতিতে। একটা ঘর মারিয়া বারবার চলিয়াছে। ঘরটা বাঁধিয়া একজন দানের পর দান ধরিয়া চলিয়াছে। অকস্মাৎ একটা তীব্র গন্ধে রজনীর নাসারন্ধ্র ভরিয়া উঠিল। মদের গন্ধ। মুহূর্তে রজনীর বুকের মধ্যে একটা অদম্য তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল। সে ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া এক বিচিত্র অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া খুঁজিতে আরম্ভ করিল। এসবের গোপন পথঘাট রজনীর অবিদিত নয়। সে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া একটা মাংস-ডিম-পরটার দোকানে গিয়া প্রবেশ করিল।

—গরম সরবত দেবেন তো একটা।

দোকানদার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে দেখিয়া লইয়া বলিল, ডবল দাম কিন্তু।

রজনী হাসিয়া বলিল, নাম জানি আর দাম জানি না ? সে জানি।

একটা পর্দা-ঘেরা ঘর দেখাইয়া দিয়া দোকানী বলিল, বসুন গিয়ে। খাবার কি দোব ?

পর্দাটা ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে করিতে রজনী বলিল, পোয়াখানেক মাংস, আর—আর দুটো ডিম, ব্যস।

দোকান হইতে যখন সে বাহির হইল, তখন সমস্ত মেলাটা আলোয় আলোময় হইয়া গিয়াছে, রজনীর মনে হইল, সব যেন হাসিতেছে, সমস্ত কিছু হইতে দীপ্তি যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে। সে আগাইয়া চলিল। দুই ধারে দোকানের পর দোকান চলিয়াছে, আলোকোজ্জ্বল পণ্যসম্ভার যেন সব ভাসিয়া চলিয়াছে।

সহসা রজনীর দৃষ্টি পীড়িত হইয়া উঠিল। মেয়েটি দেখিতে সুশ্রী, কিন্তু বেমানান বেশভূষায় কি বিশ্রীই না লাগিতেছে ! রজনী দৃষ্টি ফিরাইল। পাশের মেয়েটা কদর্য দেখিতে। তারপর ও মেয়েটিও তাই। তাহার পাশের মেয়েটির রুচি মন্দ নয়, বেশ মানানসই বেশভূষাই সে করিয়াছে।

কখন সে ঘুরিতে ঘুরিতে মেলার রূপোপজীবিনীদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। রূপ ও সজ্জার কদর্যতা রজনীর ভালো লাগিল না, সে ফিরিল। সহসা কি খেয়াল হইল, সে প্রথম মেয়েটির নিকটে আসিয়া বলিল, ওই বেগুনি রঙের কাপড়টা ছাড়গে। বিশ্রী লাগছে দেখতে। একখানা চাঁপাফুল রঙের—

মেয়েটা ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, বল কি নাগর ? তা দাও না একখানা কিনে। দিয়ে দেখ না কেমন লাগে।

পাশের মেয়েগুলি ও সম্মুখের জনতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। রজনীর মাথার ভিতরটা চন চন করিয়া উঠিল, একটা দর্পিত ভঙ্গিতে মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া হন হন শব্দে সেখান হইতে চলিয়া গেল। আধ ঘণ্টা পরেই সে আবার ফিরিল, তাহার কাঁধে একটা বোঁচকা।

অল্পক্ষণ পরেই রূপোপজীবিনীর পল্লীটা মুখর হইয়া উঠিল, তাহারা গোল হইয়া বসিয়া রজনীর গুণগান আরম্ভ করিল, সকলের হাতে একখানা করিয়া রঙিন শাড়ি। সেই মেয়েটি চাঁপাফুলের রঙের কাপড় পরিয়া রজনীর হাতখানি ধরিয়া বসিয়া আছে। মধ্যস্থলে রজনী বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

আলোগুলি নিবিতেছিল, প্রভাত হইয়া আসিয়াছে। গত রাত্রের উৎসব-আয়োজনের অবশেষ আবর্জনা হইয়া সমস্ত মেলাটাকে কদর্য করিয়া তুলিয়াছে। উচ্ছিষ্টে আবর্জনায় পথঘাট পরিপূর্ণ, একটা বাসি দুর্গন্ধে পেটের ভিতর মোচড়

দিয়া উঠে। ভাদ্রের সজল বাতাসে মানুষের গায়ে শীত ধরিয়া উঠিতেছে। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে রজনী উঠিয়া বসিল। একটা গাছতলায় সে শুইয়া আছে। সমস্ত কাপড়-চোপড় কাদায় জলে কালো এবং ভারি হইয়া উঠিয়াছে। গালে হাত দিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ধীরে ধীরে সব তাহার মনে হইল। একবার কোমরের গেঁজেটা পরীক্ষা করিয়া দেখিল। গেঁজেটা আছে, কিন্তু শূন্য; কঠিন গোলাকার বস্তু একটাও হাতে ঠেকিল না।

উপায়? শূন্যদৃষ্টিতে সে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মাথা এখনও ঘুরিতেছে, পেটে অসহ্য ক্ষুধা। সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া সে ভাবিতেছিল, উপায়? বাড়ি ফিরিয়া যাওয়াই ভালো। কিন্তু তারপর? আর টাকা কোথায় মিলিবে? সোলা শহরে গেলেও মিলিবে, কিন্তু টাকা? এই মেলা হইতেই কোনো দিকে চলিয়া গেলে হয় না? যে কোনো দিকে? কতক্ষণ পর তীব্র রৌদ্রে শরীর তাহার জ্বালা করিয়া উঠিল। পরিষ্কার ভাদ্রের আকাশে সূর্য যেন আজ জ্বলিতেছে। রজনী উঠিয়া দাঁড়াইল। পথ আবার লোকজনে ভরিয়া উঠিয়াছে। দলে দলে মেয়ে-ছেলে মনসাতলায় পূজা দিতে চলিয়াছে। একটা পথের বাঁকে চলন্ত জনস্রোত অত্যন্ত মন্থর, পথের সঙ্কীর্ণতা হেতু ভিড়ও অসম্ভব। সম্মুখেই একদল পূজার্থিনী স্ত্রীলোক, সঙ্গে ছোট ছোট কয়েকটি ছেলে-মেয়ে। সহসা রজনীর চোখ অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল, দাতে দাঁতে আপনা আপনি যেন মৃদু ঘর্ষণ করিয়া উঠিল। কোলের কাছেই একটি ছোট মেয়ে, গলায় একগাছি সোনার বিছে-হার। হাতের আঙুলে আঙুলে সে সজোরে ঘষিতে আরম্ভ করিল।

বাঁকটা ঘুরিয়াই দুইটা পথ। রজনী চট করিয়া একটা পথে ঘুরিয়া গেল।

পিছনে শিশুকণ্ঠের একটা আর্তস্বর সমস্ত উন্মত্ত কলরবকে ছাপাইয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিল, মাগো, আমার হার! ওগো, আমার হার! আমার হার!

পথের পর পথ ফিরিয়া রজনী মেলার প্রান্তে নির্জন স্থানে আসিয়া একটা গাছতলায় হাঁপাইতে লাগিল। সর্বাঙ্গ তাহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছে বুকের ভিতর একটা সীমাহীন অসহ্য যন্ত্রণা।

চতুর্থীর দিন সে প্রতিমা সাজাইতে বসিল, বাবু নিজে আসিয়া সম্মুখে চেয়ার লইয়া বসিলেন। আপাদমস্তক অমলধবল আভরণের দীপ্তিতে প্রতিমা যেন হাসিয়া উঠিল। মাথায় শুভ্র মুকুটের উপর একটি করিয়া নীলকণ্ঠ পাখীর নীল পালক, কাঁধ হইতে প্রতিমার চরণ স্পর্শ করিয়া শরতের সাদা মেঘের মত আঁচলা, কটিতট হইতে লাল খদ্দরের কাপড়ের প্রান্তদেশে রুপার পাড়ের মত

সাদা পাড়, জমির মধ্যেও ফুল, সমস্ত কারুকার্যের সমন্বয়ে রচিত আভরণ ও সজ্জায় প্রতিমার রূপ ঝলমল করিয়া উঠিল। বাহিরে ছেলের দল মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রতিমার সজ্জা দেখিতেছিল। কয়টি ছোট ছেলে ডাক চুরির চেষ্টায় ঘুর ঘুর করিতেছে। একটি ছোট মেয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে কাতর অনুনয়ে বলিতেছিল, ডাক দাও মালাকার! ওই এমনি হার দাও!

বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এঃ হে হে! করলে কি? হাত তোমার কাঁপছে কেন হে?

মেয়েটি তখনও বলিতেছে, হার দাও মালাকার! ও মালাকার!

শেষ পর্যন্ত বাবু পরম পরিতুষ্ট হইলেন, বলিলেন, তোমার কথা আমি খবরের কাগজে লিখব। প্রতিমার ফোটো তুলে সাজের নমুনা আমি ছাপিয়ে দোব তুমি একজন উঁচুদরের কারিগর, যাকে বলে শিল্পী।

অন্যবার রজনী পনের টাকা বিদায় পাইত, এবার বাবু তাহার হাতে পচি টাকার নোট তুলিয়া দিলেন।

সমস্ত প্রতিমা শেষ করিয়া কালী সিংয়ের ঘরে আসিয়া রজনী তাহার টাকা কয় গণিয়া দিল। কালী সিং বলিল—শ্যামা ভারি রাগ করিয়েছে মিতা।

রজনী জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। কালী সিং বলিল, উ রো তুমি ওখানে আইলে ভাই, এখানে আইলে না। তুমার বন্ধুলোকভি আসিয়েছিল।

রজনী উত্তর দিবার পূর্বে শ্যামাই আসিয়া উপস্থিত হইল।

—কি গো মিতে, ভুলে গেলে নাকি?

—তাই কি ভুলতে পারি?—রজনী ম্লান হাসি হাসিল।

—তবে? সেদিন এলে না, এখনও কাপড় পেলাম না আমরা!

—কাপড় এবার আর পারলাম না মিতেনী। আর পারবও না।—সে হাতজোড় করিল।

—বটে, তামাসা হচ্ছে বুঝি! দেখি, তোমার বোঁচকা দেখি!—শ্যামা নিজেই বোঁচকাটা টানিয়া লইয়া খুলিয়া ফেলিল। সবিস্ময়ে বলিল, একি এ যে সব ছোট ছেলেমেয়েদের জামা! এ কি হবে?

রজনী হাসিয়া বলিল, এবার থেকে মামণি খুকুমণিদের সাজাব মিতেনী! তোমাদের তো সাজালাম অনেকদিন।—বলিয়া সে বিচিত্রবর্ণের ঝলমলে ছোট ছোট জামাগুলি বহুমূল্য বস্তুর মত সযত্নে গুছাইয়া তুলিতে আরম্ভ করিল।

সুখনীড়

গোলাকার কক্ষপথে পৃথিবী চক্রাকারে একটি নির্দিষ্ট গতিতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে, দিনের পর পৃথিবীর বুকে আসে রাত্রি, গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা, মোট কথা একটি সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা সেখানে বিরাজমান; আকস্মিকতার স্থান সেখানে নাই। কিন্তু পৃথিবীর বুকের মধ্যে আর একটি চক্র অহরহ আবর্তিত হইতেছে, তাহার গতি যেমন অনির্দিষ্ট, আকস্মিকতার সংস্থান তাহার মধ্যে তেমনই অভিনব। এই আকস্মিকতার আঘাত যেমন প্রচণ্ড, বৈচিত্র্যও তেমনই প্রচুর। এ চক্র মানুষের ভাগ্যচক্র। আঙ্কিক নিয়মে এ চক্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত নয়।

নতুবা সনকা ও মণিমালার চারি বৎসরের মধ্যেই দেখা হইবার কথা নয় এবং হিসাব-নিকাশ অনুযায়ী কলিকাতাও দেখা হইবার স্থান হইতে পারে না। কিন্তু কলিকাতার এক রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহে তাহাদের উভয়ের দেখা হইয়া গেল। সনকা যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল পৃথিবীর পূর্ব দিগন্ত লক্ষ্য করিয়া আর মণিমালা চলিয়াছিল পশ্চিমমুখে। সনকার স্বামী রেঙ্গুনে ব্যবসা করিতেন—বিবাহের পরই সনকা স্বামীর সঙ্গে রেঙ্গুন চলিয়া গেল। সনকা সেদিন মণিমালার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল, আর জীবনে হয়ত দেখা হবে না বকুল।

মণিমালাও অঝোর ঝরে কাঁদিয়াছিল।

সনকার বিবাহের মাস আষ্টেক পর মণি যাত্রা আরম্ভ করিল। তাহার স্বামী তখন সদ্য লাহোর কলেজে অধ্যাপকের পদ পাইয়াছেন। বিবাহের তিন দিন পরই তিনি মণিমালাকে সঙ্গে লইয়া লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মণিমালা সেদিন সনকার মাকে প্রণাম করিবার সময় সনকার জন্য কাঁদিয়াছিল, বলিয়াছিল, আর বোধহয় বকুলের সঙ্গে দেখা হবে না।

কাঁদিবার যে কথা। তিন বৎসর বয়সে তাহারা 'বকুল' পাতাইয়াছিল। তাহার পর প্রতিদিন উদয়াস্ত কাল তাহারা দুইজনে একসঙ্গে হাসিয়াছে, কাঁদিয়াছে, আড়ি করিয়াছে, ভাব করিয়াছে—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কত জল্পনা-কল্পনা করিয়াছে, জীবনে বিচ্ছেদ হইলে দুইজনেই জল বিনা মীনের মত বাঁচিবে না, এমন কথাও বলিয়াছে।

বাংলার অত্যন্ত সাধারণ এক পল্লীগ্রামে পাশাপাশি বাড়ির দুই মেয়ে দুই বাড়ির সম্মুখের খোলা জায়গার উপর যে বকুলগাছটি আছে, তাহার তলে আসিয়া

খেলাঘর পাতিত। কোনোদিন হইত মা ও মেয়ে, কোনোদিন হইত শাশুড়ী ও বউ, কোনোদিন হইত বর ও কনে। কোনোদিন বা পরস্পরকে মারিয়া ধরিয়া দুইজনে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি ফিরিত। একদিন দুজনেরই জননীদ্বয় একই মুহূর্তে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আপন আপন মেয়েকে খাওয়ার সময় ধরিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন। মেয়ে দুইটি সেদিন সাজিয়াছিল বড়বউ আর ছোটবউ, দুইজনেই আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া নির্বাক হইয়া বসিয়া ছিল।

দুই জননীই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। তারপর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কে তোমার ?

—ও বল বউ।

—ও থোত বউ।

অকস্মাৎ দুই জননীর মধ্যে একজনের মাথায় কি খেলিয়া গেল, তিনি আপন মেয়েকে বলিলেন, না, তুমি ওকে বলবে বকুল, বকুলতলায় তোমাদের দুজনের ভাব—তোমরা দুজনে দুজনের বকুল।

অপর জননী সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিলেন, বেশ বলেছ ভাই! ভারি সুন্দর হবে। সনকা—বল—মণিকে বল বকুল।

সনকা মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—উঁ ?

—মণি তোমার বকুল হয়, বল তো—বকুল !

—বকুল !

মণিকে আর শিখাইয়া দিতে হইল না, সনকার শিক্ষা হইতেই তাহার শিক্ষা হইয়া গিয়াছিল, সেও বলিল, বকুল !

সন্ধ্যায় মণিদের বাড়ির ঝি থালায় মিষ্টান্ন, রঙিন কাপড় এবং বকুলফুলের মালা লইয়া সনকাদের বাড়ি তত্ত্ব লইয়া আসিল। পরদিন প্রাতঃকালেই মণিদের বাড়ি মণির বকুলের তত্ত্ব আসিয়া পৌঁছিয়া গেল। তারপর নিবিড় অন্তরঙ্গতার মধ্যে দুটি সখি ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছিল। কৈশোরের প্রারম্ভে দুইজনে গোপনে পরামর্শ করিত—আমাদের ভাই দুজনের বিয়ে কিন্তু এক বাড়িতে হওয়া চাই। এক বাড়িতে দুই ভাইয়ের সঙ্গে।

মণি বলিত, না ভাই, এক মায়ের দুই ছেলে হলে হবে না। দুই খুড়তুতো জাঠতুতো ভাই। দেখিস নি—আমার মেজদা—আর মেজখুড়ীর ছেলে সেজদার কেমন ভাব ? ওদের বউদের কেমন ভাব দেখেছিস তো ! এ ওকে বলে তুই—ও একে বলে তুই।

সনকা পুলকিত হইয়া বলিত, হ্যাঁ ভাই।

কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা তাহাদের পূর্ণ হইল না। ভাগ্যচক্রের চক্রান্তে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ একদিন সনকার বিবাহ হইয়া গেল। পাত্রটি এই গ্রামেরই ভাগিনেয়। বাল্যকালে এই ছেলেটির নাম করিতেও লোকে শিহরিয়া উঠিত। পনরো-ষোল বৎসর বয়সে একদিন সে স্কুলের শিক্ষকদের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া একজন শিক্ষককে নির্দয়ভাবে প্রহার করিয়া দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। তারপর কেমন করিয়া সুদূর ব্রহ্মদেশে গিয়া হাজির হয়—সে কথা এখানে অবান্তর। সেখানে সে প্রথমে আরম্ভ করে এক বাঙালীবাবুর ঘরে পাচক ব্রাহ্মণের কাজ, তারপর হয় সে ফেরিওয়ালা, তারপর হয় দোকানদার। ক্রমে কয়লার ডিপো, কাঠের গোলা, পুরাতন লোহালক্কড় লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে সে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হইয়া উঠিল। তারপর দীর্ঘকাল পরে অকস্মাৎ একদিন সে হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট পরিয়া প্রচুর ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের হিসাব লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। সমগ্র দেশটা তাহার প্রশংসায় হইয়া উঠিল পঞ্চমুখ। দূর দূরান্তরের আত্মীয়স্বজনেরা মিনতি করিয়া পরম আবেগপূর্ণ ভাষায়, তাহাকে দীর্ঘদিন না দেখার বেদনা জানাইয়া একবার দেখা দিতে, পদধূলি দিতে আমন্ত্রণ জানাইল। সেইরূপ একটি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সে একদিন এই গ্রামটিতে মাতুলালয়ে আপনার নূতন মোটর হাঁকাইয়া আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু লোকে বলিল তাহাকে টানিয়া আনিল সনকার অতি-প্রসন্ন ভাগ্যদেবতা, ভাগ্যচক্রের খেয়ালী পরিচালক। কারণ সে সনকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল এবং বিনা পণেই নিজে উপযাচক হইয়া বিবাহ করিয়া ফেলিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা—পাত্রটির কি খুড়তুতো কি জাঠতুতো সমবয়সী ভাই না থাকিলেও সনকা বিন্দুমাত্র আপত্তি করিল না! অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে আপনার ভাগ্যকে অভিনন্দিত করিয়া সে হরেন্দ্রর হাতে হাত মিলাইয়া আত্মসমর্পণ করিল। মণিমালাও কোনো অভিমান করিল না, সে সনকার বরকে নানা কৌতুক রহস্যে বিব্রত করিয়া তুলিল। হরেন্দ্র কয়েকদিন পরই সনকাকে লইয়া চলিয়া গেল রেঙ্গুন।

মাস আষ্টেক পর মণিমালারও বিবাহ হইয়া গেল। পূর্বেই বলিয়াছি, পাত্রটি তখন লাহোর কলেজে সদ্য সদ্য অধ্যাপকের পদ পাইয়াছে। মনীশ নামকরা কৃতি ছাত্র, মণিমালার বাপ অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া মনীশের মত পাত্র সন্ধান করিয়াছিলেন। বিবাহের পরই তিনদিনের দিন মণি মনীশের সহিত চলিয়া গেল লাহোর।

তারপর, চার বৎসর পর অকস্মাৎ দুজনেরই আবার দেখা হইয়া গেল

কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে। সেদিন নূতন নাটক মণিহারের উদ্বোধন রজনী। সনকা আসিয়া মেয়েদের বসিবার জায়গায় প্রথম শ্রেণীতে আসন গ্রহণ করিল। সনকা বেশ একটু মোটা হইয়াছে—পরনে তাহার বেনারসী শাড়ি, হাতে একহাত জড়োয়া চুড়ি, গলায় হীরার কণ্ঠি—উজ্জ্বল আলোকের প্রতিভাতিতে ঝকঝক করিতেছে। সঙ্গে পানভরা মস্ত একটা রুপার বাক্স। থিয়েটারের ঝি-টা তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তাড়াতাড়ি বসিবার আসনখানি ঝাড়িয়া দিয়া বলিল, আমি আজ ঠিক জানতুম যে, মা আমার আসবেন।

সনকা হাসিয়া বলিল, তুমি একটা কাজ কর দেখি, আমাদের গাড়িটা চেন তো! গিয়ে সায়েবকে বলে দাও, থিয়েটার ভাঙবার আগেই যেন আসেন, আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।

ঝি তাড়াতাড়ি সনকার আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য ছুটিল। নীচে প্রেক্ষাগৃহে ভিড় জমিয়া গিয়াছে। যাইবে না কেন, মণিহারের লেখক যে নাম করা লেখক—বিদ্বান ব্যক্তি। মেয়েদের আসনেও যথেষ্ট ভিড়। প্রথম শ্রেণীতে সনকা লক্ষ্য করিল, অনেকগুলি মাত্র মহিলা বসিয়া আছেন। সহসা সে লক্ষ্য করিল, ও পাশ হইতে একটি বেশ ফ্যাসানদুরস্ত মেয়ে তাহাকে ঘন ঘন তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছে। মেয়েটি দেখিতে বেশ, এবং বেশভূষা প্রসাধনে বেশ একটু আধুনিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সনকা মুখ ফিরাইয়াও হাতের জড়োয়া চুড়িগুলি বেশ করিয়া বাহির করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পর আবার একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিল, মেয়েটি তাহাকে দেখিতেছে। এবার সনকার মনে হইল, এ যেন চেনা মুখ। তবুও সনকার তাহাকে ভালো লাগিল না। উহার ঐ আড়ম্বরহীন অথচ বৈশিষ্ট্যযুক্ত বেশভূষা তাহার এই ঐশ্বর্যময়ী দেহসজ্জাকে ব্যঙ্গ করিতেছে—মেয়েটির দৃষ্টির মধ্যেও যেন কৌতুক রহিয়াছে বলিয়া মনে হইল।

সনকা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বেশ একটু রূঢ়ভাবেই বলিল, কি দেখছেন এমন করে আমার দিকে তাকিয়ে?

মেয়েটি এবার উঠিয়া আসিয়া সনকার পাশের আসনটা দখল করিয়া বসিয়া বলিল, দেখছি আপনাকে। আপনার গয়না নয়।

সনকা মনে মনে রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল, কিন্তু এই প্রকাশ্য আসরে সেটুকু বাধ্য হইয়া গোপন করিয়া বলিল, কথামালার একটা গল্প মনে পড়ে গেল আমার। সেই একটা শেয়াল বলেছিল—আঙুর টক।

মেয়েটি সনকার বাক্য-বিষ গায়েই মাখিল না, বেশ হাসিমুখেই বলিল, আপনাকে আমার ভারি ভালো লাগছে। কিছু পাতাতে ইচ্ছে করছে ভাই।

—বেশ তো, কি পাতাবেন ? চোখের বালি ?

—না ভাই ; বেশ মিষ্টি কিছু, ধরুন—বকুল।

সনকা এবার বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিল। মেয়েটি আবার বলিল, কিংবা আজ মণিহার দেখতে এসেছি—মণিমালা পাতাই দুজনে।

সনকা হা হা করিয়া হাসিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিল, মর—মর তুই মর। এত রঙ্গও তুই করতে পারিস !

মণি বলিল, আর তুই মুটকি আরও খানিকটে মোটা হ, তবেই আরও চিনতে পারব।

সনকা মনের পুলকে হা হা করিয়া হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িল। মণি বলিল, তবু আমি তোকে চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু ভাবছিলাম, বকুল এখানে কেমন করে আসবে, তারা থাকে রেঙ্গুনে ! তারপর, কবে এলি এখানে, বল।

সনকা চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, কবে মানে ? আমরা তো এখন কলকাতাতেই ; এখানেই বাড়ি করেছি, এখানেই এখন ওর আপিস ! আট মাস হয়ে গেল এখানে আসা।

—আট মাস !—মণিমালার বিস্ময়ের যেন অন্ত ছিল না।

সনকা এবার প্রশ্ন করিল, আমারও চেনা চেনা মনে হচ্ছিল, কিন্তু লাহোরের পণ্ডিত-পণ্ডিতানী এখানে কেমন করে আসবেন, ভেবেই পাই না।

মণি বলিল, ওমা, আমরাও যে এক বছরের ওপর এখানে এসেছি। পণ্ডিত মহাশয় না কি বললি—তিনি যে এখন এখানে পণ্ডিতি করছেন !

—বলিস কি ? বাসা কোথায় লো ?

—বালিগঞ্জে।

—বালিগঞ্জে ? ওমা, আমি যাব কোথায় গো ? ও উনোনমুখী, আমার বাড়িও যে বালিগঞ্জে !

মণি এবার বলিয়া উঠিল, এইবার আমি বলছি—তুই মর—মর—মর। তুই পোড়ারমুখীই তো চিঠি লেখা বন্ধ করেছিস !

সনকা কথাটা এড়াইয়া গিয়া বলিল, যাকগে মরুকগে—কি বলে যে সেই—গতস্য শোচনা নাস্তি ! দেখা তো হল। ভাগ্যে আজ তুই থিয়েটার দেখতে এসেছিলি ! আমি তো প্রায় আসি—এক-একটা বই আমার দুবার তিনবার দেখা !

মণি বলিল, আমিও তো মাঝে মাঝে আসি। কিন্তু আশ্চয্যি, এতদিন দেখা হয় নি !

সনকা এবার বলিল, তোর পণ্ডিতজী কই? দেখা না ভাই! কেমন হল পণ্ডিতজী তোর—বল। আমি তো দেখি নি!

মণি বলিল, নেই, এখন নীচে। দাঁড়া, থিয়েটার আরম্ভ হোক, দেখাব।

সনকা প্রশ্ন করিল, কেমন ভালোবাসে লো তোকে? প্রতাপের মত, না চন্দ্রশেখরের মত?

—ওদের কারও মতই না।

—তবে?

বেশ সলজ্জ অথচ গৌরবের সহিত মণি বলিল, সে বলিস নে ভাই। মালা মালা করেই পণ্ডিতজী আমার পাগল। মণিমালা আর ফুলের মালা। ঘরে মণিমালা আর বাইরে ফুলের মালা!

—বলিস কি লো? বাইরে ফুলের মালা কি লো? কার কাছ থেকে ফুলের মালা নেয়, তুই ছাড়া!

—যে দেয়। এখন তোর কথা বল। তোর তিনি কই?

সনকা বলিল, তাঁর কথা আর বলিস নে। তিনি আবার সায়েব। তবে ধারা ঐ এক। শুধু সোনা—সোনা আর সোনা। আমার নাম দিয়েছে সোনা, আর বাইরে দিন-রাত্রি সোনা—টাকা—নোট—এই কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য মানুষ ভাই, যদি কোনোদিন কিছুতে মন-খারাপ হল, হয়ত মুখ নামিয়ে আছি—সন্ধ্যার সময় একখানা গয়না এনে হাজির। যদি বলি—ও কেন? উত্তর হল, মুখ ভার করেছিলে যে!—পুলকিত তৃপ্তির হাসিতে সনকার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মণি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কই ভাই, তোর সায়েব কই?

সনকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, সায়েব লোকে আবার বাংলা থিয়েটার দেখে! বললাম যে, আশ্চর্য মানুষ। বলে কি—হ্যাঃ, ও রাবিশ আবার দেখে! কিছুতে আসে না ভাই। আমি থিয়েটার দেখতে আসি—আমায় নামিয়ে দিয়ে সায়েব হয় ইংরিজী বই দেখতে যায়, নয়ত কোনো বন্ধু—তাও অধিকাংশ সায়েব—তাদের ওখানে যায়। আবার ঠিক থিয়েটার ভাঙবার আগেই গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হয়। আজও আমায় নামিয়ে দিয়ে কোনো সায়েবের ওখানে গেল। সেই শেষ হবার সময় আসবে আবার।

মণি এবার প্রশ্ন করিল, ছেলেপিলে কি তোর?

—তোর?

—আমার?—মণিমালা না-এর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িল।

—হয় নি এখনও?

—না। তোর ?

—দুটি হয়ে মারা গেছে।—সনকা এতক্ষণে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ওদিকে ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চের যবনিকা অপসারিত হইতেছিল—পাদ-প্রদীপগুলি তখন সারি সারি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দর্শকমণ্ডলী আপন আপন স্থানে একে একে আসন গ্রহণ করিতেছিল।

সনকা বলিল, এই ভদ্রলোকের লেখা আমার এত ভালো লাগে ভাই—কি বলব তোকে।

মণি একটু হাসিল।

যবনিকা সম্পূর্ণ অপসারিত হইতেই রঙ্গমঞ্চের উপর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া সবিনয়ে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্বে একটি বিশেষ কর্তব্য আমরা আজ পালন করব, তারপর অভিনয় আরম্ভ হবে। সে কর্তব্য মাত্র আমাদের অর্থাৎ রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং অভিনেতাদেরই নয়—সে কর্তব্যে আপনাদেরও দায়িত্ব আছে। আজ আমরা আমাদের বঙ্গ রঙ্গালয়ে প্রতিভাবান নাট্যকার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনীশ মুখোপাধ্যায় মশায়কে সম্মান প্রদর্শন করব। শ্রীযুক্ত মনীশবাবুর প্রতিভার পরিচয় আপনাদের মত নাট্যামোদীদের কাছে দিতে যাওয়া বাহুল্য। তবুও বলব, তাঁর প্রথম নাটক 'অরুণালোক' আমাদের নাট্যজগতে সত্য সত্যই অরুণালোক। আজ আবার তাঁর নূতন নাটক 'মণিহার' অভিনীত হবে—আশা করি 'মণিহার'—বঙ্গবাণীর কণ্ঠে মণিহার রূপে শোভা পাবে।

সমস্ত দর্শকমণ্ডলী আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল। তারপর নাট্যকার অধ্যাপক মনীশ মুখোপাধ্যায় আসিয়া দর্শকমণ্ডলীকে অভিবাদন করিতেই পুনরায় করতালিধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে মালা পরাইয়া দিলেন। দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে কয়জন মাল্যদানে নাট্যকারকে অভিনন্দিত করিল।

সনকা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল। মণি মৃদু হাসিয়া বলিল, দেখলি ?

—কি ?

—ফুলের মালা কুড়োনোর ধুম! বলছিলাম না, মণিমালা আর ফুলের মালা, এই হল পণ্ডিতজীর বাতিক!

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সনকা এবার প্রশ্ন করিল, উনিই তোর বর ?

গৌরবের হাসি হাসিয়া বলিল, উনিই আমার পণ্ডিতজী!

মণি আবার হাসিয়া বলিল, বাতিকের কথা আর বলিস নে ভাই। কোনো দিন সন্ধ্যেতে যদি মানুষ বাড়িতে দুদণ্ড স্থির থাকল। আজ এখানে সভা, কাল ওখানে থিয়েটারে ওঁর বই হচ্ছে, পরশু কোনো জায়গায় অভিনন্দন—আর ফিরে এসে ঘুমন্ত আমাকে ঠেলে তুলে ফুলের মালার বোঝা গলায় চাপিয়ে দেবে!

সনকা কোনো উত্তর দিল না, সে রঙ্গমঞ্চের দিকে চাহিয়াছিল—আবার ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চের যবনিকা অপসারিত হইতেছিল! অকস্মাৎ সাদা আলো নিবিয়া প্রগাঢ় নীলবর্ণের আলোকধারায় স্নান করিয়া রঙ্গমঞ্চের মধ্যে বিচিত্র দৃশ্য আত্মপ্রকাশ করিল। অভিনয় আরম্ভ হইল।

প্রথম অঙ্ক শেষে সনকা হাসিয়া বলিল, পণ্ডিতজীকে আমার প্রণাম জানাস ভাই! উঃ, কত বড় বিদ্বান লোক!

মণি হাসিয়া বলিল, বলিস কি? প্রণাম? সে তুই নিজে জানাস ভাই।

সনকা বলিল, বেশ, কবে আমার ওখানে আনছিস বল? আমার বিয়ে আগে হয়েছে—ঘর আমার আগে—সুতরাং আমার বাড়ি নেমন্তন্ন আগে রাখতে হবে।

মণি বলিল, দাঁড়া ভাই, পণ্ডিতজীর আবার অবসর দেখতে হবে। সভা-সমিতি থাকলে তো হবে না।

সনকা অকস্মাৎ হাসিয়া বলিল, এদের দুজনে বেশ মিলবে কিন্তু! একজন বলবেন—কয়লার দর যা চড়েছে আজ বুঝলেন! উনি বলবেন—রবিবাবুর ওই কবিতাটা পড়েছেন আপনি?

ঝিটা আসিয়া বলিল, কই গো বড়মা—আজ যে আপনার কিছু অর্ডার হল নি? কি আনব বলুন?

সনকা বরাত করিল চা ও কিছু খাবারের।

সনকা খাবার তুলিয়া মণির পাতে দিতেছিল—হাত নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের চুড়িগুলি হইতে আলোক-প্রতিচ্ছটা চারিদিকে জলকণার মত ছড়াইয়া পড়িতেছিল। মণি প্রশ্ন করিল, চুড়িতে তোর কি পাথর ভাই বকুল?

সনকা বলিল, হীরে। বলিস কেন—গয়না গয়না একটা বাতিক। কত টাকা যে গয়নাতে বন্ধ হয়ে রয়েছে তার হিসেব নেই। আর একটা চপ নে ভাই।

মণি বলিল, না না ভাই কিছু ভালো লাগছে না আমার। আর দিস নে।

পঞ্চম অঙ্কের শেষ হইতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল, ঝিটা আসিয়া সনকাকে ডাকিল, মা, বাবু গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাকে—

সনকা তখন নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতির বেদনায় অভিভূত হইয়া ঝর

ঝর করিয়া কাঁদিতেছিল সে বিরক্ত হইয়া বলিল, দাঁড়াতে বল গে। এখনও খানিকটা দেরি আছে।

ঝি চলিয়া গেল। সনকা আপন মনেই বলিল, এমন কাঠখোট্টা মানুষ তো আমি দেখি নি!

বর্ষার মেঘাবৃত আকাশ অকস্মাৎ একদিন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া যেমন শরতের প্রসন্ন স্বর্ণালোকে ধরিত্রী হাসিয়া ওঠে, ঠিক তেমনই করিয়া নাটকের সমস্ত বিয়োগসম্ভাবনা ব্যর্থ করিয়া দিয়া অতি সুষ্ঠু এবং সহজভাবে মিলনান্ত হইয়া নাটক শেষ হইল। রাজকন্যা দরিদ্রের গলায় মণিহার পরাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা নামিতে আরম্ভ করিল।

সনকা উঠিয়া মুগ্ধচিত্তে মণিকে বলিল, সত্যিই, তোর পণ্ডিতজীকে আমার প্রণাম। একদিন আমার বাড়িতে আসতে হবে।

মণি বলিল, বেশ।

কথা বলিতে বলিতেই দুজনে নীচে নামিতেছিল। পথের উপর গাড়ি রাখিয়া অধীর আগ্রহে দাঁড়াইয়া হরেন্দ্র সাহেব সিগারেট টানিতেছিল। সনকা হাসিয়া বলিল, ওই যে আমার সায়েব। আয়, আলাপ করিয়ে দি। সুদৃশ্য ঝকঝকে প্রকাণ্ড মোটরখানার কাছে আসিয়া সনকা বলিল, শুনছেন মিস্টার চ্যাটার্জি?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হরেন্দ্র বলিল, এস—এস।

—শুনুন মশায়! আগে একে নমস্কার করুন। ইনি আমার বকুল, যিনি বাসর ঘরে আপনার—মনে পড়েছে—কর্ণ কি করে দিয়েছিল!

মণিমালা হাসিল। হরেন্দ্র অত্যন্ত প্রীতির সহিত বলিল, নমস্কার। ভালো আছেন আপনি? আপনার সে কানমলা ভারি মিষ্টি! খুব মনে আছে আমার।

—এই যে, তুমি এখানে—অধ্যাপক মনীশবাবু রাশিকৃত ফুলের মালা হাতে লইয়া মণির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সনকা প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মণি বলিল, ইনি আমার সেই বকুল। আর বকুল, ইনি আমার পণ্ডিতজী!

মনীশবাবু সবিনয়ে নমস্কার করিয়া বলিল, বহু ভাগ্য আমার আজ! আপনার দর্শন পেলাম।

মণি আবার বলিল, আর ইনি মিস্টার চ্যাটার্জি—আমার বকুলের বর।

মনীশবাবু চ্যাটার্জির মুখের দিকে চাহিয়াই গম্ভীর হইয়া গেল। চ্যাটার্জি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মনীশের দিকে চাহিয়া ছিল।

সনকা মৃদুস্বরে স্বামীকে বলিল, আঃ, সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আলাপ কর না।

মনীশবাবু তাড়াতাড়ি নমস্কার করিয়া বলিল, ভারি সুখী হলাম মিস্টার চ্যাটার্জি!

হরেন্দ্র হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া বলিল, আচ্ছা, আজ তাহলে আসি।

সনকা গাড়িতে উঠিয়া বলিল, তাহলে আমার বাড়িতে একদিন আসতে হবে ভাই বকুল।

নতুন গাড়িটা জলের উপর নৌকার মত যেন পিছলাইয়া চলিয়া গেল। মনীশবাবু একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া মণিকে লইয়া চড়িয়া বসিলেন।

গাড়িতে উঠিয়া মণি বিরক্তিভরে বলিল, উঃ! ছি, আবার তুমি আজ খেয়েছ? মনীশবাবু তাড়াতাড়ি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া বলিল, আমায় মাফ কর মণি। ও জন্যে আমায় আর কিছু তুমি বল না। বলেছি তো মজলিসে—আসরে—থিয়েটারে যাই, বন্ধু-বান্ধব—শিল্পী—এমনই বিশিষ্ট লোকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে। ঠেলতে পারি নে। আর ঠেলাটাও অভদ্রতা হয়।

মণি চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে অকস্মাৎ সে বলিয়া উঠিল, ভাগ্যবতী আমার বকুল। ধন, ঐশ্বর্য, বাড়ি-ঘর—গাড়ি-গয়না কিছুর অভাব নাই—অনুগত স্বামী।

মনীশ হাসিয়া বলিল, অনুগত স্বামী!

মণি ঈষৎ তপ্তস্বরে বলিল, হাসলে যে! জান, বকুল মুখভার করলে সে পৃথিবী অন্ধকার দেখে। সঙ্গে সঙ্গে কোনো না কোনো গয়না সে এনে দেয়। ওর হাতের জড়োয়া চুড়িগুলি দেখেছ? আলো যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে! সমস্তগুলো হীরে।

মনীশ এবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ওগুলো তোমার বকুলের দুর্ভাগ্য মণি।

মণি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, তোমার কথার ঐ এক ধারা! ধন অলঙ্কার কখনও দুর্ভাগ্য হয়?

মনীশ বলিল, ধন অলঙ্কার দুর্ভাগ্য নয়, কিন্তু তোমার বকুলের ভাগ্যে ওগুলো সত্যিই দুর্ভাগ্য! তোমার বকুলের স্বামী ওই মিস্টার চ্যাটার্জিকে আমি ভালো করে জানি। থিয়েটারের অভিনেত্রী মহলে এবং কলকাতার বিশিষ্ট পাড়ায় লোকটি পরম সম্মানিত ব্যক্তি। ওঁর প্রসাদ তারা অনেকেই পেয়েছে। ভদ্রলোক

এই সেদিন থিয়েটারেরই সুরমা বলে একটি সুন্দরী শক্তিশালিনী অভিনেত্রীকে থিয়েটার ছাড়িয়ে অর্থবলে আয়ত্তাধীনা করেছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে খোঁজ করলেই ওঁকে পাওয়া যায়।

মণি স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পর সে বলিল, কিন্তু বকুলকে দেখে তো তা মনে হল না। স্বামীর কথা বলতে সে যে অজ্ঞান!

মনীশ বলিল, হাসি দিয়ে দুঃখ ঢাকতে মানুষকে তো শেখাতে হয় না মণি, বিশেষ যেখানে মানুষ সে দুঃখের জন্য পরের কাছে খাটো হয়; কিংবা হয়ত সত্যি সত্যিই তোমার বকুল এ কথা জানেন না, দুর্ভাগিনী উনি—ধন অলঙ্কারের মোহেই অন্ধ হয়ে আছেন—দেখতে পান না।

মণি স্বামীর কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া বলিল—উঃ, মা গো! দাঁড়াও আমি বকুলকে বলছি।

শিহরিয়া উঠিয়া মনীশ বলিল, না না না, মণি এমন কাজ তুমি কর না। কেন তার সুখের ঘর ভেঙে দেবে! জীবনে অশান্তি এনে দেবে!

মণিও শিহরিয়া উঠিল, বলিল, তা সত্যি!

বাড়ি পৌঁছিয়া সনকা হরেন্দ্রকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। হরেন্দ্রর মদ্যপানের মাত্রা সেদিন অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছিল। বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া, মাথায় ওডিকলনের জল দিয়া হাওয়া করিতে করিতে সনকা ছল ছল চোখে বলিল, আমি এবার বিষ খেয়ে মরব।

হরেন্দ্র ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, সোনা, সোনামণি আমার, আমি তাহলে মরে যাব। মরে যাব—সত্যি বলছি মরে যাব।

সনকা বলিল, কেন তুমি ওগুলো খাও?

হরেন্দ্র শুধু কাঁদিতেই থাকিল—না না সোনা—বিষ খেয়ো না—মরে যেয়ো না!—

সনকা আবার ওডিকলনের জল মাথায় দিয়া ফ্যানটার গতিবেগ বাড়াইয়া দিল।

পরদিন প্রাতঃকালে স্বামীর সহিত চা খাইতে বসিয়া সনকা বলিল, কাল কি কাণ্ডটা করেছ মনে কর দেখি! কেন তুমি ওগুলো খাও?

হরেন্দ্র চায়ের কাপে চামচ নাড়িতে নাড়িতে বলিল, ও কথা তুমি বাদ দাও সোনা। জেনে শুনে তুমি বারবার এই কথা বল, এই আমার দুঃখ। সায়েব-সুবার সঙ্গে আমার কারবার—তারাই আমার বন্ধু। মদটা হল তাদের চায়ের মত। কাজেই না খেলে চলে না।

সনকা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সর্বসুখী [illegible]মে আমার বকুলকে। বিদ্বান স্বামী—লোকের মুখে মুখে প্রশংসা—মণি বলতে বেচারা অজ্ঞান—

হা-হা করিয়া অট্টহাস্যে হরেন্দ্র সনকার কথার শেষাংশ ঢাকিয়া দিল। সনকা বিরক্তিভরে বলিল, তুমি হাসছ কেন? পাগল হলে না কি?

হরেন্দ্র বলিল, আরে, ওই লাট্যকার নাকি বলে, ওই বেটা? আরে দূর দূর! বেটা পয়লা নম্বরের মাতাল আর চরিত্রহীন। থিয়েটারের অ্যাকট্রেস-গুলোর ছি-চরণের ছুঁচো! কিছুদিন আগে থিয়েটারের সুরমা বলে অ্যাকট্রেসকে নিয়ে যা ঢলাঢলি করলে, আরে রাম-রাম!

সনকা অবাক হইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্র আবার বলিল, আমাদেরই এক হার্ডওয়ার মার্চেন্ট—সে লোকটা খুব পয়সাওয়ালা—সে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। নইলে দেখতে ওটা এতদিন সেইখানেই দিনরাত পড়ে থাকত। আমি জানব কি করে! আমাকে বললে পুলিশের এক বড় সাহেব। ব্যাপারটা পুলিশের কানেও উঠেছিল। বললে, চ্যাটার্জি, তোমাদের দেশের কি ব্যাপার? একজন প্রফেসর—নামজাদা লেখক—সে এমনধারা মাতাল আর চরিত্রহীন—ছি-ছি-ছি! আমি তো লজ্জায় মাথা হেঁট করে রইলাম।

সনকা অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিল, কিন্তু বকুলকে দেখে তেমন তো কিছু বুঝতে পারলাম না!

হরেন্দ্র বলিল, বেশ! সে হয়ত জানেই না। স্বামী বিদ্বান—নামজাদা লেখক—এতেই হয়ত সে ভুলে আছে!

সনকা চুপ করিয়া রহিল। হরেন্দ্র বলিল, তা একরকম ভালো। না জেনে শান্তিতে আছে—সেও মন্দের ভালো! তুমি যেন বল-টল না!

সনকা বলিল, হ্যাঁ, সেও মন্দের ভালো।

হরেন্দ্র টেলিফোনটা তুলিয়া ডাকিল, কে? ঘোষ কোম্পানি—জুয়েলার্স? দেখুন জড়োয়া ব্রোচ একখানা পাঠিয়ে দিন তো—হ্যাঁ এই দশটার মধ্যে।

অপরাহ্নে অধ্যাপক মনীশবাবু সাজসজ্জা করিতেছিল। কোথায় একটা সভা হইবে সেখানে তাহাকে সভাপতিত্ব করিতে হইবে। মণিমালা নিজের হাতে কাপড়-চাদর কোঁচাইয়া রাখিয়াছে। প্রত্যহই সে রাখে। মনীশ জামা গায়ে দিতেই সে নিজে সযত্নে চাদরখানি তাহার গলায় তুলিয়া দিল। মনীশ তাহাকে সাদরে কাছে টানিয়া চুম্বন করিয়া কহিল, বল কি আনিব বালা?

মণি হাসিয়া উত্তর দিল, রাজকণ্ঠের মালা!

এটুকু তাহাদের নিত্যকার অভিনয়। মনীশ বাহির হইতে গিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, উঃ ভয়ঙ্কর মেঘ করেছে! ছাতি আর বর্ষাতিটা নিতে হবে দেখছি।

মণি তাড়াতাড়ি ছাতি ও বর্ষাতি আনিয়া দিল। মনীশ বাহির হইয়া গেল। মণি জানালায় বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। বালিগঞ্জের নির্জন পল্লীপথ প্রায় জনহীন। একটা তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দে মোটরের হর্ন বাজিয়া উঠিল। মণি দৃষ্টি অবনমিত করিয়া দেখিল প্রকাণ্ড নূতন ঝকঝকে মোটর একখানা দ্রুতবেগে চলিয়াছে।

ঠিক সনকাদের মোটরটার মত—তেমনই বড়, হর্নের শব্দও তেমনই—সেটাও বটে! হয়ত চ্যাটার্জি চলিয়াছে অভিসারে! অকস্মাৎ মণির মন বেদনায় ভরিয়া উঠিল। হায় বকুল, দুর্ভাগিনী বকুল, সে হয়ত নিশ্চিন্ত মনে ঘরে বসিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জড়োয়ার চুড়িগুলি দেখিতেছে!

ঠিক সেই সময়েই সনকাও বসিয়া মণির কথা ভাবিতেছিল। চ্যাটার্জি বাড়িতে নাই—খিদিরপুরে কোন সাহেবের সঙ্গে একটা বড় ব্যবসায়ের কথা আছে—সেখানে গিয়াছে, ফিরিতে রাত্রি হইবে। একা বসিয়া থাকিতে থাকিতে সেও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতেছিল, হায় দুর্ভাগিনী বকুল, তুই তো জানিস নে ভাই—কি কালকূটভরা ফুলের মালা মনীশ নিত্য তোর গলায় পরাইয়া দেয়!

তাহার চোখ ভরিয়া জল আসিল। আশ্চর্য, হঠাৎ যেন তাহার মন মণির দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া খানিকটা তৃপ্তিতেও ভরিয়া উঠিল! অহেতুকী তৃপ্তি!

আকাশে মেঘ ঘন হইয়া উঠিয়াছে। মণি মুখ বাঁকাইয়া সনকার আভরণ-রাশিকে উপহাস করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিছানা পাতিতে হইবে—এই বিছানা-পাতা কাজটি সে নিজে হাতে করে—অপরের হাতে পাতা বিছানাতে শয়ন করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না।

অকস্মাৎ তীব্র নীল আলোকে সারা আকাশ চিড় খাইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে গুরু গুরু গর্জনে সমস্ত থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! কোন উন্মাদ যেন নিষ্ঠুর অট্টহাসি হাসিতেছে।

সুরতহাল রিপোর্ট

দারোগাবাবু 'সুরতহাল' রিপোর্ট লিখছিলেন।

'মৃতা কড়ি বাউড়িনী, বয়স অনুমান পঁচিশ-ছাব্বিশ, কিছু বেশীও হইতে পারে—কারণ তাহার সন্তানাদি হয় নাই।—ঘরের কড়িকাঠে গরু বাঁধিবার দড়ি আটকাইয়া গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলিতেছে দেখা যায়। লাস দেখিয়া গলায় দড়ির ফাঁস আটকাইয়া দম বন্ধ হইয়াই মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ঘাড় ভাঙিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে।'

মাস দেড়েক পূর্বে কড়ির স্বামী ভোলা মারা গেছে। মাস দেড়েকের মধ্যে কড়ি গলায় দড়ি দিয়ে মরল।

লোকে আশ্চর্য হল না। কড়ি ছিল ভোলা-অন্ত প্রাণ। ভোলাকে পুড়িয়ে এসে ঘরের দাওয়ার উপর যেভাবে সে বসেছিল—তাতে বাউড়ীদের দেবেন, নোটন নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করেছিল, কড়ি হয়ত পাগল হয়ে যাবে।

মাস দেড়েক আগের কথাই বলছি।

ভোলার শব সৎকার করে এসে কড়ি ঘরের দাওয়ার উপর এসে বসল। তার সব যেন শূন্য মনে হচ্ছে। ঘর দোর বিশ্ব সংসার—সব খাঁ খাঁ করছে। সে ভাবছিল—সে কি করবে? তার কি হবে?

শুধুই তো সব শূন্য হয়ে যায় নি—দুনিয়ার লোক তাকে যে দড়ি দিয়ে বাঁধবার জন্যে এগিয়ে আসছে। ভোলা নেই—কে তাকে রক্ষা করবে?

কড়ি শিউরে উঠল।

কড়ি বাউড়ীর মেয়ে। বাউড়ীদের সাঙা আছে, মানে মেয়েদের দ্বিতীয়বার বিয়ের রেওয়াজ আছে; স্বামী বেঁচে থাকতে তাকে ছেড়েই সে অন্যজনকে বিয়ে করতে পারে, স্বামী মরে গেলে তো কথাই নেই। কিন্তু কড়ি আর কাউকে বিয়ের কথা ভাবতেই পারে না এবং কোনো লোকও কড়িকে বিয়ে করার কথা মনে করতে পারে না। তার কারণ একদিকে কড়ি সতী, অন্যদিকে সে চোর, পাকা নামজাদা চোর। কড়ির অনেক ভাগ্য যে, তার স্বামী ভোলা নিজে ছিল চৌকিদার—তাই বার বার চুরি করেও সে জেলে যায় নি। নইলে, লোকে বলে, জেল ছিল অনিবার্য।

সুযোগ-সুবিধে পেলে, লোকজন না থাকলে বা অন্ধকার রাত্রেই চোরে চুরি

করে. কিন্তু কড়ির চুরি দিনে দুপুরে—হাজারো লোকের মধ্যে, একেবারে হাটে প্রকাশ্যে। লঙ্কা, লেবু, কুল, ছোটখাটো তরি-তরকারী চুরি—চুরিই নয়। ওসব তো ভদ্রলোকেও করে; লঙ্কা, কি লেবু, কি কুল—মুঠো দরুণে তুলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে, নাকে শুঁকে, অর্ধেকগুলো ফেলে দিয়ে, অর্ধেকগুলো আত্মসাৎ করার প্রকৃতিটা প্রায় প্রচলিতই হয়ে গেছে; দশজনের কাছে জিনিস দেখে ফিরলেই পাঁচ মুঠো হয়ে যায়। থানার লোকে পর্যন্তও ও চুরি ধরে না—ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দেব। হাটের ফড়েরা বড জোর এমন লোকের হাত চেপে ধরে মুচড়ে জিনিস কেড়ে নেয়, তার বেশী কিছু বলে না। কড়ির চুরি. লঙ্কা লেবু চুরি নয়—সে চুরি করে কপি, মাছ, কমলা, ল্যাংড়া, মালদহের আম, কাঁঠাল এলে সবচেয়ে ভালো কাঁঠালটি—মোট কথা হাটের সেরা জিনিসটির ওপর তার নজর থাকে। তেমন জিনিস না থাকলে কড়ির নজর পড়ে কাপড় কি গামছার দিকে। তা না পেলে সে মানুষের ভিড়ের মধ্যে থেকে হাটুরেদের পয়সার থলেটার দিকে হাত বাড়ায়। ধরাও মধ্যে মধ্যে পড়ে, হাটুরে থেকে খদ্দেররা পর্যন্ত প্রহার দেয়, দুপ দাপ শব্দে কিল-চড় পিঠে পড়ে, ধাক্কা খেয়ে পড়েও যায়, আবার সঙ্গে সঙ্গে ওঠে, বলে—তা মার কেনে, তা মার কেনে, অন্যায় হয়ে যেয়েছে—তা মার কেনে।

এ সব অবশ্য আগের কথা; ইদানীং ভোলার কল্যাণে সে এসব থেকে অনেকখানি রেহাই পেয়েছিল। ভোলার মত ভালো লোক বড় দেখা যায় না, তার ওপর সে ছিল চৌকিদার—লোকে ভোলার পরিবার বলে তাকে ছেড়ে দিত। কড়ির ঠিক বিপরীত চরিত্র ছিল ভোলার। একবার সে পথের উপর একতাড়া নোট কুড়িয়ে পেয়েছিল—দশ টাকার পনেরখানা নোট; ভোলা সে নোটের তাড়াটি একেবারে সরাসরি হাজির করে দিয়েছিল থানায় দারোগাবাবুর কাছে।

দু ক্রোশ দূরের একখানা গ্রামের এক চাষীর টাকা; লোকটি জমি বিক্রি-করা সাড়ে পাঁচশ টাকার পাঁচ তাড়া নোটের মধ্যে দেড়শ টাকার তাড়াটাই অতি সাবধানতার আতিশয্যের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিল। টাকার তাড়াটি ফেরত পেয়ে তার দুচোখ বেয়ে জল এসেছিল—সে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে একখানা দশ টাকার নোট ভোলাকে দিতে চেয়েছিল। তার মুখের দিকে চেয়ে ভোলা সে টাকা নেয় নি। দুই হাত জোড় করে বলেছিল—মার্জ্জনা করবেন মণ্ডল মশায়।

লোকটি ভোলার দিকে চেয়ে মিনতি করে বলেছিল—আরও বেশী দিতে হয় আমি জানি, কিন্তু—

বাধা দিয়ে ভোলা বলেছিল—আজ্ঞে না। তার জন্যে লয় মণ্ডল মশায়।

—তবে ?

—মানুষ কম দুঃখে জমি বিক্রি করে না মণ্ডল মশায়। আপনার অনেক দুঃখের টাকা, লক্ষ্মী বেচা টাকা—উ আমি লিতে পারব না।

দারোগাবাবু ছিল ঘাগী লোক, এল-সি থেকে এ-এস-আই, তার থেকে এস-আই বা দারোগা, বড় বড় পাকা গোঁফ—মাথার চুলও আধকাঁচা, আধপাকা, কোনো রকম ভণ্ডামি তার নিজেরও ছিল না—পরেরও সহ্য করতে পারত না। সে পর্যন্ত এক্ষেত্রে ভোলার পিঠে প্রকাণ্ড একটা চাপড় মেরে বলেছিল—সাবাস বেটা!

কথাটা সে পুলিশ সাহেবের কানেও তুলেছিল। সাহেব নিজের পকেট থেকে ভোলাকে বকশিশ দিয়েছিল দু টাকা।

শুধু এইটুকুই ভোলার খাতিরের কারণ নয়। ভোলা একবার একা একদল ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করে একজন ডাকাতকে ঘায়েল করে তাকে ধরেছিল।

সে একটা কাহিনী। ডাকাতের দলের ডাকাতি-করা ভোলা একা রুখতে পারে নি, কিন্তু প্রথম থেকেই সে দূরে দূরে থেকে চীৎকার করতে আরম্ভ করেছিল। ডাকাতের দল যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ সেরে সরে পড়েছিল। ভোলাও তাদের পিছু নিয়ে চীৎকার করতে করতে চলেছিল। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠ, সেই মাঠের মধ্যেও ভোলা তাদের পিছন ছাড়ে নি—বাঘের পিছনে ফেউয়ের মত সে ডাকতে ডাকতে চলেছিল। মাঠের শেষে নদী। নদীর ধারে জঙ্গল। জঙ্গলের ধারে এসে ডাকাতদের সবচেয়ে সেরা লাঠিয়াল ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। সে লোকটা মেয়ে কি ছেলের হাত থেকে গয়না টেনে খুলতে গিয়ে আঁটো বোধ হলে—ধারালো হেঁসো দিয়ে হাতটাই কেটে নিত, কানের গয়না সে জীবনে কখনও খুলে নেয় নি, টেনে ছিঁড়ে নিয়েছে চিরকাল। এ লোক, সেই লোক। ফেউয়ের ডাকে তিক্ত-বিরক্ত বাঘের মতই সে আক্রোশ ভরেই ঘুরেছিল ভোলার মুণ্ডটা ছিঁড়ে কি ছেঁচে দেবার জন্যে। কিন্তু তার কপাল, আর ভোলার কপাল। অন্ততঃ লোকে তাই বলে—ভোলার কপালের দোহাই দেয়। নইলে সে লোকের সামনে ভোলার দাঁড়াবার যোগ্যতা ছিল না। ভোলার কপালের গুণেই অন্ধকারের মধ্যে লোকটা একটা ইঁদুরের গর্তের মধ্যে পা আটকে পড়ে গিয়েছিল। সেই সুযোগে ভোলা বসিয়েছিল মোক্ষম লাঠি। তারপর তার বুকের উপর বসে মাথার পাগড়ি খুলে তাকে বেঁধেছিল। ডাকাতের দল তাদের লাঠিয়ালের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল, তাই তারাও গিয়ে পড়েছিল অনেকটা দূরে। ভোলা যখন ডাকাতটাকে টানতে টানতে

নিয়ে এসেছিল গ্রামে। এর জন্যে সে সরকার থেকে বকশিশ পেয়েছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশী পেয়েছিল গ্রামের লোকের স্নেহ, সাদর পৃষ্ঠপোষকতা।

ঠিক এই জন্যেই কড়িকে লোকে হাতে-নাতে ধরেও খুব বেশী নির্যাতন করত না। হাটে ধরা পড়লে এই জন্যেই অনেক-সময় থানার লোকেও তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথম প্রথম ভোলা নিজেও তাকে প্রহার করত; ইদানীং সেও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। শুধু বলত—ছি-ছি-ছি!

কড়ি খটখটে চোখের দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকত।

ভোলা আবার বলত—'যাকে দশে বলে ছি, তার জীবনে কাজ কি?' তু মর—মর—মর, তু মর। মরণ যদি না হয়ত গলায় দড়ি দিয়ে মর। জলে ডুবে মর। বিষ খেয়ে মর।

কড়ি তবুও চুপ করেই থাকত। তার দৃষ্টি অদ্ভুত দৃষ্টি, পলক পড়ে না, সাপের মত চেয়ে থাকত। দৃষ্টি দেখে কোনোদিন কড়ির মনের দুঃখ, কি লজ্জা, কি আনন্দ, কিছুই বুঝতে পারা যায় নি।

ভোলা আবার বলত ওই মরবার কথা—মর—মর—মর, তুই মর।

আবার কড়ি মৃদুস্বরে বলত—হ্যাঁ। মরব তাই। হ্যাঁ!

—মরবি না তো আমাকে এমনি করে জ্বালাবি তু?

—কেনে? কি করলাম কি? কি জ্বালালাম তুমাকে?

ভোলা হতবাক হয়ে যেত বিস্ময়ে।

কড়ি বলত—চুরি করেছিলাম, তার লেগে তো লোকে আমাকে মেরেছে।

তারপর অকস্মাৎ ভোলার পায়ে ধরে কাঁদত—তুমিও না হয় মার। যে হাতে আমি চুরি করি, সেই হাতখানা আমার ভেঙে দাও। আমার মরণই যদি চাও, তবে তুমিই আমার টুঁটিতে পা দিয়ে মেরে ফেল।

ভোলা তবু তাকে ভালোবাসত।

কতজন, মায় থানার লোকে পর্যন্ত তাকে কতবার বলেছে—ও মেয়েটাকে তুই ছেড়ে দে ভোলা। তোর মত লোকের অমন চোর পরিবার, ছি-ছি-ছি!

ভোলা মাথা চুলকে বলত—আজ্ঞে?—যেন কথাটার অর্থ তার মাথায় ঢোকেই নি।

—ছেড়ে দে হারামজাদী চোরকে।

ভোলা তবুও সেইভাবে মাথাই চুলকে যেত। কোনো উত্তরই দিত না।

ভোলা যে জানে কড়ির আর এক পরিচয়।

বাউড়ীর মেয়ে হলেও কড়ি সুন্দরী মেয়ে। ভদ্রলোকেদের মেয়েদের মত

ফরসা রঙ, তেমনি শ্রী। কড়িকে কতবার কতজন প্রলুব্ধ করেছে; ভোলা নিজে চোখে দেখেছে—বাবুদের ছেলে কড়িকে টাকা দেখাচ্ছে, কিন্তু কড়ি একবার মাত্র তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে চলে এসেছে, ফিরেও তাকায় নি আর। ভোলা তখন বাবুদের বাড়ি কাজ করত; সে নিজের চোখে দেখেছিল, তারই মনিবের ছেলে কড়িকে টাকা দেখালে, কিন্তু কড়ি দেখবামাত্র চোখ ফিরিয়ে নিলে, চলে গেল। বাড়িতে ফিরে ভোলা কড়িকে কাঁদতে দেখেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করতে কড়ি বলেছিল অকপট সত্য কথা।

তাদের স্বজাতির মধ্যে অনেকে প্রথম প্রথম কড়ির মন ভাঙাতে চেষ্টা করেছিল। কড়ি তাদের গাল দিত তারস্বরে। ভোলা আসবামাত্র বলে দিত তাদের কথা।

দুটো ব্যাপারই যেন পাশাপাশি চলত।

সকালে কড়ি চুরি করত। ভোলা তিরস্কার করত—কড়ি পায়ে ধরে কাঁদত। সন্ধ্যেয় কড়ি চিৎকার করত অথবা অঝোর ঝরে কাঁদত।

—কি হল? চেঁচাচ্ছিস কেনে?

—ওই দেবনা। বাঁশবুকো—তিন্দশে নামুনেতে থাবে, নামুনেতে থাবে।

—থাম বাপু থাম।

—না। কেনে? থামব কেনে? আমাকে—

—আঃ—

—কিসের আঃ! যা-না-তাই বলবে—আর আমি চুপ করব?

কড়ির গালিগালাজের মাত্রা বেড়ে চলত উত্তরোত্তর।

স্বজাতি ও সমশ্রেণীর ক্ষেত্রে কড়ি গাল দিত; কিন্তু উঁচুজাতের ভদ্রশ্রেণীর ক্ষেত্রে সে অঝোর ঝরে কাঁদত।

সে হলে ভোলাকে সান্ত্বনা দিতে হত। ভোলার সান্ত্বনায় কড়ির কান্না বেড়ে যেত। অনেক কষ্টে অবশেষে সে বলত—ওই আধাকেষ্ট (রাধাকেষ্ট) বলে আমাকে—আর বলতে পারত না কড়ি, কেবল অঝোর ঝরে কাঁদত।

শুধু তাই নয়। কড়ির মত পরিশ্রমী মেয়ে সংসারে দেখা যায় না। দিনরাত সে খাটছেই খাটছে। কখনও ধান মেলে দিচ্ছে, ধান তুলছে, ধান ভানছে, কখনও কাঠকুটো ভেঙে আনছে, গরুর সেবা করছে, ঘুঁটে দিচ্ছে, মাথায় করে সেই ঘুঁটে বেচে আসছে; কাজের তার বিরাম নেই। ভোলার গরু ছিল—ভাগে জমি নিয়ে সে চাষও করত। কড়ি সমানে তার সঙ্গে খাটত। তাদের জাতের সকল মেয়েই খাটে—কিন্তু কড়ির কাজের সঙ্গে কারও কাজের তুলনা হয় না।

ভোলা এমন কড়িকে প্রাণ দিয়ে ভালো না বেসে পারে নি।

সেই ভোলার মত স্বামী মরে গেল। কড়ি ভোলার সৎকার করে এসে আপনার দাওয়ায় বসে ভাবছিল—তার কি হবে? সে কি করবে?

আশ্চর্যের কথা। কড়ি জীবনে এমন আশ্চর্য-বোধ কখনও করে নি। তার মনে হল ভোলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীটার চেহারাই যেন বদলে গেছে। প্রতিটি মানুষ যেন অন্য রকম হয়ে গেছে।

ভোলার পুরনো মুনিব বাড়ির সেই ছেলেটি দীর্ঘকাল ধরেই কড়িকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করে এসেছে। এই সেদিন ভোলার অসুখের সময়েও সে কড়ির দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়েছে—যে কথাগুলি বলেছে তার মধ্যে থেকে কড়ি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছে অন্য রকম অর্থ। কড়ি খুব তাড়াতাড়িই যাচ্ছিল। দাস্ত-বমির আক্ষেপে ভোলা কাতর হয়ে পড়েছিল; লেবুর রসে উপকার হবে—লেবুর গন্ধ শুঁকলেও আরাম পাবে, তাই সে যাচ্ছিল কয়েকটা পাতিলেবুর সন্ধানে। হাটবার হলে ভাবনাই ছিল না, কিন্তু হাটবারের দেরি আছে দুদিন। কড়ি যাচ্ছিল রামবাবুদের বৈঠকখানার দিকে, বাবুদের বৈঠকখানার সামনে ছোট বাগানটার মধ্যে দুটো পাতিলেবুর গাছ আছে, ফলও ধরে আছে অনেক। পাঁচিলের একটা জায়গা ভাঙা আছে, সেও কড়িব অজানা নয়। হঠাৎ পথে ওই বাবুদের ছেলের সঙ্গে দেখা। ওর চরিত্র কড়ি ভালোই জানে—সে একবার তার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়েই হন হন করে চলে যাচ্ছিল। ছেলেটি ডাকলে—ওরে, এই কড়ি!

বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই কড়ি উত্তর দিয়েছিল—কিগো? বলছ কি?

—যা গেল! বলছি ভোলা আছে কেমন?

—ভালো নাই বাপু।

—ডাক্তার দেখাচ্ছিস তো? কোথায় যাচ্ছিস এমন করে?

—আমি মরি নিজের জ্বলনে, তুমি আর জালিও না বাপু।

—জ্বালানো কি হল? এমন হন হন করে যাচ্ছিস, তাই জিজ্ঞাসা করছি। কোনো কিছুর দরকার থাকলে বলিস—ভোলা আমাদের পুরনো চাকর, তাছাড়া সে ভালো লোক।

—না, কিছু দরকার নাই।

—তোর কথাবার্তা এমন কেন বল্ তো? মানুষের সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে জানিস না?

—না জানি না।—বলেই কড়ি হন হন করে চলে গিয়েছিল।...কিছু দরকার

থাকলে বলিস! কেন? দরকার থাকলেই বা তোমাকে আমি বলব কেন? তোমারই বা এত দরদ কেন?...তোর কথাবার্তা এমন কেন? মানুষের সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে জানিস না?...না। কড়ি জানে না সে ধরনের কথাবার্তা! ছি! ছি!

ভোলার মৃত্যুর পর সে লোকও যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। মাত্র এক মাসের মধ্যে। আশ্চর্য! কালই তার সঙ্গে কড়ির দেখা হল। ভোলার মৃত্যুর পর এই প্রথম দেখা।

কড়ি তার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে চাইলে।

সে বললে—ভালো আছিস কড়ি?

কড়ির চোখ ভরে আজ জল এল। গলার স্বর ধরে এল—সে কথা বলতে পারলে না।

বাবুদের ছেলেটি বললে—ভোলার মত লোক আর হবে না। বড় ভালো লোক ছিল সে।

কড়ি এবার মুখ তুলে তার দিকে চাইলে। আশ্চর্যের কথা—তার চোখে মুখে কোথাও এমন কিছু নেই, যা দেখে কড়ির চোখ নত হয়ে পড়ে, মন ঘেন্নায় রি-রি করে ওঠে।

ছেলেটিই আবার বললে—কি করবি বল? এর ওপর তো মানুষের হাত নেই।

আঁচল দিয়ে আপনার চোখ মুছে কড়ি বললে—কি করে খাব মশায়, তাই ভাবছি। পোড়া পেট তো মানবে না।

—ভগবান আছেন রে। তিনিই যা হয় করবেন।

—আপনকাদের বাড়িতে একটা চাকরি দেবেন মশায়? ঝিয়ের কাজ?

—কাজ?

—হ্যাঁ। বলেন তো দিনরাতই থাকব আপনকাদের বাড়িতে।

ছেলেটি বারবার ঘাড় নেড়ে বললে—না বাপু। সে পারব না।

একটু থেমে আবার সে বললে—তোমার স্বভাব-চরিত্র ভালো, কিন্তু তুমি বড় চোর।

কড়ি মাথা নীচু করে বললে—চুরি আর আমি করব না।

ছেলেটি হাসলে।

কড়ি বললে—আপনকার পায়ে হাত দিয়ে বলছি।

কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ছেলেটি বললে—থাক।

কড়ি তার দিকে চেয়ে একটু মিষ্টি হাসি হেসেই বললে—বিশ্বেস হচ্ছে না আপনকার? আপুনি বলবেন- তাই করব আমি

—না বাপু। বরং দরকার হয়ত কিছু ধান-চাল সাহায্য দেব চাকরি-বাকরি হবে না।

মাথা হেঁট করেই কড়ি ফিরে গেল। সে ঠিক চাকরির সন্ধানে বার হয় নি। বেরিয়েছিল অমনিই। ভোলার মৃত্যুর পর থেকে এই একটা মাস সে ঘরের মধ্যেই ছিল। ভোলা যা রেখে গেছে—তা তাদের জাতির পক্ষে অনেক! ভোলা চাষ করত—চাষের ধান সঞ্চয় করে ছোটখাটো একটি মরাই সে বেঁধে রেখে গেছে; চৌকিদারির মাইনে বকশিশ থেকে পনের গণ্ডা টাকাও তার জমানো আছে। ঘরে পেতল-কাঁসাও কয়েকখানা করেছিল ভোলা। তুটো হেলে বলদ আছে, সে তুটো বেচলেও আট-দশ গণ্ডা টাকা হবে। একটা গাই আছে, সের দেড়েক তুধ দেয়। তুধ বেচলেও রোজ আট-দশ পয়সা হবে। পেটের ভাবনা তার নেই। কিন্তু এই এক মাসের মধ্যে তার মন প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। ভোলাকে অহরহ ভেবে সে আর দিন কাটাতে পারছে না। শূন্য ঘর—সেই ঘরের মধ্যে তার মন প্রাণ যেন কাটে না। বাড়ির খুব কাছেই রেল ইস্টিশান, ছোট ছোট রেল লাইন, ইস্টিশানও খুব ছোট; ভোরের গাড়িটা যখন যায় তখনই কড়ি বরাবর ওঠে। আজকাল তার ঘুম ভাঙ্গে রাত্রি থাকতে। ঘরের কাজ সারা হয়ে গেলে তবে ভোরের গাড়ি আসে। কাজও যে কমে গেছে। একা মানুষ সে—এঁটো বাসন মাত্র একখানা। ঘরে পুরুষমানুষকে নিয়েই তো যত কাজ। হাজারো অকাজ করে সে কাজ বাড়িয়ে দেয়। এখানে তামাকের গুল ঝাড়ছে, ওখানে ফেলেছে পোড়া বিড়ি; বর্ষার সময় কাদা পায়ে—অন্য সময় ধুলো পায়ে একেবারে এসে ঘরে ঢুকছে; এখানে গামছাটা ফেলছে; অকারণে কাস্তেটার ডগা দিয়ে উঠোনের কি দাওয়ার মাটি খুঁড়ছে; মাছ ধরে এসে পুঁটিমাছ-ধরা ছিপটা ছুঁড়ে দিলে তো পড়ল গিয়ে ওইখানে; লাঙ্গলের গজাল ঠুকতে বসে এখানে ফেললে পাথরটা, ওখানে ফেললে লোহার টুকরোটা; কোদালের বাঁট তৈরি করতে বসে গাছের ডাল চেঁচে-ছুলে ঘরময় ছড়ালে কাঠের ছিলকে; লাউ-কুমড়োর লতা চালের উপর তুলতে গিয়ে মেঝের উপর ফেললে রাজ্যের পচা খড়;—কাজ করে আর কুলিয়ে উঠতে পারত না কড়ি। তার উপর ছিল তার সেবা। আজ পায়ের নথ তুলে এল—বাঁধ জলপটি। কাল এল হাত কেটে—দাও হাত বেঁধে। পরশু নেসপেকটার বাবুর ভারি বাক্সটা ঘাড়ে করে ঘাড়ে ব্যথা নিয়ে ফিরল—দাও নুনের পুঁটলির সেঁক। মদ খেয়ে মাতাল

হয়ে ফিরলে তো কথাই থাকত না। মাথায় জল দেওয়া, বাতাস করা, তাকে খাওয়ানো, বমি করলে পরিষ্কার করা, তার উপর তার মার খাওয়া!

ভোলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার সব কাজ ফুরিয়ে গেছে। আজকাল ভোরের গাড়ি আসতেই তার বাসিপাট সারা হয়ে যায়, সে চুপ করে দাওয়ার উপর বসে থাকে দশটার গাড়ির প্রত্যাশায়। দশটার গাড়ি এলেই হয় কাঠকুটো কুড়োতে যাওয়ার সময়। সমস্ত দুপুরটা মাঠের মধ্যে বাগানে বাগানে ঘুরে, ফিরে আসে দুটোর সময়। তারপর আবার সেই একলা ঘরের মধ্যে কাটানো, বাকি দিনটা—সমস্ত রাত্রিটা! কড়ি হাঁপিয়ে উঠেছে। জাত-জ্ঞাতের মেয়েরা কেউ কেউ আসে, কিছুক্ষণ বসে তারপর চলে যায়—যাই ভাই, এখুনি আবার ছেলে কাঁদবে। মরদের ফেরার সময় হল।

তারা চলে যায়, কড়ি একা বসে থাকে। সন্ধ্যার সময় কেউ আসেই না। দিনরাত্রি কাটে না কড়ির।

মধ্যে মধ্যে দেবনা, যাকে কড়ি গালিগালাজ অভিসম্পাত না দিয়ে জল খেত না—সে-ই আসে। কিন্তু কড়ি আশ্চর্য হয়ে যায়—সে দেবনা আর নাই। দেবনাও যেন পালটে গেছে। বাবুদের ছেলেটার মতই সে যেন অন্যমানুষ, তার কথাবার্তার ধরনও অন্যরকম।

কড়ি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

ঠিক এই সময়েই বাইরে থেকে তাকে ডাকলে, কড়ি—

দেবেনই ডাকছে।

কড়ি ব্যগ্র হয়ে উত্তর দিলে—আয় দেবেন, আয়।

দেবেন এসে দাঁড়াল। বললে—তু নাকি বাবুদের বাড়িতে চাকরি খুঁজতে গিয়েছিলি?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কড়ি বললে—হ্যাঁ।

দেবেন বললে—বাবুদের বাড়িতে আজ আমি মুনিষ লেগেছিলাম কিনা, তাই শুনলাম।

কড়ি বললে—কি করব বল ভাই, প্যাটে খেতে হবে তো।

দেবেন বললে—মরণ তোর। ভোলা যা রেখে গিয়েচে—তাতেই তোর চলে যাবে। গাই গরুর দুধ বিক্রি কর, দু-চার টাকা ধার দে লোককে, সুদ পাবি।

কড়ি আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—একলা ঘরে আমি আর থাকতে লারছি দেবেন। ঘর যেন আমাকে গিলতে আসছে।

দেবেনও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে, কি করবি বল—মানুষের তো হাত নাই এতে।

কড়ির চোখে জল এল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সে বললে—ছেরো জেবন কি করে কাটাব আমি বল?

দেবেন বললে—অন্য কেউ হলে বলতাম সাঙা কর। কিন্তুক তোকে তো জানি। তোর ওই গুণেই ভোলা তোকে ছাড়ে নাই! তা ধম্ম-কম্ম কর—দেবতা থানে ঘোর। দিন কেটে যাবে।

ঝরঝর করে কড়ির চোখ দিয়ে জল পড়তে আরম্ভ হল।

দেবেন বলে—তোর হাতটান দোষটা যদি না থাকত, তবে তো তু মহাশয় লোক হতিস কড়ি। ভদ্দলোকেরাও বলে, বাউড়ার মেয়ে হলে কি হবে—কড়ির মত চরিত্ত হয় না। দোষের মধ্যে ওই হাতটান।

কড়ি নীরবে বারবার চোখের জল মুছবার চেষ্টা করলে—জল যেন মুছে সে শেষ করতে পারছে না।

দেবেনও অত্যন্ত দুঃখ পেলে কড়ির কান্না দেখে। সান্ত্বনা দিয়ে বললে—কাঁদিস না। আর কোথাও চাকরি-টাকরি করতে যাস না। কোথা কোন-দিন লোভ সামলাতে পারবি না, কি করে ফেলবি—তখন মহাবিপদ হবে।

একটু থেমে সে আবার বললে—তখন ভোলা ছিল, সে ছিল চৌকিদার, তাছাড়া লোকে তাকে ভালোবাসত; তখন তোর দোষ অনেক ঢাকা পড়ত—লোকে ক্ষমাঘেন্নাও করত। এখন মহাবিপদ হবে।

কড়ি আর থাকতে পারলে না। বললে—আমি উ কাজ করব না দেবেন। তোর দিব্যি। তু দেখিস!

এ কথায় দেবেন না হেসে পারলে না। কড়ি তার দিব্যি করছে! দিব্যি করে দিব্যি ভঙ্গ করলে তারই অনিষ্ট হবে। তাতে কড়ির কি? তার মনে পড়ল যাত্রার দলে শোনা একটা ছড়া—পরের মাথায় দিয়ে হাত, কিরে করে নিষ্যাত।

কড়ি অধিকতর ব্যগ্রতা ভরে বললে—মা কালীর দিব্যি।

দেবেন হাসতে হাসতেই বললে—দেবতার নাম নিয়ে দিব্যি করিস না কড়ি, থাক।

কড়ি বললে, যদি করি তবে হাতে যেন আমার কুষ্ঠ হয়।

দেবেন শিউরে উঠে বললে—না-না। ওসব বলতে নাই। বলিস না।—বলেই সে আর দাঁড়াল না, চলে গেল।

কড়ি ব্যগ্রভাবে তাকে ডাকলে—দেবেন, দেবেন।

দেবেন সাড়া দিলে না

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকের দুপুরবেলা রৌদ্রে যেন চারিদিক ঝলসে যাচ্ছে। কাকগুলো পর্যন্ত গাছের ভিতরে বসে ঝিমোচ্ছে; কুকুরেরা ছায়াচ্ছন্ন ঠাণ্ডা জায়গায় বসে ধুঁকছে; জনমানবহীন পথ; চারিদিক নিঝুম; গৃহস্থের বাড়ি সব বন্ধ, যে যার দরজা জানালা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে; শুধু একটানা বাতাসে তালগাছের পাতার আলোড়নে ঝরঝর শব্দ উঠছে, সে বাতাস আগুনের মত গরম, ধুলোয় ভর্তি। দুপুরটা যেন ঝাঁ-ঝাঁ করছে।

কড়ি পথ দিয়ে চলছিল। বিনা কাজে অকারণে চলছিল। ঘরে বসে তার ভালো লাগে নি। তাই সে চলেছিল। এখন মাঠে কাঠকুটো কুড়োতে যাওয়ার সময় সকালবেলায়। জ্যৈষ্ঠের দুপুরবেলার রোদ বাতাসকে বলে 'ঝলা'। জ্যৈষ্ঠের ঝলা লাগলে অনেক সময় মানুষ শুধু ঘেমে ঘেমেই মরে যায়। আমাশয় তো সাধারণ অসুখ। তাই লোকে বোশেখ-জ্যৈষ্ঠ দুমাস কাঠকুটো কুড়োতে যায় সকালে। তাছাড়া কড়ি এখন সকালেও কাঠকুটো কুড়োতে যায় না। তার কারণ সকল বাগানেই আম-কাঁঠালের গাছ, এখন আম-কাঁঠাল পাকবার সময়, বাগানে ঢুকলেই নিশ্বাসের সঙ্গে বুক ভরে ওঠে পাকা ফলের মিষ্টি গন্ধে, অন্য মানুষের কথা কড়ি জানে না, কিন্তু ওই গন্ধ নাকে এলেই কড়ির মুখ জলে ভরে ওঠে, চোখ আপনা থেকেই গাছের মাথার দিকে ফেরে—সন্ধান করে কোথায় আছে উৎকৃষ্ট ফলটি। চুরি করবার দুর্বার প্রবৃত্তি তার বুকের ভিতর যেন লক-লক করে ওঠে। তাই সে যায় না কাঠকুটো কুড়োতে। সে আর চুরি করবে না। কিছুতেই চুরি করবে না।

বাউড়ী পাড়া পার হয়েই গোবিন্দবাবুদের খিড়কী! খিড়কীর পুকুরটার পাড় দিয়েই একটা মানুষ হাঁটার সরু পথ, ও পথ দিয়ে পুরুষ যেতে পায় না, মেয়েরা যাওয়া-আসা করে। কড়ি সেই পথ দিয়ে চলেছিল। কোথায় যাবে তার কোনো ঠিক ছিল না। সকাল থেকে বাড়িতে বসে বসে বাড়িটাই তার অসহ্য বোধ হয়ে উঠেছিল, তাই সে চলে এসেছে। অস্পষ্টভাবে শুধু মনে হয়েছিল যদি দেবনার দেখা মেলে তবে তাকে কয়েকটা কথা বলে আসবে। বলে আসবে, বুঝিয়ে দিয়ে আসবে, সে চুরি করে না। কিছুক্ষণ গল্পও করে আসবে। বাড়ি থেকে বার হতে গিয়ে মনে হল কাপড়খানা ময়লা। একটু ভেবে সে একখানা ফরসা শাড়ি পরলে। আরও একটু ভেবে মাথার চুলে একবার চিরুনি দিলে; তারপর একটা পান খেয়ে সে বার হল। কিন্তু দেবেন বাড়িতে ছিল না।

কোথায় খাটতে গেছে বোধহয়। দেবেনের বাড়িতেও কেউ নেই যে, জিজ্ঞাসা করে জানা যায়! সেখান থেকে বেরিয়ে অকারণে বিনা কাজেই সে চলেছিল।

বাবুদের খিড়কীর চারিপাশে খুব ঘন সারিবন্দী তালের গাছ। কোনো একটা গাছের মাথার উপরে বসে একটা চিল ডাকছে তীক্ষ্ণস্বরে। উঃ কি তীক্ষ্ণ স্বর! এই ঝাঁ ঝাঁ করা দুপুরের আগুনের তপ্ত ঝরঝরে ঝড়ো বাতাস চিরে চলছে যেন।

ও কে? কে যেন ঘাট থেকে উঠে চলে গেল! বাবুদের বাড়িরই কোনো বউ কি মেয়ে হবে। ঝলমলে শাড়ি, আর মেয়েটির অনাবৃত একটি হাতের গয়নাগুলি দুপুরে রৌদ্রের ছটায় ঝকমক করছে। পিছন দিক থেকে কড়ি ঠিক চিনতে পারলে না।

ঘাটের কাছে এসে সে থমকে দাঁড়াল। বাঁধানো ঘাটের ঠিক মাথার উপরেই মেয়েটির আলতা-পরা পায়ের ভিজে ছাপ পড়েছে, আলতার ছোপ আঁকা গোটা পাখানির ছাপ উঠে গেছে শানের উপর। ছাপ একটি নয়, বরাবর চলে গেছে জল পর্যন্ত। সধবা ভাগ্যমানী মেয়ে।

ওটা কি? একেবারে জলের ধারের সিঁড়িটার উপর ওটা চকচক করছে কি? কড়ির বুকের ভিতরটা ধ্বক ধ্বক করে উঠল। জনহীন চারিদিক—কড়ি একবার চারিদিকটা ভালো করে দেখে নিলে, তারপর অত্যন্ত সন্তর্পিতভাবে পা ফেলে সিঁড়ির ধারে এসে দাঁড়াল। কানের একটা দুল। খসে পড়ে গেছে, বউটি জানতে পারে নি। গিনি সোনার দুল—রৌদ্রের ছটায় আগুনের মত জ্বলছে। বউটি জানতে পারে নি, কোনো রকমে আলগা হয়ে গিয়েছিল, পড়ে গেছে। কিন্তু শব্দও কি হয় নি? নিশ্চয় হয়েছিল, বউটির খেয়াল ছিল না। খেয়াল হবে কি? কড়ির মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। জানতে পারবে কি? বাড়িতে হয়ত তার স্বামী তার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে। তার কি খেয়াল থাকে, না থাকতে পারে?

উঃ, আগুনের মত জ্বলছে! কড়ি খানিক হেঁট হল কুড়িয়ে নেবার অভিপ্রায়েই। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে সোজা উঠে—ছুটে—হ্যাঁ ছুটেই সেখান থেকে পালিয়ে গেল। না—সে ও কাজ আর করবে না।

দু পাশে ভদ্রজনদের বাড়ি নিস্তব্ধ। লোকজন সব ঘুমুচ্ছে। কড়ি প্রত্যেক বাড়িটিরই হালহদিস জানে—কোন কোন বাড়ির কোনখানে ভাঙা গোপন প্রবেশপথ আছে, সে তার নখদর্পণে। বাড়িতে শাড়ি শুকুচ্ছে, রঙিন শাড়ি, সৌখীন পাড়ওয়ালা শাড়ি, একটা বাড়িতে শান্তিপুরে শাড়িও ঝুলছে একখানা।

কড়ির বুকের ভিতরটা ধ্বক ধ্বক করছে। সে প্রাণপণে ছুটছে। অনেকটা এসে পড়ল। বাবুদের বৈঠকখানার সারি—দুপাশে বাবুদের বৈঠকখানা, মাঝখান দিয়ে পথ। এখানে এসে সে থামল। এখানে থাকবার মধ্যে আছে দু-চারটে ফুলের গাছ, খড়। ধানের মরাই। কড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে চলছিল।

সামনেই সেই বাবুদের বৈঠকখানা।

কড়ি দাঁড়াল। তার বুকের ভিতরটা অপূর্ব সান্ত্বনায় আনন্দে ভরে উঠল—সে আজ 'সোনার দব্যি' হেলায় ফেলে দিয়ে এসেছে, ছোঁয় নাই। আঃ। বাবুদের সেই ছেলেটিকে এ কথাটা বলতে পারলে তবে তার তৃপ্তি হয়।

বাবুদের বৈঠকখানায় হাসির আওয়াজ উঠছে।

—ছক্কা—ছক্কা—ছক্কা।—কলরব উঠল। দুপুরবেলা ঘরে দরজা দিয়ে তাস খেলছে বাবুরা।

কড়ি আর থাকতে পারলে না, দরজা ঠেলে ঢুকে পডল।

সকলে বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালে। সেই বাবুটি বললে—কি? কি চাই তোর?

কড়ি বুঝতে পারলে না কি বলবে।

—কি চাই এখানে?—রূঢ়স্বরে সে প্রশ্ন করলে।

কড়ি ঢোঁক গিলে বললে—আজ্ঞে জন্ম-মিত্যুর খাতাটা, নিকে নোব।

সে অবাক হয়ে কড়ির মুখের দিকে চেয়ে বললে—তুই ক্ষেপে গিয়েছিস নাকি?

—আজ্ঞে?

—ভোলা মরে গেছে, জন্মমৃত্যুর খাতার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ কি? সে তো লেখাবে নতুন চৌকিদার।

কড়ি এবার একরকম ছুটেই পালিয়ে এল। তবুও দাওয়া থেকে নামবার সময় সে শুনলে একজন বলছে—ব্যাপার কি? পাগল?

—না—না। মেয়েটা পাকা চোর। বোধহয় দুপুরবেলা চুরি করতে বেরিয়েছে।

—কিন্তু দেখতে তো বেশ মেয়েটা।

—ওদিকে চেয়ো না।

—কেন?

—চোর হোক, ছোটলোক হোক, মেয়েটি কিন্তু সেদিকে আশ্চর্য রকম ভালো। সত্যিকার সতী মেয়ে।

কড়ি ছুটে পালিয়ে এল।

সন্ধ্যেবেলা কড়ি ওই কথাই ভাবছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের সন্ধ্যা, চারিদিক এখনও গরম হয়ে আছে—তবুও হাওয়া অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কড়ি উঠোনে একখানা চ্যাটাই পেতে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। আকাশে চাঁদ ঝলমল করছে। অকারণে তার কেবল কান্না আসছে। এমনি গরমের সময় চাঁদনী রাতে ঠিক এইখানটিতেই চ্যাটাই বিছিয়ে সে আর ভোলা বসে থাকত। কোনোদিন সে শুয়ে থাকত, ভোলা বসে তামাক খেত, কোনোদিন বা ভোলা শুয়ে থাকত, কড়ি দিত তার মাথার চুল টেনে। একটা মানুষের অভাবেই ঘরখানা খাঁ খাঁ করছে। পাড়াপড়শীর ঘরে গেলে সঙ্গ পাওয়া যায়, কিন্তু কড়ি যায় না। ভোলা থাকতে তো যেতই না, এখনও যায় না। লোকে সন্দেহ করে। আবার তার মনে পড়ে গেল, সে আজ 'সোনার দবি্য' হেলায় ফেলে দিয়ে এসেছে। কিন্তু তবু বাবুদের ছেলেটা তাকে বললে—। সত্যিই তার চোখ জলে ভরে গেল।

—কড়ি! কড়ি রইছিস?

কড়ির বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। দেবনা! দেবেনের গলা। দেবেনকে সে বলবে আজকের কথা।

—কড়ি!

—দেবেন! এস।

—অঃ। তু যে একবার কি হলি—এস বলছিস।

—তোমাকে খাতির করছি।

—খাতির! তা—। দেবেন হাসলে।—তা খাতিরের খবর এনেছি তোর লেগে।

কড়ি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেবেনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—বস। ভারি গোপন কথা ভাই।

—বল।—কড়ির গলা কাঁপতে লাগল।

—আগে দিব্যি কর, কাউকে বলবি না।

—কালীর দিব্যি। কাউকে বলব না!

—গোপালপুরের হরেরাম পোদ্দারকে জানিস?

—হরেরাম পোদ্দার? তার তো জ্যাল হয়েছিল—সেই ডাকাতির মাল সামালের লেগে।

—সে ফিরে এসেছে।

—ফিরে এসেছে?

—হ্যাঁ। এসেই ভোলার খোঁজ করছিল। তা আমি বললাম, ভোলা নাই। তা বললে—যাক ফাঁসি থেকে বাঁচলাম। বেঁচে থাকলে খুন করতাম। তারপর তোর কথা শুধালে।

—আমার কথা?

—হ্যাঁ। পোদ্দারের সঙ্গে আমার অনেকদিনের জানাশোনা কিনা। পোদ্দারের ঘরে চাকরি করেছি অনেকদিন। তাই হরেরাম এসেই আমাকে ডেকেছিল।

কড়ি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

—পোদ্দার বললে তোর কথা। বললে, ভোলা মরে গিয়েছে, কড়ি আর সাঙা করবে না বলছিস—তা কড়ি যদি আমার কথা মাফিক কাজ করে, তবে সব দায়-হায় আমার।

কড়ি বললে—না।

—না লয় শোন। চুরি-চামারি যা করবি পোদ্দারকে দিবি। পোদ্দার তার দাম দেবে। ধরা পড়লে মামলা-মোকদ্দমা করতে হয় তাও করবে।

—না—না।

—ওই দেখ, ক্ষেপামী করিস না। নইলে তোর এবার জ্যাল নিঘ্যাত তা বলে রাখলাম। এই তো আজই শুনলাম—দুপুরবেলায় বাবুপাড়ায় ঘুরছিলি। বাবুদের বঠকখানায় ঢুকেছিলি। লোক দেখে বলেছিস জন্মমিত্যুর খাতা নেকাতে গিয়েছিলি।

—না—না।

—আর না। শোন, আজকে ভাব, ভেবে কাল বলিস আমাকে।

দেবেন চলে গেল। কড়ি মাটির পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল।

পরদিন বেলা তখন জল খাবার বেলা। মুনিষজনের জল খাবার বেলা। মুনিষজনেরা জল খাবার ছুটি পেয়ে বাড়ি ফিরছে। দেবেন বাড়ির পথে কড়ির বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। এতক্ষণ কড়ি নিশ্চয় ফিরেছে কাঠকুটো কুড়িয়ে।

—কড়ি। কই কড়ি? কড়ি! অ কড়ি।—ওই তো কুটো কুড়োবার ঝুড়িটা পড়ে রয়েছে। চারিদিক চেয়ে দেবেন দেখলে ঘরের দরজার শেকল খোলা রয়েছে—শুধু ভেজানো আছে। কড়ি কি ঘরে শুয়ে আছে? দরজা ঠেলে দেবেন অবাক হয়ে গেল। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ।

—কড়ি! কড়ি! কড়ি! কড়ি!

উদ্বেগপূর্ণ কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই সে দরজায় ধাক্কা দিলে। পরক্ষণেই

কিন্তু তার ভয় হল। সে ছুটে বেরিয়ে এল কড়ির বাড়ি থেকে। ছুটে গেল পাড়ার মাতব্বর নোটনের কাছে।

লোকজনের মধ্যে কে যে উৎকণ্ঠিত কৌতূহলের আতিশয্যে দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা মারলে সে কথা ঠিক কেউ জানে না—কিন্তু দরজাটা খুলে গেল।

ঘরের মধ্যে কড়িকাঠে দড়ি টাঙিয়ে কড়ি গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে।

নোটন বললে—বেরিয়ে আয় সব। কেউ কিছু নাড়িস না, থানায় খবর দে।

দারোগাবাবু সুরতহাল রিপোর্ট লেখা শেষ করলেন—

'মেয়েটির আত্মহত্যার কারণ কিছু জানা যায় না। তবে যেরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে স্বামীর মৃত্যুর আঘাত সহ্য করতে না পারিয়াই এরূপ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ মৃত স্বামীর প্রতি গভীর আসক্তি ছিল মেয়েটির। অথবা মেয়েটি কোনো কিছু চুরি করিয়া ধরা পড়িবার আশঙ্কায় এরূপ করিয়াছে এমনও হইতে পারে। কারণ মেয়েটি স্বভাব-চোর ছিল। পূর্বে পূর্বে বহুবার চুরি করিয়াছে। যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, গতকাল দ্বিপ্রহরে সে চুরির অভিপ্রায়েই ভদ্রপল্লীতে ঘোরাফেরা করিয়াছে।'

দারোগা উঠলেন, বললেন—লাশ জ্বালিয়ে দিতে পার তোমরা।

তাসের ঘর

অমর শখ করিয়া চায়ের বাসনের সেট কিনিয়াছিল। ছয়টা পিরিচ, পেয়ালা, চাদানি ইত্যাদি রঙ-চঙ করা সুদৃশ্য জিনিস, দামও নিতান্ত অল্প নয়—চার টাকা। চার টাকা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে অনেক।

অমরের মায়ের হুকুম ছিল, সেটটি যত্ন করে তুলে রেখো বউমা, কুটুম্বসজ্জন এলে, ভদ্রলোকজন এলে বের করো।

কলিকাতা-প্রবাসী হরেন্দ্রবাবুরা দেশে আসিয়াছেন, আজ তাঁহাদের বাড়ির মেয়েরা অমরদের বাড়িতে বেড়াইতে আসিবেন; তাহারই উদ্যোগ-আয়োজনে বাড়িতে বেশ সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে।

মা বলিলেন, চায়ের সেটটা আজ বের কর তো গৌরী।

গৌরী বাড়ির মেয়ে—অমরের অবিবাহিতা ভগ্নী। মা চাবির গোছাটা

গৌরীর হাতে দিলেন। গৌরী বাসনের ঘর খুলিয়া জার্মান-সিলভারের ট্রে-সমেত সেটটি বাহির করিয়া আনিয়া বলিল, পাঁচটা কাপ রয়েছে কেন মা, আর একটা কাপ কি হল? এই দেখ বাপু, সবে এই আমি বের করে আনছি, আমায় দোষ দিও না যেন।

বিরক্ত হইয়া মা বলিলেন, দেখ না ভালো করে খুঁজে, ঘরেই কোথাও আছে। পাখা হয়ে উড়ে তো যাবে না।

গৌরী সেটটা সেইখানে নামাইয়া আবার ভালো করিয়া ঘর খুঁজিয়া আসিয়া বলিল, পাখাই হল, না কেউ খেয়েই ফেলল—সে আমি জানি না বাপু, তবে ঘরের মধ্যে কোথাও নেই।

দুমদাম করিয়া মা ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, তোমার দোষ কি মা, আমার কপালের দোষ। তোমরা চোখ কপালের ওপর তুলে কাজ কর নীচের জিনিস দেখতে পাও না।

গৌরীর চোখ হয়ত কপালের উপরেই উঠিয়া থাকে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে গৌরীর অপরাধ প্রমাণিত হইল না। পেয়ালাটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

মা হাঁকিলেন, বউমা, বউমা!

বউমা—অমরের স্ত্রী শৈল—উপরে তখন ঘর-দুয়ার ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া অতিথিদের বসিবার স্থান করিতেছিল, সে নীচে আসিয়া শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আমায় ডাকলেন?

শাশুড়ী বাসন-অন্ত-প্রাণ, সিন্দুকের চাবি পুত্রদের দিয়া বাসনের ঘরের চাবি লইয়াই বাঁচিয়া আছেন। পেয়ালাটার খোঁজ না পাইয়া ফুটন্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত বার্তাকুর মত সশব্দে জ্বলিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, হ্যাঁ গো রাজার কন্যে, নই বউমা বলে ডাকা কি ওই বাউড়ীদের, না ডোমেদের?

শৈল নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল, উত্তর করা তার অভ্যাস নয়।

শাশুড়ী বলিলেন, একটা পেয়ালা পাওয়া যাচ্ছে না কেন, কি হল?

একটু নীরব থাকিয়া বধূ বলিল, ও আমিই ভেঙে ফেলেছি মা।

শাশুড়ী কিছুক্ষণ বধূর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বেশ কর মা, কি আর বলব বল!

সত্য কথা, এমন অকপটভাবে অপরাধ স্বীকার করিলে অপরাধীকে মাপ করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া শাশুড়ী বলিলেন, পাঁচটাকেও ফেলে দেব আমি চুরমার করে ভেঙে।

রাগ গিয়া পড়িল চায়ের সেটটার উপর।

শৈল সবই নীরবে সহ্য করে, সে নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী বলিলেন, ভেঙেছ বলা হল, বেশ হল, আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও, ওপরের কাজ সেরে এস, জলখাবারগুলো করতে হবে।

শৈল উপরে চলিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে হাসিমুখে আসিয়া রান্নাঘরে শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইল।

শাশুড়ীর মনের উত্তাপ কমিয়া আসিয়াছিল, বলিলেন, নাও তোমাদের দেশের মত খাবার তৈরি কর।

শৈল খাবারের সাজ-সরঞ্জাম টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, সমস্তর ভেতরই মাছের পুর দোব তো মা?

—অ্যাঁ, মাছের পুর? হ্যাঁ, তা দেবে বইকি, বিধবা তো কেউ আসছে না।

ময়দার ঠোলার ভিতরে মাছের পুর দিতে দিতে শৈল বলিল, জানেন মা, এর সঙ্গে যদি একটুখানি হিঙ দেওয়া হত—ভারি চমৎকার হত। বাবার আমার হিঙ ভিন্ন কোনো জিনিস ভালো লাগে না। আর যে-সে হিঙ আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেন না; আফগানিস্থান থেকে কাবুলী সব আসে, তারাই দিয়ে যায়।

শাশুড়ী বললেন, পশ্চিম ভালো যায়গা মা, আমাদের পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে কি তুলনা হয়, না সে সব জিনিস পাওয়া যায়?

শৈল বলিল, পশ্চিমেও সে হিঙ পাওয়া যায় না মা। কাবুলীরা সে সব নিজেদের জন্য আনে, শুধু বাবাকে খুব খাতির করে কিনা, টাকাকড়ি অনেক সময় নেয়—তাই সে জিনিস দেয়। শুধু কি হিঙ, যখন আসবে তখন প্রত্যেকে আঙুর, বেদানা, নাশপাতি, বাদাম, হিঙ—এ সব ছোট ছোট ঝুড়ির এক এক ঝুড়ি দিয়ে যায়। পাঁচজনের মিলে সে হয় কত! কাঁচা জিনিস অনেক পচেই যায়।

ও-ঘরের বারান্দা হইতে ননদ গৌরী মৃদুস্বরে বলিল, এই আরম্ভ হল এইবার।

অর্থাৎ বাপের বাড়ির গল্প আরম্ভ হইল। সত্য কথা, শৈলর ওই এক দোষ; বিনীত, নম্র, মিষ্টমুখী, সুন্দরী বউটি প্রত্যেক কথায় তাহার বাপের বাড়ির তুলনা না দিয়া থাকিবে না।

পাশের বাড়িতে তুমুল কোলাহল উঠিতেছিল, শাশুড়ী এবং বধূতে কলহ বাধিয়াছে।

শৈলর শাশুড়ী বলিলেন, যা হবে, তাই হোক মা। আমার বউ ভালো হয়েছে, উত্তর করতে জানে না; দোষ করলে বকব কি, মুখের দিকে চাইলে মায়া হয়।

শৈল বলিল, ওঁর ছেলে স্ত্রীকে শাসন করেন না কেন? জানেন মা, আমার দাদা হলে আর রক্ষে থাকত না। সঙ্গে সঙ্গে বউকে হয়ত বাপের বাড়ি পাঠিয়ে

দিতেন। একবার বউদি কি উত্তর করেছিলেন মায়ের সঙ্গে, দাদা তিন মাস বউদির সঙ্গে কথা কন নি। শেষে মা আবার বলে কয়ে কথা বলান। তবে দাদার আমার বড্ড বাতিক—খদ্দর পরবে হাঁটু পর্যন্ত, জামা সেই হাত-কাটা—এতটুকু। তামাক না, বিড়ি না, সিগারেট না,—সে এক বাতিকের মানুষ!

শাশুড়ী বোধ হয় মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, নাও নাও, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে নাও ; দেখো, যেন মাছের কাঁটা না থাকে।

শৈল বলিল, ছোট মাছ—কাঁটা বাছতেই হাত চলছে না মা ; তবে এই হয়ে গেল।

কড়ায় এক ঝাঁক সিঙাড়া ছাড়িয়া দিয়া, সে আবার বলিল, মা আমার কক্ষনো ছোট মাছ বাড়িতে ঢুকতে দেন না। দু সেরের কম মাছ হলেই, সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দেবেন। কুচো-মাছের মধ্যে ময়া, আর কাঠ-মাছের মধ্যে মাগুর।

শাশুড়ী বাধা দিয়া বলিলেন, নাও নাও ; সেরে নিয়ে চুল-টুল বেঁধে ফেল গে।

কেশপ্রসাধন-অন্তে শৈল কাপড় ছাড়িতেছিল।

ননদ গৌরী প্রশংসমান দৃষ্টিতে ভ্রাতৃজায়ার দিকে চাহিয়া বলিল—উঃ, রঙ বটে তোমার বউদি! তুমি যা পরবে, তাতেই তোমাকে সুন্দর লাগবে, আর আমাদের দেখ না, যেন কাঠ পুড়িয়ে—

শৈল বলিল, এ যে দেবার নয় ভাই, নইলে তোমাকেও দিতাম। আমার আর কি রঙ দেখছ! বাবা মা দাদা আমার অন্য বোনদের যদি দেখতে, তবে দেখতে রঙ কাকে বলে ; ঠিক একেবারে গোলাপফুল।

গৌরী বিস্মিত হইয়া বলিল, বল কি বউদি, তোমার চেয়েও ফরসা রঙ?

—হ্যাঁ ভাই, বাড়ির মধ্যে আমিই কালো।

শাশুড়ী আসিয়া চাপা গলায় বলিলেন, আর কত দেরি বউমা, ওরা যে সব এসে গেছেন।

শৈল তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া বলিল, এই যে মা, হয়ে গেছে আমার।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের মহার্ঘ উজ্জ্বল সজ্জা ভূষণ রূপ সমস্তকে লজ্জা দিয়া শৈল আবির্ভূতা হইল—নক্ষত্রমণ্ডলে চন্দ্রকলার মত।

প্রবাসিনীর দল মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল, শৈল হাসিমুখে প্রণাম করিল।

ও-বাড়ির গিন্নী বলিলেন, এ যে চাঁদের মত বউ হয়েছে তোমার দিদি। লেখাপড়া-টড়াও জানে নাকি?

শৈল মৃদুস্বরে বলিল, স্কুলে তো পড়ি নি, বাবা স্কুলের শিক্ষা বড় পছন্দ করেন না। বাড়িতে পড়েছি, ম্যাট্রিক স্ট্যাণ্ডার্ড শেষ হয়েছিল, তারপরই—

কথাটা অসমাপ্ত থাকিলেও ইঙ্গিতে সমাপ্ত হইয়া গেল।

ও-বাড়ির গিন্নী বলিলেন, কে জানে মা, আজকাল কি যে হাল হল দেশের, মেয়েদের আর কলেজে না পড়লে বিয়ে হচ্ছে না। আমার বউরা তো কলেজে পড়ছিল সব ; বিয়ের পর আমি সব ছাড়িয়ে দিলাম।

শৈল উত্তর দিল, কলেজের কোর্স আমিও কিছু পড়েছি। তবে আমার বোনেরা সব ভালো করে পড়ছে ; বাড়িতে দাদাই পড়ান, পড়াশোনায় দাদার ভয়ানক বাতিক কিনা, জানেন—বছরে পাঁচ-সাতশ টাকার বই কেনেন—বাংলা, ইংরিজী ! বিলেত থেকে ইংরিজী বই আনাবেন। কাজকর্ম যদি করতে বলবেন মা,—কাজকর্ম অবিশ্যি বাবারই বিজনেস আছে—সেই বিজনেস দেখতে বলেন তো বলবেন, সম্মুখে জ্ঞানসমুদ্র মা, চোখ ফেরাবার আমার অবকাশ নাই।

—কোথায় তোমার বাপের বাড়ি ?

—এলাহাবাদ। এলাহাবাদ গেছেন নিশ্চয়ই, আমাদের সেখানে তিন পুরুষ বাস হয়ে গেল। বাবা সেখানে কণ্ট্রাক্টরি করেন।

—কি রকম পান-টান ?

—আমি তো ঠিক জানি না। তবে মেজভাই বলেন মাঝে মাঝে, এরকম করে আর চলবে না মা, তুমি বাবাকে বল। পাকা বাড়িগুলো ভাড়া দিয়ে নিজে সেই খোলার বাড়িতে থাকবেন, টাঙায় চড়ে কাজ দেখে বেড়াবেন, মোটর কিনবেন না, এ করে চলবে না। বাবা বলেন, এ আমার পৈতৃক বাড়ি, যেমন আছে তেমনই থাকবে, ভাঙবও না, অন্য কোথায় যাবও না। আর গাড়ি, গাড়িও আমি কিনব না, ছেলেরা বিলাসী হবে। আমি রোজগার করছি, তারা যদি না পারে ! জানেন, লোকে বলে—মহেন্দ্রবাবু এক হিসাবে সন্ন্যাসী !

শৈল কথা শেষ করিয়া মৃদু মৃদু হাসি হাসে।

প্রবাসিনী গিন্নী একবার শৈলর শাশুড়ীকে বলিলেন, তাহলে ছেলের তোমার বেশ বড় ঘরেই বিয়ে হয়েছে দিদি। তোমাদের চেয়ে অনেক বড় ঘর। তত্ত্ব-তল্লাস করেন কেমন বেয়াইরা ?

বিচিত্র সংসার, বিচিত্র মানুষের মন, কোন কথায় কে যে আঘাত পায়, সে বোঝা বোধকরি, বিধাতারও সাধ্য নয়। 'তোমাদের চেয়ে বড় ঘর'—এই কথাটুকুতেই অমরের মা আহত হইয়া উঠিলেন, তিনি মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, কে জানে দিদি, বড় না ছোট, সে জানি না। তবে বউমাই বলেন, বাপেদের

এই, বাপেদের ওই ; কিন্তু তত্ত্ব-তল্লাসও দেখি না, আজ দুবছর ওই দুধের মেয়ে এসেছে, নিয়ে যাওয়ার নাম পর্যন্ত নেই।

শৈল মুহূর্তে বলিয়া উঠিল, জানেন তো মা, বাবার আমার অদ্ভুত ধরন! তিনি বলেন, যে বস্তু আমি দান করলাম, সে আবার আমি কেন আমার বলে ঘরে আনব! তবে যাকে দান করলাম সে যদি স্বেচ্ছায় নিয়ে আসে, তখন তাদের আদর করব, সম্মান করব, আমার বলব। আর তত্ত্ব-তল্লাস এত দূর থেকে করা সম্ভব হয়ে উঠে না ; কিন্তু টাকা তো চাইলেই দেন তিনি, যখন চাইবেন, তখনই দেবেন।

শাশুড়ী বলিয়া উঠিলেন, কি বললে বউমা, তোমার বাবা আমাদের টাকা দেন—কখন, কোন কালে ?

শৈল বলিল, আপনাদের কথা তো বলি নি মা ; আপনি জিজ্ঞেস করে দেখবেন—একশ, পঞ্চাশ, আশী—চাইলেই তিনি দেন, কেন দেবেন না ?

শাশুড়ীর মুখ কালো হইয়া উঠিল। শুধু স্বগ্রামবাসী নয়, উপস্থিত মহিলাবৃন্দ প্রবাসিনী—দেশ-দেশান্তরে এ সংবাদ রটিয়া যাইবে। অমরের মায়ের মাথা যেন কাটা গেল।

তিনি বলিলেন, ভালো, অমর আসুক, আমি জিজ্ঞাসা করব। কই ঘুণাক্ষরেও তো আমি জানি না!

ও-বাড়ির গিন্নী বলিলেন, তোমায় হয়ত বলে নি অমর। দরকার হয়েছে, শ্বশুরের কাছে নিয়েছে।

অমরের মা বলিলেন, সে নেবে কেন ভাই ? সে নেওয়া যে তার অন্যায়—নীচ কাজ। ছিঃ, শ্বশুরের কাছে হাত পাতা, ছিঃ!

অমর কাজ করে কলিকাতায়, সেখানে সে অর্ডার-সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করিয়া থাকে। ব্যবসা হইলেও ক্ষুদ্র তাহার আয়তন, সঙ্কীর্ণ তাহার পরিধি, তবুও সে স্বাধীন ; তাই মাসে দুইবার করিয়া সে বাড়ি আসিয়া থাকে। অমরের মা রোষকষায়িত নেত্রে পুত্রের আগমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ধনী কলিকাতা-প্রবাসিনীদের সম্মুখে যে অপমান তাঁহার হইয়াছে, সে তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। শুধু তাঁহার সংসারের অসচ্ছলতাই নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তাঁহাকে মিথ্যাবাদিনী সাজিতে হইয়াছে। এ কয়দিন বধূর সঙ্গেও একরূপ বাক্যালাপও করেন নাই। শৈল অবশ্য সে বিষয়ে দোষী নয়, সে সদাসর্বদাই মুখে হাসিটি মাখিয়া শাশুড়ীর আজ্ঞার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

সংসারের নিয়ম—কাল অগ্নির উত্তাপও হরিয়া থাকে, মনের আগুনও নিবিয়া আসে। কিন্তু শৈলর দুর্ভাগ্য, শাশুড়ীর মনের আগুন-শিখা হ্রস্ব হইতে না হইতে ইন্ধনের প্রয়োগে দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। পাড়ায় ঘরে ঘাটে এই লইয়া যে কানাকানি চলিতেছিল, সেটা ভালোভাবেই ক্রমশ জানাজানি হইয়া গেল।

সেদিন সরকারদের মজলিসে একদফা প্রকাশ্য আলোচনার সংবাদ অমরের মা স্বকর্ণেই শুনিয়া আসিলেন।

দিন দশেক পরেই কিসের একটা ছুটি উপলক্ষ্যে অমর বাড়ি আসিবার কথা জানাইয়া দিল। শৈলর মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কথাটা মিথ্যা, বার বার সঙ্কল্প করিয়াও সে এ বিষয়ে স্বামীকে কোনো কথা লিখিতে পারে নাই—কোনো অনুরোধ জানাইতে কেমন যেন লজ্জা বোধ হইয়াছে। তাহার হাত চলে নাই, ঠোঁট কাঁপিয়াছে, চোখে জলও দেখা দিয়াছে; সে চিঠির কাগজখানা জড়ো করিয়া মুড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। শৈল আপনার শয়নকক্ষে স্তব্ধ প্রতীক্ষায় স্বামীর জন্য বসিয়া রহিল, অমর আসিলেই সে তাহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িবে।

অকস্মাৎ অমরের উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল। অন্ধকারের আবরণের মধ্যে চোরের মত নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া সে আশ্বস্ত হইল। ক্রোধের প্রসঙ্গ তাহাকে লইয়া নয়, অমর বচসা জুড়িয়া দিয়াছে কুলীর সহিত।

—এই আধ মাইল—মালের ওজন আধ মণ পঁচিশ সের, তোকে দু আনা দিলাম—আবার কত দেব ?

লোকটাও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিতেছিল, তখন আপনি চুকিয়ে নেন নাই কেন মশায় ? তখন যে একেবারে হুকুম ঝাড়ালেন—এই, ইধার আও। আমাদের রেট তিন আনা করে—হ্যান, দিতে হবে।

—নিকালো বেটা হারামজাদা, নিকালো বলছি—এই নে পয়সা, কিন্তু এখুনি নিকালো সামনে থেকে বলছি।

পয়সা ফেলিয়া দিয়া অমর ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বাড়ি ঢুকিল।

—দেখ না, লোকসান যেদিন হয়, সেদিন এমনি করেই হয়। পঞ্চাশটা টাকা একজন মেরে দিয়ে পালাল, তারপর ট্রেন ফেল, আবার বাড়ি এসেও চারটে পয়সা লোকসান।

মাও বোধকরি প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি শান্ত অথচ শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, তার জন্যে তোমার চিন্তা কি বাবা ? বড়লোক শ্বশুর রয়েছেন, তাঁকে লেখ, তিনিই পাঠিয়ে দেবেন।

অর্থ না বুঝলেও শ্লেষতীক্ষ্ণ বাক্যশর আঘাত করিতে ছাড়ে নাই। অমর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, তার মানে?

মা বলিলেন, সেই জন্যই তো তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি বাবা। আমি শুনব—তুমি আমাকে তোমার রোজগারের অন্ন খাওয়াও, না তোমার শ্বশুরের দানের অন্নে আমাকে পিণ্ডি দাও? তুমি নাকি তোমার শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা চাও, আর শ্বশুর তোমায় টাকা পাঠিয়ে দেন—একশ পঞ্চাশ আশী, যখন যেমন তোমার দরকার হয়?

ক্লান্ত তিক্তচিত্ত অমরের মস্তিষ্কে মুহূর্তে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, কে, কোন হারামজাদা হারামজাদী সে কথা বলে?

মা ডাকিলেন, বউমা!

শৈলর চক্ষের সম্মুখে চারিদিক যেন দুলিতেছে—কি করিবে, কি বলিবে, কোনো নির্ধারণই সে স্থির করিতে পারিল না।

শাশুড়ী আবার বলিলেন, চুপ করে রইলে কেন, বল, উত্তর দাও?

শৈল বিহ্বলের মত বলিয়া ফেলিল, হ্যাঁ, বাবা দেন তো।

অমর মুহূর্তে উন্মত্তের মত দেওয়ালে মাথা কুটিতে আরম্ভ করিল।

মা তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

অমর বলিল, ও বাড়িতে থাকলে আমি জলগ্রহণ করব না।

মা বলিলেন, আমার মাথা কাটা গেল—হরেনবাবুর বাড়ির মেয়েদের কাছে। এমন বউ নিয়ে আমিও ঘর করতে পারব না বাবা।

বিচারক যেখানে বিধিবদ্ধ বিধানের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সেখানে বিচার হয় না, বিচারের নামে ঘটে—স্বেচ্ছাচার। তাই ওইটুকু অপরাধে শৈলর অদৃষ্টে গুরু দণ্ড হইয়া গেল,—সেই রাত্রেই তাহার নির্বাসনের ব্যবস্থা হইল। রাত্রি বারোটার ট্রেনে শৈলর দেবর তাহাকে লইয়া এলাহাবাদ রওনা হইয়া গেল।

শৈলকে দেখিয়াই তাহার মা আনন্দে বিস্ময়ে আকুল হইয়া বলিলেন, এ কি শৈল, তুই যে এমন হঠাৎ?

শৈল ঢোঁক গিলিয়া বলিল, কেন মা আমাকে কি আসতে নেই? তোমরা তো আনলে না, কাজেই নিজেই এলাম।

মেয়েকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মা বলিলেন, ওরে, আনতে কি অসাধ, না আমার মনেই ব্যথা হয় না, কিন্তু কি করব বল?

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন. বাবর রোজগার কমে গেছে.

বাজার নাকি বড় মন্দা তার ওপর হেমির বিয়ে এসেছে—খরচ যে করতে পারছি না মা।

শৈল অবকাশ পাইয়া অঝোরঝরে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল।

মা বলিলেন, সঙ্গে কে এসেছে শৈলী? জামাই?

শৈল বিবর্ণ মুখে বলিল, না, আমার দেওর এসেছে।

—কই সে—ওমা, বাইরে কেন সে?—ঘরের ছেলে। ওরে দাই, দেখ তো, বড়দিদির্ দেওর বাইরে আছেন, ডাক তো। বল—মা ডাকছেন।

শৈলর বুক দুরদুর করিতেছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অমরের আদেশ ছিল, সে যেন সেখানে জলগ্রহণ না করে। কঠিন শপথ দিয়া আদেশ দিয়াছে অমর।

দাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কই কেউ তো নেই!

মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, সে কি? কোথায় গেল সে?

শৈল বলিল, তাকে ট্রেন ধরতে হবে মা, সে চলে গেছে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে মা যেন অভিভূত হইয়া গেলেন।—ট্রেন ধরতে হবে—চলে গেছে, সে কি?

শৈল বলিল, তাকে সিমলে যেতে হবে মা—একটা খুব বড় কাজের সন্ধান করতে যাচ্ছে; যে ট্রেনে আমরা নামলাম, এই ট্রেনই সে গিয়ে ধরবে, থাকবার তার উপায় নেই।

মা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, ফেরবার সময় নামতে বলে দিয়েছিস তো?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শৈল বলিল, বলে তো দিয়েছি মা, কিন্তু নামতে বোধহয় পারবে না, খুব জরুরী কাজ কিনা। সিমলে থেকে কলকাতায় যাবে একটা কার চিঠি নিয়ে, সময়ে পৌছুতে না পারলে তো সব মিছে হবে।

এই সময়েই শৈলর জ্ঞানান্বেষী বড়দাদা বাড়ি ঢুকিল। পরনে তাহার খদ্দর সত্য, কিন্তু জরিপাড় শৌখিন খদ্দরের ধুতি, গায়েও শৌখিন খদ্দরের পাঞ্জাবি, মুখে একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেট; হাতে কতকগুলি মাছ ধরিবার চারের উপকরণ।

শৈলকে দেখিয়াই সে বলিল, আরে, শৈলী কখন, অ্যাঁ?

হাসিমুখে শৈল বলিল, এই তো দাদা। ভালো আছেন আপনি?

—হ্যাঁ। তা বেশ, কই, তুই নতুন লোক, খাস বাঙলা দেশের মানুষ—কই, দে তো এই চারগুলো তৈরি করে, দেখি, তোর হাতের কেমন পয়! মাছ ধরতে যাব আজ দেহাতে—এক জমিদারের তালাওয়ে।

শৈল উপকরণগুলি হাতে লইয়া বলিল, চলুন না দাদা, একবার আমাদের ওখানে, কত মাছ ধরতে পারেন একবার দেখব।

—তোদের ওখানে পুকুরে খুব মাছ, না রে ?

—আমাদেরই পুকুরে খুব বড় বড় মাছ—আধ মণ, পনের সের, পঁচিশ সের এক-একটা মাছ। জানেন দাদা, তখন প্রথম গেছি, একটা আঠার সে: কাতলা মাছ এনে দেওর বললে, বউদিকে কুটতে হবে। ওরে বাপ রে, সে য আমার ভয়! এখন আর আমার ভয় হয় না—আধ মণ, পঁচিশ সের মাছ দিব্যি কেটে ফেলি।

—যাবার ইচ্ছে তো হয় রে, হয়ে ওঠে না। কলকাতা যাই, তাও অমরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে সময় হয় না। আবার তুই অবিশ্যি যদি কলকাতায় থাকতিস, তবে নিশ্চয় যেতাম।

শৈল বলিল, আচ্ছা, দেখব, আমাদেরও কলকাতায় বাড়ি হবে এইবার—

অর্ধপথে বাধা দিয়া দাদা বলিল, কলকাতায় তোদের বাড়ি হচ্ছে নাকি ?

শৈল বলিল, জায়গা কিনেছেন। ধীরে ধীরে হবে এইবার।

মা পুলকিত হইয়া প্রশ্ন করেন, জামাই এখন বেশ পাচ্ছেন, না রে শৈলী ?

শৈল মুখ নত করিয়া বলিল, দেশেও দালান করবেন।

মাস দুয়েক পরই কিন্তু শৈলর মা অনুভব করিলেন, কোথাও একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটিয়াছে, জামাই বা বেয়ান কেহই তো শৈলকে পত্র দেন না, সংবাদ লন না! তিনি স্বামীকে বলিলেন, দেখ, তুমি বেয়ানকে একখানা পত্র লেখ।

মহেন্দ্রবাবু নিরীহ ব্যক্তি। শৈল অন্যের সম্বন্ধে যতই অত্যুক্তি করিয়া থাক, তাহার পিতার উপার্জনকে যতই বাড়াইয়া বলিয়া থাক, পিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে অত্যুক্তি সে করে নাই। সত্যই তিনি সাধু প্রকৃতির নিরীহ ব্যক্তি।

মহেন্দ্রবাবু স্ত্রীর কথায় শঙ্কিত হইয়া পরদিনই বেয়ানকে পত্র দিলেন। লিখলেন—আমি আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তি, শৈলকে চরণে স্থান দিয়া আপনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি—প্রার্থনা করি, সে অনুগ্রহ হইতে আমি বা আমার শৈল যেন বঞ্চিত না হই। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, সেখানে কি ঘটিয়াছে, শৈল কি অপরাধ করিয়াছে! কিন্তু অপরাধ যে করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে কোনো কথা প্রকাশ করে নাই; তবুও এই দীর্ঘ দুই মাসের মধ্যে কই কোনো আশীর্বাদ তো আসিল না! শ্রীমান অমর বাবাজীবনও তো কোনো পত্র দেন না! দয়া করিয়া, কি ঘটিয়াছে, আমাকে জানাইবেন; আমি নিজে শৈলকে আপনার চরণে উপস্থিত করিয়া আসিয়া দিব।

তারপর শেষে আবার লিখিলেন—অমর সংবাদ না দিলেও শৈলর নিকট তাহার উন্নতির কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কলিকাতায় বাড়ি করিবে শুনিয়া পরম আনন্দ হইল। আপনার মেজছেলের পরীক্ষার সংবাদ শুনিলাম, কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম হইতে পারে নাই। আশীর্বাদ করি, বি. এ-তে সে যোগ্যস্থান লাভ করিবে।

পত্রখানা পড়িয়া অমরের মায়ের চক্ষে জল আসিল।

মনে তাঁহার ক্রোধবহ্নি জ্বলিতেছিল, ইন্ধনের অভাবে সময়ক্ষেপে সে বহ্নি নিবিয়া গিয়াছে। প্রতি পদে তাঁহার শৈলর প্রতিমার মত মুখ মনে পড়িত। বলুক সে মিথ্যা, তবু মিষ্ট কথার সুরটি তাঁহার কানে বাজিত। আজ বেয়াইয়ের পত্র পড়িয়া তাঁহার সকল গ্লানি নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া গেল। শুধু বিদূরিত হইয়া গেল নয়, পুত্রবধুর উপর মন তাঁহার প্রসন্ন হইয়া উঠিল, পত্রের শেষভাগটুকু পড়িয়া আবার তিনি সেখানটা পড়িলেন—কলিকাতায় বাড়ি ইত্যাদি।

তিনি অমরকে পত্র দিলেন। বেয়াইকে লিখিলেন—বউমা আমার ঘরের লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর কোনো অপরাধ হয়? তবে কার্যগতিকে সংবাদ লইতে পারি নাই, সে দোষ আমারই। শীঘ্রই অমর বউমাকে আনিবার জন্য যাইবে।

পত্র পাইবামাত্র শৈল পুলকিত হইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল।

অমর আসিয়াছে। দশ-বারো সেরের একটা মাছ সে সঙ্গে আনিয়াছে। শৈল তাড়াতাড়ি সেটা কাটিতে বসিল।

বলিল, বড় জাতের মাছ বোধহয় ধরা পড়ে নি। এগুলো মাঝলাজাত।

ওদিক হইতে ভ্রাতৃজায়া বলিল, এই আরম্ভ হল। শ্বশুর-বাড়ির অবস্থা ভালো আর কারও হয় না!

রাত্রে অমরের নিকট শৈল নতমুখে দাঁড়াইয়া ছিল। অমর একখানা পত্র বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, এসব কি বল তো?—'একটি বড় মাছ যেমন করিয়া হউক আনিবে, এখানে আমি আমাদের অনেক মাছ আছে বলিয়াছি।' বেশ, আমাদের ষোল-আনা একটাও তো পুকুর নেই, 'অথচ—ছিঃ! আর, 'এখানে মুক্তার গহনার চলন হইয়াছে, আমার জন্য ঝুটা মুক্তার মালা একছড়া'—ও কি—ও কি, কাঁদছ কেন, শৈল, শৈল?

শৈল বিছানায় মুখ গুঁজিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া তুলিল। সে কথা যে অমরকে মুখ ফুটিয়া বলিবার নয়!

ব্যাঘ্রচর্ম

যাহাকে বলে 'অজ পাড়াগাঁ'; মজিদপুর সেই 'অজ পাড়াগাঁ'। পায়ে চলা পথ ভিন্ন এখনও এ গ্রামে প্রবেশের জন্য গাড়ির পথ তৈয়ারি হয় নাই। জামা গায়ে, জুতা পায়ে কোনো বিদেশী গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামের পথচারী কুকুরগুলি লাঙ্গুল গুটাইয়া চিৎকার করিতে করিতে দূরে পলাইয়া যায়; পথের উপর খেলায় নিবিষ্ট দিগম্বর বালকের দল সভয়ে সসম্ভ্রমে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া একপাশে দাঁড়ায়, তারপর পথিকের পিছনে পিছনে গ্রামপ্রান্ত পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া ফিরিয়া আসে। অল্প কিছুদিন আগে এখানে একটি সরকারী ইঁদারা তৈয়ারি হইয়াছে বটে, কিন্তু সে জল পর্যন্ত লোকে এখনও খায় না; বলে, ইঁদেরার জল লোনা—খেলে পেটে লোনা ধরবে।—এমনি পাড়াগাঁ এই মজিদপুর।

এ গ্রামে ইট তৈয়ারি করিতে নাই, কয়লা পোড়াইতে নাই, পান ছাড়া অপর কোনো প্রয়োজনে চুন ব্যবহার করিতে নাই, শেয়ালে ছাগল ধরিয়া লইয়া গেলেও তাড়া করিতে নাই। কারণ—শেয়াল নাকি সাক্ষাৎ ভগবতী। এমনই ক্ষুদ্র গ্রামখানা অকস্মাৎ একদিন বিপুল চাঞ্চল্যে আলোড়িত হইয়া উঠিল, ঠিক যেন ঘনপল্লবে আচ্ছন্ন কোনো একটা ছোট ডোবায় আকাশ হইতে কে একটা বিশ মণ ওজনের পাথর ফেলিয়া দিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে পঙ্কিল শীতল বদ্ধ জল ভয়ে বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহিরে যাইতে চায়, কিন্তু পারে না। গ্রামের লোকগুলির ঠিক সেই অবস্থা, উপায় থাকিলে তাহারা হয়ত পলাইয়া যাইত।

তাহাদের দোষ নাই—তরুণ এম-এ পাশ করা জমিদার আসিয়াছেন। সঙ্গে রাত্রির অন্ধকারের মত কালো রঙের দুইটা গ্রে-হাউণ্ড—টম ও টেবি, আর গাদাখানেক বই। জমিদার তাহাদের ভয়ের বস্তু হইলেও অপরিচিত জন নয়। তাহারা জমিদার ইহার পূর্বে দেখিয়াছে—প্রকাণ্ড বড় বড় পাগড়ী বাঁধা চাপরাসী, ফুরসী, গড়াগড়া, বোতল বোতল কারণ, অকারণ গর্জন, এ সবের সঙ্গে তাহাদের অপরিচয় নাই। কিন্তু গাদাখানেক বই ও কুকুরপ্রিয় হেমাঙ্গবাবুর মত জমিদার তাহাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাহার উপর যেদিন গোমস্তা ঘোষণা করিয়া দিল যে, বাবু কাহারও সহিত দেখা করিবেন না, কাহারও নজরানা লইবেন না, খাজনার কথাও বলা চলিবে না—সেদিন তাহাদের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। কিন্তু বিস্ময়ের অপেক্ষা ভয় হইল আরও বেশী।

হেমাঙ্গবাবু শখ করিয়া মহলে বিশ্রাম লইতে আসিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে কিছু

পড়াশুনা করিবারও অভিপ্রায় আছে। হেমাঙ্গবাবু কাছারীর প্রাঙ্গণে পদচারণা করেন—দূর হইতে প্রজারা দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখে। ছেলেরা আঙুল দেখাইয়া বলে, হুই দেখ বাবু।

বয়স্ক ব্যক্তিরা ছেলেটার হাতখানা টানিয়া নামাইয়া দিয়া বলে, এ্যাঃ-ই খবরদার!—কেহ চুপি চুপি বলে, কি রকম ভাই, আমি তো কিছু বুঝতে লারচি।—মোড়ল মাতব্বর যাহারা, তাহারা কেহ কেহ সাহস করিয়া যায়, কিন্তু কাছারীর সীমানার বাহিরেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখে—লিকলিকে কালো আঁধার কুকুর দুইটা কোথায়।

যে গলার ডাক—সত্যই মানুষের ভয় হয়।

সেদিন কুকুর দুইটা কাছারীর পিছনের দিকে বাঁধা ছিল, তাই সাহস করিয়া ইন্দ্র মণ্ডল কাছারীতে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িল। হেমাঙ্গবাবু তেল মাখিতেছিলেন, সে হাত জোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে, চরণে ত্যাল দিয়ে দিই আমি।

হেমাঙ্গবাবু হাসিয়া বলিলেন—না, থাক।

ইন্দ্র মণ্ডল অবাক হইয়া গেল, তবু সে বলিল—আজ্ঞে, আমি আপনার পেজা!

হেমাঙ্গবাবু লোক খারাপ নন, তিনি মিষ্টি স্বরেই বলিলেন, কি নাম তোমার?

ইন্দ্র উৎসাহিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, ইন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল, হুজুরের মণ্ডল আমি; পুণ্যেপাত্ত।

—বেশ বেশ, কি রকম ফসল হল এবার।

ইন্দ্র কাতর কণ্ঠে বলিল, ভগমানেই মেরে দিলে হুজুর, মানুষের আর অপরাধ কি।

অকস্মাৎ পিছনের দিকে কুকুর দুইটা গম্ভীর ক্রুদ্ধ চিৎকারে স্থানটাকে ভয়সঙ্কুল করিয়া তুলিল। কুকুরের ডাক তো নয়, যেন বাঘের ডাক।

সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বরও পাওয়া গেল, ওরে বাপরে, ই যে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে মানুষকে।

হেমাঙ্গবাবু চাকরটাকে বলিলেন, কোনো লোক দেখে চেঁচাচ্ছে। গিয়ে ঠাণ্ডা কর তো তুই। কে আসছে, চলে আসতে বল, দাঁড়িয়ে থাকলে বেশী চিৎকার করবে।

চাকরটা চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই একজন অসাধারণ লম্বা জোয়ান আসিয়া কাছারীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আভূমি নত হইয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্র ভঙ্গিমায় এক সেলাম বাজাইয়া কহিল—সেলাম হুজুর!

হেমাঙ্গবাবু বিস্মিত হইয়া লোকটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ছয় ফুট,

সাড়ে ছয় ফুট লম্বা এক জোয়ান ; তেমনি পরিপুষ্ট দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, চোখ দুইটা করমচার মত রাঙা, লোকটার হাতে তাহারই দৈর্ঘ্যের অনুরূপ দীর্ঘ একগাছা লাঠি। কপালে প্রকাণ্ড একটা কাটা দাগ।

লোকটি হাসিয়া বলিল—আমাদের রুটি মেরে দিলেন হুজুর। আচ্ছা কুকুর পুষেছেন। বন থেকে বাঘ ধরে আনবে ও কুকুরে—লেলিয়ে দিলে লোকের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলাবে।

হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, ও কুকুর শিকার করবার জন্যেই পোষে।

লোকটি বলিল—তা পুষেছেন বেশ করেছেন কিন্তক—গোলামের মত কুকুর ও লয়। এক লাঠিতেই গোলাম ও দুটোকেই সাবড়ে দেবে।

লোকটাকে দেখিয়া কথাটা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না।

হেমাঙ্গবাবু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—কি নাম তোমার ?

আবার একটা সেলাম করিয়া সে বলিল—গোলামের নাম রতন হাড়ি। হুজুরের গোলাম আমি। এ চাকলায় সকলেই আমাকে চেনে। বলো না গো গোমস্তাবাবু।

হেমাঙ্গবাবু এবার মুখ ফিরাইয়া উপস্থিত ব্যক্তি কয়টির দিকে চাহিলেন। দেখিলেন—গোমস্তা, ঠাকুর, লগদী, ইন্দ্র মণ্ডল, স্থানীয় ব্যক্তি কয়টির সকলেই ভয়ে যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

হেমাঙ্গবাবু প্রশ্ন করিলেন—লোকটি কে হে রাধাচরণ ?

রাধাচরণ গোমস্তা বলিল, আজ্ঞে রতন হাড়ি, এ চাকলার বড় লাঠিয়াল একজন। জমিদারের কাজকর্ম পড়লে কাজ-টাজ করে।

রতন বলিল—হুজুরদের কাছারীতে আমার বাঁধা বিত্তি আছে। সব জমিদারের কাছারীতেই আছে। দাঙ্গা-দখল, পেজা-শাসন যখন যা দরকার হয়, আমি হুজুরদের গোলাম আছি-ই।

তারপর কপালের কাটা দাগটা দেখাইয়া বলিল, মুর্শিদাবাদে ফতেসিং পরগণায় জমিদারদের এক দাঙ্গায় এই দেখেন, মারলে কপালে তরোয়াল দিয়ে —এক কোপ। গলগল করে তাজা রক্ত—গরম কি সে রক্ত—চাল দিলে ভাত হয় হুজুর—বেরিয়ে মুখ ভেসে গেল। তবু আমিও ছাড়ি নাই, সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় বসিয়ে দিলাম লাঠি—ব্যস, ডিমের খোলার মত চুর হয়ে গেল। সেও পড়ল—আমিও পড়লাম। কিন্তু ঐ লাশ পড়তেই ও তরফের সব ভাগলো। আর কখনও সে সীমানায় পা দেয় নাই, তবে আমাকে ছ মাস বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল।

ইন্দ্র মণ্ডল ধীরে ধীরে কাছারী হইতে বাহির হইয়া গেল।

হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—পুলিশ ধরলে না তোমাকে ?

হাসিয়া রতন বলিল—তবে আর হুজুরেরা আছেন কেন ? এস্থা গোলমাল করে দিলেন যে, পুলিশ পাত্তাই পেল না। জলের মত টাকা খরচ করেছিলেন মালিকেরা। মামলাতেও জিতে গেলেন আমারই হুজুর। সে সীমানায় এখন বাবুদের হাজার টাকা আয় বেড়ে গিয়েছে।

একটা সিগারেট ধরাইয়া হেমাঙ্গবাবু প্রশ্ন করিলেন—এখন কোথায় কাজ করো তুমি ?

আবার একটা সেলাম করিয়া রতন বলিল—সবারই কাজ করি আমি হুজুর, যার যখন দরকার পড়ে ; তলব করলেই গোলাম হাজির হয় ; বাঁধি কাজ আমি করি না কোথাও।

—হুঁ, এখন কোথায় এসেছিলে ?

—এই হুজুরের দরবারে। হুজুরকে সেলাম দিতে। শুনলাম হুজুর এসেছেন, তাই এলাম। বকশিশের হুকুম হয়ে যাক হুজুর। ওই কুকুর দুটোকে রোজ দুধ ভাত দিচ্ছেন—আমাকেও আজ কিছু হুকুম হোক।

হেমাঙ্গবাবু গোমস্তাকে ইশারা করিলেন, সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর হইতে একটা টাকা আনিয়া রতনের হাতে দিয়া বলিল—নাও!

রতন পুনরায় অভিবাদন করিয়া বলিল—যখন দরকার হবে হুজুর, কুকুর পাঠিয়ে তলব দিবেন, গোলাম হাজির হবে। যা হুকুম করবেন তাই আমি পারি। হুজুরের যদি কেউ দুশমন থাকে, হুকুম দিলে—। সে ইশারা করিয়া বুঝাইয়া দিল তাহাকে সে খুন করিতে পারে।

তারপর আবার আরম্ভ করিল—এই এরা সব জানেন—এ চাকলায় কাশীদাস বলে এক হারামজাদা চাষা ছিল। এ চাকলা তার ভয়ে কাঁপত। বেটার পয়সাও ছিল, আর বুকের ছাতিও ছিল। আজ এর জমি কেড়ে নিত, কাল ওর পুকুর ছেঁকে মাছ ধরিয়ে নিত, ওকে ধরে খত লিখিয়ে নিত। শেষে চাকলার জমিদারের সঙ্গে লাগল ঝগড়া। গোলামের ওপর ভার হল শেষে। এই বছর দুয়েক আগে কালীপূজোর দিন, মাঠের মধ্যে কাশীদাস হয়ে গেল। পা, হাত, মুণ্ডু—সব অলাদা হয়ে পড়ে ছিল মাঠের মধ্যে।

হেমাঙ্গবাবু তাহার অবয়ব এবং সপ্রতিভ ভঙ্গিমার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন—কাজ করবে তুমি ?

আবার সেলাম করিয়া রতন বলিল, হুকুম করলেই পারি।

—না, সে রকম কোনো কাজ নয়। আমার কাছে চাকরি করবে তুমি ?

—গোলামের পেটটা একটু বড় হুজুর।—বলিয়া হাসিয়া রতন পেটে হাত বুলাইল

—আমার ওই   দুটো পাকী তিন   ভাত খায়, করে দুধ।

—শখের বলিহারি যাই হুজুরের। হুজুর ইচ্ছে করলে আমার মত বিশটে লোক পুষতে পারেন। তা আমি বলব কাল এসে।—রতন অভিবাদন করিয়া বিদায় হইয়া গেল।

গোমস্তা এবার সভয়ে বলিল—ওর মত লোককে ঘরে ঢুকাবেন না হুজুর।

পাচক ব্রাহ্মণটি আবার সাধুভাষায় কথা বলে, সে বলিল, সাক্ষাৎ ব্যাঘ্র হুজুর।

হেমাঙ্গবাবু হাসিয়া বলিলেন—বাঘও তো লোকে শখ করিয়া পোষে! দেখি না দিন কতক পুষে।

পাচকটি কাতর হইয়া বলিল—কি করবেন ওকে রেখে হুজুর ? হুজুরের সুনাম তো দেশময়। কোথাও তো—

বাধা দিয়ে হেমাঙ্গবাবু বলিলেন, এই কুকুর দুটো পুষছি—কাউকে তো লেলিয়ে দেবার জন্যে নয়, দুটো বন্দুকও আমার আছে, কিন্তু মানুষকে তো গুলি করি নে। ভয় কি! দেখি না।

গোমস্তা বলিল—ও কি কাজ করবে হুজুর, বাঁধা কাজ করবার ওর দরকারই হয় না। এই সব কাজে রোজগারও করে ; আর তাছাড়া যার বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াল, তারই ঘরে সেদিনের খোরাকটা করে নিয়ে গেল। কেউ তো 'না' বলতে পারে না। ওকে দেখলেই লোকে ভয়ে কাঁপে—যা চায় দিয়ে বিদায় করে বাঁচে।

পাচকটি বলিল—তবু দেখুন গিয়ে হতভাগ্যের চালে খড় নাই, পত্নীর পরিধানে ছিন্নবস্ত্র। পাপের ধন কর্পূরের মত উড়ে যায়। সেই যে বলে শাপ সঞ্চিত ধন, আর বন্যার জল—এ কখনও থাকে না।

গোমস্তার অনুমান কিন্তু সত্য হইল না। পরদিন প্রাতঃকালেই রতন আসিয়া দাঁড়াইল। সেদিন সে আর সেলাম করিল না, হেমাঙ্গবাবুর পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, হুজুরের পায়েই আশ্রয় নিলাম আজ থেকে।

দিন কয়েক পর হেমাঙ্গবাবুর বইয়ের উপর বিরক্তি ধরিয়া গেল। তিনি বন্দুক ও কুকুর দুইটাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বড় শিকার

এখানে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, তবে খরগোশ ও পাখি এখানে অজস্র। হরিয়াল, তিতির, সরাল পাখি ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া বেড়ায়। বন্দুকের শব্দও তাহাদের নিকট অপরিচিত। গোমস্তা বলিল—রতন, তুমি বাবুর সঙ্গে যাও।

রতন বলিল—হুজুরের সঙ্গে চলেছে দুই বাঘ—হাতে বন্দুক, রতন আর ও পাখ-পাখুড়ী কুড়োতে কোথা যাবে! ওই শম্ভুকে পাঠিয়ে দাও।—সে বেশ মশগুল করিয়া তামাক সাজিতে বসিল।

হেমাঙ্গবাবু গ্রাম পার হইয়া মাঠে একটা বনফুলের ঝোপের কাছে আসিতেই কি একটা জানোয়ার লাফ দিয়া বাহির হইয়া মাঠে ছুটিল—খরগোশ!

তিনি বন্দুক তুলিয়া ধরিয়া গুলি ছুঁড়িলেন। খরগোশটা একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িয়া গেল; কিন্তু পরমুহূর্তেই উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ছুটিতে আরম্ভ করিল। তখন টম ও টেবি ছুটিয়াছে। দেখিতে দেখিতে টম আসিয়া নিরীহ জানোয়ারটার ঘাড়ের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িল। নিস্তব্ধ প্রান্তর করুণ চিৎকারে সকরুণ হইয়া উঠিল। হেমাঙ্গবাবুর মনে হইল, কোনো ছাগল-ছানাকে কুকুরটা ভুল করিয়া বোধহয় আক্রমণ করিয়াছে, ঠিক এমনি চিৎকার। তিনি ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, ছাগল নয়—খরগোশ। খরগোশের চিৎকার কখনও তিনি শোনেন নাই। টম আরও গোটা দুই ঝাঁকি দিতেই জীবটা নীরব হইয়া গেল।

মানুষের বুকের হিংস্রবৃত্তি যখন পাশবিক উল্লাসে জাগিয়া উঠে, তখন মানুষ আর একরকম হইয়া যায়। একবার হত্যা করিয়া কৃতকার্য হইলে আর রক্ষা নাই, হত্যার পর হত্যা করিবার জন্য মানুষ পাগল হইয়া উঠে। প্রথমেই এমন একটি শিকার করিয়া হেমাঙ্গবাবু মাতিয়া উঠিলেন। শিকার শেষে এক বোঝা পাখি লইয়া যখন কাছারীতে ফিরিলেন, তখন বেলা গড়াইয়া অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে।

স্নানাহার শেষ করিয়া একখানা বই লইয়া বসিয়াছিলেন, এমন সময় গোমস্তা আসিয়া ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া বলিল—খরগোশটার পেটে চারটে বাচ্চা ছিল।

হেমাঙ্গবাবু অনেক শিকার করিয়াছেন, মরা পাখির পেটে ডিম অনেকবার পাইয়াছেন, সুতরাং এ সংবাদে তিনি বিস্মিত হইলেন না। বরং কৌতূহলপরবশ হইয়া উঠিয়া বলিলেন—তাই নাকি? কই চলো তো দেখি কেমন?

সত্যই লম্বা একটা চামড়ার থলির মধ্যে পরিপূর্ণ অবয়ব চারটি শাবক রহিয়াছে, স্পষ্ট দেখা গেল। হেমাঙ্গবাবু বলিলেন, একটু অন্যায় হয়ে গেল। যাকগে। বাচ্চা চারটে দিয়ে দাও ওই কুকুর দুটোকে।

রাত্রে আহারের সময় হেমাঙ্গবাবু দেখিলেন, লোকজন সকলেই খাইতে বসিয়াছে, কেবল রতন নাই। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—রতন কই?

গোমস্তা বলিল—সে খাবে না বলেছে, তার শরীর ভালো নাই।

চাকরটা মৃদুস্বরে বলিল—সমস্ত সন্ধ্যেটা সে কেঁদেছে।

—কেন?

—ঐ খরগোশটার পেটের বাচ্চাগুলোকে দেখে।

হেমাঙ্গবাবু অবাক হইয়া গেলেন! একটা নরঘাতী! মানুষের উপর কোনো অত্যাচার করিতেও যে ইতস্তত করে না, সে তুচ্ছ একটা পশুর জন্যে কাঁদে!

পরক্ষণেই তিনি আবার হাসিলেন। সবই অভ্যাস—যে মানুষ পশুহত্যা করে সে নরহত্যা করিতে পারে না; যে নরহত্যা করে, সে পশুহত্যা দেখিয়া কাঁদে। একবার ভাবিলেন, লোকটাকে বিদায় করিয়া দেওয়াই ভালো, পরক্ষণেই মনে হইল, থাক।

রতন হেমাঙ্গবাবুর কাছেই থাকিয়া গেল, সপরিবারে উঠিয়া আসিয়া সে হেমাঙ্গবাবুর এলাকার মধ্যেই বসবাস আরম্ভ করিল। হেমাঙ্গবাবুই তাহার সব করিয়া দিলেন। সে এখন খায় দায় আর হেমাঙ্গবাবুর কাছারীতে আসিয়া বসিয়া থাকে। ঐ কুকুর দুইটার সঙ্গে তাহার বড় সদ্ভাব—সে-ই এখন তাহাদের তদ্বির-হিসাবেও তদারক করে।

হেমাঙ্গবাবু একটু খেয়ালী মানুষ, দুর্দান্ত ভয়ঙ্কর জানোয়ারের উপর তাঁহার অহেতুক আকর্ষণ আছে, নতুবা মানুষ তিনি খারাপ নন, জমিদার হিসাবে তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক প্রজাপালক শিষ্ট জমিদার বলিয়া খ্যাতি আছে। সুতরাং রতনকে এখনও তাহার গুণপনার পরিচয় দিতে হয় নাই। কর্মচারীরা কিন্তু বড় বিরক্ত হয়, ঐ এমন ধারা ভয়ঙ্কর একটা লোককে দেখিয়া তাহাদের আতঙ্কও হয় —আবার রতনের মোটা বেতনের জন্য হিংসাও হয়। তাছাড়া রতন ইহাদের উপর অত্যাচার করে। এক একদিন এক একজনের কাছে গিয়া সেলাম বাজাইয়া বলে—আজ মদের ইলেমটা কিন্তুক আপনার কাছে পাওনা গোমস্তা মশাই।

যমের কাছে অনুনয়-বিনয় চলে, কিন্তু যমদূতের নিকট অনুনয় করিলে ফল হয় না; তাহারা কেহ একটা আনি, কেহবা একটা দু-আনি ফেলিয়া হাত ছাড়িয়া বাঁচে।

রতন অকৃতজ্ঞ নয়; সে আবার একটা সেলাম করিয়া বলে—বাবুর গোলাম আমি আপনারও গোলাম। যখন যা কাজ পড়বে হুকুম দেবেন।

নিরীহ কর্মচারী কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলে, আমাদের আবার কাজ কি রতন

রতন বুঝাইয়া বলে—হুজুর, মানুষ হলেই কাজ আছে। আপনার দুশমন ? যে যেমন মানুষ তার তেমন দুশমন, তার তেমন কাজ। এই দেখেন—ক্ষেতপুরের জমিদারের এক সরকার; বুঝলেন, তার ঝগড়া লাগল তার গাঁয়ের স্যাকরার সঙ্গে। মশাই, এক বেটা সেঁকরা গোটাকতক পয়সা করে যেন সাপের পাঁচ পা দেখলে। সরকার আমাকে ধরলে, রতন, আমাকে বাঁচাতেই হবে, নইলে মান ইজ্জৎ তো আর রইল না। পঁচিশ টাকা ঠিকে হল। তিনদিন না যেতেই বুঝলেন—ছুটে গেল বেটার চালে চালে লাল ঘোড়া।

কর্মচারীটা সভয়ে বলিয়া উঠিল—আগুন!

অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে রতন বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, লাল ঘোড়া আগুনকেই বলে। তা আপনার একবার নয়, তিন তিনবার। শেষে বেটা সেঁকরা টিন দিলে ঘরে। তখন একদিন করলাম কি জানেন, গাঁয়ের সদর রাস্তার উপর বেটা দাঁড়িয়েছিল, বেটার কানটা ধরে গাঁয়ের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত ঘোড়দৌড় করে দিলাম।

কর্মচারীটা চুপ করিয়া রহিল, সে আর কথা বাড়াইতে নারাজ, রতনের হাত হইতে রেহাই পাইলেই সে বাঁচে। রতন কিন্তু রেহাই দিল না, সে তাহার ভয়ঙ্কর মুখ আরো বীভৎস করিয়া কৌতুকের হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল—লাল ঘোড়া তো খুব সস্তা হুজুর। একটি দেশলাইয়ের কাঠি হলেই—ব্যস। এক টাকা দিলে ঘরের এক কোণে দিতাম, দুটাকা দিলে দুকোণে, তিন টাকায় তিন কোণে, চার টাকায় বেড়াজাল—একেবারে ইধার-উধার পর্যন্ত!

কর্মচারীটি এবার বিরক্ত হইয়া বলিল—কিন্তু যমের ঘরে তো জবাবদিহি করতে হবে রতন।

হি হি করিয়া হাসিয়া রতন বলিল—সেদিন আর কাউকে পয়সা লাগবে না হুজুর, রতন নিজের গরজেই যমের দালানে আগুন লাগাবে।—বলিয়া সে এবার উঠিয়া চলিয়া গেল।

একদিন রতনের কাজ আসিয়া উপস্থিত হইল।

সম্প্রতি হেমাঙ্গবাবু একখানি নূতন মৌজা খরিদ করিয়াছেন, সেইখানে প্রজাদের সহিত বিরোধ বাধিয়া উঠিল। হেমাঙ্গবাবুকেও দোষ দিতে পারা যায় না, তিনি বিরোধ করিতে চাহেন নাই। বিরোধ করিল প্রজারাই। নজর, সেলামী বা কোনো আবওয়াবই হেমাঙ্গবাবু দাবি করেন নাই, তিনি দাবি করিয়া ছিলেন, আইনসঙ্গত প্রাপ্য খাজনা। কিন্তু তাও প্রজারা দিবে না।

তাহারা বলে—খাজনা কিসের ? মাঠ চষা—তার আবার খাজনা কিসের ?

হেমাঙ্গবাবু নালিশ করিলেন। প্রজারা তাঁহার কাছারীতে আগুন দিল; একদিন পথে তাঁহার গোমস্তাকে ধরিয়া কান মলিয়া অপমান করিয়া ছাড়িল। গোমস্তা আসিয়া হেমাঙ্গবাবুর পায়ে গড়াইয়া পড়িতেই হেমাঙ্গবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি রতনকে তলব করিলেন। রতন আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন—এতদিন বসে বসে খেলি, হাতীর মত তোকে পুষলাম, এইবার কাজ দেখাতে হবে।

রতন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—নতুন মৌজা পলাশবুনি পোড়াতে হবে।

রতন প্রশ্ন করিল—পলাশবুনি ?

—হ্যাঁ, একধার থেকে আর একধার পর্যন্ত—যেন একখানি ঘরও না বাঁচে, বুঝলি ? যদি কেউ দেখতেই পায়, কি বাধাই দেয়—তবে তাকে শেষ করে দিয়ে আসবি।

—খুন ?—রতন হুকুমটা বোধকরি বেশ করিয়া সমঝাইয়া লইতে চাহিল।

—হ্যাঁ, খুন।—হেমাঙ্গবাবু সকম্পিত কণ্ঠস্বরেই পুনরায় আদেশ দিলেন।

রতন আর কোনো কথা বলিল না, চলিয়া গেল।

হেমাঙ্গবাবু উৎকণ্ঠিতচিত্তে রতনের প্রত্যাবর্তনের পথ চাহিয়া ছিলেন। দ্বিতীয় দিনে তাঁহার মনে হইল, উত্তেজনাবশতঃ এ হুকুম তিনি না করিলেই পারিতেন। কিন্তু রতন কি সে কাজ ফেলিয়া রাখিয়াছে! তৃতীয় দিন তিনি রতনের জন্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, রতন ধরা পড়িল না তো ! চতুর্থ দিন তিনি অন্য একজন পাইককে ডাকিয়া বলিলেন, রতনের বাড়িটা খোঁজ করে আয় তো।

পাইকটা ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আজ্ঞে, কারও দেখা পেলাম না। তার পরিবার কোথা গিয়েছে। ঘরে শেকল লাগান রয়েছে।

কিন্তু রতন তো ফেরে নাই। চিন্তিত হইয়া হেমাঙ্গবাবু পলাশবুনিতেই লোক পাঠাইলেন। কিন্তু তাহার পূর্বেই সব সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। অপরাহ্ণেই জানা গেল, রতন দ্বিতীয় দিন রাত্রে তাহার স্ত্রীকে লইয়া সেখান হইতে পলাইয়া গিয়াছে। ঘরে তৈজসপত্রের মধ্যে পড়িয়া আছে কয়েকটা ভাঙ্গা হাঁড়ি। পলাশ-বুনি হইতে সংবাদ আসিল, গ্রামও পোড়ে নাই—রতনও ধরা পড়ে নাই।

হেমাঙ্গবাবু স্তব্ধ বিস্ময়ে বসিয়া রহিলেন। নায়েব গোমস্তারা বলিল, এই লোকের ঐ ধারাই বটে। বেটা সেখানে কিছু টাকা খেয়ে পাঁয়তারা করেছে আর কি ?

হেমাঙ্গবাবু সেদিন সমস্তদিন কুকুর দুইটার পরিচর্যায় মত্ত হইয়া রহিলেন।

বৎসর খানেক পর হেমাঙ্গবাবু তাঁহার এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে গেলেন হুগলী জেলার একখানা গ্রামে। বন্ধুও তাঁহার অবস্থাপন্ন জমিদার। সেইখানে সহসা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই তাঁহার সহিত রতনের সাক্ষাৎ হইয়া গেল।

বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন—এবার আমি এক বাঘ পুষেছি, দেখবে?

হেমাঙ্গ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—বাঘ?

—হ্যাঁ বাঘ। যাকে শেলেদা বাঘ।

—চলো, দেখি কোথায়?—হেমাঙ্গবাবু উৎসুক হইয়া উঠিলেন। বন্ধু বলিলেন, বসো না। এইখানে আনছি। ওরে তারাচরণকে ডেকে দে তো।

হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—বাঘ এখানে আনবে কি হে? না—না, এ সাহস ভালো নয়। এখনও বাচ্চা বুঝি?

—বাচ্চা নয় বরং প্রৌঢ়।

—বলো কি?—হেমাঙ্গবাবুর বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

—সেলাম হুজুর।

আভূমি নত সেলাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রতন হেমাঙ্গবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া যেন নিশ্চল পাষাণ হইয়া গেল।

হেমাঙ্গবাবুর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই বন্ধুটি রসিকতা করিয়া বলিলেন—নর-ব্যাঘ্র। শিকার দেখিয়ে শেকল খুলে দিলে তার আর নিস্তার নাই।

হেমাঙ্গবাবু বলিলেন—হুঁ।

এই সময় একজন কর্মচারী আসিয়া হেমাঙ্গবাবুর বন্ধুকে কি বলিতেই তিনি উঠিয়া বলিলেন—তুমি আলাপ করো এর সঙ্গে, আমি আসছি।

রতন হেমাঙ্গবাবুর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হেমাঙ্গবাবু প্রশ্ন করিল—তুই পালিয়ে এলি কেন?

রতন বলিল—আমি যে পারলাম না হুজুর কাজ করতে।

—কেন?

—কখনও যে আমি ও কাজ করি নি। আমি সব মিথ্যে করে বলতাম। যেখানে যে খুন দাঙ্গা হত, সব আমি নিজের নাম দিয়ে মিথ্যে করে বলতাম।

হেমাঙ্গবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কেন এমন করতিস? কে তোকে এ বিদ্যে শেখালে?

রতন শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তারপর মাথা হেঁট করিয়া অনাবশ্যক ভাবে মাটিতে দাগ কাটিতে কাটিতে বলিল, হুজুর, দশ বছর আগে, তখন আমার একটিমাত্র ছেলে। সেবার দেশে আকাড়া হল এমন যে, না খেয়ে মানুষ মরতে লাগল। পেটের জ্বালায় দেশ ছেড়ে পালিয়ে আপনার সঙ্গে যেখানে প্রথম দেখা হয়, ঐ চাকলায় আসি। এ চাকলায় ধান-টান চারটি হয়েছিল, আমার সেই উপোস-সার শরীরে বল ছিল না, খাটতে পারতাম না, ভিক্ষেও কেউ দিত না। তার উপর ছেলেটার হল অসুখ। কোনো কিছু করেও কিছু যোগাড় করতে পারলাম না। এক জমিদারের বাড়ি গেলাম—সেখানেও ভিক্ষে দিলে না, তাড়িয়ে দিলে। পথে আসতে আসতে আবার ফিরলাম। জমিদারকে গিয়ে বললাম, ভিক্ষে দেন—না হয় কাজ দেন। জমিদারবাবু বললেন, কি কাজ পারিস তুই? মরিয়া হয়ে বললাম—যা বলবেন, খুন, জখম, ঘরে আগুন লাগান —যা বলবেন, তাই করব। আশ্চর্য বাবু, জমিদারবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে একটা টাকা বকশিশ দিয়ে দিলেন। ছেলেটা মরে গেল সেই অসুখেই, আমি কিন্তু ফন্দিটা শিখে নিলাম। যেখানে যা খুন-জখম হত, বলতাম আমি করেছি। লোকে ভয় করত, যার দোরে দাঁড়াতাম, সে-ই আঁচলটা ভরে দিত, খাতিরও করত।

রতন চুপ করিল।

হেমাঙ্গবাবুও নীরব। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন—চল, তুই আমার সঙ্গে ফিরে চল। তোকে কিছু করতে হবে না।

রতন তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল—আর জন্মে আপনি আমার সত্যিই বাপ ছিলেন হুজুর।

আশ্চর্য! পরদিন প্রাতেই কিন্তু দেখা গেল রতন স্ত্রীকে লইয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে।

এবার আর হেমাঙ্গবাবু বিস্মিত হইলেন না। তিনি কল্পনানেত্রে দেখিলেন —আবার কোন দূরদেশে রতন আভূমি নত হইয়া সেলাম করিয়া কোনো বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিকে অভিবাদন করিতেছে—সেলাম হুজুর!

পু ত্রে ষ্টি

রামচন্দ্রপুরের উত্তরপাড়ার বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির মেজকর্তা বৈঠকখানায় একা বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন। অকস্মাৎ কি যেন তাঁহার খেয়াল হইল—পট করিয়া একগাছা গোঁফ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। বলিলেন—বেটা, তুমি দুধের সব খাবে!—বলিয়া আবার একগাছা। আবার একগাছা—আবার একগাছা। এইবার কিন্তু তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে হইল, গোঁফ জোড়াটির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—উঃ! তারপর একটু চিন্তা করিয়া আপনাকে বোধ করি প্রশ্ন করিলেন—মাথায় টাক পড়ে—গোঁফে টাক পড়ে না কেন? এমন সময় দরজার গোড়ায় খুট খুট শব্দ উঠিল। দীর্ঘ শীর্ণকায় এক বৃদ্ধ দরজার মুখেই ভারি একজোড়া চটিজুতা খুলিয়া, প্রকাণ্ড একটা হুঁকা হাতে ঘরে প্রবেশ করিল। লোকটির চোখে অতিরিক্ত রকমের পুরু কাচের একজোড়া চশমা। চশমার ডাঁটি দুইটি আবার নাই—তাহার স্থলে দুই প্রান্ত দড়ির বেড় দিয়া মাথার পিছনে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। ঘরে প্রবেশ করিয়াই বৃদ্ধ ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তিদের মত ঘাড় তুলিয়া সমস্ত ঘরটা ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। বোধ করি মেজকর্তাকে ঠাওর করিয়া লইয়া—হেঁট হইয়া একটি প্রণাম করিয়া কহিল—পেনাম! তামাক খান।—সঙ্গে সঙ্গে সসম্ভ্রমে মেজকর্তার সম্মুখে হুঁকাটি বাড়াইয়া ধরিল। হুঁকাটায় গোটা-দুই টান দিয়া মেজকর্তা বলিলেন—আচ্ছা, এ কি করা যায় বল দেখি, রায়?

রায় উত্তর দিল—আজ্ঞে, বাজারের খরচ দেন।

রায় এ বাড়ির বহুকালের পুরাতন ভৃত্য। পায়ে একজোড়া ছেঁড়া চটি—চোখে চশমা-পরা রায় এখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পরিচিত। মেজকর্তা বলিলেন—হুঁ, তা দেখে-শুনে নিয়ে এস।

এদিক-ওদিক দেখিতে দেখিতে রায় অভ্যাস-মত ধীরে ধীরে বলিল—গাছের দব্যি লয় যে পেড়ে আনব, মাঠে পড়ে নাই যে কুড়িয়ে আনব—দোকানে দাম লিবে যে!

উপরের ঠোঁটটা ফুলাইয়া নিম্নদৃষ্টিতে গোঁফগুলি দেখিতেই মেজকর্তা ভোর হইয়া রহিলেন—কোনো উত্তর দিলেন না। রায় বলিল—আজ্ঞে খরচ দেন।

মেজকর্তা চটিয়া উঠিলেন—হুঁকাটা সশব্দে নামাইয়া দিয়া বলিলেন—খরচ—কিসের হে বাপু?

রায় কিন্তু দমিল না, সে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই জবাব দিল—আজ্ঞে, বাজারের।

অপ্রসন্ন মুখে কর্তা বলিলেন—কত ?

রায়ও জবাব দিল—সে তো আদ্যিকাল থেকে হিসেব করাই আছে, আট আনা। ন-আনা ছিল আট আনা করেছেন—সেই তাই দেন।

মেজকর্তা ট্যাঁক হইতে খুলিয়া ছয় আনা পয়সা রায়ের হাতে দিয়া বলিলেন—অ্যা—এই নাও।

পয়সা কয় আনা চশমার কাছে ধরিয়া দেখিয়া শুনিয়া রায় বলিল—তা কি করে হয়—হিসেবের আঁক তো কমাবার লয়—ই—ছ-আনাতে কি করে হবে ?

মেজকর্তা বলিলেন—ওতেই হবে হে বাপু, দেখে-শুনে করতে পারলে ওতেই হবে।

পয়সা ছয় আনা রায় তক্তাপোষে নামাইয়া দিল ; কহিল—তাহলে আমি পারব না আজ্ঞে, যে পারবে তাকেই পাঠান আপনি। আমি বৌমাকে গিয়ে বলে খালাস।

সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরিল। মেজকর্তা তাড়াতাড়ি বলিলেন—বলি শোন হে শোন—এই নাও।—বলিয়া এবার কোঁচার খুঁট হইতে একটি আনি বাহির করিলেন। রায়কে বলিলেন—ছেলে নাই—পিলে নাই—এত খরচ কেন হে বাপু ? এই সাত আনাতেই সেরে এস যাও। আর জ্বালিও না আমাকে।

রায় তবুও পয়সা লইল না ; সে আরম্ভ করিল—আমারই হয়েছে এক মরণ মেজবাবু—কি করে কি করি আমি ! আপনি খরচ দেবেন না—ওদিকে জিনিস কম হলে বৌমা আমার ওপরই রাগবে। কোন জিনিস কম করব আপনি বলেন দেখি ?

মেজকর্তা বলিলেন—তুমি বড় বকো রায়জী, এই নাও। এবার কোঁচার আর এক খুঁট হইতে চারিটি পয়সা বাহির করিয়া তাহার তিনটি রায়ের হাতে দিয়া বলিলেন—আর আমার নাই—আর আমি দিতে পারব না।—বলিয়া রায়ের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিলেন।

রায় আর প্রতিবাদ করিল না ; পৌনে আট আনা লইয়াই আবার একটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। বাহিরে রায়ের চটিজুতার মন্থর শব্দ মিলাইয়া যাইতেই মেজকর্তা উদ্বৃত্ত পয়সাটি মুঠোর মধ্যে অতি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—এ পয়সাটা আমি কাউকে দোব না।—সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাড়ির ভিতরে চলিলেন এই তাম্রখণ্ডটি তাঁহার সঞ্চয়ের ভাণ্ডারের মধ্যে রাখিবার জন্য। এই তাঁহার স্বভাব। আজ বারো বৎসর ধরিয়া তিনি মধু-মক্ষিকার মত শুধু সঞ্চয়ের মোহে ডুবিয়া আছেন। নৈমিত্তিক খরচ হইতে তাঁহার এক কণাও

সঞ্চয় করা চাই—সে সঞ্চয় তিনি আর খরচ করেন না। এবং এই তিল-সঞ্চয়ের জন্য তাঁহার একটি পৃথক ভাণ্ডার আছে—তিল জমিয়া জমিয়া আজ পাহাড় না হইলেও স্তূপ হইয়াছে—লোকে বলে বাঁড়ুজ্জেদের আঁটকুড়ো কর্তার ছাতাধরা টাকা।—মধ্যে মধ্যে এ কথা মেজকর্তার কানে আসে, তিনি স্তব্ধ হইয়া থাকেন!

বৈঠকখানার পরই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের একপাশে খামারবাড়ি, অপর অংশটায় দেবালয় ও নাটমন্দির, তাহার পরই সে আমলের পাকা বাড়ি। নাটমন্দির পার হইয়া মেজকর্তা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলেন। বাড়িটা এখন তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তরদিকের অংশটা মধ্যম তরফের ভাগে পড়িয়াছে। দোতলার শয়ন-ঘরে খাটের শিয়রে সিন্দূরের মাঙ্গলিক চিহ্ন শোভিত লোহার সিন্দুক। সিন্দুকটা খুলিয়াই মেজকর্তা চটের একটা প্রকাণ্ড থলিয়ার মধ্যে পয়সাটি রাখিয়া দিলেন। একদিকে কাঠের দুইটা হাতবাক্স রহিয়াছে—তাহার একটায় মহলের আমদানীর টাকা থাকে, অপরটায় থাকে বন্ধকী কারবারের সোনারুপার অলঙ্কার-পত্র। সম্পদসম্ভারগুলির দিকে চাহিয়া তাঁহার অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল। একবার তিনি চটের থলিয়াটা তুলিয়া ধরিয়া ওজন অনুমানের চেষ্টা করিলেন। থলিয়াটার ওজনের গুরুত্বে খুশী হইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন পঁচিশ সের কি ত্রিশ সের, কোন ওজনটা ঠিক! কিন্তু বাধা পড়িল, পিছন হইতে মেজগিন্নী বলিলেন—ও হচ্ছে কি?

তাঁহার কোলে একটি শীর্ণকায় শিশু।

থলিয়াটা রাখিয়া দিয়া মেজকর্তা তাড়াতাড়ি সিন্দুকের ডালাটা বন্ধ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মেজগিন্নী হাসিয়া বলিলেন—ভয় নেই, টাকাকড়ি চাইতে আসি নি আমি—তুমি ধীরে সুস্থে সিন্দুক বন্ধ কর।

মেজকর্তা অপ্রস্তুতের মত কহিলেন—তা, তা নাও না কেন তুমি—ইয়েকে বলে কি চাই, নাও না কেন!

—না, টাকা তোমার আমি চাই না। তুমি অনুমতি দাও, এই ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র নিই। বড় সুন্দর ছেলে গো, দেখ একবার।

মেজকর্তা স্থিরদৃষ্টিতে মেজগিন্নীর মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলেন, শিশুর দিকে চাহিলেন না বা কোনও উত্তর দিলেন না। মেজগিন্নী বলিলেন—ছেলের জন্য তোমার মনের কষ্ট আমি জানি। আমাকে লুকুলে কি হবে—আমার তো চোখ আছে, কি মানুষ কি হয়ে গেলে! কতবার বললাম আবার তুমি বিয়ে কর—সেও করলে না।

মেজকর্তার চিত্ত বোধ করি অস্থির হইয়া উঠিতেছিল—তাঁহার অঙ্গভঙ্গির

চাঞ্চল্যে সে অস্থিরতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তিনি কি বলিতে গেলেন, কিন্তু বাধা দিয়া মেজগিন্নী বলিলেন—স্থির হয়ে বস খ—আমার কাছেও তুমি পাগল সেজে থাকবে ?

সমস্ত শরীরটা দুই হাতে চুলকাইতে চুলকাইতে মেজকর্তা বলিলেন—যে গরম—শরীর শুড়শুড় করছে—উঃ !

বিছানার উপর হইতে পাখা তুলিয়া লইয়া মেজগিন্নী বলিলেন—বস, আমি বাতাস করি।

বার দুই শুষ্ক কাশি কাশিয়া মেজকর্তা বলিলেন—উঁহু, গরুগুলো কি করছে—মানে খেতে-টেতে পেল কি না—ছাড়, পথ ছাড়।

দরজার মুখ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া মেজগিন্নী বলিলেন—আমার কথা শেষ হোক, তবে যাবে। শোন, এই ছেলেটিকে আমি পুষ্যি নোব। চাটুজ্জেদের ভাগ্নে—মা নেই, বাপ নেই ; কেউ নেই। মামীও বিদেয় করতে পারলে বাঁচে—সামান্য কিছু দিলেই দিতে চায়।

অস্থির চঞ্চলভাবে মেজকর্তা বলিয়া উঠিলেন—না না না ; ও হবে না, ও হবে না, ও সব কলুষে চারায় কাজ নেই আমার। কি বংশ, না কি বংশ—! ছাড় ছাড়, পথ ছাড়।

মেজগিন্নী দৃঢ়ভাবে বলিলেন—না।

মেজকর্তা তখনও বলিতেছিলেন—চোর না ছ্যাচড়, না ভিখিরীর ঘরের ছেলে—ও সব হবে না। মরে যাবে—মরে যাবে—চেহারা দেখছ না !

মেজগিন্নীর চোখে জল দেখা দিল, সজল চক্ষে তিনি বলিলেন—ওগো, দুবেলা ভাত-মুড়ি পেট ভরে খেতে পায় না, দুধ তো দূরের কথা। ওদের বাড়িতে থাকলেই ছেলেটা মরে যাবে।

অকারণে খাটের চাদরখানা টানিতে টানিতে মেজকর্তা বলিলেন—যায় যাক—মরে গেলে ফেলে দেবে ওরা।

মেজগিন্নী বলিলেন—ছি—অবোধ শিশু তোমার কি দোষ করলে বল তো ?

মেজকর্তা আপন মনেই বলিতেছিলেন—পরের ছেলে—পরের ছেলে—হবে না—হবে না। ফিরিয়ে দাও—চার আনা পয়সা বরং—

মেজগিন্নী ততক্ষণে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। সম্মুখের লম্বা বারান্দাটার দূরতম প্রান্তে ক্ষীণ পদধ্বনি ক্রমশ ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে সিঁড়ির বুকের মধ্যে নিঃশেষে বিলীন হইয়া গেল। মুখের কথাটা অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া মেজকর্তা এতক্ষণ স্তব্ধভাবেই দাঁড়াইয়াছিলেন। স্ত্রীর অস্তিত্বের

মিলাইয়া যাইতে এতক্ষণে তিনি স্ত্রীর গমনপথকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন —আচ্ছা—আমার ছেলে নেই তো তোমার কি বাপু?—তারপর আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—যুধিষ্ঠির নিব্বংশ—ভীম নিব্বংশ—রাবণ নিব্বংশ —কেষ্টঠাকুর নিব্বংশ—আমিও নিব্বংশ—বংশ নেই তো নেই, হবে কি?—বলিতে বলিতে তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া বৈঠকখানার দিকে চলিলেন। চাষ-বাড়ির প্রান্তে প্রাচীরের গায়ে সারি সারি পেয়ারার গাছ। মেজকর্তা লক্ষ্য করিলেন, বিনা বাতাসেই গাছগুলি আন্দোলিত হইতেছে—বুঝিলেন গাছে বাঁদর লাগিয়াছে; তিনি হাঁকিলেন—নিতাই, ও—নিতাই, পেয়ারা গাছে বাঁদর লেগেছে—তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে।—সঙ্গে সঙ্গে গাছ হইতে ঝুপ ঝাপ করিয়া দশ-বারোটি ছেলে লাফ দিয়া মাটিতে পড়িল। মেজকর্তা যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। ছেলেরা উপদ্রব করিলে তিনি জলিয়া যান। আজও তিনি ঠিক বালকের মত ছুটিয়া ছেলের দলকে তাড়া দিলেন। কিন্তু কাহাকেও পাইলেন না, বাড়ির বহিঃসীমা হইতে শিশুকণ্ঠের কলহাস্যে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। বিফলতার জন্য মেজকর্তার ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। বিপুল আক্রোশে কয়টা ঢেলা কুড়াইয়া লইয়া তিনি পেয়ারা-গাছের উপর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার মনেই বলিলেন, পেয়ারারই বুনেদ মারব আজ।—কিন্তু নিরস্ত হইতে হইল, পিছনের পোয়াল-গাদার আড়াল হইতে কে কাঁদিয়া উঠিল। ফিরিয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, দুইটি পোয়াল-গাদার মধ্যবর্তী গলির মত স্থানটির মধ্যে বৎসর চারেকের একটি সুন্দর শিশু ভয়ে কাঁদিতেছে। মেজকর্তাকে দেখিয়া বর্ধিততর ভয়ে তাহার কান্না বন্ধ হইয়া গেল। মেজকর্তা ছেলেটির দিকে চাহিয়াছিলেন—অতি সুন্দর ছেলেটি! অকস্মাৎ তিনি একান্ত লুব্ধ আগ্রহে যেন ছোঁ মারিয়া শিশুকে বুকে তুলিয়া লইয়া বার-বার চুমা খাইয়া পরমাদরে কহিলেন—ভয় কি, তোমার ভয় কি?—পরমুহূর্তেই চকিত হইয়া উঠিলেন, চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া ছেলেটিকে একরূপ ফেলিয়া দিয়া অতি দ্রুতপদে যেন পলাইয়া আসিলেন। বৈঠকখানায় কেহ ছিল না, নির্জন ঘরে আধ আলো-ছায়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া তিনি হাঁপাইতে ছিলেন। চোখের দৃষ্টি কেমন অস্বাভাবিক রূপে প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। হুঁকার মাথার কল্কেটা হইতে তখনও ক্ষীণ রেখায় আঁকিয়া-বাঁকিয়া ধোঁয়া উঠিতেছিল। মেজকর্তা ধীরে ধীরে হুঁকাটাকে তুলিয়া লইয়া তক্তাপোষের উপর বসিয়া পড়িলেন। হুঁকাটা তিনি টানিলেন না, নীরবে নত দৃষ্টিতে শুধু হুঁকাটা ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। বাহিরে জুতার শব্দ হইল, কিন্তু সে

শব্দ তাঁহার কানে গেল না। যে আসিল সে বড়কর্তার পুত্র—মেজকর্তার ভ্রাতুষ্পুত্র মণি। মণি ডাকিল—কাকা!

মেজকর্তা অদ্ভুত দৃষ্টিতে মণির মুখের দিকে চাহিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন—আসুন আসুন আসুন। ভালো ছিলেন? নেন, তামাক খান।—বলিয়া হুঁকাটা মণির দিকে বাড়াইয়া ধরিলেন।

মণি অপ্রস্তুত হইয়া কয় পদ পিছাইয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে কহিল—আমি মণি। একটা কথা।—কথা তাহার আর শেষ হইল না, মেজকর্তা হুঁকাটা সেইখানেই নামাইয়া দিয়া দ্রুতপদে বৈঠকখানা ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন।

মণি বিরক্ত হইয়া বলিল, সাধে লোকে বলে, ক্ষ্যাপা গণেশ!

বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্বে যখন মেজকর্তার নবীন বয়স, বাঁড়ুজ্জেদের তিন তরফ তখন একান্নবর্তী ছিল। সে আমলে মেজকর্তা কিন্তু এমন ছিলেন না, লোকে তখন তাঁহার নাম দিয়াছিল—বাবু গণেশ। তখন নিত্য সন্ধ্যায় মেজকর্তার আড্ডায় গান-বাজনার মজলিস বসিত। মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত সেতারি আলি নেওয়াজ খাঁ নিয়মিত মাসে একবার করিয়া মেজকর্তার ওখানে আসিতেন। মেজকর্তা খাঁ-সাহেবের নিকট সেতার শিখিতেন। আচারে-ব্যবহারে, কথায়-বার্তায়, আদব-কায়দায় মেজকর্তা উঁচুদরের লোক ছিলেন। খরচ-খরচায় তিনি তখন মুক্তহস্ত। বন্ধু-বান্ধব লইয়া প্রীতিভোজনের বিরাম ছিল না। বড়ভাই দেখিতেন জমিদারী, ছোটভাই দেখিতেন মামলা-মকদ্দমা, মেজকর্তার উপরে ছিল জোতজমা পুকুর বাগান তদারকের ভার।

গ্রামের প্রান্তে চাষ-বাড়িতে মেজকর্তার মজলিস বসিত। নিস্তব্ধ রাত্রে বিপুল হাস্যধ্বনিতে সুষুপ্ত গ্রামবাসী চকিত হইয়া বসিত, কিন্তু পরক্ষণেই আবার নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিত—বুঝিতে পারিত মেজকর্তা হাসিতেছেন।

এমনি করিয়া দশ-বারো বৎসর কাটিয়া গেল, তখন মেজকর্তার বয়স ত্রিশ, মেজগিন্নী পঁচিশ অতিক্রম করিয়াছেন। সেদিন সকালে স্নান-আহ্নিক সারিয়া মেজকর্তা ছোটভাই কার্তিকের মেজখোকাকে কোলে লইয়া জল খাইতেছিলেন। বাড়ির পাঁচটি ছেলের মধ্যে এই শিশুটিই নিঃসন্তান মেজকর্তার বড় প্রিয়। নিজে খাইতে খাইতে খোকার মুখে একটু একটু করিয়া তুলিয়া দিতেছিলেন।

মেজগিন্নী সেদিন বিনা ভূমিকায় বলিলেন—দেখ, আমি বদ্যিনাথ যাব। তোমাকেও যেতে হবে।

মেজকর্তা ভাইপোকে লইয়া মাতিয়াছিলেন, অন্যমনস্ক ভাবেই প্রশ্ন করিলেন —কেন ?

—ধন্না দোব বাবার কাছে।

মেজকর্তা এবার যেন সজাগ হইয়া উঠিলেন। মেজগিন্নীর কণ্ঠবিলম্বিত মাতুলি ও কবচগুলির দিকে চাহিয়া বলিলেন—অনেক তো করলে, আর কেন ?

মেজগিন্নীর চোখে জল দেখা দিল, তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল, বলিলেন—তুমি এই কথা বলছ !

মেজকর্তা খোলা জানালা দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

মেজগিন্নী আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিলেন—বাবাকে ধরে একবার দেখব। কত লোকের তো বংশ হচ্ছে বাবার কৃপায়।

মেজকর্তা নীরবেই বসিয়া রহিলেন—কোনো উত্তর দিলেন না। মেজগিন্নীও নীরবে উত্তরের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। আহারলুব্ধ খোকা জ্যেঠা-মহাশয়ের দাড়িতে টান দিয়া কহিল—হাম্।—খোকার হাতটা সরাইয়া তিনি বিরক্তিভরে বলিলেন, আঃ।—উত্তর না পাইয়া মেজগিন্নী আবার বলিলেন, তুমি না পাঠাও আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও সেখান থেকে আমি যাব। —ওদিকে কোলের মধ্যে খোকার চাঞ্চল্যের শেষ ছিল না, জেঠার নাকে এবার সে একটা ছোবল মারিয়া বলিল, দে হাম।—বিরক্ত হইয়া মেজকর্তা খোকাকে মেজগিন্নীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—দিয়ে এসো ওকে, ওর মার কাছে।—মেজগিন্নী খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া উত্তরের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পর মেজকর্তা মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—খোকাকে তুমি নাও না কেন ?

মেজগিন্নী দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—না। একগাছের বাকল অন্যগাছে কখনও জোড়া লাগে না।

মেজকর্তা বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে বলিলেন—চল, তাই চল।

মেজগিন্নীর দেওঘর-যাত্রার উদ্যোগ হইতেছিল। যাত্রার নির্ধারিত দিনের পূর্বদিন দ্বিপ্রহরে প্রতিবেশিনীরা অনেকে আসিয়াছিল, ছোটগিন্নী বড়গিন্নীও ছিলেন। একজন বলিল—বাবার দয়ার শেষ নাই, ওখানে গেলে বাবার দয়া হবেই।

অন্য একজন বলিল—কপাল ভাই কপাল ; কপালে না থাকলে বাবার হাত নাই। এই আমার—

সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বাধা দিয়া ক্ষেমা-ঠাকরুন বলিয়া উঠিল—উ বল না মা ; বাবার অসাধ্যি কিছু নাই। কার নিয়ে যে কাকে দেন, বাবার ছলা কি

কেউ বুঝতে পারে ? ওই যে মুখুজ্জেবাবুদের মনি-বৌ, ওর যে ওই দশটা ছেলে মরে তিনকড়ি ; ও কে জান ?

এক মুহূর্তে মজলিসটা জমিয়া উঠিল। ক্ষেমা-ঠাকরুন বাবাকে প্রণাম করিয়া আরম্ভ করিল—ও-পাড়ার মুকী দিদি—মোক্ষদা ঠাকরুন গো, ওই ওরই ভাইপো মরে মনি-বৌর ওই তিনকড়ি। জান তো মুকী-ঠাকরুন মনি-বৌর বাড়িতেই থাকত—খাওয়া পরা সব ছিল মনি-বৌর বাড়িতে—দুজনে গলাগলি ভাব। দশটা ছেলে যখন মল, মুকী-ঠাকরুন বত্তিনাথ গেল মনি-বৌর হয়ে ছেলের জন্যে ধন্না দিতে। তিনদিনের দিন স্বপ্ন হল—উঠে যা তুই, ওর ছেলে নাই, হবে না। মুকী সে নাছোড়বান্দা ; বলে—না বাবা, দিতেই হবে, না দিলে আমি উঠব না। দ্বিতীয় দিনেও ঐ স্বপ্ন ! মুকী উঠল না ; বলে—মরব বাবা এইখানে। তখন তিনদিনের দিন স্বপ্ন হল—এই দেখ ভাই, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

সত্যই ক্ষেমা-ঠাকরুনের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রোত্রীরা সকলে স্তব্ধ-নির্বাক। ক্ষেমা-ঠাকরুন আবার আরম্ভ করিল—তিনদিনের দিন স্বপ্ন হল—ওর নাই—তবে কেউ যদি ওকে আপনার দিয়ে দেয় তবে হবে। তুই দিবি ? মুকী বলল—হ্যাঁ বাবা দোব। বাবা বললেন—বেশ তবে ওর ছেলে হবে। মুকীর তো আর ছেলে-পিলে ছিল না, ছিল একমাত্র ভাইপো। মুকী তাকে মানুষ করেছিল। পনের-ষোল বছরের সুস্থ সবল ছেলে, ছেলের ছাতি কি ! সেই ছেলে ভাই, তারই আটদিনের দিন ধড়ফড়িয়ে মরে গেল। তখন মুকী বুক চাপড়ে বলে—হায় আমি করলাম কি গো, এ আমি কল্লাম কি ? সেই ছেলে মরে সেই বছরই মনি-বৌর এই তিনকড়ি হল।

সকলে স্তব্ধ অভিভূত হইয়া বসিয়া ছিল। সহসা বড়গিন্নী বলিয়া উঠিলেন —কি হল রে মেজ, এমন করছিস কেন ?

কম্পিত হস্তে মেঝে চাপিয়া ধরিয়া মেজগিন্নী বলিলেন—দোক্তা খেয়ে মাথা ঘুরছে।

রাত্রে তিনি স্বামীকে বলিলেন—দেখ, কপালে যদি থাকে তবে এমনি বংশ হবে। বত্তিনাথ থাক।

মেজকর্তা বিস্মিত হইয়া গেলেন, বলিলেন—আবার কি হল ?

মেজগিন্নী সে কথা স্বামীর কাছে প্রকাশ করিতে পারিলেন না। সকরুণ নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে শুধু চাহিয়া রহিলেন। মেজকর্তা আদর করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন—ছি—এমন দোমনা হওয়া ভালো নয়।

বাবা বৈদ্যনাথ যে কি স্বপ্নাদেশ দিলেন, সে কথা মেজকর্তা এবং মেজগিন্নী জানেন, তৃতীয় ব্যক্তির নিকট সে কথা তাঁহারা প্রকাশ করিলেন না। প্রত্যাবর্তনের কয়দিন পরে মেজকর্তা বড়ভাইকে গিয়া বলিলেন—আমার একটি কথা ছিল দাদা। বড়কর্তা কি একটা দলিল পড়িতেছিলেন, দলিলখানা রাখিয়া দিয়া তিনি বলিলেন—কি বলবে বল।

একটু ইতস্তত করিয়া মেজকর্তা বলিলেন, আমি মনে করছি পোষ্যপুত্র নোব।

বড়কর্তা প্রশ্ন করিলেন—বাবার দয়া হল না?

মেজকর্তা বলিলেন—সে কথা থাক। এখন আমার ইচ্ছে, মেজবৌরও ইচ্ছে যে কার্তিকের মেজ-খোকাকে—

বড়কর্তা বলিলেন—সে কথা কার্তিককে বল—ছোটবৌমারও মত চাই—তাকেও বলা দরকার।

মেজকর্তা বলিলেন—সে আমি তোমারই ওপর ভার দিচ্ছি।

বড়কর্তা বলিলেন—বেশ, আমি বলছি কার্তিককে।

কয়েক মুহূর্ত পরে আবার বড়বাবু বলিলেন—এ তোমার সাধু সঙ্কল্প গণেশ—ঘরের সম্পত্তি ঘরে থাকবে—একই বংশ—খুব ভালো কথা।

মেজকর্তা হাসি-মুখে চাষ-বাড়ি চলিয়া গেলেন। সেখানে সেদিন পোষ্যপুত্র গ্রহণোপলক্ষে যাগযজ্ঞ ব্রাহ্মণভোজন উৎসব-আয়োজনের ফর্দও হইয়া গেল। গোল বাধিল উৎসবের ফর্দের সময়। বন্ধুদের একদল বলিল—যাত্রা-গান হোক—কলকাতার যাত্রা। আর এক দল বলিল—তার চেয়ে ভেড়ার গোয়ালে আগুন ধরিয়ে দাও। করাতে হলে খেমটা-নাচ করাতে হবে।

মেজকর্তা বলিলেন—কুচ পরোয়া নাই, ও দুই-ই হবে। আর একদিন হোক বৈঠকী মজলিস। খাঁ সাহেবকে লেখা হোক, উনিই সব ওস্তাদ যন্ত্রী নিয়ে আসবেন।

দ্বিপ্রহরে ফিরিয়া বাড়ির ফটকে ঢুকিয়াই মেজকর্তা দেখিলেন, কার্তিক মেজ-খোকাকে কোলে লইয়া বৈঠকখানা হইতে বাড়ির ভিতরে চলিয়াছে। বুঝিলেন কথাবার্তা শেষ হইয়া গিয়াছে। সানন্দে দ্রুতপদে তিনি অগ্রসর হইয়া হাত বাড়াইয়া খোকাকে ডাকিলেন—বাপু ধন!

কথার সাড়ায় ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কার্তিক রুষ্ট স্বরে বলিল—না।—তারপর মেজভাইয়ের আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল—এত বড় চণ্ডাল হিংসুটে তুমি—তা আমি জানতাম না।

মেজকর্তা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কোনো উত্তর না পাইয়া কার্তিক আবার বলিল—এই শিশুকে বধ করে তুমি বংশ রাখতে চাও!—ছি—ছি!

চারিদিক যেন দুলিয়া উঠিল, মেজকর্তা আর্তস্বরে বলিলেন—কার্তিক!

কার্তিকও তখন ক্রোধে জ্ঞানশূন্য; সে বলিল—তুমি লুকালে কি হবে—সত্যি কথা কখনও ঢাকা থাকে না, বুঝেছ! আমরা বাবার স্বপ্নের কথা শুনেছি। চণ্ডাল—তুমি চণ্ডাল!

মেজকর্তা অকস্মাৎ মাটিতে বসিয়া পড়িয়া দুইহাতে মাটির বুক আঁকড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ভূমিকম্প!—পরমুহূর্তে তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন তিনি অজ্ঞান।

সেই দ্বিপ্রহরে গিয়া মেজকর্তা আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বাহির হইলেন পূর্ণ দুই মাস পরে। সেদিন বরাবর তিনি বড়কর্তার নিকট গিয়া বলিলেন—আমার সম্পত্তি ভাগ করে দিতে হবে।

বড়কর্তা চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরমুহূর্তে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন—বস।

ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পদচারণা করিতে করিতে মেজকর্তা এক স্থানে থমকিয়া দাঁড়াইলেন, দেওয়ালের গায়ে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিবিষ্টচিত্তে কি দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিলেন—বাপ রে—বাপ রে—বেটা পিঁপড়ের বংশবৃদ্ধি দেখ দেখি; উঃ, সবারই মুখে একটা করে ডিম!—বলিতে বলিতেই তিনি দুই হাত দিয়া পিপীলিকাশ্রেণীকে দলিয়া পিষিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। বড়কর্তা উঠিয়া আসিয়াছিলেন, মেজভাইয়ের পিঠে হাত দিয়া তিনি ডাকিলেন—গণেশ! একান্ত লজ্জিত ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মেজকর্তা ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পলাইয়া গেলেন। বড়কর্তা কবিরাজ আনাইলেন, কিন্তু মেজকর্তা ফিরাইয়া দিলেন। ঘর হইতেই বলিয়া পাঠাইলেন—বিষয় ভাগ করে দেওয়া হোক আমার, এর ওর ছেলের পালের দুধের দাম দেবার কথা আমার নয়।

তারপর বিছানার উপরে সজোরে একটা কিল বসাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন—মারি বেটা বদ্যিনাথের মাথায় রাবণের মত এক কিল—যাক বেটা মাটিতে বসে। কচু—কচু—দেবতা না কচু!

কিছুদিনের মধ্যেই সম্পত্তি ভাগ হইয়া গেল। সে আজ বারো বৎসরের কথা। তারপর হইতে মেজকর্তা এমনি ধারায় চলিয়াছেন। আরও একটি পরিবর্তন তাঁহার আসিয়াছিল। জপে-তপে ধর্মে-কর্মে তাঁহার গভীর অনুরাগ দেখা দিল। দারুণ শীতে গভীর রাত্রে যখন লোকে লেপের মধ্যেও শীতে কাঁপিতেছে, তখন মেজকর্তা খালি গায়ে হাত দুইটি বুকের উপর আড়াআড়ি

ভাবে ভাঁজিয়া গ্রামপ্রান্তের দেবীমন্দির হইতে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে বলিতে অ-পথ ধরিয়া বাড়ি ফেরেন। যে পথে সাধারণে চলে, সে পথ ধরিয়া তিনি চলেন না—পথচিহ্নহীন নির্জন প্রান্তরে মেজকর্তার পদচিহ্ন নিত্য নব পথরেখার প্রথম চিহ্ন আঁকিয়া দেয়।

ঐ ঘটনার পর হইতে আজও পর্যন্ত কখনও আর মেজকর্তা পোষ্যপুত্র লওয়ার নাম করেন নাই, কি সন্তান কামনার কথা মুখে আনেন নাই। অর্থ ও পরমার্থের মোহের মধ্যে বংশকামনা ডুবাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মেজগিন্নী ভুলিতে পারেন নাই—তিনি স্বামীকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, পোষ্যপুত্র লওয়ার কথাও বলিয়াছেন, কিন্তু ফল হইয়াছে বিপরীত। মেজকর্তার মাথার গোলমাল বাড়িয়া গিয়াছে। অধিকাংশ সময়েই তাঁহার অর্থসঞ্চয়ের পিপাসা বাড়িয়া যাইত—আপন শয়নকক্ষে ঐ সিন্দুকটির পাশেই তখন তিনি অবিরাম ঘুরিতেন—বার বার সেটা খুলিয়া দেখিতেন। কখনও কখনও ধর্মে কর্মে অনুরাগ বাড়িত—কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি তীর্থদর্শনে বাহির হইয়া পড়িতেন। দেখিয়া শুনিয়া মেজগিন্নী নিরস্ত হইয়াছিলেন—বহুদিন আর ও কথা তোলেন নাই। আজ চার মাসের পর সহসা চাটুজ্জেদের ভাগিনেয় ওই অনাথ শিশুটিকে দেখিয়া কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারেন নাই, স্বামীর নিকট অনুরোধ জানাইতে আসিয়াছিলেন। ছেলেটির মামী নীচে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—ছেলেটিকে দিয়া কিছু অর্থ প্রত্যাশা তাহাদের ছিল। মেজগিন্নী নীচে আসিয়া নীরবে ছেলেটিকে তাহার কোলে তুলিয়া দিলেন।

চাটুজ্জে-বৌ প্রশ্ন করিল—কি হল?

মেজগিন্নী সে কথার উত্তর দিতে পারিলেন না, বুকের ভিতর কান্না মুহুর্মুহু ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল। চাটুজ্জে-বৌ বিস্মিত হইয়া আবার প্রশ্ন করিল, হল না?

ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে মেজগিন্নী জানাইলেন—না।—আর তিনি সেখানে দাঁড়াইলেন না, পিছন ফিরিয়া একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

দ্বিপ্রহরে বৃদ্ধ রায় ঠুক ঠুক করিয়া আসিয়া চশমা দিয়া চারিদিক দেখিয়া মেজগিন্নীকে ঠাহর করিয়া লইয়া প্রণাম করিয়া ডাকিল—বৌমা!

মেজগিন্নী শুইয়াছিলেন—উঠিয়া বসিলেন। মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া ক্লান্ত মৃদুস্বরে বলিলেন—চল যাই। বাবু এসেছেন?

ঘাড় নাড়িয়া রায় বলিল—মা, ক্ষেপার মন—বিন্দাবন, কি বলব বল!

এগারটার ট্রেনে বলে, আমি গঙ্গাচানে চললাম। আমি ওই ওই করতে করতে আর নাই—চলে গিয়েছে।

মেজগিন্নী বলিলেন—তা হলে তোমরা খেয়ে নাও গে, ঠাকুরকে রান্নাবান্না সামলে দিতে বল।

রায় বলিল—তুমি এস মা, দুটো মুখে দেবে চল।

সস্নেহ হাসি হাসিয়া মেজগিন্নী বলিলেন—আমি খাব না বাবা, আমার মাথাটা বড় ধরেছে।

রায় আর একটি প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে ফিরিল। চটি জোড়াটি পায়ে দিয়া কিন্তু আবার খুলিয়া ফেলিল; বলিল—না গো বৌমা, ই তোমাদের ভালো লয় বাপু। ই—আমার ভালো লাগছে না। দুটো খাও বাপু তুমি। ক্ষেপার সঙ্গে তুমি সুদ্ধ ক্ষেপলে কি চলে!

ধীরে অথচ দৃঢ়স্বরে মেজগিন্নী আদেশ করিলেন—যা বললাম, তাই কর গে রায়জী।

রায় আর কথা কহিল না, চটি জোড়াটি পায়ে দিয়া ঠুক ঠুক করিতে করিতে চলিয়া গেল।

বহুকাল পর মেজকর্তা আজ কেমন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। অস্থির চাঞ্চল্যে মণিকে পর্যন্ত চিনিতে পারেন নাই—হুঁকা বাড়াইয়া দিতে গিয়াছিলেন। সেটুকু খেয়াল হইতেই লজ্জায় পলাইয়া আসিয়া আপন শয়ন-ঘরের মধ্যে লুকাইয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি আরম্ভ করিলেন। অবিরাম ঘুরিতে ঘুরিতে মধ্যে মধ্যে তিনি বলিয়া উঠিতেছিলেন—দূর দূর! একবার ছোট তরফের বাড়ির দিকে মুখ ফিরাইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—খট খট—লবডঙ্কা।

পরমুহূর্তেই বলিয়া উঠিলেন—দূর দূর।

আবার কয়েকবার পদচারণা করিয়া তিনি বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু সেও ভালো লাগিল না। বিছানা হইতে উঠিয়া আবার তিনি অস্থির পদে ঘরের মধ্যে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে চট করিয়া আনলা হইতে কাপড় ও গামছা টানিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—ধুয়ে ফেলে আসি। ধুয়ে ফেলে আসি। শতেক যোজনে থাকি, যদি গঙ্গা বলে ডাকি।—বাহিরের হাত-বাক্স হইতে খরচ বাহির করিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। বাড়ির ফটকের মুখেই রায়ের সঙ্গে দেখা হইয়া

গেল—বৃদ্ধ রায় কি একটা হাতে লইয়া ফিরিতেছিল। পাশ কাটাইয়া যাইতে যাইতে মেজকর্তা বলিলেন—গঙ্গাস্নানে চললাম—গঙ্গাস্নানে চললাম—বলে দিও—বলে দিও!

রায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিয়া মাথা তুলিয়া বলিল—দাঁড়ান দাঁড়ান!

কেহ কোনো উত্তর দিল না, রায় উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—মেজকর্তা! বলি শুনচেন গো! অই অ—মেজকর্তা!—সে আহ্বানের উত্তর কেহ দিল না, রায় ঘাড় তুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে চাহিয়া দেখিল, যতদূর তাহার দৃষ্টি চলে কেহ কোথাও নাই।

স্টেশনে নামিয়া মেজকর্তা একেবারে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া উঠিলেন। ঘাটে স্নানার্থী-স্নানার্থিনীর আসা-যাওয়ার বিরাম নাই, ঘাটের উপরেই ছোট বাজারটিতে ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় জমিয়া আছে। মেজকর্তা ঘাটের এক পাশে বসিয়া ওপারে ধু-ধু করা বালুচরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। রৌদ্রচ্ছটায় বালুচর ঝিকমিক করিতেছে। বহুদূরে চরের উপর সবুজের রেশ! ঘাটে নানা কলরবের মধ্যে হইতে নানা কথা তাঁহার কানে আসিতেছিল। অতি নিকটেই কাহারা আলোচনা করিতে করিতেছিল—আশ্চর্য সাধু ভাই! যে যাচ্ছে তারই নাম ধরে ডাকছে—কোথা আমাদের বাড়ি বলে দিল—ঠিক বলে দিল!

আর একজন অতি মৃদুস্বরে বলিল—শ্মশানের ঘাটোয়াল বলছিল কি জান —বলছিল বাবা মড়া খায়।

মেজকর্তা আগ্রহভরে প্রশ্ন করিলেন—কোথা হে কোথা?

একজন উত্তর দিল—সাধু কি লোকালয়ে থাকে হে বাপু, সাধু যে, সে থাকবে শ্মশানে।

মেজকর্তা উঠিয়া পড়িলেন। গঙ্গার তটভূমির উপর ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ এক ফালি পথ চলিয়া গিয়াছে—সেই পথটা ধরিয়া শ্মশানে টিনের চালাটায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। অনতিদূরে গঙ্গাগর্ভের নিকট বালুচরের উপর বেশ একটি জনতা মধুচক্রে মধু-মক্ষিকার মত জমিয়া আছে। তিনি বুঝিলেন সন্ন্যাসী ওইখানেই অবস্থান করিতেছেন। তিনিও অগ্রসর হইয়া জনতার মধ্যে মিশিয়া গেলেন। জনতার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড একটা ধুনির সম্মুখে ভীমকায় উগ্রদর্শন এক সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। নানা জনকে তিনি নানা কথা বলিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে অপরিচিত জনতার মধ্য হইতে এক এক জনের নাম ধরিয়া ডাকিতে ছিলেন। থাকিতে থাকিতে এক সময় মেজকর্তার

দৃষ্টির সহিত সন্ন্যাসীর দৃষ্টি মিলিত হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই মৃদু হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—এস বাবা গণেশ বাঁড়ুজ্জে, রামচন্দ্রপুরের বাঁড়ুজ্জে বাড়ির মেজকর্তা এস।—মেজকর্তা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। পরমুহূর্তে বিপুল ভয়ে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী যদি অন্তরের আরও কোনো কথা এই জনতার সমক্ষে বলিয়া দেয়! তিনি ত্বরিত পদে সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া আবার গঙ্গার ঘাটের উপর বসিলেন। কতক্ষণ বসিয়া ছিলেন, তাঁহার নিজেরই ঠিক ছিল না। অবশেষে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল কাহার কথায়। ঘাটের উপরের বাজারের একজন পরিচিত দোকানদার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল—ওই—মেজকর্তা যে! প্রণাম, ভালো আছেন?

মেজকর্তা একটু অর্থহীন হাসি হাসিয়া কহিলেন—ভালো তো?

দোকানী বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনাদের আশীর্বাদে। তারপর চান-টান করুন। পাকশাকের যোগাড় করে দি—সেবা করবেন চলুন। বেলা যে আর নাই।

মেজকর্তা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই বেলা আর বেশী নাই। সূর্যমণ্ডলে ক্লান্তির রক্তাভা দেখা দিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন—তাই তো—তা ইয়ে—মানে ফেরবার ট্রেনটা—।

হাসিয়া দোকানী বলিল—সে তো সেই কাল সকাল নটায়। তিনটের গাড়ি তো অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে।

মেজকর্তা ধীরে ধীরে চিন্তান্বিত ভাবে ঘাটের ধাপে ধাপে গঙ্গার জলে গিয়া নামিলেন।

গভীর রাত্রি। দোকানের বারান্দায় মেজকর্তা জাগ্রতচক্ষে শুইয়াছিলেন। ঘুম আসে নাই। বার-বার তিনি উঠিয়া বসিতেছিলেন—আবার শুইতে-ছিলেন। এবার তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিস্তব্ধ পল্লী—শুধু গঙ্গাতটের বনভূমিতে ঝিল্লীর অবিশ্রান্ত চীৎকার ধ্বনিত হইতেছে। মেজকর্তা শ্মশানের দিকে চলিলেন। বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ড ধক্ ধক্ করিয়া প্রবলবেগে স্পন্দিত হইতেছিল। শ্মশানের বুকে নামিয়া দেখিলেন, জনশূন্য শ্মশানে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে সন্ন্যাসী গঙ্গার দি মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছেন। অল্পদূরে দাঁড়াইয়া করজোড়ে মেজকর্তা ডাকিলেন—বাবা!

সন্ন্যাসী মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিলেন—এস—বস।—সন্ন্যাসীকে প্রণাম

করিয়া মেজকর্তা উপবেশন করিলেন। নর-কপালের পাত্রে কি একটা পানীয় পান করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—কামনা নিয়ে এসেছ বাবা?

মেজকর্তার কণ্ঠ যেন নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—স্বর তাঁহার বাহির হইল না। সন্ন্যাসী আবার বলিলেন—কি কামনা বল বাবা?

বহুকষ্টে মেজকর্তা এবার উত্তর দিলেন—বাবা অন্তর্যামী—

হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—কিন্তু তোমার কামনার কথা তোমাকেই যে মুখ ফুটে চাইতে হবে বাবা। না চাইলে কি এ সংসারে পাওয়া যায়—তুমি কি চাও?

সেই অঙ্গারলিপ্ত তটভূমির উপরেই লুটাইয়া পড়িয়া মেজকর্তা বলিলেন—সন্তান—বংশ! বাবা বৈদ্যনাথ আমাকে নিরাশ করেছেন, তুমি দয়া কর বাবা।

সন্ন্যাসী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, মেজকর্তাও উঠিলেন না, সেই ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় সন্ন্যাসীর পদমূলে পড়িয়া রহিলেন।

বহুক্ষণ পর সন্ন্যাসী বলিলেন—ওঠ, উঠে বস।—বলিয়া ঝুলি হইতে একটা মাটির পাত্র বাহির করিয়া খানিকটা পানীয় তাহাতে দিয়া বলিলেন—মায়ের প্রসাদ পান কর।—মেজকর্তা শাক্ত ব্রাহ্মণবংশের সন্তান, বিনা দ্বিধায় তিনি সেইটুকু পান করিয়া ফেলিলেন।

সন্ন্যাসী নিজের পানীয় পান করিয়া বলিলেন—শিববাক্য লঙ্ঘন করা যায় না। যায়?

মেজকর্তা হতাশভাবে বলিলেন—না বাবা, যায় না।

হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—যায়। পারে—একজন পারে। কে জানিস?

মেজকর্তা বলিলেন—না বাবা।

খিল খিল করিয়া হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, বাবার কথা রদ্ করতে পারে—মা রে, বেটা মা, আমার কালীমা—যে শিবের বুকে চড়ে নাচে।

আবার সেই খিল খিল হাসি।

সে হাসির তীক্ষ্ণতায় বনভূমির অন্ধকারও যেন শিহরিয়া উঠিল, উপরে টিনের চালায় সে হাসির প্রতিধ্বনি অট্টহাস্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া তখনও বাজিতেছিল।

মেজকর্তার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী আবার একপাত্র পানীয় মেজকর্তার পাত্রে ঢালিয়া দিলেন। নিজেও পান করিয়া বলিলেন—মাকে আমার তুষ্ট করতে পারবি?

করজোড়ে মেজকর্তা বলিলেন—কি করতে হবে বাবা?

মেজকর্তার মুখের নিকট ঝুঁকিয়া পড়িয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—বলি দিতে পারবি? তন্ত্রমতে আমি তোর জন্যে মায়ের কাছে পুত্রেষ্টি যাগ করব।

মেজকর্তার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন—হ্যাঁ বাবা।

সন্ন্যাসী বলিলেন—কিন্তু নরবলি—পারবি, দিতে পারবি?

মেজকর্তা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একপাত্র পানীয় তাহার মুখের কাছে ধরিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—ভয় কি? অমাবস্যার অন্ধকার—কেউ জানবে না—মানুষের দৃষ্টি সেদিন ঢাকা থাকে। গভীর রাত্রে—দূর শ্মশানে—কেউ জানবে না।…মাথার মধ্যে সুরার নেশা আগুনের শিখার মত জ্বলিতেছিল—চোখও জ্বলিতেছিল অঙ্গারখণ্ডের মত—

মেজকর্তা বলিয়া উঠিলেন—পারব—বাবা—পারব।

পরদিনই মেজকর্তা বাড়ি ফিরিলেন। অকারণে খানিকটা অত্যন্ত কৃত্রিম হাসি হাসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন—গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলাম।

মেজগিন্নী বলিলেন—বেশ করেছিলে।

বোধ করি এ কথার উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া মেজকর্তা আরও খানিকটা হাসিয়া বলিলেন—তাই বলছিলাম।

মেজগিন্নী ঠাকুরকে বলিলেন—সকাল সকাল রান্না কর ঠাকুর, কাল থেকে বাবু খান নাই।

অস্থির ভাবে কয় বার ঘুরিয়া ফিরিয়া মেজকর্তা বলিলেন—সেই ছেলেটা, সেই—

শঙ্কিতভাবে মেজগিন্নী বলিলেন—সে তখনই তারা নিয়ে গিয়েছে।

মেজকর্তা আরও একবার ঘুরিয়া অবশেষে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। আবার কিছুক্ষণ পর আসিয়া বিনা-ভূমিকায় বলিলেন—তাকে রাখলেই হত।

মেজগিন্নী স্বামীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—কাকে?

মেজগিন্নীর দিকে পিছন ফিরিয়া রান্নাঘরের চালের একগোছা খড় টান মারিয়া মেজকর্তা বলিলেন—সেই ছেলেটাকে—সেই—

মেজগিন্নী কোনো উত্তর দিলেন না। মেজকর্তা আরও একগাছা খড় টান মারিয়া খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন—পুষ্যিপুত্তুর নাই হল, খেত-দেত থাকত।

বাধা দিয়া মেজগিন্নী বলিলেন—চালের খড়গুলো কেন টানছ বল তো? যা বলবে সুস্থ হয়ে বসেই বল না বাপু।

মেজকর্তা আর দাঁড়াইলেন না, হন হন করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। বৈঠকখানায় গিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন।

অপরিসীম উদ্বেগে তাঁহার বুকের ভিতরটা যেন পীড়িত হইতেছিল। দরজার গোড়ায় রায়ের চটির মন্থর শব্দ উঠিল। রায় আসিয়া প্রণাম করিয়া ডাকিল—বৌমা একবার ডাকছেন গো!

মেজকর্তা চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন—অ্যাঁ?

রায় বলিলেন—দিনরাত এত ভাববেন না—মেজবাবু। বলছি—বৌমা একবার ডাকছেন আপনাকে।

মেজকর্তা উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন—আমি চণ্ডীতলা চললাম।

রায় শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—অই অই। ই—করে কি? হায়—বলি শুনছেন গো—অ—

মেজকর্তা তখন চলিয়া গিয়াছেন।

দ্বিপ্রহরে খাইতে বসিলে, মেজগিন্নী অভ্যাস মত পাখা লইয়া বাতাস করিতেছিলেন। মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন—তাহলে চাটুজ্জেদের ছেলেটিকে—

মেজকর্তা বলিলেন—হ্যাঁ, খাবে-দাবে থাকবে—মানুষ হবে—তা, থাক না—থাক না! খাবে-দাবে—মানে—।

উঠানে বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরীটা বসিয়াছিল, সেটা সহসা আকাশের দিকে মুখ করিয়া তারস্বরে দীর্ঘ চীৎকার করিয়া উঠিল। ঠাকুর তাহাকে তাড়া দিল—দূর—দূর।

মেজগিন্নী বলিলেন—থাক থাক ঠাকুর—ও বাচ্চার জন্যে কাঁদছে—কাল রাত্রে বাচ্চাটাকে শেয়ালে নিয়ে গিয়েছে। ওই—ওই—ওকি কিছুই যে খেলে না?

তখন মেজকর্তা আহার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন।

অপরাহ্ণে ঘুম হইতে উঠিয়া মেজকর্তা জলের গ্লাসটি লইয়া বাহিরে বারান্দায় আসিতেই দেখিলেন, হাসি-মুখে মেজগিন্নী ছেলেটিকে কোলে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামীকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন—কতবার এলাম, তোমার ঘুম আর ভাঙে না। ভারি সুবোধ ছেলে বাপু—কান্নার নামটি নাই। একবার নাও না কোলে—।

মেজকর্তার আর মুখ-ধোয়া হইল না; অভ্যাস মত দ্রুতপদে তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। মেজগিন্নী একটু ম্লান হাসি হাসিলেন; কিন্তু দুঃখ বা অভিমান তিনি করিলেন না।

রাত্রে মেজকর্তা বলিলেন—ওকে ঝিকে দিও, মানুষ করবে।

মেজগিন্নী বলিলেন—তাই দোব।

শয্যায় শুইয়াও মেজকর্তার ঘুম আসিল না—অসম্ভব অবাস্তব কল্পনায় তাঁহার মস্তিষ্ক পীড়িত হইতেছিল। তবুও তিনি নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া রহিলেন, পাছে মেজগিন্নী জানিতে পারেন। তিনি কল্পনা করিতেছিলেন আগামী অমাবস্যা-রাত্রির কথা। ভীমদর্শন সন্ন্যাসী—সম্মুখে যজ্ঞকুণ্ড—ছেলেটা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সব দেখিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের দৃশ্য ভাসিয়া উঠে, মেজগিন্নী খোকার জন্য ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া আছে। অকস্মাৎ মনে হয়, ওই ছেলেটার পরলোকগতা মায়ের কথা—তার আত্মা যদি আসিয়া বলে—দাও দাও, ওগো, আমার সন্তান ফিরাইয়া দাও!—সঙ্গে সঙ্গে তিনি বালিশের মধ্যে সজোরে মুখ গুঁজিয়া দেন। বাহিরে তারস্বরে কুক্কুরীটা কাঁদিতেছিল। তিনি শিহরিয়া উঠেন—উঃ! আবার ধীরে ধীরে মেজকর্তা মনকে দৃঢ় করেন।

প্রভাতে উঠিয়া মেজকর্তা দেখিলেন, মেজগিন্নী কখন উঠিয়া গিয়াছেন—ওদিকের খাট শূন্য। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিতেন, সে শয্যা কেহ স্পর্শও করে নাই।

দিন দশেক পর।

সেদিন অমাবস্যা, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা খুব কম। মেজকর্তা অমাবস্যার উপবাস করেন, রায়জী করে নিশিপালন। মেজকর্তা বাড়িতে নাই। আজ কয়দিন হইতেই এক সন্ন্যাসী লইয়া মাতিয়া আছেন। সকালেই বাড়ি হইতে চলিয়া যান, ফেরেন দ্বিপ্রহরে—আবার খাওয়া-দাওয়ার পর বাহির হন—গভীর রাত্রে ফিরিয়া আসেন, তাও বড় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়। মেজকর্তার সন্ন্যাসী-সেবা এমন অসাধারণ কিছু নয়—তন্ত্রমতে জপে-তপে সুরাপানও তিনি করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া এখন স্বামীর অনুপস্থিতি মেজগিন্নীরও মন্দ লাগে না—খোকাকে লইয়া স্বেচ্ছামত খেলা খেলিতে বাধা পড়ে না।

সেদিন সন্ধ্যার পর দোতলার বারান্দায় উজ্জ্বল হ্যারিকেনের আলো জ্বালিয়া মেজগিন্নী খোকাকে কোলে লইয়া দুধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে ছড়া গাহিতেছিলেন—

তুমি পথে বসে বসে কাঁদছিলে
মা-মা বলে ডাকছিলে।

চির অনাদৃত অনাথ শিশু শান্তমুগ্ধ নেত্রে মেজগিন্নীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, কি মোহ সে মুখে ছিল সে-ই জানে!

মৃদু মন্থর জুতার শব্দ করিয়া রায় আসিয়া দাঁড়াইল, মেজগিন্নী মাথার

কাপড়টা একটু টানিয়া দিলেন। হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া রায় বলিল—পেনাম বৌমা।

মেজগিন্নী বলিলেন—কিছু বলছ রায়জী?

রায়জী ধীরে ধীরে বলিল—ই বেটা সাধু তো ভালো নয় মা, বাবুকে যে পাগল করে দিলে গো! দিন-রাত মদ—মদ আর মদ। আজ আবার বলে পাঠিয়েছেন, ফিরতে রাত হবে—দোর সব যেন খোলা থাকে। তা বলি—বলে যাই বৌমাকে। আর কল্কেটা সেজে রেখে যাই, তখন আবার ধর ধরবে না।—একটু ইতস্তত করিয়া আবার সে বলিল—তুমি এত লাগাম ঢিল দিও না মা। ছেলে নিয়ে তুমিও যে কেমন হয়ে গেলে—একটুকু শাসন-টাসন কর।

মৃদু সলজ্জ হাসি হাসিয়া মেজগিন্নী অবগুণ্ঠন একটু টানিয়া দিলেন।

তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। মেজকর্তা অতি সতর্ক নিঃশব্দ পদক্ষেপে বাড়ির ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিরন্ধ্র গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবী যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে প্রকাণ্ড সুষুপ্ত বাড়িখানা গাঢ়তর অন্ধকারের মত দাঁড়াইয়া আছে। শুধু দুই-তিনটা খোলা জানালা দিয়া গৃহমধ্যের আলোক-রশ্মি শূন্যের অন্ধকারের মধ্যে নিতান্ত অসহায় প্রেতদেহের মত ভাসিয়া রহিয়াছে। অতি সতর্কতা সত্ত্বেও মেজকর্তার পা টলিতেছিল। ধীরে ধীরে তিনি অন্দরের দিকে চলিলেন। মৃদু কাতর স্বরে কে কাঁদিয়া উঠিল। মেজকর্তা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ শুনিয়া বুঝিলেন কুকুরটা এখনও শোক ভুলে নাই। আবার তিনি অগ্রসর হইলেন। আজ শ্মশানে তাঁহার পুত্রেষ্টি যাগ হইতেছে। তিনি বলি-সংগ্রহে আসিয়াছেন। বলির সময় সমাগতপ্রায়। সমস্ত দরজা খোলা রহিয়াছে—সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া তিনি দোতলায় উঠিলেন। ধীরে ধীরে ঝিয়ের ঘরে ঢুকিলেন। অন্ধকার ঘর, অতি সতর্কতার সহিত দেশলাই জ্বালিয়া দেখিলেন, বুড়ি ঝি অকাতরে ঘুমাইতেছে, কিন্তু শিশু তো সেখানে নাই। বাহির হইয়া আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন—কোথায় তবে? বিদ্যুৎ-রেখার মত একটা কথা তাঁহার মাথার মধ্যে খেলিয়া গেল। আবার তিনি অগ্রসর হইলেন। এ পাশের আলোকিত বারান্দার দ্বারপথে দাঁড়াইয়া মেজকর্তা দেখিলেন, তাঁহার অনুমান সত্য—মেজগিন্নীর কোলের কাছে শিশুটি শুইয়া আছে।

ধীরে ধীরে তিনি শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন মেজগিন্নীর বক্ষদেশ সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত, মুক্ত। তাঁহার বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শিশুটি দুই হাতে মেজগিন্নীকে জড়াইয়া ধরিয়া একটি স্তন মুখে পুরিয়া অগাধ নিশ্চিন্ত

ঘুমে মগ্ন। মাঝে মাঝে স্বপ্নঘোরে মৃদু হাস্যরেখা তাহার অধরে ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে। মেজগিন্নীর মুখে অতি তৃপ্তির হাস্যরেখা কে যেন তুলি দিয়া আঁকিয়া দিয়াছে। মেজকর্তার সুরাপ্রভাবিত মস্তিষ্কের মধ্যে সব যেন ওলট-পালট হইয়া যাইতেছিল। হাত-পা থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। তবুও তিনি প্রাণপণে আপনাকে সংযত করিয়া শিশুকে তুলিয়া কাঁধের উপর ফেলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িলেন। বাড়ির বাহিরে প্রান্তরের মধ্যে পড়িয়া গতি আরও দ্রুত করিবার চেষ্টা করিলেন।

অকস্মাৎ অমাবস্যার অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া কে কাঁদিয়া উঠিল। মেজবৌ! মেজকর্তা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। আবার সেই মর্মভেদী চীৎকার। বিশ্বের বেদনা যেন সে চীৎকারের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। মেজকর্তার বুকের ভিতর যেন ঝড় বহিয়া গেল, তবু আর একবার তিনি চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সম্মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াই তিনি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। শ্বেতবর্ণ অশরীরী মূর্তির মত কে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে! সেটা একটা ছোট তালগাছের শুকনা পাতা—শিথিল দীর্ঘ বৃন্ত সমেত সেটা ঝুলিতেছিল—অপর কিছু নয়। কিন্তু মেজকর্তার মনে হইল, এই শিশুর অশরীরী মাতা যেন দীন ভাবে সন্তান ভিক্ষা চাহিতেছে। ওদিকে পিছনে বাড়ির মধ্য হইতে আবার সেই মর্মভেদী চীৎকার! সে চীৎকারে তাঁহার মর্মস্থল সমবেদনায় অধীর হইয়া উঠিল—সমস্ত বাসনা এক মুহূর্তে তুচ্ছ হইয়া গেল। তিনি ফিরিলেন—উন্মত্তের মত ফিরিলেন—যাই—যাই—মেজবৌ!

ঠিক এই সময়ে দূরে চৌকিদার হাঁক দিতেছিল—ও—ওই!

মেজকর্তার মনে হইল, এ রুদ্রকণ্ঠে রুষ্ট তান্ত্রিকের আহ্বান। তিনি আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—মেজবৌ! মেজবৌ!

মেজবৌয়ের নিশ্চিন্ত অঞ্চলতলে আশ্রয়ের জন্য প্রাণপণে ছুটিয়া বাড়ির ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মেজকর্তার কণ্ঠস্বর পাইয়া কুক্কুরী আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া মৃদুক্রন্দনে আপনার বেদনা নিবেদন করিল।

মেজকর্তা ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—তোর ছেলে তো আমি নিই নি মা—তোর ছেলে আমি নিই নি।

পুকুরের মাছ বর্ষায় বাহিরের জলস্রোতের সংযোগে বাহির হইয়া যায়। নালা নদী নদ সমুদ্র ঘুরিয়া সে অবশ্য আর পুকুরে ফিরিয়া আসে না; কিন্তু ফিরিয়া আসিলে যা ঘটে, তাই ঘটিল। আত্মীয় জ্ঞাতি বন্ধুবর্গ দূরের কথা—মা পর্যন্ত চিনিতে পারিল না।

পরনে নীল রঙের পাতলুন, ফুলহাতা কোমরটুকু অবধি খাটো জামা, জামার পিছনে পিঠের উপর আবার একটা চৌকা ফালি, মাথায় বিচিত্র টুপি—এই পোশাকপরা লোকটিকে দেখিয়া জেলেপাড়ার সকলে ভাবিয়াছিল কোনো অদ্ভুত দেশের মানুষ। লোকটি পরম আরামে সিগারেট টানিতে টানিতে আসিয়া জেলেদের বিপন অর্থাৎ বিপিনের বাড়ির দুয়ারে দাঁড়াইল। পিছনে একপাল ছেলে জুটিয়াছিল, সে দাঁড়াইতেই ছেলেগুলিও দাঁড়াইয়া গেল। বিচিত্র পোশাকপরা লোকটির দৃষ্টি জীর্ণ পতনোন্মুখ বাড়িটার দিকে পড়িতেই সে-দৃষ্টি চকিত হইয়া উঠিল—ভ্রূর কুঞ্চনে জাগিয়া উঠিল নীরব প্রশ্ন। পিছন ফিরিয়া ছেলেদের দিকে চাহিয়া হাতের একটিমাত্র আঙুল নাড়িয়া সে ডাকিল, এই কাম হিয়ার—ইধার আও! শুন শুন—ইখানে শুন। এ-ই ছো-ক-রা!

যে ছেলেটি সম্মুখে ছিল সে চট করিয়া পিছু হটিয়া চার-পাঁচজনকে আড়াল রাখিয়া দাঁড়াইল! সে চার-পাঁচজনও পিছনে যাইবার জন্য একটা ঠেলাঠেলি শুরু করিয়া দিল। লোকটি কৌতুক বোধ করিয়াও ঘৃণার সহিত বলিল—শূয়ার-কি-বাচ্চা!

তারপর সে বাড়ির ভাঙা দরজাটা ঠেলিয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া উঠানে দাঁড়াইল। চারিদিক ভাঙা-ভগ্ন, উহারই মধ্যে ভালো অবস্থার ঘরখানার দাওয়ার উপর বসিয়াছিল এক প্রৌঢ়া; খাটো ছেঁড়া একখানা কাপড় পরিয়া কতকগুলো গুগলি-শামুকের খোলা ভাঙিয়া পরিষ্কার করিতেছিল। সে সন্ত্রস্ত হইয়া রূঢ় শঙ্কিত স্বরে প্রশ্ন করিল—কে, কে গো তুমি?

আগন্তুক একমুখ হাসিয়া বলিল—মা!

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রৌঢ়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এবার মাথার টুপিটা খুলিয়া আগন্তুক বলিল—চিনতে পারছিস না মা? হামি পশুপতি!—কথাগুলিতে অদ্ভুত একটি টান—'শ'-কারগুলি সব কেমন শিসের মত তীক্ষ্ণ, উচ্চারণে শব্দগুলি যেন কেমন বাঁকা।

পশুপতি ? পশু ? পশো ? প্রৌঢ়ার হাত দুইটি নিষ্ক্রিয় স্তব্ধ হইয়া গেল ; ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আকুল প্রশ্নভরা চোখে আগন্তুকের দিকে প্রৌঢ়া নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার হারানো ছেলে পশো, পশুপতি ? লম্বা, রোগা, দুরন্ত—পনের বছরের ছেলে দশ বৎসর আগে পলাইয়া গিয়াছিল জগন্নাথের পাণ্ডার সঙ্গে—সেই পশুপতি ? পশো ?

আগন্তুক আগাইয়া আসিয়া বলিল—চিনতে পারছিস না মা ?

সত্যই প্রৌঢ়া চিনিতে পারিতেছিল না ; পরনে অদ্ভুত পোশাক—সায়েবদের পোশাকও সে দেখিয়াছে—এ পোশাক সেই ধরনের হইলেও ঠিক তেমন নয়, নীলবর্ণ এ এক অদ্ভুত পোশাক। জেলের ছেলে পশুপতি—যে কেবল নেংটির মত এক ফালি কাপড় পরিয়া থাকিত, কালো রঙ, নির্বোধ বোকা চেহারা, জলে থাকিয়া থাকিয়া যাহার সর্বাঙ্গ চুলকনায় ভরিয়া থাকিত, সেই পশুপতি—পশো ? মাথার পিছন দিকটা একেবারে কামানো—সামনের বড় বড় চুলগুলা আইবুড় মেয়েদের মত পিছনের দিকে আঁচড়ানো, চোখে-মুখে এমন একটা চালাক-চতুর ভাব—এই কি সেই ?

আগন্তুক এবার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া দাওয়াটা বার দুয়েক ঝাড়িয়া লইয়া বসিল, হাসিয়া বলিল—বহুত মুল্লুক ঘুরে এলম, মা। জাপান চীন বিলাত মার্কিন মুল্লুক ঘুরলম। জাহাজে খালাসী হইয়েছিলম।

সে আবার একটা সিগারেট ধরাইল।

দশ বৎসর আগের কিশোর একখানি মুখের ছবির সহিত এই মুখখানি ক্রমশ মিলিয়া এক হইয়া আসিতেছিল—এক বিচিত্র জ্যামিতি ও পরিমিতির আঙ্কিক নিয়মে বিভিন্ন কালে পরিবর্তিত একখানা জমির মত। নাকের বাঁকা ভাবটি ঠিক তো—সেই তো! ঠোঁটের কোণ দুইটার ঠিক তেমনিই নীচের দিকে টান! ভ্রূ দুইটা তো তেমনি মোটা!

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া আগন্তুক বলিল—বুঢ্ঢা কাঁহা ?—শূয়ার-কি-বাচ্চা ?

বুঢ্ঢা—বিপিন জেলে—এই বাড়ির মালিক, প্রৌঢ়ার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী। পশুপতির সৎ-বাপ।

প্রৌঢ়া এবার কাঁদিয়া ফেলিল—বুড়ো মইছে বাবা—আমাকেও মেরে যেইছে। পথে বসিয়ে গেল বাবা, সব দিয়ে যেইছে বেটীদিগে।

বিপিন মরিবার সময় সব দিয়া গিয়াছে তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যাদের।

পশুপতি হাসিয়া বলিল—মর গেয়া বুঢ্ঢা, শূয়ার-কি-বাচ্চা ?

দশ বৎসর পূর্বে পশুপতি নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। দুরন্ত নির্বোধ জেলের ছেলে, সৎ-বাপ বিপিনের পোষ্য ছিল। বিপিন ছিল এখানকার মধ্যে অবস্থাপন্ন জেলে—এ অঞ্চলের ভালো ভালো পুকুর সে জমা করিয়া লইত, অদূরবর্তী নদীটার খানিকটা অংশও সে খোদ সরকারের কাছে জমা লইত একা। বিপিন মাছ ধরিতে যাইত, পশুপতিকে সঙ্গে যাইতে হইত; জলের তলায় কোনো কিছুতে জাল আটকাইলে বিপিন পশুপতিকে জলে ডুবিতে বাধ্য করিত। জলের তলায় বুক যেন ফাটিয়া যাইত। পশুপতি জলের তলায় হাতড়াইয়া ফিরিত কোথায় কিসে আটকাইয়াছে জাল। কতবার যে বোয়াল চিতলের কামড় সে খাইয়াছে তাহার হিসাব নাই। মাছ ধরিয়া ফিরিয়া বিপিন পশুকে পাঠাইত কাঠ-সংগ্রহে। সন্ধ্যায় আকণ্ঠ মদ গিলিয়া পশুকে সে নিয়মিত প্রহার দিত। সেবার জগন্নাথের পাণ্ডার লোক আসিয়াছিল রথযাত্রার পূর্বে যাত্রী সংগ্রহে। কেমন করিয়া জানি না এই বিদেশবাসীর সহিত পশুর আলাপ জমিয়া যায়! তাহার এটা ওটা কাজকর্ম করিয়া দিত, এঁটো বিড়ি প্রসাদ পাইত, আর গল্প শুনিত। জগন্নাথের মন্দির, তাঁহার রথ, সে রথ নাকি আকাশ ছোঁয়, রথের উপর জগন্নাথ নাকি হাঁটিয়া আসিয়া চড়েন, লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হয়; মধ্যে মধ্যে সে রথ নাকি আটকাইয়া যায়, লক্ষ লোকে টানিলেও সে রথ চলে না, তখন পাণ্ডারা জগন্নাথকে তিরস্কার করে—তবে সে রথ আবার চলে। সেখানে নাকি সমুদ্র আছে, তালগাছের সমান উঁচু এক একটা ঢেউ—নীলবর্ণ জল, সমুদ্রের নাকি ওপার নাই।

পাণ্ডার লোক যাত্রী লইয়া ট্রেনে চড়িয়া কিছুদূর আসিয়া সন্ধান পাইল, ট্রেনের বেঞ্চের তলায় লুকাইয়া শুইয়া আছে—পশুপতি। ট্রেনটা এক্সপ্রেস ট্রেন। বর্ধমান তখন পার হইয়া গিয়াছে। হাওড়ায় পৌঁছিয়া ট্রেন থামিল। নির্বিকার পাণ্ডা হাওড়ায় রেলকর্মচারীর হাতে পশুকে সমর্পণ করিয়া যাত্রীর দল লইয়া চলিয়া গেল। নিঃসম্বল পশু, একখানি মাত্র জীর্ণ কাপড় তাহার পরনে, রেলকর্মচারী তাহাকে সঁপিয়া দিল কনেস্টবলের হাতে। কিল, চড় ও কয়েকটা গুঁতা দিয়া কনেস্টবলটা তাহাকে আনিয়া পুরিল হাজতে। হাজত হইতে কোর্ট—কোর্টের বিচারে কয়েকদিনের জন্য তাহার জেল হইয়া গেল। প্রকাণ্ড কালো রঙের ঢাকা একখানা গাড়িতে তুলিয়া তাহাকে আনিয়া জেলে পুরিয়া দিল। আশ্চর্যের কথা, অতিক্রান্ত এতগুলি অবস্থান্তরের মধ্যেও পশু কোনোদিন কাঁদে নাই। একটা সভয় বিস্ময়ের অতিরিক্ত আর কিছু সে অনুভব করে নাই।

যে কষ্টে মানুষের কান্না আসে তেমন কষ্ট, এই অবস্থান্তরের মধ্যে ছিল না।

অন্ততঃ তাহার কাছে ছিল না। কষ্ট অনুভব করিল সে বরং জেলখানা হইতে বাহির হইবার পর। বিরাট শহর—বড় বড় বাড়ি—অসংখ্য পথ—যে পথ পিছনে ফেলিয়া আসে সে পথ আর খুঁজিয়া বাহির করা যায় না, গাড়ি—গাড়ি আর গাড়ি, মানুষ আর মানুষ। জেলখানা হইতে বাহির হইয়া কিছুক্ষণ ঘুরিয়া সে যখন অকস্মাৎ অনুভব করিল সে হারাইয়া গিয়াছে, যে পথ ফেলিয়া আসিয়াছে, সে পথ আর বাহির করা যাইবে না—তখন তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। সমস্ত দিনটা সে কাঁদিয়াছিল! মায়ের জন্য কাঁদিয়াছিল, গাঁয়ের জন্য কাঁদিয়াছিল। তারপর সব সহিয়া গেল। ভিক্ষা করিয়া মোট বহিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে আসিয়া উপস্থিত হইল অদ্ভুত একটা স্থানে। চারিদিকে বড় বড় বাড়ি—মধ্যে প্রকাণ্ড বাঁধানো নদী—নদীর উপরও বড় বড় বাড়ি ভাসিতেছে। বাড়ি নয়—জাহাজ। আশপাশের লোকজনের কাছেই সে শুনিল ওগুলা জাহাজ। বড় বড় মই লাগাইয়া মোট মাথায় লোক উঠিতেছে, নামিতেছে; আকাশের উপরে একটা মই লোহার দড়িতে প্রকাণ্ড বোঝাগুলাকে বাঁধিয়া লইয়া জাহাজের উপর আপনি তুলিয়া লইতেছে। জাহাজের মাথায় বড় বড় চোঙা—মধ্যে মধ্যে চোঙা হইতে কি ভীষণ ধোঁয়ার রাশি! অদ্ভুত লাগিয়া গেল পশুপতির। জায়গাটার নাম শুনিল—খিদিরপুরের ডক। কত মানুষ—কত রকমের সায়েব। সুন্দর নীল পোশাক। খাটো মাথার সায়েবগুলার ছোট ছোট চোখ, থ্যাদা নাক—পশুপতির বেশ লাগিল। পরে শুনিল—উহারা জাপানী সায়েব। পশু ওইখানেই থাকিয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যেই সে অনেক শিখিয়া ফেলিল। আকাশে যে মইগুলা জিনিস টানিয়া তোলে ওগুলা—'কেরেন'। জাহাজের গোল চোঙাগুলা, চিমনী! জাহাজের উপরের ঘরগুলি কেবিন। জাহাজের ভিতরে—পাতালের মত গহ্বরটাও ক্রমশ তাহার পরিচিত হইয়া উঠিল। কল-ঘরের ভিতরও সে দেখিল; সেদিন সে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। বাপ রে! চারি পাশে রেলিং-ঘেরা পিছল সিঁড়ি নীচে ওই পাতালে নামিয়া গিয়াছে; মধ্যে ঝকঝকে বিরাট যন্ত্রপাতি। সে কি উত্তাপ—আর সে কি শব্দ!

খিদিরপুরের একটা খোলার পল্লীতে সে থাকিত। সেখানে কত লোক, কত জাতি, চীনাম্যান, মগের মুলুকের লোক, চাটগাঁয়ের খালাসীর দল, গোয়ানী, মধ্যে মধ্যে সায়েব-খালাসীর দু-চারজনও মাতাল হইয়া আসিয়া জুটিত। কত প্রহারই সে প্রথম প্রথম খাইয়াছে। বড় হইয়া অবশ্য সেও কতজনকে প্রহার দিয়াছে। কত গল্প সে শুনিত, দেশ-দেশান্তরের কথা—বার্মা মুলুক, সিঙ্গাপুর,

হংকং, চীন, জাপান, মার্কিন, বিলাত, ফেরান্স—কত দেশ কত শহর। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সে অভিজ্ঞতার অধিকাংশই নারী-সংক্রান্ত; পশুপতির পায়ের রক্ত মাথার দিকে উঠিত। সমুদ্রের গল্প—কূল নাই, দিক নাই, শুধু সমুদ্র আর আকাশ, আকাশে ওড়ে কত পাখী—জাহাজের আশে পাশে ঘোরে হাঙ্গর, করাতের মত সারি সারি দাঁত, মধ্যে মধ্যে নাকি তিমিও দেখা যায়; আর ঝড় —আকাশভরা কালো মেঘের কোল হইতে ঝড় নামিয়া আসে, সমুদ্রে তুফান উঠে, সে তুফানে সমুদ্র যেন জাহাজ লইয়া লুফিতে থাকে। জাহাজের ডেক ভাসাইয়া জল চলিয়া যায়, কত সময় সেই ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসিয়া যায় কত জন। 'কালাপানি' আর 'মাডারিনে' (মেডিটেরেনিয়ান) নাকি ঢেউ খুব বেশী। পশুপতি স্তব্ধ হইয়া শুনিত। একদা ঐ খালাসীদের সঙ্গেই জাহাজের অফিসে নাম লেখাইয়া একটা জাহাজে করিয়া সে ভাসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর কত বার সে কলিকাতায় ফিরিয়াছে, কতবার গিয়াছে; এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে—এক মুলুক হইতে অন্য মুলুকে।

দীর্ঘ দশ বৎসর পর সহসা কি মনে হইয়াছে—কেমন করিয়া জানি না মনে পড়িয়াছে মাকে, গাঁকে। সে কলিকাতা হইতে গ্রামে আসিয়াছে।

সন্ধ্যায় জেলেপাড়ায় প্রকাণ্ড মদের মজলিস বসিল। পশুপতি কুড়ি টাকা দিয়াছে। মদ নহিলে জেলেদের মজলিস হয় না, বিনা মদে বিচার হয় না, বিনা মদে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। অপরাধ যাহাই হউক, মদ্যদণ্ডই একমাত্র শাস্তি। আবালবৃদ্ধবনিতা ধর্মরাজতলায় জমিয়াছিল। প্রকাণ্ড জালায় মদ ও একটা মাটির প্রকাণ্ড পাত্রে প্রচুর মাংসের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই মদ ও মাংসের সহিত মজলিস চলিতেছিল।

একটা বড় বাঁশের ঝুড়ি উপুড় করিয়া সেইটার উপর বসিয়াছে পশু, তাহার পরনে সেই পোশাক। সে নিজে এক বোতল পাকিমদ আনিয়া প্রায় অর্ধেকটা ইহারই মধ্যে খাইয়া ফেলিয়াছে। মজলিসে চলিতেছে হুঁকা—সে টানিতেছে সিগারেট। দুই পয়সা দামের সিগারেটের বাক্স অনেকগুলিই সে সঙ্গে আনিয়াছে।

এক ছোকরা উঠিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল—জ্ঞাত মশাইরা গো!

সমস্বরে দশ-বারো জনে বলিল—চুপ-চুপ-চুপ!—তাহারা মজলিসের গোলমাল থামাইতেছিল।

—নিবেদন পাই।

—বল। বল।

—আজ্ঞে, পশু আমাদের খুব বাহাদুর।

—নিচ্চয়! একশ বার।

—কিন্তুক বেলাত যেয়েছিল।

—হাঁ-হাঁ ঠিক কথা!

—তা বেলাত গেলে আর জাত যায় না। এই আমাদের গেরামের ছোট হুজুরের ছেলে যেয়েছিল বেলাত, দেখেন তার জাত যায় নাই।

—ঠিক। ঠিক। বটে!

—তা পশুর কেনে জাত যাবে?

—নিচ্চয়।

—কুড়ি টাকা জরিমানা দিয়েছে—

একজন বলিল—আরও দশ টাকা লাগবে। তা না দিলে—যাবে, উয়োর জাত যাবে। আমি বলছি যাবে।

পশু বলিল—দশ রূপেয়াই দিবে হামি।

সঙ্গে সঙ্গে বক্তা বলিল—একবার হরি হরি বল!

সমস্বরে সকলে হরিধ্বনি দিয়া উঠিল। তারপর আরম্ভ হইল গল্প। পশু গল্প আরম্ভ করিল—দেশ-দেশান্তরের লোকিক-অলৌকিক গল্প। একবার একজন আরব দেশের সেখকে তাহারা সমুদ্র হইতে তুলিয়াছিল!—বুঝলি—জাহাজের ছামুতে মানুষটা এই ভেসে উঠছে—ব্যস ফিন ডুব যাচ্ছে। তিনবার-চারবার। তখুন সারং বলল—নামাও বোট। নৌকো! নৌকো! বোট হল নৌকো। বাপরে, সিখানে কি হাঙ্গর—মাছের পোনার ঝাঁকের মতুন কিলবিল করছে হাঙ্গর। তারই অন্দরমে মানুষ। তাজ্জব রে বাবা!

মজলিসসুদ্ধ মেয়েপুরুষ স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল। পশুপতি বলিয়া গেল বাঁকা বাঁকা উচ্চারণে—লোকটাকে যখন তুললাম রে ভাই, তখুন বলব কি, তাজ্জব কি বাত—লোকটাকে ছোঁয় নাই হাঙ্গরে। জাহাজসুদ্ধ লোকের তাজ্জব লেগে গেল। বাপ রে! বাপ রে! মানুষটার জ্ঞান হল—সারং উকে পুছলো—কেয়া নাম, কাঁহাকে আদমী, দরিয়াওমে গিরলে ক্যায়সে। আদমীঠো বলল, আরবী সেখ উ। দুসরা একটা জাহাজমে বম্বই যাচ্ছিল। নামাজ পড়তে পড়তে গিরে যায় সমুন্দরে। বলল কি জানিস? বলল—পড়ল তো ছুটে আইলো হাঙ্গর দশঠো, বিশঠো। তো, উ বলল—দুহাই আল্লাকে, দুহাই পয়গম্বরকে—মৎ কাটো হামকো। ব্যস, হাঙ্গর ছুঁতে পারলে না। তারপর তো

ভাই, সারং তার করল—উ লোকটার জাহাজে। তারসে ফিন খবর আইলো—বাত ঠিক। উ জাহাজ তখুন একশ মাইল চলা গিয়া।

এমনি কত গল্প।

তারপর আরম্ভ হয় গান—নাচ। পুরুষেরাই নাচে গায়, মেয়েরা দেখে।

পশুপতি নিজে নাচে। পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া অদ্ভুত নাচ। বিচিত্র সুরে শিস দিয়া গান করে। মত্ত মজলিসে খুব বাহবা পড়িয়া গেল। পশুপতি নাচ শেষ করিয়া বলিল—সবসে ভালো নাচ জোড়া মিলকে নাচ। বড়া বড়া ঘর, শালা, আলো কত—আসবাব কি, বাজনা কি—আঃ হায়-হায়!—সুদূর দেশের আলোকোজ্জ্বল আনন্দোৎসবের স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, সে হায়-হায় করিয়া সারা হইল। সহসা উৎসাহিত হইয়া সে প্রশ্ন করিল—দেখবি সি নাচ, দেখবি?

—হাঁ-হাঁ। নিচ্চয়।

পশুপতি বোতল হইতে আর এক চুমুক মদ গিলিয়া রুমালে মুখ মুছিয়া লইল—একটা সিগারেট ধরাইয়া বার কয়েক টানিয়া একজনকে দিয়া সে করিয়া বসিল একটা কাণ্ড। খানিকটা ব্যবধান রাখিয়া বসিয়াছিল মেয়েদের দল। পশুপতি ব্যবধানের সেইখানি জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া মেয়েদের দেখিয়া নবীন জেলের যুবতী মেয়েটার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—ই ঠিক পারবে, আয়—উঠে আয়!

মজলিসে একটা হৈ-হৈ পড়িয়া গেল।

পশুপতি মত্তদৃষ্টিতেও নৃত্যসঙ্গিনী পছন্দ করিতে ভুল করে নাই। নবীনের মেয়েটি সুশ্রী তন্বী তরুণী।

মজলিসে ভীষণ হৈ-চৈ উঠিল; নবীন ক্রোধে ফুলিয়া গর্জন আরম্ভ করিয়া দিল—মেরেই ফেলাব শালাকে।

নবীনের ছেলেটা অতিরিক্ত মদ খাইয়াছিল। সে একস্থানে দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে চীৎকার করিতেছিল—না না না, উ হবে না। ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, উকে আমি ছাড়ব না—ছেড়ে দাও বলছি। অবশ্য তাহাকে কেহই ধরিয়া ছিল না, বারণও তাহাকে কেহ করে নাই।

নবীন বলিল—আমার মেয়েকে উকে সাঙা করতে হবে।

পশুপতি ইয়া বড় একটা ছুরি হাতে নির্ভয় কৌতুকে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। সে বলিল—ব্যস্, মাৎ চিল্লাও, সাঙা করব হামি। ই বাত আছে—কসুর হইছে, সাঙা করব হামি।

তন্বী তরুণী মেয়েটি শুধু সুশ্রী নয়, রূপবতী। জেলেদের মেয়েদের মধ্যে শ্রী আছে, কিন্তু নবীনের মেয়েটির মত মেয়ে দেখা যায় না। পরদিন সুস্থদৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখিয়াও পশু আফসোস করিল না। জেলের মেয়েরা মাছের পসরা লইয়া বিকিকিনি করিয়া বেড়ায়—তাহারা স্বভাবে একটু উচ্ছলা, কিন্তু এ মেয়েটি শান্ত নিরুচ্ছ্বসিত। কাচ-ঘেরা লণ্ঠনের ভিতরের শিখার মত স্থির ধীর।

পশুর মা কিন্তু আপত্তি তুলিল।—উ মেয়ে সর্বনেশে মেয়ে বাবা। বেউলো রাড়ী, তিনবার বিয়ে হয়েছে—তিনটে মরদের মাথা উ খেয়েছে ; উ হবে না বাবা।

মিথ্যা নয়, এই বয়সে তিনবার বিধবা হইয়াছে নবীনের মেয়ে। প্রথম বিবাহ হইয়াছিল তিন বৎসর বয়সে, বিধবা হইয়াছিল পাঁচ বৎসরে। দ্বিতীয় বার সাঙা হয় এক বৎসর পরে—ছয় বৎসরে, ছয় মাসের মধ্যে সে স্বামী মারা যায়। তারপর ছয় বৎসর তাহার আর বিবাহ হয় নাই। বৎসর দুয়েক আগে তাহার নিষ্কম্প দীপশিখায় আকৃষ্ট হইয়া আসিল এক পতঙ্গ—সতের-আঠার বৎসরের এক কাঁচা জোয়ান। মাসখানেকের মধ্যে সেও পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। নদীতে মাছ ধরিতে গিয়াছিল ; জালখানা ফেলিয়া আর তুলিতে পারিল না। জালের ভিতর কি বজবজ করিয়া বুটবুটি কাটিয়া পাঁকের ভিতর বসিয়া গেল ; প্রকাণ্ড মাছ বুঝিয়া সে ডুব মারিল। তারপর একবার সে ভাসিয়া উঠিয়াছিল—প্রকাণ্ড একটা কুমীরের সঙ্গে আলিঙ্গন-বদ্ধ অবস্থায়। পর মুহূর্তে যে ডুবিল, আর উঠিল না।

এই কারণে মেয়েটার আসল নাম পর্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। নাম তাহার রমাদাসী—লোকে এখন ডাকে তাহাকে 'বেউলো' অর্থাৎ বেহুলা বলিয়া। মেয়েটি অস্বাভাবিক শান্ত—কিন্তু কঠিন ; তাহার বড় চোখ দুইটির স্থির দৃষ্টি মেলিয়া সে যখন চায়, তখন মনে হয় সে যেন তিরস্কার করিতেছে। পশুপতির বড় ভালো লাগিল

পরদিন সকালে উঠিয়া সে নবীনের বাড়ি গেল। নবীন, নবীনের ছেলে মাছ ধরিতে গিয়াছে—নবীনের স্ত্রী, পুত্রবধু গিয়াছে ভোররাত্রের চুরি করিয়া ধরা মাছ বেচিতে, বাড়িতে ছিল কেবল রমা। সে স্থির শান্তদৃষ্টিতে পশুপতির দিকে চাহিল—ভাবী বধূত্ব স্মরণ করিয়াও সে একবার হাসিল না, চোখ নত করিল না।

পশুপতি বলিল—রাগ করেছিস ?

শান্তভাবে মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

তন্বী তরুণী মেয়েটি শুধু সুশ্রী নয়, রূপবতী। জেলেদের মেয়েদের মধ্যে শ্রী আছে, কিন্তু নবীনের মেয়েটির মত মেয়ে দেখা যায় না। পরদিন সুস্থদৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখিয়াও পশু আফসোস করিল না। জেলের মেয়েরা মাছের পসরা লইয়া বিকিকিনি করিয়া বেড়ায়—তাহারা স্বভাবে একটু উচ্ছলা, কিন্তু এ মেয়েটি শান্ত নিরুচ্ছ্বসিত। কাচ-ঘেরা লণ্ঠনের ভিতরের শিখার মত স্থির ধীর।

পশুর মা কিন্তু আপত্তি তুলিল।—উ মেয়ে সর্বনেশে মেয়ে বাবা। বেউলো রাড়ী, তিনবার বিয়ে হয়েছে—তিনটে মরদের মাথা উ খেয়েছে; উ হবে না বাবা।

মিথ্যা নয়, এই বয়সে তিনবার বিধবা হইয়াছে নবীনের মেয়ে। প্রথম বিবাহ হইয়াছিল তিন বৎসর বয়সে, বিধবা হইয়াছিল পাঁচ বৎসরে। দ্বিতীয় বার সাঙা হয় এক বৎসর পরে—ছয় বৎসরে, ছয় মাসের মধ্যে সে স্বামী মারা যায়। তারপর ছয় বৎসর তাহার আর বিবাহ হয় নাই। বৎসর দুয়েক আগে তাহার নিষ্কম্প দীপশিখায় আকৃষ্ট হইয়া আসিল এক পতঙ্গ—সতের-আঠার বৎসরের এক কাঁচা জোয়ান। মাসখানেকের মধ্যে সেও পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। নদীতে মাছ ধরিতে গিয়াছিল; জালখানা ফেলিয়া আর তুলিতে পারিল না। জালের ভিতর কি বজবজ করিয়া বুটবুটি কাটিয়া পাকের ভিতর বসিয়া গেল; প্রকাণ্ড মাছ বুঝিয়া সে ডুব মারিল। তারপর একবার সে ভাসিয়া উঠিয়াছিল—প্রকাণ্ড একটা কুমীরের সঙ্গে আলিঙ্গন-বদ্ধ অবস্থায়। পর মুহূর্তে যে ডুবিল, আর উঠিল না।

এই কারণে মেয়েটার আসল নাম পর্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। নাম তাহার রমাদাসী—লোকে এখন ডাকে তাহাকে 'বেউলো' অর্থাৎ বেহুলা বলিয়া। মেয়েটি অস্বাভাবিক শান্ত—কিন্তু কঠিন; তাহার বড় চোখ দুইটির স্থির দৃষ্টি মেলিয়া সে যখন চায়, তখন মনে হয় সে যেন তিরস্কার করিতেছে। পশুপতির বড় ভালো লাগিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া সে নবীনের বাড়ি গেল। নবীন, নবীনের ছেলে মাছ ধরিতে গিয়াছে—নবীনের স্ত্রী, পুত্রবধূ গিয়াছে ভোররাত্রের চুরি করিয়া ধরা মাছ বেচিতে, বাড়িতে ছিল কেবল রমা। সে স্থির শান্তদৃষ্টিতে পশুপতির দিকে চাহিল—ভাবী বধূত্ব স্মরণ করিয়াও সে একবার হাসিল না, চোখ নত করিল না।

পশুপতি বলিল—রাগ করেছিস?

শান্তভাবে মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

—গোস্ত রাঁধতে জানিস? মান্‌সো?

ঘাড় নাড়িয়া মেয়েটি জানাইল—হ্যাঁ।

—তু মদ খাস? মদ?

এবার মেয়েটি সেই দৃষ্টিতে পশুপতির দিকে চাহিল—ভবঘুরে উচ্ছৃঙ্খল পশুপতিকেও সে দৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত করিতে হইল। কিন্তু পশুপতি ইহাতেই বেশী মুগ্ধ হইয়া গেল। শান্ত স্নিগ্ধ মেয়েটি, ছোট একখানি ঘর, ছেলে-মেয়ে—পশুপতি কল্পনা করিল অনেক। পুলকিত প্রবল আকাঙ্ক্ষায় সে বিবাহের দৃঢ় সংকল্প লইয়া ফিরিয়া আসিল।

মা আপত্তি করিল, কিন্তু সে কানেই তুলিল না। শিস দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল—একখানা ঘর তাহাকে কিনিতে হইবে। মাকে সুদ্ধ লইয়া সংসার করা তাহার পোষাইবে না। সে পাড়ার প্রান্তে খানিকটা জমি জমিদারের গোমস্তার কাছে বন্দোবস্ত লইয়া সেই দিনই ঘর আরম্ভ করিয়া দিল।

ঘর তৈয়ারী হইলে সে নবীনকে বলিল—ঠিক কর দিন।

সাতদিন পর দিন ঠিক হইয়া গেল। পশু বলিল—অল্লাইট, হামি কলকাত্তা যাবে—চিজ-বিজ কিনতে।

পথে নির্জন একটা গলির ভিতর কে ডাকিল—শোন।

রমাদাসী! সে আজ মৃদু হাসিয়া ডাকিতেছিল—শোন!

রমার মুখে হাসি আজ নূতন দেখিল পশুপতি, সে দ্রুত গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া রমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। রমা আতঙ্কভরে বলিয়া উঠিল—না-না-না।

সে কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাহাতে পশুও তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

রমা বিবর্ণ মুখে বলিল—এই কবচটি তুমি পর। মা-চণ্ডীর কবচ—আমি এনেছি তোমার লেগে। একদিন উপোস করে থেকে কবচ এনেছি। সেই কি অসুখ করেছিল একদিন—অসুখ মিছে কথা, উপোস করেছিলাম।

সে নিজেই পরাইয়া দিল—লাল সুতায় বাঁধা তামার একটি কবচ। হাসিয়া রমা বলিল—আমার কপাল যাই হোক, মা তো মিথ্যে নয়, রণে বনে অরুণ্যে মা তোমাকে রক্ষে করবেন!

ইহার পর পশুপতির সন্ধানই নাই। কলিকাতায় বাজার করিতে গিয়া সে আর ফিরিল না।

উপরের কাহিনীটুকু আমার গ্রামের ঘটনা, আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম—জেলেপাড়ার একটি বিচলিত বিহ্বল মুহূর্তে। পশুপতি নিরুদ্দেশের কিছুদিন

পরেই পশুপতির ওই নূতন ঘরে রমা গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিল। দারোগা সুরতহাল রিপোর্ট লিখিতেছিল, আমি পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতে ছিলাম। দারোগা কি বুঝিয়াছিল, কি লিখিয়াছিল জানি না, আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা এই। যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহাও মিথ্যা নয়—সে কথা, শুনিলাম আরও মাস কয়েক পর, পশুপতির কাছে।

রেডিও অফিসে একটা ছোট নাটিকা দিবার কথা ছিল। সেখানে গিয়া শুনিলাম—এক অভিনব প্রোগ্রামের ব্যবস্থা। জার্মান সাবমেরিনের গুপ্ত আক্রমণে একখানা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের একমাত্র উদ্ধারপ্রাপ্ত ভারতীয় নাবিক আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিবে।

রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা চমৎকার লাগিল।

বন্ধুবর হীরেন থিয়েটারী ঢঙে প্রশ্ন করিল—শুনলে ?

দাদা কমলবিলাস গম্ভীর মুখে বলিলেন—শুক্রাচার্য করে দিলে তোমাদের।

—মানে ?

—কা-কা-কানা করে দিলে তোমাদের লেখাকে।—মধ্যে মধ্যে কমলদাদার কণ্ঠ ঠেকিয়া যায়।

স্বীকার করিয়া নীচে নামিয়া দেখিলাম—সেলারের পোশাক পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে পশুপতি। সেও আমাকে চিনিল—বাবু !

—হ্যাঁ। তোর গল্প শুনলাম। খুব বেঁচেছিস।

সে হাসিল।

রমার সংবাদ দিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু প্রশ্ন করিলাম—তুই চলে গেলি কেন ?

—আজ্ঞে খিদিরপুরে গেলাম বেড়াতে। জাহাজ দেখলাম—বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল, আমোদ-টামোদ করলাম রেতে ; কি হয়ে গেল, মনে হল কি হবে বিয়ে করে ? ত্যাশ বিদ্যাশে কত—সে লজ্জায় থামিয়া গেল।

আমি বুঝিলাম—দেশ-বিদেশের বিচিত্রতার মধ্যে বিচিত্র বিলাসিনীদের আকর্ষণ সেদিন তাহাকে সব ভুলাইয়া দিয়াছিল! আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলাম। ছোট একটি নীড়, রমার মধ্যেকার নারীত্বের শান্ত বিকাশ তাহাকে ভুলাইতে পারিবার তো কথা নয়, সুতরাং তাহার দোষ কি ? প্রেম তো তাহার মধ্যে সম্ভব নয়। তাহার জন্য প্রয়োজন ছিল অপরিমেয় আনন্দের—

চিন্তায় বাধা দিয়া পশুপতি বলিল—কিন্তু ভুল হইছিল, মতিচ্ছন্ন হইছিল আমার বাবু। আজ মরে গেলে কি হত ? রমাদাসীর কবচই আমাকে বাঁচায়া বাবু। নইলে কেউ বাঁচল না—আমি বাঁচলম ! আর—

পশুপতি বলিল—প্রচণ্ড বিস্ফোরণে জাহাজ ফাটিয়া গেল, বিকট শব্দ, দুরন্ত আঘাত, ধোঁয়াচ্ছন্ন অন্ধকার। কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল, সে জানে না। জ্ঞান ছিল না তাহার। যখন জ্ঞান হইল তখন সে দেখিল কে যেন তাহাকে একখানা ভাসমান কাঠের উপর শোয়াইয়া রাখিয়াছে। তাহার মাথা ছিল হাতের উপর—রমার কবচটাই তাহার কপালে ঠেকিয়া ছিল।

কবচটা বাহির করিয়া সে কপালে ঠেকাইল। বলিল—ই কবচ যত দিন রহেগা, তত' দিন হামারা কিছু হবে না বাবু।

আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম রমার কথা।

স্তম্ভিত হইয়া গেল পশুপতি। তাহার সে-মূর্তি আমি বর্ণনা করিতে পারিব না।

কয়েক মুহূর্ত পর সিগারেট ধরাইয়া হাসিয়া সে বলিল—চললাম। সেলাম বাবু!

তাহাকে ডাকিলাম—শোন শোন!

—আজ্ঞে!

—কি করবি এখন?

পিছনে গঙ্গায় ষ্টীমারের তীব্র সার্চলাইট আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চাকার জলকাটার আলোড়ন-শব্দ শোনা যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে রকমারি আওয়াজের সিটি বাজিতেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পশুপতি হাসিল, তারপর বলিল—নতুন জাহাজমে চলে যায়েগা। আজকাল খালাসীর ভারি আদর। কেউ যেতে চাইছে না। হাম যায়েগা।

সে চলিয়া গেল। যাইবার সময় পথের উপরেই কি একটা ফেলিয়া দিয়া গেল; ছোট শক্ত একটা কিছু। অগ্রসর হইতেই সেটা আমার নজরে পড়িল, বিবর্ণ সুতায় বাঁধা একটা তামার কবচ!

শা প মো চ ন

বিজ্ঞানের যুগে দেবীচরণের আকৃতির বিকৃতিকে বিধাতার খেয়ালের খুশি বলা চলে না। দোষ নাকি গিয়া পড়ে পিতা-মাতার উপর। কিন্তু বিধাতার খেয়ালই হউক, আর অপরাধ পিতা-মাতারই হউক, দেবীচরণ ফলভোগ করে। লোমশ পশুর মত ছাই-রঙের দেহবর্ণ, অস্বাভাবিক লম্বা মুখ, তাহার উপর একটা চোখ অহরহ মিটমিট করে, আর একটা চোখ বিস্ফারিত, কে যেন চোখের উপরের কপালের চামড়াটা টানিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। শীর্ণ দেহ, কাঠির মত হাত পা,

তাহার উপর চলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া, এক পায়ের শিরাগুলি নাকি অহরহ টানিয়া ধরিয়া থাকে।

বেলা তিনটা হইবে, দক্ষিণপাড়ায় দুর্গাপ্রসাদবাবুর চায়ের মজলিসটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে; গড়গড়ার মাথায় ধুমুচির মত কল্কেটা আগ্নেয়গিরির মতই ধূমায়মান, হাস্যধ্বনিও প্রচুর উঠিতেছে। এই সময় সম্মুখের রাস্তায় দেবীচরণকে দেখা গেল। পরিধানে আধময়লা কাপড়, কিন্তু পরিপাটি কোঁচায় সুবিন্যস্ত, গায়ে একটি গলাবন্ধ কোট, পায়ে একজোড়া ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা, কাঁধে কনস্টেবলদের মত একটি ঝোলা।

দুর্গাপ্রসাদের দাদা বাঙলা দেশে প্রতিষ্ঠাবান চিত্রশিল্পী, তিনি সম্প্রতি কলিকাতা হইতে দেশে আসিয়াছেন; চায়ের মজলিস তাঁহাকে লইয়াই গরম হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি দেবীচরণকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, আরে, অদ্ভুত চেহারা তো!

দুর্গাপ্রসাদ মৃদুস্বরে বলিল, আমাদের কিশোরীদার ছেলে—দেবীচরণ। দেবীচরণের শ্রবণশক্তি বড় তীক্ষ্ণ, কথাটা তাহার কানে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই সে সহাস্যমুখে বৈঠকখানার উপর উঠিয়া বলিল, চিনতে পারছেন না কাকাবাবু?—কথাটা বলিয়াই সে শিল্পী শ্যামাচরণের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া চাপিয়া বসিল।

শ্যামাচরণ তাহার সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলাইয়া লইতে লইতে বলিলেন, কেমন আছ?

হাসিয়া দেবীচরণ বলিল, আজ্ঞে, অস্তি কশ্চিৎ দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহে মার্জার শাবকের অবস্থা। ব্রাহ্মণগৃহের গরুও বলতে পারেন, খাদ্যাভাবে অস্থিপঞ্জরসার।

—কেন? তুমি তো সাবোয় না চুঁচড়োয় এগ্রিকালচার না কি শিখেছিলে না?

দুই হাতের তালু উল্টাইয়া দিয়া হাসিয়া দেবীচরণ কহিল, বেশ! শুধু কৃষিবিদ্যা! শেখার আর অন্ত নাই, স্কুলে ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত, চুঁচড়োয় কৃষি, জমিদারী-সেরেস্তার খাতা লেখা, পোস্টাপিসে পিওনীতে শিক্ষানবিশী, শিখলাম অনেক; কিন্তু গেল সব এই মদনমোহন রূপের জন্যে। দেখলেই মালিকের ভুরু কুঁচকে ওঠে। মুখে বলে, দরকার নাই। কিন্তু আমি বুঝি সব। বুঝলেন, অবশেষে শিখলাম জ্যোতিষবিদ্যা; কিন্তু সেখানে আরও বিপদ! লোকে বাড়ি ঢুকতে দেয় না, বলে, সাক্ষাৎ শনি, চোখ দেখছিস না!

মজলিসসুদ্ধ লোক তাহার কথায় হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; শ্যামাচরণ একটু অপ্রস্তুত হইলেন; তিনি কথাটাকে ঘুরাইয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যেই বলিলেন, বল কি! তাহলে তো অনেকগুলি বিদ্যে তুমি শিখেছ!

মজলিসের হাসির সঙ্গে দেবীচরণও প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছিল ; সে বলিল, আজ্ঞে হাঁা, বিদ্যেতে আমি বিদ্যে-মহাসাগর, কিন্তু তলা একেবারে পরিষ্কার, মণি-মুক্তো দূরের কথা, ঝিনুকের খোলাও একটা জন্মাল না।

শ্যামাচরণ সত্যই একটু দুঃখিত না হইয়া পারিলেন না, বলিলেন, তাইতো, তাহলে ঘরেই বসে আছ ?

মাথা চুলকাইয়া দেবীচরণ বলিল, আজ্ঞে না, কতকগুলো শিশি বোতল নিয়ে টুংটাং করে খুঁড়িয়ে বেড়াচ্ছি কোনো রকম করে।

বিস্মিত হইয়া শ্যামাচরণ বলিলেন, শিশি বোতল নিয়ে ?

—আজ্ঞে, জাত্যাভাবে ভবেৎ বৈষ্ণব—কর্মাভাবে চিকিৎসকঃ। আজকাল চিকিৎসক হয়েছি, ওষুধ বেচি !

এবার শ্যামাচরণের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়া গেল, তিনি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বল কি ? চিকিৎসক !

—আজ্ঞে হাঁা ; মানে-মানে যখন দিলে না লোকে, তখন প্রাণে না মারলে উপায় কি ? দেহ তো দেখছেন, চুরি-ডাকাতি করবার সামর্থ্য নাই, কাজেই বলের অভাবে কলে কাজ চালাচ্ছি।

দুর্গাপ্রসাদ এবার একটু হাসিয়া বলিল, দেবীচরণ একটা ওষুধ তৈরি করেছে দাদা, অদ্ভুত ওষুধ ; সে ব্যবহার করলে শরীর পুষ্ট হয়, কামদেবের মত রূপ হয়, কোকিলের মত কণ্ঠ হয়, জাতিস্মরের মত স্মৃতিশক্তি হয় আরও কি কি হয় বল না হে দেবী !

দেবী অপ্রতিভ হইল না, সে হাসিয়া বলিল—নাস্তি দোষ বিজ্ঞাপনে, বুঝলেন বাবু ! ওটা হল আমার বিজ্ঞাপন। তবে হাঁা, ওষুধ আমার ভালো, বুঝলেন কিনা, আয়ুর্বেদোক্ত প্রণালীতে বিশুদ্ধ দেশীয় ভেষজের দ্বারা প্রস্তুত। অষ্টোত্তর শত রকমের গাছ-গাছড়া—অনন্তমূল ইত্যাদি—বুঝলেন কিনা, সেবনে ক্ষুধা হবে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পাবে, শরীরের পুষ্টি হবে, কান্তি উজ্জ্বল হবে, বুঝলেন কিনা ; তা কাকাবাবু, আপনি এক বোতল ব্যবহার করে দেখুন। মূল্য নাম মাত্র—আড়াই টাকা। তা সে আপনার কাছে আর কি ? শুনতে তো পাই আপনি একজন মস্ত বড় চিত্রকর—খ্যাতি কত ! বুঝলেন কিনা ; সেবার গেলাম মুর্শিদাবাদে রাজবাড়ি ; দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের খরচ প্রয়োজন—

সবিস্ময়ে শ্যামাচরণ বলিলেন, দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ ?

—আজ্ঞে হাঁা। তারপর বুঝলেন কিনা, মনে মনে—

আবার বাধা দিয়া শ্যামাচরণ বলিলেন—কেন ? প্রথম স্ত্রী তোমার—

—আজ্ঞে, সেদিকে আমি ভাগ্যবান, তিনি খালাস পেয়েছেন। তারপর বলি শুনুন—মনে মনে অনেক প্রণিধান করলাম, করে একখানা কাপড়-কাচা সাবান বের করে, যাকে বলে আপাদ-মস্তক ঘর্ষণ করে, খালি পায়ে, খালি গায়ে, গলায় একটা ন্যাকড়ার ফালিতে একটা চাবি বেঁধে, গিয়ে উপস্থিত হলাম জোড়হাত করে। সভায় তখন ঘোর মজলিস, দেখি কাকাবাবুর নাম হচ্ছে। মহারাজ বলছেন,—হ্যাঁ, চিত্রকর বটেন শ্যামাচরণবাবু! ভাবলাম, বলি, হুজুর, তিনি আমার কাকা হন। পরক্ষণেই লোভ সম্বরণ করলাম, না, তাঁর মাথা হেঁট হবে আর আমার ভাগেও হয়ত শিকের দড়ি শেকল হয়ে যাবে, কোন মতেই আর ছিঁড়বে না।

দেবীচরণ একবার নীরব হইয়া চারিদিক দেখিয়া লইল; দেখিল, অন্য সকলের মুখে কৌতুকস্মিত হাস্যরেখা সুপরিস্ফুট, কিন্তু শ্যামাচরণ গম্ভীরমুখে বসিয়া আছেন। সে নীরব হইয়া গেল।

—তারপর? সাহায্য কি পেলে?—একজন প্রশ্ন করিল।

হাতের উপর হাত দিয়া মৃদু তালি দিতে দিতে দেবীচরণ বেশ গম্ভীরভাবেই বলিল, তা দিয়েছিলেন পঞ্চাশ টাকা। বললাম, মাতৃবিয়োগ হয়েছে ব্রাহ্মণের ছেলে। মহারাজের দয়া হয়ে গেল আর কি!

গম্ভীরভাবেই শ্যামাচরণ বলিলেন, বিয়েটা হল কোথায় হে?

—জায়গা অবশ্যি খুব ভালোই—আম, কাঁঠাল, দধি, দুগ্ধ প্রচুর। গঙ্গার তীর, শীতল জায়গা, মুর্শিদাবাদ জেলা—নবাবী দেশ। শ্বশুরও পণ্ডিত লোক, হাসছেন কি, বেশ মান-খাতির আছে গো! মশায়, দানের বাসন কত গো! একটা ঘর বোঝাই।

শ্যামাচরণ বুঝিলেন—একটা চাতুরি খেলিয়া মেয়েটির সর্বনাশ করা হইয়াছে। তিনি একটু কঠিন হাসি হাসিয়া বলিলেন—ঘটকচূড়ামণিটি কে হে? ঘটকালি করলে কে?

দেবী হাসিয়া বলিল—অ্যাই দেখুন, কাকাবাবু কি বলছেন দেখুন! বিজ্ঞাপনে বিবাহের যুগে ঘটকের দফাই যে ইতি শেষঃ। ও আপনার ঘটও ভেঙেছে, কচুও দগ্ধ হয়ে ভস্মে পরিণত, বাকি আছে চূড়ামণি—তা সেটুকু আর থাকবে না, ওই বেতারে বিয়ে আরম্ভ হওয়ার অপেক্ষা আর কি!

মজলিসসুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবার শ্যামাচরণের মুখেও হাসি দেখা দিল। দেবীচরণের রসিকতায় তিনি সত্যই মুগ্ধ হইয়া গেলেন, বলিলেন, তাই তো দেবীচরণ, তুমি যে এমন রসিক, তা তো জানতাম না!

—আকার দেখে অনুমান করতে পারেন না বাবু ? আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমার নিজেরই হাসি পায়। বিধাতা বেটাকে বখশিশ করতে ইচ্ছে হয়।

এ কথাটায় অন্য সকলে হাসিল, কিন্তু শ্যামাচরণ আবার গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। দেবীচরণের চক্ষু আকারে দেড়খানি হইলেও, তীক্ষ্ণতায় বোধ করি সাড়ে চারখানির সমতুল্য—সেটুকু ভাবান্তরও তার দৃষ্টি এড়াইল না। সে তাড়াতাড়ি আরম্ভ করিল—আবার বিয়ের কথা যদি শোনেন, তবে হাসতে হাসতে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবে। বুঝলেন কাকাবাবু, ও দোষ কারুরই নয়, ঘটক তো ছিলই না, আর দোষ আমার শ্বশুরেরও নয়। দোষ আমার আর সেই তার ; মানে বুঝলেন কিনা ওই সীতা সাবিত্রীর বাচ্চাটির। যাকে বলে, স্বখাত সলিল। আমি কন্যে চাক্ষুষের সময়, যাকে বলে বাজিয়ে, মানে—বলে কয়ে সেঙা করা, তাই করেছি।

—আরে, তুমি নিজেই কনে দেখতে গিয়েছিলে নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্বয়ং একক।

—কেন তোমার জ্যেঠা ? তিনি আছেন তো ?

—আছেন মানে ! দিন দিন ফুলছেন। ইয়া—বিরাট পুরুষ, ওঁর আর বিনাশ নেই। প্রায় বিশ্বরূপের কাছাকাছি, কোমরে এখন কাছি বেঁধে কাপড় রাখতে হয়।

—বল কি, এত মোটা হয়েছেন ? তা মোটা মানুষের নড়াচড়া একটু কষ্টকর হয় বটে।

—অ্যাই, কাকাবাবু আবার বলছেন কি দেখ ! জ্যেঠা গতিতে আমার ঐরাবত ; উচ্চৈঃশ্রবা রেসে হেরে যায়। আজকাল আবার মামার সম্পত্তি পেয়েছেন একগণ্ডা দুকড়া দুক্রান্তি একদন্তী জমিদারী স্বত্ব। দৈনিক ভূমি কম্পিত করে দপ্তর বগলে দশ-বারো মাইল হেঁটে খাজনা আদায় করে আসছেন। তা আমি অবশ্যি বলেছিলাম জ্যেঠাকে, যে জ্যেঠা, চল আমার সঙ্গে।—বেশ লজ্জিত হয়ে বিনয় করেই বললাম। তা জ্যেঠার আমার আর কিছু থাক আর না থাক, জ্যাঠামি অনেকটুকু আছে কিনা ! বললে, তাহলে একখানা ফরাসডাঙ্গা না হোক, ধোলাই ধুতি কিনে দে আমাকে, আর ইণ্টারক্লাসে নিয়ে যেতে হবে, ও কাঠের বেঞ্চিতে ভিড়ে আমি যেতে পারব না। ঠ্যাটামি বরং সহ্য হয় বাবু, কিন্তু জ্যাঠামি আদবে আমার বরদাস্ত হয় না। আমি আর কিছু না বলে জয় বাবা গুণহীন সিদ্ধিদাতা ’বলে জ্যেঠাকে একটি প্রণাম করে একাই চলে গেলাম।

অকস্মাৎ সকচিত হইয়া সে বলিল, কে গেল ? পোস্টমাস্টার নয় ?

পথিকটি তখন পথের সে স্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে, দেবীচরণ

দাওয়ার উপর হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিল, হুঁ, সেই ঘুঘু মশায়ই বটেন। বুঝলেন, এখানে এক সম্বন্ধ বার করেছেন, রোজ কুটুম্বিতা করে জলখাবারটি সেখানে সারা চাইই। যাই, আমি আবার ওষুধের দাম পাব, দেখি।—বলিতে বলিতেই সে ঝোলা খুলিয়া একটি বোতল বাহির করিয়া নামাইয়া দিল।

—খেয়ে দাম দেবেন কাকাবাবু। সস্তা ইনস্টলমেণ্ট—চার আনা সপ্তায়, আড়াই মাসে শোধ। নগদ দিলে চার আনা কমিশন।

শ্যামাচরণ হাসিলেন। কে একজন বলিল, বাঃ, বিয়ের গল্পটা বলে যাও।

—মানে, গল্প আর কি, চোস্ত সাদা কথায় মেয়েটিকে আমি বললাম, বাপু, এই দেখছ আমার রূপ, আর গুণের কথা বেগুন না হলেও কচু বটে, খেতে ভালো লাগে না, নাড়লে ঘাঁটলে সুড়সুড়ি লাগে; আর অবস্থার কথা কি বলব, লোকের দশ অবস্থা হয়, আমার আবার দশের আগে দশমিক, মাথায় পৌনপুনিক। স্রেফ মোটা ভাত আর মোটা কাপড়; শেমিজ না, ক্রীম না, স্রেফ নারকেল তেল। পছন্দ হয় তো বল বাপু, না হয় তো তাও বল। তা বুঝলেন কিনা, মেয়েটি একদিকেই ঘাড় নাড়লে, সে ঘাড় আর অন্যদিকে গেল না। আমি যাই, মাস্টার আবার অন্যদিকে পথ ধরবে। রামঘুঘু রে বাবা!

শ্যামাচরণ হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, বউমাটি দেখতে শুনতে কেমন হে?

অত্যন্ত লজ্জার সহিত দেবী বলিল, আমার তো আজ্ঞে, দেড়খানা চোখ, ওই একরকম আর কি।—সে হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

দুর্গাপ্রসাদ বলিল, দেবীর বউ খুব সুন্দরী হয়েছে, তা সে কথা ও কিছুতেই বলবে না।

শ্যামাচরণ বলিলেন, ওদের দুজনের ছবি আঁকতে দিলে আমি আঁকি, 'দি বিউটি অ্যাণ্ড দি বীস্ট'! অবশ্য দেবীকে আরও খানিকটা কুৎসিত করতে হবে।

দুর্গা বলিল, বলে দেখ না। টাকাকড়ি পেলে হয়ত রাজী হতে পারে।

শ্যামাচরণ মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে ঔষধের বোতলটা লইয়া একবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন, তারপর ছিপিটা খুলিয়া সেটাকে উপুড় করিয়া সমস্ত ঔষধটুকু নিঃশেষে মাটিতে ঢালিয়া দিলেন।

'খুব সুন্দরী' কথাটা অতিরঞ্জন; সংসারে যে রূপ দেখিতে গেলে মানুষ বাধা পায়, সে রূপের মহিমা বাড়িয়া উঠে মানুষেরই কল্পনায়। দেবীচরণের বাড়িতে পর্দার বড় কড়াকড়ি অবস্থা। বধূটি কদাচিৎ বাড়ির বাহির হয়, তাও দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মেয়েটি নিজেকে আবৃত করিয়া রাখে। দেখা যায়

শুধু হাতের ও পায়ের আঙুলগুলি ; গৌরবর্ণ ঈষদ্দীর্ঘ আঙুলগুলি মানুষের মনের রঙে ডুবিয়া তুলিকার কাজ করে। তবে খুব সুন্দরী না হইলেও ভামিনী শ্রীমতী মেয়ে, নিখুঁত রূপ না থাকিলেও একটি রমণীয় শ্রী আছে।

ভামিনী স্বামীর সংসারে একা মানুষ, বাহিরের দরজাটি ভেজাইয়া দিয়াই সে দাওয়ায় রান্না করিতেছিল। গ্রাম ঘুরিয়া ফিরিয়া দেবীচরণ সন্তর্পণে দরজাটি অল্প খুলিয়া সব দেখিয়া লইল ; নিবিষ্টমনে ভামিনী রান্না করিতেছে। সন্তর্পণেই বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবী ভামিনীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা ভামিনী সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠনটি দীর্ঘ করিয়া টানিয়া দিল। এবার সশব্দে হাসিয়া দেবীচরণ দাওয়ার উপরের তক্তাপোষটায় বসিয়া বলিল, তুমি তো ভয়ানক চতুরা !

ভামিনী রান্না ছাড়িয়া উঠিল। স্বামীর হাত-পা ধুইবার জন্য জল ও গামছা আনিয়া সম্মুখে নামাইয়া দিল, একটি কথাও বলিল না, মাথার অবগুণ্ঠন এতটুকু অপসারিত করিল না। এমনই ভামিনীর অভ্যাস। দশটা কথায় একটা জবাব দেয়। দেবী আবার বলিল, তুমি তো দেখি ভয়ানক চালাক !

ঘোমটার ভিতর হইতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে ভামিনী বলিল—অ্যাঁ ?

—আমি এসে দাঁড়ালাম এত চুপি চুপি, তুমি বুঝলে কেমন করে বল তো ?

—ছায়া দেখে। লম্বা ছায়া পড়ল যে। —ভীরু শিশুর মত ভামিনী উত্তর দিল।

দেবীচরণ বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তাহলে তুমি বোকা সেজে থাক। নইলে ধুম থেকে বহ্নি, ছায়া থেকে কায়া—এ উপলব্ধি তো সহজ নয় !

ভামিনী ঘোমটার ভিতর হইতেই প্রশ্ন করিল—অ্যাঁ ?

—কিছু না ; বলছিলাম, তরকারির ডালায় কচু আছে ? থাকে তো দগ্ধ কর, ভক্ষণ করব।

ভামিনী কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত অপেক্ষা করিয়া ত্রস্তভাবে রান্নাশালের দিকে চলিয়া গেল, রান্নায় পোড়া গন্ধ উঠিয়াছে। দেবী ঝোলার ভিতর হইতে আপনার ঔষধগুলি বাহির করিতে বসিল। ঔষধের বোতলের সঙ্গে বাহির হইল একটি কাগজে মোড়া প্যাকেট। শ্যামাচরণ নগদ টাকাই তাহাকে দিয়াছেন। সেই টাকায় ফিরিবার সময় দেবীচরণ ভামিনীর জন্য একখানি শাড়ি কিনিয়া আনিয়াছে। 'বনহরিণী' শাড়ি, শাড়ির পাড়ে চকিত হরিণীর দল সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে। প্যাকেটের কাগজখানা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে

সহসা ঘৃণায় আক্রোশে কুৎসিত মুখখানা বীভৎস করিয়া তুলিয়া দেবীচরণ বলিয়া উঠিল—পরিবারের সহোদর সব! আমার স্ত্রী যেমনই হোক, তাতে তোদের খোঁজ কেন, শুনি? কমিশন বাদ না দিয়েই পুরো আড়াই টাকা নগদ।

কিন্তু ভামিনীর কি দোষ? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দেবীচরণ অবগুণ্ঠনাবৃতা ভামিনীর দিকে চাহিল, এখনও সেই দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অদ্ভুত! সংজ্ঞা নাই, সাড়া নাই, রক্তমাংসের পুতুল একটা। দেবীচরণের সাধ্য আর কতটুকু, কিন্তু তবুও তো দেবীচরণের ত্রুটি নাই! রঙিন কাপড়, সায়া, শেমিজ, ব্লাউজ, পাউডার, স্নো, ক্রীমে ভামিনীর বাক্স ভরিয়া দিয়াছে। দেবীচরণ অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে বলিল, এগুলো তুলে রাখ দেখি।

ভামিনী উনান হইতে কড়াটা নামাইয়া সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া আসিল। একে একে বোতলগুলি তুলিয়া রাখিয়া শেষে কাপড়খানা হাতে তুলিয়া একবার শুধু পাড়টা দেখিল, তারপর সেখানিকেও ঘরে রাখিয়া দিয়া পুনরায় রান্নাশালে ফিরিয়া উনানে কড়াটা চাপাইয়া দিল।

দেবীচরণের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, সে বলিল—দেখ।

ভামিনী মুখ ফিরাইল। দেবী বলিল—তোমার বাবা আমার পায়ে ধরে তোমার পিঠে ফুল গঙ্গাজল দিয়ে যাকে বলে উচ্ছুগ্যু করে তোমাকে দান করেছে, আমি তোমায় পায়ে ধরে আনতে যাই নি, বুঝেছ?

ভামিনী নিস্পন্দ নির্বাক, অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সে শঙ্কিত বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রূঢ়স্বরে দেবী বলিল—শুনছ?

মৃদুস্বরে উত্তর হইল—হ্যাঁ।

—তবে? তবে আমাকে দেখে ঘোমটা কেন তোমার? খোল, ঘোমটা খোল।

ভামিনী ঘোমটা খুলিয়া দেবীচরণের মুখের দিকে চাহিল। সুন্দর ভামিনীর দুইটি চোখ, তেমনই সুন্দর তাহার দৃষ্টি! দেবীর সমস্ত অন্তরখানি পরম স্নেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে নিজেই উঠিয়া গিয়া সস্নেহে ভামিনীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—কাপড়খানা পছন্দ হয়েছে?

ভামিনী প্রশ্ন কহিল—পাড়ে ওগুলো কি? ছাগল?

হাসিয়া দেবী বলিল—না সখি, তোমার মত যাদের চোখ, ওরা হল তাই।

—গরু?

হা হা করিয়া হাসিয়া দেবী যেন ভাঙিয়া পড়িল—তোমার কি গরুর মত চোখ নাকি? এমনই গোলাকৃতি?

অপ্রস্তুত হইয়া ভামিনী বলিল—না।

—হরিণ হরিণ! আজ কাপড়খানা পরবে, বুঝেছ? আজ শুক্রবার, 'সোম শুক্রে পরে শাড়ি, ধন হয় তার আড়ি-আড়ি'। মেলাই টাকা হবে আমাদের। সন্ধ্যাবেলা রান্না সেরে নিয়ে গা ধুয়ে ফেলবে, সুগন্ধ তেল দিয়ে চুল বাঁধবে, তারপর সাবান দিয়ে মুখখানি পরিষ্কার করে ধুয়ে স্নো মাখবে; মেখে কাপড়খানি পরে ফেলবে। বুঝেছ?

ভামিনীর মুখখানি এবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে দীপ্তি দেখিয়া দেবীর অন্তর মুহূর্তে উত্তাপে আবেগে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, সে তাহার লোমশ দীর্ঘ হাত দুখানি প্রসারিত করিয়া ভামিনীকে বুকে টানিয়া লইল। ভয়ে ভামিনীর চোখ তখন মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, সংজ্ঞাহীন কাঠের পুতুলের মতই আড়ষ্ট সে, মুখখানা শবের মত বিবর্ণ।

দেবীও সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। অত্যন্ত রূঢ়কণ্ঠে বলিল, ঘোমটাটা টান; শুনতে পাচ্ছ না?—বলিয়া নিজেই তাহার অবগুণ্ঠন আবক্ষ টানিয়া দিল।

গান! ভদ্রলোকে গান গায় পাড়ার মধ্যে, উপরের জানালার ধারে বসে! মুখুজ্জেদের ডেঁপো ছেলেটা এই দ্বিপ্রহর বেলায় জানালার ধারে বসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

—হ্যাঁ, রান্না-বান্না তুলে ঘরে রাখ। আমি জল নিয়ে আসি।—বলিয়া দেবীচরণ প্রকাণ্ড দুইটা বালতি লইয়া বাহির হইয়া গেল। ভামিনীর স্নানের জল। উঠানের কোণে তালপাতা দিয়া ঘেরা একটুকরা বাঁধানো জায়গা, ভামিনীর স্নানের ঘর।

প্রাতঃকালে দেবীচরণ চলিয়াছিল রোগী দেখিতে। সঙ্গে দুই-তিনজন নিম্নজাতীয় স্ত্রী-পুরুষ; তাহারা কবিরাজকে ডাকিতে আসিয়াছে। ময়দার দোকানে গোঁসাইজী বসিয়া হুঁকা টানিতেছিল, সে অকস্মাৎ দেবীচরণকে দেখিয়া বেশ ব্যগ্র হইয়া উঠিল, বলিল—দেবীচরণ যে, অ্যাঁ! চলেছ কোথায় হে?

দেবীচরণ বাহিরে আর একটি মানুষ, সে তাড়াতাড়ি নমস্কার করিয়া বলিল, —আজ্ঞে, ধন্বন্তরি কলে চলেছেন, প্রভু।

গোঁসাইজীও রসিক ব্যক্তি, কিন্তু আজ আর তিনি রসিকতা করিলেন না। পরম গম্ভীর ভাবে বলিলেন, তা বেশ বেশ; কল-টল পাচ্ছ তাহলে. আজকাল ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পুরুষস্য ভাগ্যং স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্ দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ

বিস্ফারিত চোখে ইঙ্গিত করিয়া একখানি হাত দেবীর মুখের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া গোঁসাই বলিল—পঞ্চাশ।

—আজ্ঞে না।—দেবীচরণের সর্বাঙ্গ ভয়ে স্বেদাপ্লুত হইয়া উঠিল।

—একশ।

—আমাকে মাফ করুন গোঁসাইজী। আপনার পায়ে ধরছি আমি।—দেবীচরণ ভয়ে এবার কাঁদিয়া ফেলিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গোঁসাই বলিল, কেউ জানতে পারত না হে, কাকে কোকিলে না। মিছে ভয় করলে তুমি। তা যাক, কিন্তু সাবধান, বুঝেছ?

রেহাই পাইয়া দেবীচরণ যেন বাঁচিয়া গেল, সে বিবর্ণ মুখেই পরম আশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে না। আমার মাথায় বজ্রাঘাত হবে তাহলে। দেখবেন আপনি। আপনাকে—আপনি—মানে—।—কথা খুঁজিয়া না পাইয়া প্রলাপের মত সে বকিতে আরম্ভ করিল।

আবার পাছে গোঁসাইজীর সহিত দেখা হইয়া যায়, সেই ভয়ে রোগী দেখিয়া ফিরিবার সময় এক জনবিরল গলি-পথ ধরিয়া সে বাড়ি ফিরিল; কিন্তু মনে মনে তাহার কৌতূহলের আর সীমা ছিল না। এই ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীলোকটি কে? গোঁসাই তো বহুবল্লভ; তাহার উপর জাতিকুলশীল সব মজাইয়া তাহার অভিসার। সম্প্রতি ছুতারদের গলিতে নাকি প্রভাতে তাহার পদচিহ্ন দেখা যায় বলিয়া লোকে অনুমান করে। ছুতারদের বিধবা মেয়ে দাসী—দুর্গাদাসীর দুয়ারে তাহার করপদ্মের ছাপ পাওয়া যায়। দেবীচরণের মনটা কুৎসিত আনন্দে ভরিয়া উঠিল, ধান্যলুব্ধ ঘুঘু এইবার জটিল জালে আবদ্ধ হইয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইল, একটা ঢাক কাঁধে করিয়া কথাটা সে গ্রামময় ঘোষণা করিয়া বেড়ায়। আনন্দের আবেগে সে অভ্যাস মত সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া অত্যন্ত দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে আপন মনেই পাগলের মত হাত-পা নাড়িয়া নানা ভঙ্গি করিয়া হাসিয়া উঠিতেছিল।

বাড়ি আসিয়াই সে তাহার ধন্বন্তরি ঔষধালয়ের দুয়ারটি খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। খিলখিল হাসি! বাড়িখানা যেন সে হাসির ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার বুকে যেন খিল ধরিয়া গেল। ভামিনী হাসিতেছে। ভামিনী হাসিতেছে! ভামিনী হাসে, হাসিতে জানে! কিন্তু সে হাসি হাসায় কে? রক্ত যেন সনসন করিয়া মাথার দিকে উঠিয়া চলিয়াছে।

বাবুরামের বাবুয়া

বাবুরাম জমাদার।

বাবুরাম জমাদারকে যদি কেউ চোখে দেখতে চাও তবে হাওড়াতে ট্রেনে চড়ে চলে যাও, বেশি দূর না, শান্তিনিকেতন পার হয়েই যে জংসনটা পাবে, সেই জংসনে নেমে ব্রাঞ্চ লাইনে চাপতে হবে—ব্রাঞ্চ লাইনে বারো-তেরো মাইল। ছোট গাড়ি। বারো মাইলেই চারটে স্টেশন পার হতে হয়। পঞ্চম স্টেশনে নেমো। তবে যদি জংসন স্টেশনটাতেই কি অন্য যে কোনো স্টেশনে কলিকালের ভীম বা মহাদেব কি এমনি ধরনের চেহারার কোনো মানুষকে দেখতে পাও, এই বুকের ছাতি—মাথায় বাবরী চুল—টিকলো নাক, ইয়া টাঙির মত গোঁফ—বড় বড় চোখ, তেমনি দুখানা শক্ত সবল হাত, তবে তার কথা শুনবার জন্য অপেক্ষা করো। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। হয়ত বা মানুষটার চেহারা চোখে পড়বার আগেই তার গলার আওয়াজই তোমাকে চমকে দেবে। অথবা তার হা-হা হা-হা হাসি।

আমি তার গলার আওয়াজ শুনেই চমকে উঠে চারিদিক চেয়ে দেখে দেখে চেয়েছিলাম—এমন গলার আওয়াজ যার, সে মানুষটা কে? কেমন? চোখ ফিরিয়ে খুঁজতে হল না—প্লাটফর্মের অনেক লোকের আওয়াজ ছাপিয়ে যেমন তার গলাটাই কানে এসে পৌছেছিল বিশেষভাবে, ঠিক তেমনি ভাবেই অনেক লোকের ভিতরেও তার চেহারাটাই আগে চোখে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল, আজকালকার ক্যানেডিয়ান ইঞ্জিন প্রথম দেখবার কথা। দেখেছিলাম আসানসোলে প্রথম। ওভারব্রিজের উপর দাঁড়িয়েছিলাম, ট্রেনের দেরি ছিল, নিচে নামি নি, প্লাটফর্মে যাত্রীর ভিড় আর ফেরিওয়ালাদের ঠেলাগাড়ির ধাক্কার ভয়ে। হঠাৎ কোত্থেকে সাত স্বরে মেশানো ভরাট ভোঁ-ওঁ-ওঁ আওয়াজ। জাহাজের ভোঁ-এর সঙ্গে মিল আছে—তবু অন্যরকম। যেমন জোরালো ভরাট, তেমনি সুরেলা। বাঁয়া তবলার আসরে হঠাৎ যেন পাখোয়াজে কোনো জবরদস্ত ওস্তাদ আওয়াজ তুলে দিলে। ইয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে হল না—চোখে পড়ল মাথা থ্যাবড়া বিরাট লম্বা ইঞ্জিনখানা। মনে হল কলেজী কুস্তীর আসরে গামা কি গোলাম কি কিক্কর সিং এসে দাঁড়িয়েছে। বাবুরাম কুস্তী করে পালোয়ান হবার চেষ্টা করলে গামা গোলাম না হোক—কাছাকাছি কিছু হত। তাই বলছি, বাবুরামকে খুঁজে বের করতে হয় না—বাবুরাম আপনি চোখে

জলাধারের অন্তরীক্ষ

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ—১৩৬০

মূল্য এক টাকা বার আনা মাত্র
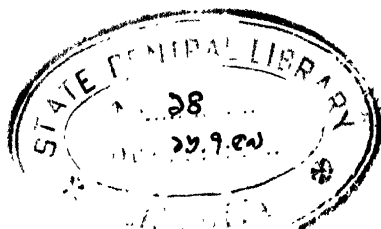
৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা ৬, ডি এম লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার
কর্তৃক প্রকাশিত। ৮৩বি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬, বাণী-শ্রী প্রেসের পক্ষে
শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

জীবনে আদর্শ গৃহীরূপেই যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম,
যাঁহার আশীর্ব্বাদ জীবন্তরূপে আমাকে এ-সংসারে
আজও জীবিত রাখিয়াছে স্বর্গত সেই পিতামহ-
দেবের চরণে—
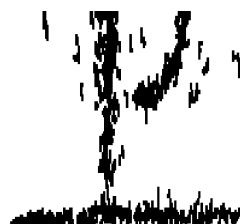
জলাধারের

পাগলের পরিচয়

পাগল উপাধি এ সভ্যজগতে তাহারই হয়, যাহার বাক্যে ও কর্ম্মে সামঞ্জস্য থাকে না, বা যাহার কর্ম্মপদ্ধতি সাধারণত অনিয়মিত এবং পূর্ব্বাপর সম্বন্ধশূন্য। কিন্তু উন্মাদ যাহারা, স্বতন্ত্র তাহারা—চিকিৎসকের অধীনস্থ জীব।

নিখিলবন্ধুকে আমি পাগল জানিতাম। কারণ, তাহার কথা শুনিলে তাহাকে তাহাই মনে হইত, তবুও তাহার কথা মনোযোগ আকর্ষণ করিত, না শুনিলেও উপায় ছিল না। কথার সাধারণ সূত্রই চিন্তা, তাহার কথাগুলি যে সব চিন্তার ফল, সে চিন্তা ত সাধারণ মোটেই নয়, পরন্তু এতটা পরিমাণে অসাধারণ, যে তাহা বিশ্বাস করা ত দূরের কথা, শুনিতেই চিত্তে কেমন যেন একটা অস্থির ভাব আসে।

আমায় বন্ধু বলিয়াই বিশ্বাস করিত বলিয়া আমার কাছেই সে আসিত, বসিত, ধূমপান করিত, তাহার পুঁজিপাটা যা কিছু সকলগুলিই ঝাড়িয়া ফেলিত। সে সকল গ্রাহ্য হইল কি-না তাহা সে কখনও বিচার করিত না, বক্তব্যগুলি প্রকাশ করিয়াই খালাস। তাহার কোনও বন্ধন আছে বলিয়া আমি জানি না, কোথায় থাকিত তাহারও ঠিক ছিল না, তবে মধ্যে মধ্যে আসিত। ধীরে ধীরে, চিন্তায় জর্জ্জরিত স্থবিরের মত সে যখনই ঘরে প্রবেশ করিত, অনুমানে বুঝিতাম আজ কিছু নূতন বিস্ময়কর ব্যাপার বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ছড়াইয়া দিবে, যাহাতে সবার প্রবহমান চিন্তাস্রোত ওলট-পালট হইয়া যাইবে। ইহার পর এখানে তাহার পরিচয় একটু দেওয়া ভাল।

ভূতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, তেজস্তত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রাচীন ইতিহাস, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি আলোচনায় সকল তত্ত্বই কোন না কোনও

সময়ে তাহার মুখের কথায় রূপ পাইত। কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও কথা কখনও তাহার মুখে শুনি নাই। একদিন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা, এত কথা বল, কিন্তু ভগবানের প্রসঙ্গে ত কিছু কোনদিনই বললে না—ও তত্ত্বটি তোমার বাদ পড়ল কেন,—এটা যে কেমন লাগে।

তাহাতে সে কোন প্রকার চিন্তা না করিয়াই বলিল,—যেমন আমার মুখে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও কথা না শুনে তোমার কেমন কেমন লাগে আমারও ঠিক তেমনি ও বিষয়টা চিন্তা করতেই কেমন কেমন লাগে। শুনিয়া কৌতুকের বশে জিজ্ঞাসা করিলাম—কি রকম খুলে বল ত শুনি!

রকম আর কিছুই নয়, অন্য সব বিষয়ে চিন্তা করতে গেলে ভিতরে যে উৎসাহ বা আকর্ষণ অনুভব করি, ও বিষয়টি ভাবতে গেলে যেন বাধা আসে, সূত্র হারিয়ে ফেলি। জোর করে' স্বভাবের বিরুদ্ধে ত আর কিছু ভাবা যায় না।

আচ্ছা, পাঁচ জনের কাছে ঈশ্বর সম্বন্ধেও ত কিছু শুনেছ—তাতে কি মনে হয়!

সে ত পুরানো পুঁথি বা বইয়ের কথা এদিক ওদিক ক'রে বলা, না হয় শুনা কথা ফলিয়ে বলা, তাদের নিজের সে বিষয়ে কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞানও নেই, চিন্তাও নেই। যাক্ ও সব কথা না কওয়াই ভাল।

আরও একটু খোঁচা দিবার অভিপ্রায়েই বলিলাম—তা হোলে তুমি ঠিক একটি নাস্তিক, বল—হাঁ কি না।

শুনিবামাত্র সে যেন একটু চিন্তিত হইয়াছে এরূপ বোধ হইল, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব কাটিয়া গেল, বলিল—হাঁ,—না।

শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পরিলাম না, মুখে বলিলাম,—হাসালে বটে, এক কথায় বুঝি উত্তর দিতে বুদ্ধিতে কুলাল না!

সে বলিল,—তোমার যেমন কথা, তেমনি উত্তর। যখন ঈশ্বর-সম্বন্ধে

প্রত্যক্ষ জ্ঞান আর সেইজন্য বিশ্বাস না থাকার কথা ভাবি তখন নাস্তিক; কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকলেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বাধে না, এটা যখন ভাবি এবং অন্তরে এটা বিশ্বাস করি তখন নাস্তিক নয়। এ ত সোজা কথা। যাক, ছেড়ে দাও না ও সব কথা।

ওর গায়ে কিছু লাগে না, সবই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে। এ সম্বন্ধে আর ঘাঁটাইয়া কি হইবে যখন তার ইচ্ছা নাই। তবে একটা কথা আরও শুনিবার উদ্দেশ্যে আর একবার প্রশ্ন করিয়া বসিলাম, জানিতাম, সে কখনও তাহাতে রাগ করিবে না।

আচ্ছা, যখন এত লোকে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে কিছু পেয়েছে, তখন অবশ্যই তাঁর অস্তিত্ব আছে। আমি সাধারণের কথা বলছি না। এই ধর না, পৌরাণিক যা-কিছু না হয় ছেড়ে দিলে, কিন্তু বেদব্যাসকে ত উড়িয়ে দিতে পার না। তা সে যুগের বেদব্যাস থেকে শঙ্কর, রামানুজ, বল্লভাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, চৈতন্য প্রভৃতি জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষেরা আবার এ যুগের দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ প্রভৃতি অসাধারণ মানুষদের কথাই বলেছি। আমাদের দেশের এঁরা যখন সাক্ষী—

বাধা দিয়া নিখিলবন্ধু জিজ্ঞাসা করিল, কিসের সাক্ষী?

ঈশ্বর আছেন তার সাক্ষী।

তাতে আমার কি? ঈশ্বর আছে কি নেই, এ যখন আমার মোকদ্দমা নয়, তখন তাঁরা সাক্ষী থাকেন, আছেন—না থাকেন, না আছেন—আমার মাথাব্যথা কিসের বল দেখি?

আহা, একেবারে উড়িয়ে দাও কেন। আমরা মানুষ, জগতের সভ্য সমাজে বাস করি, আমাদের সমাজের যে সব বড় বড় লোক, তাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে যে অসাধারণ শক্তি, এবং ভাব-ধারার বিকাশ দেখিয়ে গেছেন, যা ধরে এক এক সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়ে গেল, তাঁদের ভাবের সঙ্গে পরিচয় না করলে চলবে কেন? তাঁরা যে বস্তু

নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে গেলেন, আমরা চখের সুমুখে সেটা দেখবো না!

কে বারণ করেছে তোমায় দেখতে—সে সব ত তুমিও দেখছ, আমিও দেখছি।

বলি, তাঁরা ঈশ্বর-বস্তুকে অবলম্বন করে'ই না মহৎ হয়েছেন, আর তুমিও ত এটা দেখতে পাচ্চ, যেমন আমি পাচ্ছি!

যেমন তুমি দেখতে পাচ্চ, ঠিক তেমনি দেখতে আমিও পাচ্চি— এই কথা তুমি বলছ?

হাঁ, অন্তত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে।

না, ও সম্বন্ধেও আমরা দুজনে একই বিষয় বা বস্তু দেখতে পাচ্চি না। তোমার কাছে হয়ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত; সেইজন্য তুমি ঈশ্বরকে অবলম্বন ক'রেই এই সকল লোকের অসাধারণত্ব, এটি দেখতে পাচ্চ, বিশ্বাস করছ—আমার তো তা হয় নি!

আচ্ছা, তুমি এ সকল ব্যক্তিকে অসাধারণ ব'লে স্বীকার কর কি-না!

আহা, তা করবো না কেন! তাঁরা সমাজের গড়পড়তা মানুষের তুলনায় কতটা বড়, সে আর বুঝতে পারি না! কি যে বল তুমি— আমায় পাগল ঠাওরালে, দেখছি!

আচ্ছা, সেই যে অসাধারণত্ব সেটি কিসের জন্য?

শক্তির জন্য, জ্ঞানের জন্য, নিজের ভিতর যে কর্ম্মশক্তি আছে, কোনও বিশিষ্ট ধারায় তা প্রসারিত হবার সুযোগ পাওয়ার জন্য। সেই জ্ঞানকে অবলম্বন ক'রে যে সব কর্ম্ম করেছেন, তাতে একশ্রেণীর মানুষ সুখী হয়েছে, তাতে তাদের আনন্দের স্ফুরণ ও ভাবের প্রসার হয়েছে সেই জন্য।

তা হলেই এটা ত বুঝতে পারা যায় যে, শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দের স্ফুরণ ঈশ্বরকে অবলম্বন না করলে আসবে কি করে! তাঁরা

প্রত্যেকেই ঈশ্বরকে অবলম্বন করেছিলেন বলেই না এতটা জ্ঞান ও আনন্দের এবং একটি বিরাট জনসমষ্টির শ্রদ্ধার অধিকারী হয়েছিলেন?

একথা ত আমি বুঝতে পারি না—যে, ঈশ্বরকে অবলম্বন করেছিলো ব'লেই জ্ঞান, আনন্দ কিম্বা জনসমাজের শ্রদ্ধার অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ভাব বা বস্তু লক্ষ্য করেছিলেন—এইটিই বরং বেশী বেশী দেখতে পাই। ঈশ্বর ব'লে কোন বস্তুর অস্তিত্ব আমি এর মধ্যে দেখতে তো পাই নি।

প্রত্যেকে আলাদা বস্তু লক্ষ্য করেছিলেন—আর সে বস্তু ঈশ্বর নয়, এই কথা তুমি বলছ?

হাঁ তাই-ই; আমি আর কিছু বুঝিনি বা বলিনি—ছেড়ে দাও না ও সব, যার ভিতরে আমার মাথা যায় না।

তা বললে হবে না, তুমি ত এদের কথা আলোচনা করেছ। আচ্ছা, বল দেখি, বেদব্যাস ভগবান সম্বন্ধে কি অদ্ভুত স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ভাবেই বলেছেন।

গোড়ায় বেদব্যাসের দায়িত্বই এ ব্যাপারে খুব বেশী এ কথা ঠিক, কিন্তু তাঁর অপূর্ব্ব কাব্য সৃষ্টিকে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করবার ত কোনও প্রয়োজন আছে বোলে আমি মনে করি না। তারপর তাঁর অন্যান্য মতও আমার অভ্রান্ত ব'লে মেনে নিতে প্রাণ যদি বা না চায়, ত জোর করে মানাতে পার কি? আমার প্রাণ যে চায় না।

আচ্ছা, তারপর শঙ্কর—এত বড় আচার্য্য মহাপুরুষ।

সেই ত পুরানো কথা নিয়েই তাঁর কারবার—

কি রকম?

উপনিষদের আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব সেই পুরাতন কথা নিয়ে আলোচনা নয় কি? উপরন্তু জোর করে মায়া বা বিবর্ত্তবাদের প্রতিষ্ঠা নিয়েই ত শঙ্করের যত বাদানুবাদ! যা আমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মেনে নিতে পারি না।

আর রামানুজ! তাঁর যা-কিছু—বিশিষ্টাদ্বৈত মতের বাদানুবাদ নয় কি? জীব আর ঈশ্বরে পার্থক্য—বিরাট আর অংশ, অমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, তাতে কি?

মাধবাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, চৈতন্য প্রভৃতি।

তাঁদেরও ত ঐ দ্বৈতাদ্বৈত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ আর অচিন্ত ভেদাভেদ নিয়ে ও প্রেম ভক্তির ধারা, পাঁচ জনের মধ্যে শক্তিসঞ্চার আর নিজ নিজ জীবনে আনন্দ লাভ—অবশ্য সেটা ব্যাপক ভাবে।

আচ্ছা, এ যুগের মানুষ, ধর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন!

দু'জনের ত এক মত নয়! দেবেন্দ্রনাথের সেই পুরানো উপনিষদের, ব্রহ্ম আর মহানির্ব্বাণতন্ত্রের বাছা বাছা শব্দ ও স্তোত্রপাঠ আর সগুণ জ্যোতির্ম্ময়ের উপাসনার জাঁকজমক। সূর্য্যোপাসনাও তাঁর ছিল তাও জানি। আর কেশব সেনের ত আলাদা বিধানই হয়ে গেল।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ?

ওঁরাও ত দুজনে আলাদা, রামকৃষ্ণের মত বা সিদ্ধান্ত সবই ত ভাব-রাজ্যের ব্যাপার; তাঁর কর্ম্মজীবন একরকম, বিবেকানন্দের একেবারেই আলাদা। তাঁর আগা পাসতলাই কর্ম্মরাজ্যের। এসব ত তুমিও বুঝতে পার, আমিও বুঝতে পারি—নিজ নিজ বুদ্ধির মত করে' নিয়ে অবশ্য।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর?

সেও ত মাধবাচার্য্য, ও চৈতন্যের অনুসরণ।

আচ্ছা, অরবিন্দ?

আত্ম-চৈতন্যের স্ফুরণ, তাঁর মধ্যে সকলেই স্বীকার করবে—বাকীটা ত শক্তিকে অবলম্বন করে কর্ম্মজগতের মধ্যে তাতে আত্মসমর্পণ।

তা হ'লে এই যে যে সব মহাপুরুষের কথা আমরা পাচ্ছি, তাঁদের লক্ষ্যই এক ঈশ্বরবস্তু কি না, কর্ম্ম অবশ্য বিভিন্ন হতে পারে!

তাঁদের লক্ষ্য ত এক নয়ই, বরঞ্চ কর্ম্ম তাঁদের সকলেরই এক বলতে পারো। তাঁদের আশপাশের সকলকে যজানো', আর সেই কাজটি সুসিদ্ধ করবার জন্য শক্তিলাভের চেষ্টা বা সাধনা ছাড়া অন্য কর্ম্ম ত দেখতে পাই না।

আচ্ছা, তাঁদের জ্ঞান, ভক্তি, শক্তি, আনন্দ—এগুলি ত সকলকার একই ?

সরলভাবে বিচার করলে সেগুলি গুণগত ভাবে এক—তাতে কি এলো গেল! কর্ম্মের ফলে জ্ঞানও লাভ করা যায়, ভক্তি বা ভাবও পাওয়া যায়, শক্তিও পাওয়া যায়, শেষে আনন্দও পাওয়া যায়। শক্তি থাকলে যাকেই ছোঁবে তাইতেই ত সংক্রামিত হবে।

সত্যবস্তুকে অবলম্বন করতে পারলে তবেই না,—

যে যেটা ধ'রে থাকে সত্য ব'লেই ধরে না কি ?

যদি বলি জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দই ঈশ্বর—

তা সে তো অল্প-বেশী নানা মাত্রায় সকলকার মধ্যেই রয়েছে। কই, তাতে তো ঈশ্বর বলে আলাদা একটি কিছু অনুভূত হয় না।

হোপলেস্—তুমি ঈশ্বর বলে' বা ভগবান বলে' তা'হলে কিছুই মান না ?

নির্ব্বিচার সংস্কার-বশে ভগবান ব'লে একটা শব্দময় ফাঁকা ভাব ছেলেবেলা থেকে মাঝে মাঝে মনের মধ্যে আসে বটে; কিন্তু বুঝতে গেলে তার কোনও হদিশ পাই নি, কেউ পেয়েছে বলে'ও শুনি নি। তারপর তোমার যা বিশ্বাস। আর ওসব কথায় কাজ নেই।

কেন ভগবানকে পেয়েছেন বা জেনেছেন—এ কথাও ত রামকৃষ্ণের মত মহাপুরুষদের জীবনে—

শব্দটা ঐ রকম শোনায় বটে; কিন্তু ভাবের বা বস্তু-নির্দ্দেশের বেলা সেই নিজের সত্তায় প্রতিফলিত জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের উপরে এনে ফেলেছেন।

তা হলে' কি জগৎ জুড়ে যত ধর্ম্ম, ঈশ্বর ব'লে এই অধিকাংশ জনসমষ্টি বিশ্বব্যাপী চৈতন্যময় একসত্তার প্রতি লক্ষ্য করছে সেটা কি ভ্রম বলতে চাও ?

জনসমষ্টি মিলিত হয়ে যখন কোন কাজ করে, তখন কি তাকে ভ্রম বলা যায় ? আমার কথা ধর কেন ভাই, আমি এই বুঝি—আমাদের যে সত্তা, তার জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের বিকাশের তারতম্যেই ছোট-বড় আমাদের বিচারে সাব্যস্ত হয়। গুরুভাব অর্থাৎ মানুষ হয়ে মানুষের উপর আধিপত্যই হল এখানকার চরম ভোগ :—তা রাষ্ট্র ব্যাপারেই হোক, কোন কর্ম্ম বা ধর্ম্ম ব্যাপারেই হোক, অধ্যাত্ম জ্ঞান বুদ্ধি, বিজ্ঞানের ব্যাপারেই হোক। কেন্দ্রস্থ সত্তা যে বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে, তাকেই মহাপ্রসারিত ক'রে তুলবে—যার ফল সমধর্ম্মী।' অন্যান্য সত্তার আকৃষ্ট হওয়া, শক্তির স্ফুরণ হওয়া ; আর এই সকল প্রত্যক্ষ অনুভব বা দর্শনে আনন্দে ভাসা আর দোল খাওয়া।

মাপ কর ভাই—আর ঈশ্বরের কথায় কাজ নেই।

আজ নিখিলবন্ধুর পালা, আমি চুপচাপ।

নিখিল বলিতে লাগিল,—শুনচো একটা ব্যাপার?

বল না শুনচি।

পুরী সমুদ্রের তীরে বসিয়া আছি, এক অমাবস্যার রাত্র। দেখিলাম আকাশে মেঘ নাই, অনেকগুলি উজ্জ্বল তারা দেখা যাইতেছে। বায়ু স্থির, হঠাৎ ঝড়ের মত একটি দমকা বাতাস উঠিল। সেই বাতাসের গতি উত্তর হইতে দক্ষিণের দিকে, এমনই মনে হইল। গ্রাহ্য না করিয়াই বসিয়া আছি। লক্ষ্য রহিয়াছে সমুদ্রের জলের দিকে, তরঙ্গের রঙ্গ-ভঙ্গ চলিতেছে। যেমন তরঙ্গ সাধারণত সমুদ্রের তীরের দিকে থাকে, সেইরূপ তরঙ্গেরই খেলা; অন্ধকারও ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে। সমুদ্রতীর এখন প্রায় নির্জ্জন, দূরে ক্বচিৎ দুই-একজন চলাফেরা করিতেছে।

বালুময় তীরভূমির অতি নিকটেই, জলরেখার কতকটা দূরে, চঞ্চল জলের উপর যেন জোনাকির গাঁদি লাগিয়াছে। একটি তরঙ্গ আগাগোড়াই জ্যোতিষ্মান্, তারপর সেইরূপ একটি, তারপর আর একটি। তিনটি পর পর আসিয়া যখন সৈকতের বালুতলে মিলাইয়া গেল তখন দেখিলাম,—চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারার ছড়াছড়ি; তাহার মাঝে একখানি শ্বেতবর্ণ প্রায়-চতুষ্কোণ পদার্থ, যেন একখানি স্থূল কাষ্ঠাসন, তাহার উপরে গোলাকার একটি পদার্থ। অন্তরে দীপ্ত কৌতূহল, সুতরাং অনুমান করিতে কল্পনার প্রশ্রয় না দিয়াই উঠিলাম। জল হইতে সেটি যখন সৈকতের নিকটে আসিয়াছে, তখন নিকটে যাওয়া কঠিন নয়। তাহার নিকটে গিয়া হেঁট হইয়া পরীক্ষায় মন দিয়াছি, এটি কোন্ পদার্থ! হঠাৎ যেন ঝড়ের সঙ্গে একজন কেহ পশ্চাৎ

হইতে একটি ধাক্কা দিয়া আমায় তাহার উপর ফেলিয়া দিল। আমার কোন আঘাত লাগিল না; কিন্তু তাল সামলাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই আর একটি ধাক্কার আমায় তাহার উপর বসাইয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশাল তরঙ্গ আসিয়া সেই আসনশুদ্ধ আমাকে ভাসাইয়া জলের দিকে লইয়া চলিল। সত্যই একটু ভয় পাইলাম। কি করিব, না করিব, বিচারে ঠিক করিবার অবকাশও পাইলাম না। দেখিলাম—সেই আসন আপনবেগে ক্রমাগত গভীর জলের দিকেই চলিল।

স্বপ্নাবিষ্টের মতই দেখিতেছি,—এতক্ষণ যেন তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছিলাম, কিন্তু তীর হইতে যখন গভীর জলে প্রায় চার শত গজ দূরে আসিয়াছি, তখন আর একটি বিশালায়ত প্রবল তরঙ্গ আসিয়া সেই আসনকে বায়ুবেগে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণের দিকে লইয়া চলিল। তখন আমি নিরুপায় হইয়া, পা গুটাইয়া স্থির হইয়াই সেই আসনে বসিলাম।

ঘোর অন্ধকার রাত্রি। জলের উপর মাঝে মাঝে তরঙ্গের তুষার-ধবল পুঞ্জীকৃত ফেনরাশি মধ্যে মধ্যে আমার চক্ষে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। ভাবিলাম, এখনও জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলে বোধ হয় সাঁতার দিয়া কোনও রকমে তীরে উঠিতে পারিব; কিন্তু আসনের সঙ্গে যেন এমনভাবে বাঁধিয়া দিয়াছে, যাহাতে নড়িবার সাধ্য নাই—সুতরাং হাল ছাড়িয়াই দিলাম। ভয় যথেষ্টই আছে; কিন্তু যেন তারও উপরে। তখন এতটা বিস্মিত হইয়াছি, আমার সবটুকু অস্তিত্ব যেন সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। কি হইল? এটা তো দৈব ব্যাপার।

এদিকে আসন ক্রমশ তীরের সম্পর্ক ছাড়াইল, আর পশ্চাতে ফিরিয়া তীরের চিহ্নও দেখিতে পাইতেছি না, কেবল একটি ক্ষুদ্র তারার মত লাইটহাউসের আলোটুকু নড়িতেছে। আসনের গতি ক্রমশই বাড়িতেছে। কানে হাওয়া ঢুকিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে; বোঁ বোঁ

শব্দ অবিরাম, আর কোনও শব্দ নাই। কি উপায় হইবে, অভ্যাস-বশত মনে মনেই একবার শব্দ হইল—হা ভগবান!

আসনটি, আগাগোড়াই দেখিতেছি অদ্ভুত, কাঠের একখানি পিঁড়া জলে ভাসাইলে যেমন দোলে, অসমান ভারে যেমন এ-দিক ও-দিক উঁচুনীচু হয়, এই অপূর্ব্ব আসন সেভাবে কোনও দিকেই তিলমাত্র হেলিতেছে অথবা দুলিতেছে না, ঠিক সমানভাবেই রহিয়াছে, যেন সমতল ক্ষেত্রে স্থির বসিয়া আছি। আমি একটু এ-দিক ও-দিক করিলে বা চঞ্চল হইলেও সে আসন অচঞ্চল, স্থির। প্রথম হইতেই এটা লক্ষ্য করিয়া আমি আরও আশ্চর্য্য হইয়াছি। কি বস্তুটি ইহা! কাঠও নয়, পাথরও নয়, এদিকে খুব পুরু—আমার অঙ্গুলির প্রায় দুই পর্ব্ব হইবে, কোণ চারিটাই গোলাকার। ঝিনুকের ভিতর পিটের মত উপরটি তাহার উজ্জ্বল এবং মসৃণ, কেবলমাত্র এইটুকু অনুভব করিতে পারিলাম। কতক্ষণ এই আসনের উপর বসিয়া চলিয়াছি, মনে নাই; ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ যেন এক হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ বুঝিতে পারিলাম, যেন আসনের গতি অনেকটা মৃদু হইয়া গিয়াছে। তখন কল্পনা করিতেছিলাম—এইভাবে চলিতে চলিতে ক্রমে এবার আসনটি কোথাও হয়ত স্থির হইয়া যাইবে।

ঘটিলও তাই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য তার গতির নিয়ন্ত্রণ। ঠিক এটি মনুষ্যচালিত কোনও যন্ত্রের মত ব্যাপার নয়, একেবারেই দৈবগতি তার, যে ক্রমে কমিতে লাগিল তাহা আমার ধারণার অতীত। সে আসন থামিতে থামিতে প্রায় দুই দণ্ডের উপর চলিল। বায়ুও এখন ঠিক আসনের গতির সঙ্গে মিলিত, ক্রমে একেবারেই নিস্তব্ধ, অন্ধকারের মাঝে যেন আসনখানি স্থির, গতিহীন হইল।

আমার অবস্থা এখন বর্ণনার অতীত। অসীম জলতলের চারিদিকেই অন্ধকার বটে কিন্তু আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো; সেই আলোতে, সম্মুখে, সমুদ্রের জল-বিস্তৃতির কতকটুকু লক্ষ্য হয় মাত্র, বাকী সবটুকুই

ক্রমে তরল অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে। কি অপূর্ব্ব শূন্যতা, তার মধ্যে আমি একমাত্র জীব। ভয় আর বিস্ময়—এই দুইটি ঘনীভূত ভাবেই আমার অস্তিত্বের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে—আমি সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থবর্জ্জিত একটি জীবমাত্র!

অকস্মাৎ একটি শব্দ যেন কানে আসিল। শব্দটা জলের নয়, যদিও জলের মধ্যে আমি রহিয়াছি। বীণাতে ষড়জের তারে জোরে ঘা দিলে যেমন ধ্বনি উঠে, এ শব্দ সেইরূপই অনুভব করিলাম। স্তম্ভিত অবস্থাতেই আসনে ছিলাম, এই আকস্মিক শব্দে যেন চমকিত হইলাম। কোন একটি দিক হইতে শব্দ আসে নাই, ঠিক আমার মাথার অনেকটা উপর আকাশ হইতেই এই শব্দ উঠিয়া ক্রমে ক্রমে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে মণ্ডলাকারে দিগন্তে মিলাইয়া গেল; চমকের রেশও সেই সঙ্গে ক্ষীণ হইয়া গেল। শব্দটি যেখানে অনুমান করিয়াছিলাম, সেইখানেই আবার অপ্রত্যাশিত একটি ব্যাপার যাহা ঘটিল, তাহার প্রভাবও আমার মধ্যে কিছু কম হইল না।

দেখিলাম, অনেকটা ঊর্দ্ধে, আকাশের কতকটা স্থান মণ্ডলাকারে আলোকিত। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ জ্যোতি, তারও কেন্দ্র ঠিক আমার মাথার উপরে বহু ঊর্দ্ধে আকাশে, অনুমান হইল যেস্থান হইতে ধ্বনি উঠিয়াছিল, ঠিক সেইখানেই জ্যোতিরও কেন্দ্র। কেন্দ্রস্থিত কতকটা ছায়া, যাহা কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় অন্ধকারময়, মণ্ডলাকার সেইস্থান হইতেই জ্যোতির বিস্তার। সেই অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রথমে ঘনীভূত হইয়া, পরে তরল হইয়া ক্রমশ দিগন্তে বিলীন হইয়াছে। সেই নয়নাভিরাম জ্যোতির্দ্দর্শনে আমার অন্তরের যত ভয়, যতটা সঙ্কোচ, যত কিছু অশান্তির ছায়া একেবারেই চলিয়া গেল আর আমার অন্তরক্ষেত্রও যেন জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিল। একি অপূর্ব্ব ব্যাপার, যেন সমস্তটুকু জীবন দিয়াই এই অপার্থিব আনন্দরস গভীরভাবে আস্বাদন করিলাম! কিন্তু সে আনন্দ আমার বেশীক্ষণ ভোগ হইল

না; কারণ ক্রমে ক্রমে অল্প সময়ের মধ্যেই উহা ম্লান হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরের জ্যোতিও ম্লান হইতে লাগিল, কেমন একটা নিরানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। তবে আর আমার ভয় রহিল না। কিন্তু তারপর ক্রমে যেন আমার এই সন্দেহ উপস্থিত হইল—যথার্থই কি জ্যোতি দর্শন করিলাম, না অন্ধকার রাজত্বে জ্যোতির মরীচিকা দেখিলাম! স্বপ্নাবিষ্টের মত হইয়া গিয়াছি, আমার যেন কোন বস্তু নির্দ্ধারণের শক্তি নাই। যাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম, তাহাতেও আমার সন্দেহ হইতে লাগিল।

এই দুর্ব্বল তন্দ্রাময় অবস্থা যে আমার কতক্ষণ ছিল, মনে নাই। ক্রমে ক্রমে মৃদুমন্দ সমীরণস্পর্শে যেন আবার আমি একটু সচেতন হইলাম। কি প্রাণমুগ্ধকর গন্ধ এই মৃদু-পবনে ভাসিয়া আসিতেছে! এমন গন্ধ জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। উহার একটা উন্মাদনা আছে—যতই সেই গন্ধপূর্ণ বায়ুতে শ্বাস লইতে লাগিলাম, এক প্রকার নেশায় মন প্রাণ আমার স্থির হইয়া যাইতে লাগিল—ক্রমে আমি আসনে বসিয়াই যেন অচৈতন্য হইতে লাগিলাম। বাহ্যজ্ঞান একেবারেই যে লোপ পাইল, তাহা বলিতে পারি না; কারণ তখনও শরীরে পবনের স্পর্শ অনুভূত হইতেছিল; সেই গন্ধের রেশও প্রাণে অনুভব করিতে-ছিলাম, তবে ক্রমশই যেন ক্ষীণ হইয়াই আসিতেছে। বেশ বুঝিতে পারিলাম, ঐ গন্ধের মধ্যে এমন একটা মাদকতা আছে, যাহাতে আমার ঐরূপ অবস্থা ঘটিতেছে। ক্রমে আমার স্মৃতিলোপ হইল, ঠিক যেন সুপ্ত হইয়া পড়িয়াছি।

কতক্ষণ পর যেন আবার একটি স্বপ্নময় অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইল, আমি যেন কোন শান্তিময় অবস্থা হইতে জাগ্রত হইতেছি, এমনই ভাবটি। তখন দেখিলাম—তমসাবৃত রাত্রির আঁধার যেন ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কিম্বা সূর্য্যাস্তের পরে প্রদোষকালে যেমন মেঘমুক্ত আকাশে আলো থাকে। বেশ দেখিতে

পাইতেছি, সে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোতে তীব্র ভাব নাই; অথচ সকল বস্তুই স্পষ্টভাবে দেখা যায়, ক্রমে ক্রমে এমনই আলোকে দিক সকল পূর্ণ হইল, তখন দেখিলাম—সমুদ্রটি নিস্তরঙ্গ, বায়ু গতিশূন্য অবস্থায় পুষ্করিণীর জল যেমন স্থির থাকে, তেমনই স্থির। সেই স্থির জলরাশির অনন্ত বিস্তৃতির উপর অপূর্ব্ব দৃশ্য! অসংখ্য উজ্জ্বল আভাময় দীর্ঘ শরীর সকল ইতস্তত গতিমান। শরীর ত বটে! অনেকক্ষণ স্থিরভাবে নিরীক্ষণ করিয়া কৃতনিশ্চয় হইলাম। শরীর ব্যতীত আর কি বলিব।

এ শরীর আশ্চর্য্য রকমের; মানুষের মত রক্ত-মাংস-অস্থি নির্ম্মিত নয়; আমাদের শরীরে যেমন স্থূলতা ও গুরুত্ব আছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেদে বিভিন্ন আকারের অস্থি মাংসপেশীসমূহের উপর স্থূল চর্ম্ম আচ্ছাদনে মিলিত একটা আকারের সঙ্গে নানা প্রকার বর্ণ, তাহার উপর বস্ত্রাদির আচ্ছাদন আছে, এখানে ইহারা সেরূপ নয়—আকৃতি দীর্ঘ এবং বর্ণ স্বচ্ছ নীলাভ। শরীর মধ্যে হস্ত-পদাদি অঙ্গের সংস্রব নাই। একটি মানুষের শরীর যদি সোজা হইয়া দাঁড়ায়, হাত দুটি সোজা-ফেলিয়া রাখিলে মেরুদণ্ডের মূল লইয়া যে আকৃতি হয়, তাহাদের আকৃতি অনেকটাই সেইরূপ। মানুষের শরীরের আকৃতি যেমন স্পষ্ট রেখায় নির্দ্দেশ করা যায়, তাহাদের বাহ্য আকৃতি সেইরূপ হইলেও স্পষ্ট রেখায় নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না—যেন শেষের দিকে সীমা-রেখা ক্রমে ক্রমে তরল বাষ্পাকারে মিলাইয়া গিয়াছে। মানুষের আকার যতটা দীর্ঘ, তাহাদের শরীর দৈর্ঘ্যে তাহাপেক্ষা অনেকটাই কম, নিম্নাংশ ক্রমে সরু হইয়া শেষ হইয়াছে। অসীম জলের বিস্তার সেখানে তুলনা করিবার মত কোন বস্তু না থাকায়, প্রথমে ততটা লক্ষ্য হয় না।

সেই সকল শরীর নিঃশব্দে, নিস্তরঙ্গ জলের উপর নড়াচড়া করিতেছে। মুণ্ডের আকৃতি তাহাদের আছে; কিন্তু তাহার মধ্যে কেশ, কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, মুখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কোন চিহ্নই নাই।

মানুষের যেমন গলা শরীর ও মুণ্ডের সংযোগস্থল, তাহাদের গলা নাই—মুণ্ডের সঙ্গেই শরীরের আকৃতি নামিয়া আসিয়াছে, পায়ের দিকটা যেন মিলাইয়া গিয়াছে। তাহাদের গতি বিচিত্র ধীরে ধীরে সরিতেছে বোধ হয়। কোথাও চাঞ্চল্যের লেশ মাত্র নাই বা পরস্পর বাক্যবিনিময়ের শব্দ নাই।

ক্রমে ক্রমে সেই সকল আকৃতিগুলি আমার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; অপূর্ব্ব বিস্ময়ে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক কিছু তাহাদের শরীরে দেখিতে পাইলাম—ঐ নীলাভ বলিয়া প্রথমে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহার মধ্যেও নানা বর্ণের আভা আছে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়। কোনটিতে পীত বর্ণের আভা, কোনটি গোলাপী, কোনটি সিন্দূর বর্ণের, কোনটিতে পিঙ্গল, কোনটিতে বেগুনী, কোনটি বা হরিৎ—এইরূপ এক একটি বিশিষ্ট বর্ণের ঘনীভূত আভায় যেন সকল শরীরই নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রথম দৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য হয় না, বলিয়াছি, যেন সকলকার একই বর্ণের আভা, কোনও বৈশিষ্ট্য নাই। আমরা যেমন চক্ষুর দৃষ্টিতে সম্মুখে দেখিয়া চলি এবং ফিরিবার সময়ে শরীরকে ঘুরাইয়া তবে ফিরিয়া আসি অর্থাৎ প্রত্যেক কর্ম্মটি শরীরকে ফিরাইয়া, দৃষ্টি সম্মুখে রাখিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, তাহাদের তাহা নয়। তাহাদের গতির সঙ্গে শরীরকে ফিরাইতে হয় না। একটি শরীর একদিকে অগ্রসর হইল, ফিরিবার সময় শরীরকে না ফিরাইয়াই আবার সেই দিকে আসিতে লাগিল। সম্মুখে পশ্চাতে, দুই পার্শ্বে, যেদিকেই হোক না কেন, তাহাদের গতি শরীরকে না ফিরাইয়াই সম্পন্ন হয়। অপূর্ব্ব ব্যাপার—যেন তাহাদের সকল দিকেই চক্ষু অথচ চক্ষু বলিয়া কোন ইন্দ্রিয়ের লক্ষণই নাই। সুতরাং তাহাদের মানুষ বলিব কিম্বা আর কিছু বলিব, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। যাহাদের শরীর নাই অথচ শরীরের আকার এবং স্বচ্ছভাবের নানা বর্ণের আভা আছে,

গতি আছে অথচ আয়াস নাই—এমন বস্তুকে কি বলা যায়! মানুষের সঙ্গে তার তুলনা কোথায়? তাহারা চেতনাময় প্রাণী বা জীব, এটা ঠিক; কিন্তু কি বলিব তাহাদের!

দেখিলাম, তাহাদের ঊর্দ্ধগতিও আছে। তবে সেই গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের তরল লঘু শরীর যেন আরও তরল হইয়া মিলাইয়া যায়। আমি ভাবিতেছিলাম যে, স্থলের জীব, একটি স্থূল শরীর বিশিষ্ট প্রাণী, মানুষ আমি, চক্ষের সম্মুখে এ কি দেখিতেছি। এখন অপূর্ব্ব ব্যাপার। সেই আসনে বসিয়া,—এ কি, কোথায় সে আসন! কোথায় আমার রক্ত-মাংস-অস্থি-হাত-পা সংযুক্ত শরীর? কই, আমার সে শরীর তো নাই, এত লঘু যেন কোনও ভারই নাই, বায়ুর মত লঘু হইয়া গিয়াছি। কোথায় আমার হাত, পা, চোখ, মুখ, নাক, কান? আমার মুণ্ডই বা কোথায়? আমি ঘাড় না ফিরাইয়াই সকল দিকই দেখিতে পাইতেছি। আমার মুণ্ডের স্থানে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি যাহা স্থূল শরীরে হৃদয়ে অনুভব করিতাম। আমার এখন সবটাই চক্ষু, সবটাই কান, সবটাই নাক, সবটাই স্পর্শ।

চিন্তার কোন অবসর নাই, এ রাজ্য পৃথিবীর জীবের অগোচর। যাহাকে আমরা লবণ-সমুদ্র বলিয়া জানিতাম, যাহার উপরে আকাশ, নীচে নানাবিধ অসংখ্য জলজীবপূর্ণ সমুদ্রজল, সেই জলাধারের উপর এক অসীম, উন্নত জীবরাজ্য—যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, যাহার কথা কখনও শুনি নাই!

স্থলরাজ্যে যেমন বৃক্ষলতাপূর্ণ বিস্তীর্ণ ভূমিতে আমরা নানাপ্রকারের স্থূল শরীর লইয়া নানা জাতীয় মানুষ, পশু পক্ষী সরীসৃপ উদ্ভিদ বাস করি, বিশাল এই সমুদ্রজলের উপর-তলে, তরল আধারের উপযুক্ত শরীর লইয়া এখানে কেবল মাত্র উন্নততর সূক্ষ্ম বর্ণময় শরীরধারী উচ্চশ্রেণীর জীব বাস করে। সমতল ভূমিতে বা প্রস্তরপূর্ণ কঠিন পর্ব্বতভূমির উপর নানা জাতীয় মানুষ আমরা, দেশের জীবসকল কত

ভাবে মনোমত উপাদান সংগ্রহ করিয়া যেমন নিজ নিজ বাসস্থান নির্ম্মাণ করি, এখানে সেরূপ স্থূল জীবও নাই, আর কোন প্রকার বাসস্থান বলিয়া কিছু চিহ্ন কোথাও দেখিতেছি না। দেশের কঠিন মাটির উপর আমরা সভ্যতা-গর্ব্বিত জীবসকল নানাভাবে পরস্পর সম্বন্ধ পাতাইয়া, যানবাহনাদি লইয়া কত কত হাবভাব ভঙ্গীতে যাতায়াত করি, বিচিত্র কোলাহলময় অশেষবিধ কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, নানা প্রকার দ্বন্দ্বময় অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, এখানে তাহার কিছুই নাই। এখানকার অধিবাসীরা সূক্ষ্ম আভাময় শরীরে নিঃশব্দে এক বিশাল কর্ম্মরাজ্যে বিচরণ করিতেছে, সর্ব্বপ্রকারেই স্থূলভূতের সম্পর্কশূন্য হইয়া এক মহান উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত—যাহার খবর বুদ্ধিগর্ব্বে স্ফীত উন্নত মস্তক সভ্য মানবসমাজের গোচর নহে।

কঠিন ভূপৃষ্ঠবাসী জীব সকলের মধ্যে যেমন জীবসৃষ্টির সূত্রে একটা উন্মাদ তৃষ্ণা বা মোহ, উদ্দাম সম্ভোগেচ্ছা অবিরাম কর্ম্ম প্রেরণা দিতেছে, তাহার ফলে জন্ম ও মৃত্যুর লীলা, নানাপ্রকার ব্যাধি বহুবিধ অশান্তি, সদাচার কদাচার অবিরাম মানুষ-সমাজকে আলোড়িত করিতেছে; এখানে সে সকল সম্ভোগের কোন আভাস নাই, আর জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারও নাই। যতটুকু বুঝিলাম, এখানে কেহ জন্মগ্রহণ করে না। এখানকার জীবগণ আমাদের মত কোন স্থূললোক হইতে উৎকৃষ্ট বা উন্নত কর্ম্মফলেই আসিয়া থাকে।

যেইমাত্র দেখিলাম, আমার মানুষের শরীর নাই, আমার সেই ঘন, আভাময় শরীরের মধ্যে একটি আনন্দের প্রবাহ খেলিয়া গেল, যেন পর পর তাড়িৎশক্তির দুই-তিনটি তরঙ্গ, বেশ বুঝিতে পারিলাম শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গেল। আমার চারিদিকেই সেই আভাময় শরীর সকল নিজ নিজ ভাবে বিভোর, আপনাতে আপনি সমাহিত হইয়া অজ্ঞাত কোন কর্ম্মের মধ্যে অভিনিবিষ্ট। সে কর্ম্মের কথা পরে

এখন আমার এই রূপান্তর, এই অভাবনীয় ভিন্নলোকে আগমন ও অবস্থান, আমাকে যেন সত্তায় পর্য্যন্ত পৃথক করিয়া দিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের স্ফুরণ হইতেছে! কোন্ পুণ্যফলে আমার সজ্ঞানে এই অবস্থা ঘটিল, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। ক্রমে দেখিলাম, আলোকে দিঙ্‌মণ্ডল আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে অতীব সূক্ষ্ম, মধুর সুরের আভাস সেই আলোক-রশ্মির সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্যাপ্ত শ্রবণ পূর্ণ হইতে লাগিল। সূক্ষ্ম তারের যন্ত্রের ঝঙ্কারের সঙ্গে তুলনা করিলে ঠিক হয় না; কারণ তাহার রেশ অতীব সূক্ষ্ম ও মৃদু; এই

স্থরের রেশ অবিরাম, অতীব তীক্ষ্ণ, এবং পুনঃ পুনঃ অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঝঙ্কারে উদ্ভাসিত। সে সূক্ষ্ম সুর সূর্য্যকিরণ বা রশ্মির সঙ্গে সংযুক্ত, তার ঝঙ্কার-মাধুর্য্য বর্ণনার ভাষা নাই। স্থূল শব্দের মধ্যে এমন শক্তি নাই, যাহার সাহায্যে সেই অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুরধ্বনির কতকাংশও বর্ণনা করা যায়। পার্থিব যন্ত্রধ্বনি এতই স্থূল, তাহার সঙ্গে তুলনা করা বিড়ম্বনা। আমাদের কান কেবল স্থূল শব্দই গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত বলিয়াছি— এই অপার্থিব সূক্ষ্ম-ধ্বনি গ্রহণ করিবার যোগ্যতা কোথায়? মাত্র এইটুকু বলা যায় যে, ইহা অপূর্ব্ব বিস্ময়কর এবং আনন্দময়।

ক্রমে দেখিতেছি, আলো আর স্থর একযোগে রশ্মির আকারে, অনন্ত রশ্মি আলোক এবং সুর একত্র মিলিত, উদীয়মান সূর্য্য হইতে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, যেন আলোকমিলিত সুর-রশ্মির বৃষ্টি হইতেছে, যাহাতে দিঙ্মণ্ডল মধুময় করিয়া দিয়াছে, আমরা তাহাতে স্নান করিয়া ধন্য হইতেছি। অসীম পবিত্রতাময় এই লোক, তাহাতে অপার্থিব আনন্দের আভাস যেন আর কিছুই নাই। স্থূল শরীর ধরিয়া যাহারা এই কঠিন ধরাপৃষ্ঠে নিজ নিজ ক্ষুদ্র অধিকার লইয়া নিজ নিজ জীবন-দ্বন্দ্বে মাতিয়া রহিয়াছে, কি করিয়া তাহাদের এই স্বর্গীয় সুর-আলোকে মিলিত আনন্দধারার কথা বুঝাইব!

একজন মানুষ যদি ঐ রাজ্যে তাহার ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত স্থূল শরীর লইয়া আসে, তাহার পক্ষে এ সকল বিচিত্র অনুভব অসম্ভব। যে রাজ্যে আসিয়া আমি এই অপূর্ব্ব নানাবর্ণের আভাময় শরীরগুলি দেখিতে পাইতেছি, স্পষ্টরূপে এই বায়ুমণ্ডলের মধ্যস্থিত সকল অনুভবগুলি গ্রহণ করিতে পারিতেছি, সে রাজ্যের শরীর স্বতন্ত্র, বৃত্তি স্বতন্ত্র, সবই স্বতন্ত্র। এখানে স্থূল শরীরে আসিলে তাহার কিছুই অনুভব করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না, কারণ মানুষের সবটাই স্থূল—তাহার দেখা, তাহার শুনা, তাহার স্পর্শ, তাহার আঘ্রাণ, তাহার রসাস্বাদন, সবটুকুই স্থূলকে অবলম্বন করিয়া। স্থূল-জগতে যাহারা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম অনুভূতি-

সম্পন্ন, তাঁহাদের মধ্যে কল্পনার প্রবণতা থাকায় সত্য অনুভব সকল নিস্তেজ। আশ্চর্য্য এইটুকু, এখানে সত্যের আলোকে সবটাই উদ্ভাসিত; সকল দেখা, সকল শুনা, সকল স্পর্শ, সকল আস্বাদনই সত্য, এবং সেই অনুভব জাগ্রতভাবেই সত্য, স্বপ্নময় অথবা ক্ষীণ নহে—এইটুকু বলা ছাড়া ইহা পরিষ্কার বুঝাইবার আমার আর কোনও উপায় নাই,।

আমার স্থূলশরীর পরিবর্ত্তনের কথাটি আরও আশ্চর্য্য। সেই আসনে বসিয়াই ছিলাম। এই আবহাওয়ার মধ্যে কি ভাবে যে এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনটি সাধিত হইল, তাহা আমার অজ্ঞাত। যে সময়ে আমি এখানে প্রথম শব্দ শুনিয়াছিলাম, তখন হইতে যে সময়ে আমি এই পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম, সেই পর্য্যন্ত এই কালটুকুর মধ্যেই এই পরিবর্ত্তন বা আকস্মিক রূপান্তর সম্ভব হইয়াছিল, ইহা ব্যতীত আর কিছুই বোধ করিতে পারি নাই। বিস্ময়জড়িত আমার অস্তিত্ব বহুক্ষণ এই সকল আলোচনায় অভিভূত ছিল, ততক্ষণ আমি অন্য কিছুই অনুভব করিতে পারি নাই, ক্রমে এই সকল ঘনীভূত বিস্ময়ের হাওয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল; শেষে আমার পৃথিবীর কঠিন মাটি ও জলের স্মৃতি একেবারেই যেন মুছিয়া গেল—তখন এখানকার সকল ব্যাপার যে ভাবে চৈতন্যের বিষয়ীভূত হইয়াছিল, এবার তাহাই বলিব।

আভাময় এই সকল শরীরের গতি ধীর, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন দেখিতেছি, এই ধীর ভাবের মধ্যেও বেশ স্বচ্ছন্দ গতি আছে, যাহা স্থূল জগতের তুলনায় অনুমান করা কঠিন। কারণ সেখানকার স্থূল শরীরের গতি চঞ্চল—অবশ্য শরীরের লঘুত্ব ও গুরুত্ব হিসাবেই সেটা বুঝিয়া লইতে হইবে। এখানকার শরীরের আপেক্ষিক গুরুত্ব অত্যন্ত কম হওয়ায় তাহার গতি লঘু হওয়াই স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া স্থূল মানুষের শরীরকে গতিমান্ করিতে হইলে প্রথমে ইচ্ছা, তাহার পর শক্তি-প্রয়োগ বা আয়াস করিতে হয়; কিন্তু এ শরীরকে গতিমান্

করিতে শুধু ইচ্ছাই যথেষ্ট, তারপর কোন আয়াসের প্রয়োজনই হয় না। মানুষের শরীর যখন হাঁটে তখন দুই পা একটির পর একটি মাটিতে ধরিয়া তবে গতিমান্ হয়; এখানকার শরীরে দুইটি পা ত নাই—কাজেই ইহার গতি সরল ঋজুভাবেই ইচ্ছার সঙ্গে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। যেমন বেশীদূর হইতে রেল-পথের দিকে চাহিলে প্রসারিত লৌহময় রেখার উপর দিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ট্রেণটি নড়িতে বা এক ধারায় এক দিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়, অনেকটা সেইরূপ। পার্থক্যের মধ্যে ট্রেন-শরীরটি অনেকটা লম্বা এবং কঠিন বস্তুতে নির্ম্মিত, আর এখানকার শরীর সূক্ষ্ম মনুষ্যাকৃতি, আভাময় এবং নিঃশব্দগতি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানকার শরীরগুলি মানুষের তুলনায় খুব হালকা বা অত্যন্ত লঘু; তুলনা করিলে তাই বলিয়া আকাশ ত দূরের কথা, বায়ু অপেক্ষাও লঘু বোধ হয় না—বরং এখানকার শরীরগুলি বাতাসের তুলনায় বেশ কতকটা স্থূল সেটি বুঝিতে পারা যায়; ঐ শরীরকে কিন্তু ইচ্ছামত সূক্ষ্ম ও লঘু করা যায়, তাহা বুঝিয়াছিলাম। এখানকার অধিবাসীরা জলের উপরেই গতিবিধি করে, তবে সময়ে সময়ে—তখন জানিতাম না কি ভাবে—আধারভূত জলতলের বেশ কতকটা উপরেও যাইতে পারে; কিন্তু সেই ঊর্দ্ধগতির সঙ্গে শরীরটিও অদৃশ্য হইয়া যায়, শূন্যে তাহাদের শরীর লক্ষ্য হয় না। তাহারা অন্তরীক্ষেও গতিমান হয়।

সাধারণত এখানকার বায়ুমণ্ডল স্থির, তরঙ্গহিল্লোল নাই, এরূপই অনুভব হয়; কিন্তু কখনও কখনও এমনও দেখা যায়, উচ্চে তরল মেঘের গতাগতি এবং বায়ুর প্রবল গতি, তাহাতে স্বাভাবিক সূর্য্যকিরণ-রশ্মি-উদ্ভাসিত স্তরের বেশ কতকটা প্রতিহত হয়, কিন্তু এ রাজ্যে অধিবাসীগণের শরীর গতির কোন ব্যতিক্রম হয় না। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে-কোন কারণেই হোক, এ শরীরের উপর বায়ুর কোনও ক্রিয়া বা প্রভাব নাই—ঝড়ের মধ্যেও ইহা স্থির থাকে।

এখানকার প্রাণিগণের কর্ম্মের কথা বলিবার পূর্ব্বে অন্যান্য বিষয়ে আর কিছু বলিবার আছে। এখানকার বায়ুমণ্ডলে দিবাভাগে সুরধ্বনি-মিলিত আলোক-রশ্মির কথা বলিয়াছি। এখানে উহারই কেবল মাত্র শব্দ নয়, ক্রমে ক্রমে যতই এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হইতেছি, ততই আরও বিচিত্র শব্দের আভাস পাইতেছি—উহা সুর নয়, শব্দ বলাই ঠিক। সে সকল শব্দ চারিদিক হইতেই আসিতেছে, আর অসংখ্য জীবপূর্ণ মানব-রাজ্য হইতেই যেন আসিতেছে, স্পষ্টতর বুঝিতে পারিতেছি। ক্রমে ক্রমে সেই সকল শব্দের অনুভব বেশ তীব্রভাবেই হইতে লাগিল! সেই সকল শব্দ অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার অধিবাসীর গতির পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। শব্দ সকল এক একটি ভাব লইয়া আসে; সেই শব্দের বিচিত্র প্রভাব এখানকার প্রাণীগণের উপর কতটা গভীর এটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। এখানকার অধিবাসীদের এখন হইতে আপ্-দেব বলিয়াই বলিব, তাহাদের অন্য কিছু বলিতে মন চায় না।

এই আপ্-দেবগণের গতিবিধি দুই, তিন, চারি, অথবা আরও অধিক সংখ্যায়—এক একটি দলে মিলিত। কোথাও একটি দেখিতেছি না। উহা নয়নের পক্ষেও বড় মনোরম। প্রত্যেকের ঘন বর্ণপ্রভায় উদ্ভাসিত শরীরের শীর্ষদেশ এবং হৃদয় এই দুই অংশ অপেক্ষাকৃত জ্যোতির্ম্ময়। কোনও একটি বিশেষভাবে ভাবিত হইলে, ঐ দুই অংশই বিচিত্র আভাময় হইয়া উঠে। সেই সকল উজ্জ্বল বর্ণাভাস তরঙ্গের মতই চঞ্চল বা ক্রিয়াশীল—যেন ঢেউ খেলিয়া গেল, এইরূপ বোধ হয়। বিশেষ একটি ভাবের অস্তিত্ব, বর্ণময় তরঙ্গাকারেই তাহার অভিব্যক্তি! আমার চৈতন্যের মধ্যে এই সকল বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রভাব, সঙ্গে সঙ্গে দিব্য শরীরের মধ্যে আনন্দ-ঘন উজ্জ্বল তরঙ্গহিল্লোলে আকুল করিয়া তুলিল। তখন এখানকার সকল ভাবের সঙ্গে পরিচয় ঘটে নাই। পরে ক্রমে ক্রমে যখন সকল ভাবের পরিচয় পাইতে

লাগিলাম, যাহা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ক্ষোভ, অসন্তোষ বা অপ্রিয় ভাবসমূহ নির্দ্দেশ করে। সে সকল ভাবের বর্ণাভাস উজ্জ্বল নহে বরং বিপরীত; সে বর্ণের তরঙ্গ সকল ম্লান, ধূম্রবর্ণ, গাঢ়, অস্বচ্ছ ভাবের তারতম্যানু-সারেই ঔজ্জ্বল্যহীন বা মাধুর্য্যবর্জ্জিত।

এখানকার কর্ম্মজীবন অপূর্ব্ব, অসাধারণ এবং বিস্ময়কর। এ এ রাজ্যের কর্ম্মরীতি বুঝিতে গেলে প্রথমে স্থূল-জগতের কর্ম্মধারার সঙ্গে আকাশ-তরঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা জানিতে হয়। তার আসল ব্যাপার এই যা-কিছু কার্য্য ধরাতলের নানাস্থানে, জীবরাজ্যের মধ্যে ঘটিতেছে, নানা অবস্থার মধ্যে নানা লোক-সমাজের মধ্যে অবিরাম অনুষ্ঠিত হইতেছে, উহার সকল অংশই বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অর্থাৎ আকাশে তরঙ্গ তুলিতেছে, কিছুই বাদ যাইতেছে না। শুধু শব্দ নয়, প্রত্যেক চিন্তার সঙ্গে যে তরঙ্গ উঠিতেছে, সেই তরঙ্গের প্রভাব সূক্ষ্মরাজ্যে এখানকার অন্তরীক্ষে খুব বেশী। সাধারণভাবে স্থূল বুদ্ধিতে ধরিবার জো নাই—এ সকল কি ভাবে সম্ভব হইতেছে! আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে যদি আকাশ-তরঙ্গের রূপ দেখা যাইত, তাহা হইলে যে অদ্ভুত ছবি নয়নগোচর হইত, তাহা দেখিয়া মানুষের জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া যাইত। সজীব তরঙ্গের রেখায় রেখায় আকাশের সর্ব্বস্থান পরিপূর্ণ। এই বিশাল আকাশ-মহাসমুদ্রে যেন তিলমাত্র স্থান বাদ নাই; অথচ প্রত্যেকটি পৃথক্‌, কোনটির সঙ্গে কোনটি মিশিয়া যাইতেছে না, অবিরাম এই তরঙ্গেই খেলা চলিতেছে।

শব্দটা স্থূল, তাহার তরঙ্গও অপেক্ষাকৃত স্থূল, এখনকার দিনে যন্ত্রের সাহায্যে ধরা যায়; কিন্তু চিন্তা অথবা ভাব-বস্তু সূক্ষ্ম, উহা যন্ত্রের মধ্য দিয়া ধরিবার শক্তি চিরদিনই অভাব থাকিবে। কারণ ভাব বা চিন্তাপ্রবাহ জড়ধর্ম্মী নয়; তাহাকে ধরিতে চিৎসত্তা ব্যতীত অপর কাহারও সাধ্য নাই, সম্ভাবনা নাই। জীবরাজ্যে এই যে অনুসন্ধিৎসা, যাহাকে আমরা চিন্তা নামে অভিহিত করি, সেই চিন্তাধারার মধ্যেও বিশেষ তারতম্য আছে। বিক্ষিপ্ত এবং ক্ষীণ চিন্তাপ্রসূত তরঙ্গ বা

স্পন্দন ক্ষীণ হইয়া থাকে, উহা বহু দূর প্রবলভাবে প্রসারিত হইতে পায় না। আবার তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন প্রবল চিন্তাধারা প্রবল তরঙ্গ উৎপন্ন করে এবং বহুদূর প্রসারিত হইয়া পড়ে। চিন্তা ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত দুই ভাবেই চলে; এখন ব্যক্তিগত চিন্তা বা ভাবধারার কথাই আমাদের আলোচ্য। তারপর সমষ্টির কথা।

মানুষের জাগ্রত অবস্থায় দুইটি কাজ আছে,—শরীর হাত-পা প্রভৃতি কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া কাজ, আর চিন্তা। আবার চিন্তা করিতে করিতেও কর্ম্ম চলে। আসলে মানুষের চিন্তা ও কর্ম্ম, এই দুইটির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। কর্ম্মের পূর্ব্বে চিন্তা আছে; কাজেই প্রত্যেক কর্ম্মেই আকাশে স্পষ্ট হিল্লোল তুলিয়া বায়ুমণ্ডল আলোড়িত করিতেছে। বিক্ষপ্ত না হইলে তরঙ্গের প্রবাহ স্পষ্ট হয়। একটি ভাব বা চিন্তার ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে চিত্তক্ষেত্রে তরঙ্গ তুলিতে না তুলিতেই আর একটি চিন্তার সূত্র আসিয়া আকাশে অসম্পূর্ণ এক প্রবাহ সৃষ্টি করিল। ইহাই হইল বিক্ষেপ। শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন, সুস্থ যে চিত্ত, তাহাই সম্পূর্ণ ধারায় প্রবাহ সৃষ্টি করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র; কিন্তু মানুষের বিপদ্ এবং প্রাণ-ভয় সর্ব্বাপেক্ষা গভীর এবং ঘন তরঙ্গ তুলিয়া আকাশমণ্ডল আলোড়িত করিতে পারে। বিপদ্ এবং ভয়ের তুল্য এমন শক্তিশালী তরঙ্গ তুলিতে ব্যবহারিক জগতে আর কিছু দেখা যায় না।

তারপর দ্বিতীয় কথা এই যে, এখানকার শরীর এমন সূক্ষ্ম, এমন অপূর্ব্ব উপাদানে, আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত, যে, জীবজগতের প্রত্যেক স্পন্দনের তরঙ্গে সাড়া দেয়। যত কিছু ঘটনা, যত কিছু চিন্তা এবং কর্ম্মব্যাপার, ভিতরেই হোক বা বাহিরেই হোক, এ রাজ্যের কিছুই অগোচর থাকে না। ধরাতলবাসী মানব-মনের অন্তরতম প্রদেশ হইতে সূক্ষ্মভাবে কোনও চিন্তার স্পষ্ট অভিব্যক্তি মাত্রেই এখানে তাহার সাড়া পৌঁছায়। এখানকার সকলেই অন্তর্য্যামী, তাহা হইতেই

এখানকার কর্ম্মপ্রেরণা আসে, এবং কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে সহায়তা করে। সংক্ষেপে এটুকু জানিয়া রাখা ভাল, যে এই সকল অব্যক্ত ক্রিয়াশক্তির মূল হইল আদিত্য। এই সৌর-দেবতার কিরণরশ্মি ধরিয়াই এখানকার জীব-কোটী, শুধু এখানকার কেন, সমগ্র সৌরজগতের অধিবাসী জীবসমষ্টির প্রাণশক্তি, চিন্তা, কর্ম্ম, জ্ঞান, সিদ্ধান্ত, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ নির্ব্বিশেষে যাহা কিছু হইতে পারে, তাহা এই আকাশ-তরঙ্গ অবলম্বন করিয়াই অবিরাম প্রেরণা দিতেছে, কখনও ক্ষণেকের জন্যও তাহার বিরাম নাই, ব্যতিক্রম ঘটে না।

ইহার পর প্রকৃতির সহজ নিয়মের বিষয় আর একটু জানিবার কথা আছে। আমাদের এই জীব-জগতে দুইটি শক্তির ক্রিয়া অবিরাম চলিতেছে দেখা যায়; তাহা প্রত্যক্ষের মতই স্পষ্ট—আকুঞ্চন ও প্রসারণ নামেই তাহাদের অনুভূতি ও অভিব্যক্তি। এই দুইটি শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কাণ্ড অবিরাম চলিতেছে। ব্যষ্টিগত জীবপ্রকৃতি ও সমষ্টিগত জীব-প্রকৃতি এই দুইটি ক্রিয়াশক্তির প্রত্যক্ষ ফল। আকুঞ্চনে জীব কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়; কেন্দ্র হইল চৈতন্য বা আত্মা, আর প্রসারণে কেন্দ্র হইতে দূরে প্রসারিত হয়। ইহার প্রত্যক্ষ ক্রিয়াফল যাহা আমরা সহজ বুদ্ধির সাহায্যে ধরিতে পারি তাহারই আকুঞ্চনে অর্থাৎ কেন্দ্রাভিমুখী গতির ফলে তত্ত্বজ্ঞানের অনুভূতি, নিষ্ঠা, যোগ, গভীর তন্ময়তা এবং মৃত্যু; আর প্রসারণের ফলে অর্থাৎ কেন্দ্র হইতে বহির্গতির ফলে কর্ম্মপ্রবৃত্তি, ভোগবিলাস, আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা, ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ অধিকার এবং জীবন।

এখন ইহার মধ্যে এইটুকু বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার আছে যে, যখনই জীবের চৈতন্যশক্তি কেন্দ্র হইতে প্রসারিত হইতেছে তখন কেন্দ্র হইতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে না, কেন্দ্রের সঙ্গে তাহার সূক্ষ্ম যোগ থাকিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবেই প্রসারিত হইতেছে;—আবার যখন আকুঞ্চিত হইতেছে তখন তাহার প্রসারের সীমা হইতে

বিস্তৃতির অনুভব অচ্ছেদ্যরূপে লইয়াই ফিরিতেছে তাহাই আমাদের জীবন।

এই শক্তির ক্রিয়া অবিরাম জগৎ জুড়িয়া অবাধ চলিতেছে, কোথাও ইহার অভাব নাই; কাজেই সৃষ্টির অদ্ভুত কৌশলেই সৃষ্টিকে বাঁচাইবার উপায় ইহার মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে, যাহা বাহিরে কোনও সাহায্যের অপেক্ষা রাখিতেছে না।

এই অপূর্ব্ব লোকের অধিবাসী—দিব্যদেহধারিগণের এসকল অনুভব আমাদের পৃথিবীর জীবগণের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ এবং স্বভাবগত। সেই কারণে তাঁহাদের কর্ম্ম, সর্ব্বক্ষেত্রেই কল্যাণকর, শুভপরিণামশীল এবং অশেষ আনন্দ উদ্দীপক। তাঁহাদের উদ্দিষ্ট সেই কল্যাণ জগতের চক্ষে বিরুদ্ধভাবের কিম্বা আরও কত কিছুই মনে হইতে পারে। এই দ্বন্দ্বময়জীবন মনুষ্যসমাজের বিচারের কথায় আর নাই, এইটুকু কেবল পুনরুক্তি করিয়া পাঠকের স্মরণে রাখিবার সাহায্য করিতেছি যে, এ লোকের, এই আনন্দময় কর্ম্মরাজ্যের কেন্দ্রস্থ দেবতা, যাঁহার প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশই এখানকার প্রেরণা, তিনি হইলেন আদিত্য;—যাঁহার অধিকারে কোনও দিক্ দিয়াই অমঙ্গল বলিয়া কিছু কল্পনার কল্পনাও এখানে অসম্ভব।

অবশ্য এই সৌরজগতের সকল গ্রহনক্ষত্রের কেন্দ্র হইল আদিত্য; সকল লোকেরই কর্ম্মশক্তি এই আদিত্যকেন্দ্র হইতেই নিরন্তর সঞ্চারিত হইতেছে—তবে এ লোকের কথা এত বিশেষ করিয়া বলিবার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য আছে, তাহা বলিতেছি। এই পৃথিবীর কথাই ধরা যাক, যেহেতু আমাদের অন্যে অধিকার নাই। এই ধরণীর মানুষসমাজই প্রাণীজগতে শ্রেষ্ঠ। এই মানুষসমাজের মধ্যে নানা স্তরের মানুষ ত আছে, তাহার মধ্যে কত অল্পসংখ্যক মানুষ সূর্য্য হইতে স্থূলভাবে যেটুকু উপকার সাধারণে পায়, তাহার অতিরিক্ত কিছু ভাবিতে পারে—বোধ হয় সংখ্যার হিসাব করিলে মনটি আমাদের ছোট হইয়া যাইতে বাধ্য।

এখানকার লোকে, দিব্যদেহধারিগণের সূর্য্যের সঙ্গে সম্বন্ধ এতটা প্রত্যক্ষ এবং সহজ অনুভূতির বিষয় যে, পৃথিবীর অন্যান্য মানুষরাজ্যের সঙ্গে তার তুলনাই হইতে পারে না—পূর্ব্বেই ইহা আভাসে কিছু বলিয়াছি। ভূমণ্ডলের মানুষসমাজের যত কিছু উন্নতি হউক না কেন, বিশ্বশক্তির কেন্দ্র বলিয়া আদিত্যের কোন অনুভূতি সে মানুষসমাজের নাই, তাহা আমরা সহজ-বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারি; অথচ যত কিছু সুখ সুবিধা সূর্য্য হইতে পাওয়া যায় তাহা জগদ্বাসী স্বভাবগত আত্মীয় সম্পর্কে এবং অনায়াস-ক্রমেই পাইয়া থাকে এবং তাহাতে নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে। তবে অতীব অল্পসংখ্যক এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, ভারতীয় মতে যাঁহারা জড়বিজ্ঞানবিদ্, পাশ্চাত্যভাষায় সায়ান্টিস্ট, বঙ্গানুবাদে বৈজ্ঞানিক নামে প্রচলিত, সেই ক্ষুদ্রতম অনুসন্ধিৎসু অধ্যবসায়শীল সমাজ আদিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া থাকেন, ইহা সত্য। কিন্তু এই পাশ্চাত্যজাতীয় মানুষে এখনকার জগতে শ্রেষ্ঠ এবং ভারতের আদর্শ হইলেও জড়ব্যবসায়ী অর্থাৎ বিরাট প্রকৃতির অধিকার মাত্র জড়রাজ্যের একান্ত অনুরক্ত এবং তাহার উপাসনায়ই নিমজ্জমান বলিয়া স্বভাবতই স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন। সেই কারণেই দূরবীক্ষণের সাহায্যে আদিত্যের স্থূল প্রকাশ লইয়াই ব্যস্ত। অন্য সময় সূর্য্যের দিকে টেলিস্কোপ ফিরানো একেবারেই অসম্ভব, কাজেই গ্রহণকালীন কেন্দ্রস্থ নিস্তেজ ছায়ায় সূর্য্যের মণ্ডলপ্রান্তে জ্যোতির মধ্যে বিশেষভাবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আবিষ্কারেই তাঁহাদের সূর্য্যতত্ত্ব-সংগ্রহের চেষ্টা—যেহেতু অন্য উপায় সে রাজ্যে অনাবিষ্কৃত। তবে অধুনা সূর্য্যের রোগ আরোগ্যকারী শক্তির সহিত পরিচিত এমন কেহ কেহ আছেন দেখা যায়। সভ্য সমাজের অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই এ তত্ত্ব বিদিত।

তারপর এদিকে ভারতবাসী-সাধারণের কথা! এখনকার দিনে পাশ্চাত্যের একান্ত অনুকরণে সঞ্জীবিত হইলেও তাহাদের মধ্যে হিন্দু

সনাতনপন্থী কেহ কেহ সূর্য্যোপাসনা করেন। আদিত্য উপাসনায় মন্ত্রজপ, স্তোত্রপাঠাদি নিয়ম তাঁদের মধ্যে বলবৎ থাকিলেও, আসলে সূর্য্যসম্বন্ধে স্বার্থপ্রাণোদিত অজ্ঞানমূলক একটি ভাব ব্যতীত মহান্ সত্যের প্রতি লক্ষ্য এতই বিক্ষিপ্ত যে, তাহার প্রভাব নিকটস্থ কাহারও হৃদয়ে মনে লাগে না, তাহা এতটা প্রাণহীন। সুতরাং নবীন সভ্যতাগর্ব্বিত পাশ্চাত্যই হোক, এবং প্রাচীন সভ্যতাবর্জ্জিত সনাতন ভারতবাসীই হোক, আদিত্য সম্বন্ধে উভয়েই সমান-ফলভাগী। কারণ উভয়পক্ষেই যথার্থমার্গে তত্ত্বানুসন্ধানে ঐকান্তিকতার অভাব সুস্পষ্ট। বিরাট জনসমষ্টির কথায় কাজ নাই। এখানকার এই দিব্যরাজ্যে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে আদিত্য-শক্তি প্রাণে প্রাণে ওতপ্রোত বর্ত্তমান থাকে, যাহার কখনও অন্যথা হয় না এবং হইবার নয়। ইহাতেই তাঁহারা মহাশক্তিমান্। আসলে এখানকার সকলেই যথার্থ আদিত্য-তত্ত্বে সঞ্জীবিত এবং তাহাতেই সর্ব্বক্ষণ অনুপ্রাণিত। একথা বলিলে কিছুমাত্র ভুল হয় না, যে পৃথিবীর মানুষ সূর্য্য সম্বন্ধে কতকাংশ কল্যাণভোগী হইলেও, অজ্ঞান এবং শক্তির অপব্যবহার হেতু নিয়ত দ্বন্দ্বময়, দুর্ব্বল আনন্দ ও শান্তিবিমুখ, আর এখানকার দিব্যদেহধারিগণ সূর্য্য বা আদিত্য-তত্ত্বে সমাহিত বলিয়া মহাশক্তিমান, নিরন্তর আনন্দ ও শান্তিময়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখানে সূর্য্যরশ্মির মধ্য দিয়া যে দিব্য সুরের রেশ আমরা পাইয়া থাকি, সেই রশ্মির মধ্য দিয়া সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহুবিধ শব্দতত্ত্ব এবং এক অপূর্ব্ব স্পর্শের পুলকও অনুভূত হয়। সেই পুলকপ্রবাহ এই দীপ্তিমান্ শরীরে মহানন্দের সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তির অনুভূতি আনিয়া দেয়, তাহাতেই এখানকার কর্ম্মপ্রবাহ চলিতেছে।

উপরে ঘন মেঘ বায়ুমণ্ডলে ব্যাপ্ত থাকিলে রশ্মি ক্ষীণ থাকে। তাহাতে অনুভূতির উপর আবরণ পড়ে, কিন্তু কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলে

যুক্তাবস্থায় তাহাতে নিরানন্দ বোধ হয় না; কিন্তু এখানকার ভোগই হইল ঐ সূর্য্যরশ্মিমিলিত দিব্যতত্ত্বসকলের অনুভব। কর্ম্মশূন্য অবস্থায় সূর্য্যের আনন্দময়-রশ্মির অপ্রকাশ, কোন প্রকার আবরণ এখনে দিব্য-অধিবাসীগণের সহ্য হয় না। তখন স্থানান্তরে, অবশ্য এই অন্তরীক্ষেই ভূবর্লোকে উর্দ্ধে অথবা অপর অংশে, যেখানে আদিত্যের পূর্ণ প্রকাশ সেইখানেই যাইতে হয়। এই দিব্যপ্রাণিগণের অন্তরীক্ষে অবাধ গতি। ঋতুপরিবর্ত্তনের ব্যাপার বড়ই চমৎকার এবং আনন্দময়, তাহা পরে যথাসময়ে বলিব। এখন কর্ম্মের কথা।

এখানকার দেবদূতগণের কর্ম্ম-ক্রম আমার মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে লাগিল। যে ভাবে বিকশিত হইয়াছিল, আমি ঠিক সেই ভাবেই বলিব, যদিও আমার আকস্মিক অনুভূতির সকল কথা বলা সম্ভব হইবে না। আমার রূপান্তরের পর, বিস্ময়ের প্রবল বেগ প্রশমিত হইল, প্রথমে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি আমার হৃদয়দেশে ধীরে ধীরে আসিতে লাগিল। কোনও একদিকে যেন বিশেষ অশান্তি অথবা সঙ্কটভীতির বার্ত্তা;—বিপদ-কাতর হইয়া যেন কাহারা গভীর দুঃখ পাইতেছে, বড় কাতর আহ্বান। এইটি যেন সংবাদের কাজ করিল। তখনই সেই স্থানে গিয়া তাহাদের অবস্থা লক্ষ্য করিতে প্রবৃত্তি হইল। হৃদয়ে সহানুভূতি প্রবলভাবেই জাগিয়া উঠিল এবং একটি অপূর্ব্ব আকর্ষণ অনুভূত হইল। অবশ্য এই আর্ত্তি সেইস্থানের সর্ব্বত্রই প্রসারিত হইয়া পড়িল, তাহাতে সেখানকার অন্তরীক্ষবাসীদের গণের কাহারও জানিতে বাকী রহিল না। কিন্তু দেখিলাম—ইঁহাদের মধ্যে নির্ম্মল-ক্ষীণ-লোহিতাভ শরীর দুই জন ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন। আমার অন্তঃকরণ প্রবল সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল, আমিও উঠিলাম এবং তাঁহাদের সঙ্গে মিশিলাম। উর্দ্ধে উঠিয়া অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিমেষ মধ্যেই আমরা যথাস্থানে উপনীত হইলাম।

সিংহলের দক্ষিণে সমুদ্রতীর হইতে কিছু দূরে দুইখানি নৌকা,

একখানি হইতেই এই বিপদের বার্ত্তা। এক বণিক মহাজনের নৌকায় দস্যু পড়িয়াছে। মহাজনের সেই নৌকায় অতীব সুন্দরী দুইটি যুবতী নারী, তিন-চার জন দস্যু মিলিয়া তাহাদের বলপূর্ব্বক অপর নৌকায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। কাতর আর্ত্তনাদ তাহাদেরই, যাহাতে আমাদের বিচলিত করিয়াছিল এবং তাঁহাদেরই ব্যাকুলতায় আমাদের এখানে আনিয়াছে। দস্যুগণ সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। কয়েকজন লোককে বাঁধিয়াছে, তাহারা ভীত এবং মুহ্যমান্। ধনরত্ন লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া অপর কয়েকজন ব্যস্ত। অধিকারী একজন যুবক, বদ্ধাবস্থায় পড়িয়া আছে, তাঁহার অবস্থাও ভয়ে মুহ্যমান।

আমাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্বৃত্তগণের মধ্যে একটা আকস্মিক ভয় এবং আর্ত্তগণের মধ্যে একটা সাহস সঞ্চারিত হইল। দেবদূতগণের আবির্ভাবের ইহাই প্রথম পরিচয়। আমরা কিন্তু অন্তরীক্ষেই রহিলাম, সেইখানেই সকল ব্যাপারই দেখিলাম। কর্ত্তব্য আমাদের স্থূলভাবে কিছুই নাই, যেহেতু আমাদের স্থূল-শরীর নয়। প্রবলভাবে অভয় ইচ্ছাশক্তি আর্ত্তগণের প্রতি প্রয়োগ এবং দস্যুগণের অপকর্ম্মের প্রতিবাদে তাহাদের পাতকের অশুভ ফলাফলের বিষয়, দুষ্ট প্রবৃত্তির নিশ্চিত অমঙ্গল তাহাদের অন্তঃকরণে প্রবলভাবে আমাদের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা জাগ্রত করাই হইল আমাদের প্রথমত প্রধান কর্ম্ম। পশু-শক্তির প্রাবল্যে ভয়ানক উত্তেজনাবশে এবং লোভের প্রভাবে তাহাদের মধ্যে আমাদের এই সকল চেষ্টা প্রথমে প্রতিহত হইলেও, সত্যের প্রভাবে তাহাদের মধ্যে অনিবার্য্য দুর্ব্বলতা আসিতে লাগিল।

আর্ত্তগণের হৃদয়ে বল সঞ্চারিত হইলে তাহার ফল এই হইল,—যাহাদের সুযোগ ছিল তাহারা সাহস করিয়া পুনঃ পুনঃ দস্যুগণকে আক্রমণ করিতে এবং তাহাদের সঙ্গীগণের বন্ধনমোচনে সচেষ্ট হইল। আমাদের মধ্যে দুই জনের লক্ষ্য নারীদ্বয়ের প্রতি বিশেষ ক্রিয়া করিতেছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের আবির্ভাবের সঙ্গেই

তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে সাহস এবং বিপদুদ্ধারের আশা যুগপৎ ক্রিয়া করিল। তাহারা এমন অপূর্ব্ব কৌশলে, বলপূর্ব্বক যাহারা তাহাদের ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল তাহাদের প্রতিবাদে এমন প্রবলভাবে আত্মরক্ষার জন্য বাহুদ্বয় চালনা করিল যে, তাহাতে একজন নৌকার কিনারায়, অপর জন সমুদ্রের জলে পড়িয়া গেল। ক্রমে মহাজনের দলের মধ্যে মুহ্যমান্ অবস্থাটি কাটিয়া গেল এবং প্রাণপণ শক্তির প্রয়োগে তাহারা নিজ নিজ আপদুদ্ধারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত দেখা গেল। তারপর যাহা হইল তাহার মধ্যে বিশেষত্ব এইটুকু যে, নারীদ্বয়ের বিপদুদ্ধারের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা এবং দস্যুদল নিজেদের শক্তিহীন বিবেচনা করিয়া আপনাদের নৌকায় আশ্রয় লইয়া দ্রুতগতি পলায়নের চেষ্টা। একজন দস্যু অত্যন্ত আঘাত পাইয়া মুমূর্ষু হইয়াছিল, আরও চার জন আহত হইয়াছিল; দলের লোকেরা তাহার শুশ্রূষায় সচেষ্ট হইল। এই আহবে নারীগণের যে অসীম সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেল, তাহার প্রধান কারণই আমাদের সঙ্গী দুইজন দেবদূতের বিশেষ শক্তিপ্রয়োগ। তিনটি বিষয় এক্ষেত্রে, আমার এই নবজীবনের কর্ম্মারম্ভে লক্ষ্যের বিষয় হইল।

প্রথম—দেবদূতগণের শক্তি মানুষের বুদ্ধির উপর প্রযুক্ত হয়, ভীত মুহ্যমান্ অবস্থায় তাঁহাদের শক্তির ক্রিয়া বিশেষভাবেই অনুভূত হয়। তাঁহারা অভয়দাতা। দ্বিতীয়—দুষ্ট অভিপ্রায় যাহাদের, তাহাদের পশুবলের উত্তেজনায় প্রাবল্য হেতু প্রথমে তাহারা শক্তিমান্ বোধ করিলেও, পরে তাহারা দেবদূতগণের শক্তিপ্রভাবে দুর্ব্বল হইতে বাধ্য। তৃতীয়—দেবদূতগণের শক্তির ক্রিয়া বিপদগ্রস্ত আর্ত্তের ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হয়; কোনও ক্রমে পৃথক্‌ভাবে অনুভূত হইবার নয়। এই ভাবে যাঁহারা এই দেবদূতগণের কৃপায়, অভয়শক্তি-প্রয়োগের ফলে বিপন্মুক্ত হন, তাঁহারা সাধারণত নিজ শক্তিতে উদ্ধার পাইলেন, এই মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন—অহঙ্কার তাঁহাদের প্রবল

থাকে, তাহাতে সুপ্তশক্তি জাগ্রত হইবার পক্ষে সহায়তা করে। এই সকল বুঝিতে পারিলে সহজেই ধারণা হইতে বাধা থাকে না যে, অন্তরীক্ষবাসী দেবদূতগণের কর্ম্ম এই জগতের মানুষের পক্ষে সকল দিকেই মঙ্গলময়, তাঁহাদের সংস্পর্শে অমঙ্গলের নামটি নাই। যাঁহারা সাত্বিকভাবাপন্ন, তাঁহারা এইভাবের বিপদুদ্ধারের পর সংস্কারবশে ভগবানের কৃপায় বিপন্মুক্ত হইলেন মনে করিয়া অজ্ঞাত কোন এক মহান্ অস্তিত্বের কল্পনায় নিজ বুদ্ধিকে পরিচালিত করেন। তাহাতেও কল্যাণ অবশ্যই আছে।

কোন কঠিন বিপদ, যাহাকে দৈব বিপদ বলে, যাহাতে মানুষের হাত নাই, সাধারণ মানুষ সেই সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইলে বলে যে, ভগবান রক্ষা করিলেন। মুখে বলা শুধু নয়, যেন নিশ্চিতরূপে ভাবিয়াও থাকে। কিন্তু যথার্থ ব্যাপার যাহা ঘটে তাহা যদি জানিবার সুযোগ হয় তাহা হইলে আর কেহ ভগবান বলিয়া কাহাকেও ডাকিবে না। বাস্তবিক সে সকল আপদ উদ্ধারের ব্যাপার এ সকল আপদেবগণেরই কার্য্য। দেবদূত কথাটা মানুষের কানে বড়ই মিষ্ট শুনায়, তাই তাহাদের দেবদূতই বলিলেও দোষ হয় না—তাহাতে বোধ করি অর্থ বিপর্য্যয়ও ঘটিবে না।

বলিতেছিলাম, যখনই অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপাকে পড়িয়া মানুষ কাতর প্রাণে বিপদের গুরুত্ব হৃদয়ে অনুভব করে তখনই স্বভাবের নিয়মে আপদ উদ্ধারের আশায় সে একটি বিরাট শক্তির সহায়তা চায় যিনি তাহাকে বিপদমুক্ত করিতে পারিবেন, আর তাঁহাকেই সে ভগবান বলিয়া জানে। তখনই মানুষ নিজ শক্তিকে ক্ষুদ্র ও অক্ষম নিশ্চিতরূপেই ধারণা করিতে পারে। কিন্তু এ সৃষ্টির এমনই নিয়ম, ভগবান কি বস্তু, কোথায় তাঁর অধিষ্ঠান, তাঁর স্বভাবই বা কিরূপ, মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধই বা কি, এ সকল বিষয়ে কোন স্পষ্ট জ্ঞান না থাকিলেও তাহার অন্তরের ঐকান্তিক ব্যাকুল আর্ত্তিভাব-তরঙ্গে প্রবাহরূপে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক জায়গায় পৌঁছায় ;—আর প্রতিকারও, তাহার অন্তরে বিপদ অনুভূতির গভীরতা বা পরিমাণ অনুসারে, শীঘ্র বা বিলম্বে আসিয়া থাকে। বিপদ অনুভব এবং বিপদ উদ্ধার ইহার মধ্যে যত কিছু বেদনা, আতঙ্ক, অবর্ণনীয় নৈরাশ্য জনিত উদ্বেগ, আবার সময়ে সময়ে সেই প্রচণ্ড উদ্বেগের তাড়নায় স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও শারীর-যন্ত্রের বিকৃতি, হয়ত এ সকলও তাহাকে

সহ্য করিতে হয়। তাহার কর্ম্ম-সংস্কারগত ভোগশরীর ও মনের দুর্ব্বল গঠনের ফলে এই সকল দুঃখ আসিয়া থাকে তাহাও হয়ত সে জানে না,—কিন্তু যখন সেই বিপদ কাটিয়া যায় প্রতিক্রিয়ার ফলে সে সেই পরিমাণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, আরাম পায়, আনন্দ ভোগ করে, তাহার দুঃখ, বেদনার কাহিনী প্রিয়জনের কাছে দশ মুখে প্রকাশ করিতে চায়,—জানে কি, কোথা হইতে পরিত্রাণ আসিল? ভগবান রক্ষা করিলেন একথা সে বলিলেও, অন্তরে তাহার এ ব্যাপার রহস্যময় থাকিয়াই যায়, কারণ ভগবান বলিয়া এই যে একটি ভাব তাহাও ত মানুষের কাছে অসীম রহস্যে আবৃত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীর জীব-সমাজের মধ্যে যত কিছু চিন্তা এবং কর্ম্ম চলিতেছে, প্রত্যেকটি চিন্তা এবং কর্ম্ম হইতে কোন না কোন ভাবের তরঙ্গ সৃষ্টি করিতেছে আর সেই তরঙ্গে অন্তরীক্ষ মহাসমুদ্র অবিরাম আলোড়িত হইতেছে, যাহা হইতে এই আপদেবগণ নিজ নিজ কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতেছেন। এ কর্ম্মের ইতি দেখিতে পাই নাই। এখন আমার কোন সঙ্কোচ বা কর্ম্ম নির্দ্ধারণে বুদ্ধির অভাব নাই। তাহা অবশ্য প্রথমেও ছিল না, তবে পূর্ব্বে কোন আহ্বান আসিলে আমি দেখিতাম প্রথমে কে বা কাহারা উঠিলেন, তাহা দেখিয়া আমি তাঁদের সঙ্গে মিলিতাম। তারপর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কি ভাবে তাঁহারা কর্ম্ম করেন, শক্তি প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য এ সকল লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতাম, তারপর আমার গতি অন্তরীক্ষের মধ্যেও একটি সীমার মধ্যে ছিল, তাহার অধিক গতি ছিল না,—এখন আর সে সকল লক্ষ্য করিয়া অনুসরণ করিতে হয় না,—এখন তরঙ্গ লক্ষ্য করিয়া স্বতই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই,—কেমন ভাবে শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় সে বিষয়ে আর সহায়তা বা আদর্শের প্রয়োজন হয় না, আমার গতিও প্রসারিত হইয়াছে;—তবে কর্ম্ম সম্বন্ধে একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যেই রহিয়াছি; অন্যান্য বিশাল দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম সকল যাহা উচ্চ স্তরের দেবদূতগণের

অধিকারে তাহার মধ্যে আমার গতি হয় নাই। তবে বুঝিয়াছি, এখানেও কর্ম্মের ক্রমপ্রকরণ আছে, অধিকার আছে, দায়িত্ব আছে, প্রসাদ আছে, মহিমা আছে, সে সকল উচ্চ অবস্থা কর্ম্মোৎকর্ষের ফলে প্রাকৃতিক নিয়মে আপনাআপনিই হইয়া যায়। কেহ গুরু নাই, উপদেষ্টা নাই, বাকবিতণ্ডা নাই, নিস্তব্ধ একটি বিরাট প্রেমের রাজ্য, অনির্ব্বচনীয় মহিমায় এই ধরাতলের সুখ ও কল্যাণের নিয়ন্তারূপে সর্ব্বকাল ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

এখন এখানে আমার কর্ম্ম-সম্পর্কে আর একটি ঘটনার কথা বলি তখন আমরা প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপের নিকটে ;—আদিত্য-রশ্মির সুধাময় কিরণে,—সুরলোকের অবিশ্রান্ত বিকীরণের মধ্যে নৃত্যে মগ্ন ছিলাম। এটুকু এখানে জানা প্রয়োজন যে, স্থূল প্রাণীজগতে নিদ্রা বা সুষুপ্তি যেমন জীবনের পক্ষে অচ্ছেদ্য নিয়ম, পরিমিত নিদ্রার অভাবে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে কারণ শরীর এবং প্রাণের অপচয় এই আনন্দময় সুষুপ্তিতেই পূর্ণ হয়, দৈনিক কর্ম্মজীবন আনন্দময় হয় ;—সেইরূপ অন্তরীক্ষের এই আপদেবগণের সূর্য্য-কিরণ-রশ্মি-বিকীরিত অমৃতময় সুরধারায় স্পন্দনের মধ্যে নিমজ্জিত অবস্থাই হইল নিদ্রা বা সুষুপ্তি। আদিত্য কিরণ মিলিত সুরধারার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে স্নান যে কি আনন্দময় তাহা কি করিয়া বুঝাইব? উহা প্রকাশের শব্দ ত নাই-ই, পরন্তু প্রবৃত্তিও হয় না।

এখন যাহা বলিতেছিলাম,—আমরা প্রশান্ত মহাসমুদ্রের উপর মহানন্দময় সুষুপ্তিতে বিভোর ছিলাম,—একটি অতি কাতর, মহাভয়ের ভাবতরঙ্গ আসিয়া অন্তরীক্ষে লাগিল। শান্তিময় অবস্থা হইতে জাগ্রত হইলাম, তরঙ্গের কেন্দ্রস্থল লক্ষ্য করিলাম। ভারতের দিকটা মেঘাচ্ছন্ন, ঝড় ও মেঘের খেলা চলিতেছে। সমস্ত পশ্চিমদিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত জলদের মেলা, বহু উর্দ্ধ বেড়িয়া প্রবলভাবে আলোড়িত হইতেছে।

তরঙ্গ লক্ষ্য করিয়া মুহূর্ত্তে গিয়া পৌঁছিলাম এক গ্রামের মধ্যে, এক

সম্পন্ন গৃহস্থের আশ্রমে একটি পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবা মৃত্যুশয্যায়। জীবিত পিতা, মাতা, স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনে পরিবৃত সকলের মুখে শোকের পূর্ব্বাভাস। যুবা তখন বাহ্যত অচৈতন্য, অন্তরে তাহার প্রবল দ্বন্দ্ব চলিতেছে। শ্বাসও উঠিতেছে। বুঝিলাম আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে যুবা ক্ষীণ এবং অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িতেছে।

যুবা কল্পনা করিতেছে শূন্য, নিঃসঙ্গ অবস্থা, সে যেন সঙ্গ ও সংসার হইতে নিস্তব্ধ শূন্য এক অনন্ত অন্ধকারময় লোকে যাইতেছে, তাহা বড়ই ভয়ঙ্কর। ঐ সকল তাহার জীবিত কর্ম্মাবস্থার অনেকানেক শ্রবণ মননের ফল,—আসলে সবটাই তার কল্পনা। কল্পনায় তাহার ভয় ক্রমাগতই বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে হৃদপিণ্ডের গতিও বিষম দ্রুত হইতেছে।

এখন একথা যেন কেহ মনে না করেন যে, আমার পর্য্যায়ে এই আপদেবগণের কাজই হইল প্রাণ ভয়ে ভীত সকলকেই প্রাণে বাঁচাইয়া দেওয়া। আর সকল সময় প্রাণে বাঁচানোটাই যথার্থ কল্যাণের কাজও হয় না এবং বিপদগ্রস্ত সকলকেই প্রাণে বাঁচাইয়া দেওয়া তাহাদের সাধ্যায়ত্তও নয়। বাঁচানো বা মারার নিশ্চিত বিধান আরও উচ্চস্তরের দেবদূতগণেরই কর্ম্ম। আমার এখন সে অধিকার নাই, কারণ প্রকৃতির গুহ্যতম নিয়ম ও সকল উদ্দেশ্যের সঙ্গে এখনও আমি সম্যক পরিচিত নহি। আমার এখন প্রাথমিক স্তরের কতকটা লইয়াই কর্ম্ম চলিতেছে কাজেই যেখানে কাহাকেও বাঁচানো বা মারার স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইবে সে সকল ক্ষেত্রে আমাদের মত একজনের কর্ম্ম করিবার পথ নাই, সেহেতু প্রেরণাও আসে না। তবে আমায় কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া এ জ্ঞানটি স্বতই আসিয়া থাকে যে, যাহাকে বা যাহাদের লইয়া আমার কর্ম্ম তাহাদের উপর প্রাকৃতিক বিধানটা কিরূপ হইবে সেই অনুসারেই আমায় ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে হয়।

এ ক্ষেত্রে আমি দেখিলাম যে যুবার দেহত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। পার্থিব

লোকের শরীর ও মন সম্পর্কে যেমন দয়া বা মমতা তাহার বশে তাহাদের কর্ম্মে ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হয়, আমাদের সেরূপ কোনও মনোভাব নাই। প্রাকৃতির নিয়মেই এ ক্ষেত্রে তাহার যে গতি হইবে তাহাতে কিছু অন্তরায় থাকিলে সেটি দূর করিয়া তাহাকে নিজ গতিতে কতকটা অগ্রসর করিয়া দেওয়াই এখানে আমাদের কর্ম্ম। এখন দেখিলাম ইহার দেহত্যাগের কিছু বিলম্ব আছে, কারণ তাহার প্রাণ নিম্নমার্গের কেন্দ্রস্থল হইতে সঙ্কুচিত হইয়া প্রাণকেন্দ্রে এখনও গতিমান হয় নাই।

ষঠচক্রের ব্যাপার সম্বন্ধে যাঁহাদের জানা আছে তাঁহারা জানেন যে প্রাণ আপন কেন্দ্র অর্থাৎ উপর দিকে যেখানে মেরুদণ্ডের শেষ সেখান হইতে নিম্নে যেখানে মেরুদণ্ড শেষ হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত অবিরাম অতি দ্রুত কম্পনের দ্বারা শারীরক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে। তাহার ছয়টি কেন্দ্র আছে, প্রত্যেক কেন্দ্রের ক্রিয়া পৃথক ভাবের। নিম্নতম কেন্দ্র হইল গুহ্যদেশ, তাহার উপর লিঙ্গ, তাহার উপর নাভি, তাহার উপরে হৃদয়, তার উপরে কণ্ঠ, তার উপরে ভ্রূমধ্যে প্রাণকেন্দ্র। এই সকল কেন্দ্রই প্রাণের উপস্থিতি এবং সূক্ষ্মভাবে স্পন্দনের ফলে শরীর মনের যাবতীয় কর্ম্ম চলিতেছে। এখন মৃত্যুকালে দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে* প্রাণ নিম্নমার্গের সকল কেন্দ্র হইতে গুটাইয়া প্রাণকেন্দ্রে স্থির হয়, তারপর দেহত্যাগ করিয়া আত্মা সূক্ষ্ম শরীরে বিরাট ব্যোমে নিজ মার্গে গতি পাইয়া থাকেন। স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া গেলেও আত্মার একটি সূক্ষ্ম আবরণ তখনও থাকে তাহাকেই সূক্ষ্ম শরীর বলে!

এখন এই যুবা নিজের ভয়াত্মক কল্পনায় এমনই ভাসিয়া চলিয়াছে যে তাহার চৈতন্যের নাগাল পাওয়াই যায় না। অনেকটা, কানটা কাকে লইয়া গেল শুনিয়া কাকের পিছনে দৌড়ানোর মতই। এ অবস্থায় বেশীভাগ স্থূলবুদ্ধি জীবেরই এরূপ হইয়া থাকে। আমার এবার মৃত্যু হইবে জানিতে পারিলে তখন প্রকৃতিস্থ বা স্থির থাকাই কঠিন, কারণ অন্তর ক্ষেত্রে তখন ভূত ও বর্ত্তমান কর্ম্ম ও তাহার ফল

সংক্রান্ত হিসাব নিকাশ, এবং ভবিষ্যতে তাহার গতি কি হইবে এই সকল চিন্তার ঝড় বহিতে থাকে। দেখিলাম যুবার এত ভয় হইয়াছে যে, শান্তিময় অবস্থায় দেহত্যাগের পথ আপনিই রোধ করিয়া ফেলিতেছে। মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার বিকট মূর্ত্তি কল্পনা করিতেছে।

এ ক্ষেত্রে তাহার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা অনুসরণ করিয়া এটুকু স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম যে, তাহার এই ভয় ও উদ্বেগের কারণটি এই যে, তাহার জীবনের সকল কর্ম্মই চঞ্চল বুদ্ধিপ্রসূত। তাহার প্রকৃতিই চঞ্চল। সুস্থ, বলবান শরীরে মনের চাঞ্চল্যই তাহাকে কর্ম্মের প্রেরণা যোগাইয়াছে। আর যে সকল কর্ম্ম সে করিয়াছে তাহাতে তাহার চৈতন্য পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই, স্থির সংযমের পথ পায় নাই। ধীর বিচারবান হওয়া ত দূরের কথা, সে কখনও কোন সময় একস্থানে চার দণ্ড স্থির হইয়া বসে নাই। অতিরিক্ত সঙ্গপ্রিয় ছিল তাহার প্রকৃতি, কখনও অল্পক্ষণের জন্যও নিঃসঙ্গ হইতে পারে নাই। তবে তাহার মধ্যে সরলতা ছিল। কুটিল কিম্বা দুষ্ট বুদ্ধি, অপরের অনিষ্টকারী স্বভাব তাহার ছিল না। অতিরিক্ত চঞ্চল প্রকৃতি বলিয়াই অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সুখপ্রিয়। যৌবনবিকাশের কিছুপূর্ব্ব হইতেই তাহার যৌন ক্রিয়ার প্রবৃত্তি জাগিয়া নানাপ্রকার সঙ্গ দোষে মনোভাব বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ভালবাসা, প্রেম, এসকল তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই। জীবনে তাহার মুখ্যত দুইটি কর্ম্ম প্রবল হইয়া ছিল, একটি তাহার নিরন্তর বন্ধু বা লোক সঙ্গ, দ্বিতীয় নারী সংসর্গ। ইহার জন্য তাহার কোন সৎ কর্ম্মবুদ্ধি জাগে নাই। অভাব, দুঃখ, সামাজিক বা গার্হস্থ্য জীবনের দায়িত্ব বোধ তাহার মধ্যে তিলার্দ্ধও স্থান পায় নাই। কাজেই এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে ক্ষীণ মস্তিষ্কে তাহার সংযমের অভাবই তাহাকে অতিরিক্ত পরিমাণে কাতর করিয়াছিল।

এ ক্ষেত্রে আমার কর্ত্তব্য হইল, উৎকট কল্পনাপ্রসূত বিষম আতঙ্কের অবস্থা হইতে তাহাকে স্থির বা শান্ত করা। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি,

কল্পনার বেগ এতটা প্রখর তাহাতে তাহার চৈতন্যের নাগাল পাওয়াই যায় না। পাগলের মত তাহার চৈতন্য উদ্দাম, বিপরীত মার্গেই গতিবিশিষ্ট। তখন অন্যদিক দিয়াই উপায় করিতে হইল।

তাহার আত্মীয়মণ্ডলের মধ্যে সকলেই মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল—এখন তাহাদের মধ্যে একজনের মনে হইল অনেকক্ষণ কিছুই খাওয়ানো হয় নাই, গলাটি বড়ই শুখাইয়াছে, একটু কিছু পান করানো যায় কি-না—দেখা যাক। তাহার কথা শুনিয়া সকলেই অনুমোদন করিল। এক পাত্র একটু জল লইয়া একজন তাহার চৈতন্যের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের চেষ্টায় যখন অল্প একটু বাহ্য চেতনা আসিল, সে তখন ক্ষণেকের মত একবার চাহিয়া দেখিল,—আমি তাহাই চাহিতেছিলাম। যেই চক্ষু একবার খুলিয়াছে, বিকারের ঘোরে চাওয়ার মত, তাহার ঠিক সম্মুখেই ছিলাম, এবার আমি তাহার দৃষ্টির উপর শক্তি প্রয়োগ করিলাম ; আমার প্রকাশ সে চৈতন্য দিয়াই অনুভব করিল।

ওকি ? এ কে ? শব্দগুলি যন্ত্রচালিতের মতই তাহার মুখ হইতেই বাহির হইয়া গেল। তারপর পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। তখন তাহার অন্তরে কল্পনার ভয় প্রশমিত হইল। তাহার আত্মীয়গণ তাহার কথা শুনিয়া একটু ভয় পাইয়াছিল তাহার, ও কি ? এ কে ? কে ? কথাগুলি শুনিয়া তাহারা নানাপ্রকার ভয়াত্মক কিছু কল্পনা করিতে লাগিল, কিন্তু মুখে বলিল, কই, আর কেউ ত এখানে নেই, এই যে আমরা সকলেই তোমার কাছে আছি। খাও এই জলটুকু খাও,—বলিয়া জলটুকু খাওয়াইতে চেষ্টা করিল। সে চেষ্টার ফলে এখন সে কতকটা জলপান করিয়া তাহাতে অন্তরে বায়ুর গতি কতকটা স্থির হইল।

সেই যে একবার দেখা এখন সেই দৃষ্টিসূত্রে তাহার প্রকৃতি স্থির হইতে সহায়তা করিল। তাহার ভয় ক্রমে ক্রমে একেবারেই চলিয়া গেল। ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের গতিও স্থির হইয়া

আসিতে লাগিল। কল্পনার যত কিছু ভয়ের ব্যাপার আর কিছুই নাই, ক্রমে তাহার বড়ই আরাম বোধ হইতে লাগিল। সে বুঝিল নিঃসঙ্গ সে নয়। প্রিয়জন একটি তাহার সঙ্গেই আছে, ঠিক মানুষের মত তাহার শরীর দেখিতে পাইতেছে না বটে কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিতেছে। সে অনুভব স্থূল চক্ষে দেখার তুলনায় আরও নিকট, বেশী স্পষ্ট এবং ঘনিষ্ট। জ্ঞানে তাহার এখন আমায় লক্ষ্য হইয়াছে; সে বলিল, আমার কাছেই থাক, চলে যেও না,—এই কথা কয়টি বলিয়া ফেলিল।

শুনিয়া আশেপাশের নানা জনে নানা কথাই মনে করিল। তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতেছে, এ কথার কি অর্থ হইতে পারে; উত্তরে একজন বলিল, না না, এই যে, আমরা তোমার কাছেই আছি, ভয় কি ?

ইত্যবসরে প্রাণের গতি কেন্দ্রের দিকেই নির্দ্দিষ্ট হইল, অন্তরের সকল চাঞ্চল্য আর নাই,—যুবকের দর্শন, স্পার্শ, শ্রবণ, এক হইয়া শান্তির আরাম স্থির ভাবেই অনুভূত হইতে লাগিল। হৃদয়ের শেষ স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের ঘন অনুভব,—তারপর বিহ্বলতা, তারপর সংজ্ঞা লোপ! এ অবস্থায় চৈতন্যকে জাগ্রত রাখিবার মত অহং তাহার ছিল না;—সাধারণের তাহা থাকেও না,—কাজেই, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে স্থিতির মত দেহত্যাগ সময়ে সে অচৈতন্য রহিল। এইখানেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হইল।

একটি কথা জানিয়া রাখা ভাল যে,—সাধারণ জীব যারা অজ্ঞান অবস্থায় দেহত্যাগ করে। মমতা যাহাদের অধিক—দেহগত চৈতন্য যাহাদের স্তিমিত, তাহাদের দেহত্যাগের সময়ে মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। কিছুতেই সে প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী এই নিয়মে সহজে নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারে না। মৃত্যুকে স্বীকার করিলেও তাহার যে সেই সময় এতটা নিকট হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না, কোনও প্রকারে

যেন এড়াইতে চায়। যে দেহকে আধার করিয়া তাহার অহঙ্কারের স্ফুরণ হইতেছিল সেই দেহের উপরেই তাহার অধিকার ত্যাগ, একথা সে ভাবিতেও পারে না। কিন্তু তাহার সময় আসিলে তখন সেই অবশ্যম্ভাবী নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া ছাড়া উপায়ও থাকে না। আখেরী হিসাব চুকাইবার সময় কৃপণের সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে বিচ্ছেদের উৎকণ্ঠার মত—দেহাত্মবোধ যাহাদের প্রবল দেহত্যাগের সময়ে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হয়—সেই জন্যই তখন মূর্চ্ছা আসে, পরে সেই অবস্থাতেই তাহাদের শরীর ছাড়িতে হয়।

এ ক্ষেত্রে এই যুবকের যাহা ঘটিল, দেহ ত্যাগের পরে তাহার অবস্থার কথা কিছু বলা ভাল। দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মূর্চ্ছার ভাব কাটিয়া গেল। তখন তাহার শরীর এবং শরীরের সকল ক্রিয়ার মূল প্রাণের অভাব বোধ হইল। আমি আছি এ জ্ঞানটি আছে, মনের সংকল্প বিকল্পময় অবস্থা আছে, কিন্তু প্রাণের অভাবে তাহা ক্ষীণ, এতই ক্ষীণ যে তাহা হইতে ইচ্ছামত কর্ম্ম করিবার শক্তি এবং প্রবৃত্তির অভাব, যেমন তিন-চার দিন উপবাসের পর শরীরে প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়, সে সময় যেমন হালকা বোধ হয়, আকন্দ ফল পাকিলে তাহা ফাটিয়া যেমন অন্তরস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তুলার গুচ্ছ সকল বাতাসের গতি অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া বেড়ায়, দেহচ্যুত এই জীবের গতিও সেইরূপ,—তখন তাহার কর্ম্মানুসারী গতিতে নিজ অভিষ্ট মার্গে গতিমান হয়।

জীবিত অবস্থায় যে ধারায় তাহার কর্ম্ম চলিয়াছিল, প্রত্যেক কর্ম্মের ফলাফল বিষয়ে তাহার যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে,—সেই সকল অভিজ্ঞতাই তাহার গতি। এখন প্রাণশক্তির অভাব হইলেও তাহার সেই ক্ষীণ জ্ঞানই তাহাকে তাহার নিজ মার্গ আধিকার করিতে সহায়তা করিতে থাকে। অন্তরের চৈতন্য, কর্ম্মবিপাকে মলিন থাকিলে এই পরলোকে তাহাকে কতকটা অন্ধকার দেখিতে হয়,—কিন্তু বিবেকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ক্রমে ক্রমে তাহার জড়বুদ্ধি যত পরিষ্কৃত হইতে থাকে

ততই অর্থাৎ সেইক্রমে সে নিজের পথে আলোক দেখিতে পায়। এই যুবকের তাহাই হইয়াছিল। যতক্ষণ তাহার নিজ মার্গ সরল, আলোকময় না হইল ততক্ষণ আমাকে প্রচ্ছন্ন ভাবেই তাহার সাথে সাথে থাকিতে হইল। ইহাও সত্য যে তাহার দেহত্যাগের পর, যতক্ষণ তাহার পার্থিব জড়তাময় অসহায় ভাবটি না কাটিল ততক্ষণ তাহার বিচারবুদ্ধির উপর আত্মশক্তি বিকাশের ফলে নিজ মার্গে গতিমান করিতে সহায়তাই করিতে হইয়াছিল। অন্তরীক্ষের সৌর দেবদূতগণের ইহা অন্যতম প্রিয় কর্ম্ম। যাঁহারা এ জড় জগতের জড় ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সর্ব্বদাই লোকসঙ্গে জীবন যাপন করেন, মৃত্যুকে তাঁহাদের প্রধান ভয়ই নিঃসঙ্গতাঘটিত। তাঁহাদের কল্পনা এই ভাবেই পুষ্ট হয়, যেন দেহত্যাগের পরের অবস্থা কেবল অন্ধকারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকা,—তাহাদের জন্যই আমার এই সত্যটি প্রকাশ করিতে হইল।

এবার আর একটি ঘটনার কথা,—তারপর কর্ম্মক্ষেত্র পরিবর্ত্তনের কথা বলিব। ব্যাপারটি হিমালয়ের মধ্যে ভোটরাজ্যের এলাকায় একস্থানে ঘটিয়াছিল।

ভোটিয়া স্ত্রী, পুরুষ ও একটি বালক-পুত্র। পিতা-পুত্রের পৃষ্ঠে মোট বাঁধা; অবশ্য যে যতটা পারে সেই মতই, নারীর পিঠে ছোট একটি কাপড় চোপড়ের বোঝা। আরও একটি সঙ্গী তাহাদের আছে, একটি পাহাড়ী গাধা, তার পিঠে দুই দিকেই বেশ ভারী মাল চাপাইয়া বেশ প্রফুল্ল মনে তাহারা চলিয়াছে। চল্লিশটি ক্রোশ চড়াই, উৎরাই এবং গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া তাহারা যেখানে যাইতেছে, এই সময়ে সেখানে প্রতিবৎসরেই একটি মেলা বসিয়া থাকে, অনেক টাকার কেনা-বেচা হয়। সারা বৎসর পরিশ্রম করিয়া ইহারা যে-সকল দ্রব্য উৎপন্ন করে এই হাটেই তাহা বিক্রয় করে। শেষে ফিরিবার সময় কিছু কিছু কাঁচা মাল সওদা করিয়া আনে যাহাতে আবার সারা বৎসর কাজ চলিবে। এই তাহাদের জীবিকা। সরল, সুন্দর, স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবন তাহাদের।

এখন যে-পথে তাহারা চলিয়াছে সে-পথে পড়াও বা আশ্রয় স্থান কিছু দূরে দূরে। এ অঞ্চলে এমনই হয়। সঙ্গে তাহাদের চাল, ডাল, আটা, ঘি, গুড় প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্যাদি চলিতেছে। আজ সকালে তাহারা আহারাদি সারিয়া মধ্য পথের একটি জঙ্গলময় পড়াও হইতে বাহির হইল, পাঁচ ক্রোশ গেলে তবে আবার আশ্রয় মিলিবে।

ক্রোশ দুই চলিবার পর পুরুষটি, পেটের পীড়া অনুভব করিয়া বোঝা রাখিয়া জঙ্গলে গেল। মাতা-পুত্রে বোঝা নামাইয়া ততক্ষণ একটু বিশ্রামের জন্য বসিল। অনেকক্ষণ পর যখন সে ব্যক্তি ফিরিয়া

আসিতেছে দেখা গেল, তাহার চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, চলৎশক্তি ক্ষীণ। নারী উদ্বিগ্ন চিত্তে অগ্রসর হইয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিতে সে কেবল মাত্র,—হৈজা, এই কথাটি বলিয়া, সেইখানেই বসিয়া পড়িল। ওলাউঠা বা কলেরাকে ইহারা হৈজা বলে, এ রোগে মৃত্যু নিশ্চিত ইহাই তাহাদের ধারণা।

শুনিবামাত্র ভয়ে নারীর মুখ শুখাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি পুত্রকে ডাকিয়া দুজনে গাধাটি ভারমুক্ত করিল। বোঝা হইতে বিছাইবার মত একটা কিছু বাহির করিয়া নারী স্বামীকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া দিল। পথের পাশে, পীড়িত স্বামী লইয়া এইরূপ অসহায় বিপন্ন নারীপ্রাণে যে অবস্থা তাহা বর্ণনার ভাষা নাই। তাহার মুখ দিয়া কথা ফুটিল না। উদ্বেগ, ভয়, ও বিষাদ, মিলিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মুহ্যমান, বালকটি এখনও বিপদের কথা ভাল বুঝিতে পারে নাই। সে একবার পিতা ও একবার মাতার মুখের দিকে দেখিতে লাগিল। জনশূন্য জঙ্গলময় পার্ব্বত্য পথে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, যদি কেহ আসে, কিন্তু কে কোথায় আছে যে সাহায্য করিতে আসিবে?

নারীহৃদয় বিধাতার কি অপূর্ব্ব রহস্যময় সৃষ্টি,—এমনই তাহাদের গঠন, গুরু বিপদে অসহায় বিপন্ন অবস্থাটি তাহারা এমনই তীক্ষ্ণ অনুভব করিতে পারে পুরুষে ততটা পারে না। ঐ অবস্থায় তাহারাই সহজে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারে,—স্বভাবত পুরুষার্থ প্রবল পুরুষের যেটি সহজে ঘটিবার নয়; কারণ সম্পূর্ণ শক্তিহীন না হইলে পুরুষ আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। কখন কখন নিজ শক্তিতে বিশ্বাসের অভাবে তাহারা ভগ্ন হইয়া পড়ে, সে ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণও ঘটে না আর পুরুষার্থ-প্রয়োগেও শক্তিহীন। নারী, এ সব ক্ষেত্রে, সহজ আত্মসমর্পণের প্রভাবে যে কল্যাণ আকর্ষণ করিয়া আনে, পুরুষ তাহার পূর্ণ অংশই গ্রহণ করে কিন্তু তাহাদের ধারণাতেও আসে না কিভাবে এটি সম্ভব হইল। এই পৃথিবীর সকল মনুষ্য সমাজেই এই

ভাবে নারী জাতি অশেষ কল্যাণময়ী অথচ পুরুষের ধারণা, নারী দুর্ব্বল এবং জন্মগত অধীনতা লইয়া তাহাদেরই সেবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

যথানিয়মে এখন তাহাদের এই ব্যাকুল আর্ত্তি, বিশেষত নারী-প্রাণের গভীর বিষাদ এবং কাতর প্রার্থনা, সেই জনশূন্য পার্ব্বত্য অরণ্য ভেদ করিয়া যথাস্থানে পৌঁছিল এবং ঐ ক্ষেত্রে যেরূপ সাহায্য প্রয়োজন তাহার যোগাযোগও ঘটিল।

সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পীড়িত ব্যক্তি তৃষ্ণায় কাতর। কণ্ঠ শুখাইতেছে দেখাইয়া স্ত্রীকে বলিল,—বড় তৃষ্ণা, একটু জল। স্ত্রী ভাবিল, সর্ব্বনাশ! তবে ত রক্ষা নাই। এ রোগে রোগীকে জল দিতে নাই, জলপান করিলেই রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য ইহাই তাহার ধারণা। শুধু তাহার নয়, এই হিমালয় রাজ্যে সর্ব্বস্থানেই এই সংস্কার বদ্ধমূল। সুতরাং যদিও সে বলিয়া ফেলিল যে, জলে এখন কাজ নাই, খারাপ হইবে—কিন্তু আমার উপস্থিতির প্রভাব তাহার অন্তঃকরণে অর্থাৎ বুদ্ধির উপর যে ক্রিয়া করিল তাহার ফলে সে ভাবিল যখন এতটাই তৃষ্ণা, তখন জল, পাহাড়ে ঝরনার পরিষ্কার জলপান করিলে তাহার হয়ত উপকারই হইবে। তারপর নিজেও তৃষ্ণা অনুভব করিয়া বালককে জল আনিতে বলিল। তারপর, রোগী ছটফট করিতেছে দেখিয়া সে তাহার বুকে, মাথায়, হাত বুলাইতে লাগিল। অন্য সময় হইলে সে তাহাকে ছুঁইত না, দূরে থাকিয়া যাহা করিবার তাহা করিত।

জল ছিল কিছু দূরে, বালকের জানা ছিল না। এখন তাহাকে পথ দেখাইতে হইল। জল পাইয়া সে প্রথমে নিজে যতটা পারিল পান করিয়া লইল, তারপর পাত্র ভরিয়া লইয়া আসিল। অন্য সময়ে এই ভোটিয়ারা জল পান করে না,—তাহারা মদ্য পান করে। এক প্রকার মদ তাহারা ঘরে প্রস্তুত করে, সংসারের সকল কর্ম্মের মধ্যে ইহাও তাহাদের নৈমিত্তিক কর্ম্ম। তৃষ্ণা অনুভব করিলে জলের পরিবর্ত্তে তাহাই পান করিয়া থাকে। এ অঞ্চলের শীতপ্রধান দেশে

জলে বড়ই ভয়—সর্দ্দি লাগিয়া যাইবে। সেই জন্যই রোগের সময়ে প্রকৃত জলের তৃষ্ণা যখন পায় তখনও জলকে বিষবৎ এড়াইতে চায়। যাহা হউক, এখন বালক জল আনিয়া তাহার জননীকে সেখানে দেখিতে পাইল না। পিতার নিকট পাত্র ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল মা কোথা? রোগী আগে জলতৃষ্ণা মিটাইয়া পরে অঙ্গুলী সঙ্কেতে জঙ্গলের দিকে দেখাইয়া দিল। চাহিয়া দেখিল তাহার মা আসিতেছে, মুখে বিষাদের ছায়া।

জননীকেও রোগে ধরিয়াছে,—পুত্র অগ্রসর হইয়া তাহার কাছে গেল। ধীরে ধীরে তাহার মা পিতার নিকটে আসিয়া বসিল এবং তাহাকে ছুঁইতে নিষেধ করিয়া বলিল, আর রক্ষা নাই, একটু জল দাও। পাত্রটি ছোট, পিতাই সবটা শেষ করিয়াছে, কাজেই বালক আবার ছুটিল জলের উদ্দেশ্যে আর তাহার মা সেইখানে শুইয়া পড়িল। এই পাহাড়ে, হৈজাকি বিমার যখন ধরে তখন এই রকমই হয়। পুনরায় যখন বেগ আসিল, তখন আর তাহাদের উঠিয়া জঙ্গলে যাইতে শক্তি নাই। পড়িয়া পড়িয়া তাহারা সেই বিষম রোগ ভোগ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মাছিতে সে স্থান পূর্ণ এবং তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া গেল। সূর্য্যদেব তখন মাথার উপর।

দুর্গম জঙ্গলে পথের মধ্যে তাহাদের এই অবস্থা। পুরুষের অন্তরে মৃত্যুভয় আছে। নারীর তাহা নাই, সে দেবতার অনুগ্রহের উপর সব ছাড়িয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে সন্তানের কথা ভাবিতেছে বটে তবে দেবতা যা করেন, ভাবিয়া অনেকটাই সে নিশ্চিন্ত; কিন্তু পুরুষটি তাহাদের গাধা, মাল এবং বালকটির কি হইবে এই সকল ভাবিয়া বড় ছটফট করিতেছে। এখন কি ভাবে ইহাদের পরিণতি ঘটিল তাহাই বলিব।

যে পড়াও হইতে ইহারা বাহির হইয়াছিল,—দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে খুলনা অঞ্চলের দুটি বাঙ্গালী যুব' সেখানে আসিয়া পৌছিল। একজন

পাহাড়ী বাহক তাহাদের মালপত্র লইয়া সঙ্গে ফিরিতেছে। দুজনের হাতেই বন্দুক। তবে শিকার তাহাদের উদ্দেশ্য নয়, পায়ে হাঁটিয়া হিমালয়ের সবটা ভ্রমণ করিবে এই উদ্দেশ্যেই মাসাধিক কাল ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক জন চিত্রকর, দ্বিতীয় যুবক বড় খেলোয়াড়।

তাহারা ভোরে উঠিয়াই যাত্রা করিয়াছিল, উদ্দেশ্য, আজ রাত্র এখানে কাটাইবে, স্থানটি উপভোগ করিবে; কাল ভোরে আবার যাত্রা করিবে। এই ভাবেই তাহারা আনন্দে হিমালয় ভ্রমণ করিতেছিল। এখানে পৌঁছিবামাত্র যে ব্যক্তি শিল্পী তাহার মনে স্থানটির উপর একটা বিতৃষ্ণভাব দেখা গেল। বন্ধুকে বলিল, জায়গাটা ভাল নয়, ভয়ানক জঙ্গল—চল খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে—কি বল।

বন্ধুর আজই যাইতে আপত্তি ছিল কিন্তু সে জানিত তাহার আপত্তিতে কাজ হইবে না, কারণ দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। তবুও বলিল, আজ এখানে থাকাই যাক না, দশ মাইল হেঁটে আসা গেল আবার এখনি যাবে? উত্তরে তাহার বন্ধু বুঝাইল যে, এস্থানটি জঙ্গল, মোটেই থাকিবার উপযুক্ত নয়, চল না যাওয়াই যাক। যদি ও জায়গাটা ভাল হয় সেখানে না হয় একটু বেশী থাকা যাইবে। মোটে ত নয় মাইল, আমরা সন্ধ্যার ঢের আগেই পৌঁছাইতে পারিব।

তাহারা যাইবে ঠিক করিল বটে কিন্তু কুলীটা আরাম চায়। সে মালপত্র রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাঠ সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইয়াছে। ফিরিয়া আসিলে দুজনে মিলিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিল, মোটে সাড়ে চার ক্রোশ পথ, আহারাদি সারিয়া বাহির হইলেও আমরা বেলা থাকিতেই পৌঁছাইতে পারিব। সে কিছুতেই রাজী হয় না দেখিয়া, তাহাকে কিছু অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় তখন রাজী হইল।

বেলা যখন তৃতীয় প্রহর ঘেঁষিয়াছে, তখন তাহারা যথাস্থানে

আসিয়া পড়িল। পথের পাশে প্রথমে বালকটিকে, পরে রোগে অচৈতন্যপ্রায় স্ত্রী-পুরুষ লক্ষ্য করিয়া তাহারা সেখানে দাঁড়াইল, কুলী একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিল।

বালক তাহাদের দেখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে তাহার পিতামাতার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া যাহা বলিতে লাগিল আগন্তুক দুজন তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। তবে একথা সহজেই বুঝিল যে, ইহারা রোগগ্রস্ত, অসহায় এবং বিপন্ন। রোগীর নিকটে গিয়া অবস্থা দেখিল, হিন্দীতে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া অবস্থাটা কতক জানিয়া লইল, কেবল, হৈজা কথাটির অর্থ বুঝিতে পারিল না। মলের দুর্গন্ধ, সেখানে মাছি ভয়ানক। এই সকল দেখিয়া তাহারা অনুমান করিল হয়ত-বা ইহাদের কলেরাই হইয়াছে। চক্ষু দেখিল ঘোর রক্তবর্ণ; বিকারের লক্ষণ বুঝিয়া তাহারা চিন্তিত হইল। বলা বাহুল্য, তাহাদের আর যাওয়া হইল না।

আগন্তুক যুবকদের দেখিয়া স্ত্রী-পুরুষ এবং বালক—সকলের প্রাণেই ভরসা আসিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষে জড়িতকণ্ঠে কত কি বলিতে লাগিল কিন্তু তাহাদের কুলী না আসিয়া পৌঁছাইলে কিছুই করা যাইবে না বুঝিয়া পথের দিকে দেখিতে লাগিল। চিত্রকর আগাইয়া গেল দেখিতে, দ্বিতীয় যুবক বালককে জিজ্ঞাসা করিল, জল কোথায় পাওয়া যায়? তাহাদের সঙ্গে একটা তামার কলস ছিল, বালককে জল ভরিয়া আনিতে পাঠাইয়া দিল। তাহারা মলের দুর্গন্ধ পাইয়াও ঘৃণা করিল না।

চিত্রকরের মনে তখন নিশ্চিত ভাবে এই কথাটাই উঠিতে লাগিল যে, রোগগ্রস্ত বিপন্নদের সাহায্যের জন্যই তাহাদের আজ সেখানে থাকা হইল না, আর ভগবান এই জন্যই তাহাদের এখানে পাঠাইয়াছেন। তার মনে আশঙ্কাও ছিল যে, এ-ক্ষেত্রে তাহারাই বা কি করিতে পারিবে। ইহারা বাঁচিবে কি-না সন্দেহ—বালকেরই বা কি হইবে;

এই সব? যাই হোক, কর্ত্তব্য যেটুকু তাহারা সেইটুকু ত করিতে পারিবে! আবার সাহসও আসিতেছিল এই ভাবিয়া যে, ভগবান যখন তাহাদের আনাইয়াছেন তখন অবশ্যই ইহাতে একটা শুভ উদ্দেশ্য আছে।

কিন্তু তাহারা কি করিয়া জানিবে কোন্ ভগবান তাহাদের এখানে আনিয়াছেন, আর কি উদ্দেশ্যই বা তাঁহার আছে ইহার মধ্যে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সৌর দেবদূতগণের কাজ মানুষের চৈতন্য বা বিবেক উদ্বোধিত করা। সরলবুদ্ধি যাহারা তাহাদের উপর দেবদূতের প্রভাব বেশী এবং শীঘ্র কার্য্যকরী হয়। তীক্ষ্ণ বিবেকবান যাহারা তাহাদের উপর কোন প্রভাব বা শক্তির প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, সান্নিধ্যেই অভিপ্রেত কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে আমার কর্ম্ম ছিল দূরবর্ত্তী যুবকদ্বয়ের সঙ্গে এই বিপন্ন যাত্রিগণের যোগাযোগ ঘটানো; তাহাদের সহিত মিলাইয়া দিলেই এ ক্ষেত্রে কল্যাণ হইবে। তাহারা সরল উন্নতমনা বলিয়া সহজেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া গেল। নতুবা রোগীদের বাঁচাইতে আমার কোন হাত নাই, সে কর্ম্ম আমার নয়। এখানে দেখিলাম স্ত্রী বা নারীর মৃত্যু অনিবার্য্য, পুরুষ বাঁচিবে, কিন্তু আমার দরদ তিনটি প্রাণীর উপর সমানই, ইতর-বিশেষ কিছুই নাই, থাকা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যাহা হউক, এই দুই পর্য্যটক বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে সাহস, উৎসাহ, ত্যাগ এবং পরোপকার প্রবৃত্তি থাকার জন্য কাজটি সহজ হইয়া গেল। পূর্ণ আস্থা এবং প্রীতি সহকারে তাহারা এই দৈবনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে লাগিয়া গেল। ইহাতে তাহাদের উপকার কম হইল না। মহত্ত্ব বা মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে এই সকল কর্ম্মই বিশেষ সহায়তা করে।

শুভ কর্ম্মে ব্যাঘাত বিস্তর, এ যেন একটা প্রতিজ্ঞার মতই। এ কাজে তাহারা বাধাও কম পায় নাই। তাহাদের সেই বাহক আসিয়া যখন ব্যাপার দেখিল, বুঝিল, তখন বিষম ভয়ে সে দূরে

চলিয়া গেল। দূর হইতে জোড় হাতে সে যুবকদ্বয়কে রোগীর কাছে যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিল। বিপদের ভয় দেখাইতে লাগিল। তাহার অনুনয় বিনয় দেখিয়া একজন বন্দুকটি তুলিয়া লইল এবং বাহকের দিকে লক্ষ্য করিয়া জানাইল যে, এখন কথার অবাধ্য হইলে এই বন্দুকের গুলিতে তাহার প্রাণ যাইবে। প্রাণের ভয় সকল ভয়ের বড়, সুতরাং বাহক এখন বশীভূত হইল।

তখন বাহকদ্বারা যে কাজ সম্ভব তাহা করানো হইল। জল আনাইয়া রোগীদের পরিষ্কৃত করিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্তন এবং শয্যায় শয়ন করানো হইল। মোটামুটি কিছু ঔষধ তাহাদের সঙ্গে যাহা ছিল বুদ্ধি পূর্ব্বক তাহা সেবন করান হইল। দুজনে মিলিয়া এই দুর্গমে অপরিচিত রোগীদের জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিচারে যথাসম্ভব সেবা করিতে লাগিল। এইভাবে সে রাত্র তাহারা রোগীদের নিকটে কাটাইল। কিন্তু রক্ষা পাইল পুরুষটি। নারীকে বাঁচাইতে পারিল না ভাবিয়া তাহারা গভীর দুঃখ পাইল বটে কিন্তু ভবিতব্য ভাবিয়া শান্ত হইল। নারীর প্রাণশক্তি ছিল না, পুরুষের কল্যাণে সে সবটাই নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিল।

যাহা হউক, স্ত্রীকে হারাইয়া পুরুষের দুর্ব্বল শরীরে যে আঘাত লাগিল তাহা সামলাইতে তাহার কয়েক দিন গেল। যুবকদ্বয়—নারীকে মৃত্যু পর্য্যন্ত যথাকর্ত্তব্য সেবা করিয়া পরে কুলির সাহায্যে গতি করিল এবং যত দিন না পুরুষটি সবল হইল ততদিন তাহারা ঐ খানেই রহিল। পরে যখন পুরুষের চলিবার মত অবস্থা হইল, তখন তাহারা একসঙ্গে চলিল এবং তাহাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া পরমানন্দে নিজেদের নির্ব্বাচিত পথে প্রস্থান করিল।

পরলোকের যা-কিছু, ইহলোকের অ-দৃষ্ট। কারণ দেহত্যাগের পর আর সেই জীবের গতাগতি ইহলোকের কারো ইন্দ্রিয়-গোচর নয়। অথচ মানুষ-সমাজের অনেকেরই জানিতে ইচ্ছা হয়, ঐ অবস্থার কথা

অর্থাৎ দেহত্যাগের পর কি প্রকার গতাগতি হয়, ওখানকার কথা এখানে জানা কঠিন শুধু নয়, ধারণা করাও কঠিন, আবার যারা জানে তাঁদের পক্ষে প্রকাশ করাও কম কঠিন নয়। সেই জন্যই মনে হয়, অ-দৃষ্ট থাকাই ইহার বিধিবদ্ধ সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু আমরা মানুষ, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আমাদের না খাইলেই নয়। তবে তাহাতে লাভ কি, যদি হিসাব করিয়া দেখা যায় তাহা হইলেই দেখিব, যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, সেস্থান হইতে বড় বেশি দূর যাওয়া হয় নাই, তবে মনে হয় যেন অনেকদূর আসিয়াছি বা অনেকটাই বুঝিয়াছি। তবে এটা সাধারণ পল্লবগ্রাহী বুদ্ধির বা সাধারণ অধিকারীর কথা। যাঁরা এই ভাবের পশ্চাতে বুদ্ধি ও মনের সর্ব্বাংশ নিয়োগ করতে পারেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা যোগী, যোগীর কাছে প্রকৃতির সকল গুহ্যই উন্মুক্ত হইয়া যায়।

এখন জীবের ভালবাসা বা প্রেম লইয়াই একটু কথা আছে। সাধারণত ভালবাসা এক প্রবল যৌগিক ব্যাপার। এক হৃদয়ে তাহার জন্ম, পরে তাহা আপন শক্তিতে প্রসারিত হইয়া বিশ্বজগতে মানব-সমাজে ছড়াইতে পারে যদি উহা স্বার্থলেশশূন্য হয়। নর ও নারীতেই ভালবাসা হয় এইটাই সাধারণের ধারণা, কিন্তু আসলে উহা সর্ব্বজীবেরই সম্পত্তি। নর-নারী, নরে নরে, নারীতে নারীতেও উহা ঘটিতে পারে। তবে যেখানে জীবসৃষ্টির প্রয়োজন সেখানে নিশ্চয়ই উহা নর ও নারীর মধ্যেই জন্মায়। সাধারণত মানুষ-সমাজে উহা স্বার্থের সঙ্গেই মেশানো থাকে, আর এমন ভাবেই থাকে যেন স্বার্থ হইতে তাহার অস্তিত্বকে পৃথক করাই যায় না। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই উহা ওতঃপ্রোত জড়িত থাকে, আমরা সহজে দেখিতে পাই।

একই সময়ে এক হৃদয় হইতে অপর হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে পারে এই বিচিত্র আকর্ষণ। ঐ প্রেম, উহার প্রভাবে অসাধ্যও সাধ্য হইতে পারে। কিন্তু উহার আসল তত্ত্বই হইল প্রসারমুখী আকর্ষণ। বিবাহিত

জীবনে স্ত্রী-পুরুষ মিলনের ফলে সৃষ্টি, এই ক্রমে এক হইতে দুই, তারপর বহু হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। এ ধারা সঙ্কীর্ণ, কিন্তু প্রেমতত্ত্বটি ব্যাপক। প্রেম না বলিয়া এখানে ভালবাসা কথাটাই ব্যবহার করা ভাল, কারণ যে সম্পর্কে উহার পরিচয় এখানে বলিতেছি তাহা সন্তান ও জননীর বিষয়।

সবাই জানে, কোন কোন জননীর একমাত্র সন্তানের উপর মমতা অসাধারণ,—অনেক মা সন্তানের জন্য দেহত্যাগ পর্য্যন্ত করিয়াছে। এই যে টান এ বড় সহজ নয়। ইহজগতের এই স্থূল সংসারে এই যে অসাধারণ টান, দেহত্যাগের পর এ কি সবই শেষ হইয়া যায়? সাধারণের মনে যাহাই হউক না কেন, আসলে এ টান মোটেই পার্থিব নয়। ইহার গতি অনেক দূর। তার একটি সূক্ষ্ম কারণ আছে। ঐ যে একটি আত্মার অপর একের প্রতি অসাধারণ টান, ফলে দুইটি সত্তার গতি এক হইয়া যায়। কিন্তু দেহ ভেদ হইলে আগে একজনের মৃত্যু হইলে অপরের কি গতি হয়? গভীর হইলে অন্য জনেরও দেহ রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া ওঠে। এখানে ব্যাপারটা ছিল অন্য প্রকার।

যাহা হোক এখন, আগে যে নারীর দেহত্যাগের কথা বলিয়াছি তাহার সম্বন্ধে আরও একটু বলিবার আছে। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, এক শ্রেণীর মাতৃ সম্পর্কের প্রসার এবং জননীর ভালবাসা পরলোক হইতেও ইহলোকে সন্তানের উপর কিভাবে কল্যাণকর হয়। কিন্তু সন্তান বিপরীত ধর্ম্মী হইলে সেই সন্তান জননীর উর্দ্ধগতির হন্তাও হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে দেখা গেল, জননীর যতটা ভালবাসা সন্তানের উপর ছিল, সন্তানের ততটা ছিল না। এই কারণে পুত্র সন্তানটি, মায়ের মৃত্যুর পর কিছু কাল মোহগ্রস্ত হইয়াই রহিল।

নিঃস্বার্থ প্রেমে পূর্ণ জননী প্রথমে নিজ ভাবে উচ্চ মার্গেই চলিতে-ছিলেন কিন্তু সন্তানের প্রতি মমতার বশে আবার নামিয়া সন্তানের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। এইভাবে তাঁহার উচ্চ মার্গে গতির তাল ভঙ্গ

হইতেছিল। এ ক্ষেত্রে আমার কর্ত্তব্য আছে অনুভব করিলাম। আর সে কর্ত্তব্য হইল জননীকে সন্তানের স্বাধীন গতি সম্বন্ধে সচেতন করা।

সন্তান কতক্ষণ বাপ-মাকে চায়? যতক্ষণ না তাহার স্বতন্ত্র ভোগ জীবন গড়িয়া উঠে। ক্রমে যৌবনের প্রভাবে সে পিতামাতার আকর্ষণ কাটাইতে আরম্ভ করে। পরে তাহার স্বতন্ত্র অস্তির ও প্রবৃত্তি সকল ফুটিতে আরম্ভ করিলেই আকর্ষণটা বিশেষরূপেই কাটাইতে পারে। তারপর সে যৌন সম্বন্ধ পাতাইতে সচেষ্ট হয় এবং যখন তাহার পরিণামে পুত্রের পিতা হয় তখনই সে তাহার জনক-জননীর স্নেহপাশ ছিন্ন করিতে পারে। শাস্ত্রে তাহাকে পিতৃঋণ শোধ বা মুক্তি বলে। কিন্তু মাতৃঋণ পরিশোধের কোন কথাই নাই। কারণ বিশ্বস্রষ্টা প্রকৃতি জননী মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধটি এমনই সুকৌশলে গাঁথিয়াছেন যে, উহার শেষ বা ছেদ হয় না, সুতরাং পরিশোধের দাবি রাখে না। মায়ের উপরে সন্তানের টান না থাকিলেও অধিকাংশ মায়ের তাহা থাকে, ছেদ হয় না, সেই জন্য অনেক সময় জননী পরলোকে গেলেও সন্তানের কথা ভুলিতে পারে না। কারণ সে যে তাঁরই সৃষ্টি এবং এক সময়ের অবলম্বন।

যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে, ক্রমে ক্রমে সেই প্রেমপূর্ণ জননীর নিজগুণেই তাহার সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের কতকাংশ চৈতন্যগোচর হইল। তিনি কারণ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন, সন্তান তাহার প্রতি ততটা আকৃষ্ট নয়। ভবিষ্যতে তাহার সমাজের আর পাঁচজনের মত সে কর্ম্মঠ এবং ভোগবিলাসী হইতে চলিয়াছে। তখন অবস্থানুসারে তাহার কথা ভুলিয়া যাইবে। সন্তানের হৃদয়ে মায়ের জন্য কোনোরূপ আকর্ষণই থাকিবার নয়। এই সকল সহজ নিয়মেই ঘটিয়া চলিবে।

যেই মাত্র জননীর নিজ সন্তানের পরিণাম চৈতন্যগোচর হইল, তখনই তিনি সহজ সাম্যভাবে অনুকূল অবস্থা পাইলেন; ক্রমে নিজ মার্গে ঊর্দ্ধগতি পাইলেন। কিন্তু সন্তানের অশেষ কল্যাণ কামনা, যাহাতে

ভবিষ্যতে বিপদে আপদে সে সহজে উদ্ধার পাইবে এবং তাহার জীবন বিঘ্নসঙ্কুল না হইয়া সহজ হইতে পারে—এমনই একটি শুভ, কল্যাণ কামনার ধারা বা প্রবাহ রাখিয়া গেলেন।

রাখিয়া গেলেন,—বলিয়া যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছি তাহা বুঝাইতে জটিল না হয় সেইজন্য এই কথাটি আবার প্রয়োজন বুঝিয়াই বলিতেছি যে, তাঁহার পবিত্র লঘু (অস্তিত্বময়) সত্তা হইতে, তাহার সন্তানের শুভ হোক, এই কামনার একটি সূক্ষ্ম প্রবাহ জীবন-কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল, তাহাতেই সেই জীবের প্রভূত কল্যাণ নিহিত, আর এইভাবেই এখানকার জীব পরলোকগত আত্মীয়ের শুভইচ্ছা বা আশীর্ব্বাদ পাইয়া থাকে এবং তাহাতে তাহার জটিল জীবন অনেকাংশেই সরল ও শেষে কৃতার্থ হয়।

এখানে আরও একটু কথা জানিয়া রাখা ভাল যে ইন্দ্রিয় সতেজ থাকিলে, কর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল অনুভূতি স্পষ্ট হয় বা জীবিতকালে কর্ম্মাবস্থায় যেমন ভাবে মানুষের হইয়া থাকে, যে সকল ভাব বা বিষয় প্রাণে, মনে ও বুদ্ধিতে জীবন্ত ভাবে ধরা দেয়, পরলোকগত জীবের দেহমুক্ত অবস্থায় সেরূপ সতেজ অনুভূতির সম্ভাবনা না থাকিলেও তাহার অন্তরের কামনাসমূহ ইহজগতের তুলনায় সাধারণত যতই ক্ষীণ মনে হোক না কেন তাহার ক্রিয়াশীলতা কখনও প্রতিহত হয় না, বরং গভীর ভাবেই ফলপ্রসু হইয়া থাকে। কারণ অন্তরীক্ষের সূক্ষ্মভাব-সমূহের অবাধ গতাগতির অবকাশ আছে। আরও কথাটা এই যে, ভাগ্যবান জীব, জীবিত অবস্থায় যাঁরা প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছেন, অর্থাৎ যৌন-প্রবৃত্তির তাড়না-মুক্ত যে সরল প্রেম, নির্ম্মল স্বার্থলেশহীন ভালবাসার আস্বাদ যাঁরা পাইয়াছেন,দেহ মুক্ত হইলে তাঁহাদের উর্দ্ধগতি ও অনুভূতি বহুদূর প্রসারিত হয়। সৃষ্টিতত্ত্বে মানব-প্রকৃতি এবং তাহার গতি সম্বন্ধে সহজ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি তাহাকে অশেষ শক্তিশালী করিয়া তুলে। এক কথায়, তাঁহারা যথার্থই কতকাংশে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন।

এই সূত্রেই হিন্দুদের দেহত্যাগের পর কারো নাম উল্লেখ করিতে সেই নামের আগে ঈশ্বর ৺ চিহ্ন নির্দ্দেশের বিধি। জীবের জীবনে ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে সকল ব্যাপার গোচরিভূত হইয়া থাকে, তাঁহারা ইহ বা পর জগতে তাহাদের প্রিয় জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবার শক্তি লাভ করিয়া বহুবিধ উপায়ে তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন--যাহা স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন এখানকার মানবের অগোচর। এই ভাবেই সেই ভোটিয়া নারী তাহার সন্তানের পক্ষে মৃত হইলেও অশেষ কল্যাণকারিণী হইয়াছিলেন। জগদীশ্বরের সৃষ্টি এই ক্রমেই রক্ষা হইতেছে।

এইবার আমার কর্ম্মক্ষেত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং আমাকে উহা কি বিচিত্র ক্ষেত্রে টানিয়া আনিল তাহার কথা বলিব। এ পর্য্যন্ত আমার কর্ম্ম ছিল অতি দুঃখী বা আর্ত্তজনের বা ব্যক্তিবিশেষের সাহায্য করা; ক্রমে ক্রমেই এই সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ গণ্ডীর বাহিরে যে ব্যাপার ঘটিতেছে তাহার মধ্যে আমার চৈতন্য, দৃষ্টি বা অনুভূতি প্রসারিত হইল। এই অনুভব আপন চৈতন্যে সহজেই আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহ আমাকে আমার পদোন্নতির খবর দিয়া গেল না। নিজেই অনুভব করিতে লাগিলাম, দিকে দিকে যে সকল ব্যাপার পূর্ব্বে আমার চৈতন্যগোচর হইত না, এখন তাহা হইতে লাগিল। সে ব্যাপার অপূর্ব্ব ভাবেই ঘটিল তাহা বলিবার পূর্ব্বে সত্যই এই চমৎকার তথ্যটি জানিয়া রাখা ভাল।

আমাদের ভারতে কত কত যে প্রসিদ্ধ-অপ্রসিদ্ধ দেবমন্দির আছে তাহার হিসাব হয় না। ছোট ছোট গ্রামেও অসংখ্য দেবস্থান আছে। ছোট-বড় প্রাচীন আধুনিক বিখ্যাত কারুশিল্পের নিদর্শন নানা দেবের নানা প্রকার মন্দির তো আছেই কিন্তু সাধারণ ভারতবাসীর একথা জানা আছে কি, ঐ সকল মন্দিরে যথার্থ কোন্ দেবতা অধিষ্ঠিত? অর্থাৎ কোন্ দেবতা ঐ মন্দিরস্থ বিগ্রহ অবলম্বনে সেই মন্দিরে অবস্থিত এবং পূজা গ্রহণ করেন?

আমরা দেখিতে পাই, একজন প্রতিষ্ঠাতা একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন, বিগ্রহ বা লিঙ্গ যাহা প্রতিষ্ঠাতার অভিপ্রায়ানুসারেই স্থাপিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিগ্রহ বা লিঙ্গ, সেটি তো ধাতু বা পাথরে প্রস্তুত, যথার্থ প্রাণহীন জড়ের পর্য্যায়েই পড়ে। এসব বিষয়, উপস্বত্ব আর পূজার নিবেদিত বস্তু ও দ্রব্যসমূহ ভোগ করিয়া থাকেন অধিকারী বা তার বংশের কেহ যাকে তিনি মনোনীত ব্যক্তি বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। এটি তো সবাই জানেন। এখন এ সম্বন্ধে যে কথাটা সবার জানা নেই সেটা এই যে, ঐ সকল মন্দির আশ্রয় করিয়া থাকেন এক শ্রেণীর বিদেহ আত্মা বা উপদেবতা বা জীব—যারা শরীর ত্যাগ করিয়াও এই পৃথিবীতে থাকিতে চান, এখানকার সম্বন্ধ কাটাইতে পারেন না বলিয়া তাঁরা এই ভাবে থাকিতেই ভালবাসেন। স্থূল ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা সাধন বা সৎভাব তাদের সঞ্চিত কর্ম্মকে তাদের কামনা বা ইচ্ছানুযায়ী গতি দিয়া থাকে তাহাতেই তাঁর' মন্দিরের পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে অবস্থান করবার যোগ্যতাও অর্জ্জন করে থাকেন, আর এই সৃষ্টি রক্ষা সম্পর্কে প্রাকৃত নিয়মের বশেই তা ঘটিয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রে দেবতা বলিতে প্রকৃতির অধিকারে ভিন্ন শক্তি। তার মধ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব গণেশ সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি, তার পর উপদেবতার সীমা সংখ্যা নেই। সবারই পূজার রীতি নেই। আসলে যে-কোন মন্দিরে যে-কোন মূর্ত্তি বা বিগ্রহ থাকুক না কেন আসলে পূজা পান কোন বিদেহ পুণ্য আত্মা যাঁরা সংস্কার বশে নিজ নিজ ইষ্ট সাধনানুসারে এক এক বিগ্রহরূপে বিরাজ করেন—তার মধ্যে সমধর্ম্মী যাঁরা তাঁরাই সেই মন্দির মধ্যস্থিত বিগ্রহের অনুরক্ত।

আরও বিশেষ কথা এই যে, ঐ সকল সংস্কার যাদের প্রবল তাঁরা সারা ভারতে হিন্দু-সংস্কৃতির পুরানো আবহাওয়ায় মানুষ আর সেই ভাবেই রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে জন্মান ও বংশবৃদ্ধি করেন। তাই সর্ব্বপ্রদেশের প্রায় সকল স্থানেই দেবমন্দির নির্ম্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বিরাম নাই। আমাদের মন্দির মধ্যে যে দেবতা থাকেন বা জনগণের

এক শ্রেণীর সেবা গ্রহণ করেন কতক মতে তাঁরা উপদেবতার সামিল। যারা দেহত্যাগের পর অলক্ষ্যে অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন, আবার লোক-সমাজে তাঁরা একটা কোন স্থানবিশেষ আশ্রয় করে থাকেন। তাঁদের সংস্কার-গত যে ভোগ, দেবতার উপাসনার ফলে দেবতার মতই পূজা পুষ্প চন্দন, ফুল ফল নৈবেদ্য প্রভৃতি উৎসর্গীকৃত পঞ্চ উপচার বা ষোড়শ উপচারে পূজা গ্রহণেই তাঁহাদের সুখ বা পুণ্যের ফল ভোগ। দেবতা হইয়া পূজা পাইবার প্রবৃত্তিই তাঁহাদের চরম গতি। গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অন্তর্গতজীব, আসলে অধ্যাত্ম শক্তিতে অনুন্নত যারা, তারা বিগ্রহ অথবা লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা, সেই দেবতার নানা উপচারে সেবা করাই তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা। সেই মত তারা জীবিত অবস্থায় বিগ্রহ এবং মন্দির প্রতিষ্ঠাদ্বারা পরলোকের কাজ করিয়া যান। তার পর দেহ ত্যাগ করিয়া সেই বিগ্রহ বা লিঙ্গ মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া দেবতার পূজা গ্রহণ করিয়া স্বর্গ পুণ্যফল ইত্যাদি ভোগ করেন। এমন, অনেক দিনই চলে এই ভাবের পুণ্য ভোগ। তারপর যদি সৎ ধর্ম্মে প্রবল অনুরাগ থাকে, অধ্যাত্ম উন্নতির পথটি পাইয়া যান তবেই সে আশ্রয় ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধমুখে গতি পাইয়া থাকেন। না হইলে সেই বিগ্রহ আঁকড়াইয়াই পড়িয়া থাকেন।

প্রকৃতির এমনই সুন্দর নিয়ম, দেহত্যাগের পর আত্মচৈতন্যের বাহ্য গতি প্রখর হইয়া যায়। কারণ স্থূল বা জড়ের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ তখন থাকিতেই পারে না; সহজেই আত্মচৈতন্যের বাহনরূপী অন্তঃকরণ নিজমার্গে গতি পাইয়া যান, কিন্তু যাদের অর্থাৎ যে জীবের জড়জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনীভূত তারা তো সহজে চৈতন্যমার্গে যাইতে পারিবে না। তারা স্থূল কিছু আশ্রয় করিয়া বহুকাল থাকিতে বাধ্য হয়। এই গণ্ডীর মধ্যে এক শ্রেণীর অপদেবতা আছে যারা নানা ভোগতৃষায় জর্জ্জরিত, তাদের দেহ না থাকিলেও মানুষ-সমাজ ছাড়িতে চাহে না বা পারে না। বিদেহ অবস্থায় সেই সমাজেই ঘোরাফেরা করিয়া

থাকে। যে যে স্থানে তাদের ভোগ্য বস্তু ও কর্ম্মপ্রবল দেখা যাইবে, তারা সেই সেই স্থানেই আছে। অপরাপর জীবিত মানুষের ভোগের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিগত নিজ চেতনা মিলাইয়া তাঁর নিজ ভোগটা কতক পূর্ণ করিয়া লইতে চায়। এটা বুঝিতে অত পরলোকে যাইবার দরকার নাই, এই লোকেই আমাদের আশে পাশেই আমরা দেখিতে পাই না কি, একজনকে ভোজনরত দেখিয়া অপর একজন ক্ষুধার্ত্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সেই ভোগের অংশগ্রহণ করিতেছেন? এ যেমন স্থূল দৃষ্টির বিষয়, অন্য ইন্দ্রিয় সম্পর্কে অনেক কিছু ভোগের আস্বাদন ঐ সব বিদেহ জীব গ্রহণ করে। নরনারীর দেহের গোপন মিলন উপভোগে একশ্রেণীর প্রেতাত্মার কি ভীষণ আগ্রহ। রাস্তা ঘাটে, ঝিয়ের কোলে একটি শিশু, লাবণ্যময় মনোহর মূর্ত্তি একটি নারী বা নর একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখা যায় না কি? মেয়েলী কথায় তাদের বলে ডান বা ডাইনী। তারপর হয়তো এক যুবতীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, এসব দৃষ্টি অনুসরণ করলে একটি তীব্র ভোগস্পৃহা দেখা যায় না কি? এ যেমন স্থূল নিকৃষ্ট ভোগের বিষয়, এর অপর দিকটাও ত আছে।

এখন মন্দিরাশ্রিত দেবতার কথা লইয়াই আমার বর্ত্তমান কর্ম্মাবস্থার কথা, তাহার সহিত এক গৃহী সাধুর কথা আছে। তিনি সাকার উপাসনা করিতেন। তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে তিনি, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ অবলম্বনেই থাকিতেন। এইভাবে কিছু দিন আনন্দেই ছিলেন, নিজ অধিকারে সাত্ত্বিক পূজারতি, ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি লইয়া, ক্রমে তিনি লক্ষ্য করিলেন, যাহারা তাঁহার উত্তরাধিকারী তাহারা বিষয়বৈভব লইয়া উন্মত্ত হইল; ক্রমে পূজাদি ক্রিয়াকর্ম্মের প্রতি অবহেলা, শেষে সব কিছু লোপ পাইবার পূর্ব্বেই তিনি এভাবে উপাসনার মধ্যে অধ্যাত্ম চেতনার অভাব বোধ করিয়াই ঐ অবলম্বন ত্যাগ করিয়া উন্নত মার্গের আশ্রয় লইলেন।

এখন একটি ব্যাপার ঘটিয়াছিল, ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে, মীরাট

অঞ্চলে, সেই কথাই বলবো। কোন এক জঙ্গলের মধ্যে একটি পুরাতন মন্দির ছিল। সেই মন্দিরে যিনি আশ্রয় লইয়াছিলেন অথবা সেই মন্দির আশ্রয় করিয়াছিলেন তিনি আর ছিলেন না। একটা কথা জেনে রাখা ভালো, যখন কোন জীব ঐ ভাবে পরকালে কোন মন্দির বা দেবস্থান আশ্রয় করিয়া থাকেন তখন মন্দিরে অবস্থাও ভাল থাকে। পূজা, অর্চ্চনা সবই ঠিক মত চলে। তারপর যখন তিনি চলিয়া যান অর্থাৎ সেই অবলম্বন ত্যাগ করেন ও নিজ অভীষ্ট মার্গে গতি লাভ করেন তখন সে মন্দির আর তৎসংক্রান্ত সকল ব্যাপারই যেন আপনাপনি শেষ হইয়া যায়। মন্দির তখন শ্রীহীন, ভূতপ্রেতের আড্ডা হয়ে পড়ে। গাছ জন্মায়, শেওলা ধরে, সংস্কারহীন ভগ্নমন্দির জঙ্গলময় হইয়া বন্য পশু পক্ষির আবাসস্থান হইয়া থাকে; সে মন্দিরের কোন আকর্ষণই থাকে না।

অনেকে হয়তো মনে করবেন যে প্রতিষ্ঠাতার বন্দোবস্ত যা-কিছু, পূজার্চ্চনার জন্য বিষয়-সম্পৃত্তি নষ্ট হয় বলিয়াই ঐ রকম অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটে; কিন্তু প্রকৃত তা নয়, আসল অধিষ্ঠাত্রী বা অধিষ্ঠাতার অন্তর্ধ্যানের ফলেই ঐ অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ঘটে। এইটাই ঠিক কারণ। অধিষ্ঠাতার অধ্যাত্ম প্রভাবেই ঐ দেবমন্দিরের সব কিছু পূজা পবিত্রতা রক্ষার আয়োজন ঠিক থাকে; সে প্রভাবের অভাবেই যা-কিছু সবই লোপ পায়। ফলে সে মন্দির ধ্বংসের পথে যায়। কিন্তু যতদিন একেবারে ধ্বংস না হয় ততদিন সেই মন্দির আশ্রয় করিয়া অপর কোন নিম্ন শ্রেণীর অপদেবতা বা প্রেতাত্মা আশ্রয় করিয়া থাকে। তারা ভিন্ন ভিন্ন মার্গের জীব। এখানেও সেই ব্যাপার ঘটিয়াছিল; এই মন্দির আশ্রয় করিয়াছিল এক অপদেবতার জাত। সেইখানে আশ্রয় লইয়া প্রায় সময় নিজ প্রবৃত্তির তাড়নায় গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

এখন এখানে এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিল। এক জোয়ান ভদ্র ঘরের ছেলে আর একটি মেয়েকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ধরিয়া আনিয়া একদিন লুকাইয়া রাখে। মেয়েটি গৃহস্থ ঘরের সুন্দরী বিধবা। তারা

সে রাত্রে তাহাকে ঘর হইতে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া মন্দিরে লুকাইয়া রাখে। আর ছেলেটিকে কিছু দূরে একটা গাছে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সে রাত্রে মেয়েটির উপর আর কোন অত্যাচার হয়নি। গ্রামে সেই রাত্রেই লোকদের জানাজানি, খোঁজাখুজি চলিতেছিল,তারপর ভোর হয়ে যায়, সেইজন্য তাদের কাজের সুবিধা হয়নি। সকালে একটা লোকের পাহারায় রেখে তারা ঐ জঙ্গলের আশেপাশে গা ঢাকা হয়ে থাকে। কথা ছিল, সন্ধ্যায় ওরা সবাই এসে জুটিবে আর যা করিবার তাহা করিবে।

মন্দিরের অপদেবতাটির বড় আনন্দ, সে যা চায় তাই তার সুমুখেই রয়েছে, সেও সেখানে আছে। এ দিকে মেয়েটিকে খাইতে দিলেও সে কিছুই খাইল না, তার স্বাভাবিক মন ও বুদ্ধিগত পবিত্রতাই তার মনে সাহস দিতে ত্রুটি করে নাই। তবে মাঝে মাঝে নারী-প্রকৃতিসুলভ অসহায় ভাবটা তাকে দুর্ব্বল করিয়াও তুলিতেছিল, তাই সে কাঁদিতেও-ছিল, মনে মনে ভগবান শরণও তাকে সময় সময় সাহস যোগাইতেছিল। ছেলেটিরও তাই। তবে তাহারা দুজনে দুজনের অপরিচিত নয়, একই পিতামাতার সন্তান কিন্তু ভাইটি ভগিনীর অবস্থানের কথা জানে না ভগিনীও ভাইটির কথা জানে না।

এখন এই ব্যাপারের পিছনে আছেন ওখানকারই এক জমিদার, কিছু বৈষয়িক স্বার্থের উদ্দেশ্যে এই ব্যাপারটি তিনি ঘটাইয়াছেন। মেয়েটি বড়, ছেলেটি প্রায় বছর দুইয়ের ছোট; ভাই আর বোন, মাতৃহীন তারা। তাদের বাপের কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল। বাপের একটি উপযুক্ত ভাগিনেয় সেই-ই বিষয়-আশয় দেখিত; সকল কিছুই তত্ত্বাবধান করিত। তার বয়স প্রায় চল্লিশ। বাপ যখন মারা যায়, তখন তাদের মা ছিল না, বিমাতাও তাদের ছিল না, কারণ দ্বিতীয় বার পত্নী গ্রহণ করে নাই তাহাদের বাবা। সেইজন্য প্রৌঢ় বয়স্ক পিতা তাদের একটু উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল। আজ দুইমাস হইল বাপও

মারা যায়। দুইদিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিল, কিছু বলিয়াও যাইতে পারে নাই, ব্যবস্থাও বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ভাগনে অর্থাৎ এদের পিসতুত ভাই এস্টেটের ম্যানেজার, এদের সরাইয়া সবটার মালিক হইতে চায়। পরে হইল এই যে, বাড়িতে ডাকাত পড়ার ঢঙ করে ছেলে ও মেয়েটিকে একেবারে সরিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র; লুটপাট কিছু হইল, তারপর যাহা করিবার জন্য লোক লাগানো হইয়াছিল তাহা সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন করিয়া তাহারা ঐ নিরীহ প্রাণী দুটিকে এইভাবে এখানে আনিয়া রাখিয়াছে। রটনা হইয়া গিয়াছে, বাড়িতে ডাকাত পড়িয়াছিল, তারপর লুন্ঠিত দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে অধিকারী জমিদারের পুত্র ও কন্যাকে পাওয়া যাইতেছে না। বর্ত্তমানে উদ্দেশ্য এই যে, ওদের ঐ রাত্রেই হত্যা করিয়া বনের মধ্যে একজায়গায় পুতিয়া তার উপর শিকড় সুদ্ধ একটি গাছ বসাইয়া দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করা হবে।

ছেলেটি ষোলো, মেয়েটি আঠারো। ছেলেটিই বেশি ভীতু, সেইই বড় বেশি ভয়ে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আমি প্রথমেই অনুভব করি, অন্তরীক্ষ হইতে এদের কাতর প্রাণের আহ্বানই আমার সঙ্গে এখানে আসিয়াছিল।

এখানে আসিয়া দেখিলাম, আমি একলা নয়, আরও দুইজন দেবদূত এখানে আছেন, কিন্তু তাঁহারা ভিন্ন কর্ম্মে রত। যাহাতে ঐ সকল নাটের গুরু, সেই ম্যানেজার ভাগিনেয়, নিজ কর্ম্মগতিতে ঐ নিরীহ উত্তরাধিকারী দুজনের হত্যার ষড়যন্ত্রে ধরা পড়িয়া নিজের কর্ম্মফল ভোগ করে, সেই দিকেই কর্ম্ম করিতে ছিলেন। ফলে গ্রামবাসী শুভাকাঙ্ক্ষীদের একত্র করিয়া অতি দ্রুত বাহনের সাহায্যে থানায় খবর ও সঙ্গে সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে আনাইয়া মন্দিরস্থ বনভাগের চারিদিকেই অনুসন্ধানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন দেখিলাম, গ্রামবাসী সুহৃদ্বর্গের ঐকান্তিক যত্ন এবং আগ্রহে পুলিশের কৃতিত্বের ফলে তাহারা

সন্ধ্যার, এমন কি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই, ছেলে ও মেয়েটিকে বাহির করিয়া ফেলিল এবং ঐ মেয়েটির এজাহারে তাহাদের শত্রুপক্ষও বন্ধনদশায় লৌহকঙ্কণ পড়িয়া হাজতে গেল। শেষে বিচারে ন্যায় এবং অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। এইভাবে সকল কর্ম্মেই ঐ দেবদূতের কাজ। গ্রামস্থ সুহৃদ্বর্গের সাহায্যেই তাহারা দুইজনে অভীষ্ট সিদ্ধির পথ সরল করিতে পারিয়াছিল। আমার কর্ম্ম তখন অন্য দিকেই গিয়াছিল। সেই কথাই বলিতেছি।

ঐ যে দুষ্ট নারকীয় জীবটি মন্দির আশ্রয় করিয়াছিল, তাহার উপস্থিতিতে, তাহাকে দেখিতে না পাইলেও মেয়েটি যে আতঙ্কে মধ্যে মধ্যে মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছিল সেই অবস্থা হইতে উদ্ধারের সহায়তায় ছিলাম। যখন ঐ নারকী মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরে ঐ গ্রামমধ্যে তাহার ভোগ মিটাইতে যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে আমি গিয়া চাপিয়া বসিলাম মেয়েটির কাছেই। সে যখন ফিরিয়া মেয়েটির কাছে আসিল তখন আমাকে তাহার নিকটে দেখিয়াই তাহার আর অগ্রসর হইবার শক্তি রহিল না, সে দ্রুতগতি পলাইয়া গেল। যতক্ষণ না গ্রামবাসী আসিয়া মেয়েটিকে মুক্ত করিল ততক্ষণ আমি তাহার কাছেই ছিলাম।

আমি কি করিতেছিলাম,— মেয়েটির মনে সাহস যোগাইতেছিলাম, ; এ বিপদ কখনও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। গ্রামবাসীরা আসিয়া তাহাদের উদ্ধার করিবে, যেহেতু কয়েকজন বিচক্ষণ গ্রামবাসী তাহার পিতার মিত্র ছিল, তাহারাও সংবাদও পাইয়াছিল, এইবার তাহারা আসিয়া তাহাদের উদ্ধার করিবে—এই আশায় আর তাহার হৃদয় অবসন্ন বা দুঃখে অবসাদগ্রস্ত হইতে দেয় নাই।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই যখন কোলাহল করিতে করিতে গ্রামবাসীরা মন্দিরের কাছে আসিল তখনই আমার কর্ম্ম শেষ। মেয়ে ও ছেলেটি উদ্ধারের পর—ঐ প্রেতমূর্ত্তিকে লইয়া পড়িলাম। এই আশ্রয়চ্যুত হইলেই তাহার গতি হইবে, নারকীয়—পরিস্থিতির ভিতর হইতে

উদ্ধার পাইলেই তাহার চৈতন্যের স্ফুরণ অবশ্যম্ভাবী—এ কথা সে জানিত না, আমরা জানিতাম। তাই ঐ ধরনের কোন বিদেহ মলিন-জীব দেখিলেই আমরা তাহার বাসা ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টাই করি। কারণ আশ্রয় ভাঙ্গিবার পরই তাহাদের জড়তা কাটে, এ কথা তাহারা জানে না, তাই ঐ বাসা আঁকড়াইয়া তাহারা পড়িয়া থাকে।

অন্তরীক্ষের এই মহান কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গে মানব-সমাজের প্রত্যক্ষ পরিচয় তো নাইই, কিন্তু কতভাবেই না মানব-সমাজ উপকৃত হয় ভাবিলে বিস্ময় লাগে। এই জগতে মানব কল্পনা করিয়া পরলোকের কথা কতমতেই আলোচনা করে। কিন্তু যথার্থ পরলোকের যা-কিছু এই অন্তরীক্ষের—জলাধারের অন্তরীক্ষের সাথে মিশাইয়া আছে। এ সৌরজগতের মধ্যে এই পৃথিবীর অন্তরীক্ষের প্রসারতা কম নয়, মানব-মনের কাল্পনিক গণনার ধারাও ইহার অন্ত পায় না। অথচ এই মানব সমাজের সঙ্গে তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

পরিশিষ্ট

মানুষের সঙ্গে মানুষের যে ভাবে কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার দ্বারা পরিচয় হয়, বিদেহ জীবেরও তেমনি একরকম ভাবে ভাবে পরিচয় হয়, এটা আগেই কথা-প্রসঙ্গে বলেছি। স্থূল বাক্যের প্রাণ হইল ভাব,—এ জগতে ভাবের স্থান অতি উচ্চে। মানুষ-সমাজে স্থূল শরীর আশ্রয় করিয়াই যত কিছু ক্রিয়াকর্ম্ম চলিতেছে। এই কারণে, স্বভাবটা তার যত কিছু স্থূল বস্তু অবলম্বন করিয়াই চলে, স্থূলের উপরেই তার আসক্তি বেশি। শব্দ বা বাক্য সেটি ত স্থূল, দেহও স্থূল। দেহ ও ইন্দ্রিয় সম্পর্কে যা-কিছু ক্রিয়া উৎপন্ন করে, তাহাও স্থূল।—মানুষে মানুষে ব্যবহারে, একে অপরের স্থূলরূপ বা তার কথা যা শব্দ হইয়া বাহির হয় সেগুলি সহজেই ধরিতে পারে,—কিন্তু রূপের প্রাণ যেটি, বা শব্দের মধ্যে যে ভাবময় রূপ রহিয়াছে তাহার কতক অর্থবোধ করিলেও আসল তত্বটি দেখিতে পায় না। মানুষের মধ্যে যারা উন্নত, ভাবরাজ্যে তাহাদের যে গতাগতি, অনুন্নত মানুষের তা নাই, কাজেই ভাবরাজ্যের কথা তাহাদের অজ্ঞাত বলিলেই হয়।

কিন্তু এই সব জড়, স্থূল রাজ্যের ব্যবহার এবং সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যের ব্যবহার, এই দুইয়ের মধ্যে একটি সরল সূত্র আছে যাহার দ্বারা একের সঙ্গে অপরের ব্যবহার চলিতেছে; সেটি হইল মানুষের বুদ্ধি বা যুক্তি। এই যুক্তি আশ্রয় করিয়াই মানুষ নিজেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্তারূপে অনুভব করে এবং নিজেকে অন্য সবার তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে। তবে যেখানে কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধি, জ্ঞান বা যুক্তির বৈশিষ্ট্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় সেইখানেই তাহার অহং স্তম্ভিত এবং শেষে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তির শরণাগতি ব্যতীত আর উপায় থাকে না। এই

ভাবেই মানুষ-সমাজের নিম্ন স্তর হইতে উচ্চ স্তরের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষার কাজটি চলিতেছে।

এখন এটা স্পষ্টই দেখা যায়, মানুষ নিজ সমাজে বেশ কাজকর্ম্ম করিয়া পিতামাতা, ভাইভগিনী, স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধব লইয়া বেশ একপ্রকার সহজ বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া নানাভাবেই চলিতেছে, কিন্তু এক জায়গায় আসিয়া তাহার বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া গেল ; এ জায়গায় সবারই বুদ্ধি যুক্তি স্তম্ভিত হইয়াই থাকে, কারণ মানুষ যতই উন্নত হোক না কেন, এখানে উন্নত-অবনত সবারই একই গতি। এখানে সবাই একই সমস্যায় ডুবিয়া যায়, স্তব্ধ হয়,—কেহ কাহাকেও সহায়তা করিতে পারে না। কারণ এ সমস্যা, রহস্যময় অবস্থার সমাধান মানুষের দ্বারা সম্ভব নয় ; সে অবস্থাটি কি ? মৃত্যু। এই মৃত্যুই মানুষ-সমাজের পরম রহস্য হইয়া আছে। শুধু মৃত্যু নয়, জন্মও ঠিক অতটাই রহস্যাবৃত, অতটাই বিস্ময়কর, অতটাই গভীর, মানুষের বুদ্ধির অতীত বিষয়। কিন্তু ঐ জন্মের উপলক্ষ্য হইয়া একটা এমনই সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অতীব সুখের ব্যবহার আছে যাহাতে সাধারণ জীবের পক্ষে ঐ রহস্যের পশ্চাতে ধাবন বা অনুসন্ধান প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া যায়। কাজেই বহির্মুখী জীবের জন্ম উপলক্ষ্য করিয়া যে রহস্যের মধ্যে তাহার এই ধরার মাটিতে আবির্ভাব, আবার কালের মধ্যে খানিক হাত-পা নাড়িয়া মন বুদ্ধি লইয়া খেলা করিয়া এই মাটি হইতে তাহার তীরোভাবও তেমনি অমীমাংসিত এবং বিস্ময়কর ব্যাপার হইয়াই রহিয়াছে। অবশ্য ইহা লইয়া উন্নত পর্য্যায়ের যারা তাদের শুধুই কল্পনা নয়, সেই কল্পনার সঙ্গে যুক্তিও আছে। তাহা যুক্তি-যুক্ত কল্পনা বলিয়াই প্রচলিত। এখন সেই সকল অনুসন্ধানের ফলরূপে সমাজের একস্তরের অনুসন্ধিৎসু জীবের মধ্যে কাল্পনিক অবলম্বন হইয়াই আছে। তাঁহাদের এক শ্রেণীর মত এই যে, জীব জলৌকার মত একটি গর্ভ আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়া তবে দেহ পরিত্যাগ করে

আমরা জানি, ঐ সকল তত্ত্বজ্ঞদের মতের মধ্যে সত্য আছে, কারণ একশ্রেণীর যথার্থ জ্ঞান বা মুক্তির জন্য সর্ব্বস্বত্যাগী জীবের পক্ষে তপস্যাপ্রভাবে আছা প্রকৃতির কৃপায় যোগবলে সৃষ্টিতত্ত্বের কতক রহস্যের সন্ধান পাইয়া থাকেন। সেই স্তরের একশ্রেণীর মত, দেহ ত্যাগের পর জীবের ঐ জলৌকাবৎ দেহ ত্যাগ ও গর্ভ আশ্রয়ের ব্যাপার ঘটে। আমরা জানি সাধারণত সকল জীবেরই ঐ ভাবের জন্ম মৃত্যু ঘটে না, ঐ ভাবের জন্ম মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম শিশু বা বালকদের হইতে পারে। কিন্তু পূর্ণ বয়স্ক, যারা জীবন ভোগ করিয়া জন্ম হইতে দীর্ঘ কতক কাল এ সংসারে কর্ম্ম এবং ভোগাদি ব্যাপারে নিযুক্ত, জীবনে যাহাদের স্বার্থপ্রণোদিত জটিল কর্ম্মাদি অনুষ্ঠিত, তাহাদের তো ঐ ভাবে দেহত্যাগ ও পুনর্জ্জন্ম হইতেই পারে না। তাহাদের অনেকেরই পুনর্জ্জন্মের যোগাযোগই থাকে না। অনেকের গীতার কথামত ধারণা যে মৃত্যু মাত্রেই জন্মান্তর গ্রহণ ঘটিয়া থাকে। জন্মান্তর গ্রহণের পথ মোটেই ঐ ভাবের নয়। উচ্চ স্তরের জ্ঞান ও শক্তি, জাগ্রত বিবেকবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব ব্যতীত সাধারণ জীবের জন্মগ্রহণের অধিকার থাকে না। দেহত্যাগের কালে ইচ্ছা, প্রবল পুনর্জ্জন্মের লোভ এটা সকল জীবেরই থাকে কিন্তু উহা থাকিলেই কি তা সম্ভব? এখানে প্রকৃতি জননী বড়ই হিসাব করিয়া চলেন। যদি ইচ্ছামত যত বিগত দেহ জীব আত্মা পুনরায় দেহ বা জন্ম গ্রহণ করিবার অধিকার পাইত তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে স্থান সঙ্কুলান হইত না। মানব-শরীর ধারণের যোগ্যতা অর্জ্জন এবং প্রকৃতি রানীর তাহাতে সম্মতি বড় সহজ বিষয় নয়। স্রষ্টার বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলে কেহ এখানে আসিয়া কর্ম্ম করিতে পারে না। সেই জন্যই ত্যক্ত দেহ মানুষ মৃত্যুতে অথবা দেহ ত্যাগের পর বেশি দুঃখ এইভাবেই পায় যে, সমস্ত জীবনটা তাহার বৃথাই গিয়াছে; যেরূপ কর্ম্ম তাহার করা উচিত ছিল, যে কর্ম্ম করিলে সে এখন শান্তি পাইত সে

ভাবে সে সব কর্ম্ম করাই হয় নাই। প্রবৃত্তির বশেই সে চলিয়াছিল, মনে স্বার্থও দ্বেষের গ্লানি পুষিয়া অপর শান্ত আত্মা যাঁরা তাহাদের পীড়িত করিয়াছে। এখন পুনরায় যদি একবার সুযোগ পায় তো এবার আসিয়া মানবজন্ম সার্থক করিবে। কিন্তু তখন ব্যাকুল হইলেও সে সুযোগ তাহার আসে না। আমরা এখানে, এই অন্তরীক্ষে দেখিয়াছি, বহুতর বিদেহ জীব ব্যাকুল হইয়া কেবল আর একবার জন্মলাভের জন্য বিস্তর অনুতাপ ভোগ করিতেছে। সে তাপ এমনই মর্ম্মন্তুদ যে, ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। সে তীব্র অনুশোচনায় তাহার কাতর অবস্থা দেখিলে আমাদের পর্য্যন্ত টলাইয়া দেয়। কিন্তু আমাদের হাত-পা বাঁধা, আমাদের অধিকারের সীমা আছে। আমরা তাহাদের কি করিতে পারি ? বড় জোর, নানা সৎভাব প্রয়োগ করিয়া শান্ত করিয়া থাকি। তারপর তাহাদের কাল পূর্ণ হইলে প্রেতলোক ও পিতৃলোক হইতে যাহাতে গতি তাহাদের উচ্চতর হয় সেদিকে লক্ষ্য স্থির করিতে সাহায্য করিয়া থাকি। অবান্তর হইলেও বলিলাম, কারণ, এসব বিষয় একটু মনের মধ্যে আলোচনা বা বুদ্ধির গতি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক নিজ জীবন বিশ্লেষণ তো একজনের সহায়তা করিতে পারে বলিয়াই মনে হয়, এগুলি জানিয়া রাখাই ভালো।

এখন এই যে মন্দির বা কোন দেবস্থান আশ্রয় করিয়া আছেন একশ্রেণীর বিদেহ জীবের কথা, তাঁহাদের সংস্কারানুসারে যে ভাবের স্থান অস্তিত্বের পক্ষে সুখদ বা প্রয়োজনীয় এবং শান্তিপ্রদ তাঁহারা জীবিতাবস্থার তপস্যা প্রভাবে উহা সৃষ্টি এবং দেহত্যাগের পর ঐ সকল পবিত্র স্থান অবলম্বন করিয়াই সেই সমাজের সমধর্ম্মী, সমভাবাপন্ন সমবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পূজার্চ্চনা গ্রহণ করিয়া কালযাপন করিয়া থাকেন, ঐ প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাতেই সুখ বা পুণ্য এই ধারণাই তাহাদের থাকে। আবার অনেক ঐ শ্রেণীর উপদেবতা আছেন যারা রোগমুক্তির সহায়তা করিতে সচেষ্ট। পীড়িত ব্যক্তিগণের দুঃখ

তাঁহারা দেখিতে পারেন না, তাই নানাপ্রকার রোগ মুক্তির সহায়তায় তাঁহাদের সচেষ্ট দেখা যায়। অনেক প্রকার ঔষধ নানা ভাবেই বলিয়া দেন। অনেক সাধু সন্ন্যাসী ইহার মধ্যে আছেন, তাঁহাদের প্রবল বিশ্বাস, মানুষকে রোগযন্ত্রণামুক্ত করা ঈশ্বর-অভিপ্রেত কর্ম্ম এবং এই কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহারা ঈশ্বর তুল্য পূজ্য হইবেন।

ঐ ভাবেই মন্দিরালয়ে এক শ্রেণীর সাধু বাস করিয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে কাহারও বা আত্মচৈতন্যের প্রসার যতটা হইয়ছিল কর্ম্মক্ষয় ততটা হয় নাই! এই লোকেও কর্ম্মব্যতীত থাকিবার জো নাই। এমন সন্ন্যাসী বা সাধু এই সংসারে অতি অল্পই আছেন যাঁহারা ত্রিবিধ কর্ম্মক্ষয় করিয়া পূর্ণ ভাবেই আত্মারাম হইয়া এখান হইতে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। এই ভাবের মুক্ত বিদেহ যাঁরা, তাঁদের দেহত্যাগ একটি অপূর্ব্ব ব্যাপার। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে দেহত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য রশ্মি অবলম্বন পূর্ব্বক এমন অবস্থায় চলিয়া যান, যাহার কথা জগদ্বাসী সাধারণ মানবের তো ধারণাই নাই, এমন কি, এখানে তাঁহাদের পরমগতির কথা অন্তরীক্ষবাসী আমরাও জানি না। তবে এই টুকু,— তাঁহাদের জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ পবিত্র আত্মস্বরূপের গতির পরশ লাগিয়া আমাদের সবার অস্তিত্বের মাঝে আনন্দময় শিহরণ খেলিয়া উর্দ্ধপানে মিলাইয়া যায়, সারা ক্ষেত্র ব্যাপিয়া সে স্পন্দন আমাদের অস্তিত্ব সার্থক করিয়া তুলে যাহার স্বরূপ বুঝানো সম্ভব নয়, মাত্র আত্মায় অনুভবেরই বিষয়। এইটুকুই আমাদের বোধগম্য। বাকী যে সব কর্ম্মাধীন সাধু, তাঁহাদের সংসার-সমাজে সাধু বলিয়া যতই কেন না প্রতিষ্ঠা থাকে, যতই ভক্তবৃন্দে পরিবৃত হইয়া সংসার-সমাজে থাকুন না, তাঁহাদের গতি সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত হইতে না পারিয়া আপনাপন জ্ঞান এবং ভোগ-সংস্কার বশে কোন না কোন কর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই ইহ ও পর দুই লোকেই থাকেন। বিশেষ, এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠালোলুপ যে শ্রেণী সাধু দেখা যায়, তাঁহাদের পরলোকগতি ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত দেবালয়

মধ্যেই কোন না কোন সৎকর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই থাকিতে হয়। ইহার মোহ কাটাইতে বহু কাল যায়। কর্ম্ম সৎ হোক বা অসৎ হোক উহা একটি বন্ধন, পাশ এবং মোহ মাত্র একথা মোক্ষমার্গের সবাই জানেন। কর্ম্ম-মোহ সম্পূর্ণ না কাটিলে মুক্ত বা সিদ্ধ হওয়া যায় না। এটি মনে রাখিয়াই সকল কিছু পারমার্থিক জগতের কথা আলোচনা করিতে হইবে। যাহা হউক, দেহত্যাগের পরও সাধারণত কর্ম্ম ও ভোগ থাকে; নানা প্রকার বিপন্ন অবস্থায় জীবের ত্রিবিধ দুঃখমোচন, বুদ্ধিবিপর্য্যয়-ঘটিত দুঃখ দূর, কাহারও বা নানাকারণে জীবন গতি-বিপর্য্যয়ের দুঃখ, নানা ভাবের অজ্ঞানকৃত দুঃখ হইতে মুক্তি, সৎকর্ম্মের বিঘ্ন অপসারণে সহায়তা, এই ভাবে নানা বিষয়ে কর্ম্মধারা সূক্ষ্ম ভাবে চলিতে থাকে, উচ্চস্তরের অন্তরীক্ষবাসীদের কথাই বলিতেছি।

আশ্চর্য্য এই পরলোকের কথা।

* * *

এইবার নিখিলবন্ধু চুপ করিল,—দেখিলাম, তাহার মুখখানি অতীব গম্ভীর সুন্দর, প্রফুল্ল এবং উজ্জ্বল, যেন এক অদ্ভুত দীপ্তিতে পূর্ণ, যেমনটি প্রায়শ কাহারও মুখে দেখা যায় না। সে যেন আলাদা একটি মানুষ, এ লোকের নয়, আমার অপরিচিত, আবার যেন পরিচিতও বটে। একটি স্নিগ্ধ হাসির ভাব তাহার চক্ষে, অথচ মুখে হাসিতেছে না। কতক্ষণ ঐ ভাবেই সে আমার পানে চাহিয়া রহিল। নিঃসঙ্কোচে ঐরূপভাবে ঠায় চাহিয়া থাকা একজনের মুখের পানে, সে ঐ ব্যক্তিই পারে। তাহার সেই দেখার মধ্যে যেন আরও কিছু ছিল। সে দৃষ্টিতে একজনের মনে যে রহস্যময় অপূর্ব্ব একটি ভাব জাগায়, বিস্ময়ে অবাক হওয়া ব্যতীত তাহা বর্ণনার আর কোন ভাষা নাই।

খানিক পরে, যখন তাহার দৃষ্টির প্রভাব অনেকটাই স্তিমিত হইয়া আমার স্বাভাবিক ভাব, অর্থাৎ নিখিলের সঙ্গে আমার সহজ সম্বন্ধবোধ

প্রায় ফিরিয়া আসিয়াছে, এমনই মুহূর্তে হঠাৎ যেন এই কথাটা আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল :

থামলে যে ? শেষ হয়ে গেল নাকি তোমার কথা ? শুনিয়া নিখিল আবার এক রকমের একটু হাসিল,—মুচকি হাসির ভাবটি,—যেন আমার কথাটি তাহার বিশ্বাস হইল না। তাহাতে আমি একটু অপ্রতিভ বোধ করিলাম। যেই সে দেখিল তাহার সেই মিলানো হাসির প্রভাবে আমি অপ্রতিভ হইয়াছি, তৎক্ষণাৎ সে বলিল,—এর পর আরও শুনতে চাও ? আমার তো মনে হয় ওটা ঠিক তোমার ভিতরের কথা নয়।

সত্য সত্যই এইবার যেন পূর্ণ অপ্রতিভ হইলাম, তাই চুপটি করিয়াই আছি দেখিয়া সে অতীব কোমল কণ্ঠেই বলিল,—দোষ নিও না ভাই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য বল,—তোমার কি আর একটুও ধৈর্য্য আছে,—তুমি যে আরও শুনতে চাইচো ?

এখন আত্মরক্ষার্থে সত্যই বলিলাম,—আচ্ছা, তুমি সত্য বল তো তোমার আজকার কথা আরম্ভ থেকে শেষ, যখন নিজেই কথা বন্ধ করেছ, তখন পর্য্যন্ত আমায় তিল মাত্র অমনোযোগী দেখেছ কি-না ? তুমিই বলো।

ভাই,—বলিয়া নিখিলবন্ধু একটু যেন কিছু ভাবিয়া লইল, তার-পর বলিল,—সত্যই বলচি, আমি ঠিক লক্ষ্য করিনি। তবে এখন তোমার কথায় মনে হচ্চে যেন তুমি একবারও নস্য নাওনি যদিও দেখচি এখনও তোমার নস্য শিশিটি হাতেই ধরা আছে। বোধ হয় শুনছিলে। তা বেশ, ভাই,—বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে সে উঠিল এবং এক পা এক পা চলিতে লাগিল,—যেন দ্বারপথ অতিক্রম করিয়া এখনই চলিয়া ইবে, দেখিয়া আমিও উঠিলাম।

একটু দাঁড়াও না ভাই, আমার কথা আছে তোমার সঙ্গে।

আর একদিন হবে,—বলিয়াই সে সোজা চলিয়া পথের উপর গিয়াই দাঁড়াইল। আবার সেই রহস্য মা মিলানো হাসির ভাবটি মুখে লাগিয়া আছে দেখা গেল

তারপর আমার প্রতি একেবারেই বিমুখ নিখিল হইল।

পথটা সোজা সমুদ্রের দিকেই গিয়াছে।